শরদিন্দু অম্‌নিবাস

শরদিন্দু অমনিবাস

সপ্তম খণ্ড

ছোট গল্প

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রকাশক : ফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি-২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৫৪

প্রথম সংস্করণ : ১৩৬২

দ্বিতীয় মুদ্রণ : ১৩৮৩

নিবেদন

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র রচনাবলী কয়েক খণ্ডে শরদিন্দু অম্নিবাস নামে প্রকাশিত হচ্ছে।

লেখকের গোয়েন্দা কাহিনী, ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং কিশোরদের জন্য লেখা গল্পগুলি যথাক্রমে শরদিন্দু অম্নিবাস প্রথম—চতুর্থ খণ্ডে ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে।

পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম—এই তিনটি খণ্ড শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবদ্দশায় প্রকাশিত গল্প-গ্রন্থগুলির সমুদয় গল্পের সংকলন।

পঞ্চম খণ্ডে লেখকের অলৌকিক ও হাস্য-কৌতুকরসের এবং ষষ্ঠ খণ্ডে ঐতিহাসিক ও সামাজিক গল্প মিলিয়ে একশ দশটি গল্প পূর্বে মুদ্রিত হয়েছে। সপ্তম খণ্ডে বাকী চুয়াত্তরটি গল্প—প্রেমের ও সামাজিক—সংকলিত হল।

—প্রকাশক

সূচী

অমরবৃন্দ	...	১
মরণ দোল	...	৯
আঙটি	...	১৫
ভল্লু সর্দার	...	২২
বিদ্রোহী	...	৩৬
স্বখাত সলিল	...	৪৫
অভিজ্ঞান	...	৫৩
একূল ওকূল	...	৬০
শালীবাহন	...	৭৩
মায়ামৃগ	...	৭৭
হাসি-কান্না	...	৯২
প্রণয়-কলহ	...	৯৯
ধীরে রজনি	...	১০২
শুক্লা একাদশী	...	১০৪
মন্দ লোক	...	১০৬
মায়া কানন	...	১০৯
নিশীথে	...	১১৩
রোমান্স	...	১১৯
পিছু ডাক	...	১২৩
গোপন কথা	...	১৩৬
অপরিচিতা	...	১৩৯
ঘড়ি	...	১৪১
ইচ্ছাশক্তি	...	১৫০
বাঘিনী	...	১৫১
দিগ্‌দর্শন	...	১৬১
স্মর-গরল	...	১৬৫
ছুরি	...	১৭০
নিষ্পত্তি	...	১৭৮
শাদা পৃথিবী	...	১৮৩
ভাগ্যবন্ত	...	১৯০
মেঘদূত	...	১৯৪
বালখিল্য	...	১৯৯
পূর্ণিমা	...	২০৮
স্বাধীনতার রস	...	২১১
যুধিষ্ঠিরের স্বর্গ	...	২১৪
জোড় বিজোড়	...	২২০

বড় ঘরের কথা	...	২২৩
অষ্টমে মঙ্গল	...	২৩৪
কল্পনা	...	২৩৭
কানু কহে রাই	...	২৪২
অপদার্থ	...	২৫৮
চরিত্র	...	২৬১
গীতা	...	২৬৭
ঘাড়িদাসের গুপ্তকথা	...	২৬৯
এমন দিনে	...	২৭৬
সাক্ষী	...	২৮২
হেমনলিনী	...	৩০০
পতিতার পত্র	...	৩০৬
সেই আমি	...	৩১৩
মানবী	...	৩১৬
প্রিয় চরিত্র	...	৩৩০
স্ত্রী-ভাগ্য	...	৩৩৬
সুত-মিত-রমণী	...	৩৪৪
চলচ্চিত্র প্রবেশিকা	...	৩৫২
সুন্দরী ঝর্ণা	...	৩৬২
চিড়িক্‌দাস	...	৩৬৫
চিন্ময়ের চাকরি	...	৩৬৭
ডিক্‌টেটর	...	৩৭৪
মুষ্টিযোগ	...	৩৭৭
গোদাবরী	...	৩৭৯
অবিকল	...	৩৮৯
কিসের লজ্জা	...	৩৯১
বোম্বাইকা ডাকু	...	৩৯৪
আর একটু হলেই	...	৩৯৭
কিস্টোলাল	...	৩৯৯
জন্মান্তর সৌহৃদানি	...	৪০৯
পলাতক	...	৪১৬
ভাই ভাই	...	৪২১
প্রেম	...	৪২৬
রমণীর মন	...	৪২৯
মটর মাস্টারের কৃতজ্ঞতা	...	৪৩৬
বুড়ো বুড়ি দুজনাতে	...	৪৪১
কালস্রোত	...	৪৪৪
অমাবস্যা	...	৪৬৩

অমরবৃন্দ

গৃহিণী থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিলেন। কাজেই শুইতে যাইবার বিশেষ তাড়া ছিল না। রাত্রি দশটা নাগাদ আহারাদি শেষ করিয়া লাইব্রেরী-ঘরে আসিয়া বসিলাম। ভৃত্য তামাক দিয়া গেল।

নৈশ-প্রদীপের তৈল পুড়াইয়া কাজ করা আমার অভ্যাস নাই—ভারি ঘুম পায়! কিন্তু আজ স্থির করিলাম—গৃহিণী যখন বারোটার পূর্বে ফিরিবেন না, তখন মাঝের এই দুই ঘণ্টা সময় কাজ করিয়াই কাটাইয়া দিব। 'বাংলা সাহিত্যের অমরবৃন্দ' নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিব মনে আঁচিয়া রাখিয়াছিলাম; সম্পাদক মহাশয়ও প্রত্যহ তাগাদা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এমন কি শীঘ্র লেখাটা না দিলে তিনি আমার বাসায় আসিয়া আড্ডা গাড়িবেন, এমন ভয়ও দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু তবু কিছুতেই লেখাটা বাহির হইতেছিল না। আজ স্থির করিলাম, যেমন করিয়া হোক প্রবন্ধের পত্তন করিব। একবার আরম্ভ করিতে পারিলে আর ভয় নাই।

টেবিলের সামনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে বসিলাম। সম্মুখে টেবিল-সংলগ্ন মেহগিনর র‍্যাকের উপর বাংলাভাষায় যে কয়খানি অমর গ্রন্থ আছে, সারি দিয়া সাজানো ছিল—সেই দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া ঘন ঘন তামাক টানিতে লাগিলাম।

প্রথমে মাইকেল মধুসূদন দত্তকে ধরা যাক। মধুসূদনের অমর সৃষ্টি কোন্ চরিত্র? রাবণ নিশ্চয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাবণকে লইয়াই প্রবন্ধ আরম্ভ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে; মন্দ হইবে না।

তারপর বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমের কোন্ সৃষ্টি অমর? কপালকুণ্ডলা? দেবী? সূর্যমুখী? ভ্রমর?—কি আশ্চর্য! বঙ্কিম কি পুরুষ-চরিত্র অঙ্কিত করেন নাই? তবে, কেবল নারীচরিত্রগুলি মনে পড়িতেছে কেন?

যাক্—এবার রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার কে কে আছে? চিত্রাঙ্গদা—'দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।' আর? রাজা বিক্রম! হুঁ—হইতেও পারে! তা ছাড়া 'চোখের বালি'র বিনোদিনী আছে—সন্দীপ আছে—

রবীন্দ্রনাথের পর কে? শরৎচন্দ্র। তাঁর রাজলক্ষ্মী, কমল, সুরেশ, সব্যসাচী, কিরণময়ী—

অতঃপর? শরৎচন্দ্রের পর কে? আর কেহ আছে কি।...টেবিলের ধারে মাথা রাখিয়া ভাবিতে লাগিলাম। ভাবিতে ভাবিতে—

আমি আফিমের নেশা করি না। কিন্তু তামাকের ধোঁয়ার সঙ্গে চিরদিনের অভ্যাস মিশিয়া বোধ হয় একটু তন্দ্রা আসিয়া পড়িয়াছিল। আমি মানসচক্ষে দেখিলাম—আমার

সবুজ বনাত-ঢাকা টেবিলের উপর কচি কচি ঘাস গজাইয়াছে। শাখাযুক্ত কলমদানীটা কোন্ ফাঁকে দুটি নব পল্লবিত বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। চারিদিকে যে বই খাতা ইত্যাদি ছড়ানো ছিল, সেগুলো পাথরের চ্যাঙড় মাটির ঢিবি বনিয়া গিয়াছে। গঁদের পাত্রটা বেবাক শিবমন্দিরে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। অথচ আয়তনে কিছুই বাড়ে নাই—আমি যেন বাইনাকুলারের উল্টা মুখ দিয়া এই দৃশ্য দেখিতেছি।

বড় ভাবনা হইল। আমার লেখার সমস্ত সরঞ্জাম যদি এইভাবে পাহাড় জঙ্গল বৃক্ষ ইত্যাদিতে পরিবর্তিত হইয়া যায়, তাহা হইলে সম্পাদক মহাশয়কে কি দিয়া ঠেকাইয়া রাখিব? রচনার পরিবর্তে দূর্বাঘাস তিনি কখনই লইবেন না, তিনি তেমন লোকই নন।

টেবিলের ওপারে বইয়ের র‍্যাক্‌টা ধোঁয়াটে একটা পাহাড়ের মত দেখাইতেছিল। পাশাপাশি বিভিন্ন আয়তনের বইগুলো তাহারি উত্তুঙ্গ চূড়ার মত আকাশে মাথা তুলিয়াছিল। হঠাৎ খুট্ খুট্ শব্দ শুনিয়া ভাল করিয়া সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি—দুইজন ঘোড়্সওয়ার একটা বইয়ের তলা হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে! পাহাড়ী রোমশ দুইটি ঘোড়া, পিঠে কম্বলের জিন্, তাহার উপর দুই সিপাহী আসীন। একজন হিন্দু, অন্যটি মুসলমান। হিন্দুর মাথায় মুরেঠা, গায়ে আঙ্‌রাখা, পায়ে নাগরা, কোমরে তরবারি। মুসলমানের মাথায় টোপ, গায়ে কিংখাপের শিরমানি ও পায়জামা, পায়ে মখমলের জুতা। তাহারও রেশমী কোমরবন্দ্ হইতে শম্‌শের ঝুলিতেছে।

দু'জনে আসিয়া আমার কলমদানের একটা বৃক্ষতলে নামিল। গাছের ডালে ঘোড়া বাঁধিয়া হিন্দু বলিল, 'খাঁ সাহেব, এইখানেই কোথায় আছে। আমার মনে আছে, আমি পাহাড়ের গুহা থেকে সেটা ছুঁড়ে নীচের উপত্যকায় ফেলে দিয়েছিলুম।'

খাঁ সাহেবের চেহারা অতি সুন্দর; মুখে সামান্য দাড়ি আছে, কিন্তু তাহাতে গণ্ড ও চিবুকের গোলাপী বর্ণ ঢাকা পড়ে নাই। তাঁহার চোখের দৃষ্টি মেঘলা আকাশের মত ছায়াচ্ছন্ন—যেন দুঃখের গভীরতম তল পর্যন্ত ডুব দিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন। তিনি ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'তাই তো সিংহজী, এতদিন পরে সে জিনিস কি আর খুঁজে পাওয়া যাবে? যা হোক, চেষ্টা করে দেখতে দোষ নেই। হয়তো ঘাসের তলায় চাপা পড়ে গেছে।—আসুন, খুঁড়ে দেখা যাক।' বলিয়া কোমর হইতে তরবারি বাহির করিলেন।

সিংহজী হাসিয়া বলিলেন, 'তলোয়ার রাখুন। সব কাজ কি তলোয়ারে হয়? আমি খোন্তা জোগাড় করছি।' এই বলিয়া সিংহজী আমার একটা কলম তুলিয়া লইয়া বলিলেন 'চমৎকার খোন্তা পাওয়া গেছে। আপনিও একটা নিন।'

দু'জনে অম্লান বদনে আমার দুইটি কলম তুলিয়া লইয়া ঘাসের উপর এখানে-ওখানে খুঁড়িতে আরম্ভ করিলেন। আমি ভাবিতে লাগিলাম—কে ইঁহারা? কোথায় ইঁহাদের কথা পড়িয়াছি। একজনের মুখে শৃগালের ধূর্ততা মাখানো, অন্যজন শার্দুলের মত গম্ভীর। অথচ দু'জনের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব। কে ইঁহারা?

সিংহজী সহসা সানন্দে বলিয়া উঠিলেন, 'পেয়েছি, পেয়েছি, খাঁ সাহেব। এই দেখুন।' বলিয়া একটি ক্ষুদ্র বস্তু তুলিয়া ধরিলেন।

খাঁ সাহেব নিকটে আসিয়া বলিলেন, 'সত্যিই তো! লাগিয়ে দেখুন, আপনারটা বটে কিনা।'

সিংহজী বলিলেন, 'আমি আমার আঙুল চিনি না?' বলিয়া নিজের বাঁ হাতটা তুলিয়া ধরিলেন। তখন দেখিলাম তাঁহার বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা নাই। সিংহজী ছিন্ন আঙুল যথাস্থানে জুড়িয়া দিতেই সেটা বেবাক জোড়া লাগিয়া গেল।

এতক্ষণে ইঁহাদের চিনিলাম—আঙুলকাটা মাণিকলাল ও মবারক আলি খাঁ!

মবারক বলিলেন, 'সিংহজী, আপনার হারানো নিধি তো আপনি খুঁজে পেলেন। এবার চলুন, আমার হারানো নিধির সন্ধান করি।'

মাণিকলাল মিটি মিটি হাসিয়া বলিলেন, 'কে, দরিয়া বিবি?'

মবারক কিয়ৎকাল অধোমুখে রহিলেন, শেষে বলিলেন, 'সিংহজী, আপনি তো সব কথাই জানেন। যে আমাকে সাপের মুখে পাঠিয়ে দিয়েছিল, আমি তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি!'

'শাহজাদি আলম্ জেব্-উন্নিসা বেগম?'

'হ্যাঁ, তাকে কিছুদিনের জন্য পেয়েছিলুম, আবার হারিয়েছি।'

মাণিকলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তাঁকে খুঁজলেই পাবেন মনে হয়?'

মবারক বলিলেন, 'জানি না। কিন্তু তবু খুঁজতে হবে।'

'বেশ, চলুন।'

দুইজন ঘোড়ার দিকে অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে পশ্চাতের পাহাড় হইতে পিল্ পিল্ করিয়া উইয়ের মত এক পাল ভেড়া বাহির হইয়া আসিল। গড্ডালিকা-প্রবাহের পশ্চাতে একজন মেষপালক। তাহাকে দেখিয়াই মনে হইল পূর্বে কোথায় দেখিয়াছি। কিন্তু চিনি চিনি করিয়াও চিনিতে পারিলাম না। মেষপালক বয়সে প্রৌঢ়; দাড়ি গোঁফে মুখ আচ্ছন্ন, স্কন্ধে উপবীত। মুখে একটু ব্যঙ্গ-হাস্য লাগিয়া আছে—যেন পৃথিবীর সমস্ত ধাপ্পাবাজি তিনি ধরিয়া ফেলিয়াছেন।

মেষযূথ সবুজ মাঠের উপর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। মেষপালক অনায়াস-পদে মন্দিরের নিকটবর্তী হইলেন। তারপর একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর মস্তক রক্ষা করিয়া শ্যামল শষ্পশয্যায় শয়নপূর্বক মন্দিরের চত্বরে পা তুলিয়া দিলেন।

মাণিকলাল এতক্ষণ অশ্বের পাশে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন; বলিলেন, 'লোকটা তো মহা পাষণ্ড। শিবমন্দিরে পা তুলে দিলে! অথচ ব্রাহ্মণ বলে বোধ হচ্ছে। আসুন তো দেখি!' মেষপালকের নিকটে গিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, 'কে রে তুই—শিবমন্দিরের গায়ে পা তুলে দিয়েছিস! পা নামা ব্যাটা।'

মেষপালক পা নামাইয়া উঠিয়া বসিল। দুইজন অস্ত্রধারী পুরুষকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'তোমাদের সঙ্গে তরবারি রহিয়াছে দেখিতেছি। দুইজনেই বলবান। সুতরাং আমার অন্যায় হইয়াছে, এরূপ কার্য আর করিব না।'

মাণিকলাল কহিলেন, 'তুমি ব্রাহ্মণ বলেই আজ নিষ্কৃতি পেলে। কিন্তু এ-রকম ভাবে পা উঁচু করে শোবার উদ্দেশ্য কি?'

মেষপালক বলিল, 'পা উঁচু করিয়া শুইলে ধ্যান করিবার সুবিধা হয়। চেষ্টা করিয়া দেখিও।'

মাণিকলাল এই অদ্ভুত মেষপালকের কথা শুনিয়া বিস্মিতভাবে বলিলেন, 'তোমার নাম কি?'

মেষপালক মৃদুহাস্যে বলিল, 'আমার নাম জাবালি। উপবেশন কর।'

মাণিকলাল তখন দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। মবারকও পাশে বসিলেন।

মাণিকলাল সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রভু, আপনি ভেড়া চরাচ্ছেন কেন?'

জাবালি বলিলেন, 'দেখ, ভেড়ার মাংস অতিশয় সুস্বাদু। তাহাদের প্রতিপালনে কোনও কষ্ট নাই। তাহারা আপনি চরিয়া খায়, আপনি বংশবৃদ্ধি করে। আমি বিনা ক্লেশে উহাদের মাংস পাইয়া থাকি। উপরন্তু উহাদের রোম হইতে কম্বল প্রস্তুত হয়।

সুতরাং অন্নবস্ত্র কিছুরই অভাব থাকে না।'

মবারক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'অন্নবস্ত্র ছাড়া মানুষের অন্য কাম্য কি নেই?'

জাবালি প্রতিপ্রশ্ন করিলেন, 'আর কি আছে?'

মবারক একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন, 'রমণীর প্রেম।'

জাবালি বলিলেন, 'বৎস, প্রেম একটা সংস্কার মাত্র—অতএব অন্যান্য সংস্কারের মত উহা বর্জনীয়। কিন্তু ক্ষুধা সংস্কার নয়—শীতের প্রকোপকেও সংস্কার বলা চলে না। উহারা সংস্কারবিবর্জিত উলঙ্গ সত্য—চোখ ঠারিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। জগতে আর যাহা কিছু সকলই সংস্কার। দেখ, কিছুকাল পূর্বে আমি শিবমন্দিরে পা তুলিয়া দিয়াছিলাম বলিয়া তোমরা আমাকে তিরস্কার করিতেছিলে। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, শিব কে? তাহার আবার মন্দির কিসের? ইহা যদি শিবের মন্দির হয়, তবে শিব নামক কোনো ব্যক্তি নিশ্চয় ইহার মধ্যে আছে। আমি আদেশ করিতেছি, আনো দেখি শিবকে এই মন্দির হইতে বাহির করিয়া।'

মাণিকলাল নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। তখন জাবালি আবার বলিলেন, 'শিব এখানে নাই, সুতরাং ইহা শিবমন্দির নহে। অতএব ইহার গায়ে পা তুলিয়া দিলেও কোনো অপরাধ হয় না। কিন্তু তোমরা দুইজন অস্ত্রধারী পুরুষ যখন আপত্তি করিতেছ, তখন সুবুদ্ধি-পরিচালিত হইয়া আমি সে-কার্য হইতে বিরত হইলাম।'

মবারক পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, 'কিন্তু নারীর প্রেম একটা সংস্কার মাত্র, এ যুক্তি কি সুবুদ্ধি-পরিচালিত?'

জাবালি কহিলেন, 'অবশ্য। শারীরিক ক্ষুধার তাড়নাই পুরুষকে নারীর প্রতি আকৃষ্ট করে; এই আকর্ষণ নারী-বিশেষের প্রতি নয়—নারী-সাধারণের প্রতি। ক্ষুধার সময় মৃগমাংস ও মেষমাংস যেরূপ সমান প্রেয়—নারী সম্বন্ধেও তাহাই, কোনও প্রভেদ নাই। কেবল, সুস্বাদু খাদ্য দেখিয়া যেরূপ লোকে লুব্ধ হয়, সুন্দরী নারী দেখিয়াও সেইরূপ লালায়িত হয়। এই লালসাকে প্রেম বলিতে চাহ বলিতে পার, কিন্তু তাহা ভ্রম। বস্তুত, প্রেম বলিয়া কিছু নাই, মানুষ বংশানুক্রমে আত্মপ্রতারণা করিয়া এই প্রেমরূপ সংস্কারের উদ্ভব করিয়াছে।—ভাবিয়া দেখ, তুমি যতদিন জেব্-উন্নিসাকে না পাইয়াছিলে ততদিন দরিয়া বিবিকে লইয়া সন্তুষ্ট ছিলে; কিন্তু জেব্-উন্নিসাকে পাইবা-মাত্র দরিয়া বিবির প্রতি তোমার বিতৃষ্ণা জন্মিল। ইহার কারণ কি?'

মবারক দ্বিধা-প্রতিফলিত মুখে নীরব রহিলেন, সহসা উত্তর দিতে পারিলেন না। মাণিকলাল বলিলেন, 'প্রভু, আপনার কথাগুলি কড়া হলেও সত্য বলে মনে হচ্ছে। নির্মল থাকলে আপনার উপযুক্ত জবাব দিতে পারত। সে ভারি বুদ্ধিমতী—ঔরংজেব বাদশাকে ঘোল খাইয়ে ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? আপনি স্বয়ং সমস্ত সংস্কার থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন তো?'

জাবালি বিনয় সহকারে বলিলেন, 'দম্ভ করিতে নাই। দম্ভে বুদ্ধির মলিনতা জন্মে। তথাপি, আমি সম্পূর্ণ দম্ভমুক্ত হইয়া বলিতেছি যে, আমার সংস্কার দূর হইয়াছে।'

মবারক ঈষৎ অধীরভাবে বলিলেন 'সাহেব, আপনার বক্তব্য আমাব কাছে খুব স্পষ্ট হল না। এমন অনেক সময় দেখা যায় যে, একটি লোক পৃথিবীর শতকোটি নারীর মধ্যে কেবল একটিকেই সারা জীবন ভালবেসেছে—অন্য স্ত্রীলোকের পানে মুখ তুলেও চায়নি; সেই স্ত্রীলোকের মৃত্যুতে সে জগৎ অন্ধকার দেখেছে; কিন্তু তবু অন্য নারীকে হৃদয় সমর্পণ করতে পারেনি। এই একনিষ্ঠা কি প্রেম নয়?'

জাবালি বলিলেন, 'বৎস, উহাই প্রেম নামে অভিহিত বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা একটি সংস্কার মাত্র। সংস্কার মাত্রেই দুঃখের কারণ, তাই প্রেম-পীড়িত ব্যক্তিরা সর্বদা

দুঃখ পায়। দেখ, ছাগজাতীয় জীব প্রেম নামক সংস্কার হইতে মুক্ত, তাই তাদের প্রেমজনিত দুঃখ নাই; বিশেষের প্রতি তাহার নিষ্ঠা নাই, তাই তাহার অনুরাগ সর্বব্যাপী। তাহাকে বিশ্বপ্রেমিকও বলিতে পার। এই ছাগের অবস্থাই সকল মোক্ষাভিলাষীর কাম্য। উহাই ভূমা।'

মবারক বিরক্তভাবে মুখ ফিরাইয়া লইলেন, জাবালির কথার উত্তর দিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। এইখানেই বোধ করি আলোচনা শেষ হইত, কিন্তু এই সময় মন্দিরের অপর পার্শ্বে দুইজন তর্করত ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শুনা গেল। দেখিতে দেখিতে দুইজন ধুতি-পাঞ্জাবি-পরিহিত যুবক মন্দিরের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিল। একজন দীর্ঘাকৃতি গৌরবর্ণ পুরুষ, খদ্দরের বেশভূষা যেন তাহার বিশাল অঙ্গে ঠিক মানাইতেছে না; অন্যটি পরিপূর্ণ বাঙালী, শ্যামল সুশ্রী চেহারা, মুখ বুদ্ধির প্রভায় উজ্জ্বল।

রজতগিরিনিভ পুরুষ জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিল, 'তুমি ভুল করছ, বিনয়। আমার হাতে যখন অস্ত্র নেই, তখন আমি শুধু হাতেই লড়ব; কিন্তু তবু দুষ্টের পীড়ন চুপ করে পড়ে সহ্য করব না। আমি গোরার গুলি খেয়ে মরতে রাজী আছি, কিন্তু পাহারাওয়ালার রুলের গুঁতো আমার অসহ্য।'

বিনয় বলিল, 'বড়টা যখন তুমি স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত, তখন অপেক্ষাকৃত ছোটটায় আপত্তি কেন?'

গোরা বলিল, 'আবার ভুল করলে। আমার কাছে বন্দুকের গুলিটা তুচ্ছ, রুলের গুঁতোই বড়। কারণ ওতে আমার মনুষ্যত্বকে আহত করে, বন্দুকের গুলি তা পারে না।'

বিনয় বলিল, 'তা যেন হল। কিন্তু এদিকে উদ্দেশ্য সিদ্ধি যাতে হয় সেদিকেও তো দৃষ্টি রাখা দরকার।'

'উদ্দেশ্যটা তোমার কি শুনি?'

'দেশের উদ্ধার।'

গোরা গর্জন করিয়া উঠিল, 'না—কখনো না। আমাদের প্রথম এবং একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে মনুষ্যত্বের উদ্ধার। মনুষ্যত্বকে যদি ভীরুতার হাত থেকে উদ্ধার করতে না পার, তাহলে দেশ নিয়ে করবে কি? সত্যাগ্রহ? তুমি কি মনে কর, নিজের দাবীকে আঁকড়ে ধরে এক জায়গায় বসে থাকলেই সত্যের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করা হয়?'

বিনয় বলিল, 'তাছাড়া বর্তমান অবস্থায় আর কি করা যেতে পারে? তোমার মত গর্জন করলে কোনো ফল হবে কি?'

'না, শুধু গর্জনে কাজ হবে না, বর্ষণও চাই। আমাদের দেহ আছে, হাত পা আছে, সেই হাত পা দিয়েই কাজ করতে হবে। অনাচারের বিরুদ্ধে আমাদের দেহ-মনের সমস্ত শক্তিকে যুযুৎসু করে তুলতে হবে। কেবল প্রহার সহ্য করবার শক্তিকে পোক্ত করে তুললে কাজ হবে না। ওটা জড়শক্তি—জীবশক্তি নয়।'

এই সময়ে মন্দিরপার্শ্বে কয়েকজন লোক আসীন দেখিয়া বিনয় বলিয়া উঠিল, 'গোরা, তোমার বক্তৃতা থামাও—কারা রয়েছে।'

জাবালি হাত তুলিয়া উভয়কে নিকটে ডাকিলেন। তাহারা নিকটবর্তী হইলে কহিলেন, 'স্বাগত! তোমরা উপবিষ্ট হও।'

গোরা ও বিনয় সসম্ভ্রমে ঋষিকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিল। জাবালি আশীর্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমাদের মধ্যে কিসের চর্চা হইতেছিল?'

বিনয় অল্প কথায় ঋষিকে তর্কের বিষয় বুঝাইয়া দিল। তিনি বলিলেন, 'ভাল, বুঝিলাম, তোমরা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিতে চাও। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি

—স্বাধীনতা লাভ করিয়া ভারতবর্ষের কী ইষ্টসিদ্ধি হইবে?'

বিনয় মৃদু হাসিয়া বলিল, 'একেবারে গোড়ার প্রশ্ন। গোরা, জবাব দাও।'

গোরা বলিল, 'স্বাধীনতাই চরম ইষ্ট নয়, ইষ্টসিদ্ধির একটা উপায় মাত্র। আসল কাম্য—সুখ।'

জাবালি বলিলেন, 'যদি তাহাই হয়, তবে সুখলাভের জন্য দুঃখকে বরণ করিতে, চাহ কেন?'

গোরা বলিল, 'বৃহত্তর দুঃখের হাত এড়াইবার জন্য; যেমন, গো-বীজের টীকা নিলে বসন্ত রোগের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়।'

মাণিকলাল গোরাকে সমর্থন করিয়া বলিলেন, 'ঠিক কথা। আর একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে; যেমন, ক্ষুধার বৃহত্তর দুঃখ এড়াবার জন্য ঋষিবর মেষপালনরূপ অল্প দুঃখ স্বীকার করছেন।'

জাবালি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'ভাল। তোমাদের যুক্তি বিচারযোগ্য বটে। এখন বল দেখি, ভারতবর্ষ নামক বিশাল ভূখণ্ডকে বা তদ্দেশবাসী নরনারীকে স্বাধীন করিয়া তোমাদের লাভ কি হইবে। তোমরা নিজের চরকায় তৈল দিতেছ না কেন?'

গোরা বলিল, 'ভারতবর্ষই আমার চরকা, আমি তাতেই তেল দিতে চাই। ভারতবর্ষের ছত্রিশ কোটি নরনারীর সুখই আমার সুখ।'

জাবালি কিয়ৎকাল তুষ্ণীভাব ধারণ করিয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে শিরঃসঞ্চালন করিয়া বলিলেন, 'বৎস, তুমি পরের প্রতি মমতাসম্পন্ন হইয়া ভ্রান্তপথে চলিয়াছ—ও-পথে কাম্যলাভ করিতে পারিবে না। ভারতবর্ষই বল আর অন্য দেশই বল, উহা কতকগুলি মনুষ্যের সমষ্টি মাত্র। এই মনুষ্যগুলি নিজের সুবিধার জন্য কতকগুলি সমাজ বা গোষ্ঠীর সৃষ্টি করিয়াছে। সকল সমাজের কাম্য এক নহে—এমন কি পরস্পর বিরোধী। একে যাহা চাহে, অন্যে তাহা চাহে না। ব্যক্তিগত ভাবেও তদ্রূপ;—তুমি সাত্ত্বিকভাবে জীবন যাপন করিতে চাহ, আর একজন মদ্য মাংস আহার করিয়া তামসিকভাবে কাল হরণ করিতে ভালবাসে। সুতরাং কেবলমাত্র স্বাধীনতার দ্বারা সকলকে একই কালে সুখী করা অসম্ভব। সে চেষ্টাও পণ্ডশ্রম।'

কিছুক্ষণ হেঁটমুখে চিন্তা করিয়া গোরা বলিল, 'তবে, আপনার মতে, সার্বজনীন সুখলাভের উপায় কি?'

জাবালি বলিলেন, 'আত্মসুখের চিন্তায় অবহিত হওয়া। সকলেই যদি স্বার্থসন্ধ হইয়া নিজ নিজ সুখের কথা ভাবিতে থাকে তাহা হইলে অচিরাৎ তাহারা সুখবস্তু লাভ করিবে। দেখ, কি সহজ উপায়। সকলে স্বার্থপর হও, আর কাহারও দুঃখ থাকিবে না।'

বিনয় ও মাণিকলাল হাসিতে লাগিলেন। গোরার মুখেও একটু হাসি দেখা দিল, সে বলিল, 'প্রস্তাবটা বোধ হয় নূতন নয়—আগেও শুনেছি। কিন্তু স্বার্থে স্বার্থে যখন সংঘাত বাধবে তখন তো দুঃখ আপনি এসে পড়বে!'

জাবালি বলিলেন, 'সত্য। মনুষ্যজীবনের চরম শ্রেয় কি, তাহা মানুষ জানে না বলিয়াই যত প্রকার দুঃখের উদ্ভব হয়। কেহ মনে করে অর্থই সুখ, কেহ মনে করে স্বাধীনতাই সুখ। এইজন্য লক্ষ্যবস্তুর বিভিন্নতা হেতু বিরোধের উৎপত্তি হয়। তুমি ভারতবর্ষকে সুখী করিতে সমুৎসুক। উত্তম কথা, যাহা বলিতেছি শোন। লোকশিক্ষা দাও। মানুষকে বুঝাও যে, সংস্কার বিমুক্ত হইয়া সুখের অন্বেষণই একমাত্র ইষ্ট। সুখ কি তাহা মানুষ ভুলিয়া গিয়াছে—তাহাকে নূতন করিয়া বুঝাইয়া দাও। যেদিন সকলে হৃদয়ঙ্গম করিবে সুখ নামক মানসিক অবস্থাই একমাত্র পরমার্থ—ঐহিক বিষয়-সম্পত্তি বা দারা-পরিজন নহে—সেদিন জগতে আর দুঃখ থাকিবে না।'

মবারক এতক্ষণ নীরবে বসিয়া শুনিতেছিলেন; তিনি প্রশ্ন করিলেন, 'কিন্তু সুখ কাকে বলে সেটা তো আগে জানা দরকার। সুখের সংজ্ঞা কি?'

জাবালি হাসিলেন, বলিলেন, 'দুঃখ-সংযোগের বিয়োগই সুখ। ইহার অধিক কিছু বলিব না। গীতা নামক একটি গ্রন্থ আছে—উহাতে কিছু কিছু সত্য কথা বলা হইয়াছে; পাঠ করিয়া দেখিতে পার। শুনিয়াছি, আকবর শাহ উহা পারস্য ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।'

সহসা দূরে রমণীকণ্ঠের আর্তধ্বনি ইঁহাদের আলোচনার জাল ছিন্ন করিয়া দিল। সকলে চমকিয়া ফিরিয়া দেখিলেন, একটি যুবতী ভয়-ব্যাকুল ভাবে তাঁহাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে এবং দুইজন মাতাল পরস্পর গলা-জড়াজড়ি করিয়া স্খলিতপদে টলিতে টলিতে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে।

একটা মাতাল ভাঙা গলায় গান ধরিল, 'এসেছিল বক্‌না গরু পর গোয়ালে জাব্‌না খেতে—'

দ্বিতীয় মাতাল বলিল, 'If music be the food of love, play on—The man that hath no music in himself, nor is not moved with concord of sweet sounds—'

পলায়মানা যুবতী আবার অস্ফুট চীৎকার করিয়া বলিল, 'বাঁচাও—কে আছ, রক্ষে কর—'

গোরা, বিনয়, মবারক ও মাণিকলাল একসঙ্গে উঠিয়া সেইদিকে ছুটিয়া গেলেন; গোরা জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হয়েছে?'

স্ত্রীলোকটি তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল, 'ওরা আমার পেছু নিয়েছে। আমি অভয়া।'

মাতাল দুটাও কিছু দূরে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। ক্রুদ্ধ মবারক তরবারি বাহির করিয়া তাহাদের কাটিতে উদ্যত হইলেন। মাণিকলাল ইসারায় তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া কর্কশকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোরা কারা?'

এক নম্বর মাতাল তখনো ভাঙা গলায় গান গাহিতেছিল, সে গান বন্ধ করিল না। দ্বিতীয় মাতাল বলিল, 'কেন বাবা, বদিয়াতি করছ—শিকার পালায়, পথ ছাড়ো। আমরা দু'জনে নামকাটা সেপাই।'

মাণিকলাল তাহার নাসিকায় একটি মুষ্ট্যাঘাত করিলেন; গোরা তাহার সঙ্গীতজ্ঞ সহচরের গালে একটি প্রচণ্ড চড় কশাইয়া দিল। দু'জনেই ধরাশায়ী হইল। দ্বিতীয় মাতালটা শয়ান অবস্থাতেই মাথা তুলিয়া বলিল, 'এই তো বাবা, অন্যায় করছ। মাতাল মেরে কোনো লাভ নেই—তার চেয়ে মদ মারো, মজা পাবে। গোকুলবাবুকে ঐ কথাই বলেছিলুম—'

প্রথম মাতাল ক্ষীণকণ্ঠে গান ধরিল, 'দেহি পদপল্লবমুদারম্‌—'

মবারক তৎক্ষণাৎ তাহাকে একটি পদাঘাত করিলেন; সে একবার হেঁচ্‌কি তুলিয়া নীরব হইল।

এই সময় জাবালি সেখানে আসিয়া মাতাল দুইটিকে শায়িত অবস্থায় দেখিয়া বলিলেন, 'কি হইযাছে? ইহারা মদ্যপ দেখিতেছি। আহা, উহাদের মারিও না, ছাড়িয়া দাও।'

দ্বিতীয় মাতাল একটি হাত তুলিয়া বলিল, 'Amen! বেঁচে থাক বাবাজী—তোমার দাড়ির জয়জয়কার হোক। কিন্তু বাবা, মদ্যপ বল্‌লে প্রাণে বড় ব্যথা পাব। দেবেনটা পাতি মাতাল কিন্তু বাবা, আমি—সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই জয়কালী,

বলে—'

দেবেন্দ্র উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, 'নিমে, চুপ কর, গানটা গাইতে দে—' বলিয়া গান গাহিবার উদ্যোগ করিল—'সুরাপান করি না আমি—'

নিমচাঁদ বাধা দিয়া বলিল, 'তুই শালা রামপ্রসাদের কি জানিস? ক্যাডাভারাস্ চাষা কোথাকার। তুই মালিনী মাসীর গান গা—'

গোরা বলিল, 'চোপরও।—অভয়া, এ দুটোকে নিয়ে কি করি বল তো?'

অভয়া এতক্ষণে বেশ প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল; হাসিয়া বলিল, 'ছেড়ে দিন। আচম্‌কা ভয় পেয়েছিলুম, নইলে ভয় পাওয়া আমার স্বভাব মনে করবেন না যেন, গোরবাবু। তাছাড়া, মাতালের অভিজ্ঞতাও আমার জীবনে কম হয়নি।'

জাবালি বলিলেন, 'বৎসে অভয়া, তোমার প্রস্তাব আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। কারণ, আমি দেখিতেছি, সুরাসক্ত হইলেও ইহারা কিয়ৎ পরিমাণে সংস্কারমুক্ত হইয়াছে। সুতরাং ইহারা বিশেষ করিয়া তোমার দয়ার পাত্র।'

অভয়া ভক্তিভরে জাবালির পদধূলি লইয়া বলিল, 'প্রভু, আপনার বাণীই আমার জীবনের শান্তি। সংস্কার থেকে মুক্তি কখনো পাব কিনা জানি না, কারণ, দেখতে পাই একটা সংস্কার ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে তার বিপরীত সংস্কারটা ঘাড়ে চেপে বসে! কিন্তু সেই পথেই চলেছি!'

জাবালি বলিলেন, 'সেই পথেই চল। উহাই একমাত্র পথ—অন্য পন্থা নাই।'

অভয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'দেবী হিন্দ্রলিনীকে দেখছি না? তিনি কোথায়?'

হিন্দ্রলিনীর নাম শুনিবামাত্র জাবালির মুখে দুঃখের ছায়া পড়িল, চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হইল। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'হিন্দ্রলিনী নাই—তিনি স্বর্গতা।' বলিয়াই সচকিতভাবে চতুর্দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'কিন্তু সেজন্য আমার কোনও দুঃখ নাই। যবচূর্ণ থাকিতে ঈষৎ ক্লেশ হয় বটে কিন্তু তাহা যৎসামান্য। আমার মেষপাল লইয়া আমি পরম সুখে আছি।' বলিয়া বদনমণ্ডল প্রফুল্ল করিবার চেষ্টা করিলেন।

মবারক পাশে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন; তিনি মৃদু হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

ইতিমধ্যে, বোধ করি মাতালের গণ্ডগোলে আকৃষ্ট হইয়াই, অনেকগুলি নরনারী পাহাড়তলি হইতে বাহির হইয়া ঘটনাস্থলের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। তাহাদের সকলকে চিনিতে পারিলাম না, কয়েকজনকে আন্দাজে চিনিলাম। একজন আধ-পাগলা গোছের লোক একটা ভাঙা বেহালা লইয়া অনবরত তাহাতে ছড় চালাইতেছিল, কিন্তু বেহালায় আওয়াজ বাহির হইতেছিল না। মূর্তিমতী ইন্দ্রাণীর মত একটি নারী—মুখে গাম্ভীর্য, বুদ্ধি ও সৌন্দর্যের অপূর্ব সম্মিলন হইয়াছে—মন্থরপদে আসিতে আসিতে পিছু ফিরিয়া ডাকিল—'চারু!'

তাহাকে চিনিতে বিলম্ব হইল না! এমন আরও অনেক নরনারী আসিল, কাহাকেও দেখিয়া চিনিলাম, কেহ চেনা-অচেনার সংশয়ময় সন্ধিস্থলে রহিয়া গেল।

দুইটি তরুণী হাত-ধরাধরি করিয়া নিঃশব্দে সকলের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিল, কেহ তাহাদের লক্ষ্য করে নাই। দু'জনেই শ্যামবর্ণা কৃশাঙ্গী,চেহারাও প্রায় একই রকম। বিনয়ের পাশ দিয়া যাইবার সময় বিনয় মুখ তুলিয়া তাহাদের প্রতি চাহিয়া মৃদু হাসিল, বলিল, 'ব্যাপার কি? একেবারে যুগল রূপে যে!'

বুঝিলাম, দু'টিই ললিতা। একটি বিনয়ের, অন্যটি শেখরের।

বিনয়ের ললিতা মুখ টিপিয়া হাসিল, উত্তর দিল না। গোরার কাছে গিয়া নিম্নস্বরে বলিল, 'গোরবাবু, সুচিদিদি আপনাকে ডাকছেন। এদিকে কিসের গোলমাল হচ্ছে—তাই আপনাকে পাঠালেন।'

গোরা বলিল, 'যাচ্ছি। কিন্তু তার আগে—'

গোরা সাঁড়াশির মত আঙুল দিয়া নিমচাঁদ ও দেবেন্দ্র দত্তকে ঘাড় ধরিয়া তুলিল—বলিল, 'চল—'

নিমচাঁদ বলিল, 'নিজে থেকেই যাচ্ছি বাবা—গলাটিপি দাও কেন? ওটা যে বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে! To gild refined gold, to paint the lily, to throw a perfume on the violet—'

খট্ খট্! খট্ খট্! একটা বেসুরা শব্দে সকলে চমকিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, একজন বৃদ্ধ মুসলমান একটা লাঠি কাঁধে ফেলিয়া পাগলের মত ছুটিয়া আসিতেছে এবং বিকৃত উত্তেজিত কণ্ঠে বারবার কি একটা বলিতেছে।

সকলে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল; মোহগ্রস্ত বৃদ্ধ লাঠি কাঁধে তাহাদের প্রদক্ষিণ করিতে করিতে চীৎকার করিতে লাগিল, 'তফাৎ যাও! তফাৎ যাও! সব ঝুট হ্যায়!'

ক্রমশ পাগলা মেহের আলির কণ্ঠস্বর আমার কর্ণে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া মিলাইয়া গেল। আমার সম্মুখে যে-দৃশ্য অভিনীত হইতেছিল তাহাও অল্পে অল্পে ফিকা হইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। কেবল কানের কাছে সেই উৎকট খট্ খট্ শব্দ প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল।

টেবিল হইতে মাথা তুলিয়া দেখি, বহির্দ্বারের কড়া সজোরে নড়িতেছে। চোখ রগড়াইয়া উঠিয়া পড়িলাম।

গৃহিণী থিয়েটার দেখিয়া বাড়ি ফিরিয়াছেন।

৭ চৈত্র ১৩৪০

মরণ দোল

পয়লা মাঘ ১৩৪০; সন্ধ্যাকাল। মুঙ্গের শহর বলিয়া যাহা এতকাল পরিচিত ছিল তাহারই একপ্রান্তে আমাদের ক্লাবের বিধ্বস্ত বিমথিত ঘরখানার বাহিরে আমরা কয়েকজন ক্লাবের সভ্য বসিয়া ছিলাম। সকলেরই আপাদমস্তক গৈরিক ধুলো ও সুরকিতে আবৃত। কাহারও পায়ে জুতো নাই। বরদার গায়ে কেবল একটা গেঞ্জি—বাহুর একটা স্থান কাটিয়া ধুলোয় রক্তে মাখামাখি হইয়া শুকাইয়া ছিল। সে থাকিয়া থাকিয়া হি হি

করিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

বেলা দু'টা বাজিয়া বারো মিনিটের সময় ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে; কিন্তু আকাশ এখনো রক্তাভ ধূলায় আচ্ছন্ন হইয়া আছে। নীচে, উইঢিবির উপর উইয়ের মত অসংখ্য লোক ইটের স্তূপের উপর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, প্রিয়জনের নাম ধরিয়া ডাকিতেছে, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। আমরা ক্লান্ত অবসন্ন দেহে বসিয়া ধুঁকিতেছিলাম। অভিশপ্ত শ্মশানীভূত শহরের উপর অলক্ষিতে শীতরাত্রির অন্ধকার নামিয়া আসিতেছিল।

সকলেই স্ব স্ব চিন্তায় মগ্ন ছিলাম; তাই মাঝে মাঝে যা দু'একটা কথা হইতেছিল তাহাও ছাড়া ছাড়া অসংলগ্ন বোধ হইতেছিল। শচীন হঠাৎ বলিয়া উঠিল, 'একটা কোদাল পেলে হয়তো দাশুটাকে বাঁচাতে পারতুম। ইট আর সুরকির তলা থেকে তার কাতরানি শুনতে পাচ্ছিলুম; কিন্তু শুধু হাত দিয়ে পঞ্চাশ টন ইট সুরকি সরানো—'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শচীন চুপ করিল। শুধু হাতেও যে সে পঞ্চাশ টন ইট-সুরকি সরাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার রক্তমাখা ক্ষতবিক্ষত আঙুলগুলা তাহার সাক্ষ্য দিতেছিল।

বরদা দন্তবাদ্য কোনোমতে থামাইয়া বলিল, 'আজ টেম্‌পারেচার কত বলতে পার? ফ্রিজীং পয়েণ্টের নীচে নেমে গেছে নাকি?'

অমূল্য এতক্ষণ ক্লাবঘরের ভাঙা বরগা, জানালার কাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া আগুন জ্বালিতে প্রবৃত্ত ছিল; এখন বলিল, 'এস, ঘিরে বসো। আজ রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা কি?'

সকলে আগুন ঘিরিয়া বসিলাম। বরদা বলিল, 'আমার গোয়াল ঘরটা দাঁড়িয়ে আছে—সেইখানেই সকলে মিলে গুঁতোগুঁতি করা যাবে।'

অমূল্য জিজ্ঞাসা করিল, 'আর আহার?'

বরদা মাটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, 'ঘাস। আজ আর বিচিলিও পাচ্ছ না।'

অমূল্য হাসিয়া বরদার পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া বলিল, 'কুচপরোয়া নেই। গোয়ালেই যখন থাকতে হবে তখন ঘাসে আপত্তি করলে চলবে কেন?'

নন্দ'র একটা পা ভাঙিয়া গিয়াছিল। সে কোট প্যাণ্টালুন পরিহিত অবস্থায় চিৎ হইয়া ঘাসের উপর শুইয়া সিগারেট টানিতেছিল। মাথায় একটা ব্যাণ্ডেজ জড়ানো ছিল; একটা পা প্যাণ্টালুনের উপরেই লাঠি দিয়া সোজা করিয়া বাঁধা ছিল। আমরা তাহাকে চ্যাংদোলা করিয়া আনিয়া আগুনের পাশে শোয়াইয়া দিলাম। নন্দ'র মাথার চোট খুব গুরুতর নয়; কিন্তু সে কেমন যেন ঝিমাইয়া পড়িতেছিল। নিজের মনেই সিগারেট টানিতে টানিতে বিড়্ বিড়্ করিয়া বলিল, 'দোতলার অফিস রুমে বসে টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে সিগারেট ফুঁক্‌ছিলুম; প্রথম আধ মিনিট বুঝতেই পারলুম না যে ভূমিকম্প হচ্ছে। গঁদের শিশিটা টেবিলের ওপর থেকে নাচ্‌তে নাচ্‌তে যখন মাটিতে পড়ে গেল তখন বুঝলুম। ঘর থেকে বেরিয়ে পালাতে যাব, খিলেন থেকে একটি এগারো ইঞ্চি খসে মাথায় পড়ল। মুখ থুব্‌ড়ে পড়লুম সেইখানেই—তারপর পায়ের ওপর পড়ল একটা বীম!......হামাগুড়ি দিয়ে পালাবার চেষ্টা করলুম—সিঁড়ি পর্যন্ত পেঁছুতে না পেঁছুতে সমস্ত বাড়িখানাই মাথার ওপর ভেঙে পড়ল।'

অমূল্য বলিল, 'নন্দ, তুই পেল্লাদ-মার্কা ছেলে। এতেও যখন মরিসনি তখন আর তোর ভাবনা নেই।'

নন্দ নিজ মনে বলিয়া চলিল, 'জ্ঞান যখন হয়, দেখলুম নাকের ফুটো সুরকিতে বন্ধ গেছে—হাঁ করে নিশ্বাস নিচ্ছি। সর্বাঙ্গের ওপর অসহ্য চাপ; মনে হচ্ছে ইট-পাথরের

চাপে পাঁজরাগুলো এখনি প্যাঁকাটির মত মট্ মট্ করে ভেঙে যাবে। চোখ খুলে চাই-বার উপায় ছিল না, ধুলোয় চোখ বন্ধ। কিন্তু কান দুটো খোলা ছিল। অনেক রকম আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলুম। আমার বাঁ পাশে অফিসের দপ্তরী হায়দার মিঞা 'পানি লাও' 'সরবৎ লাও' 'হালুয়া লাও' বলে নানারকম ফরমাস করছিল—বোধ হয় তার মাথায় চোট লেগেছিল। ডান দিক থেকে একজনের কাশির আওয়াজ আসছিল, কেউ রক্তবমি করছিল। ক্রমে দু'দিকের শব্দই থেমে গেল। আমার শরীরের ওপর চাপ যেন আরো বেড়ে উঠ্তে লাগ্ল—কান ভোঁ ভোঁ করতে লাগল। তারপর আর মনে নেই।—তোরা কখন আমায় বার কর্লি?'

পৃথ্বী দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মুখে পুরিয়া চুষিতেছিল—সে ডাক্তার। অঙ্গুষ্ঠ বাহির করিয়া বলিল,—'সাড়ে চারটের সময়। উপুড় হয়ে পড়েছিলি; ভাগ্যে একটা বীম কোণাচে ভাবে তোর ওপর পড়েছিল—নইলে—' আমার দিকে ফিরিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, 'হাস-পাতালের অবস্থা কি রকম কিছু জানো? নন্দ'র জন্যে অন্তত একটা splint আর কিছু টিংচার আয়োডিন চাই-ই। মাথায় জখমটা বিশেষ কিছু নয় কিন্তু পায়ে compound fracture of the tibia—যদি গ্যাংগ্রীন set in করে—'

প্রমথ বলিল, 'উপায় নেই। হাসপাতাল দেখে এসেছি—ধুলো হয়ে উড়ে গেছে!'

কিছুক্ষণ সকলে নীরব রহিলাম। আমাদের অঙ্গারগর্ভ ধুনী আরক্তভাবে জ্বলিতে লাগিল। সেইদিকে তাকাইয়া শচীন বলিয়া উঠিল, 'আড়াই মিনিটের মধ্যে সাত শতাব্দীর কীর্তি একটা শহর তাসের বাড়ির মত ধূলিসাৎ হয়ে গেল। উঃ! কী ভীষণ শক্তি! আমার বিশ্বাস, জার্মান হাউইট্জার দিয়ে বারো ঘণ্টা বোম্বার্ড করলেও এমনটা করতে পারত না। কত লোক মরেছে কেউ আন্দাজ করতে পারো?'

অমূল্য বলিল, 'ছ'সাত হাজারের কম নয়।'

প্রমথ মাথা নাড়িল, 'আমি সমস্ত শহর ঘুরে দেখে এসেছি—মোট দশ বারো হাজার লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাকী লোক গেল কোথায়?'

নন্দ জিজ্ঞাসা করিল, 'বাঙালী ক'জন মরেছে?'

তখনো সম্পূর্ণ খবর জানা যায় নাই; যতদূর জানা গিয়াছিল নন্দকে বলিলাম। শুনিয়া নন্দ জিজ্ঞাসা করিল, 'তোদের বাড়ির সবাই বেঁচে আছে? কেউ যায়নি?'

ভাগ্যক্রমে আমাদের কয়জনের আত্মীয় পরিজন রক্ষা পাইয়াছিল। ঘরবাড়ির অবশ্য কাহারো চিহ্ন ছিল না; কিন্তু সকলে যে প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছে এই সৌভাগ্যের আনন্দে সর্বস্ব হারানোর দুঃখও লঘু হইয়া গিয়াছিল। রাজেন সেই কথাই বলিল, 'বাড়িঘর গিয়েছে যাক গে, বেঁচে থাকলে আবার হবে। কি বলিস? কিন্তু ভেবে দ্যাখ দেখি, যদি মণি'র মত অবস্থা হত!'

আমরা মনে মনে শিহরিয়া উঠিলাম। মণি'র স্ত্রী পুত্র মা ছোটভাই—অর্থাৎ পৃথিবীতে আপনার বলিতে যে-কয়জন ছিল সকলেই চাপা পড়িয়াছিল, কেবল সে একা বাঁচিয়া ছিল।

অনেকক্ষণ কোনো কথা হইল না; তার পর চুনী মৃদুকণ্ঠে হাসিতে লাগিল। মণি'র দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিয়া হাসিতেছে না তাহা বুঝিলাম। এতগুলো ভয়ঙ্কর ঘটনা এত অল্পকালের মধ্যে চক্ষের সম্মুখে ঘটিয়া গিয়াছিল যে, মন একটা ঘটনাকে ধরিয়া বেশীক্ষণ স্থির থাকিতে পারিতেছিল না—আলোর ধাঁধায় দিগ্-ভ্রান্ত চামচিকার মত এ-দেয়াল হইতে ও-দেয়ালে আছাড় খাইয়া ফিরিতেছিল। আলো-চনার ধারাও তাই বিচিত্র রকমের স্বৈরাচারী হইয়া উঠিয়াছিল।

চুনী বলিল, 'অমূল্য আজ এক কুকুরের প্রাণ রক্ষা করেছে!'

অমূল্য যে কুকুরগতপ্রাণ, একথা আমরা সকলেই জানিতাম; তাই ব্যাপারটা জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলাম। চুনী বলিল, 'সবেমাত্র ভূমিকম্প থেমেছে—আমি ছুটেছি স্কুলের দিকে, ছেলেটার কি হল দেখবার জন্যে। বড়বাজারের চৌমাথার ওপর এসে দেখি, অমূল্য একটা প্রকাণ্ড লোহার বীম নিয়ে টানাটানি করছে। কিন্তু বীম নড়বে কেন? একে তো সেটা নিজেই বিশ মণ ভারী, তার ওপর আবার পঞ্চাশ টন ডেব্রি পড়েছে তার ঘাড়ে। আমাকে দেখে অমূল্য উন্মাদের মত হাত নেড়ে ডাক্‌লে; তার মুখের ভাব দেখে মনে হল হয়তো বা একটা মানুষ বীমের নীচে চাপা পড়েছে। নিজের ছেলের সন্ধান ছেড়ে ছুটে গেলুম। গিয়ে দেখি, বীমের এক প্রান্তে একটা কুকুর পিছু ফিরে বসে আছে আর তারস্বরে চেঁচাচ্ছে! জিজ্ঞাসা করলুম, 'এ কি!' অমূল্য কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে, 'ভাই, ওর ল্যাজ চেপে গেছে, কিছুতে ছাড়াতে পারছি না।'

'কি রকম রাগ হয় বল তো? রেগে চলে যাচ্ছিলুম, অমূল্য হাত চেপে ধরলে। কি করি—ভয়ও হল। পরের সন্তানকে বিপদে ফেলে নিজের সন্তান খুঁজতে যাচ্ছি, হয়তো ভগবান দাগা দেবেন। দু'জনে মিলে বীম ধরে ঠেলাঠেলি আরম্ভ করলুম। কিন্তু বৃথা চেষ্টা, বীম একচুলও নড়ল না। অমূল্য কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'কি করি ভাই!'

'তখন আমার মাথায় এক বুদ্ধি গজালো। জিজ্ঞাসা করলুম, 'ছুরি আছে?' অমূল্য পকেট থেকে ছুরি বার করলে। আমি বললুম, 'আব দেরি নয়, ওর ল্যাজ কেটে ফ্যালো।' অমূল্য বুঝলে ও ছাড়া গতি নেই, দ্বিরুক্তি না করে ল্যাজ কেটে ফেল্‌লে।

'কুকুরটা ছাড়া পেযে মারলে টেনে দৌড়। একবার পিছু ফি র তাকালে না; অমূল্যকে একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দিল না। এই তো কুকুরের কৃতজ্ঞতা!'

অমূল্য গল্পের মধ্যে দু'একবার বাধা দিবাব চেষ্টা করিয়াছিল, এখন লজ্জিতমুখে বলিল, 'চুনীটা ভারী মিথ্যাবাদী। আমি কেঁদেছিলুম?'

'কাঁদিস নি?'

শচীন বলিল, 'ল্যাজ কাটাব কথায় মনে পড়ল। আমি একটি পতিতা নারীকে উদ্ধাব করেছি। তবে সম্পূর্ণ নয়।'

'কি রকম?'

'বাজারের ও-অঞ্চল একটি বাড়িও খাড়া নেই দেখেছ বোধ হয়। কেবল ইটের পাহাড়। তারই ওপর ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ দেখলুম—একটা পা গোছ-পর্যন্ত বেরিয়ে আছে। চুট্‌কি পবা স্ত্রীলোকেব পা। হাঁকাহাঁকি করে দু'চারজন লোক জড় করলুম, তারপর সবাই মিলে ইট কাঠ সরাতে লাগলুম। মনে হল, পা যখন বেরিয়ে আছে তখন হয়তো মরেনি। অনেক কষ্টে ধড়টা বার করা গেল—ধড়টা বেশ অক্ষত! তারপর গলার কাছে পেঁৗছে দেখি—আর কিছু নেই! মুণ্ডুটা সাফ্ ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে।—হাত দশেক দূরে মাথাটা পাওয়া গেল।'

কিযৎকাল চুপ করিয়া থাকিয়া শচীন আবার বলিল, 'আজ যে-সব দৃশ্য দেখেছি কখনো ভুলতে পারব বলে বোধ হয না। গণেশলালকে চেনো? বেহারী উকিল? সে কোর্টে ছিল, পাগলের মত ছুটতে ছুটতে এসে দেখলে, তার স্ত্রী বাড়ির সামনে রাস্তার ওপর মরে পড়ে আছে!—গণেশ এখনো স্ত্রীর মৃতদেহ কোলে করে রাস্তায় ওপর বসে আছে।'

একটু থামিয়া বলিল, 'কি ভাগ্য দেখ। মেয়েটি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল, কিন্তু রাস্তায় নামতেই আর একজনের বাড়ি তার মাথার ওপর ভেঙে পড়ল। নিজের বাড়ি থেকে না বেরুলে হয়তো মরত না।'

বরদা বলিল 'ওটা তোমার ভুল। মৃত্যু তাকে ডাক দিয়েছিল; যেখানেই থাকুক ম যেতে হত।'

চুনী বলিল, 'আমি তো এক সেকেন্ডের জন্যে বে'চে গেছি। ডেপ্রটির কোর্টে একটা কেস্ আরম্ভ করছিল্ম, হঠাৎ হাকিমটা এক লাফ মেরে আমার ঘাড়ের ওপর পড়ল। দ্'জনে জাপ্টাজাপ্টি করে নাচতে নাচতে ঘর থেকে যেই বেরিয়েছি অমনি ঘরের ছাদ ধ্বসে পড়ল।'

বরদা বলিল, 'পরমায়্ থাকতে কেউ মরতে পারে না, এই হচ্ছে চরম সত্য। নইলে আমি বে'চে আছি কি করে?'

অম্ল্য বলিল, 'খ্ব খাঁটি কথা। তুমি বে'চে আছ কি করে সেটা আমরা সকলেই জানতে চাই। তুমি তো দোতলার ঘরে খিল দিয়ে গৃহিণী সমভিব্যাহারে দিবানিদ্রা দিচ্ছিলে। তুমি বাঁচলে কি করে বল তো শ্নি?'

বরদা বলিল, 'সে কথা বললে তোমরা সবাই আমায় অবিশ্বাস করবে। একে তো আমার একটা বদনাম আছে—'

অম্ল্য বলিল, 'তোর গল্প যত আষাঢ়েই হোক আজ আমরা শ্নব। আজকের দিনে যদি তুই মিথ্যে গল্প বানিয়ে বলতে পারিস তাহলে ব্ঝব তোর মত পাপী নরকেও নেই।'

বরদা বলিল, 'ভাই, আমি কখনো মিথ্যে গল্প বলিনে। হয়তো একট্ আধট্ রঙ চড়িয়ে বলি, কিন্তু আজ আর তাও নয়।—নির্জলা সত্যি কথা বলব—সাক্ষী ভগবান।'

তারপর বরদা বলিতে আরম্ভ করিল, 'অম্ল্য ঠিক ধরেছে—দিবানিদ্রাই দিচ্ছিল্ম, গিন্নীও পাশে শ্রয়ে ঘ্মোচ্ছিলেন। হঠাৎ গিন্নীর ঠেলা খেয়ে ঘ্ম ভেঙে গেল, দেখি খাটখানা ঘরময় পিছলে বেড়াচ্ছে। ঘরটা দ্লছে, ঠিক যেন কেউ দ্'হাতে ধরে সেটাকে ঝাঁকানি দিচ্ছে। আর, এক হাজার জাঁতা একসঙ্গে ঘোরালে যে-রকম শব্দ হয় তেমনি একটা শব্দ মাটির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে।

'আমি খ্ব সাহসী লোক নই; অন্তত মৃত্যুকে ভয় করি না এমন কথা বললে মিথ্যে কথা বলা হবে। কিন্তু আশ্চর্য—আমার একট্ও ভয় হল না; ব্দ্ধিও ঘোলাটে হয়ে গেল না। বোধ হয় বিপদটা হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছিল বলেই ভয়-বস্তুটা মনের মধ্যে ঢোকবার অবসব পায়নি। বিদ্যুৎ চমকের মত আমার মাথায় খেলে গেল—আজ জীবন মরণের সমস্যা; হয় এস্পার নয় ওস্পার!

'আজ তোমাদের কাছে বলতে লজ্জা নেই, বিপদের গ্রুত্ব উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা মনে মনে স্থির করে নিয়েছিলাম—মরি তো একসঙ্গে মরব, কেউ কাউকে ছেড়ে দেব না। গিন্নীও আমার বাঁ হাতখানা এমনভাবে চেপে ধরেছিলেন যে ইহজন্মে সে হাত ছাড়ানো সম্ভব ছিল না।

'দ্'জনে একসঙ্গে খাট থেকে নামল্ম। তখন ছাদ থেকে টাইল ভেঙে পড়ছে, মেঝে এত দ্লছে যে দাঁড়িয়ে থাকা কঠিন। একটা আলমারি ঠিক পায়ের কাছে উপ্ড় হয়ে পড়ে চুরমার হয়ে গেল।

'দরজা খ্লে ঘর থেকে বের হল্ম। দোতলায় আর যারা ছিল তারা ভূমিকম্প হবার সঙ্গে সঙ্গে নীচে নেমে গিয়েছিল—আমরা যে ঘ্মোচ্ছি তা তারা জানত না। স্তরাং দোতলায় কেবল আমরা দ্'জনেই রয়ে গিয়েছিল্ম।

'ব্দ্ধিটা পরিষ্কার ছিল, আগেই বলেছি। তাই কি করতে হবে সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। ঘর থেকে বার হয়ে ঠিক বাঁ-হাতে নীচে নামবার সি'ড়ি। সি'ড়ি দিয়ে নেমে কোনোমতে একবার খোলা জায়গায় পে'ছ্তে পারলেই নিরাপদ।

'আমরা সি'ড়ি দিয়ে নামতে গেল্ম; এক ধাপ নেমেও ছিলাম—এমন সময় মনে হল কে যেন পিছন থেকে আমাদের টেনে ধরলে।

'গিন্নীর চাবি বাঁধা আঁচলটা মাটিতে লুটোচ্ছিল, দেখলাম চাবির গোছা দরজার ফাটে আটকে গেছে। মুহূর্তের জন্য মনে হল—আজ আর রক্ষা নেই, স্বয়ং যম পিছনে থেকে টেনে ধরেছে!

'কুকুরের ল্যাজ-কাটার উদাহরণটা তখন জানা ছিল না; তাছাড়া গিন্নী সে অবস্থাতেও বস্ত্র বর্জন করতে সম্মত হলেন না। ফিরে গেলাম। বাড়িখানা তখন কাঁপছে ঠিক ম্যালেরিয়া রুগীর মত, হাড় পাঁজরা তার খসে খসে পড়ছে। ভূমিকম্পের বেগ এত বেড়ে গেছে যে মনে হচ্ছে এখনি সব ওলট-পালট হয়ে যাবে—মহাপ্রলয়ের আর দেরি নেই।

'চাবিটা দরজা এবং চৌকাঠের ফাঁকে এমনভাবে আট্‌কে গিয়েছিল যে ছাড়ানো দুষ্কর—তার ওপর গিন্নী একটি হাত চেপে ধরে আছেন। মাথার ওপর এক চাপ্‌ড়া প্ল্যাস্টার খসে পড়ল, তবু আঁচল ধরে টানাটানি করতে লাগলুম। তারপরেই দোরের খিলেন ভেঙে হাতের ওপর পড়ল। হাতটা ভাগ্যক্রমে ভাঙ্‌ল না, কেবল থেঁতলে গেল। তখন আঁচল ধরে প্রাণপণে মারলুম এক টান! আঁচলের খুঁট ছিঁড়ে গেল। চাবিটা দরজার ফাঁকেই আট্‌কে রইল।

'আবার ছুটে গেলুম সিঁড়ি দিয়ে নামবার জন্য। কিন্তু নামা হল না। ঠিক সিঁড়িতে পা দিয়েছি এমন সময় সেই হাজার জাঁতা ঘুরানোর শব্দের ভেতর থেকে কে যেন প্রচণ্ড স্বরে বলে উঠল—'ওদিকে যাস্‌নি।'

এই পর্যন্ত বলিয়া বরদা থামিল, হাত দু'টা আগুনের দিকে প্রসারিত করিয়া দিল। দেখিলাম, তাহার রোমশ বাহুর উপর চুলগুলা কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে।

বরদা আবার আরম্ভ করিল, 'মতিভ্রম বলতে হয় বল, কিন্তু সে আজও এখনো আমার কানে বাজ্‌ছে। মেঘের মত আওয়াজ—ওদিকে যাস্‌নি! কে একথা বললে জানি না, তখন অনুসন্ধান করবারও সময় ছিল না—তবে এ হুকুম অমান্য করা যে উচিত হবে না, তা বুঝতে পারলুম।

'কিন্তু যাব কোন্‌দিকে? এখানে থাকলে তো মৃত্যু নিশ্চিত। চারিদিকে দেওয়াল-গুলো চোখের সামনে ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। ছাদটা ধ্বসে পড়ল বলে। সিঁড়ির ছাদ মুহুর্মুহুঃ হাঁ হয়ে আবার জোড়া লেগে যাচ্ছে।

'আমাদের দোতলার ঘরগুলোর মাঝখানে একটা ছোট চৌকশ খোলা ছাদ আছে—সেইদিকে গিন্নীকে টেনে নিয়ে চললুম। গিন্নীর হাঁটু তখন জবাব দিয়েছে, তাঁকে এক-রকম বগলে করে নিয়েই ছুটলুম। ভাবলুম, যদি বাঁচতে হয় তবে ঐ খোলা ছাদটাই একমাত্র ভরসা।

'খোলা জায়গায় এসে পেঁছুতে একটা বিরাট হাসির শব্দ কানে ঢুক্‌লো—এটা এত-ক্ষণ শুনিনি। ঠিক যেন একটা পাগলা দৈত্য হা হা করে হাসছে আর শহরময় দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। চেয়ে দেখলুম, আকাশ সুরকির লাল ধুলোয় ছেয়ে গেছে, আর তারই ভেতর দিয়ে বড় বড় বাড়িগুলো ঘাড় মুচ্‌কে ভেঙে ভেঙে পড়ছে।

'বলতে অনেক সময় লাগে, কিন্তু মাত্র আড়াই মিনিটের তো ব্যাপার। তখন বোধ হয় দেড় মিনিট কেটেছে। আমি ছাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি। গিন্নী আমার হাঁটু দুটো জড়িয়ে ধরে বসে পড়েছেন। চারিধারে এই প্রলয়ঙ্কর ব্যাপার চলেছে। এই সময় ভূমিকম্পের বেগ বেশ একটু কমে এল—মনে হল বুঝি থেমে আসছে। কিন্তু সে সেকেন্ড দশেকের জন্যে। তারপর যা আরম্ভ হল তার বর্ণনা বোধ হয় হোমার কিম্বা বাল্মীকিও দিতে পারতেন না।

'তুফানের মাঝখানে ডিঙ্গীর মত পৃথিবী দুলতে লাগল। এতক্ষণ চারিদিকের দৃশ্য ভাব দেখতে পাচ্ছিলুম, এখন একটা গাঢ় লাল ধোঁয়ায় সমস্ত ঢাকা পড়ে গেল।

কেবল চতুর্দিক থেকে সেই পৈশাচিক হাসি আর বাড়ি ঘর ভেঙে পড়ার হুড়মুড় শব্দ শুনতে লাগলুম।

'আমাদের বাড়িখানা আমার চারিপাশে ভেঙে ভেঙে পড়ছে বুঝতে পারলুম কিন্তু চোখে দেখতে পেলুম না। প্রতি মুহূর্তে প্রতীক্ষা করতে লাগলুম, এইবার ছাদ ফাঁক হয়ে আমাদের গ্রাস করে নেবে, নয়তো পাশের একটা দেয়াল মাথার ওপর ভেঙে পড়বে।

'মৃত্যুকে আজ তোমরা সকলেই মুখোমুখি দেখেছ, কিন্তু আমার মত সজ্ঞানে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে তার জন্যে প্রতীক্ষা বোধ হয় কেউ করনি। মৃত্যু-দেবতার করাল মুখের পানে আমি একদৃষ্টে চেয়ে দেখেছি কিন্তু তবু আমার চোখের পলক পড়েনি—আজ সর্বস্ব হারানোর দিনে এইটুকুই আমার লাভ।

'যাহোক, পৃথিবীতে সব জিনিসেরই যখন একটা শেষ আছে, তখন প্রাকৃতিক নিয়মে ভূমিকম্পও শেষ হতে বাধ্য। আড়াই মিনিটের প্রলয় মাতনের মত ভূমিকম্প থামল।

'ধুলোর অন্ধকার যখন একটু পরিষ্কার হল তখন দেখলুম বাড়ির চিহ্নমাত্র নেই—শুধু একটা থামের মাথায় একহাত চৌকশ জায়গার ওপর আমি আর আমার স্ত্রী দাঁড়িয়ে আছি—যেন স্তম্ভের মাথায় পাথরের দু'টি পুতুল! ব্যাপারটা বুঝেছ? সমস্ত বাড়ির মধ্যে কেবল ঐ থামটি দাঁড়িয়ে আছে, আর সব ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। আমরা যদি নীচে নামতুম তাহলে আর বেরুতে পারতুম না, জাঁতা-কলে ইঁদুরের মত চাপা পড়ে থাকতুম।'

বরদা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল; তারপর কতকটা নিজ মনে বলিল, 'কিন্তু কে সে—যে গর্জন করে আমাদের সাবধান করে দিলে? আমি শুধু তাই ভাবছি। আমাদের পরমায়ু ছিল তাই বেঁচে গেলুম একথা সত্যি। কিন্তু 'ওদিকে যাস্‌নি' বলে মানুষের গলায় হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল কে?*

২ ফাল্গুন ১৩৪০

আ ঙ টি

হীরার আঙটির হীরাটা যখন আল্‌গা হইয়া যায় তখন আর তাহা আঙুলে পরিয়া বেড়ানো নিরাপদ নয়। হীরা অলক্ষিতে পড়িয়া হারাইয়া যাইতে পারে। বিষয়ী, সাবধান।

ক্ষেত্রমোহনের আঙটির হীরা অনেকদিন আগেই হারাইয়া গিয়াছিল। শোকটা সে

* এই গল্পের অধিকাংশ ঘটনাই সত্য ও লেখকের প্রত্যক্ষীকৃত।

সহজেই কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছিল এবং ঝুটা পাথর দিয়া কাজ চালাইতেছিল। অপরিচিত কেহ হয়তো হঠাৎ দেখিয়া ভুল করিতে পারিত, কিন্তু অন্তরঙ্গদের মনে কোনো মোহ ছিল না।

ক্ষেত্রমোহন যে একজন ভদ্রবেশী মিষ্টভাষী জুয়াচোর তাহা তাহার স্ত্রী চপলা জানিত। চপলার বয়স বাইশ বছর। রূপ ও যৌবন দুই আছে—সন্তানাদি হয় নাই। তাহার রূপ-যৌবনের মধ্যে একটা তীব্র তেজস্বিতা ছিল—চোখ-ধাঁধানো উগ্র প্রগল্‌ভতা। বাইশ বছর বয়সে বাঙালী মেয়ের যৌবন সাধারণত থাকে না—যাহা থাকে তাহা পশ্চিম দিগন্তের অস্তরাগ। চপলার মধ্যে কিন্তু কোনো অভাবনীয় কারণে যৌবন টিকিয়া গিয়াছিল। তাহার মনের উপর যে নিগ্রহ হইয়াছিল, তাহারই ফলে হয়তো এমনটা ঘটিয়াছিল। মনের সহজাত বৃত্তি ও সংস্কারগুলি যখন নিপীড়িত হইয়া অন্তর্মুখী হয়—তখন তাহারা কোন্ পথে কি রূপ ধরিয়া দেখা দিবে, বলা দেবতারও অসাধ্য। ফ্রয়েড সাহেব এই অতল সমুদ্রে চাট্‌গেঁয়ে খালাসীর মত 'পুরণ' ফেলিতেছেন বটে—কিন্তু বাম্ মিলে না।

ক্ষেত্রমোহন লোকটা নিরম্বু বদ্‌মায়েস। মোসাহেবী করা ছিল তাহার পেশা। বড়-লোকের সদ্যবয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানদের অপ্সরালোকের দ্বার পর্যন্ত পেঁছাইয়া দেওয়া ছিল তাহার জীবিকা। কিন্তু সে নিজের স্ত্রীকে ভালবাসিত। বেহুঁশ মাতালের পকেট হইতে মনি-ব্যাগ চুরি করিতে তাহার বাধিত না। কিন্তু সে নিজে মদ খাইত না। এবং অন্য মকার সম্বন্ধেও তাহার একটা স্বাভাবিক নিস্পৃহতা ছিল। অপ্সরালোকের দ্বার পর্যন্ত গিয়া সে ফিরিয়া আসিত।

শঙ্করাচার্য সত্যই বলিয়াছেন—এ সংসার অতীব বিচিত্র!

চপলা যখন প্রথম স্বামীর চরিত্র জানিতে পারে তখন ভীত বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। তারপর কিছুদিন কান্নাকাটির পালা চলিল। ক্ষেত্রমোহন সস্নেহে যত্ন করিয়া চপলাকে নিজের চার্বাক নীতি বুঝাইয়া দিল। অতঃপর ক্রমে ক্রমে চপলা উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার মনে আর মোহ ছিল না।

ট্রাম-ঘর্ঘরিত সদর রাস্তার উপর একটি সরু বাড়ির দোতলায় গোটা দুই ঘর লইয়া ক্ষেত্রর বাসা। শয়নঘরের একটা জানালা সদর রাস্তার উপরেই। সেখানে দাঁড়াইলে পথের দৃশ্য দেখিবার কোনো অসুবিধা নাই।

সেদিন বৈকালে চপলা সেই জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রাস্তার দিকে তাকাইয়া ছিল, এমন সময় সিঁড়িতে জুতার শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিল। উৎফুল্লমুখে ক্ষেত্রমোহন ঘরে ঢুকিল।

ক্ষেত্রর বয়স ত্রিশ—সুশ্রী চট্‌পটে বাক্‌পটু। সে হাসিতে হাসিতে চপলার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল, 'সব ঠিক করে ফেলেছি। আজ রাত্তিরেই—বুঝলে? গুদাম সাবাড়—মাল তস্রুপাত!'

চপলা তাহার মুখের পানে চাহিয়া হাসিল—জ্বলজ্বলে চোখ-ঝলসানো হাসি। তাহার দাঁতগুলি যেন একরাশ হীরা, আলোয় ঝকমক করিয়া উঠিল। ক্ষেত্রর এ হাসি অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, তবু সে লোভ সামলাইতে পারিল না, একটা চুম্বন করিয়া ফেলিল।

বুকে হাত দিয়া তাহাকে একটু ঠেলিয়া দিয়া চপলা বলিল, 'কি হল?'

চপলার কাছে ক্ষেত্রর কোনো কথাই গোপন ছিল না। বরং কেমন করিয়া কাহার নিকট হইতে টাকা ঠকাইয়া লইল, কাহাকে মাতাল করিয়া পকেট-বুক হইতে নোট চুরি করিল—এসব কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চপলার কাছে গল্প করিতে সে ভালবাসিত, বেশ

একটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করিত। এখন সে জানালার গরাদ ধরিয়া সোৎসাহে বলিতে আরম্ভ করিল, 'তোমাকে অ্যাদ্দিন বলি নি। এক নতুন কাপ্তেন পাক্‌ড়েছি; বেশ শাঁসালো জমিদারের ছেলে—কলকাতায় ফূর্তি করতে এসেছে। নরেন চৌধুরী নাম। ফড়েপুকুরে একটা বাসা ভাড়া নিয়ে একলা আছে। তাকে মাসখানেক ধরে খেলাচ্ছি।

'ছোঁড়ার বয়স বেশী নয়—তেইশ-চব্বিশ। কিন্তু হলে কি হবে, এরই মধ্যে অনেক বুড়ো ওস্তাদের কান কেটে নিতে পারে। একেবারে একটি হর্তেল ঘুঘু। এই দেখ না, একমাস ধরে তেল দিচ্ছি এখনো একটি সিকি পয়সা বার করতে পারি নি। শালা মদ কিনবে তাও আমার হাতে টাকা দেবে না; নিজে গিয়ে বোতল কিনে আনবে, নয়তো দারোয়ান ব্যাটাকে পাঠাবে। তার থেকে দু'পয়সা বাঁচাব, সে গুড়ে বালি। পাঁড় মাতাল—কিন্তু মদের গেলাস ছোঁবার আগে কি করে জান? টাকাকড়ি, মায় হাতের আঙটি পর্যন্ত দেরাজে বন্ধ করে চাবিটি ঐ শালা দারোয়ানের হাতে দিয়ে বলে—যাও, মৌজ কর! এই বলে তাকে একেবারে বাড়ির বার করে দেয়। তারপর আমার দিকে চেয়ে মুচকে মুচকে হাসতে থাকে—চণ্ডাল ব্যাটাচ্ছেলে।'

চপলা মন দিয়া শুনিতেছিল, এই আকস্মিক উত্তাপে সকৌতুকে হাসিয়া ফেলিল; বলিল, 'তবে যে বললে সব ঠিক করে ফেলেছি?'

ক্ষেত্র মুখের একটা বিরক্তিসূচক ভঙ্গী করিয়া বলিল, 'দেখলুম ও শালা পগেয়া বদমায়েসকে সহজে ঘাল করা যাবে না—একেবারে ঘাড় মটকাতে হবে। আমারও রোখ চড়ে গেছে—আজ রাত্রে ঠিক করেছি ব্যাটার দেরাজ ফাঁক করব। এই দেখ, চাবি তৈরি করিয়েছি।' বলিয়া পকেট হইতে কয়েকটা চক্‌চকে চাবি বাহির করিয়া দেখাইল।

'চুরি করবে?'

'হ্যাঁ। ঢের খোশামোদ করেছি, আর নয়; এবার একহাত ভানুমতীর খেলা দেখিয়ে দেব। টাকাকড়ি ব্যাটা দেরাজে বেশী রাখে না—কোথায় রাখে ভগবান জানেন; কিন্তু একটা হীরের আঙটি আছে, রাত্রে বেরুবার সময় সেটা দেরাজে বন্ধ করে রেখে যায়। সেইটের ওপর টাঁক করেছি। উঃ! কী হীরেটা মাইরি; চপলা, যদি দেখো চোখ ঝলসে যাবে। দাম হাজার টাকার এক কাণাকড়ি কম নয়। যদি পাঁচশো টাকাতেও ছাড়ি, কেষ্ট স্যাকরা লুফে নেবে।'

'কিন্তু যদি ধরা পড়?'

'সে ভয় নেই। বন্দোবস্ত সব পাকা করে রেখেছি। আজ এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে ব্যাটা বেরুবে—সমস্ত রাত বাড়ি ফিরবে না—' বিমনা ভাবে ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিল, 'কোথায় যাবে কিছুতেই বললে না; হয়তো নটরাজ থিয়েটারের সৌদামিনীর কাছে—কিন্তু সৌদামিনী তো মেনা মিত্তিরের—; যাক গে, যে চুলোয় খুশী যাক। আসল কথা, এগারোটার পর ব্যাটা বাড়ি থাকবে না। দারোয়ানটাও বেরুবে—তার ব্যবস্থা করেছি। ব্যাস, গলির মোড়ে ওৎ পেতে থাকব, কর্তারাও বাড়ি থেকে বেরুবেন আর আমিও সুট্ করে গিয়ে ঢুকব। তারপরেই গুদাম সাবাড়—মাল তস্রুপাত। শালা লুট লিয়া—শালা লুট লিয়া—' রাস্তার দিকে তাকাইয়া ক্ষেত্র উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

কিন্তু পরক্ষণেই বিড়ালের মত লাফ দিয়া জানালার সম্মুখ হইতে সরিয়া আসিয়া চাপা গলায় বলিল, 'সরে এস—সরে এস, ওপাশের ফুটপাথ দিয়ে যাচ্ছে!'

চপলা সরিল না, বলিল, 'কে?'

'নরেন চৌধুরী—সরে এস।'

'কি দরকার? আমাকে তো আর চেনে না।'

'তা বটে!' তারপর ঘরের ভিতরের অন্ধকার হইতে উঁকি মারিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে

বলিল, 'ঐ দেখতে পাচ্ছ, ফর্সা মত চেহারা, গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি, হাতে হরিণের শিঙের ছড়ি? উনিই নরেন্দ্র চৌধুরী। হাতের আঙটিটা দেখতে পাচ্ছ?'

'পাচ্ছি।' চপলা বাহিরের দিকে তাকাইয়া হাসিল; পড়ন্ত দিনের আলো তাহার মুখের উপর পড়িয়াছিল, মনে হইল যেন একরাশ হীরা ঝরিয়া পড়িল—'হীরেটার দাম কত বললে?'

'হাজার টাকা।' ক্ষেত্র বিছানার উপর গিয়া বসিল—'বেশীও হতে পারে। এবার তোমার ঝুম্‌কো গড়িয়ে দেবই, বুঝেছ? ঐ কেষ্ট স্যাকরাকে দিয়েই গড়িয়ে দেব—সস্তায় হবে। অনেকদিন থেকে তোমায় বলে রেখেছি—'

রাস্তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই চপলা বলিল, 'হুঁ।'

ক্ষেত্র জিজ্ঞাসা করিল, 'চলে গেছে, না এখনো আছে?'

চপলার ঠোঁটের উপর দিয়া একটা ক্ষণিক হাসি খেলিয়া গেল, ক্ষেত্র তাহা দেখিতে পাইল না। চপলা বলিল, 'মোড় পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে আসছে।'

'ফিরে আসছে?' ক্ষেত্রর কপালে উৎকণ্ঠার ভ্রূকুটি দেখা গেল। 'তাই তো, আমার বাসার সন্ধান পেয়েছে নাকি? ব্যাটা যে রকম কুচুটে শয়তান! তুমি সরে এস। কে জানে—'

চপলা জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া রহিল, খানিক পরে সরিয়া আসিয়া বলিল, 'চলে গেছে।'

'যাক, তাহলে বোধহয় এমনি ঘুরে বেড়াচ্ছিল।' বলিয়া ক্ষেত্র একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

চপলা যেন অন্যমনস্কভাবে ক্ষেত্রর মুখের পানে তাকাইয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা, টাকার জন্যে মানুষ সব করতে পারে—না?'

ক্ষেত্র একগাল হাসিল—'পারে না! টাকার জন্যে পারে না এমন একটা মানুষ দেখাও তো দেখি। খুন জখম জাল ফেরেব্বাজি—দুনিয়াটা চলছে তো ঐ টাকার পেছনে। আর তাতে দোষই বা কি? টাকা না হলে কারুর একদণ্ড চলে? তবে আমি যে ব্যাটার ঘাড় ভাঙতে যাচ্ছি তার মধ্যে আমার অন্য স্বার্থও আছে। ব্যাটা আমাকে বড় হয়রান করেছে। যেমন করে হোক ওর ঐ আঙটি গাপ করবই।'

আলস্যভরে দুই হাত মাথার উপরে তুলিয়া চপলা গা ভাঙিল। তারপর বলিল, 'যাই, চুল বাঁধি গে।'

রাত্রি সাড়ে দশটার সময় ক্ষেত্র গলির মোড়ে আড্ডা গাড়িল। ঠিক সম্মুখ দিয়া ফড়েপুকুরের রাস্তা পূর্ব-পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে, গলির মুখ যেখানে গিয়া তাহার সহিত মিশিয়াছে সেখানে একটা কাঠের আড়ত আছে—সেই আড়তের গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইলে সহজেই পথচারীর দৃষ্টি এড়ানো যায়। রাস্তার গ্যাস কাছাকাছি নাই।

এখান হইতে নরেন চৌধুরীর বাসার সদর বেশ দেখা যায়—বড় জোর বিশ গজ। রাস্তার উপরেই দরজা। দরজা খুলিলে ভিতরে একটা ছোট গলি, গলির দুই ধারে দুইটি ঘর, রাস্তার উপরেই। বাহিরের দিকে জানালা আছে।

ক্ষেত্র দেখিল, পাশের একটা ঘরে আলো জ্বলিতেছে। এইটাই আসল ঘর। ঘরে একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল আছে, সেই টেবিলের ডান দিকের দেরাজে—

ক্ষেত্র পকেটে হাত দিয়া দেখিল, চাবি ঠিক আছে। সে মনে মনে হিসাব করিল—কাজ শেষ করিয়া বাহির হইয়া আসিতে মিনিট দশেকের বেশী সময় লাগিবে না। তাহার হাত

নিশপিশ করিতে লাগিল, একটা স্নায়বিক অধীরতা তাহার শরীরকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। লোকটা কতক্ষণে বাড়ির বাহির হইবে?

ক্ষেত্র বিড়ি ও দেশলাই বাহির করিল। বিড়িতে ফুঁ দিয়া ঠোঁটে ধরিয়া দেশলাই জ্বালিতে গিয়া সে থামিয়া গেল। না, কাজ নাই। গলিতে লোকজনের যাতায়াত বন্ধ হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু গলির দুইধারে বাড়ি। কে জানে, যদি কেহ দেশলায়ের আলো দেখিতে পায়। ধূমপানের সরঞ্জাম ক্ষেত্র আবার পকেটে রাখিয়া দিল।

হাতে ঘড়ি ছিল, চোখের খুব কাছে আনিয়া দেখিল, এগারোটা বাজিতে পাঁচ মিনিট। সময় হইয়া আসিতেছে।

এমন সময় নরেন চৌধুরীব ঘরে বৈদ্যুতিক আলো নিবিয়া গেল। ক্ষেত্র নিশ্বাস বন্ধ করিয়া একদৃষ্টে সদর-দরজার পানে তাকাইয়া রহিল। তারপর আস্তে আস্তে নিশ্বাস ত্যাগ করিল। এইবার!

সদর-দরজা খুলিয়া নরেন চৌধুরী বাহির হইয়া আসিল। ক্ষেত্র কাঠ-গোলার দেয়ালে একেবারে বিজ্ঞাপনের পোস্টারের মত সাঁটিয়া গেল। নরেন ফুটপাথে দাঁড়াইয়া সিগারেট ধরাইল। ক্ষেত্র সহস্রচক্ষু হইয়া দেখিল, তাহার হাতে আঙটি আছে কিনা। না, নাই। আবার সে ধীরে ধীরে চাপা নিশ্বাস ফেলিল। নরেন ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলিয়া গেল।

এইবার ক্ষেত্র অন্ধকারে দাঁত বাহির করিয়া হাসিল। নরেনের পরিপাটি সাজসজ্জা সে এক নজরে দেখিয়া লইয়াছিল। এইসব নিশাচর প্রজাপতিদের প্রতি তাহার মনে একটা অবজ্ঞাপূর্ণ ঘৃণার ভাব ছিল। সে মনে মনে বলিল, 'মাণিক অভিসারে বেরুলেন!' কোনো একজন স্ত্রীলোক ইহাকে দোহন করিয়া অন্তঃসারশূন্য করিয়া শেষে ছোবড়ার মত দূরে ফেলিয়া দিবে, ইহা ভাবিয়া সে মনে বড় তৃপ্তি পাইল। করুক, করুক, সোনার চাঁদকে একেবারে ন্যাঙটা করিয়া ছাড়িয়া দিক।

কিন্তু এদিকে দারোয়ানটা এখনো বাহির হইতেছে না কেন? খোট্টাটার আবার কি হইল? ভাঙ খাইয়া ঘুমাইয়া পড়ে নাই তো?

আরো খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ক্ষেত্র ঘড়ি দেখিল—সওয়া এগারোটা! তাই তো! কি হইল? দারোয়ান আগে বাহির হইয়া যায় নাই তো! না, তাহা হইলে নরেন দরজায় তালা লাগাইয়া যাইত। তবে—দারোয়ানটা কি সত্যই ঘুমাইয়া পড়িল? তাহাকে সরাইবার জন্য ক্ষেত্র এত মেহনৎ করিয়াছে—সারকুলার রোডে ময়দা-কলের বস্তিতে তাড়ির আড্ডার সন্ধান বলিয়া দিয়াছে, আর শেষে—

এই সময় খোট্টা দারোয়ান বাহির হইল। দরজায় তালা লাগাইয়া পাগড়ি বাঁধিতে বাঁধিতে নাগরা ঠকঠক করিয়া প্রস্থান করিল।

এইবার সময় উপস্থিত। দারোয়ানের নাগরার শব্দ মিলাইয়া যাইবার পর, ক্ষেত্র কাঠ-গোলার ছায়ান্ধকার হইতে বাহির হইয়া আসিল। পথ নির্জন—বাধা বিপত্তির কোনো ভয় নাই। কিন্তু দুই পা অগ্রসর হইয়া ক্ষেত্র আবার ফিরিয়া আসিল। কাজ নাই, আর একটু যাক। যদি দারোয়ানটা কিছু ভুলিয়া ফেলিয়া গিয়া থাকে, হয়তো আবার ফিরিয়া আসিবে।

দশ মিনিট কাটিয়া গেল, দারোয়ান ফিরিল না। তখন ক্ষেত্র অন্ধকার হইতে বাহির হইল। বেশ স্বাভাবিক দ্রুতপদে, যেন নিজের বাড়িতে যাইতেছে এমন ভাবে, দরজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া, বেশ শব্দ করিয়া দরজা খুলিল। তারপর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দরজা ভেজাইয়া দিল!

ক্ষেত্রর পকেটে একটা ছোট বৈদ্যুতিক টর্চ্চ ছিল, সেটা এবার সে জ্বালিল—একবার চারিদিকে ফিরাইয়া দেখিয়া লইল। তারপর বাঁ দিকের দরজার উপর ফেলিয়া

দরজায় তালা লাগানো। ক্ষেত্র আর একটা চাবি বাছিয়া লইয়া তালায় পরাইল, খুট করিয়া শব্দ হইল। তালা খুলিয়া গেল।

টর্চের আলো নিবাইয়া ক্ষেত্র ঘরে ঢুকিল। ঘরে কোথায় কি আছে সবই তাহার জানা ছিল; সে অন্ধকারে হাতড়াইয়া গিয়া রাস্তার দিকের জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল। তারপর ঘরের দিকে ফিরিয়া টর্চ জ্বালিল।

টর্চের আলো একটা টেবিলের উপর গিয়া পড়িল। টেবিলের উপর বিশেষ কিছু নাই—কাগজ-চাপা, ব্লটিং প্যাড, দোয়াত, কলম। টেবিলের আশেপাশে দুই-তিনটা চেয়ার অস্পষ্ট ভাবে দেখা গেল।

ক্ষেত্র আর কালক্ষয় না করিয়া কাজে লাগিয়া গেল। টেবিলের সম্মুখে চেয়ারে বসিয়া সে দেরাজ খুলিতে প্রবৃত্ত হইল। ডান ধারের দেরাজগুলো খোলা, কিন্তু বাঁ ধারের দেরাজের সম্মুখে একটা কবাট আছে—তাহার গায়ে চাবির ঘর। ক্ষেত্র সেই কবাটের গায়ে চাবি প্রবেশ করাইয়া সন্তর্পণে ঘুরাইল। কবাট খুলিয়া গেল।

চারিটি দেরাজ। নরেন উপরের দেরাজে আঙটি রাখে—ক্ষেত্র দেরাজের ভিতর আলো না ফেলিয়াই তাহার ভিতর হাত ঢুকাইয়া দিল। কাগজপত্র ও পানের ডিবা তাহার হাতে ঠেকিল—কিন্তু আঙটির পরিচিত ক্ষুদ্র কেসটি হাতে ঠেকিল না। তখন সে দেরাজের ভিতর আলো ফেলিয়া দেখিল—আঙটি নাই।

আঙটি নাই? কোথায় গেল? প্রথমটা ক্ষেত্র কিছু বুঝিতেই পারিল না। সে এতই স্থিরনিশ্চয় ছিল যে, এই অভাবনীয় ব্যাপারে যেন হতভম্ব হইয়া গেল। তারপর তাহার বুকের ভিতরটা দুরদুর করিয়া উঠিল।

তবে কি—?

সে সভয়ে একবার ঘরের চারিপাশে চাহিল, টর্চটা ঘরের কোণে কোণে ফেলিয়া দেখিল, না, কেহ নাই। সে ভয় করিয়াছিল, নরেন তাহাকে ধরিবার ফাঁদ পাতিয়াছে—তাহা নয়।

হয়তো আঙটিটা দ্বিতীয় দেরাজে আছে। মেঝেয় হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ক্ষেত্র দ্বিতীয় দেরাজ খুলিল। একেবারে শূন্য—তাহাতে একটা আল্‌পিন পর্যন্ত নাই।

তৃতীয় দেরাজ! সেটাও শূন্য। চতুর্থ দেরাজও তাই। ক্ষেত্রর কপালে ঘাম ফুটিয়া উঠিল। নাই—কিছু নাই। আঙটি তো দূরের কথা, একটা পয়সা পর্যন্ত নাই।

আলো নিবাইয়া অন্ধকার ঘরে ক্ষেত্র কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আবার তাহার বুক ধকধক করিতে লাগিল। নরেন নিশ্চয় সন্দেহ করিয়াছিল, তাই তাহাকে ঠকাইবার জন্য—

কিন্তু, না, নিশ্চয় আছে। হয়তো তাড়াতাড়িতে নরেন ডান দিকের খোলা দেরাজেই আঙটি রাখিয়া গিয়াছে। ক্ষেত্র আবার আলো জ্বালিয়া ডান দিকের দেরাজগুলো খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু কোনোটাতেই কিছু পাইল না। কতকগুলো মদের বিজ্ঞাপন, স্ত্রীলোকের ছবি, গোটাকয়েক অশ্লীল বিলাতী উপন্যাস—

এতক্ষণে ভূতের মত একটা ভয় ক্ষেত্রকে চাপিয়া ধরিল। তাহার মনে হইল, শূন্য বাড়িখানা তাহার চুরির ব্যর্থ প্রয়াস দেখিয়া নিঃশব্দে অট্টহাস্য করিতেছে। এই ঘরটা ক্রমশ সঙ্কুচিত হইয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। সে ধরা পড়িয়া গিয়াছে, আর পলাইতে পারিবে না।

এই সময় দূরের কোনো গির্জায় ঢং ঢং করিয়া বারোটা বাজিল। ঘড়ির আওয়াজ ক্ষেত্রর কানে বোমার আওয়াজের মত লাগিল। বারোটা! এতক্ষণ সে এখানে আছে! যদি কেহ আসিয়া পড়ে? নরেনই যদি ফিরিয়া আসে?

ক্ষেত্র আর দাঁড়াইল না। দেরাজগুলো খোলাই পড়িয়া রহিল, সে জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। তারপর বাড়ির বাহির হইয়া ভয়ার্ত চোখে একবার চারিদিকে তাকাইল। কাহাকেও দেখিতে পাইল না, পাড়া সুষুপ্ত। তখন স্খলিত হস্তে সদরের তালা বন্ধ করিয়া হনহন করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

তাহার বাসা যেদিকে, সে ঠিক তাহার উল্টা মুখে চলিয়াছে তাহা সে জানিতেই পারিল না।

একটার সময় ক্ষেত্র নিজের বাসার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এতক্ষণে তাহার মাথা বেশ ঠাণ্ডা হইয়াছে, ভয় আর নাই। এমন কি, অহেতুক ভয়ে দেরাজগুলো খোলা রাখিয়া পলাইয়া আসার জন্য সে একটু লজ্জা বোধ করিতেছে। কিন্তু বিস্ময় তাহার কিছুতেই ঘুচিতেছে না। নরেন কি তাহাকে সন্দেহ করিয়াছিল? তাহাই বা কি করিয়া সম্ভব—নরেন আঙটি পরিয়া বাহির হয় নাই, ইহা সে স্বচক্ষে ভাল করিয়া দেখিয়াছে। তবে আঙটিটা গেল কোথায়?

ক্ষেত্র নিজের সিঁড়ির দরজার কড়া নাড়িল। তাহার উপরে উঠিবার সিঁড়ি স্বতন্ত্র, নীচের তলার বাসিন্দার সহিত কোনো সংযোগ নাই। তাই, প্রতিবেশীকে না জাগাইয়া রাত্রে যখন ইচ্ছা সে বাড়ি ফিরিতে পারে।

কিছুক্ষণ পরে চপলা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। ক্ষেত্র কোনো কথা না বলিয়া উপরে উঠিয়া গেল। চপলা সিঁড়ির দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া শয়নঘরে ফিরিয়া আসিল, তারপর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

ক্ষেত্র জামা খুলিতে খুলিতে ভাবিতেছিল, চপলা জিজ্ঞাসা করিলে কি উত্তর দিবে! কিন্তু চপলা যখন কোনও প্রশ্ন করিল না, তখন সমস্ত কথা বলিবার জন্য তাহার নিজের মন উসখুস করিতে লাগিল। মুখে চোখে জল দিয়া, আলোটা কমাইয়া দিতে দিতে সে বলিল, 'আজ ভারি আশ্চর্য ব্যাপার হল! ঘুমুলে নাকি?' ব্যর্থতার কুণ্ঠায় তাহার স্বর নিস্তেজ।

চপলা উত্তর দিল না, কেবল গলার একটা শব্দ করিল মাত্র। ক্ষেত্র বিছানায় প্রবেশ করিয়া দেখিল, চপলা চিৎ হইয়া শুইয়া আছে, তাহার ডান হাতটা চোখের উপর রাখা। অল্প আলোয় চপলার মুখ ভাল দেখা গেল না।

'আঙটিটা পেলুম না—বুঝলে?'

চপলার নিকট হইতে কোনো সাড়া আসিল না। সে ঘুমাইয়াছে কি না দেখিবার জন্য ক্ষেত্র তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গেল—'জেগে আছ, না ঘুমুলে?'

চপলার চোখের উপর হাতটা একটু নড়িল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার আঙ্গুলের উপর আলো ঝিকমিক করিয়া উঠিল।

ক্ষেত্র সূচীবিদ্ধের মত বিছানায় উঠিয়া বসিল। চপলার হাতখানা টানিয়া নিজের চোখের সম্মুখে আনিয়া বিকৃত চাপা গলায় বলিয়া উঠিল, 'আঙটি!—এ আঙটি তুমি কোথায় পেলে!—তুমি কোথায় পেলে—'

২৬ কার্ত্তিক ১৩৪১

ভল্লু সর্দার

গোড়াতেই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে ভল্লুর বয়ঃক্রম ছয় বৎসর। তাহার কার্যকলাপ দেখিয়া এ বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে; কিন্তু সন্দেহ করিলে চলিবে না। আমরা তাহার ঠিকুজি কোষ্ঠীর সহিত পরিচিত।

ভল্লুর জীবনযাত্রা বোধ করি আরো কয়েক বৎসর অল্পস্বল্প দুষ্টামি করিয়া অপেক্ষাকৃত বৈচিত্র্যহীনভাবেই কাটিয়া যাইত; কিন্তু হঠাৎ একদিন বায়স্কোপ দেখিতে গিয়া সব ওলট-পালট হইয়া গেল। সে অপূর্ব কয়েকটি আইডিয়া লইয়া বায়স্কোপ হইতে ফিরিয়া আসিল।

প্রধান আইডিয়া, সে নিজে একজন দুর্দান্ত ডাকাতের সর্দার। যেমন তেমন সর্দার নয়,—একদিকে যেমন দুর্ধর্ষ বীর, অন্যদিকে তেমনি ন্যায়পরায়ণ—দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করাই তাহার ধর্ম। যদিচ, তাহার একজোড়া ভয়ঙ্কর গোঁফ নাই, এই এক অসুবিধা। কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে গেলে, গোঁফ ডাকাতের সর্দারের একটা অপরিহার্য অঙ্গ নয়। কারণ, দরোয়ান ছেদী সিং-এর গোঁফ তো আছেই, উপরন্তু গালপাট্টা আছে কিন্তু তবু তাহাকে কোনও দিন দুষ্টের দমন কিম্বা শিষ্টের পালন করিতে দেখা যায় নাই। আসল কথা, আচরণ ডাকাত সর্দারের মত হওয়া চাই, গোঁফ না থাকিলেও আসে যায় না।

কিন্তু সর্দার হইতে হইলে ডাকাতের দল চাই। বায়স্কোপে সর্দারের প্রকাণ্ড দল ছিল, তাহারা হুকুম পাইবামাত্র নানাবিধ অসমসাহসিক কাজ করিয়া ফেলিত, অত্যাচারী জমিদারের বাড়ি লুঠ করিয়া তাহাকে গাছের ডালে লটকাইয়া দিত। ভল্লুর সে রকম দল কোথায়? অনুগত অনুচরের মধ্যে তিন বছরের অনুজা লিলি, আর একটি নিংলে কুকুর-ছানা—গামা। অদূর ভবিষ্যতে এই কুকুর শাবকটি মহা শক্তিশালী হইয়া উঠিবে এই আশায় তাহার উক্তরূপ নামকরণ হইয়াছিল।

ইহারা দু'জনেই ভল্লুর একান্ত অনুগত বটে কিন্তু আদেশ পাইবামাত্র কোনও অসমসাহসিক কাজ করিবে কিনা তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। একবার একটা হুলো বিড়ালকে আক্রমণ করিবার জন্য ভল্লু গামাকে বহু প্রকারে উত্তেজিত করিয়াছিল কিন্তু গামা সম্মত হয় নাই, বরঞ্চ অত্যন্ত কাতরভাবে পুচ্ছ সঙ্কুচিত করিয়া বিপরীতমুখে প্রস্থান করিয়াছিল। আর লিলি—সে একে মেয়েমানুষ, তায় দৌড়িতে পারে না; দৌড়িতে গেলেই পড়িয়া যায়। তাহাকে দিয়া কোনও কাজ হইবে না।

কিন্তু এত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও ভল্লু ভগ্নোৎসাহ হইল না। অনুচর না থাকে, না থাক—সে নিঃসঙ্গভাবেই সর্দার বনিবে। যদি তার ডাক শুনিয়া কেহ না আসে সে একলা চলিবে। বায়স্কোপেও তো ডাকাত সর্দার একাকী দুর্গ-প্রাকার লঙ্ঘন করিয়া বন্দিনী তরুণীকে উদ্ধার করিয়াছিল।

সে যা হোক, কিন্তু সর্দার বনিয়া সে কোন্ কোন্ দুষ্টের দমন করিবে? কারণ, শিষ্টের পালন পরে করিলেও ক্ষতি নাই কিন্তু দুষ্টের দমন প্রথমেই করা দরকার।

তাহার মাস্টার-মহাশয়ের কথা মনে পড়িল। দুষ্ট লোক বলিতে যাহা-কিছু সব দোষই মাস্টার-মহাশয়ে বিদ্যমান। ভোর হইতে না হইতে তিনি আসিয়া হাজির হন। পাঠ্য পুস্তকের প্রতি ভল্লুর অনুরাগ কিছু কম, বিশেষতঃ অঙ্কশাস্ত্রে সে কাঁচা। তাই, পরবর্তী দু'ঘণ্টা ধরিয়া যে দারুণ অত্যাচার উৎপীড়ন চলিতে

থাকে তাহা বলাই বাহুল্য। এত বড় অত্যাচারীকে শাসন করা ডাকাত সর্দারের প্রথম কর্তব্য।

কিন্তু ভাবিয়া চিন্তিয়া ভল্লু মাস্টার-মহাশয়কে পরিত্যাগ করিল। তাঁহার চেহারা-খানা এতই নিরেট, দেহের দৈর্ঘ্য-প্রস্থও এত বিপুল যে টিনের তরবারি দিয়া তাঁহার মুণ্ড কাটিয়া লওয়া একেবারেই অসম্ভব। তাঁহাকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া গাছের ডালে ফাঁসি দেওয়াও ভল্লুর সাধ্যাতীত। দুঃখিতভাবে ভল্লু তাঁহাকে অব্যাহতি দিল।

আর শাস্তিযোগ্য কে আছে? ছেদী সিং দরোয়ান? ভল্লু মনে মনে মাথা নাড়িল। ছেদী সিং-এর চেহারাটা দুশমনের মত বটে; কিন্তু কেবলমাত্র চেহারা দেখিয়া তাহার বিচার করিলে অন্যায় হইবে। সে প্রায়ই পেয়ারা, কুল, কামরাঙা আহরণ করিয়া আনিয়া চুপি চুপি ভল্লুকে খাওয়ায়; মাঝে মাঝে কাঁধে চড়াইয়া বেড়াইতে লইয়া যায়। অধিকন্তু সন্ধ্যার সময় কোলের কাছে বসাইয়া অতি অদ্ভুত রোমাঞ্চকর কাহিনী-কেচ্ছা বলে—শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া যাইতে হয়। না—ছেদী সিং দরোয়ানকে পাপিষ্ঠ দুষ্কৃতকারীর পর্যায়ে ফেলা যায় না।

তবে—আর কে আছে? বাবা? ভল্লু অনেকক্ষণ গালে হাত দিয়া চিন্তা করিল। অভাবপক্ষে বাবাকে পাপিষ্ঠ বলিয়া ধরা যাইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বাবা লোকটি নেহাত মন্দ নয়। মার-ধর তিনি একেবারেই করেন না, নিজের লেখাপড়া লইয়াই সর্বদা ব্যাপৃত থাকেন, (যদিও, অত লেখাপড়া করা পাপিষ্ঠের লক্ষণ কিনা তাহাও বিবেচনার বিষয়)। উপরন্তু, ভল্লুর মাতার সহিত তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব আছে বলিয়া মনে হয়। প্রায়ই তাঁহাদের মধ্যে হাস্য-পরিহাস ও অন্তরঙ্গের মত কথাবার্তা হইয়া থাকে—ভল্লু তাহা লক্ষ্য করিয়াছে। আবার মাঝে মাঝে উভয়ের মধ্যে ঝগড়াও হয়,—তখন ভল্লুর মা চোখে আঁচল দিয়া অস্পষ্ট ভগ্নস্বরে কি বলিতে থাকেন অধিকাংশ বোঝাই যায় না এবং বাবা মুখ ভারী করিয়া ধীরে ধীবে এমন দু' একটি বাক্যবাণ প্রয়োগ করেন যে, মায়েব কান্না আরও বাড়িয়া যায়। অতঃপর, ঝগড়া থামিয়া গেলে বাবা নিভৃতে মাকে অনেক আদর ও খোসামোদ করিতেছেন ইহাও ভল্লুর চক্ষু এড়ায় নাই।

এরূপ ক্ষেত্রে কি করা যায়? ভল্লু বড় দ্বিধায় পড়িল। বাবাকে অন্তরের সহিত বদ্-লোক বলা চলে না; অথচ তাঁহাকে বাদ দিলে আর শাস্তি দিবার লোক কোথায়? তবে কি কেবলমাত্র দুষ্ট-লোকের অভাবেই একজন ডাকাত সর্দারের জীবন ব্যর্থ হইয়া যাইবে? মুণ্ড কাটিয়া ফেলিবার মত লোকই যদি পৃথিবীতে না থাকে, তবে ডাকাত হইয়া লাভ কি?

শীতের দ্বিপ্রহরে চিলের কোঠায় একাকী বসিয়া ভল্লু এইরূপ গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল। এখন সে ধীরে ধীরে উঠিল। এই নৈষ্কর্মের অবস্থা তাহার ভাল লাগিল না। একটা কিছু করিতে হইবে। যদি একান্তই পাষণ্ড-লোক না পাওয়া যায়—

ভল্লু দ্বিতলে অবতরণ করিল। কেহ কোথাও নাই—বাড়ি নিস্তব্ধ। মা বোধ হয় লিলিকে ঘুম পাড়াইয়া নিজেও একটু শুইয়াছেন। ভল্লু মা'র ঘর অতিক্রম করিয়া চুপি চুপি কাকিমার ঘরে উঁকি মারিল। দেখিল, কাকিমা পালঙ্কের উপর বুকের তলায় বালিশ দিয়া শুইয়া করতলে চিবুক রাখিয়া উদাস-চক্ষে জানালার বাহিরে তাকাইয়া আছেন।

এই ঘরটি কাকিমার শয়নকক্ষ বটে, কিন্তু ব্যাপার গতিকে ভল্লুরও শয়নকক্ষ হইয়া পড়িয়াছিল। পূর্বে ভল্লু নিজের মা'র কাছে শয়ন করিত; এই ঘরটা ছিল কাকার। মাস দেড়েক পূর্বে কাকার বিবাহ হইল; তারপর কি একটা গণ্ডগোল হইয়া গেল,- কাকা নিজের ঘর ছাড়িয়া বাহিরের একটা ঘরে আশ্রয় লইলেন এবং নব-পরিণীতা কাকিমা তাঁহার ঘর দখল করিলেন। ভল্লু বোধ করি কাকিমার রক্ষক হিসাবেই তাঁহার শয্যায় শয়ন

করিতে লাগিল।

সুতরাং কাকিমার শয়নকক্ষটিকে ভল্লুর শয়নকক্ষ বলা যাইতে পারে। এই ঘরেই তাহার যাবতীয় খেলার উপকরণ ও অস্ত্র-শস্ত্র লুক্কায়িত ছিল। ডাকাত সর্দারের প্রধান আয়ুধ—একটি টিনের তরবারি—তাহাও এই ঘরে পালঙ্কের নীচে থাকিত। তরবারিটা বাড়িসুদ্ধ লোকের চক্ষুশূল; সকলেরই আশঙ্কা ভল্লু ঐ তরবারি দিয়া কখন কাহার চোখে খোঁচা দিবে। তাই, ভল্লু সেটাকে অতি সংগোপনে পালঙ্কের নীচে কম্বল চাপা দিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিল।

ভল্লু কিছুক্ষণ দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর নিঃশব্দে পা টিপিয়া প্রবেশ করিল। কাকিমার মাথার কাপড় খোলা, তাঁহার খোঁপায় সোনার শিকল বাঁধা কাঁটাগুলি ভল্লু দেখিতে পাইল। কিন্তু কাকিমার উদাস দৃষ্টি জানালার বাহিরে প্রসারিত; কি জানি কি ভাবিতেছেন। তিনি ভল্লুর আগমন জানিতে পারিলেন না।

সাবধানে ভল্লু পালঙ্কের তলায় প্রবেশ করিল; কিন্তু তরবারি কম্বলের ভিতর হইতে বাহির করিতে গিয়া ঠং করিয়া একটু শব্দ হইয়া গেল। কাকিমা চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'কে রে! ভল্লু বুঝি? খাটের তলায় কি করছিস্?'

ধরা পড়িয়া গিয়া ভল্লু বলিল, 'কিছু না'—তারপর তরবারি হস্তে খাটের তলা হইতে হামাগুড়ি দিয়া বাহির হইয়া আসিল।

ডাকাত সর্দারকে কাকিমার সম্মুখে হামাগুড়ি দিতে হইল বলিয়া ভল্লু মনে মনে একটু ক্ষুব্ধ হইল, কিন্তু বাহিরে গর্বিত গাম্ভীর্য অবলম্বন করিয়া বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গীতে দাঁড়াইল।

তারপরই সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। দেখিল, কাকিমার সুন্দর চোখ দুটিতে জল টল্ টল্ করিতেছে!

কাকিমা চট্ করিয়া আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, 'কি করছিলি!'

'কিছু না'—কাকিমার মুখের উপব সুবর্তুল চোখের দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিল, 'তুমি কাঁদছ কেন?'

কাকিমা লজ্জিতভাবে মুখখানাকে আর একবার আঁচল দিয়া মুছিয়া বলিলেন, 'কৈ কাঁদছি?—তুই সারা দুপুর রোদ্দুরে রোদ্দুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিস তো? আয়, আমার কাছে এসে শো।'

'না'—ভল্লুর কৌতূহল তখনও দূর হয় নাই, সে পুনরায় প্রশ্ন করিল, 'কাঁদছিলে কেন বল না। ক্ষিদে পেয়েছে বুঝি?'

স্ত্রীজাতি ক্ষুধার উদ্রেক হইলেই কাঁদে—ইহা সে লিলির উদাহরণ দেখিয়া অনুমান করিয়া লইয়াছিল।

'দূর!'

'তবে?'

'কিছু না।—তুই তলোয়ার নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস? আয় আমার কাছে।'

'না—আমি এখন যাচ্ছি একটা কাজ করতে।'—বলিয়া ভল্লু দ্বারের দিকে পা বাড়াইল।

কাকিমা তাহাকে ডাকিলেন, 'ভল্লু, শুনে যা একটা কথা।'

ভল্লু অনিশ্চিতভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইল—'কি?'

'কাছে আয়।'

সন্দিগ্ধভাবে কাকিমাকে নিরীক্ষণ করিল। তাহাকে ধরিয়া বিছানায় শোয়াইয়া

তাঁহার নাই তো?—নাঃ, কাকিমা ভাল লোক, তিনি এমন নির্দয়

ব্যবহার কখনই করিবেন না।

ভল্লু কাছে আসিয়া অধীরভাবে বলিল, 'কি?'

কাকিমার মুখ একটু লাল হইল; তিনি ভল্লুর হাত ধরিয়া তাহাকে খুব কাছে টানিয়া আনিলেন, তারপর প্রায় তাহার কানে কানে বলিলেন, 'তোর কাকা কোথায় রে?'

ভল্লু তাচ্ছিল্যভরে বলিল, 'জানি না। বোধ হয় নীচে আছেন।'

কাকিমা আরও নিম্নস্বরে বলিলেন, 'দেখে এসে আমায় বল্‌তে পারবি? কাউকে কিছু বলিস্‌নি, শুধু দেখে আসবি।'

'আচ্ছা' বলিয়া ভল্লু প্রস্থান করিল। এই সামান্য বিষয়ে এত গোপনীয় কি আছে সে বুঝিতে পারিল না।

নীচে নামিয়া ভল্লু বাহিরের দিকে চলিল। বাহিরের একটা ঘরে তক্তপোষের উপর ফরাস পাতা; তাহার উপর চিৎ হইয়া শুইয়া কাকা বৈরাগ্যপূর্ণ চক্ষে কড়িকাঠের দিকে তাকাইয়া আছেন। ভল্লু দু'একবার ঘরের সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিল কিন্তু কাকার ধ্যানভঙ্গ হইল না; তখন ভল্লু কাকিমাকে খবরটা দিয়া আসিবে ভাবিতেছে, এমন সময় তাহার কুকুর গামা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া লাফাইতে লাগিল এবং তরুণ অপরিণত কণ্ঠে ঘেউ ঘেউ করিয়া আনন্দ জ্ঞাপন করিতে লাগিল।

গামার বয়ঃক্রম তিনমাস, চেহারা অতিশয় কৃশ ও দুর্বল। সে যে কালক্রমে ভয়ঙ্কব তেজস্বী বিলাতি কুকুর হইয়া দাঁড়াইবে এ বিষয়ে কেবল ভল্লুর মনেই কোনও সংশয় ছিল না। গামার গলার একটি বগ্‌লস্‌ কিনিয়া দিবার জন্য সে বাড়ির সকলের কাছে জনে জনে মিনতি করিয়াছিল কিন্তু কেহই তাহার কথায় কর্ণপাত করে নাই।

চ'চামেচিতে কাকা বিরক্তিপূর্ণ চোখ কড়িকাঠ হইতে নামাইয়া ভল্লুর দিকে চাহিলেন। ভল্লু তাড়াতাড়ি গামাকে লইয়া সরিয়া গেল।

গামা দীর্ঘকাল পরে প্রভুর সাক্ষাৎ পাইয়াছে—তাহার ক্ষীণ শরীরে যেন আর আনন্দ ধরে না। সে একবার বাগানের দিকে ছুটিয়া যায়, আবার ফিরিয়া আসিয়া ভল্লুর পায়ের উপর থাবা রাখিয়া সাগ্রহে তাহার মুখের পানে তাকায়, তাহার মনের ভাবটা—চল না, বাগানে যাই। এমন দুপুর বেলা ঘরের মধ্যে বন্ধ থাকতে তোমার ভাল লাগছে? চল চল, বাগানে কেমন ছুটোছুটি করব!

ভল্লু একটু ইতস্ততঃ করিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গামার আমন্ত্রণ অবহেলা করিতে পারিল না। কাকিমাকে কাকার সংবাদ পরে দিলেও চলিবে—এত তাড়াতাড়িই বা কি! বিশেষতঃ কাকা তো কিছুই করিতেছেন না, কেবল চিৎ হইয়া শুইয়া আছেন। এ সংবাদ দু'ঘণ্টা পরে দিলেও কোনও ক্ষতি হইবে না। ভল্লু গামাকে লইয়া বাগানে চলিল।

বাড়ির সংলগ্ন বাগানটা বেশ বিস্তৃত। মাঝে মাঝে আম, লিচু, গোলাপজামের গাছ—বাকিটা ফুলের গাছে ভরা। বর্তমানে বিলাতি মরশুমি ফুলের শোভায় বাগান আলো হইয়া আছে। কোথাও একরাশ পপী উগ্র রূপের ছটায় মৌমাছিদের আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে। ওদিক সুইট্‌-পীর ঝাড় পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া সহস্র ফুলের প্রজাপতি ফুটাইয়া রাখিয়াছে। স্থানে স্থানে দু'একটা চন্দ্রমল্লিকা কোঁকড়া মাথা দুলাইয়া নিষ্কলঙ্ক শুভ্র হাসি হাসিতেছে।

কিন্তু উদ্যান-শোভার দিকে ভল্লুর দৃষ্টি নাই। তাহার হাতে তরবারি, পশ্চাতে ভক্ত অনুচর। সে খুঁজিতেছে অ্যাড্‌ভেঞ্চার। কিন্তু হায়, এই ফুলের মরুভূমিতে অ্যাড্‌ভেঞ্চার কোথায়? বিমর্ষভাবে ভল্লু কয়েকটা ডালিয়া ফুলের পাপড়ি ছিঁড়িয়া ছড়াইয়া দিল।

কিন্তু ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকিলে জগতে কোনো জিনিসই দুষ্প্রাপ্য হয় না, শত্রুও অচিরাৎ আসিয়া দেখা দেয়। অবশ্য কল্পনার জোর থাকা চাই। ভল্লু শত্রুর অন্বেষণে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ একটি চন্দ্রমল্লিকা গাছের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। গাঢ় লাল রঙের চন্দ্রমল্লিকা—একটি কঞ্চির ঠেক্‌নোতে ভর দিয়া সগর্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ভল্লু কল্পনার চক্ষে দেখিতে পাইল—এ চন্দ্রমল্লিকা নয়, মহাপাপিষ্ঠ জমিদার। ইহার অত্যাচারে বাগানের অন্য সমস্ত ফুল ভয়ে জড়সড় হইয়া আছে; উহার রক্তচক্ষুর সম্মুখে অদূরে ঐ ভূ-লুণ্ঠিতা পরটুলাক্কার ফুলটি বন্দিনী তরুণীর মত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছে।

উত্তেজনায় ভল্লুর চোখ জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতে লাগিল। সে পাঁয়তারা কষিয়া একবার শত্রুর চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিল, তারপর তরবারি আস্ফালন করিয়া কঠোর স্বরে কহিল, 'ওড়ে নড়াধম—'

উত্তেজিত হইলে ভল্লুর উচ্চারণ কিছু বিকৃত হইয়া পড়িত।

নরাধম কোনো জবাব দিল না, কেবল আরক্ত চক্ষে চাহিয়া রহিল। গামা উৎসাহিতভাবে বলিল, 'ভুক্‌ ভুক্‌—'

ভল্লু পদদাপ করিয়া বলিল, 'ওড়ে নড়াধম, তুই জানিস্‌ আমি কে? আমি ভল্লু সর্দার—তোর যম।'

এত বড় দুঃসংবাদেও নরাধম বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না। ভল্লু তখন গর্জন করিয়া বলিল, 'পাজি-উল্লুক-গাধা, এই তোর মুণ্ডু কেটে ফেললুম!' বলিয়া সবেগে তরবারি চালাইল।

দুর্বিনীত নরাধমের মুণ্ড কাটিয়া মাটিতে পড়িল।

'ভল্লু!'—'

হঠাৎ পিছন হইতে গুরু-গম্ভীর আহ্বান শুনিয়া ভল্লুর ক্ষাত্র-তেজের উত্তাপ এক মুহূর্তে নির্বাপিত হইল; সে সভয়ে ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিল—কাকা! কাকার বৈরাগ্যপূর্ণ ললাটে বৈশাখী মেঘের মত ভ্রূকুটি। তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিতেছেন।

গামা কাকার আগমনের সাড়া পাইয়া কাপুরুষের মত আগেই সরিয়াছে। উপায় থাকিলে ভল্লুও সরিত কিন্তু কাকা এত কাছে আসিয়া পড়িয়াছেন যে পলায়নের চেষ্টা বৃথা। কাল-বৈশাখীর ঝড়টা তাহার মাথার উপর দিয়াই যাইবে।

কাকা আসিয়া উপস্থিত হইলেন; ভল্লুর শ্রবণেন্দ্রিয় ধারণ করিয়া বলিলেন, 'এ কি করেছিস্‌?'

ভল্লু বাঙ্‌-নিষ্পত্তি করিল না। বাগানের ফুল ছেঁড়া বারণ একথা সে বরাবরই জানে এবং সাধ্যমত এ নিষেধ মান্য করিয়া আসিয়াছে। তবে যে আজ কোন্‌ দুরন্ত কর্তব্যের তাড়নায় ঐ ফুলটাকে বৃন্তচ্যুত করিয়াছে তাহা কাকাকে কি করিয়া বুঝাইবে? ফুলটা যে ফুল নয়—একটা মহাপাপিষ্ঠ নরাধম, এ কথা কাকা বুঝিবেন কি? সকলের কল্পনাশক্তি সমান নয়; ভল্লু জানিত কাকা বুঝিবেন না। অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং—তার চেয়ে নীরব থাকাই শ্রেয়ঃ। ভল্লু নীরব রহিল।

কাকা ভল্লুর হাত হইতে তরবারি কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'কেন ফুল ছিঁড়্‌লি?'

ভল্লু এবারও জবাব দিল না। কাকা তখন তাহার কান ছাড়িয়া চুলের মুঠি ধরিলেন, সজোরে নাড়া দিয়া বলিলেন, 'পাজি-উল্লুক-গাধা, কতবার তোকে মানা করেছি বাগানের ফুলে হাত দিস্‌নি। কেন ছিঁড়্‌লি বল্‌!'

বারবার একই প্রশ্নে ভল্লু উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিল। তার উপর চুলের যন্ত্রণা! কাকার

বজ্রমুষ্টি ক্রমে ক্রমে যেরূপ দৃঢ়তর হইতেছে, হয়তো শেষ পর্যন্ত চুলগুলি তাঁহার মুঠিতেই থাকিয়া যাইবে। অথচ ভাব-গতিক দেখিয়া মনে হইতেছে, একটা কোনও উত্তর না পাইলে কাকা শান্ত হইবেন না। যন্ত্রণা ও উগ্র প্রয়োজনের তাড়ায় ভল্লুর মাথায় এক বুদ্ধি গজাইল। সে সজল চক্ষে চিঁ চিঁ করিয়া বলিল, 'কাকিমার জন্যে ফুল তুলেছি।'

ইন্দ্রজালের মত কাজ হইল। সচকিতভাবে কাকা চুল ছাড়িয়া দিলেন, হতবুদ্ধির মত বলিলেন, 'কি বল্‌লি?'

এতটা ভল্লুও প্রত্যাশা করে নাই; কিন্তু যে পথে সুফল পাওয়া গিয়াছে সেই পথে চলাই ভাল। সে আবার বলিল, 'কাকিমার জন্যে ফুল তুলেছি'—বলিয়া ভূপাতিত ফুলটা সযত্নে তুলিয়া লইল; তারপর আবার আরম্ভ করিল, 'কাকিমা বললেন—'

'কি বললেন?'

খুল্লতাতের জেরায় পড়িবার ইচ্ছা ভল্লুর আদৌ ছিল না, বিশেষতঃ মোকাবিলায় মিথ্যা ধরা পড়িবার সম্ভাবনা যখন সম্পূর্ণ বিদ্যমান। বয়ঃপ্রাপ্ত লোকদের একটা মহৎ দোষ, তাহারা প্রত্যেকটি কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য না পাইলে চটিয়া যায়; কল্পনা বলিয়া যে ঐশী শক্তি মাথায় মধ্যে নিহিত আছে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে চায় না। ভল্লু কাকার প্রশ্নটা এড়াইয়া গিয়া বলিল, 'কাকিমা বড্ড ফুল ভালবাসেন; রোজ খোঁপায় তিন্‌টে পাঁচটা ফুল পরেন—'

খুল্লতাত অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আর বিলম্ব করা অনুচিত বুঝিয়া ভল্লু প্রস্থানোদ্যত হইল।

কাকা ডাকিলেন, 'ভল্লু—শোন্—'

ভল্লু খানিক দূর গিয়াছিল, সেখানে হইতে ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, 'আর, কাকিমা তোমায় ডাকছিলেন—তুমি কোথায় আছ দেখতে বললেন'—বলিয়া ক্ষুদ্র পদযুগল সবেগে চালিত করিয়া দিল।

বাগানের নৈর্ঋত কোণে একটি বড় আম গাছের নিম্নতম শাখায় ভল্লুর স্থায়ী আড্ডা ছিল। স্থূল শাখাটি ভূমির সমান্তরাল কাণ্ড হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল; তাহার ডগার দিকে বসিয়া দোল দিলে শাখাটি মন্দ মন্দ দুলিত।

এই শাখার ঘনপল্লবিত ডগায় বসিয়া একটা বড় রকম দোল দিয়া বিক্ষুব্ধচিত্ত ভল্লু ভাবিতে আরম্ভ করিল। গামা এতক্ষণ নিরুদ্দেশ ছিল; এখন, যেন কিছুই হয় নাই এমনিভাবে ল্যাজ নাড়িতে নাড়িতে গাছের তলায় আসিয়া বসিল। ভল্লু একবার ভর্ৎসনাপূর্ণ চক্ষু তাহার পানে তাকাইল। অনুচরের ভীরুতা তাহার মর্মে দারুণ আঘাত করিয়াছিল।

তারপর পুনরায় সে ভাবিতে আরম্ভ করিল।

প্রদীপের নীচেই অন্ধকার। দুষ্টের দমনব্রত গ্রহণ করিয়া ভল্লু চারিদিকে দুষ্ট অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে—অথচ দুষ্ট, অত্যাচারী, দুর্বৃত্ত বলিতে যাহা কিছু বুঝায় তাহার মূর্তিমান বিগ্রহ ভল্লুর সম্মুখেই হাজির রহিয়াছে। এতক্ষণ এটা সে দেখিতে পায় নাই কেন? তাহার মত মহাপাপিষ্ঠ নরাধম পৃথিবী খুঁজিয়া আর কোথায় পাওয়া যাইবে?

শুধু আজিকার এই ঘটনার জন্য নয়, কাকা যে একজন অবিমিশ্র পাষণ্ড ইহা তাহার অনেকদিন আগেই জানা উচিত ছিল। প্রথমতঃ তিনি ডাক্তার—ডাক্তারেরা যে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে বদ্-লোক একথা শিশু সমাজে কে না জানে? লিলি পর্যন্ত জানে। ভল্লুর

সামান্য একটু পেটের অসুখ হইতে না হইতে কাকা তাহার সমস্ত প্রিয় খাদ্য বন্ধ করিয়া এমন সব কটু, তিক্ত, কষায় ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করেন যে সে কথা স্মরণ করিলেই অন্ন-প্রাশনের অন্ন ঊর্ধ্বগামী হয়। তাহার উপর তিনি একজন কঠোর ব্রহ্মচারী, মাথায় একটি ক্ষুদ্র টিকি আছে। ভোর পাঁচটা বাজিতে না বাজিতে তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া স্নান করেন; তারপর ঠাকুর ঘরে ঢুকিয়া এমন ঘোর রবে কাঁসর-ঘণ্টা বাজাইতে আরম্ভ করেন যে পাড়ার ত্রিসীমানার মধ্যে আর কাহারও ঘুমাইবার উপায় থাকে না।

শুধু ইহাই নয়, নব-পরিণীতা কাকিমার সঙ্গে তাঁহার দুর্ব্যবহার স্মরণ করিলেও তাঁহার নৈতিক দুর্গতি সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। বিবাহের পূর্বে বাড়িসুদ্ধ লোকের সহিত কাকার কথা কাটাকাটি বকাবকি চলিয়াছিল একথা ভল্লুর বেশ মনে আছে। যা হোক, শেষ পর্যন্ত কাকা হাঁড়ির মত মুখ করিয়া বিবাহ করিতে গেলেন। কিন্তু বিবাহ করিয়া আসিয়া তিনি অন্দর মহলের সংস্রব একেবারে ত্যাগ করিয়াছেন। এই লইয়া বাড়িতে অশান্তির শেষ নাই; ভল্লুর মা'র সহিত কাকার প্রায়ই বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। কাকা বায়স্কোপের দুষ্ট জমিদারের মত তির্যক্ হাসি হাসিয়া বলেন, 'আমি তো আগেই বলে দিয়েছিলুম!'

অথচ কাকিমা অতিশয় ভাল লোক; এতদিন তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া ভল্লুর তাহা বুঝিতে বাকি নাই। লজঞ্চুস্ কিনিবার জন্য পয়সার প্রয়োজন হইলে তিনি চুপি চুপি তাহাকে পয়সা দেন; এমন কি, চোরাই মাল তাঁহার কাছে গচ্ছিত রাখিলে তিনি কাহাকেও বলিয়া দেন না। একবার কতকগুলি ডাঁশা কুল ও খানিকটা কাসুন্দি চুরি করিয়া ভল্লু কাকিমার জিম্মায় রাখিয়াছিল, তিনি সমস্ত কুল ও কাসুন্দি যথাসময়ে তাহাকে প্রত্যার্পণ করিয়াছিলেন, একটি কুল বা একবিন্দু কাসুন্দিও আত্মসাৎ করেন নাই। এরূপ গুণবতী নারী আজকালকার দিনে কোথায় পাওয়া যায়? অন্ততঃ ভল্লুর জানাশোনার মধ্যে এমন আর দ্বিতীয় নাই।

এহেন কাকিমাকে কাকা অবহেলা করেন। শুধু অবহেলা করিলে ক্ষতি ছিল না, পরন্তু তিনি কাকিমার উপর অন্যায় উৎপীড়ন করিয়া থাকেন তাহাও সহজে অনুমান করা যায়। পূর্বে দু'একবার কাকিমাকে বালিশে মুখ গুঁজিয়া ফুঁপাইতে শুনিয়া ভল্লুর ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে; আজ সে কাকিমার চক্ষে জল দেখিয়াছে। এসব কি মিছা-মিছি? ভল্লুর দৃঢ় ধারণা জন্মিল, কাকা সুবিধা পাইলেই আসিয়া কাকিমার কান মলিয়া চুল ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া যান। নচেৎ কাকিমা অকারণ কাঁদিবেন কেন?

যে-দিক দিয়াই দেখা যাক, কাকার মত দুর্নীতিপরায়ণ দমন-যোগ্য ব্যক্তি আর নাই।

কিন্তু দমন করিবার উপায় কি? দড়ি দিয়া বাঁধিয়া গাছে ঝুলাইয়া দেওয়া বা তরবারি দিয়া মুণ্ডচ্ছেদ সম্ভব নয়। সে-চেষ্টা করিতে গেলে ভল্লুর জীবনের সুখ-শান্তি চিরতরে নষ্ট হইয়া যাইবে। ক্রুদ্ধ কাকা হয়তো ভল্লুকে চিরজীবন ধরিয়া ভাত ডালের পরিবর্তে গাঁদালের ঝোল ও বোতলের সুতিক্ত ঔষধ খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। সুতরাং তাহাতে কাজ নাই।

ভল্লু দীর্ঘকাল বদনমণ্ডল কুঞ্চিত করিয়া চিন্তা করিল কিন্তু কাকাকে জব্দ করিবার কোনও সহজ পন্থাই আবিষ্কৃত হইল না। তখন সে শাখা হইতে নামিয়া চিন্তাকুলচিত্তে ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে চলিল। গামা এতক্ষণ বৃক্ষতলে লম্বমান হইয়া নিদ্রাসুখ উপ-ভোগ করিতেছিল, এখন উঠিয়া ডন্ ফেলার ভঙ্গীতে আলস্য ভাঙিয়া প্রভুর অনুগামী

চন্দ্রমল্লিকা ফুলটি এতক্ষণ ভল্লুর হাতেই ছিল, অন্যমনস্কভাবে সে তাহার গোটাকয়েক পাপড়ি ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল; তবু ফুলের সৌষ্ঠব একেবারে নষ্ট হয় নাই। বাড়িতে

পৌঁছিয়া ভল্লু কিছুক্ষণ বিরাগপূর্ণ নেত্রে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল, তারপর অনিচ্ছাভরে উপরে কাকিমার ঘরের উদ্দেশ্যে চলিল।

বাড়ি তখনো নিঃশব্দ—বিশ্রামকারীরা বিশ্রাম করিতেছে। কাকিমার দরজার নিকট পর্যন্ত পৌঁছিয়া ভল্লু থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। কাকার কণ্ঠস্বর! কাকা চাপা অথচ উদাস স্বরে কথা কহিতেছেন। ভল্লু দরজার বাহিরে দেয়ালের সঙ্গে একেবারে সাঁটিয়া গিয়া শুনিতে লাগিল। কাকা বলিতেছেন, 'সংসারে আমার রুচি নেই। আমি একলা থাকতে চাই—ছেলেবেলা থেকেই আমার প্রতিজ্ঞা স্ত্রীলোকের সংসর্গে আসব না। কারণ, দেখেছি যারা স্ত্রীর প্রলোভনে প'ড়ে সংসারে জড়িয়ে পড়েছে, তাদের দ্বারা আর কোনও বড় কাজ হয় না।'

কাকা নীরব হইলেন; কিছুক্ষণ পরে কাকিমার অশ্রুরুদ্ধ অস্পষ্ট কণ্ঠ শুনা গেল, 'তবে বিয়ে করেছিলে কেন?'

'দাদা আর বৌদি'র কথা এড়াতে পারলুম না, তাই বিয়ে করতে হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে এই শর্ত হয়েছিল যে, বিয়ে করেই আমি খালাস, তারপর আমার আর কোনও দায়িত্ব থাকবে না। কিন্তু এখন দেখছি, তাঁরা আমায় ঠকিয়েছেন, শর্তের কথা তাঁদের মনে নেই। কিন্তু সে যাক্। একটা কথা তোমায় বলে দিই, মনে রেখো—আমার কাছে তোমার কোনোদিন কিছুর প্রয়োজন হবে না, সুতরাং আমাকে ডাকাডাকি করে মিছে উত্যক্ত কোরো না।'

'আমি তো তোমাকে ডাকিনি—'

ভল্লু দেখিল তাহার স্থান-ত্যাগ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। সে ধীরে ধীরে অপসৃত হইয়া নীচে চলিল। তাহার সামান্য একটা কথার সূত্র ধরিয়া কাকা কাকিমাকে তিরস্কার করিতেছেন, এখনি হয়তো সাক্ষী দিবার জন্য তাহার তলব পড়িবে। কাকার মত দুর্জনের নিকট হইতে দূরে থাকাই নিরাপদ।

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে ভল্লু শুনিতে পাইল, তাহার মা নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়া কাকাকে উদ্দেশ্য করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল স্বরে বলিতেছেন, 'ওমা—একি! সন্নিসি ঠাকুর একেবারে বৌয়ের ঘরে ঢুকে পড়েছে যে—'

নীচে নামিয়া ভল্লু দেখিল বাড়ির ঝি বামা ভীষণ চেঁচামেচি শুরু করিয়া দিয়াছে ও একগাছা ঝাঁটা লইয়া গামাকে চারিদিকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। তাহার কথা হইতে ভল্লু বুঝিল যে, বামা ভাঁড়ার-ঘরের দাওয়ায় রৌদ্রে শুইয়া হাঁ করিয়া ঘুমাইতেছিল, গামা গিয়া সস্নেহে তাহার মুখ-গহ্বরের অভ্যন্তরে জিহ্বা প্রবিষ্ট করাইয়া তাহার আল্‌জিভ চাটিয়া লইয়াছে। বামা গামার উদ্দেশে যে-সব বিশেষণ নিক্ষেপ করিতেছে তাহা শুনিলে কুকুরেরও কর্ণেন্দ্রিয় লাল হইয়া উঠে।

ভল্লুও নিঃশব্দে গামাকে খুঁজিতে আরম্ভ করিল। বামার আল্‌জিভ চাটিয়া লওয়া যে গামার অন্যায় হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তবু সব দোষ কি গামার? বামা হাঁ করিয়া ঘুমায় কেন? আর, গামার গলায় একটা বগ্‌লস্ থাকিলে তো এমন ব্যাপার ঘটিতে পারিত না, গামাকে তখন স্বচ্ছন্দে বাঁধিয়া রাখা চলিত! দোষ গামার নয়,—দোষ বাড়ির লোকের। তাহারা একটা বগ্‌লস্ কিনিয়া দেয় নাই কেন?

খুঁজিতে খুঁজিতে বাহিরের ঘরে কাকার তক্তপোষের তলায় ভল্লু গামাকে আবিষ্কার করিল। গামা নিদ্রার ভান করিয়া এক চক্ষু ঈষৎ খুলিয়া মিটিমিটি চাহিতে-ছিল, ভল্লুকে দেখিয়া বাহির হইয়া আসিল।

ভল্লু গামার কান মলিয়া দিয়া চাপা তর্জনে বলিল, 'পাজি কোথাকার! বামার মুখ এঁটো করে দিয়েছিস্ কেন?'

গামা বিনীতভাবে ল্যাজ নাড়িয়া অপরাধ স্বীকার করিল।

ভল্লু বলিল, 'মজা দেখাচ্ছি দাঁড়াও, এবার থেকে তোমায় বেঁধে রাখব।'

গামা পুচ্ছ-স্পন্দনে কাতরতা জ্ঞাপন করিল।

ভল্লু কিন্তু শাসনে কঠোর। খানিকটা ছেঁড়া কাপড়ের পাড় সে অন্য প্রয়োজনে সংগ্রহ করিয়াছিল, এখন তাহা পকেট হইতে বাহির করিল। সেটা গামার গলায় বাঁধিতে যাইবে এমন সময় হঠাৎ কাকার শয্যার উপর বালিশের পাশে একটা জিনিস দেখিয়া তাহার চক্ষু পলকহীন হইয়া গেল। কাকার হাতঘড়িটা রহিয়াছে, ঘড়িতে চামড়ার বগ্‌লস্‌ সংলগ্ন। ব্যান্ডসুদ্ধ রিস্ট-ওয়াচ সে পূর্বে দেখে নাই এমন নয়, বহুবার দেখিয়াছে; কিন্তু এখন তাহার মুগ্ধ নেত্র ঐ জিনিসটার উপর নিশ্চল হইয়া রহিল।

এক-পা এক-পা করিয়া অগ্রসর হইয়া সন্তর্পণে ভল্লু সোনার ঘড়িটি হাতে তুলিয়া লইল; তারপর ঘড়ি হইতে বগ্‌লস্‌ পৃথক করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কৃতকার্য হইল না। তখন ভল্লু একবার দরজায় দিকে তাকাইয়া ঘড়িসুদ্ধ বগ্‌লস্‌ গামার গলায় পরাইয়া দিল। দিব্য মানাইয়াছে। ঘড়িটি গামার লোমে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে—দেখা যায় না। ভল্লু আগ্রহ-কম্পিত হস্তে কাপড়ের পাড় বগ্‌লসে বাঁধিয়া অনিচ্ছুক গামাকে টানিতে টানিতে বাহির হইয়া পড়িল।

কাকা তখনও ফিরেন নাই, বোধ হয় মা'র সহিত তর্ক করিতেছেন। এই অবসরে ভল্লু বাগান অতিক্রম করিয়া রাস্তায় গিয়া পড়িল।

ভল্লু যখন বেড়াইয়া বাড়ি ফিরিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ভ্রমণের ফলে বিলক্ষণ ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল; ভল্লু গামাকে একটি নিভৃত স্থানে বাঁধিয়া রাখিয়া বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিল।

বাড়িতে ঢুকিতেই মাংস রান্নার সুগন্ধ তাহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। সে সটান রান্নাঘরে গিয়া বলিল, 'মা, ক্ষিদে পেয়েছে।' বলিয়া একটা পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া গেল। মা মাংস ও রুটি তাহার সম্মুখে ধরিয়া দিলেন।

নিবিষ্ট মনে আহার করিতে করিতে ভল্লু শুনিতে পাইল, বাড়িতে একটা কিছু গণ্ডগোল চলিতেছে। সে উৎকর্ণ হইয়া শুনিল। কাকা চাকরদের ধমকাইতেছেন; একবার 'সোনার ঘড়ি' কথাটা শুনা গেল। ভল্লুর বুকের ভিতর ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল।

তারপরই বামা ঝি রান্নাঘরের দ্বারের কাছে আসিয়া উপু হইয়া বসিল, ভারী গলায় বলিল, 'এ ঐ দারোয়ান ড্যাক্‌রার কাজ, বলে দিলুম বউমা, দেখে নিও। ও ছাড়া এত বুকের পাটা আর কারুর নয়।—কি অনাছিষ্টি কাণ্ড মা, ছোট দাদাবাবুর বিছানার ওপর থেকে সোনার ঘড়ি চুরি! আমি তো বার-বাড়ি মাড়াইনে সবাই জানে। রান্নাঘর মুক্ত করে, বাসন মেজে, কাপড় কেচে, উঠান ঝাঁট দিতেই বেলা কেটে যায়—তা বাইরে যাব কখন? আর, এই এগারো বছর এ বাড়িতে আছি, একটা কুটো হারিয়েছে কেউ বলতে পারে না।—এ ঐ ঝ্যাঁটাখেগো দরোয়ানের কাজ; মিন্‌সের মরণ-পালক উঠেছে কিনা, তাই মালিকের সোনার ঘড়িতে হাত দিতে গেছে!'

দরোয়ানের সঙ্গে বামার চিরশত্রুতা।

মা রান্না করিতেছিলেন, বামার সাফাই শুনিতে পাইলেও উত্তর দিলেন না। ভল্লুরও মুখ দেখিয়া মনের অবস্থা বুঝা গেল না। কিন্তু তাহার গলায় মাংসের টুক্‌রা আটকাইয়া যাইতে লাগিল। সে অতিকষ্টে আরও কিছু খাদ্য গলাধঃকরণ করিয়া উঠিয়া পড়িল, পাতের ভুক্তাবশিষ্ট মাংস ও হাড় বাটিতে লইয়া ধীরে সুস্থে রান্নাঘর ত্যাগ করিল।

প্রত্যহ দুইবেলা নিজের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ সে স্বহস্তে গামাকে খাওয়াইত।

গামাকে খাওয়াইতে খাওয়াইতে ভল্লু শুনিল কাকার কণ্ঠস্বর ও মেজাজ উত্তরোত্তর চড়িতেছে, তিনি পুলিসে খবর দিবেন বলিয়া চাকরদের ভয় দেখাইতেছেন। বাবাও সেই সঙ্গে যোগ দিয়াছেন। চাকরেরা ভয়ে আড়ষ্ট ও নির্বাক হইয়া আছে। ব্যাপার অতিশয় গুরুতর হইয়াছে।

ভল্লু কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। গামার আহার শেষ হইলে সে তাহাকে লইয়া গুটি গুটি কাকার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। ওদিকের বারান্দায় চেঁচামেচি চলিতেছে, এদিকে কেহ নাই। ভল্লু এপাশ ওপাশ চাহিয়া কাকার ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। ঘরটি অন্ধকার; ভল্লু অন্ধকারে লুকাইয়া তাড়াতাড়ি গামার গলা হইতে ঘড়ি ও বগ্‌লস্ খুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু বগ্‌লস্ গামার গলায় আঁটিয়া গিয়াছে—বোধ করি গামা মাংস খাইয়া মোটা হইয়াছে। ভল্লু অনেক চেষ্টা করিয়াও বগল্‌স্ খুলিতে পারিল না, যতই তাড়াতাড়ি খুলিবার চেষ্টা করে, ততই হাত জড়াইয়া যায়। এদিকে সময় অতিশয় সংক্ষিপ্ত—এখনি হয়তো কেহ ঘরে আসিয়া ঢুকিবে।

ত্রস্ত ভল্লু কি করিবে ভাবিতেছে এমন সময় অতি সন্নিকটে কাকার গলা শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। সর্বনাশ! মুহূর্ত মধ্যে সে গামাকে তুলিয়া কাকার বিছানায় লেপের তলায় চাপা দিল, তারপর ঘরের সবচেয়ে অন্ধকার কোণে গিয়া দাঁড়াইল।

কিছুক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে কাটিয়া গেল। কাকা কিন্তু ঘরে প্রবেশ করিলেন না, বকিতে বকিতে অন্যদিকে চলিয়া গেলেন।

এইবার ভল্লুর সমস্ত সাহস হঠাৎ তাহাকে ত্যাগ করিল। তাহার যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। তস্করবৃত্তি আপাত-লোভনীয় বটে কিন্তু চিত্তের শান্তিবিধায়ক নয়। কাকার কণ্ঠস্বর দূরে চলিয়া গেলে ভল্লু ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। আর কোনোদিকে দৃকপাত না করিয়া একেবারে দ্বিতলে নিজের শয়নকক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল। কাকিমা ঘরে ছিলেন, তাহাকে জুতা-মোজা ও গরম জামা খুলিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আজ পড়তে বস্‌লি না ভল্লু, এখনি শুতে এলি যে?'

'বড্ড ঘুম পাচ্ছে' বলিয়া ভল্লু লেপের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।

ওদিকে গামাও নরম বিছানায় লেপের মধ্যে শয়নের ব্যবস্থা দেখিয়া নিঃশব্দে পরম পরিতৃপ্তির সহিত কুণ্ডলী পাকাইয়া নিদ্রার আয়োজন করিল।

ভল্লু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। প্রায় দুই তিন ঘণ্টা ঘুমাইবার পর হঠাৎ একটা বিরাট গর্জন শুনিয়া তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। কাকিমাও ইতিমধ্যে খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া তাহার পাশে আসিয়া শুইয়াছিলেন—তিনিও চমকিয়া উঠিলেন।

ঘরে আলো জ্বলিতেছিল; ভল্লু চোখ মেলিয়া দেখিল, কাকার রুদ্রমূর্তি ঠিক খাটের পাশেই দাঁড়াইয়া আছে—হাতে একটা মোটা লাঠি। ভল্লু প্রথমটা কিছু বুঝিতে পারিল না, তারপর তাহার সব কথা মনে পড়িয়া গেল।

কাকা দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিলেন, 'ভুলো, বেরিয়ে আর শিগ্‌গির লেপ থেকে—আজ তোকে—'

ভল্লুর মুণ্ড এতক্ষণ লেপের বাহিরে ছিল, এখন তাহা ভিতরে অদৃশ্য হইয়া গেল। সে কাকিমার বুকের কাছ ঘেঁষিয়া শুইল।

রাত্রি তখন মাত্র দশটা। ভল্লুর মা বাবা শয়ন করিতে গেলেও নিদ্রা যান নাই; তাঁহারা চেঁচামেচি শুনিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলেন। মা ঘরে ঢুকিয়া

জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হয়েছে ঠাকুরপো?'

'হয়েছে আমার মাথা! ভুলো, বেরিয়ে আয় বলছি—'

মা শঙ্কিত হইয়া বলিলেন, 'কি করেছে ভল্লু?'

কাকা ক্রোধে হস্তদ্বয় আস্ফালন করিয়া বলিলেন, 'কি করেছে? ওর ঐ হতভাগা কুকুরটাকে আমার বিছানায় শুইয়ে রেখেছিল; শুতে গিয়ে দেখি লক্ষ্মীছাড়া পেটরোগা কুকুর লেপ বিছানার সর্বনাশ করে রেখেছে। বমি করে সব ভাসিয়ে দিয়েছে।'

শুনিয়া ভল্লুর মাথার চুল পর্যন্ত কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সে কাকিমার বুকের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া একেবারে নিস্পন্দ হইয়া রহিল। কাকিমার শরীরটা এই সময় একবার সজোরে নড়িয়া উঠিল, যেন তিনি হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এ রকম ভয়ংকর ব্যাপারে হাসিবার কি আছে তাহা ভল্লু ভাবিয়া পাইল না। গুরুভোজনের ফলে গামা যে এমন বিদ্‌ঘুটে কাণ্ড করিয়া বসিবে তাহা ভল্লু দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করে নাই।

কাকা পূর্ববৎ বলিতে লাগিলেন, 'শুধু কি তাই! কুকুরটাকে ঘাড় ধরে তুলতে গিয়ে দেখি, তিনি আমার রিস্ট-ওয়াচ গলায় পরে বসে আছেন।'

ঘরের বাহিরে বাবা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; মা'র কলকণ্ঠ সেই সঙ্গে যোগ দিল। লেপের মধ্যে কাকিমার সর্ব শরীর চাপা হাসির আবেগে ফুলিয়া ফুলিয়া দুলিয়া দুলিয়া উঠিতে লাগিল।

কাকা বলিলেন, 'তোমাদের হাসি পাচ্ছে? ঐ ঘড়ির জন্যে চাকরগুলোকে শুধু মারতে বাকি রেখেছি। ভাগ্যে পুলিসে খবর দেওয়া হয়নি, নয় তো কেলেঙ্কারির একশেষ হত; পুলিস এসে দেখত কুকুরের গলায় ঘড়ি বাঁধা রয়েছে।—না, এ সব হাসির কথা নয়; ভুলোর বজ্জাতি বন্ধ করা দরকার।'

মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'তা বেশ তো, কাল সকালে ওকে শাসন কোরো।'

কাকা বলিলেন, 'না বৌদি, সে হবে না। তুমি ওকে এখনি লেপের ভেতর থেকে বার করে আনো।'

মা মুখে আঁচল দিলেন, তারপর বলিলেন, 'কেন, তুমিই আনো না।'

'না না,—তুমি ওকে বিছানা থেকে বার করে আনো—তারপর আমি—'

'কেন বল তো? বিছানা ছুঁলে কি তোমার জাত যাবে?'

'না না—মানে—। আচ্ছা বেশ, কাল সকালেই হবে—' দ্বারের দিকে এক পা বাড়াইয়া কাকা দাঁড়াইলেন—'কিন্তু আমার বিছানা! আমি আজ শোব কোথায়?'

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বিছানা কি একেবারে গেছে?'

'শুধু বিছানা! সে-ঘরে ঢোকে কার সাধ্য।'

মা হাসিভরা মুখ গম্ভীর করিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, 'তাই তো! বাড়িতে তো আর লেপও নেই। তাহলে তোমাকে এই ঘরেই শুতে হয়।'

কাকা বলিলেন, 'এত রাত্রে ঠাট্টা ভাল লাগে না বৌদি। একটা লেপ বার করে দাও, বৈঠকখানায় ফরাসের ওপরেই শুয়ে থাকব।'

'আর তো লেপ নেই।'

'নেই!'

'একখানা বাড়তি ছিল, সেটা তুমি গায়ে দিচ্ছিলে। আর কোথায় পাব?'

কাকা রাগিয়া বলিলেন, 'এ তোমার দুষ্টুমি—আসল কথা দেবে না। উঃ—এই মেয়েমানুষ জাতটা—। বেশ, র‍্যাপার গায়ে দিয়েই শোব।' বলিয়া তিনি প্রস্থানোদ্যত হইলেন।

মা তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন, 'ছি ঠাকুরপো, ছেলেমানুষী কোরো না,

আজ এই ঘরেই শোও। এই শীতে কেবল র‍্যাপার গায়ে দিয়ে শুলে অসুখে পড়বে যে।'

'তা হোক—হাত ছাড়।'

'লক্ষ্মী ভাই আমার, আজ রাতটা শোও—আমি ভল্লুকে আমার বিছানায় নিয়ে যাচ্ছি।'

'না।'

'তুমি সব বিষয়ে এত বুদ্ধিমান বিচক্ষণ, আর এই সামান্য বিষয়ে এত অবুঝ হচ্ছ! ধর্মে-কর্মে তোমার এত নিষ্ঠে, আর যাকে মন্ত্র পড়ে বিয়ে করেছ তাকে হেনস্থা করলে পাপ হয়, এটা বুঝতে পার না।'

'সে দোষ আমার নয়—তোমাদের। আমি বিয়ে করতে চাইনি।'

'বেশ, দোষ আমাদের, আমি ঘাট মানছি। কিন্তু বৌ তো কোনো দোষ করেনি।'

কাকা উত্তর দিলেন না, হাত ছাড়াইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

তিনি চলিয়া গেলে মা কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'মায়া, জেগে আছ নাকি?'

কাকিমাও একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, 'হ্যাঁ।'

মা কিছু বলিলেন না, আরও কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আবার একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

চারিদিক হইতে এই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলাফেলি দেখিয়া ভল্লুর খুল্লতাত-ভীতি অনেকটা কাটিয়া গেল। সে লেপের ভিতর হইতে মুণ্ড বাহির করিল। দেখিল, কাকিমা আলোর দিকে তাকাইয়া আছেন, তাঁহার দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইতেছে।

কাকার নিষ্ঠুরতাই এই অশ্রুজলের হেতু তাহাতে সংশয় নাই। ভল্লু বিছানায় উঠিয়া বসিল, আবেগপূর্ণ স্বরে বলিল, 'কাকিমা!'

চোখ মুছিয়া কাকিমা বলিলেন, 'কি?'

ভল্লু বলিল, 'কাকা নড়াধম—না?'

কাকিমা উত্তর দিলেন না।

ভল্লু আবার বলিল, 'কাকা কারুর কথা শোনে না। মা'র কথা শোনে না, বাবার কথা শোনে না, তোমার কথা শোনে না—খালি আমাকে বকে। কাকা নড়াধম।'

কাকিমা এবারও তাহার কথায় সায় দিলেন না, তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া ভাঙা ভাঙা গলায় বলিলেন, 'ঘুমো ভল্লু, অনেক রাত হয়েছে।'

ভল্লু শুইল বটে কিন্তু তাহার ঘুম আসিল না। কাঁচা ঘুমের উপর কাকার উগ্র অভিযানে তাহার ঘুম চটিয়া গিয়াছিল; সে নীরবে শুইয়া ভাবিতে লাগিল।

ক্রমে এগারোটা বাজিয়া গেল; ঠং করিয়া সাড়ে এগারোটা বাজিল। তবু ভল্লুর চোখে ঘুম নাই। সে উত্তপ্ত মস্তিষ্কে চিন্তা করিতেছে। কাকিমা অনেকক্ষণ জাগিয়া থাকিয়া মাঝে মাঝে বুক-ভাঙা নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে শেষে বোধ করি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। ভল্লু একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, তাঁহার চক্ষু মুদিত, তিনি শান্তভাবে নিশ্বাস ফেলিতেছেন।

কাকিমার মুখের দিকে চাহিয়া ভল্লুর কাকার উপর ক্রোধ ও বিদ্বেষ আরো বাড়িয়া গেল। ডাকাত সর্দারের আর কত সহ্য হয়! আজ দ্বিপ্রহর হইতে যে অমানুষিক অত্যাচার তাহার উপর হইয়াছে, তাহা না হয় সে সহ্য করিয়াছে; তাহার সাধের তরবারিটা ভাঙিয়া ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া গিয়াছে তবু সে কিছু বলে নাই। কিন্তু কাকিমার প্রতি এই নিষ্ঠুরতা—নারী নির্যাতন— সে কি করিয়া বরদাস্ত করিবে? ভল্লুর ক্ষুদ্র প্রাণের সমস্ত শিভাল্‌রি সঙ্গীন উঁচাইয়া খাড়া হইয়া উঠিল। যায়

প্রাণ যাক্‌ প্রাণ—ভল্লু কাকাকে শাসন করিবেই!

কিন্তু—

প্রতিহিংসার কল্পনায় রাত্রি জাগরণ করা যত সহজ, কল্পনাকে কার্যে পরিণত করা তত সহজ নয়। উপায় চিন্তা করিতে করিতে ভল্লুর ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল।

অবশেষে দীর্ঘ জটিল চিন্তার পর ভল্লু সিদ্ধান্তে উপনীত হইল। তাহার অধরে একটু হাসি দেখা দিল।

কাকা কাকিমার উপর অত্যাচার করেন বটে—কিন্তু দূর হইতে। ইহার প্রকৃত কারণ, তিনি কাকিমাকে ভয় করেন। বাড়ির মধ্যে কাকা কেবল কাকিমাকেই ভয় করেন। প্রমাণ, কাকিমা এ বাড়িতে আসার পর হইতে কাকা নিজের ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছেন; এমন কি বিছানা স্পর্শ করিবার সাহস পর্যন্ত তাঁহার নাই। মুখে তিনি যতই বীরত্ব প্রকাশ করুন না কেন, কাকিমার ভয়ে তিনি সর্বদা সন্ত্রস্ত হইয়া আছেন। নচেৎ বাড়ি-সুদ্ধ লোকের এত সাধ্য-সাধনা সত্ত্বেও তিনি কাকিমার সংস্পর্শে আসিতে গররাজি কেন?

এরূপ ক্ষেত্রে কাকাকে জব্দ করিবার একমাত্র উপায়—

ভল্লুর মুখের হাসি আরও বিস্তার লাভ করিল। সে ধীরে ধীরে শয্যা হইতে নামিল—কাকিমা জাগিলেন না। ঘড়িতে বারোটা বাজিল।

বিছানা ও লেপের তপ্ত আয়েস ত্যাগ করিতে তাহার কষ্ট হইল; কিন্তু সংকল্পিত কর্তব্য পালন করিতে ভল্লু কোন সময়েই পরাঙ্মুখ নয়। সে নিঃশব্দ পদক্ষেপে ঘরের বাহির হইল।

বাড়ি অন্ধকার। কোন্‌ অদৃশ্য স্থান হইতে একটা মট্‌ মট্‌ শব্দ আসিতেছে—যেন কে অন্ধকারে বসিয়া আঙুল মট্‌কাইতেছে। ভল্লুর বুক দুর্‌ দুর্‌ করিয়া উঠিল; সে কিছুক্ষণ দুই মুঠি শক্ত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শব্দটা অপ্রাকৃত নয়, একটা দরজার তক্তায় কীট গর্ত করিতেছে। ভল্লু ধীরে ধীরে রুদ্ধ নিশ্বাস মোচন করিল। কিন্তু ভয় বস্তুটা এমনি যে বাস্তব অবাস্তবের অপেক্ষা রাখে না,—অন্ধকারে নিজের পদশব্দও আতঙ্কের সৃষ্টি করে। ভল্লুর প্রবল ইচ্ছা হইল, ফিরিয়া গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়ে—কাজ নাই আর কাকাকে শাসন করিয়া। কিন্তু সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া মনে মনে বলিল, 'আমি ভল্লু সর্দার! আমি কাউকে ভয় করি না— কিছু ভয় করি না—'

তথাপি, চক্ষু দুটি দৃঢ়ভাবে বন্ধ করিয়াই ভল্লু সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া চলিল। নিতান্ত পরিচিত পথ, তাই কোন দুর্ঘটনা ঘটিল না। অবশেষে শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে সে বৈঠকখানার দ্বারে উপস্থিত হইল।

ঘরে মৃদু আলো জ্বলিতেছে। ভল্লু দেখিল, আপাদমস্তক র‍্যাপার মুড়ি দিয়া কাকা প্রায় গামার মতই কুণ্ডলিত হইয়া শুইয়া আছেন।

ভল্লু কাকার গা ঠেলিয়া ডাকিল, 'কাকা।'

কাকা চমকিয়া উঠিলেন, 'অ্যাঁ—কে!'—ভল্লুকে দেখিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, 'কি হয়েছে রে!'

শীতের সহিত অন্যান্য মানসিক আবেগ মিশ্রিত হইয়া ভল্লুর দন্তবাদ্য আরম্ভ হইয়াছিল, সে বলিল, 'কাকিমার অসুখ করেছে— ত্‌তুমি শিগ্‌গির চল—'

'কি হয়েছে?'

ভল্লু বিপদে পড়িল। রোগের লক্ষণ সম্বন্ধে সে আগে চিন্তা করে নাই; অথচ কাকা

ডাক্তার, তাঁহাকে বাজে কথা বলিয়া প্রতারিত করা চলিবে না। পূর্বে কয়েকবার কাল্পনিক রোগের উল্লেখ করিয়া ভল্লু ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

হঠাৎ তাহার একটা রোগের কথা মনে পড়িয়া গেল। কয়েক মাস আগে লিলির ঐ রোগ হইয়াছিল, (স্যাণ্টোনিন প্রয়োগে আরাম হয়)। লিলির যে রোগ হইয়াছিল তাহা কাকিমার হইতে বাধা নাই—বিশেষতঃ যখন উভয়েই মেয়েমানুষ। ভল্লু ঢোক গিলিয়া বলিল, 'দাঁত কিড়্‌মিড়্‌ করছেন।'

দাঁত কিড়্‌মিড়্‌ করিতেছে! হিস্টিরিয়া নাকি? কাকা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এত রাত্রে—! বিচিত্র নয়। আজ রাত্রে ঐ সব বকাবকির পর হয়তো—

কাকা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আর কি করছে?'

'আর কিছু না—শুয়ে আছেন।'

হুঁ—হিস্টিরিয়াই বটে! কাকা একটু দ্বিধা করিলেন। কিন্তু অনুতপ্ত মানুষের কাছে কঠোর ব্রহ্মচারীর পরাজয় হইল। তিনি আলমারি হইতে একটা বেঁটে সবুজ রংয়ের শিশি লইয়া সংক্ষেপে বলিলেন, 'চল্‌।'

ভল্লুর বুকের ভিতর ধড়াস-ধড়াস করিতে লাগিল। কঠিন ও বিপজ্জনক কার্য ফলনোন্মুখ হইলে ঐরূপ সকলেরই হয়। সে নিঃশব্দে কাকার অনুসরণ করিল।

কাকা উপরে উঠিয়া ঘরের দ্বারের সম্মুখে একবার দাঁড়াইলেন; তারপর ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

খাটের পাশে দাঁড়াইয়া রোগিণীর অনাবৃত মুখের দিকে চাহিতেই একটা অজ্ঞাত-পূর্ব মধুর অনুভূতি তাঁহার সর্বাঙ্গের উপর দিয়া বহিয়া গেল। কিন্তু তিনি তখনই মনকে যথোচিত কঠিন করিয়া হস্তস্থ শিশির মুখ খুলিয়া রোগিণীর নাকের সম্মুখে ধরিলেন।

কাকিমা শিহরিয়া জাগিয়া উঠিলেন। ঠিক এই সময় দ্বারের কাছে খুট্‌ করিয়া শব্দ হইল। কাকা ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন—দ্বার বন্ধ; ভল্লু ঘরে নাই।

তিনি এক লাফে গিয়া দরজায় টান মারিলেন—দরজা খুলিল না। বাহির হইতে শিকল লাগানো।

কাকা চাপা গর্জনে বলিলেন, 'ভল্লু! শিগ্‌গির দোর খোল্‌ পাজি—নইলে খুন করব।'

কিন্তু ভল্লু তখন পাশের ঘরে গিয়া বাবার লেপের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

পরদিন ভোর হইতে না হইতে ভল্লুর ঘুম ভাঙিল।

মা বাবা তখনো সুপ্ত; ভল্লু চুপি চুপি উঠিয়া বাহিরে আসিল।

কাকিমার দরজা তেমনি বাহির হইতে শিকল লাগানো, অর্থাৎ কাকা সারারাত্রি বাহির হইতে পারেন নাই। বিজয়গর্বে ভল্লু সর্দারের মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; সে নিজমনে একবার কিরাত নৃত্য নাচিয়া লইল। ভবিষ্যতে তাহার ভাগ্যে যাহা আছে তাহা তো আছেই, তাই বলিয়া বর্তমানের বিজয়োল্লাস তো আর দমন করিয়া রাখা যায় না।

কিন্তু কাকা কিরূপ নির্যাতন ভোগ করিতেছেন তাহা স্বচক্ষে দেখিবার লোভও সে সম্বরণ করিতে পারিল না। জানালায় একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র ছিল—ভল্লু তাহাতে চোখ লাগাইয়া উঁকি মারিল।

যাহা দেখিল, তাহাতে স্তম্ভিত বিস্ময়ে চক্ষু চক্রাকার করিয়া ভল্লু সরিয়া আসিল। তারপর দৌড়িতে দৌড়িতে মা'র ঘরে ফিরিয়া গেল। ঘুমন্ত মা'কে নাড়া দিয়া জাগাইতে

জাগাইতে উত্তেজনা-সংহত কণ্ঠে বলিল, 'মা। মা! কাকা কাকিমাকে তিন্‌টে-পাঁচটা চুমু খাচ্ছেন।'

১০ চৈত্র ১৩৪১

বি দ্রো হী

দেবব্রত আমার বন্ধু ছিল না। কিন্তু আজ এই ক্ষান্তবর্ষণ শ্রাবণসন্ধ্যায় কলিকাতা হইতে বহু দূরে বসিয়া ষোল বৎসর পূর্বের এমনি আর একটি সন্ধ্যার কথা বার বার মনে পড়িতেছে। রামতনু লাইব্রেরীর রীডিং রুমে আমরা কয়জন টেবিল ঘিরিয়া বসিয়া ছিলাম, আর দেবব্রত আমাদের সম্মুখে শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া। উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো তাহার উগ্র সুন্দর মুখের উপর পড়িয়াছিল, তাহার বজ্রকঠিন মুখ ধীরে ধীরে রক্তহীন হইয়া গিয়াছিল, ঠোঁট দুটা হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিয়াছিল—

সমস্ত দৃশ্যটা যেন চোখের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি।

তখন কলিকাতায় থাকিয়া এম. এ. পড়ি ও সন্ধ্যার পর রামতনু লাইব্রেরীতে বসিয়াই আড্ডা দিই। রামতনু লাইব্রেরী কয়েক বৎসর ধরিয়া আমার মত আরও গুটিকয়েক প্রবীণ ছাত্রের স্থায়ী আড্ডা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; তন্মধ্যে দেবব্রত ও সুরেনদাদা উল্লেখ-যোগ্য। বাকিগুলি বিশেষত্বহীন; তাহাদের নাম পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছি।

সুরেনদাদা একাদিক্রমে বহু বৎসর ল-কলেজের ছাত্র থাকিয়া, অভিজ্ঞতা, কলেবর ও বয়োমর্যাদার বলে সার্বভৌম 'দাদা' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। শুনিয়াছিলাম দেশে তাঁহার গুটি তিন-চার পুত্রকলত্র আছে। আমরা সকলেই তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতাম।

দেবব্রত আমার সহপাঠী ছিল; কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, সে আমার বন্ধু ছিল না। দেবব্রতের বন্ধুভাগ্যটা ছিল খারাপ; আজ পর্যন্ত সে একটি সত্যকার বন্ধু লাভ করিতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ।

দেবব্রত বড়মানুষের ছেলে হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহার পিতা যখন তাহার তরুণ হস্তে কয়েক লক্ষ টাকা ও আরও অনেক বিষয়সম্পত্তি রাখিয়া ভবসমুদ্রে পাড়ি দিয়াছিলেন, তখন অনেকেই আশা করিয়াছিল যে, এই অভিভাবহীন যুবক এই-বার বহু ইয়ার জুটাইয়া পিতৃ-অর্থ দু'হাতে উড়াইতে আরম্ভ করিবে। তাহাকে কাপ্তেন পাকড়াইবার চেষ্টাও কেহ কেহ করিয়াছিল। কিন্তু এত সুযোগ সত্ত্বেও সে যেমন ছিল তেমনই রহিয়া গিয়াছিল; তাহার জীবনযাত্রা বা মতামতের কোনও পরিবর্তন হয় নাই।

আমরা রামতনু লাইব্রেরীর আড্ডাধারিগণ তাহাকে পছন্দ করিতাম না। তাহার বুদ্ধির এমন একটা কুণ্ঠাহীন অনাবৃত নগ্নতা ছিল যে আমাদের চোখে তাহা অশ্লীল দুর্নীতির রূপান্তর বলিয়া মনে হইত। আমরা বাঙ্গালী জাতি অনাবশ্যক তর্ক করিতে পশ্চাৎপদ, এ অপবাদ কেহ কখনও দিতে পারে নাই; কিন্তু দেবব্রতের সঙ্গে তর্ক বাধিলে আমরা কেমন নিস্তেজ হইয়া পড়িতাম, তর্কে আর রুচি থাকিত না। তাহার তর্ক করিবার রীতি দেখিয়াই আমাদের অত্যন্ত বিরক্তি বোধ হইত। ধর্মনীতি, সমাজতত্ত্ব, ঋষিবাক্য কিছুই সে স্বীকার করিত না, কেবল বুদ্ধির জবরদস্তি দ্বারা সকলকে কাবু করিবার চেষ্টা করিত। বলা বাহুল্য, এরূপ লোক বড়মানুষ হইলেও তাহার সহিত সদ্ভাব রাখা কঠিন হইয়া পড়ে।

তাহার চেহারা ছিল উগ্র রকমের সুন্দর। ছ'ফুট লম্বা, গৌরবর্ণ, ধারালো মুখের উপর বাঁকা নাকটা যেন খড়্গের মত উদ্যত হইয়া আছে। চোখের চাহনি এত তীব্র ও নির্ভীক যে, সাধারণতঃ তাহাকে অত্যন্ত দাম্ভিক বলিয়া মনে হয়।

টাকার গর্ব অবশ্য তাহার ছিল না, কারণ টাকা জিনিসটাকে সে গর্বের বস্তু বলিয়া মনে করিত না। অযথা বড়মানুষী করিতে তাহাকে কখনও দেখি নাই, সে হাঁটিয়া কলেজে যাইত। তাহার গর্ব ছিল শুধু বুদ্ধির। তাহার ভাব দেখিয়া মনে হইত, বুদ্ধির বলে সে মানুষের সৃষ্ট সমস্ত প্রতিষ্ঠানের অন্তর্হিত ধাপ্পাবাজি ধরিয়া ফেলিয়াছে, তাই আমাদের মত কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধ জীবের প্রতি তাহার করুণার অন্ত নাই।

তাহার উদ্ধত মতবাদ প্রায়ই নাস্তিকতার পর্যায়ে গিয়া পড়িত। মনে আছে, একবার কি একটা আলোচনার প্রসঙ্গে দাদা বলিতেছিলেন যে, বিবাহ নামক সংস্কারটাই মনুষ্য-সমাজকে দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, যাহারা বিবাহ-বন্ধনকে শিথিল করিতে চায় তাহারা সমাজের মূলে কুঠারঘাত করিতেছে। দেবব্রত একটা বিলাতী মাসিক পত্রের ছবি দেখিতে ছিল, মুখ তুলিয়া বলিল, 'বিবাহ জিনিসটার স্বকীয় মূল্য কি?'

দাদা বলিলেন, 'পৃথিবীতে কোন জিনিসেরই স্বকীয় মূল্য নেই, সব আপেক্ষিক। বিবাহ আমাদের মহামূল্য সম্পদ, কারণ সমাজকে সে প্রেমের বন্ধনে বেঁধে রেখেছে।'

'প্রেমের বন্ধন কোথা থেকে এল? বিবাহের সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধ কি?'

দাদা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'বিবাহ আর প্রেমের মধ্যে সম্বন্ধ আছে, এটাও বুঝিয়ে দিতে হবে?'

'অনিবার্য সম্বন্ধ আছে, এটা যদি বুঝিয়ে দিতে পারেন তো ভাল হয়।'

দাদা রুষ্টমুখে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'তা যদি নাও থাকে, তবু সমাজের বন্ধন হিসাবে বিবাহের মূল্য কমে না।'

'কিন্তু তাহলে প্রশ্ন ওঠে, একটা কৃত্রিম বন্ধন দিয়ে সমাজকে বেঁধে রাখা কি সংগত?'

'কৃত্রিম বন্ধন? মানে?'

'যে বন্ধনে স্ত্রী-পুরুষ স্বেচ্ছায় পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ধরা দেয় না, সে বন্ধন কৃত্রিম নয় তো কি?'

দাদা চটিয়া উঠিলেন। ধৈর্যচ্যুতি ঘটিলে তাঁহার মুখে কোনও কথা বাধে না, তিনি মোটা গলায় চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'বিবাহ কৃত্রিম বন্ধন! অর্থাৎ তোমার পূর্ব-পুরুষদের বিবাহকেও তুমি পবিত্র বলে মনে কর না?'

দেবব্রত মুষ্টি পাকাইয়া গর্জন করিয়া উঠিল, 'না, স্বীকার করি না—

অপবিত্র ও কর-পরশ
সঙ্গে ওর হৃদয় নহিলে।

মনে কি ভেবেছ বঁধু, ও হাসি এতই মধু
প্রেম না দিলেও চলে শুধু হাসি দিলে।'

স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। রবীন্দ্রনাথের কবিতা সগর্জনে আবৃত্তি করিলে শুনিতে মধুর হয় না; বিশেষতঃ নিজের পূর্বপুরুষদের বিবাহ অপবিত্র বলিয়া স্বীকার করিতে যে কুণ্ঠিত হয় না এরূপ বর্বরের মুখে। দাদাও গুম হইয়া গেলেন, এত বড় ব্রহ্মাস্ত্র যে ব্যর্থ হইয়া যাইবে, ইহা তিনি প্রত্যাশা করেন নাই।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া তিনি বলিলেন, 'তুমি তাহলে কিছুই মান না বল?'

দেবব্রতও কণ্ঠস্বর কিয়ৎ পরিমাণে নামাইয়া বলিল, 'মানি। কেবল একটা জিনিস।'

দাদা বলিলেন, 'জিনিসটি কি?'

সংক্ষেপে দেবব্রত বলিল, 'প্রেম।'

দাদা ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন, 'বল কি? বিবাহ মান না, তার মানে বিবাহ-সম্ভূত যত কিছু সম্বন্ধ সবই অস্বীকার কর। মাতৃস্নেহ, ভ্রাতৃপ্রেম এসব তোমার কাছে ভুয়ো। অথচ প্রেম মান—তার মানেটা কি?'

'মানেটা খুব সহজ। ভ্রাতৃপ্রেম মাতৃস্নেহ এগুলো মানুষের মনগড়া জিনিস—তাই কখনো কখনো মা নিজের হাতে সন্তানকে খুন করেছে এ কথা শোনা যায় এবং ভ্রাতৃ-প্রেম যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা উপলক্ষে আদালতে গিয়ে উপস্থিত হয় তা সকলেই জানে। সুতরাং ও দুটো ঝুটো জিনিস—খাঁটি নয়। খাঁটি যদি কিছু থাকে তো সে প্রেম—যা আত্মীয়তার অপেক্ষা রাখে না, যার মূল্য আপনার বিবাহের মত আপেক্ষিক নয়, নিজের মধ্যেই সম্পূর্ণ; স্বকীয়।'

দাদা বলিলেন, 'হুঁ। প্রেম তো বড় ভাল জিনিস দেখছি। কিন্তু ভ্রাতৃপ্রেম বা মাতৃ-স্নেহের চেয়েও ওটা উচ্চ কোনখানে তা এখনও হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না।'

দেবব্রত তীক্ষ্ণ হাসিয়া বলিল, 'হৃদয়ঙ্গম হবে কোত্থেকে! হৃদয়ের চারপাশে তিন ইঞ্চি পুরু কুসংস্কার জমা করে রেখেছেন যে। নইলে,প্রেমই মায়ের মনে গিয়ে মাতৃস্নেহে পরিণত হয় এবং ভ্রাতার বুকে প্রবেশ করে, কখনও কখনও লক্ষ্মণের মত ভাই তৈরি করে, এটা বুঝতে দেরি হত না। মাতৃস্নেহ বলে স্বতঃসিদ্ধ কিছু নেই. তা যদি থাকত তাহলে প্রত্যেক মা তার সবগুলি সন্তানকে সমান ভালবাসত। কিন্তু পৃথিবীতে কোনও মা তা বাসে না। এখন দেখছেন যে, মাতৃস্নেহ বলে বস্তুতঃ কিছু নেই! আছে শুধু প্রেম!'

দাদা আবার ধৈর্য হারাইলেন; বাস্তবিক এরকম কথা শুনিলে ধৈর্য রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। তিনি দুই বাহু শূন্যে আস্ফালিত করিয়া উগ্র কণ্ঠে কহিলেন, 'মাতৃস্নেহ যদি না থাকে তবে প্রেমও নেই। তুমি প্রেমের এত দালালি করছ কেন হ্যা? আজকাল প্রেম করছ বুঝি?'

দেবব্রত এবার সজোরে হাসিয়া উঠিল, বেশ প্রাণখোলা সকৌতুক হাসি। বলিল, 'দাদা, প্রেম কি চেষ্টা করে করা যায়? ওটা সহজ—যত্নসাধ্য নয়—তাই ওর আর একটা নাম অহৈতুকী প্রীতি।'

দাদা শ্লেষ করিয়া বলিলেন, 'জয় রাধেশ্যাম! হরি হরি বল।'

আমি এতক্ষণ চুপ্ করিয়াছিলাম, এবার খুব শান্তভাবে বলিলাম, 'দেবব্রত, তোমাকে আমি একটা প্রশ্ন করতে পারি কি?'

'পার।'

'বিবাহকে তুমি যখন সত্য বন্ধন বলে স্বীকার কর না, তখন স্ত্রীপুরুষের অবৈধ ও তোমার কোন আপত্তি নেই?'

দেবব্রত বলিল, 'কিছুই না। আর আপত্তি করলেই বা শুনছে কে?'

'তাহলে কুস্থানে যেতেও তোমার কোনও নৈতিক বাধা নেই?'

'কুস্থান?—ও!' দেবব্রত হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল, 'দাদা একদিক থেকে কোণঠাসা করবার চেষ্টা করেছিলেন, তুমি আর এক পথ ধরেছ। না, যাকে তুমি কুস্থান বলছ সেখানে যেতে আমার কোনও বাধা নেই।'

আমি তীক্ষ্ণস্বরে বলিলাম, 'তবে যাও না কেন?'

'রুচি নেই বলে।'

'অর্থাৎ রুচি থাকলে যেতে?'

'আলবাৎ যেতুম, একশবার যেতুম।'

'ও! তাহলে আমার আর কিছু বলবার নেই।'

দেবব্রত হাসিতে হাসিতে বলিল, 'বলবার তোমার কোন কালেই কিছু ছিল না, কেবল 'কুস্থানে'র ভয় দেখিয়ে আমাকে কাৎ করবার চেষ্টায় ছিলে। কিন্তু তা নয় না বন্ধু। ও ব্যর্থ প্রয়াস ছেড়ে দাও। তার চেয়ে বুদ্ধিকে প্রবুদ্ধ কর, সত্যকে সহজভাবে গ্রহণ করবার চেষ্টা কর; দেখবে সুস্থান কুস্থান বলে কোথাও কিছু নেই, সূর্যের আলো সর্বত্র সমানভাবে পড়ে। আরও বুঝবে, পৃথিবীতে একটিমাত্র বন্ধন আছে—মাতৃস্নেহ নয়, ভ্রাতৃপ্রেম নয়, জেলখানার গারদ নয়—তার নাম প্রেম। Omnia Vincit Amor! চললুম, যদি পার ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা কর।' বলিয়া চক্ষে অসহ্য বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়া ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে প্রস্থান করিল।

চিত্তবৃত্তি যাহার এই ধরণের সে যে শীঘ্রই বিপদে পড়িবে তাহা আমরা জানিতাম, বুদ্ধির এমন অমিতাচার ভগবান সহ্য করেন না। কিন্তু স্বখাত-সলিলে দেবব্রত যে এমন করিয়া ডুবিবে তাহা তখনও বুঝিতে পারি নাই।

একটা শনিবারে, রাত্রি ন'টার সময় সিনেমা দেখিতে গিয়াছিলাম; গিয়া দেখি দেবব্রত পাশের আসনে বসিয়া আছে। কথাবার্তা বড় কিছু হইল না, যাহার সহিত প্রত্যহ দেখা হয় তাহাকে নূতন কিছু বলিবার থাকে না। অভিনয় শেষ হইলে দু'জনে একসঙ্গে ফিরিলাম। আমার মেস ও দেবব্রতের বাড়ি একই রাস্তার উপর; মধ্যে দশ-বারটা বাড়ির ব্যবধান। চৈত্র মাসের চমৎকার রাত্রি, তাই পথ অনেকটা হইলেও পদব্রজেই চলিয়াছিলাম।

সাড়ে এগারটা বাজিয়া গিয়াছিল; পথ নির্জন। মিনিট পনের হাঁটিবার পর, একটা গলির ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে আমি বলিলাম, 'আমেরিকায় স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ যে উচ্ছৃঙ্খল পথে চলেছে তাতে ও জাতের অধঃপতন হতে আর দেরি নেই।' সদ্যদৃষ্ট ফিল্মটার কথাই মনের মধ্যে ঘুরিতেছিল।

দেবব্রত একটু ভাবিয়া বলিল, 'আমার তা মনে হয় না। যাকে তুমি উচ্ছৃঙ্খলতা মনে করছ প্রকৃতপক্ষে তা উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। ওরা একটা এক্সপেরিমেণ্ট করছে, সমাজের প্রত্যেকটি বিধি-বিধান নূতন করে যাচাই করে নিচ্ছে। হয়তো শেষ পর্যন্ত তারা সাবেক নিয়ম-গুলোই মেনে নেবে; কিন্তু বর্তমানে পুরাতন সম্বন্ধে একটা অসন্তোষ এসেছে, তাই তারা—'টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে নূতন করিয়া গড়িতে চায়।' যাদের চিন্তা করবার শক্তি আছে, সংস্কারকে যারা বুদ্ধির আসন ছেড়ে দেয়নি—' দেবব্রতের কথা শেষ হইল না, হঠাৎ বাধা পড়িয়া গেল।

যেখানে আমরা পৌঁছিলাম সেখানে গলিটা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, ইট বাঁধানো। দু'-ধারে ঘনসন্নিবিষ্ট বাড়ি, দেয়ালে সংলগ্ন গ্যাসবাতির নীচে অন্ধকার ছায়া পড়িয়াছে।

হঠাৎ পাশের একটা দরজা খুলিয়া গেল, পুরুষ কণ্ঠের একটা মস্ত কর্কশ আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। তারপর সেই অন্ধকার দ্বারপথ দিয়া একটি স্ত্রীমূর্তি যেন প্রবল ধাক্কা দ্বারা তাড়িত হইয়া একেবারে দেবব্রতের গায়ের উপর আসিয়া পড়িল। দরজা আবার সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল।

আকস্মিক সংঘাতের তাল সামলাইয়া দেবব্রত স্ত্রীলোকটিকে ধরিয়া ফেলিল। গ্যাসের আলোয় দেখিলাম, একটি ষোল-সতের বছরের মেয়ে, পরনের শাড়িখানা ছিঁড়িয়া প্রায় লজ্জা-নিবারণের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে, কপাল কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে। সে ব্যাকুল ত্রাসে একবার আমাদের দিকে তাকাইয়া ছুটিয়া গিয়া সেই বন্ধ দরজার উপর আছড়াইয়া পড়িল, চাপা রোদনরুদ্ধ স্বরে বলিল, 'খোল—ওগো—দোর খুলে দাও।'

দ্বারের অপর পার হইতে কিন্তু কোন সাড়া আসিল না। সে আবার কবাটে ধাক্কা দিল, কিন্তু এবারও উত্তর আসিল না। তখন সে বুকভাঙ্গা ব্যাকুলতায় সেই দরজার সম্মুখে মাথা গুঁজিয়া ফুঁপাইতে লাগিল।

আমরা এতক্ষণ চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া ছিলাম। এখন দেবব্রত অগ্রসর হইয়া কহিল, 'শুনুন। এটা কি আপনার বাড়ি?'

সে মুখ তুলিয়া আমাদের যেন প্রথম দেখিতে পাইল; লজ্জায় তাহার বসনহীন দেহ সঙ্কুচিত হইয়া ছোট হইয়া গেল। ছেঁড়া কাপড়ে কোনও মতে দেহ আবৃত করিয়া সে জড়সড়ভাবে দরজায় পৈঠার উপর বসিয়া রহিল।

দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হয়েছে?'

মেয়েটি কোনও উত্তর দিল না।

দেবব্রত আবার প্রশ্ন করিল, 'যিনি আপনাকে বাড়ি থেকে বার করে দিলেন তিনি কি আপনার স্বামী?'

মেয়েটি হঠাৎ হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিল।

দেবব্রত তখন ঈষৎ অসহিষ্ণুভাবে বলিল, 'দেখুন, আপনাকে এভাবে ফেলে আমরা যেতে পারছি না। এ বাড়িতে যদি আপনার কোন আত্মীয় থাকে তো বলুন, তাকে ডাকবার চেষ্টা করছি; আর যদি না থাকে তাও বলুন, দেখি যদি অন্য কোন ব্যবস্থা করতে পারি।'

মেয়েটি তখন অস্পষ্ট স্বরে বলিল, 'আমার কেউ নেই।'

'কেউ নেই! অর্থাৎ যিনি আপনাকে ধাক্কা দিয়ে বার করে দিলেন আপনি তাঁর স্ত্রী নন?'

মেয়েটা মাথা নাড়িল।

'রক্ষিতা?'

বিদ্যুদাহতের মত মুখ তুলিয়া সে আবার হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিল।

দেবব্রত বলিল, 'হুঁ, শহরে আর কোথাও যাবার জায়গা আছে?'

মেয়েটার চাপা কান্না হঠাৎ কোলের ভিতর হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, 'না।'

দেবব্রত কিছুক্ষণ নতমুখে চুপ করিয়া রহিল। দুপুররাত্রে অজানা পল্লীতে হঠাৎ এই বিশ্রী ব্যাপারে জড়াইয়া পড়িয়া আমি সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম, এই ফাঁকে বলিলাম, 'দেবব্রত, চল আমরা যাই—'

দেবব্রত মুখ তুলিয়া মেয়েটাকে বলিল, 'পুলিসে যেতে রাজী আছেন?'

মেয়েটা এবার মুখ তুলিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, বলিল, 'না—আমি পুলিসে যাব না—'

তাহার কপালে রক্তের সহিত চুল জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল, চোখ দিয়া ধারার মত

জল গড়াইয়া পড়িতেছিল; পতিতা হইলেও দেখিলে কষ্ট হয়। কিন্তু দেবব্রত এই সময় যাহা করিয়া বসিল, তাহা সহানুভূতি বা সমবেদনা নয়, চূড়ান্ত পাগলামি। পতিতার প্রতি দরদ দেখাইতে দোষ নাই, কিন্তু দরদেরও একটা সীমা আছে!

দেবব্রত মেয়েটার খুব কাছে গিয়া বলিল, 'পুলিসে যেতে হবে না, আপনি আমার বাড়িতে চলুন। যাবেন? আমি একলা থাকি, কিন্তু কোনও ভয় নেই। আসুন।'

মেয়েটা বুদ্ধিভ্রষ্টের মত ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

আমি সভয়ে বলিলাম, 'দেবব্রত, কি পাগলামি করছ?'

দেবব্রত আমার কথা শুনিতে পাইল না, মেয়েটার দিকে ঝুঁকিয়া বলিল, 'যাবেন তো? না গেলে এই রাত্রে কোথায় থাকবেন? যাবার জায়গাও তো আপনার নেই। কি, আসবেন? আপনি আশ্রয়হীন, আমার বাড়ি আছে, তাই সেখানে যেতে অনুরোধ করছি। যখন ইচ্ছে হবে চলে আসতে পারবেন। ভয় করবেন না, আমার মনে কোনো মতলব নেই।'

মেয়েটা তবু মৌন হইয়া রহিল।

তখন দেবব্রত তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া সদয় কণ্ঠে বলিল, 'চলুন। আমার বাড়ি এখান থেকে মাইলখানেক দূরে—হেঁটে যেতে পারবেন না, বড় রাস্তায় গিয়ে ট্যাক্সি ধরব।'

মেয়েটি বাধা দিল না, আপত্তি করিল না, যন্ত্র-চালিতের মত দেবব্রতের হাত ধরিয়া তাহার সঙ্গে চলিল।

সদর রাস্তায় ট্যাক্সি পাওয়া গেল। দেবব্রত তাহাকে তুলিয়া দিয়া আমাকে বলিল, 'এস মন্মথ।'

আমি শক্ত হইয়া বলিলাম, 'না, তুমি যাও। আমি হেঁটেই যাব।'

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেবব্রত আমার পানে তাকাইল; তাহার মুখে একটা তীক্ষ্ণ বাঁকা হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে বলিল, 'ও, আচ্ছা।' তারপর নিজে ট্যাক্সিতে উঠিয়া বলিল, 'হাঁকো।'

ট্যাক্সি চলিয়া গেল।

সোমবার সন্ধ্যায় দেবব্রত লাইব্রেরীতে পদার্পণ করিবামাত্র দাদা বলিলেন, 'এই যে! শনিবার রাত্রে খুব রোমান্স করেছ শুনলুম?' বলা বাহুল্য, ঘটনাটা আমি আড্ডায় ব্যক্ত করিয়াছিলাম।

দেবব্রত চেয়ারে বসিয়া সহজভাবে বলিল, 'হ্যাঁ।'

সকলেই উৎসুকভাবে তাকাইয়া ছিল, কিন্তু দেবব্রত যখন আর কিছু বলিল না, তখন দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তারপর, রোমান্স গড়াল কতদূর?'

দেবব্রত হাল্কাভাবে হাসিয়া বলিল, 'বেশীদূর গড়ায় নি এখনও, এই তো সবে আরম্ভ।' বলিয়া একটা মাসিক পত্র টানিয়া লইল।

গর্হিত কার্যের প্রতি যথোচিত ঘৃণা থাকিলে সেই সঙ্গে একটু কৌতূহল দোষাবহ নয়; বস্তুতঃ অধিকাংশ সজ্জনের মনেই দুষ্কার্য সম্বন্ধে ঘৃণা ও কৌতূহলের নিবিড় সংমিশ্রণ দেখা যায়। দাদাও তাহার ব্যতিক্রম নয়। তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন, 'তবু? ভাব-সাব আলাপ-পরিচয় হয়েছে তো?'

দেবব্রত মুখ তুলিয়া বলিল, 'খুব সামান্য। সেই যে সে-রাত্রে কাঁদতে আরম্ভ করেছে এখনও থামেনি। কাজেই আলাপের চেয়ে বিলাপই বেশী হয়েছে।'

'পরিচয় জানতে পারনি?'

'পরিচয় নূতন কিছু নেই। গেরস্ত-ঘরের শিক্ষিতা মেয়ে। বিয়ে হয়নি—স্কুলে পড়ত। মাস ছয়েক আগে একটা লোকের সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে আসে। সেই লোকটার সঙ্গেই ছিল—লোকটা মাতাল; তারপর পরশু রাত্রের ঘটনা।'

'তাহলে কুলত্যাগিনী—পেশাদার নয়?' দাদা কথাগুলি বেশ ভাবিয়া ভাবিয়া বলিলেন।

'হ্যাঁ—কুলত্যাগিনী।'

'কোন্ কুল আলো করে ছিলেন, তার কোন সন্ধান পেলে?'

'সন্ধান নিইনি।'

'হুঁ। এখন তাহলে পদ্মিনীটি তোমার স্কন্ধেই আরোহণ করে আছেন? তুমিও একলা মানুষ, তার উপর কুসংস্কারের বালাই নেই। যোগাযোগটা হয়েছে ভাল। তা—এখন এই ভাবেই বসবাস চলবে তাহলে?'

'চলা ছাড়া আর উপায় কি? যতক্ষণ তিনি নিজে কোথাও না যাচ্ছেন ততক্ষণ আমি তাড়িয়ে দিতে পারছি না।' বলিয়া সম্মুখস্থ কাগজে মনোনিবেশ করিল।

তাহার প্রখর বুদ্ধির প্রভায় উজ্জ্বল মুখখানার দিকে চাহিয়া আমার মনে কেমন একটা দুঃখ হইতে লাগিল। সমাজ-বন্ধন যে মানে না, বিবাহকে যে কৃত্রিম বন্ধন বলিয়া উপহাস করে, তাহার নৈতিক চরিত্র যে এরূপ অবস্থায় পড়িয়া অতি সহজে নির্বিঘ্নে অধঃপথে যাইবে তাহাতে সন্দেহ করিবার অবকাশ কোথায়?

দাদাও সেই কথাই বলিলেন; একটা গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, 'যাক, এতদিন শুধু মুখেই দুর্নীতি প্রচার করছিলে, এবার সত্যি সত্যিই গোল্লায় গেলে?'

চকিতে মুখ তুলিয়া দেবব্রত বলিল, 'তার মানে?'

'তার মানে আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। তোমার ভবিষ্যৎ আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। আর সকলে ক্রমশঃ ক্রমশঃ দেখতে পাবে।'

দেবব্রত হাসিয়া উঠিল, তারপর বলিল, 'দাদা একজন পাকা রোমান্টিস্ট। বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু রস মরেনি। বৌদি'র বয়স কত হবে দাদা?'

দাদা ক্রুদ্ধভাবে একবার তাহার দিকে তাকাইয়া মুখ গম্ভীর করিয়া বসিয়া রহিলেন। স্ত্রীকে লইয়া রসিকতা তিনি পছন্দ করিতেন না।

ইহার পর যখনই দেবব্রত আড্ডায় আসিত, তখনই আমরা তাহাকে নানাবিধ প্রশ্নের আড়ালে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের খোঁচা দিতাম। আমাদের মধ্যে একজন ছিল ভয়ানক পিউরিটান, তাহার নাম বোধ হয় জিতেন—সে দেবব্রতের সঙ্গে কথা বন্ধ করিয়া দিল। বিদ্রোহীর কিন্তু কিছুমাত্র ভাব-বিপর্যয় দেখা গেল না। সে আমাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের জবাব দিত; আশ্রিতা যুবতী সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে সহজভাবে উত্তর দিত—লুকোচুরি করিত না। মেয়েটার নাম অণিমা—সে দিব্য আরামে দেবব্রতের বাড়িতে বাস করিতেছে, চলিয়া যাইবার কোনও আগ্রহ নাই; দু'জনের মধ্যে পরিচয় বেশ ঘনীভূত হইতেছে; এ সমস্ত খবর তাহার নিজের মুখেই শুনিতে পাইতাম। কেবল একটা প্রশ্ন সোজা ভাবে বাঁকা ভাবে অনেক প্রকারে করিয়াও আমরা জবাব পাইতাম না। দেবব্রত কখনও গম্ভীর হইয়া থাকিত, কখনও হাসিয়া এড়াইয়া যাইত; উত্তরটা আমরা অবশ্য মনে মনে অনুমান করিয়া লইয়াছিলাম।

ক্রমে দেবব্রতের আড্ডায় আসা কমিতে আরম্ভ করিল। মাঝে মাঝে যখন আসিত, তখন তাহার মুখে একটা অতৃপ্ত ক্ষুধিত ভাব দেখিয়া আমরা মনে মনে হাসিতাম। বেশীক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিত না, কিছুক্ষণ ছটফট করিয়া উঠিয়া চলিয়া

যাইত। শেষে তাহার লাইব্রেরীতে আসা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল।

কলেজেও তাহাকে দু'মাস দেখিলাম না। বুঝিলাম, পড়াশুনায় আর মন নাই, এখন সে অন্য পথে চলিয়াছে। দাদা মাঝে মাঝে দুঃখ করিয়া বলিতেন, 'ছোঁড়া একেবারে বরবাদ হয়ে গেল। জানতুম, ওরকম চিত্তবৃত্তি যার, সে একদিন না একদিন অধঃপাতে যাবে। তবু আপশোষ হয়, বুদ্ধির দোষে ছোঁড়া নষ্ট হয়ে গেল।'

আমারও দুঃখ হইত। সে-রাত্রে সেই গৃহ-নিষ্কাশিতা মেয়েটার রক্তমাখা মুখ ও অসহায় অবস্থা দেখিয়া যদি তাঁহার শিভাল্‌রি না জাগিত, হয়তো কোনোদিন ভদ্রঘরের একটি মেয়েকে বিবাহ করিয়া সে সুখী হইতে পারিত, ক্রমে বুদ্ধির অহংকারদৃপ্ত নাস্তিকতাও কাটিয়া যাইত। কিন্তু এখন আর তাহার উদ্ধার নাই। অধঃপথের স্বাদ একবার যে পাইয়াছে সে আর ভাল পথে ফিরিবে না।

তারপর একদিন শ্রাবণের ক্ষান্তবর্ষণ সন্ধ্যায় তাহাকে শেষ দেখিলাম। মাস তিনেক তাহাকে দেখি নাই। লাইব্রেরীতে আমরা সকলে বসিয়া ছিলাম, সে আসিয়া ছড়িটা টেবিলের উপর রাখিয়া দাঁড়াইল।

আকস্মিক আবির্ভাবে আমরা বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া চাহিলাম। দেখিলাম সে অনেকটা রোগা হইয়া গিয়াছে, ধারালো মুখ যেন মাংসের অভাবে আরো ধারালো হইয়া উঠিয়াছে, ওষ্ঠে একটা শ্রীহীন শুষ্কতার আভাস।

আমরা কোনও সম্ভাষণ করিলাম না; আমার মনে হইল, দেবব্রত যেন আমাদের নিকট হইতে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে, কোথাও আমাদের মধ্যে যোগসূত্র নাই। সেও যেন এই দূরত্বের ব্যবধান বুঝিতে পারিল, গলাটা একবার ঝাড়িয়া লইয়া বলিল, 'দাদা, আপনাদের নেমন্তন্ন করতে এসেছি।'

দাদা নিরুৎসুক ভাবে বলিলেন, 'অনেক দিন পরে দেখছি। বস। কিসের নেমন্তন্ন? বিয়ে করছ নাকি?'

দেবব্রত বসিল না, বলিল, 'হ্যাঁ বিয়ে করছি। আত্মীয়-স্বজন আমার কেউ নেই, বন্ধুর মধ্যে আপনারা। তাই নিমন্ত্রণ জানাতে এসেছি, সশরীরে উপস্থিত থেকে শুভকার্য সম্পন্ন করাবেন।' তাহার শুষ্ক মুখে পরিহাসের চেষ্টা ভাল মানাইল না।

দাদা সহসা জবাব দিলেন না; পকেট হইতে কয়েক খণ্ড সুপারি বাহির করিয়া গালে ফেলিয়া চিবাইলেন, তারপর বলিলেন, 'বিয়ে করছ? বিয়েটা অবশ্য বন্ধন, তোমার মত জ্ঞানী লোক ইচ্ছে করে কেন এ ফাঁস গলায় পরছে বোঝা যাচ্ছে না, তা সে যাক। তোমার সেই অপদেবতাটি ঘাড় থেকে নেমেছে, এতেই আমরা খুশী। কোথায় বিয়ে করছ?'

দেবব্রতের মুখখানা ফ্যাকাসে হইয়া গেল; সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তার পর আস্তে আস্তে বলিল, 'আমি তাকেই বিয়ে করছি।'

দাদার সুপারি-চর্বণ বন্ধ হইয়া গেল; আরও বিস্ফারিত নেত্রে চাহিলেন। তাহাকেই বিবাহ করিতেছে! সে কি!

দাদা বলিলেন, 'ঠিক বুঝতে পারলুম না! যে ভ্রষ্টা স্ত্রীলোককে তুমি নিজের কাছে রেখেছিলে তাকেই এতদিন পরে বিয়ে করতে চাও—এই কথাই কি আমাদের জানাতে এসেছ?'

দেবব্রত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর আস্তে আস্তে অবরুদ্ধ কণ্ঠ হইতে কথা বাহির করিল, 'সে ভ্রষ্টা নয়। ছেলেমানুষ—একজনের প্রলোভনে পড়ে—কিন্তু সে সত্যই মন্দ নয়, আমি তার পরিচয় পেয়েছি—' দেবব্রতের এরকম কণ্ঠস্বর আমি কখনও শুনি নাই, সে যেন মিনতি করিতেছে। তাহার ঠোঁট দুটা কাঁপিতে লাগিল।

দাদা কঠিন স্বরে বলিলেন, 'ভাল-মন্দের বিচারক তুমি একলা নয়, আমরাও কিছু কিছু বিচার করতে পারি। মাথায় উপর সমাজ রয়েছে। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমরা দু'জনে যেভাবে ছিলে সেই ভাবেই থাকলে পারতে, তাতে নিন্দে হত বটে, কিন্তু সমাজের মুখে চুনকালি পড়ত না। এ বিয়ের ভড়ংয়ে দরকার কি?'

তেমনি পাণ্ডুর মুখে দেবব্রত বলিল, 'দাদা, আমি—আমরা একবাড়িতে আছি বটে, কিন্তু কখনো—' তাহার কণ্ঠস্বরে হঠাৎ পূর্বতন তীক্ষ্ণতা ফিরিয়া আসিল, 'ছি! আপনি কি মনে করেন, যার মন পাইনি তাকে আমি—'

দাদা হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—'ও, সেই পুরোনো পদ্য—"অপবিত্র ও কর-পরশ"।' দাদা আবার খানিকটা হাসিলেন, 'যা হোক, এতদিনে মন পেয়েছ তাহলে?'

'পেয়েছি বলেই মনে হয়।'

'একেবারে অহৈতুকী প্রীতি! খাঁটি জিনিস বটে তো? ও বাজারে মেকিও চলে কিনা, তাই জিজ্ঞাসা করছি। সে যাক। তুমি আমাদের নেমন্তন্ন করতে এসেছ। তুমি আশা কর আমরা এই বিয়েতে যোগ দেব? কেন—তুমি বড়লোক বলে?'

দেবব্রত নীরবে মুঠি শক্ত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার বিবর্ণ, লাঞ্ছিত মুখখানা দেখিয়া আমার ক্লেশ হইতে লাগিল। দাদার কথা-গুলা সত্য হইলেও অত্যন্ত নিষ্ঠুর, তাই সুরটা নরম করিবার জন্য আমি বলিলাম, 'দেবব্রত, তোমার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আমরা কিছু বলতে চাই না, একজন অপরিচিতা নারীকেও আমরা আলোচনার বাইরে রাখতে চাই—কিন্তু এ রকম একটা অনুষ্ঠানে আমি—'

দেবব্রত আমার পানে চাহিল, তাহার চোখের মধ্যে একটা কাতর অনুনয় দেখিতে পাইলাম। সে বলিল, 'মন্মথ, তুমিও আমার বিয়েতে যাবে না?'

আমি দাদার দিকে চাহিলাম, দাদা জলদগম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'যার ইচ্ছে যেতে পারে, কিন্তু আমি এসব ভ্রষ্টাচারের মধ্যে নেই। সমাজের মাথায় যারা লাথি মারে, তারা সমাজের সহানুভূতি প্রত্যাশা করে কোন্ মুখে?'

দেবব্রত আবার বলিল, 'মন্মথ, তুমি—'

আমি মাথা নাড়িলাম—'আমি সত্যই দুঃখিত, কিন্তু আমি পারব না।'

দেবব্রত আর সকলের দিকে ফিরিল, 'তোমরাও কেউ যাবে না?'

সকলেই মাথা নাড়িল।

দেবব্রত কিছুক্ষণ হেঁটমুখ দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর আস্তে আস্তে ছড়িটা তুলিয়া লইয়া অস্পষ্ট স্বরে বলিল, 'আচ্ছা বেশ—'

আমি তাহার মুখের দিকে তাকাইতে পারিলাম না; মনে হইতে লাগিল তাহার কাছে কত বড় অপরাধ করিতেছি।

দেবব্রত চলিয়া গেল।

তারপর ষোল বৎসর দেবব্রতকে দেখি নাই। এতদিনে তাহার বয়স চল্লিশ পার হইয়া গেল। কেমন আছে, কোথায় আছে জানি না, হয়তো সেই পুরাতন বাড়িতেই বন্ধুহীন আত্মীয়হীন ভাবে বাস করিতেছে।

দেবব্রত বিবাহের বিরোধী ছিল, তবু কেন সে সেই মেয়েটাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল তাহা আজও ভাল বুঝিতে পারি নাই। হয়তো যাহাকে সে ভালবাসিয়াছিল, অন্যে তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে তাহা সহ্য করিতে পারে নাই; তাই সেই শ্রাবণ-সন্ধ্যায় সমস্ত বুদ্ধির অহঙ্কার বিসর্জন দিয়া আমাদের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতে আসিয়াছিল। কিম্বা—কিন্তু আর কি হইতে পারে?

সেদিন দুষ্কৃতির প্রশ্রয় আমরা দিই নাই; তাহাকে অশেষ ভাবে লাঞ্ছিত করিয়া তাহার ভালবাসার পাত্রীকে অপমান করিয়াছিলাম। অন্যায় করিয়াছিলাম, এমন কথাও বুকে হাত দিয়া বলিতে পারি না। তবু আজ এই ক্ষান্তবর্ষণ সন্ধ্যায় তাহার সেদিনকার পীড়িত বিবর্ণ মুখখানা মনে পড়িয়া মনটা অন্যায় ভাবে ব্যথিত হইয়া উঠিতেছে।

এখন তাহারা কেমন আছে—কে জানে, আছে কিনা তাই বা কে জানে! আমাদের সার্বভৌম 'দাদা'র ধারণা, দুষ্কৃতরা অধিকদিন ধরার ভার বৃদ্ধি করিবার সুযোগ পায় না।

২৬ শ্রাবণ ১৩৪২

স্বখাত সলিল

যৌবনের দৃঢ় অসন্দিগ্ধ চিত্তবল অন্য বয়সে দেখা যায় না। যৌবনে সমগ্র বস্তুকে হয়তো আমরা সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাই না, কিন্তু যেটুকু দেখি খুব স্পষ্টভাবে দেখি। তাই, চল্লিশ পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখে যখন 'চাল্‌শে' ধরে, মনও তখন স্পষ্ট দেখার নিঃসংশয় দৃঢ়তা হারাইয়া ফেলে। হয়তো দৃষ্টি ধোঁয়াটে হওয়ার সঙ্গে দৃষ্টির ক্ষেত্র কিছু বিস্তৃত হয়; কিন্তু মোটের উপর একরোখা ভাবে নিজেকেই নির্ভুল মনে করিবার অকুণ্ঠিত সাহস আর থাকে না।

দেবব্রতের কথা যখন মনে পড়িত, তখন ভাবিতাম তাহার বয়সও তো চল্লিশ পার হইয়া গেল; যৌবনের অদম্য দুঃসাহসিকতায় একদিন সে যাহা করিয়াছিল, আজ কি সেজন্য তাহার অনুশোচনা হয় না? বিদ্রোহীর রক্ত-রাঙা ঝাণ্ডা কি এখনও সে তেমনি খাড়া রাখিতে পারিয়াছে?

কারণ, যে দুর্গম পথে সে একাকী যাত্রা শুরু করিয়াছিল, আদর্শের বৈজয়ন্তী কাঁধে লইয়া সে পথে চলা যে কত কঠিন, তাহা তো আর কাহারও অবিদিত নাই। পদে পদে নূতন সমস্যার সৃষ্টি হয়, অথচ তাহাদের জট ছাড়াইবার সময় যৌবনের কল্পনা-উদ্ভূত আদর্শ কোনও কাজে লাগে না।

তারপর দেবব্রতের সঙ্গে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হইয়া গেল। ব্যবসার উপলক্ষে মধ্য-প্রদেশের এক অখ্যাতনামা ক্ষুদ্র শহরে গিয়াছিলাম। সেখানে যে বাঙ্গালী কেহ থাকিতে পারে, এ সম্ভাবনা আদৌ মনে আসে নাই; ইচ্ছা ছিল ধর্মশালায় দু'দিন থাকিয়া কাজ শেষ করিয়া ফিরিব।

স্টেশনে নামিয়া গাড়ির খোঁজ করিতে গিয়া দেখি, দেবব্রত একখানা চক্‌চকে আট

সিলিন্ডার মোটর হইতে নামিতেছে।

ক্ষণকালের জন্য নির্বাক্ হইয়া গেলাম। তারপর বলিয়া উঠিলাম, 'দেবব্রত! তুমি এখানে?'

দেবব্রত আমাকে দেখিতে পাইয়াছিল, সে এক লাফে আসিয়া আমাকে দু'হাতে জড়াইয়া ধরিল—'মন্মথ! তুমি হঠাৎ এখানে? উঃ কতদিন পরে দেখা!' বলিতে বলিতে তাহার গলাটা ভারী হইয়া আসিল।

দেখিলাম তাহার চেহারা বিশেষ বদলায় নাই, একটু মোটা হইয়াছে; কিন্তু মুখের সেই ধারালো তীক্ষ্নতা এখনও তেমনি অম্লান আছে। মাথার ছোট-করিয়া-ছাঁটা কোঁকড়া চুল রগের কাছে পাকিতে আরম্ভ করিয়াছে।

দেবব্রত আমাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল, 'কাজে এসেছ নিশ্চয়। কি কাজ পরে শুনব, এখন ক'দিন আছ?'

'দু'দিন। কাল সন্ধ্যের গাড়িতে যেতে হবে।'

'থাকবার কোন আস্তানা নেই তো?'

'ধর্মশালায় থাকব ঠিক আছে।'

'ওসব চালাকি চলবে না, আমার বাড়িতে থাকতে হবে।'

আমার স্যুটকেসটা হাত হইতে কাড়িয়া মোটরে রাখিয়া আসিল, তারপর সপ্রশ্ননেত্রে আমার পানে তাকাইল।

আমি বলিলাম, 'কিন্তু—'

'কিন্তু কি? আপত্তি আছে?'

মনটাকে একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিলাম, 'না—চল।'

দেবব্রত আমার হাতটা চাপিয়া প্রায় গুঁড়া করিয়া দিবার উপক্রম করিল, তারপর বলিল, 'তুমি গাড়িতে বস। আমি পার্শেল অফিসে একবার খোঁজ নিয়ে আসি, একটা পার্শেল আসবার কথা আছে।'

গাড়িতে গিয়া বসিলাম। দেবব্রতের মনের ভিতর অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে; আগে তাহার একটা স্বাতন্ত্র্যের ভাব ছিল, যেন নিজেকে দূরে দূরে রাখিত, এখন সেটা নাই। বোধ হয় বয়সের গুণে। ভাবিতে লাগিলাম, বয়সের গুণে আমারও কি এমনি অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। হয়তো হইয়াছে, নচেৎ এত সহজে তাহার আতিথ্য স্বীকার করিলাম কি করিয়া? আর একদিনের কথা মনে পড়িল, যেদিন তাহার সহিত এক ট্যাক্সিতে যাইতে সম্মত হই নাই।

মিনিট পাঁচ-ছয় পরে দেবব্রত ফিরিয়া আসিল, তাহার সঙ্গে একজন কুলী একটা মাঝারি গোছের বাস্কেট মাথায় করিয়া আনিয়া গাড়িতে তুলিয়া দিল।

দেবব্রত নিজেই গাড়ি চালাইয়া আসিয়াছিল, কুলীকে বিদায় করিয়া গাড়িতে স্টার্ট দিল। গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিল।

বেলা তখন সাড়ে দশটা। ক্ষুদ্র গলিবহুল শহরের ভিতর দিয়া দেবব্রত সাবধানে গাড়ি চালাইয়া লইয়া চলিল। আমি কি সম্ভাষণ করিব কিছুই ভাবিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

শহরের ঘিঞ্জি অংশ পার হইয়া দেবব্রত জোরে মোটর চালাইয়া আমার দিকে চাহিয়া হাসিল। মনে হইল, আমাকে পাইয়া সে অকৃত্রিম ভাবে খুশী হইয়াছে। হাসিতে এই আনন্দের প্রতিবিম্ব পড়িল।

কি বলিব কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া শেষে বাজে প্রশ্ন করিলাম, 'বাস্কেটে কি আছে?'

'গলদা চিংড়ি। মাঝে মাঝে কলকাতা থেকে আনাই। ভালই হল, ঠিক সময়ে এসে পেঁছেছে।' বলিয়া আবার স্নিগ্ধচোখে আমার পানে চাহিয়া হাসিল।

আমি বলিলাম, 'তুমি এইখানেই স্থায়ীভাবে বাস করছ তাহলে?'

'হ্যাঁ। শহর থেকে একটু দূরে ফাঁকা জায়গায় একখানা বাড়ি কিনে আছি।'

'কলকাতার বাস তুলে দিলে?'

'হ্যাঁ।'

'কতদিন এখানে আছ?'

'বার বছর। কেয়ার বয়স।'

চমকিয়া তাহার দিকে চাহিলাম।

সে সহজভাবে বলিল, 'কেয়া আমার বড় মেয়ে, তার বয়স এই বার চলেছে।'

বাহিরের দিকে চোখ ফিরাইয়া রহিলাম। বড় মেয়ের বয়স বার। হয়তো আরও সন্তানাদি হইয়াছে। তাহার স্ত্রী—, অনেকগুলা প্রশ্ন মনের মধ্যে গজগজ করিতে লাগিল, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না।

দেবব্রতের বাড়িতে আসিয়া পেঁছিলাম। পাঁচিল-ঘেরা বিস্তৃত বাগানের মাঝখানে ভিলা-জাতীয় বাড়ি; আশেপাশেও ঐ রকম বাগান-যুক্ত বাড়ি রহিয়াছে। বুঝিলাম, এটি সৌখীন ধনী ব্যক্তিদের পাড়া।

দেবব্রত আমাকে একটা সুসজ্জিত ঘরে বসাইয়া ভিতরে প্রস্থান করিল; কিয়ৎকাল পরে আবার ফিরিয়া আসিয়া বসিল, বলিল, 'তোমার কাজ কি খুব জরুরী? এখনই বেরুতে হবে?'

আমি বলিলাম, 'হ্যাঁ। খেয়ে-দেয়ে বেলা বারটা নাগাদ বেরুলেই চলবে।'

পর্দা সরাইয়া একটি স্ত্রীলোক ঘরে প্রবেশ করিল। চমকিয়া মুখ তুলিয়াই চিনিতে পারিলাম; ষোল বছর আগে একবার মাত্র রাস্তার গ্যাসের আলোয় দেখিয়াছিলাম, তবু চিনিতে কষ্ট হইল না। পরিধানে সাধারণ শাড়ি শেমিজ, সিঁথিতে সিন্দুর জ্বল জ্বল করিতেছে। যে বয়সে গৃহিণী, সচিব, সখী, প্রিয় শিষ্যা ও জননীর একই দেহে সম্মিলন হয় এ সেই বয়স; যৌবনের উন্দাম বর্ষা আর নাই, নির্মল শারদ স্বচ্ছতার ভিতর দিয়া তল পর্যন্ত দেখা যায়।

সে আমার সম্মুখে অবিচলিত থাকিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তবু ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার মুখখানা রাঙা হইয়া উঠিল। এই লজ্জাকর লজ্জা ঢাকিবার জন্যই যেন তাড়াতাড়ি নত হইয়া আমাকে একটা প্রণাম করিল। আমি বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলিলাম, 'থাক, থাক।'

সে উঠিয়া দাঁড়াইল, জোর করিয়া আমার চোখের উপর চোখ রাখিয়া বলিল, 'ভাল আছেন?' এই কথা দুইটা কণ্ঠ হইতে বাহির করিতে তাহাকে যে কতখানি ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিতে হইল, তাহা তাহার স্বর শুনিয়া বুঝিলাম।

কুণ্ঠিত অপরাধীর মত একটা 'হ্যাঁ' বলিয়া আমি আর কিছু বলিতে পারিলাম না। দেবব্রতের উপর রাগ হইতে লাগিল। আমার সম্মুখে এমন ভাবে স্ত্রীকে টানিয়া আনিবার কি দরকার ছিল? আমি কে? দু'দিনের অতিথি বই তো নয়। কিন্তু তবু ভাবিয়া দেখিতে গেলে দেবব্রতের পক্ষে ইহাই একান্ত স্বাভাবিক, সে যে কোন অবস্থাতেই পর্দা-প্রথা মানিবে, তাহা কল্পনা করাও দুষ্কর।

দেবব্রত এতক্ষণ জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া ছিল, এবার ফিরিয়া স্ত্রীকে বলিল, 'মন্মথ খেয়ে-দেয়ে কাজে বেরুবে—ওর জন্যে—'

বাড়ির গৃহিণী যেন এতক্ষণে নিজ অধিকারের গণ্ডীর মধ্যে ফিরিয়া আসিল;

তাহার গলার স্বর শুনিয়া বুঝিলাম মিথ্যা কুণ্ঠার কুয়াশা কাটিয়া গিয়াছে। সে বলিল, 'রান্না তৈরি আছে। উনি নেয়ে নিন। তুমিও নেয়ে নাও না, একসঙ্গে বসে খাবে।' বলিয়া ক্ষিপ্রচরণে আহারের ব্যবস্থা করিতে চলিয়া গেল।

স্নানাদি সারিয়া একসঙ্গে আহারে বসিলাম। পাচক ব্রাহ্মণ পরিবেশন করিল, দেবব্রতের স্ত্রী দাঁড়াইয়া আমাদের খাওয়াইল। দেবব্রত হাসিয়া গল্প করিতে লাগিল, স্ত্রীকে আমার জন্য এটা-ওটা আনিয়া জোর করিয়া খাওয়াইবার উপদেশ দিল। তাহাদের কথায় আচরণে কোথাও একটু কুণ্ঠার চিহ্ন প্রকাশ পাইল না। তবু আমি নিঃসঙ্কোচে তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পারিলাম না। মনের ভিতরটা আড়ষ্ট ও অস্বচ্ছন্দ হইয়া রহিল।

কাজ সারিয়া ফিরিতে বেলা সাড়ে চারিটা বাজিয়া গেল।

বারান্দার উপর দেবব্রত দাঁড়াইয়া আছে: তাহার পাশে তাহার একটা হাত জড়াইয়া ধরিয়া একটি মেয়ে।

দেবব্রত বলিল, 'আমার মেয়ে কেয়া।—কেয়া, এঁকে প্রণাম কর।'

বাপের উগ্র সৌন্দর্যের সহিত মায়ের কোমল লাবণ্য মিশিয়া কেয়ার রূপ হইয়াছে অপরূপ! এখনও যৌবন বহুদূরে, কচি মেয়ের মুখের একটি অচপল শান্তশ্রী মনকে মুগ্ধ করে।

কেয়া আমাকে প্রণাম করিল; আমি বলিলাম, 'তোমাকে আজ সকালে দেখিনি কেন?'

হাস্যোজ্জ্বল চোখে কেয়া বলিল, 'আমরা ইস্কুলে গিয়েছিলুম।'

তারপর ঘরে বসিয়া চা পান করিতে করিতে দেখিলাম, একটি ছয়-সাত বছরের ছেলে ভীরু মৃগশিশুর মত দূর হইতে আমাকে দেখিতেছে। সারঙ্গচক্ষুর মত বিস্ফারিত কালো চোখ দুটিতে অসীম কৌতূহল; কিন্তু সে কাছে আসিতেছে না, একবার এ-দরজা একবার ও-দরজা হইতে উঁকি মারিতেছে।

আমি তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিলাম, সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

কেয়া বাপের চেয়ারের পাশে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, কহিল, 'মণ্টুর বড্ড লজ্জা, নতুন মানুষ দেখলে ও কিছুতেই কাছে আসে না! না বাবা?'

মণ্টুর চেহারায় মায়ের ছাপ বসানো, কাজেই পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে হইল না। দেবব্রত 'মণ্টু, এদিকে আয়' বলিয়া দু'বার ডাকিল, কিন্তু মণ্টুর সাড়া পাওয়া গেল না।

ঘরের তৈয়ারি রসগোল্লায় কামড় দিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমার ক'টি ছেলে মেয়ে?' কথাটা এ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

দেবব্রত বলিল, 'এই দু'টি।'

নীরবে জলযোগ শেষ করিলাম।

রুমালে মুখ মুছিতেছি, শুনিতে পাইলাম কেয়া তাহার বাপের কানে কানে বলিতেছে, 'বাবা, ইনি আমাদের কে হন?'

দেবব্রত বলিল, 'উনি তোমাদের বাবার বন্ধু হন?'

কেয়া একটু নিরাশ হইল। ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার ফিসফিস করিয়া বলিল, 'ওঁকে আমি কি বলে ডাকব?'

দেবব্রত স্নিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি বলে ডাকতে তুমি চাও?'

কেয়া একবার চকিতে আমার দিকে তাকাইয়া বাপের গলা জড়াইয়া কানে কানে কি বলিল, শুনিতে পাইলাম না; কিন্তু দেবব্রতের মুখের যে পরিবর্তন হইল তাহা দেখিতে পাইলাম। সে একবার মাথা নাড়িয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, আমাকে বলিল,

'তুমি বিশ্রাম কর, একবার বাজারটা ঘুরে আসি। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরব।' বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তাহার এই হঠাৎ উঠিয়া চলিয়া যাওয়ার মধ্যে এমন কিছু ছিল যে কেয়া একটু আহত ও অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। আমিও তাহাদের চুপি চুপি কথাবার্তায় কেমন অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম, কেয়াকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি ইস্কুলে কি পড়?'

কেয়া বলিল, 'বাংলা আর সংস্কৃত।'

বিস্মিত হইয়া বলিলাম, 'ইংরিজি পড় না?'

'না, মা ইংরিজি পড়া ভালবাসেন না।'

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম, শেষে বলিলাম, 'সংস্কৃত কি পড়?'

'ব্যাকরণ আর কাব্য।'

'কোন্ কাব্য?'

'কুমারসম্ভব।'

অবাক হইয়া বলিলাম, 'কুমারসম্ভব বুঝতে পার?'

কেয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ। যেখানে বুঝতে পারি না, পণ্ডিতজী বুঝিয়ে দেন!'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কুমারসম্ভবের কোন্ সর্গ সব চেয়ে ভাল লাগে?'

কেয়া উৎসাহে দুই করতল যুক্ত করিয়া উজ্জ্বল চোখে বলিল, 'সপ্তম সর্গ—যেখানে উমার সঙ্গে মহাদেবের বিয়ে হল।'

'আর, পার্বতীর তপস্যা ভাল লাগে না?'

'হ্যাঁ, তাও খুব ভাল লাগে।' তারপর আমার চেয়ারের হাতলে বসিয়া আমার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা, মহাদেব পার্বতীকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন কেন বলুন তো?'

আমি একটু চিন্তা করিয়া বলিলাম, 'বোধহয় পার্বতীকে কষ্ট দেবার লোভ মহাদেব সামলাতে পারেননি।'

খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কেয়া বলিল, 'যাঃ—তা কেন হবে?'

'তবে?'

মুখ গম্ভীর করিয়া সে বলিল, 'কষ্ট না পেলে মহাদেবের মত বর পাওয়া যায় না, তাই।'

কেয়ার মত মেয়ে দেখি নাই। বার বছর বয়স, কিন্তু মনটি তপোবন-কন্যার মত। বুঝিলাম কথাগুলা তাহার নিজের নয়। তাহার কোঁকড়া নরম চুলে হাত বুলাইয়া বলিলাম, 'ও—তাই হবে বোধ হয়।'

হঠাৎ কেয়া বলিল, 'আচ্ছা, আপনি এতদিন আসেননি কেন?'

কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না, শেষে বলিলাম, 'তোমাকে তো জানতুম না, তাই আসিনি।'

'বাবাকে, মাকে তো জানতেন, তবে আসেননি কেন?'

কঠিন প্রশ্ন, এড়াইয়া গেলাম। বলিলাম, 'আমি এসেছি বলে তুমি খুশী হয়েছ?'

মাথাটি হেলাইয়া সে বলিল, 'হ্যাঁ, খুব খুশী হয়েছি। আমাদের বাড়িতে কক্‌খনো কেউ আসেন না, আমরাও কোথাও যেতে পাই না। আমার ইস্কুলের বন্ধু রূপকুমারী ছুটি হলে মামার বাড়ি যায়—' কেয়ার কণ্ঠ ম্রিয়মাণ হইয়া আসিল—'মা বলছিলেন কালই আপনি চলে যাবেন। আবার কবে আসবেন?'

আমি সহসা কেয়ার মুখ কাছে টানিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কেয়া, তখন তোমার বাবার কানে কানে কি বলছিলে? আমাকে কি বলে তুমি ডাকতে চাও?'

কেয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বলিল, 'সে—সে কিছু না—' তারপর মুখ [illegible]
বলিল, 'ঐ মণ্টু উঁকি মারছে! ওকে ধরে নিয়ে আসি, দাঁড়ান। একবার ভাব হয়ে গেলে ওর আর লজ্জা থাকে না।'

কেয়া মণ্টুর পিছনে ছুটিয়া গেল। আমি অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম কিন্তু তাহারা ফিরিয়া আসিল না। বোধ হয় কেয়া মণ্টুকে ধরিতে পারে নাই।

রাত্রে আমি শয্যা আশ্রয় করিলে দেবব্রত খাটের পাশে একটা ইজি-চেয়ার টানিয়া বসিল। আলোটা ঘরের কোণে আবছায়া ভাবে জ্বলিতেছিল; এই প্রায়ান্ধকারের মধ্যে আমরা অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলাম।

শেষে দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, 'কালকেই যাওয়া ঠিক তাহলে? আর দু'দিন থাকতে পারবে না?'

বলিলাম, 'না, অনেক কাজ ফেলে এসেছি, গিন্নীরও শরীরটা ভাল নয়।—কেন বল দেখি?'

'তোমাকে পেয়ে কেয়া আর মণ্টু ভারি উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তুমি ছাড়া ওদের মুখে অন্য কথা নেই। ওদের জীবনে এ একটা নূতন অভিজ্ঞতা কি না!'

আবার দীর্ঘকাল দু'জনে নীরব রহিলাম।

তারপর আমি বলিলাম, 'দেবব্রত, তোমার অনেক পরিবর্তন হয়েছে।'

সে বলিল, 'হ্যাঁ, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই হয়। তোমারও হয়েছে।'

'আমার? কি জানি—'

কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলাম, 'তুমি কলকাতার বাস তুলে দিলে কেন? এখানে তো বাঙালীর মুখ দেখতে পাও না।'

'কেন, বুঝতে পারছ না?'

'ছেলে-মেয়ের জন্যে?'

'হ্যাঁ। ওদের দোষ কি? ওরা কেন শাস্তি পাবে?'

'কিন্তু এখানে লুকিয়ে থেকে কি ওদের বাঁচাতে পারবে? সমাজ বড় কঠোর, বড় ছিদ্রান্বেষী।'

'তা জানি বলেই তো এই স্বজাতিহীন বিদেশে লুকিয়ে থেকে সমাজকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করছি। সমাজ আমাদের প্রতি অন্যায় পীড়ন করতে চায়, আমি তা করতে দেব না।'

'সমাজ অন্যায় পীড়ন করতে চায়, একথা তুমি কি করে বল?'

'পুরানো তর্কে দরকার নেই। কিন্তু বাপ-মায়ের কল্পিত অপরাধ সন্তানের ঘাড়ে চাপানোটাও সুবিচার নয়।'

আমি প্রশ্ন করিলাম, 'তোমার ছেলেবেলার মতগুলো এখনো বদলায়নি?'

'কিছু বদলেছে, সব বদলায়নি।'

'বিবাহ সম্বন্ধে?'

'বিশেষ বদলায়নি। বিবাহের একটা লৌকিক উপকারিতা আছে। কিন্তু তবু বলব, বিবাহ কৃত্রিম বন্ধন। যেখানে প্রেম আছে সেখানে বিবাহ নিষ্প্রয়োজন, যেখানে তা নেই, সেখানে বিবাহ একটা বীভৎস পাশবিকতা।'

একবার ইচ্ছা হইল, জিজ্ঞাসা করি সে নিজে কেন বিবাহ করিয়াছিল। প্রশ্ন অরুচিকর হইলেও সে সোজা উত্তর দিবে জানিতাম, কারণ দেবব্রতের মনে কোথাও ফাঁকি ছিল

না। কিন্তু তাহাকে আঘাত করিতে সঙ্কোচ বোধ হইল।

বলিলাম, 'ঘুম পাচ্ছে এবার শোও গে।'

দেবব্রত উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমার অনুচ্চারিত প্রশ্নের জবাব দিল, 'দ্বিজু রায়ের একটা হাসির গান আছে, 'তারেই বলে প্রেম'। গানটা হাসির নয়, অত্যন্ত করুণ। কিন্তু একথাও ঠিক যে মানুষ একলা থাকতে পারে না; তাই সমাজ যত অবিচারই করুক, তাকে নিয়ে কারবার করতে হয়। আমি সমাজকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করছি; তার জন্য আমার মনে বিন্দুমাত্র গ্লানি নেই; আমি আজ পর্যন্ত জেনে বুঝে কোনও অন্যায় কাজ করিনি; আর কাউকে করতেও বলিনি। নিজের কাছে আমি খাঁটি আছি। এখন কথা হচ্ছে, যাদের আমি বন্ধু বলে মনে করি তারা আমায় সাহায্য করবে কি না।'

শেষ কথাটার মধ্যে যে তীক্ষ্ণ প্রশ্ন ছিল তাহা আমার কানে বাজিল। কিন্তু উত্তর দিতে পারিলাম না। দেবব্রত কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, বোধ হয় একটা কিছু প্রত্যাশা করিল। তারপর 'ঘুমোও' বলিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

ইহার পর অনেকক্ষণ ঘুম আসিল না; দেবব্রতের কথাগুলা মনের মধ্যে ওলট-পালট করিতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে কেয়ার শিশু-মুখ ও মণ্টুর হরিণ-চোখ দৃষ্টিপটের উপর ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

হঠাৎ মনে হইল, দেবব্রতের স্ত্রী যে গৃহত্যাগিনী একথা আমি ছাড়া প্রত্যক্ষভাবে আর কে জানে?

সকালবেলা মণ্টু নিজে আসিয়া ভাব করিয়া ফেলিল। তখনও শয্যাত্যাগ করি নাই, সে মুখখানি অতিশয় করুণ করিয়া নিজের একটি আঙুল দেখাইয়া বলিল, 'কেটে গেছে।'

আমি উঠিয়া বসিয়া আঙুল পরীক্ষা করিলাম, কিন্তু ক্ষতচিহ্ন এতই আণুবীক্ষণিক যে চোখে দেখা গেল না। বলিলাম, 'তাইতো, বড্ড লেগেছে। এস, জলপটি বেঁধে দিই।'

পটি বাঁধা হইলে মণ্টু বলিল, 'আমার একটা কোকিল আছে।'

বিস্মিতভাবে বলিলাম, 'তাই না কি! কই আমাকে দেখালে না?'

মণ্টু জানালার বাহিরে একটা গাছের দিকে নির্দেশ করিয়া বলিল, 'ঐ গাছে বসে রোজ ডাকে, আবার উড়ে যায়। ওটা আমার কোকিল। দিদির কোকিল নেই?'

বনের পাখির উপর এমন অবাধ স্বত্বাধিকার প্রচার করিতে দেখিয়া আমি থতমত খাইয়া গেলাম, বলিলাম, 'তোমার আর কি আছে?'

অত্যন্ত রহস্যপূর্ণভাবে মণ্টু পকেট হইতে একটি ফলাভাঙা ছুরি বাহির করিয়া দেখাইল, প্রশ্ন করিল, 'তোমার ছুরি আছে?'

বিষণ্ণভাবে বলিলাম, 'না। তোমার ছুরিটা আমায় দেবে?'

দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া মণ্টু বলিল, 'না। তোমাকে একটা লাট্টু দেব।'

'কিন্তু আমি যে লাট্টু ঘোরাতে জানি না।'

'আমি শিখিয়ে দেব।'

এইরূপ আলাপ আলোচনার মধ্যে সে ধীরে ধীরে আমার কোলের কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল, এখন আমার জানুর উপর উপবেশন করিয়া এক প্রচন্ড প্রশ্ন করিয়া বসিল, 'তুমি আমার, না দিদির?'

কোকিলের মত আমাকেও নিশ্চয় মণ্টু ইতিমধ্যে নিজের খাস-সম্পত্তি করিয়া লইয়াছে, মহা দ্বিধায় পড়িয়া গিয়া বলিলাম, 'তাইতো, একথা তো ভেবে দেখিনি।

দু'জনেরই হওয়া কি চলে না?'

এমন সময় মণ্টুর দিদি প্রবেশ করিল। মণ্টু লাফাইয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 'না তুমি আমার, দিদির নয়— দিদির নয়।'

দিদিও ছাড়িবার পাত্রী নয়, পিছন হইতে আমাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 'কক্খনো না। তুই কাল কেন আসিসনি, উনি আমার।'

এ বিবাদের মীমাংসা সহজে হইত না, কিন্তু এই সময় তাহাদের মা দরজার পর্দা সরাইয়া এই দৃশ্য দেখিয়া বলিয়া উঠিল. 'ও কি হচ্ছে! ছেড়ে দে, ওঁকে জ্বালাতন করিসনি। আপনি চা খাবেন আসুন।'

হৃদয়ের মধ্যে অদ্ভুত পূর্ণতা লইয়া চা খাইতে গেলাম।

তারপর যতক্ষণ বাড়িতে রহিলাম, মণ্টু ও কেয়া আমার সঙ্গ ছাড়িল না; আমাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া স্কুলেও গেল না। আমাকে লইয়া তাহাদের শিশুচিত্তের এই অপূর্ব আনন্দ-সমারোহ যেন আমারও মনে নেশা জাগাইয়া তুলিল।

কাজে বাহির হইতে বেলা একটা বাজিল। তিনটার সময় ফিরিয়া আসিলাম। কাজ শেষ হইল না; কিন্তু সে যাক।

সন্ধ্যার ট্রেনে যাইব। তার আগে যতটুকু সময় পাইলাম কেয়া ও মণ্টুর সঙ্গেই কাটাইলাম। দেবব্রত আমার ইচ্ছা বুঝিয়া আলগোছে রহিল।

ক্রমে যাবার সময় উপস্থিত হইল। আমি উঠিয়া দেবব্রতকে বলিলাম, 'আমি এক-বার অণিমার সঙ্গে দেখা করে আসি। তুমি বস।' দেবব্রত চকিতভাবে আমার দিকে তাকাইয়া ঘাড় নাড়িল।

পাঁচ মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া মোটরে উঠিলাম। কেয়া ও মণ্টু আগে হইতেই গাড়িতে উঠিয়া বসিয়াছিল; দেবব্রত নিজে গাড়ি চালাইয়া লইয়া চলিল। আমার গলাটা এমন বুজিয়া গিয়াছিল যে. প্রথম খানিকক্ষণ কথা কহিতে পারিলাম না। একটি কৃতজ্ঞ নতজানু নারীর অশ্রুপ্লাবিত মুখ চোখের সম্মুখে ভাসিতে লাগিল।

মণ্টু ও কেয়া আমার পাশ ঘেঁষিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। স্টেশনে পৌঁছিতে যখন আর দেরি নাই, তখন কেয়া চুপি চুপি আমার পকেটে হাত দিয়া কি রাখিয়া দিল। জিনিসটি বাহির করিয়া দেখিলাম, একটি ছোট্ট রুমাল, কোণে লাল রেশমী সুতায় কেয়ার নাম লেখা। আমি কেয়ার মাথা টানিয়া আনিয়া কপালে চুম্বন করিলাম।

মণ্টু ম্লানমুখে একটি রং-চটা প্রাচীন লাট্টু আমার হাতে গুঁজিয়া দিল। আমি তাহাদের দু'জনের মুখ কাছে আনিয়া বলিলাম, 'আমি তোমাদের কে জান? আমি তোমাদের মামা।'

একটু অবিশ্বাস ও অনেকখানি আনন্দ চোখে ভরিয়া দু'জনে আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

আমি বলিলাম, 'সত্যি, তোমাদের মা জানেন। তিনি আমার বোন হন; বাড়ি গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করো। আর. এবার ছুটি হলে তোমরাও রূপকুমারীর মত মামার বাড়ি যাবে।'

ট্রেন ছাড়িলে জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেবব্রতকে বলিলাম, 'মাসখানেকের মধ্যে আবার আসছি। কাজটা শেষ হল না।'

দেবব্রত বুঝিল। বাষ্পোজ্জ্বল চোখে একবার ঘাড় নাড়িল।

৭ ভাদ্র ১৩৪২

অভিজ্ঞান

বাড়ির পিছনে লম্বা খোলা চাতালের উপর ইজি-চেয়ারে বসিয়াছিলাম। ঠিক নীচে দিয়া ভাদ্রের গঙ্গা অধীর উন্মাদনায় ছুটিয়া চলিয়াছিল।

কিছুদূরে আর একটি চেয়ারে যে বসিয়াছিল, তাহার নাম সুনন্দা। সুনন্দার বয়স আঠারো-উনিশ; তাহাকে দেখিলে সম্মুখে ঐ ভরা গঙ্গার কথা মনে হয়, তেমনই অধীর উদ্বেল। প্রবল চুম্বকের মত তাহার যৌবনোচ্ছল দেহের একটা অনিবার্য আকর্ষণ আছে; বুদ্ধি ও সংযমকে অতি সহজে বিপর্যস্ত করিয়া দিতে পারে।

সুনন্দার ঘন কালো চুলের মধ্যে সিঁদুর নাই; বোধ হয় সে অনূঢ়া। তাহার কানে সূক্ষ্ম তারের কাজ করা সোনার কানবালা, গলায় সরু একটি হার; পরিধানে মেঘলা রঙের শাড়ি। বর্তমানে সে সাগ্রহে আমার মুখের পানে চাহিয়া ছিল; তাহার ঘোর রক্তবর্ণ পুরন্ত অধরোষ্ঠ যেন অনুচ্চারিত প্রশ্নে ঈষৎ বিভক্ত হইয়া ছিল।

কিন্তু এই ভাদ্রের অপরাহ্নে সুনন্দার পাশে বসিয়াও আমার মনটা ছটফট করিতেছিল। একটা দুর্বোধ্য অশান্তি স্নায়ুর মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া দেহটাকেও অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল।

সুনন্দা সহসা প্রশ্ন করিল, বলুন না, আপনার নাম কি?

একটু চিন্তা করিয়া বলিলাম, বলতে পারি না।

অধীর অসন্তোষে সুনন্দার অধর স্ফুরিত হইয়া উঠিল, সে কহিল, বলবেন না, তাই বলুন। কেন, নাম বললে কি আমরা আপনাকে বাড়ি থেকে বিদেয় করে দেব? আর, এখন তো আপনি সেরে উঠেছেন, বিদেয় করলেই বা ক্ষতি কি?

আমি বলিলাম, সুনন্দা, আমি চলে যেতেই চাই।

সুনন্দা অধর দংশন করিল; একটু থামিয়া অনুতপ্ত স্বরে বলিল, রাগ করলেন? আমি অমন যা-তা বলি।

রাগ করিনি—সত্যি বলছি। যতদিন বিছানায় শুয়েছিলুম, কিছু মনে হয়নি। কিন্তু এখন আর আমার মন টিক্‌ছে না, কেবলি মনে হচ্ছে কোথাও চলে যাই। আমার যেন কোথাও যাবার আছে।

কোথায় যাবার আছে?

তা জানি না।

ভর্ৎসনার সুরে সুনন্দা বলিল, আচ্ছা, কেন মিছে কথা বললেন? বলুন না, কারুর জন্যে আপনার মন কেমন করছে তাই তাড়াতাড়ি চলে যেতে চান। হয়তো আপনার স্ত্রী।

চমকিয়া উঠিলাম, স্ত্রী? আমার কি বিয়ে হয়েছে?

সুনন্দা তীক্ষ্ণ চক্ষে চাহিয়া বলিল, হয়নি?

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, না—বোধহয়।

সুনন্দা বিদ্যুতের মত প্রশ্ন করিল, তবে ও হীরের দুল কার?

হীরের দুল?

সুনন্দা হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসিতে একটু তিক্ত-রস ছিল; বলিল, তাও অস্বীকার করবেন? আচ্ছা, আমাকে কি মনে করেন বলুন দেখি?

ধীরে ধীরে বলিলাম, মনে করি, আনন্দময়ী মুরতি তোমার, কোন দেব আজি আনিলে দিবা, তোমার পরশ অমৃত সরস তোমার নয়নে দিব্য বিভা।—কথাগুলো একরকম

নিঃসাড়েই মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল।

সুনন্দা গঙ্গার দিকে তাকাইল; তাহার চোখে ভরা-নদীর ছায়া পড়িল। গঙ্গার পর-পারে মেঘলা আকাশ চিরিয়া এক ঝলক রক্তাভ সূর্য-রশ্মি তাহার কপালে, গালে, সুগোল সবল বাহুতে আসিয়া পড়িল।

কিয়ৎকাল পরে সে চটুল হাসিয়া মুখ ফিরাইল, আমার পরশ যে অমৃত সরস তা জানলেন কি করে?

জ্বরের ঘোরে যখন অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলুম, তখন কপালে তোমার ঠান্ডা হাত বড় মিষ্টি লাগত।

সুনন্দা শূন্যের দিকে তাকাইয়া মৃদুস্বরে বলিল, তিন দিন জ্বরে একেবারে অজ্ঞান হয়ে ছিলেন। উঃ--সে কি জ্বর! গায়ে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়। ডাক্তার বললেন, নিউ-মোনিয়ায় দাঁড়াতে পারে; আমরা তো ভেবেছিলুম--, কিন্তু কি ভাগ্যি চার দিনের দিন থেকে জ্বর কমতে আরম্ভ করল!

আমার কি হয়েছিল সুনন্দা? জ্বরই বা হল কেন আবার সেরেই বা উঠলুম কি করে?

সে একবার আমার দিকে তাকাইয়া পূর্ববৎ আকাশে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিল, আমি রোজ সকালে এইখানে স্নান করি। বারো দিন আগে সকালবেলা নাইতে এসে দেখি স্রোতে আপনি ভেসে যাচ্ছেন। সাঁতরে গিয়ে তুলে নিয়ে এলুম। অজ্ঞান অচৈতন্য, নিশ্বাস এত আস্তে পড়ছে যে ধরা যায় না। শুধু প্রাণপণে একটা ভাঙ্গা গাছের ডাল আঁকড়ে আছেন।

ডাকাডাকি করাতে বাবা এলেন, চাকর-বাকরেরা এল। ধরাধরি করে আপনাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে শোয়ালুম। তার আধঘণ্টা পরেই তাড়স দিয়ে জ্বর এল।

গভীর মনঃসংযোগে শুনিয়া বলিলাম, তারপর?

সুনন্দা ঈষৎ হাসিল, তারপর আর কি! এখন সেরে উঠেছেন, তাই পরিচয় না দিয়েই পালাবার চেষ্টা করছেন।

আমি কাতরভাবে বলিলাম, সুনন্দা, আমার যদি উপায় থাকত--

ভ্রূভঙ্গি করিয়া সুনন্দা বলিল, উপায় নেই কেন? আপনার নামে কি পুলিসের ওয়ারেণ্ট আছে?

এই সময় সুনন্দার বাবা আসিয়া একটা শূন্য চেয়ারে বসিলেন। তাঁহার নাম জানি না; সুনন্দা 'বাবা' বলে, চাকরেরা সসম্ভ্রমে 'বাবুজী' বলিয়া ডাকে; যে ডাক্তার আমার চিকিৎসা করিতেছিলেন তাঁহাকে একবার 'রায় বাহাদুর' বলিতে শুনিয়াছি। অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির লোক, বেশী কথা কহেন না; যে যা বলে তাহাতেই রাজী। তিনি নিঃশব্দে চেয়ারে আসিয়া বসিলে সুনন্দা বলিল, বাবা, উনি চলে যেতে চান। কিন্তু নাম ধাম ঠিকানা কিছুই বলবেন না।

কর্তা নিস্তেজভাবে বলিলেন, চলে যাবেন? কিন্তু এখনো ওঁর শরীর তেমন--আরো দু'দিন থেকে গেলে হয়তো--

সুনন্দা উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিয়া উঠিল, কিন্তু উনি নাম বলবেন না কেন? আমি ওঁর প্রাণ বাঁচিয়েছি, আমাকে বলতে কি বাধা?

অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে কর্তা বলিলেন, উনি যখন বলতে চান না তখন আমাদের পীড়া-পীড়ি করা উচিত নয়। হয়তো কোন কারণ আছে।

সুনন্দা সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল, ক্ষুব্ধ উজ্জ্বল চোখে আমাকে বিদ্ধ করিয়া বলিল, বেশ দরকার নেই বলবার, আমি চাই না শুনতে। বলিয়া দ্রুতপদে বাড়ির ভিতর চলিয়া

গেল।

কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলাম, তারপর কর্তা মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কবে যেতে চান?

আমি সন্ধ্যা-ধূসর গঙ্গার দিকে চাহিয়া বলিলাম, আজ থাক। কাল সকালে।

আচ্ছা। আপনার যাতে সুবিধা হয়।

সে রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। দুর্বলের গভীর নিদ্রা, কিন্তু ভাঙিয়া গেল। কপালে অতি শীতল মধুর স্পর্শ অনুভব করিয়া চোখ মেলিলাম। সুনন্দা শিয়রে দাঁড়াইয়া আছে। অপরিসীম তৃপ্তিতে মন ভরিয়া গেল; আবার চক্ষু মুদিলাম।

প্রভাতে বিদায় কালে বলিলাম, সুনন্দা, তাহলে এবার যাই।

সুনন্দা বলিল, এই নিন, এই মনিব্যাগটা আপনার পকেটে ছিল। ওর মধ্যে আড়াই শ' টাকার নোট আছে। আর, দুটো হীরের দুল।

আচ্ছা, বলিয়া মনিব্যাগ পকেটে পুরিলাম।

সুনন্দার বাবা ঘরে ছিলেন না। সুনন্দা জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের মনে থাকবে তো?

হ্যাঁ।

আবার আসবেন তো?

কি জানি—

তীব্র চাপা স্বরে সুনন্দা বলিল, আসবেন। আসতে হবে। আমি পথ চেয়ে থাকব।

দেখিলাম তাহার চোখ দুটি বাষ্পোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সে একবার দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিল, তারপর বিদায় হাসি হাসিল।

বাড়ির গাড়ি স্টেশনে পেঁছাইয়া দিল।

স্টেশনটি মাঝারি, বেশী লোকজন নাই। টিকিট ঘরের খাঁচার মুখে গিয়া একটি দশ টাকার নোট ছিদ্রপথে বাড়াইয়া দিলাম, বলিলাম, টিকিট।

ঝিমানো স্বরে টিকিটবাবু বলিলেন, কোথায় যাবেন?

কোথায় যাইব? এদিক-ওদিক তাকাইয়া বলিলাম, দশ টাকায় কতদূর যাওয়া যায়?

টিকিটবাবু চক্ষু মেলিয়া পিঞ্জরের মধ্যে হইতে চাহিলেন, শেষে বলিলেন, কোন দিকে যেতে চান?

তাচ্ছিল্যভরে কহিলাম, যে দিকে হয়।

টিকিটবাবু আর একবার আমাকে দৃষ্টি-প্রসাদে অভিষিক্ত করিয়া নীরবে একটি টিকিট কাটিয়া ছিদ্রপথে আগাইয়া দিলেন।

লাল টিকিট; রংটা কেমন যেন পছন্দ হইল না, অনভ্যস্ত ঠেকিল। বলিলাম, লাল টিকিট দিলেন কেন?

তবে কোন টিকিট দেব, হল্‌দে?

চিন্তা করিয়া বলিলাম, না থাক। এতেই হবে।

টিকিটবাবু পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের মত আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন দেখিয়া আমি সে স্থান ছাড়িয়া প্ল্যাটফর্মে গিয়া দাঁড়াইলাম।

আধঘণ্টা পরে ট্রেন আসিল। একটা খালি কামরা দেখিয়া উঠিয়া পড়িলাম।

ট্রেন চলিয়াছে। চারিদিকে জল-ভরা ধানের ক্ষেত। আকাশে কখনও মেঘ কখনও

রৌদ্র। আমি কোথায় চলিয়াছি? এ পৃথিবীতে আমাকে চেনে এমন কেহ আছে কি? আমার কি গৃহ আছে? কোথায় কাহার কাছে যাইবার জন্য আমার মনে এই অধীর চঞ্চলতা?

ট্রেন চলিতেছে, থামিতেছে; যাত্রীরা উঠিতেছে নামিতেছে, চেঁচামেচি হট্টগোল করিতেছে। ইহাদের মুখে রাগ বিরাগ ক্রোধ আনন্দের প্রতিচ্ছবি পড়িতেছে, নির্লিপ্তভাবে দেখিতেছি। সুনন্দার বিদায়কালীন মুখ মাঝে মাঝে মনে পড়িতেছে।

সুনন্দা বোধ হয় আমাকে ভালবাসে। তাহার প্রকৃতি কুলপ্লাবী ভাদ্রের গঙ্গার মত, আপন অপর্যাপ্ত প্রাচুর্যে অসম্বৃত। আমাকে সে গঙ্গা হইতে তুলিয়া আনিয়াছিল, আমি তাহার কুড়াইয়া পাওয়া জিনিস। গঙ্গায় ভাসিয়া যাইতেছিলাম কেন?

একটা বড় স্টেশনে গাড়ি থামিল। খবরের কাগজ বিক্রয় হইতেছিল; একটা কিনিলাম। গাড়ি আবার চলিতে লাগিল, নিরুৎসুকভাবে কাগজখানা চোখের সম্মুখে ধরিয়া রহিলাম।

কিছুদিন আগে ট্রেনে কলিশন হইয়াছিল, তাহারই বিবরণ, কত লোক মারা গিয়াছে, কত লোককে পাওয়া যাইতেছে না, তাহাদের নাম ধাম ঠিকানা। দেশ হইতে সোনা রপ্তানী হইতেছে। এবৎসর ধানের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে তাহার পূর্বাভাস। এসব খবর ছাপিয়া কি লাভ হয়? কাহার কাজে লাগে?

ক্রমে অপরাহ্ণ হইল। আমি যেন নিরুদ্দেশের যাত্রী, আমার যাত্রার শেষ নাই।

এ কি! রবি! তুমি!

একটা জানাকীর্ণ বড় স্টেশনে গাড়ি থামিয়াছিল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম, একজন লোক মুখ ব্যাদিত করিয়া আমার পানে তাকাইয়া আছে—তাহার চক্ষু যেন ঠিক্‌রাইয়া বাহিরে আসিবে।

আমিও তাহাকে ভাল করিয়া দেখিলাম। আমারই সমবয়সী—লম্বা হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, নাকের পাশে একটা পিঙ্গলবর্ণ মাষা, চোয়াল ভারী, নাক উঁচু। বলবান মজবুত গোছের লোক।

সে একলাফে গাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া আমার কাঁধ ধরিয়া প্রবলবেগে ঝাঁকানি দিয়া বলিল, রবি, তুমি বেঁচে আছ! উঃ—আমরা ভেবেছিলুম—

আমি নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া বলিলাম, আপনাকে আমি চিনি না।

চেন না? সে আবার ব্যাদিত মুখে চাহিয়া রহিল। তারপর আস্তে আস্তে মুখ বন্ধ করিল। তাহার চোখে সন্দেহের ছায়া পড়িল!

আমি ভদ্রতা করিয়া পাশে নির্দেশ করিয়া বলিলাম, বসুন। সে থপ করিয়া বসিয়া পড়িল; কিন্তু তাহার দৃষ্টি আমার মুখ হইতে নড়িল না।

আমাকে সত্যিই চিনতে পারছ না?

মৃদু হাসিয়া মাথা নাড়িলাম, না, আপনি কে?

সে বুদ্ধিভ্রষ্টের মত বলিল, আমি নীরোদ—ডাক্তার নীরোদ রায়, তোমার বাল্যবন্ধু; অরুণা সম্পর্কে আমার বোন হয়—, তারপর অধীর কণ্ঠে বলিল, কি আশ্চর্য রবি, আমাকে ভুলে গেলে! এই যে মাসখানেক আগে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে!

বলতে পারি না।

সে হঠাৎ বলিল, তুমি কোথায় যাচ্ছ? তাহার চোখে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইয়াছে দেখিলাম।

বলিলাম, জানি না।

কোথা থেকে আসছ?

একটু ভাবিয়া বলিলাম, জানি না।

সে ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, রবি, তোমার কি কিছু মনে নেই? ট্রেনের কলিশন—তুমি কলকাতা থেকে ফিরছিলে—রাত্রি তিনটের সময় কলিশন হয়—কিছু মনে করতে পারছ না?

না।—আমার নাম কি রবি?

এই সময় ট্রেনের ঘন্টা বাজিল।

সে একটা সঙ্কল্প ঠিক করিয়া লইয়া বলিল, তুমি আমার সঙ্গে এস। এখানে আমার বাড়ি, আমার কাছেই থাকবে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার কাছে থাকব কেন?

সে ছেলে-ভুলানো স্বরে বলিল, পরে বলব, তোমার সঙ্গে অনেক মজার কথা আছে। এখন এস। এবার গাড়ি ছাড়বে।

তাহার বালকোচিত প্রতারণার চেষ্টা দেখিয়া হাসি পাইল, বলিলাম, আপনার কি বিশ্বাস আমি পাগল?

না না—তা নয়, এস গাড়ি ছাড়ছে। বলিয়া আমার হাত ধরিয়া টানিয়া গাড়ি হইতে নামাইয়া লইল।

স্টেশনের ফটকে টিকিট বাহির করিলাম; সে হাত হইতে টিকিটখানা লুফিয়া লইল—টিকিট করেছ দেখছি। টিকিট পরীক্ষা করিয়া বলিল, রামপুর থেকে আসছ?

তা হবে।

কিন্তু যেখানে কলিশন হয়েছিল, সেখান থেকে রামপুর তো প্রায় সত্তর মাইল দূরে। যাহোক—এস।

আমি কহিলাম, আমি আবার কিন্তু কালই চলে যাব।

স্টেশনের বাইরে একখানা ছোট মোটর ছিল, তাহাতে উঠিয়া বসিলাম। ডাক্তার নীরোদ চালাইয়া লইয়া চলিল।

একটা লাল রঙের বাড়ির সম্মুখে আসিয়া গাড়ি থামিল। দেখিলাম লেখা আছে—'টেলিগ্রাফ অফিস'। ডাক্তার বলিল, তুমি বোস, আমি এখনি আসছি। বলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

মিনিট তিন চার পরে ফিরিয়া আসিয়া আবার নীরবে গাড়ি হাঁকাইয়া লইয়া চলিল।

নীরোদ ডাক্তারের বাড়ির একটা ঘরে বসিয়া ছিলাম। ডাক্তার আমার সম্মুখে উপবিষ্ট ছিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিল, তুমি রামপুরে ক'দিন ছিলে?

শুনেছি বারো দিন।

কি করে সেখানে গেলে মনে আছে কি?

না। শুনেছি—গঙ্গায় ভেসে যাচ্ছিলুম, সুনন্দা তুলেছিল।

ও—ডাক্তার কিয়ৎকাল চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল, সুনন্দা কে?

একটি মেয়ে।

তোমার যা যা মনে আছে সব আমাকে বল।

সংক্ষেপে বলিলাম। শুনিয়া ডাক্তার বলিল, হুঁ—এখন সব বুঝতে পারছি।

কি বুঝতে পারছেন?

তোমার যা হয়েছিল।

কি হয়েছিল?

ডাক্তার ধীরে ধীরে প্রত্যেকটি কথা গুণিয়া গুণিয়া বলিতে লাগিল, তুমি রাত্রির ট্রেনে কলকাতা থেকে বাড়ি ফিরছিলে, পথে কলিশন হয়, তুমি সম্ভবত সেই ধাক্কায় গাড়ি থেকে ছিটকে বাইরে পড়েছিলে। মাথায় চোট লেগেছিল; অন্ধকার রাত্রে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে গঙ্গায় পড়ে যাও। গঙ্গা সেখান থেকে মাইলখানেক দূরে। তারপর ভাসতে ভাসতে রামপুর পৌঁছেছিলে, কেমন—এখন মনে পড়ছে কি না?

আমি ক্লান্তভাবে বলিলাম, না। আমি কিন্তু কাল সকালেই চলে যেতে চাই।

কোথায় যাবে?

মনে মনে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিলাম, রামপুরে সুনন্দার কাছে ফিরিয়া যাইব। কিন্তু মুখে বলিলাম, জানি না।

আচ্ছা, সে দেখা যাবে—ডাক্তার উঠিয়া ভ্রূকুঞ্চিত মুখে ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিল। তারপর আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া হঠাৎ বলিল, অরুণা কাল আসবে।

ঈষৎ বিস্ময়ে বলিলাম, অরুণা কে?

চেন না?

না। স্ত্রীলোক?

ডাক্তার হতাশাপূর্ণস্বরে বলিল, হ্যাঁ, স্ত্রীলোক।

আমি মাথা নাড়িলাম, সুনন্দা ছাড়া আমি আর কোন স্ত্রীলোককে চিনি না।

আচ্ছা ও-কথা যাক্। এস, এখন অন্য গল্প করি।

কিছুক্ষণ ডাক্তার অন্য গল্প করিল। সে পাঁচ বছর এখানে ডাক্তারি করিতেছে, ইহারই মধ্যে বেশ পশার জমাইয়া তুলিয়াছে। তাহার স্ত্রীপুত্রাদি এখন দেশে আছে, পূজার সময় গিয়া তাহাদের লইয়া আসিবে ইত্যাদি। আমি চুপ করিয়া শুনিতে লাগিলাম!

শেষে ডাক্তার বলিল, আগে তুমি রবি ঠাকুরের কবিতা খুব আবৃত্তি করতে। এখন পার?

পারি।

বল তো একটা শুনি!

আমি বলিলাম—

'দূরে দূরে আজ ভ্রমিতেছি আমি
ছুটিনে কাহারো পিছুতে
মন নাহি মোর কিছুতেই—নাই
কিছুতে!
সবলে কারেও ধরিনা বাসনা মুঠিতে
দিয়েছি সবারে আপন বৃন্তে ফুটিতে—'

ডাক্তার আশা-ব্যগ্র কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য সংযত করিয়া যেন গল্পচ্ছলে বলিল, সেবার যখন তুমি আর আমি স্কটিশ চার্চ কলেজে আই.এস-সি পড়ি, তখন তুমি একবার এই কবিতাটা আমাদের সাহিত্য সভায় আবৃত্তি করেছিলে—

নিজের কথা আমার কিছু মনে পড়ে না।

ডাক্তার আবার গুম হইয়া গেল।

আমি বলিলাম, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই কথা আপনি জিজ্ঞাসা করছেন। এতে কি লাভ জানি না, কিন্তু আমার বড় ক্লান্তি বোধ হচ্ছে।

না না, আর ও-কথা নয়। ডাক্তার ঘড়ি দেখিয়া বলিল, আটটা বেজে গেছে। চল, এবার দুটি খেয়ে শুয়ে পড়বে; কাল সকালে ঘুম ভেঙে হয়তো—

হ্যাঁ, কাল সকালেই আমি যাব।

সকালে ন'টার সময় বলিলাম, এবার তাহলে বিদায় হই।

গভীর উৎকণ্ঠায় ঘড়ির দিকে তাকাইয়া ডাক্তার বলিল, আর একটু। আধঘণ্টা পরে যেও—এখন তো কোন ট্রেন নেই। চল, ততক্ষণ ঐ ঘরে বসবে।

মনের সেই অস্থিরতা প্রবল হইয়া উঠিতেছিল—ডাক্তারের সাহচর্য ভাল লাগিতেছিল না। তবু ঘরে গিয়া বসিলাম, বলিলাম, ঠিক সাড়ে ন'টার সময় আমি উঠব।

ডাক্তার 'আচ্ছা' বলিয়া আমাকে ঘরে বসাইয়া বাহিরে বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল।

ডাক্তার লোক মন্দ নয়। সে আমাকে আপন করিয়া লইতে চায়, কিন্তু আমি আপন হইতে পারিতেছি না। সুনন্দাও কাছে টানিয়াছিল, আমি কাছে যাইতে পারি নাই।

দশ মিনিট; পনের মিনিট কাটিয়া গেল। বাহিরে মোটরের শব্দ শুনা গেল। ভালই হইল, ডাক্তারের মোটরেই স্টেশনে যাইব।

চাপাকণ্ঠের কথাবার্তা কানে আসিতে লাগিল। হঠাৎ একটা উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনধ্বনি অর্ধপথে রুদ্ধ হইয়া গেল। আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। এবার যাইতে হইবে।

দ্বারের দিকে পা বাড়াইয়াছি, একটি স্ত্রীলোক দ্বার ঠেলিয়া প্রবেশ করিল।

তাহার বয়স কুড়ি-একুশ; তন্বী, গৌরাঙ্গী—মুখখানি অতি সুন্দর। কিন্তু চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে, রুক্ষ চুলের মাঝখানে খানিকটা অযত্নবিন্যস্ত সিঁদুর। চোখে পাগলের দৃষ্টি।

সে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; তারপর একটা অর্ধোচ্চারিত—'ওগো' বলিয়া ছিন্নমূল লতার মত আমার পায়ের কাছে পড়িয়া গেল।

আমি সরিয়া দাঁড়াইলাম, বলিলাম, আপনি কে?

সে মুখ তুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল, ওগো, তুমি আমায় চিনতে পারছ না?

স্বরটা মর্মভেদী। কিন্তু আমার প্রাণে কোনও সাড়া জাগিল না, কেবল অন্য কোথাও চলিয়া যাইবার অধীরতা দুর্নিবার হইয়া উঠিল।

বলিলাম, না। আমি এবার যাই।

সে আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, যেও না—যেও না, আমি যে তোমার স্ত্রী—তোমার অরুণা—

তাহার হাত ধরিয়া তুলিলাম। স্পর্শটা অত্যন্ত পরিচিত। আমার অস্থিরতা আরও বাড়িয়া গেল, বুকের মধ্যে কেমন যন্ত্রণা হইতে লাগিল। বলিলাম, আপনার কান্না দেখে আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু আমার আর সময় নেই—আমি যাই। বলিয়া তাহার হাত ছাড়াইয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইলাম।

ডাক্তার বাহিরে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়াইয়া ছিল; তাহাকে বলিলাম, চললুম তবে—বিদায়।

মোটর বারান্দার নীচেই ছিল; তাহাতে উঠিতে যাইব, স্মরণ হইল ডাক্তারকে কিছু দেওয়া হয় নাই।

টাকা বাহির করিবার জন্য মনিব্যাগ খুলিলাম। টাকা ছাড়া আরও দু'একটা জিনিস রহিয়াছে, এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই। একটা খোপের তলদেশে নীল কাগজে মোড়া কি একটা রহিয়াছে। দুই আঙুল দিয়া সেটা বাহির করিলাম। মোড়ক খুলিয়া দেখিলাম—একজোড়া হীরার দুল।

পৃথিবী ও আকাশ, সমস্ত পরিদৃশ্যমান জগৎটাই যেন এতক্ষণ একটু হেলিয়া

একটু বাঁকিয়া ছিল, এখন নড়িয়া-চড়িয়া নিজের অভ্যস্ত স্থানে বসিয়া গেল।

চারিদিকে চাহিলাম। পৃথিবীর চেহারা বদলাইয়া গিয়াছে। শকুন্তলার আঙটি দেখিয়া দুষ্মন্তেরও কি এমনি হইয়াছিল?

ফিরিয়া গেলাম।

ডাক্তারকে বলিলাম, নীরু, যাওয়া হল না। মোটর নিয়ে যেতে বল।

নীরোদ আমার কাঁধ চাপিয়া ধরিয়া উদ্দীপ্ত চক্ষে চাহিল, রবি! মনে পড়েছে?

পড়েছে! ছাড়, অরুণার কাছে যাই।

আর সুনন্দা?

'সুনন্দা' নামটা যেন কোথায় শুনিয়াছি—স্বপ্নের মত মনে হইল, বলিলাম, সে আবার কে?

নীরোদ হাসিয়া উঠিল, কেউ না—এখন ঘরে যা।

ঘরে অরুণা মেঝের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া ছিল।

তাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া কম্পিতস্বরে বলিলাম, অরুণা, তোমার হীরের দুল এনেছি—ওঠ।

২২ ভাদ্র ১৩৪২

একূল ওকূল

চল্লিশ বৎসর বয়সে সাধুচরণ যেদিন হঠাৎ কাহাকেও কিছু না বলিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া গেলেন, সেদিন গাঁয়ের সকলে একবাক্যে বলিল, ইহা যে ঘটিবে তাহা কাহারও অবিদিত ছিল না, বরং সাধুচরণ প্রাণের মধ্যে এতখানি বৈরাগ্য পুষিয়া এতদিন সংসার করিল কি করিয়া, ইহাই আশ্চর্য। কিন্তু সাধুচরণের স্ত্রী সৌদামিনী চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন।

সৌদামিনীর বয়স তখন আটাশ। বড় ছেলে নিমাই সবে চৌদ্দ বছরে পা দিয়াছে; তখনও পাঠশালা ছাড়ে নাই। তাহার নীচে তিনটি বোন। জমিজমা সামান্য যাহা আছে, তাহাতে সাধুচরণের বৈরাগ্যলিপ্ত চিত্ত কোন ক্রমে গ্রাসাচ্ছাদন জোগাড় করিয়া চলিতেছিল। কিন্তু এখন তাহাও ঘুচিয়া গেল। কারণ সংসারের একমাত্র সমর্থ পুরুষ যদি বিনা বাক্যব্যয়ে গৃহত্যাগ করে, তবে সংসার চলে কি করিয়া?

পাঁচ বৎসর সৌদামিনীর চোখের জল শুকাইল না।

কিন্তু সংসারে একটা অলঙ্ঘনীয় নিয়ম আছে, দিন কাটিয়া যায়। চাকা-ভাঙগা যন্ত্রটা—যাহা আর কোনদিন চলিবে না বলিয়া মনে হইয়াছিল— আবার নড়িতে আরম্ভ করিল। দেখা গেল, সাধুচরণের অভাবে সেটা গুরুতর রকম জখম হইয়াছিল বটে, কিন্তু একেবারে অচল হয় নাই।

ক্রমে সৌদামিনীর চোখের জলও শুকাইল। জমিদার ভাল লোক, সৌদামিনীর অবস্থা বুঝিয়া তিনি আর কয়েক বিঘা জমি তাঁহাকে দিয়াছিলেন, খাজনাও কমাইয়া নামমাত্র রাখিয়াছিলেন। পাড়াগাঁ হইলেও নিঃস্বার্থ লোক দু' একজন ছিল; তাহারা ক্ষেতখামার দেখিয়া দিত, যাহাতে চাষারা অসহায়া স্ত্রীলোকের যথাসর্বস্ব লুটিয়া লইতে না পারে। মাথায় গুরুভার পড়িলে দেখা যায়, ভারটা যত দুর্বহ মনে করা গিয়াছিল, ততটা নয়। সৌদামিনীরও তাহাই হইল। ক্রমে তিনি নিজেই কাজ চালাইয়া লইতে শিখিলেন। এদিকে নিমাইও বড় হইয়া উঠিতে লাগিল।

ধীরে ধীরে সাধুচরণের সংসারে তাঁহার শূন্য স্থানটা ভরাট হইয়া আসিতে লাগিল। তাঁহার প্রথমা কন্যা সাবিত্রীর বিবাহ যেদিন স্থির হইয়া গেল, সেদিন সৌদামিনী আবার সেই প্রথম দিনের মত কাঁদিলেন। কিন্তু বেশীক্ষণ কাঁদিবার অবসর কই? চোখ মুছিয়া তাঁহাকে আবার মেয়ের বিবাহের কাজে লাগিতে হইল।

সামান্য ঘরে সামান্য বরে বিবাহ। তবু প্রথম মেয়ের বিবাহ; আয়োজন যথাসাধ্য ভাল করিতে হইল। পাড়ার মোড়ল হারু মুখুজ্যে দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ—একলা মেয়েমানুষ, কিন্তু বুকের পাটা আছে বলতে হবে।' বলিয়া গাঁয়ের অন্যান্য প্রবীণ ব্যক্তিদের সঙ্গে গোপনে এই প্রশ্নটাই আলোচনা করিতে চলিলেন যে, সাধুচরণের বৌ নিতান্ত অসহায় হইয়াও এত আয়োজন করিতে সমর্থ হইল কিরূপে।

বিবাহের দিন প্রাতঃকালে সমস্যা উঠিল, বর ও বরযাত্রীদের বসিবার ব্যবস্থা হইবে কোথায়। চণ্ডীমণ্ডপের ঘরটা সাধুচরণের অন্তর্ধানের পর হইতে এ কয় বৎসর সৌদামিনী তালা লাগাইয়া রাখিয়াছিলেন, কাহাকেও ব্যবহার করিতে দেন নাই। তাঁহার মনে হয়তো আশা ছিল, সাধুচরণ যদি কখনও ফিরিয়া আসেন, তবে ঐ ঘর আবার ব্যবহার করিবেন। এখন সৌদামিনী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সেই ঘরের চাবি বাহির করিয়া দিলেন। বলিলেন, 'ঐ ঘরেই আসর কর্ নিমাই। তাঁর নিজের ঘর ছিল, সব সময় বসে শাস্তর-পুঁথি পড়তেন; ঐ ঘরেই জামাই এসে বসুক। মেয়ে জামায়ের কল্যাণ হবে।' বলিয়া ঘন ঘন চোখের জল মুছিতে লাগিলেন।

যাহোক, মেয়ের বিবাহ হইয়া গেল। সাধুচরণের সাবেক ঘরে কিন্তু আর তালা পড়িল না। নিমাই বড় হইয়াছিল, আঠার-উনিশ বছর বয়স। ঘরটা সে ব্যবহার করিতে লাগিল। সন্ধ্যার পর দু'চার জন বন্ধু আসিত, তাহাদের সহিত গল্প-গুজব, লুকাইয়া দু' একটা বিড়ি খাওয়া চলিতে লাগিল।

নিমাই আগে ঘোষেদের বাড়িতে আড্ডা দিতে যাইত; এখন নিজের চণ্ডীমণ্ডপে বসিতে লাগিল দেখিয়া সৌদামিনী চাবি লাগাইবার কথা আর বলিতে পারিলেন না। হাজার হোক, নিমাই এখন বাড়ির কর্তা, বাহিরে একটা ঘর না হইলে তাহার অসুবিধা হয়। তা ছাড়া এখন জামাই হইয়াছে, মেয়ের শ্বশুরবাড়ি হইতে সর্বদা লোকজন আসিতেছে; বাহিরে একটা ঘর না হইলে চলিবে কেন?

সুতরাং বাহিরের যে ঘরটা এতদিন সাধুচরণের শোক-স্মৃতির তাজমহল হইয়া বিরাজ করিতেছিল, তাহা আবার নিত্যব্যবহার্য সাধারণ বৈঠক হইয়া পড়িল।

নিমাই ছেলেটি বেশ বুদ্ধিমান। কুড়ি বছর বয়স হইতেই সে নিজের দায়িত্ব বুঝিয়া

রহিল। শুধু তাই নয়, নানা বুদ্ধি খাটাইয়া সে জমিজমা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। একুশ বছর বয়সে সৌদামিনী তাহার বিবাহ দিলেন।

নিমাইয়ের বিবাহের দিনও সৌদামিনী আবার চোখের জল ফেলিলেন। কিন্তু বেশী চোখের জল ফেলিতেও সাহস হইল না, ছেলের অকল্যাণ হইতে পারে। নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিলেন, 'কপাল! যার ঘর, যার সংসার, সে-ই ভোগ করতে পেলে না!'

ছেলের বিবাহের পর সৌদামিনী ধর্ম-কর্মের দিকে অধিক মন দিলেন; গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। সাধুচরণ চলিয়া যাইবার পর শাঁখাসিঁদুর রাখিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু হবিষ্য আহার করিতেন এবং অন্যান্য বিষয়েও ব্রহ্মচারিণীর কঠোর নিয়ম পালন করিতেন। এখন বধূর হাতে সংসারের অধিকাংশ কাজ তুলিয়া দিয়া তিনি জপতপের দিকে মনোনিবেশ করিলেন। ছেলে কোনদিন পর হইয়া যাইবে এ ভাবনা তাঁহার ছিল না, তাই বধূর হাতে সংসার ছাড়িয়া দিতে তিনি দ্বিধা করিলেন না।

তারপর আরও দু' তিন বছর গেল।

সাধুচরণের সন্ন্যাস গ্রহণের পর এগারো বছর কাটিয়া গেল। দ্বাদশ বৎসর স্বামী নিরুদ্দেশ থাকিলে কুশপুত্তলি দাহ করিয়া রীতিমত বৈধব্য আচার গ্রহণ করিতে হয়; পুরোহিত মহাশয়ের সঙ্গে এই সব বিধিবিধান সম্বন্ধে কথাবার্তা আরম্ভ হইয়াছে, এমন সময় হঠাৎ একদিন সাধুচরণ নিজের গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

কার্তিক মাসের প্রভাত। তখনও ঘাসে ও গাছের পাতায় শিশির শুকায় নাই; পুঁটু সদর দরজায় জলছড়া দিতেছিল, এমন সময় এক সন্ন্যাসী আসিয়া দাঁড়াইলেন। পুঁটুর মুখখানি ভাল করিয়া দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'পুঁটু না?'

পুঁটু চমকিয়া মুখ তুলিল। সন্ন্যাসীর গায়ে একটা ময়লা ছেঁড়া আলখাল্লা, মাথায় রুক্ষ চুল, কাঁচাপাকা গোঁফ-দাড়ি, মুখে একটু করুণ হাসি। তাঁহাকে দেখিয়া পুঁটু হাতের ঘটি নামাইয়া থতমত ভাবে বলিল, 'আপনি কে?'

সন্ন্যাসী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'আমি তোমার বাবা।'

সাধুচরণ যখন বিরাগী হইয়া যান, তখন পুঁটুর বয়স ছিল দেড় বছর; কিন্তু সে মায়ের কাছে গল্প শুনিয়া সব কথা জানিত। কিছুক্ষণ বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া সে চীৎকার করিতে করিতে ভিতরের দিকে ছুটিল, 'ওমা—ও মেজদি—কে এসেছে দ্যাখ,—বাবা—বাবা এসেছেন—ওমা—'

মুহূর্ত মধ্যে বাড়িতে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সৌদামিনী ছুটিতে ছুটিতে বাহিরে আসিয়া স্বামীকে দেখিয়া একেবারে তাঁহার পা জড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন, 'ওগো, এতদিন পরে তুমি ফিরে এলে—'

সাধুচরণের চোখেও জল গড়াইয়া পড়িল, তিনি বলিলেন, 'হাঁ লক্ষ্মী, আমি এসেছি। ওঠ।'

সৌদামিনী পা জড়াইয়া থাকিয়াই বলিলেন, 'আর চলে যাবে না, বল।'

সাধুচরণ বলিলেন, 'না, আর যাব না। সংসার ছেড়ে যাওয়াই আমার ভুল হয়েছিল, লক্ষ্মী। যা খুঁজতে বেরিয়েছিলুম তা তো পেলুম না। এখন ঘরেই থাকব।'

দেখিতে দেখিতে গ্রামের লোক জড় হইয়া গেল। প্রবীণ ব্যক্তিরা সাধুচরণকে আশীর্বাদ ও প্রীতিজ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। হারু মুখুজ্যে বলিলেন, 'সাধুচরণ, তুমি যে ফিরে এসেছ বাবা, এ শুধু তোমার সহধর্মিণী আর ছেলে-মেয়ের পুণ্যে।

সন্ন্যাসী হওয়া কি চাট্টিখানি কথা, বাবা, বাপ-পিতামো'র পুণ্যের জোর চাই। এই দ্যাখ না, আমার তিন কুড়ি আট বয়স হল, এখনো সংসারে জড়িয়ে আছি! চেষ্ট' করলে কি আমি বৈরাগী হতে পারতুম না? এই তো সেবার জমিদারবাবুকে বলেছিলাম, রাধা-গোবিন্দ মন্দিরের সেবায়েৎ করে দিন, দেখুন সংসার ত্যাগ করতে পারি কি না—ঘরে তৃতীয় পক্ষ আছে তো কি হয়েছে। তা সে যাহোক, এখন ফিরে এসেছ, ছেলেপুলে নিয়ে মনের সাধে ঘর সংসার কব, আমরা দেখে চোখ জুড়োই।' উপস্থিত ছেলেবুড়ো সকলেই মুখুজ্যের এই সদিচ্ছার সমর্থন করিল।

নিমাই ক্ষেতখামার পরিদর্শন করিতে প্রত্যূষেই বাহির হইয়া গিয়াছিল, মাঠে পিতার আগমন-সংবাদ শুনিতে পাইয়া ছুটিতে ছুটিতে ফিরিয়া আসিল। জটাজুট-ধারী বাপকে দেখিয়া সে ক্ষণেক থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, তারপর সংকুচিত ভাবে প্রণাম করিল। সাধুচরণ তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন।

তারপর কয়েকদিন ধরিয়া সাধুচরণের গৃহে যেন উৎসব লাগিয়া গেল। তাঁহার প্রত্যাবর্তন-বার্তা চারিদিকে রটিয়া যাইবার পর, আশেপাশের গ্রাম হইতেও পরিচিত-অপরিচিত নানা লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিতে লাগিল। সাধুচরণ এই এগারো বৎসর ধরিয়া ভাবতবর্ষের নানাদেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন: সাধু, যোগী, অলৌকিক ব্যাপারও বোধ করি অনেক প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন; তাহার গল্প সকলে চমৎকৃত হইযা শুনিতে লাগিল। চণ্ডীমণ্ডপে লোক ধরে না। দিবারাত্রির অধিকাংশ সময়ই সাধুচরণ বহুজনপরিবৃত হইয়া তাঁহার সন্ন্যাসী-জীবনের কাহিনী শুনাইতেছেন। বাড়িব ভিতরেও আনন্দের সীমা নাই। দলে দলে গাঁয়ের মেয়েরা আসিতেছে; সৌদামিনীর চোখে কখনও জল, কখনও হাসি—জপতপও এক প্রকার বন্ধ আছে। বিবাহিতা মেয়ে সাবিত্রী সংবাদ পাইয়া বাপকে দেখিতে আসিয়াছে। দুই অনূঢ়া মেয়ে, কাল্লী ও পুঁটু মুহুর্মুহুঃ বাহিরে গিয়া বাপকে দেখিয়া আসিতেছে। বিশেষতঃ পুঁটু তো আহ্লাদে ও গর্বে আটখানা, কারণ সে-ই প্রথমে পিতাকে আবিষ্কার করিয়াছে।

মোটের উপর একটা কল্পনাতীত উত্তেজনা ও বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া এই পরিবারেব সাতটা দিন কাটিয়া গেল।

তারপর ধীরে ধীরে নূতনত্বের জৌলুষ যখন কাটিযা আসিল, তখন আবার স্বাভাবিক ভাবে জীবনযাত্রা চালাইবার চেষ্টা হইল। সাধুচরণ বাহিরেব ঘরটাই অধিকার করিয়া রহিলেন: বাড়ির অন্দরেব সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইল না। দীর্ঘকাল পরিব্রাজকের জীবন যাপন করিয়া তাঁহার নূতন অভ্যাস যাহা কিছু জন্মিয়াছিল, তাহা তিনি নিজের মধ্যেই রাখিলেন। সন্ন্যাসীর জীবনে আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছু হোক না হোক, একটা স্বাবলম্বনের ভাব ও বিলাসবিমুখতা জন্মে। সাধুচরণেরও তাহা জন্মিয়াছিল। তাই তাঁহার আগমনে পরিবারের একজন লোক বাড়িল বটে, কিন্তু দায়িত্ব বা অসুবিধা কিছু বৃদ্ধি হইল না।

এই ভাবে কার্তিক মাসটা কাটিয়া গেল।

অগ্রহায়ণ মাসের গোড়ায়, একদিন সন্ধ্যার পর তুলসীমঞ্চে প্রদীপ দেখাইয়া সৌদামিনী ছোট মেয়েকে বলিলেন, 'পুঁটু, বাইরে দেখে আয় তো কেউ আছে কি না।'

পুঁটু এইমাত্র দেখিয়া আসিয়াছিল, বলিল, 'না মা, কেউ নেই। বাবা একলা বসে আছেন।'

সৌদামিনী তুলসীমূলে প্রদীপ রাখিয়া বধূকে রান্না চাপাইবার আদেশ দিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে গেলেন। সাধুচরণের সঙ্গে তাঁহার নিভৃতে সাক্ষাৎ ঘটিবার সুযোগ বড় একটা হয় না, সন্ধ্যাকালে দু' একজন বাহিরের লোক সর্বদাই তাঁহার কাছে আসিয়া

বসে। আজ নিরিবিলি পাইয়া সৌদামিনী স্বামীর ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘরে রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বালা হইয়াছিল, সাধুচরণ একটা রুক্ষ কম্বল দুই কাঁধের উপর তুলিয়া দিয়া স্থির হইয়া বসিয়া ছিলেন; স্ত্রী প্রবেশ করিলে একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া বলিলেন, 'এস, লক্ষ্মী।'

সৌদামিনী মাদুরের একটা কোণে বসিয়া বলিলেন, 'নিশ্চিন্দি হয়ে তোমার কাছে দু' দণ্ড যে বসব তা আর হয় না। এখুনি হয়তো কে এসে পড়বে।'

সাধুচরণ বিমনাভাবে বাহিরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'না, এখন আর কে আসবে! নিমাইকে সন্ধ্যাবেলা দেখি না, সে কোথাও যায় না কি?'

সৌদামিনী কহিলেন, 'সারাদিন খেটে খুটে সন্ধ্যের পর বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দুটো গল্পগুজব করতে যায়। আগে তো এই ঘরেই বসত—' বলিয়া সৌদামিনী থামিয়া গেলেন।

সাধুচরণ অল্প হাসিয়া বলিলেন, 'আমি এসে ওর বসবার জায়গাটা কেড়ে নিয়েছি —না?'

জিভ কাটিয়া সৌদামিনী বলিলেন, 'সে কি কথা!' তারপর তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নিমুকে কি কোনো দরকার আছে?'

'না, দরকার এমন কিছু নয়। তবে সন্ধ্যেবেলা আমার কাছে এসে বসত, দুটো ধর্মকথা শুনত—এই আর কি।'

পুত্র পিতার কাছে বসিয়া ধর্মোপদেশ শুনিবে, ইহার চেয়ে আনন্দের কথা আর কি থাকিতে পারে! তবু সৌদামিনীর বুকের ভিতর ছাঁৎ করিয়া উঠিল। তিনি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'ও ছেলেমানুষ, ওর এখন আমোদ আহ্লাদের বয়স, আর ধর্মকথার ও বুঝবেই বা কি!—তার চেয়ে আমাকেই দুটো ধর্মকথা শোনাও না গো! দেশসুদ্ধ লোক শুনলে, কেবল আমিই শুনতে পেলুম না।'

সাধুচরণ প্রসন্নস্বরে বলিলেন, 'বেশ। কি শুনতে চাও বল।'

সৌদামিনী বিশেষ কিছুই শোনেন নাই, তিনি গোড়া হইতে সব কথা শুনিতে চাহিলেন। তখন সাধুচরণ ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন। গৃহত্যাগ করিবার পর হইতে কোথায় কোথায় গিয়াছেন, বনে জঙ্গলে পর্বতে কোথায় কোন্ মহাপুরুষের দর্শন লাভ করিয়াছেন, কবে কোন্ তীর্থে স্নান করিয়াছেন ইত্যাদি অনেক গল্প বলিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতাও কেমন করিয়া অল্পে অল্পে কমিয়া আসিল, তাহাও গোপন করিলেন না। একবার অসুখে পড়িয়া তাঁহার কিরূপ দুরবস্থা হইয়াছিল, তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া শেষে বলিলেন, 'বুঝতে পারলুম ঘর ছেড়ে এসে ভুল করেছি। সদ্‌গুরুর দর্শন পেলুম না; তা ছাড়া জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিঃসম্বল ভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়াবার মত বৈরাগ্যের জোরও আমার নেই। তাই শেষ পর্যন্ত তোমাদের কাছেই ফিরে এলুম, লক্ষ্মী। ভাবলুম, সাধন ভজন যা করবার ঘরে বসেই করব।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সৌদামিনী বলিলেন, 'ভগবানের অসীম দয়া।'

কিছুক্ষণ উভয়ে চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর সৌদামিনী আস্তে আস্তে বলিলেন, 'আমি বলছিলুম কি, ভগবানের অসীম দয়ায় যখন ঘরে ফিরে এলে, তখন ওই কম্বল-টম্বল ছেড়ে আগেকার মত—'

মাথা নাড়িয়া সাধুচরণ বলিলেন, 'না লক্ষ্মী, ওই কথাটি বল না। এতদিন পরে আর তা পারব না, অভ্যাস ছেড়ে গেছে।' ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, 'আমি এই ঘরটিতে পড়ে থাকব আর দুটি করে খাব। আমাকে আর সংসারে টেন না,—মনে করো

তোমাদের বাড়িতে একজন অতিথি এসেছে।' বলিয়া একটু হাসিলেন।

সৌদামিনী বলিয়া উঠিলেন, 'ও আবার কি কথা! তুমিই তো সব। তবে তুমি যদি আবার আগেকার মত হয়ে বসতে পারতে, তাহলে ছেলের বুকে সাহস হত। হাজার হোক, ছেলেমানুষ বই তো নয়।'

'না লক্ষ্মী, এ বয়সে নতুন করে বিষয় আশয় দেখা আর পেরে উঠব না, তাতে কাজ নেই। তুমি তো জান, চিরদিনই আমি খোলাভোলা লোক। তার চেয়ে নিমাই যেমন করছে করুক, ওর দ্বারাই হবে। দেখেছি, কাজে কর্মে ওর খুব মন আছে।'

তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া সৌদামিনী বলিলেন, 'তা আছে। ও-ই তো ক' বছর ধরে সব করছে। এরই মধ্যে ও—'

এই সময় বাহিরে পদশব্দ শুনা গেল। সৌদামিনী গলা বাড়াইয়া দেখিলেন—হারাণ দত্ত। হারাণ লোকটা নিষ্কর্মা, পরের বৈঠকে আড্ডা দিয়া বেড়ানই তাহার পেশা। সৌদামিনী বিরক্ত হইলেন, গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, 'খাবার এতক্ষণে তৈরি হল, পন্টুকে দিয়ে খবর পাঠাব। দেরি করো না যেন।'

'আচ্ছা।—কে, হারাণ না কি? এস, হারাণ।'

'আজ্ঞে কর্তা। জমিদার-বাড়ি গিয়েছিলুম, সেখানে শুনে এলুম—'

শুনিতে শুনিতে সৌদামিনী অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

শনিবারে নিমাই শহরে গিয়াছিল।

বেলা একটার সময় ফিরিয়া আসিয়া স্নানাদির পর আহারে বসিলে সৌদামিনী তাহার সম্মুখে বসিয়া বলিলেন, 'কি হল?'

নিমাই অন্নের গ্রাস মুখে তুলিয়া বলিল, 'কাল তারা মেয়ে দেখতে আসবে।'

সৌদামিনী উৎসুক স্বরে বলিলেন, 'তারপর, ছেলেটিকে কে , দেখলি? কালীর সঙ্গে মানাবে তো?'

'বেশ মানাবে। একটু রোগা কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না।'

'বয়স কত হবে?'

'হবে উনিশ কুড়ি। এই সবে চাকরিতে ঢুকেছে, এখনো পাকা হয়নি। তার ভগ্নীপতি ডেপুটি পোস্টমাস্টার কি না, তিনিই চেষ্টা করে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। শুনলুম শীগ্‌গির চাকরিতে পাকা হবে।'

সৌদামিনী খুশী হইয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ রে, ছেলের বাপ নেই বুঝি?'

'না, বাপ নেই মা আছে। বড় দুই ভাই আছে, তারা কাটা কাপড়ের দোকান করে। তিন ভাই একান্নবর্তী, অবস্থা বেশ ভাল। এই ছেলেটি বংশের মধ্যে বিদ্বান, এণ্ট্রেন্স পাস করেছে।'

সৌদামিনী তৃপ্ত হইয়া বলিলেন, 'বেশ হবে। একটা মেয়ে যদি চাকুরের ঘরে পড়ে তো মন্দ কি? শহরে একজন আপনার লোক রইল। তা হ্যাঁ রে, কি বুঝলি? টাকার কামড় খুব বেশী হবে না কি?'

'এখনও তো দেনা-পাওনার কোনও কথাই হয়নি। দেখা যাক, কি চায়।'

'হ্যাঁ, সে পরের কথা পরে, আগে মেয়ে দেখে পছন্দ তো করুক। কালী অবিশ্যি অপছন্দর মেয়ে নয়—"

অন্যান্য আরও অনেক সাংসারিক কথার পর, আহার শেষ করিয়া উঠিবার সময়

নিমাই বলিল, 'মা, একটা খারাপ খবর আছে।'

শঙ্কিত ভাবে সৌদামিনী বলিলেন, 'কি রে?'

নিমাই গলা খাটো করিয়া বলিল, 'রাধা-গোবিন্দ মন্দিরের জন্য জমিদারবাবু এক-জন ভাল সেবায়েৎ খুঁজছিলেন; বাবার কথা তাঁকে বলেছিলুম। একরকম ঠিকও হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু মাঝে থেকে একজন গিয়ে তাঁর কাছে চুকলি খেয়েছে।'

সৌদামিনী কিছু জানিতেন না; নিমাই কথাটা যথাসম্ভব গোপন করিয়াছিল, মাকে পর্যন্ত বলে নাই। কিন্তু তিনি নিমেষ মধ্যে সমস্ত বুঝিয়া লইয়া বলিলেন, 'তারপর?'

'তারপর আর কি—ফস্‌কে গেল।—কে চুকলি কেটেছে জান? ঐ হিংসুটে বুড়ো হারু মুখুজ্যে! ওর নিজের লোভ ছিল কি না।' বলিয়া নিমাই সক্রোধে মুখখানা বিকৃত করিল।

সৌদামিনী ঠোঁটে ঠোঁটে চাপিয়া কয়েক বার ঘাড় নাড়িলেন। পাড়াগাঁয়ে কে কিরূপ চরিত্রের লোক সকলেই জানে, অথচ পরস্পরকে দাদা খুড়ো জ্যেঠা বলিয়া আত্মীয়তায় জীবন কাটাইয়া দেয়, ইহাতে নিজেদের কপটতার কথা ভাবিয়া তিলমাত্র লজ্জিত হয় না। সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি লাগিয়েছে মুখুজ্যে খুড়ো?'

আসন ছাড়িয়া উঠিয়া নিমাই বলিল, 'সে আর শুনে কি হবে! কুচুটে বুড়ো রাজ্যির মিথ্যে কথা লাগিয়েছে।'

'তবু কি বলেছে শুনি না।'

'শুনবে?—বলেছে বাবা গাঁজাখোর।'

সৌদামিনী উঠিয়া দাঁড়াইয়া তীব্র স্বরে বলিলেন, 'কি বলেছে?'

'বাবা নাকি রোজ রাত্তিরে হারাণ দত্তর সঙ্গে বসে গাঁজা খান। আরো কত কি বলেছে কে জানে। এত বড় মিথ্যেবাদী ঐ বুড়ো—'

আরক্ত মুখে সৌদামিনী বলিলেন, 'যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। মুখুজ্যে খুড়ো নিজের বুকে হাত দিয়ে কথা বলে না? ওর নাতনীকে ভাতারে নেয় না কেন? কেউ জানে না বুঝি!—' বলিয়া তিনি ছেলের কাছে ঘেঁষিয়া আসিয়া রুদ্ধ চাপা গলায় মুখুজ্যের নাতনীর অতি গুহ্য জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে লাগিলেন। নিমাই এঁটো হাতে দাঁড়াইয়া এই পরম রুচিকর কাহিনী শুনিল, তারপর বলিল, 'হুঁ। ও-বুড়োকে আমি ছাড়ব না, মা। কিন্তু এখন গোলমাল করে কাজ নেই, কালীর বিয়েটা আগে ভালয় ভালয় হয়ে যাক। তুমি ভেব না, একদিন না একদিন ও-বুড়ো আমার হাতে এসে পড়বেই—তখন—' বলিয়া নিমাই দাওয়ার পাশে মুখ ধুইতে বসিল। পিতাকে গাঁজা-খোর বলায় তাহার যত না রাগ হইয়াছিল, এই সূত্রে অমন লাভের চাকরি ফস্‌কাইয়া যাওয়ায় সে আরও আগুন হইয়া উঠিয়াছিল।

পর দিন দ্বিপ্রহরে শহর হইতে কালীকে দেখিতে আসিল—পাত্র ও তাহার দুই জন বন্ধু। মেয়ে দেখানো হইল। কালী চলনসই মেয়ে; পনের বছর বয়স, বাড়ন্ত গড়ন। মেয়ে দেখা হইলে পাত্র তাহার এক বন্ধুর কানে কি বলিল। বন্ধু হাসিমুখে জানাইল, মেয়ে বেশ ভাল, তাহাদের পছন্দ হইয়াছে।

সাধুচরণ সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন; তিনি পাত্রটিকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দুই চারিটি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পাত্র বন্ধুদের পানে একবার তাকাইয়া মুচকি হাসিয়া উত্তর দিল। এই সাধুটি যে তাহার সঙ্কল্পিত শ্বশুর, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই।

জলযোগ শেষ করিয়া পাত্রের দল পুনশ্চ কন্যা সম্বন্ধে তাহাদের পরিতোষ জ্ঞাপন

করিয়া প্রস্থান করিল। বাড়িতে সকলেই হৃষ্ট, সৌদামিনী আড়াল হইতে পাত্রকে দেখিয়াছিলেন; তাঁহার বেশ পছন্দ হইয়াছিল। ছেলেটি একটু রোগা বটে কিন্তু চট্‌পটে। শহরের ছেলে কি না—কথায় বার্তায় দিব্য চোস্ত।

সন্ধ্যার সময় সাধুচরণ নিমাইকে নিজেকে ঘরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পিতাপুত্রে কিয়ৎকাল কথা হইল; তারপর নিমাই ক্ষুব্ধ মুখে বাড়ির ভিতর গিয়া সৌদামিনীকে বলিল, 'মা, বাবার ছেলে পছন্দ হয়নি, সম্বন্ধ ভেঙে দিতে বললেন।'

সৌদামিনী তরকারী কুটিতেছিলেন, বঁটি ফেলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন, বলিলেন, 'সে কি রে!'

'হ্যাঁ—ছেলে নাকি ট্যারা।'

'ট্যারা! কই, আমি তো কিছু দেখিনি।'

নিমাই বলিল, 'একটু চোখের দোষ আছে হয়তো, তাকে ট্যারা বলা চলে না। আর, অত দেখতে গেলে তো ঠক বাছতে গাঁ উজোড় হয়ে যাবে। ময়ূরছাড়া কার্তিক এখন কোথায় পাওয়া যায় বল।' বলিয়া হতাশভাবে হাত উল্টাইয়া প্রস্থান করিল।

সাধুচরণের প্রত্যাবর্তনের পর হইতে যে জিনিসটি তলে তলে এই পরিবারের মধ্যে সৃষ্টি হইতেছিল, তাহা বুদ্ধিমতী সৌদামিনী জোর করিয়াই চোখের সম্মুখ হইতে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন। যে-মানুষ চলিয়া যাওয়ায় একদিন সংসার ছন্নছাড়া হইয়া গিয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিলে যে আবার একটা নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইবে, তাহা কেহ ভাবিতে পারে নাই। কিন্তু যখন তিল তিল করিয়া তাহাই দেখা দিতে আরম্ভ করিল, তখন সৌদামিনী অন্তরে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এখন তাঁহার এক সুরে বাঁধা সংসারের অবিচ্ছেদ্য ঐক্য নষ্ট হইয়া যায় দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। হাত ধুইয়া তিনি স্বামীর ঘরের অভিমুখে চলিলেন।

ঘরে প্রবেশ করিয়া সৌদামিনী শান্ত স্বরেই বলিলেন 'হ্যাঁগা, ছেলে পছন্দ হল না?'

সাধুচরণ কম্বলের উপর অর্ধশয়ান অবস্থায় ছিলেন, ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, 'তোমার কি রকম মনে হল?'

সৌদামিনী নিজের মতামত প্রকাশ করিতে আসেন নাই, ঈষৎ অধীর কণ্ঠে বলিলেন, 'আমার কি মনে হল না-হল তাতে তো কিছু আসে যায় না, আমি মেয়ে-মানুষ। কিন্তু তোমার অপছন্দ হল কেন?'

সাধুচরণ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'আর তো কিছু নয়, ছোকরা একটু ট্যারা।'

সৌদামিনী বলিলেন, 'কি জানি বাপু, আমি তো কিছু দেখিনি। আর, তা যদি একটু হয়ই তাতে দোষ কি? আর সব দিক দিয়ে তো ভাল।'

সাধুচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কালীর অমত হবে না?'

'ও আবার কি কথা! কালী গেরস্তর মেয়ে, যে বরে আমরা তাকে দেব, সেই বর নিয়েই ঘর করতে হবে। আর অপছন্দই বা হবে কেন? ভাল ঘর, লেখাপড়া-জানা ছেলে—একটু চোখের দোষ যদি থাকেই। কানা-খোঁড়া তো আর নয়।'

অল্প হাসিয়া সাধুচরণ বলিলেন, 'খোঁড়া বা নুলো হলে বরং ভাল ছিল লক্ষ্মী। কিন্তু এ পাত্রের হাতে মেয়ে দিতে আমার মন সরছে না।'

'কেন?' সৌদামিনীর কণ্ঠে একটা অনিচ্ছাকৃত তীব্রতা আসিয়া পড়িল।

সাধুচরণ আবার কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন; বোধ হয় নিজের আপত্তিটাকে ভাষায় রূপ দিবার চেষ্টা করিলেন। শেষে বলিলেন, 'যোগসাধনের কথা তোমাকে তো বোঝাতে

পারব না, কিন্তু যে-ছেলে ট্যারা—ভ্রূমধ্যে যার দৃষ্টি স্থির হবার উপায় নেই—তাকে যে ভগবান মেরেছেন। সে যে কোন কালেই ধর্ম-কর্ম করতে পারবে না।'

সৌদামিনী স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। সাধুচরণের আপত্তির মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না বলিয়া নয়, হঠাৎ তাঁহার একটা বিভ্রম জন্মিল। মনে হইল, তাঁহার এই স্বামী তাঁহার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত, কোথাও তাঁহাদের মনের সাদৃশ্য পর্যন্ত নাই, এবং একদিন যে এই লোকটির সঙ্গে নিবিড় দাম্পত্য-বন্ধনের ভিতর দিয়া জীবন যাপন করিয়াছেন, তাহাও অসম্ভব বলিয়া মনে হইল। অজ্ঞাতসারে তাঁহার একটা হাত মাথার কাপড়ের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল।

সাধুচরণ বলিলেন, 'ধর্মের অধিকার থেকে স্বয়ং ভগবান যাকে বঞ্চিত করেছেন, জ্ঞানতঃ হোক অজ্ঞানতঃ হোক, সে যে মহা পাষণ্ড। জেনেশুনে তাকে জামাই করি কি করে? বুঝছ না?'

সৌদামিনী বুঝিলেন না, বুঝিবার বৃথা চেষ্টাও করিলেন না। তিনি স্বামীকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিবাণে বিদ্ধ করিয়া বলিলেন. 'না, বুঝতে পারলুম না। আমি মুখ্যু মেয়ে-মানুষ, কিন্তু ট্যারা হলেই যে পাষণ্ড হয় এমন কথা বাপের জন্মে শুনিনি। তাহলে ওখানে মেয়ের বিয়ে দেবে না? অমন পাত্র হাতছাড়া হয়ে যাবে?'

সাধুচরণ বলিলেন, 'তা আর উপায় কি, বল।'

সৌদামিনী ফিরিয়া দ্বারের দিকে যাইতে যাইতে বলিলেন. 'বেশ, যা ভাল হয় কর। সাবিত্রীর বিয়ের সময় কিন্তু এসব হাঙ্গামা হয়নি।'

সৌদামিনী দ্বার অতিক্রম করিয়া যাইবার পর সাধুচরণ তাঁহাকে ফিরিয়া ডাকিলেন। সৌদামিনী মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, 'কি বলবে বল, আমার ছিষ্টির কাজ পড়ে রয়েছে।'

সাধুচরণ একটু বিষণ্ণভাবে বলিলেন, 'আমি সন্ন্যাসী মানুষ, সংসারের বড় কিছু বুঝি না; আমার যা মনে হল বললুম। তোমরা যদি মনে কর ওখানে বিয়ে দিলেই ভাল হবে, তাই দাও। এসব বিষয়ে তুমি আর নিমাই আমার চেয়ে ভাল বোঝ, তোমাদের কাজে আমি ঝগড়া বাধিয়ে উৎপাত করতে চাই না।' বলিয়া চক্ষু বুজিয়া আবার কম্বলের উপর দেহ প্রসারিত করিলেন।

সৌদামিনী কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর নীরস স্বরে বলিলেন, 'তা আর কি করে হবে। তুমি হলে বাড়ির কর্তা. ভাল হোক. মন্দ হোক, তোমার হুকুমই মেনে চলতে হবে।' বলিয়া অসন্তোষপূর্ণ মেঘাচ্ছন্ন মুখে প্রস্থান করিলেন।

কয়েক দিন কাটিয়া গেল। কালীর বিবাহের কথাটা আপাততঃ ধামাচাপা পড়িয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু নানা খুঁটিনাটির ভিতর দিয়া সংসারে অসন্তোষ ও চিত্তক্ষোভ ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছিল। সাধুচরণের সেবাযত্ন লইয়াও একটু আধটু ত্রুটি হইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

বাড়িতে একমাত্র পুঁটু তাহার বাবার প্রতি ভালবাসা ও অনুরাগ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিল। সে ছেলেমানুষ, সাংসারিক ভালমন্দের জ্ঞান তাহাকে আক্রমণ করে নাই বলিয়াই বোধ করি সে নিরপেক্ষ রহিয়া গিয়াছিল।

বেলা এগারোটার সময় পুঁটু বাহির হইতে আসিয়া বলিল, 'মা, বাবার চান হয়ে গেছে, ভাত বাড়ো।' বলিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় একটা আসন পাতিতে প্রবৃত্ত হইল।

সৌদামিনী বলিলেন, 'আসন তুলে রাখ পুঁটু, এখন ভাত নামেনি।'

'ভাত নামেনি!' পুঁটু সোজা হইয়া বলিল, 'বা রে! বাবা চান করে বসে থাকবেন! কখন তোমাদের বলে গেছি—'

সৌদামিনী ধমক দিয়া বলিলেন, 'তুই থাম। যা বলছি কর, ভাঁড়ার থেকে দুটো বাতাসা আর এক ঘটি জল এখন দিয়ে আয়। ভাত নামতে দেরি হবে।'

পুঁটু রাগিয়া বলিল, 'কেন দেরি হবে! বাবার জন্যে একটু আগে ভাত চড়াতে পার না?'

'পুঁটু!'

'বুঝেছি গো বুঝেছি। দাদার মাঠ থেকে ফিরতে দেরি হয় তাই বেলা করে ভাত চড়ানো। দাদাই সব আর বাবা কেউ নয়।' পুঁটুর ক্রুদ্ধ দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

কথাটা সত্য। ধান কাটা চলিতেছিল, তাই প্রত্যহ নিমাইয়ের ফিরিতে দেরি হইত। সে খাটিয়া খুটিয়া আসিয়া ঠাণ্ডা ভাত খাইবে, এই বিবেচনায় সৌদামিনী বিলম্বে রান্না চড়াইতেছিলেন। পুঁটুর সত্য কথায় তিনি জ্বলিয়া উঠিলেন। কিন্তু কোনো কথা বলিবার পূর্বেই পুঁটু দুপ্ দুপ্ করিয়া পা ফেলিয়া প্রস্থান করিল। সৌদামিনী অন্ধকার মুখ করিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিলেন।

ইহার কিছুক্ষণ পরেই বাহিরে একটা হৈ চৈ ও কান্নার শব্দ উঠিল।

বাড়িসুদ্ধ লোক ছুটিয়া বাহিরে গিয়া দেখিল কৈবর্ত বিধু হাজরা সাধুচরণের পা দুটা ধরিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতেছে, এবং সেই সঙ্গে চীৎকার করিয়া যাহা বলিতেছে, তাহার একবর্ণও বুঝিতে না পারিয়া সাধুচরণ পা দুটির আশা ছাড়িয়া দিয়া হতভম্ব হইয়া বসিয়া আছেন। গণেশ বাড়ির একমাত্র ভৃত্য; সে সাধুচরণের বিপদ দেখিয়া তাড়াতাড়ি বিধু হাজরাকে সরাইয়া আনিয়া বলিল, 'কাঁদছ কেন বিধু, কি বলবে কর্তাবাবুকে পষ্ট করে বল না।'

বিধু হাজরার ক্রন্দন কিন্তু বন্ধ হইল না, তাহার কাঁচা-পাকা দাড়ি বহিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তবু অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার স্বরে সে বলিল, 'গরীবের মুখের গেরাস কর্তা! ঐ দেড় বিঘে জমির ওপরেই সারা বছরের ভরসা। আপনি সাধু সন্নিসি লোক তাই আপনার পায়েই ছুটে এলুম; আপনি না রক্ষে করলে গরীবকে আর কেউ রক্ষে করতে পারবে না।'

সাধুচরণ বিপন্নভাবে চারিদিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'কি হয়েছে, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

তখন অনেক যত্নে অনেক সওয়াল করিয়া কথাটা বিধু হাজরার নিকট হইতে উদ্ধার হইল। নিমাইয়ের জমির আলে বিধু হাজরার জমি; বিধু অন্যান্য বারের মত এবারও জমি চাষ-আবাদ করিয়াছে। কিন্তু ধান কাটিতে গিয়া দেখিল নিমাইবাবু তাহার ধান কাটিয়া লইতেছেন। বিধু ওজোর করায় নিমাইবাবু বলিয়াছেন যে জমি তাঁহার, তিনি নীলামে উহা খরিদ করিয়াছেন। বিধুর জমি অবশ্য কানাই মণ্ডলের কাছে বন্ধক ছিল; কিন্তু কবে যে কানাই মণ্ডল মোকদ্দমা করিয়াছে এবং তারপর আদালতের ডিক্রির জোরে জমি হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছে, বিধু কিছুই জানে না। সে নিশ্চিন্ত মনে জমি চাষ করিয়াছে, কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে ধান রোপাই হইবার বহু পূর্বে জমি নিমাইবাবুর দখলে চলিয়া গিয়াছিল। এখন ধান পাকিয়াছে দেখিয়া তিনি জোর করিয়া ধান কাটিয়া লইতেছেন।

ব্যাপারটা আগাগোড়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া সাধুচরণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। পাড়াগাঁয়ে এরূপ ঘটনা বিরল নয়। গরীব মূর্খ চাষা মহাজনের নিকট জমি বাঁধা দিয়া

টাকা ধার করে। তারপর কয়েক বৎসর নিরুপদ্রবে কাটিয়া যায়। হঠাৎ একদিন চাষা দেখে আদালতের ডিগ্রী জারি হইয়াছে, এমন কি আর একজন আসিয়া দখল লইয়া বসিয়া আছে—অথচ সে কিছুই জানে না। সে যখন জানিতে পারে তখন হাহাকার করা ছাড়া আর কোনও উপায়ই থাকে না।

বিধু আবার সাধুচরণের পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া বলিল, 'মরে যাব কর্তা, সগুষ্ঠি না খেতে পেয়ে মরে যাব। ঐ দেড় বিঘেই ভরসা, আর কোথাও এককাঠা জমি নেই—গাঁসুদ্ধ লোককে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন। আপনি আমার বাপতুল্যি, নিমাইদাদা আমার বাপের ঠাকুর—আপনারা গরীবকে মাথায় পা দিয়ে ডুবিয়ে দেবেন না।'

এই সময় নিমাই মাঠ হইতে ফিরিল। চণ্ডীমণ্ডপের দিকে একবার তাকাইয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিতেছিল, সাধুচরণ তাহাকে ডাকিলেন। নিমাই মুখ কালো করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

সাধুচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বিধু যা বলছে তা সত্যি? তুমি ওর জমি নীলামে খরিদ করে নিয়েছ।'

সংক্ষেপে নিমাই বলিল, 'হ্যাঁ।'

সাধুচরণ একটু চুপ করিয়া বলিলেন, 'কাজটা ওকে জানিয়ে করলেই ভাল হত না কি?'

নিমাই বলিল, 'যার জমি মহাজনের কাছে বন্ধক আছে সে নিজে খোঁজ রাখে না কেন? আমি তো লুকিয়ে কিনিনি, সদর নীলেমে কিনেছি।'

সাধুচরণ ব্যথিত স্বরে বলিলেন, 'সে কথা ঠিক, নিমাই। কিন্তু জমি যখন দখল করলে তখনও কি ওকে জানানো তোমার উচিত ছিল না? ও গরীব মানুষ, খরচপত্র করে পরিশ্রম করে ধান উবজেছে, সেই ধান তুমি কেটে নিচ্ছ—'

অবরুদ্ধ ক্রোধের স্বরে নিমাই বলিয়া উঠিল, 'কে বলে ও ধান উবজেছে! আনুক দেখি একজন সাক্ষী।' বলিয়া আরক্ত চক্ষে চারিদিকে চাহিল; সকলেই জানিত কে ধান উৎপন্ন করিয়াছে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিবার সাহস কাহারও হইল না।

হতাশ সুরে সাধুচরণ বলিলেন, 'সাক্ষীসাবুদ হয়তো বিধু আনতে পারবে না, কিন্তু সত্যি ও-ই তো জমি চাষ করেছে। জমি যদি তোমারই হয়, তবু যখন চাষ করেছে তখন অন্ততঃ অর্ধেক ধান তো ওর প্রাপ্য—'

'আমি পারব না! জমি আমার, আমি চাষ করেছি। বিধুর ক্ষমতা থাকে আদালত থেকে ধান আদায় করে নিক্।' বলিয়া নিমাই আর বাগ্‌বিতণ্ডা করিবার জন্য দাঁড়াইল না, ক্রোধবিকৃত মুখে দ্রুতপদে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিল।

রেলের ইঞ্জিনের মত ধীরে ধীরে গতি সঞ্চয় করিয়া এতদিনে এই পরিবারের ঘটনাবলী হঠাৎ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে আরম্ভ করিল। সেদিন মধ্যাহ্নে এই ব্যাপার ঘটিল, তাহার পরদিন হাটবার। গণেশ ভৃত্য বাড়ির কাজ সারিয়া হাটে যাইবার জন্য সৌদামিনীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; গ্রাম হইতে প্রায় ক্রোশ তিনেক দূরে হাট বসে, সপ্তাহে একবার করিয়া সেখান হইতে সংসারের বাজার-হাট, প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনিয়া আনা হয়।

সৌদামিনী বাজারের পয়সা গণেশকে বুঝাইয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, গণেশ কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, 'মা—'

'কি রে—' বলিয়া সৌদামিনী ফিরিলেন।

গণেশ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, 'মা, আর চার আনা পয়সা চাই।'

সৌদামিনী আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, 'আর চার আনা পয়সা! কি হবে?'

লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিয়া গণেশ আস্তে আস্তে বলিল, 'বড়বাবু বললেন, হাট থেকে চার আনার গাঁজা কিনে আনতে।'

সৌদামিনী যেন পাথর হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ তাঁহার বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। তারপর সভয়ে একবার চারিদিকে তাকাইয়া আঁচল হইতে চার আনা পয়সা গণেশের হাতে ফেলিয়া দিয়া তিনি দ্রুতপদে নিজের শয়নঘরে প্রবেশ করিলেন; গণেশের মুখের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিতে পারিলেন না। লজ্জায় ও ধিক্কারে তাঁহার সমস্ত অন্তর ছি ছি করিতে লাগিল। ,

সেদিন সৌদামিনী আর ঘর হইতে বাহির হইলেন না, শরীর অসুস্থ বলিয়া মেঝেয় একটা কম্বলের উপর পড়িয়া রহিলেন। রাত্রেও জলস্পর্শ করিলেন না। কালী ও পুঁটু তাঁহার সহিত একশয্যায় শয়ন করিত; তাহারা ঘুমাইয়া পড়িলে, রাত্রি প্রায় এগারোটার সময় তিনি শয্যা ছাড়িয়া উঠিলেন। নিঃশব্দে দরজা খুলিয়া বাহিরে স্বামীর ঘরে গেলেন।

সাধুচরণ তখন কম্বলের উপর যোগাসনে বসিয়া ছিলেন. রক্তনেত্র মেলিয়া চাহিলেন।

দ্বার ভেজাইয়া দিয়া সৌদামিনী একবার ঘরের চারিদিকে চাহিলেন, ঘরে কেহ নাই। তখন তিনি দুইবার নিশ্বাস টানিয়া তিক্ত চাপা স্বরে বলিলেন, 'মুখুজ্যে খুড়ো তাহলে মিথ্যে বলেনি!'

সাধুচরণের মৌতাত তখন জমাট বাঁধিয়াছে, তিনি গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, 'কি বলেছে মুখুজ্যে খুড়ো?'

'যা বলেছে তা সত্যি। বলেছে তুমি গাঁজা খাও।'

মাথাটি দুলাইতে দুলাইতে সাধুচরণ বলিলেন, 'হ্যাঁ, খাই! গাঁজা খেলে সাধন-মার্গের সুবিধে হয়।' বলিয়া ফিক করিয়া হাসিলেন।

সৌদামিনী জ্বলিয়া উঠিলেন, 'পোড়া কপাল তোমার সাধনমার্গের। ও কথা মুখে আনতে লজ্জা করে না! আর, সাধন করতে যদি চাও তবে ঘরে ফিবে এলে কেন?—উঃ. আমার সোনার সংসার দু' দিনে উচ্ছন্ন গেল!'

সাধুচরণ ঈষৎ গরম হইয়া বলিলেন, 'উচ্ছন্ন গেল কেন?'

'কেন! তুমি এই কথা জিজ্ঞেস করছ! মেয়ের অমন চমৎকার সম্বন্ধ তুমি ভেঙে দিলে। ছেলে ঠাকুরমন্দিরে চাকরি জোগাড় করে দিলে, তাও তোমার গাঁজা খাওয়ার জন্যে ভেস্তে গেল। তারপর আবার জমিজমা নিয়ে ছেলের পেছনে লেগেছ, কোথাকার কে বিধু হাজরা. তার হয়ে ছেলের সঙ্গে লড়াই করছ। এখন আবার চাকর-বাকরকে দিয়ে গাঁজা আনিয়ে সদরে গাঁজা খাওয়া আরম্ভ করলে! উচ্ছন্ন যাওয়া আর কাকে বলে শুনি!'

সাধুচরণ হঠাৎ সপ্তমে চড়িয়া গেলেন, চীৎকার করিয়া বলিলেন. 'বেশ করি গাঁজা খাই, আমার খুশী আমি খাব। এ সংসার কার? জমিজমা ঘরবাড়ি কার? আমার! আমি যা ইচ্ছে করব।'

সৌদামিনীর দুই চক্ষে আগুন ছুটিতে লাগিল, তীব্র অনুচ্চকণ্ঠে বলিলেন, 'চেঁচিও না অত—সবাই ঘুমুচ্ছে। জমিজমা ঘরবাড়ি একদিন তোমার ছিল বটে, কিন্তু এখন আর নেই। জমিদারী সেরেস্তায় খোঁজ নিলেই জানতে পারবে। এখন নিমাই মালিক, সে-ই এ বাড়ির কর্তা; তোমার উৎপাত করবার কোনো অধিকার নেই—

বুঝলে?'

ভ্রূমধ্যে অকস্মাৎ হাতুড়ির ঘা খাইয়া যেন সাধুচরণের নেশা ছুটিয়া গেল। সৌদামিনীর এ রকম চেহারা তিনি পূর্বে কখনও দেখেন নাই; তিনি ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিলেন। তারপর মূঢ়ের মত বলিলেন, 'আমার কোনো অধিকার নেই!'

'না, নেই। এই কথাটা ভাল করে বুঝে নাও। তোমার ঐ সব লক্ষ্মীছাড়া বৃত্তি এ বাড়িতে চলবে না। এই আমি শেষ কথা বলে গেলুম।' বলিয়া জ্বলন্ত মশালের মত সৌদামিনী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

অল্পমাত্র ভোর হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তখনও কাক-কোকিল ডাকে নাই, এমন সময় সৌদামিনীর ঘরের দরজায় মৃদু টোকা পড়িল। সৌদামিনীর চোখে নিদ্রা ছিল না, তিনি শুষ্ক চক্ষু মেলিয়া শুইয়া ছিলেন, উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দেখিলেন সাধুচরণ দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার গায়ে সেই প্রথম দিনের আলখাল্লা, কাঁধে কম্বল, বগলে সেই পুরাতন ঝুলি।

সৌদামিনীকে হাতের ইসারায় একটু দূরে লইয়া গিয়া মৃদুকণ্ঠে সাধুচরণ বলিলেন, 'লক্ষ্মী, আমি যাচ্ছি।'

সৌদামিনীর কণ্ঠে কে যেন চাপিয়া ধরিল, তিনি রুদ্ধশ্বাসে বলিলেন, 'যাচ্ছ।'

'হ্যাঁ লক্ষ্মী, সংসারে আর আমার মন টিকছে না।'

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া সৌদামিনী অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, 'আমার কথায় রাগ করে কি তুমি চলে যাচ্ছ?'

মাথা নাড়িয়া সাধুচরণ বলিলেন, 'না, সেজন্যে নয়। কিন্তু তোমার কথা সত্যি। সংসারে আমার অধিকার নেই।' একটু থামিয়া বলিলেন, 'প্রথম যেদিন সংসার ছেড়ে গিয়েছিলুম, সেদিন ভুল করেছিলুম; আবার যেদিন ফিরে এলুম, সেদিন তার চেয়ে বড় ভুল করলুম। ভুলে ভুলেই জীবনটা কেটে গেল, সত্যিকার পথ চিনে নিতে পারলুম না—ললাট-লিখন।'

সৌদামিনীর নিকট হইতে কোনও জবাব আসিল না। সাধুচরণ তখন ঈষৎ হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, 'তোমাদের একটা কম্বল নিয়েছি, বোধ হয় সেজন্যে কোনও অসুবিধে হবে না। আচ্ছা, তাহলে চল্লুম লক্ষ্মী, আর দেরি করব না। অন্ধকার থাকতে থাকতে গ্রাম পেরিয়ে যেতে চাই।'

সাধুচরণ তবু একটু ইতস্ততঃ করিলেন, হয়তো সৌদামিনীর নিকট হইতে একটা মৌখিক বাধানিষেধও প্রত্যাশা করিলেন। তারপর উদ্গত দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া নিরাশ্রয় আত্মীয়হীন পৃথিবীর পথে পা বাড়াইলেন। যাইবার সময় খোলা দরজা দিয়া পুঁটুর ঘুমন্ত মুখখানি একবার সতৃষ্ণ নয়নে দেখিয়া লইলেন।

সৌদামিনী কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার চোখ দিয়া নিঃশব্দে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল বটে, কিন্তু একটা 'না' বলিয়াও তিনি স্বামীর গতিরোধ করিতে পারিলেন না।

তখন রোদ উঠিয়াছে। শয়নঘর হইতে বাহিরে আসিয়া সৌদামিনী ভারী গলায় সদ্যোত্থিতা বধূকে বলিলেন, 'বৌমা, পুকুরে একটা ডুব দিয়ে এসে তাড়াতাড়ি রান্না চড়িয়ে দাও, নিমু আজ শহরে যাবে।' বধূর চোখে সপ্রশ্ন দৃষ্টি দেখিয়া বলিলেন,

কালীর জন্যে যে পাত্রটি দেখা হয়েছিল তাদের সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করতে হবে তো। সামনেই আবার পৌষ মাস।'

৩ কার্তিক ১৩৪২

শালীবাহন

শালীবাহনের আসল নামটা কি ছিল ভুলিয়া গিয়াছি। বোধ করি ধীরেন সুরেন গোছেরই একটা কিছু হইবে। গত বিশ বছর ধরিয়া ক্রমাগত নিজেকে ঐ নামে সম্বোধিত হইতে শুনিয়া তাহার নিজেরও সম্ভবত পিতৃদত্ত নামটা বিস্মরণ হইয়াছিল।

আশ্চর্য নয়। একেবারে ন্যালা-ক্যাবলা না হইলেও শালীবাহনের মত গো-বেচারি সদা-বিকশিত-দন্ত নিরীহ মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। আমাদের বিরাট বন্ধু-গোষ্ঠীর মধ্যে সকলেই তাহাকে তাচ্ছিল্যভরে ভালবাসিতাম। আমাদের উপহাস পরিহাসের সে ছিল পরম সহিষ্ণু লক্ষ্যস্থল।

বছর কুড়ি আগে শালীবাহনের প্রথম বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহ করিয়াই সে শ্বশুর পরিবারের সঙ্গে বেবাক মিশিয়া গেল। প্রায়ই ছোট ছোট শালীদের সঙ্গে লইয়া পার্কে বেড়াইতে যাইত; একটি শালীর বয়স আট-নয় বছর, বাকি দুটি একেবারে কচি। আমাদের মধ্যে কেহ একজন একবার শালীবাহনকে কোঁচার খুঁট দিয়া কচি শালীর নাক মুছাইয়া দিতে দেখিয়া ফেলিয়াছিল; কথাটা তৎক্ষণাৎ বন্ধু সমাজে রাষ্ট্র হইয়া গেল এবং তাহার অনিবার্য ফল দাঁড়াইল তাহার শালীবাহন খেতাব।

শালীবাহনের শ্বশুর গুণময়বাবু যে একজন অতি কূটবুদ্ধি লোক ছিলেন তাহার প্রথম প্রমাণ এই যে, জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহের পরই তিনি জামাতার হাতে সংসার তুলিয়া দিয়া পরম আরামে তামাক টানিতে লাগিলেন। শালীবাহন তখন চাকরি করিতে আরম্ভ করিয়াছে, দন্ত বিকশিত করিয়া শ্বশুর ও তাঁহার চারিটি কন্যার ভার গ্রহণ করিল।

এইভাবে বছর পাঁচেক কাটিয়া গেল। শালীবাহন খুশী, গুণময়বাবু খুশী, শ্যালিকারাও খুশী—এক কথায় সকলেই খুশী—কাহারো মনে কোন দুঃখ নাই। এমন সময় শালীবাহনের জীবনের প্রথম ট্রাজেডি দেখা দিল।

তাহার স্ত্রী সহসা মারা গেল। শালীবাহন একে ভালমানুষ, তায় পত্নীর বড়ই অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল; এই ঘটনায় সে একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। তাহার দাঁতের হাসি কেমন যেন ফ্যাকাসে হইয়া গেল; রুক্ষ মাথায়, অপরিচ্ছন্ন বেশে এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

একদিন আমাদের আড্ডায় বসিয়া স্ত্রীর শেষ রোগের কথা বলিতে বলিতে বেচারি একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল। সুধাংশু আমাদের মধ্যে কুমার-ব্রহ্মচারী, বিবাহ করে নাই; সে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিল, 'কি আর করবে শালীবাহন, দুঃখ করে লাভ নেই। কথায় বলে ভাগ্যবানের বৌ মরে, আর অভাগার ঘোড়া। তুমি দেখে শুনে আর একটি বিবাহ করে ফেল।'

চোখ মুছিয়া শালীবাহন বলিল, 'আর ওসব ভাল লাগে না ভাই;—অফিসে যাই, তাও মনে হয় কার জন্যে—'

শালীবাহনের উদাসীনতা এতদূর গড়াইল যে, সে শালীদের পর্যন্ত অবহেলা করিতে লাগিল। দেখিয়া শুনিয়া গুণময়বাবু অতিশয় শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন।

এদিকে শালীবাহনের মেজ শালীটি উপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। গুণময়বাবু তাহার বিবাহ দিতে পারিতেছিলেন না, কারণ কন্যার বিবাহ দিবার পক্ষে যে বস্তুটি অপরিহার্য তাহা গুণময়বাবুর ছিল না। তিনি কয়েক ছিলিম তামাক পোড়াইয়া শালীবাহনকে সংসারের অনিত্যতা ও সংসারী মানুষের সর্ব অবস্থায় গৃহধর্মপালন-রূপ মহাকর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান-গরিষ্ঠ উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন।

বৎসর ঘুরিবার পূর্বেই মেজশালীর সহিত শালীবাহনের বিবাহ হইয়া গেল।

আবার সকলেই খুশী। শালীবাহনের বিকশিত-দন্তে পূর্বতন হাসি দেখা দিল। বিবাহের বছরখানেকের মধ্যে সে দিব্য মোটা হইয়া উঠিতে লাগিল। আমাদের বন্ধু সভার সিদ্ধান্ত হইল, এতদিনে শালীবাহনের গায়ে 'বিয়ের জল' লাগিয়াছে।

তারপর একটি একটি করিয়া বছর কাটিয়া চলিল। পিছু ফিরিয়া তাকাইবার সময় নাই, আশেপাশে তাকাইবারও সময় কম—স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছি। যে-স্রোতে প্রথম যৌবনে খেলাচ্ছলে সাঁতার কাটিয়া স্রোত তোলপাড় করিতাম, তাহাতে নাকানি-চোবানি খাইতেছি, কখন বা অতি কষ্টে নাক জাগাইয়া রাখিয়াছি। বন্ধুগোষ্ঠীর অনেকেই কে কোথায় ছিটকাইয়া পড়িয়াছে। দশ বছর আগে যাহারা হৃদয়ের কাছাকাছি ছিল, আজ তাহারা কোথায়?

শালীবাহন কিন্তু বিপুল বিক্রমে সাঁতার কাটিয়া চলিয়াছে। তাহার গণ্ড আরো স্ফীত হইয়াছে, হাসি আর প্রসারিত হওয়া অসম্ভব তাই পূর্ববৎ আছে। দশ বছর তাহার মনকে যেন স্পর্শ করিতে পারে নাই।

কিন্তু যে নিয়মে গাছের কাঁচা ফল পাকে, সেই নিয়মে তাহার কচি শালী দুটিও পাকিয়া উঠিয়াছে। শালীবাহন চাকুরি করিয়া যে টাকা উপার্জন করে তাহাতে শ্বশুর পরিবারের ভরণ-পোষণ চলে, কিন্তু শালীদের সুপাত্রে ন্যস্ত করা চলে না। তাহারা লম্বোদয়া চান্দ্রমসী লেখার ন্যায় দিনে দিনে পরিবর্ধমানা হইতে লাগিল।

অনূঢ়া কন্যা দুটির বয়স যখন যথাক্রমে উনিশ এবং কুড়ি, সেই সময় কূটবুদ্ধি গুণময়বাবু একটা মস্ত চাল চালিলেন। তিনি হঠাৎ শালীবাহনকে কোনরূপ নোটিস না দিয়া মরিয়া গেলেন।

শালীবাহনের জীবনের ইহা দ্বিতীয় ট্রাজেডি। শালী দুটি তাহার ঘাড়ে তো ছিলই, এখন আরো চাপিয়া বসিল।

শালীদের বিবাহ দিবার দায়িত্ব যতদিন শ্বশুরের সঙ্গে ভাগাভাগি ছিল ততদিন শালীবাহন বিশেষ গা করে নাই। কিন্তু এখন সে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল; দন্ত-বিকাশ করিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে লাগিল। আমাদের বন্ধু নলিনাক্ষ সম্প্রতি বিপত্নীক হইয়াছিল, তাহার বাড়িতে গিয়া ধর্ণা দিল; আমার বাড়িতেও ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করিল। আমার একটি অবিবাহিত ছোট ভাই আছে, লক্ষ্য তাহার উপর।

কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হইল না। শালীবাহনের শালীদের বিনা পারিশ্রমিকে তাহার স্কন্ধ হইতে নামাইয়া নিজ স্কন্ধে বহন করিতে কেহ রাজী নয়। শালীবাহনের হাসি ক্রমশ নিস্তেজ হইয়া আসিতে লাগিল; তাহার গোঁফের চুল দু'একটা পাকিয়া গেল। বুঝিলাম, সংসারস্রোত এতদিনে তাহাকেও কাবু করিয়া আনিয়াছে।

একদিন আমার বৈঠকখানায় তাহাকে কিছু সদুপদেশ দিলাম,—

'দ্যাখ শালীবাহন, ওসব ধান্ধা ছেড়ে দাও। টাকা থাকলে, মেয়ে না থাকলেও তার বিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু মেয়ে থাকলে—আর টাকা না থাকলে বিয়ে দেওয়া যায় না। এই সহজ কথাটা বুঝে নাও। আজকাল কত মাইনে পাচ্ছ?'

'পঁচাত্তর।'

'হুঁ। কিছু বাঁচিয়েছ?'

'কোত্থেকে বাঁচাব ভাই। খেতে পরতেই কুলোয় না, তার উপর বাড়িভাড়া আছে। শ্বশুর যতদিন বেঁচে ছিলেন, তিনি তবু সতেরো টাকা করে পেন্সন পেতেন, কিন্তু এখন—, আমরা চারটি প্রাণী, আর সম্বলের মধ্যে ঐ পঁচাত্তর টাকা। ভাগ্যে ছেলেপুলে হয়নি তাই কোন রকমে চলে যাচ্ছে। বুঝতেই তো পারছ।'

'বুঝেছি। বিয়ে দেবার আশা ছেড়ে দাও; তোমার শালীরা এমন কিছু সুন্দরী নয় যে বিনা পণে কেউ নেবে। আজকাল অনেক মেয়ে-স্কুল হয়েছে, দেখেশুনে তাই তে মাস্টারণী করে দাও।'

'কিন্তু ভাই, লেখাপড়াও তো এমন কিছু শেখেনি যে স্কুলে শেখাতে পারে। রামায়ণটা মহাভারতটা পড়তে পারে এই পর্যন্ত বিদ্যে; কি করি বল।' বলিয়া অসহায়-ভাবে আমার পানে তাকাইয়া রহিল।

বড় বিরক্তি বোধ হইল, অধীরভাবে বলিলাম, 'তবে আর কি করবে, শালী দুটিকে কাঁধে করে নিয়ে বসে থাক। বিয়ে ওদের হবে না, আমি লিখে পড়ে দিলুম। আর আমার ভায়ের কথা যে বলছ, জানো তো সে ভাল ছেলে, য়ুনিভার্সিটিতে ভাল রেজাল্ট্ করেছে। তার ইচ্ছে বিলেত যায়; কিন্তু আমার এমন টাকা নেই যে তাকে বিলেত পাঠাই, শ্বশুরের পয়সায় সে যাতে বিলেত যেতে পারে সে চেষ্টা আমার করা উচিত নয় কি? তুমিই বল।'

শালীবাহন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তারপর পাংশু হাসিয়া বলিল, 'হ্যাঁ, ঠিক কথা। আচ্ছা ভাই, আজ তাহলে উঠি।' বলিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া চলিয়া গেল।

তারপর মাসছয়েক আর তাহার দেখা পাইলাম না। খবর পাইতাম সে এখনো আশা ছাড়ে নাই, এখানে ওখানে শালীদের জন্য চেষ্টা করিতেছে।

এইবার শালীবাহনের জীবনের তৃতীয় ট্রাজেডি। একদিন শুনিলাম, তাহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীটিও মারা গিয়াছে। তাহার জন্য মনে একটা বেদনা অনুভব করিলাম। পৃথিবীতে যে যত ভালমানুষ, শাস্তি কি তাহাকেই সব চেয়ে বেশী সহিতে হয়? সেদিন তাহার প্রতি রূঢ় ব্যবহার করিয়াছিলাম স্মরণ করিয়া একটু অনুতাপও হইল।

তারপর আরও বছরখানেক কাটিয়া গেল। শালীবাহনের সহিত দেখা সাক্ষাৎ নাই; তাহার খবরও পাই না। পুরাতন পরিচিতদের সংসর্গে সে আর আসে না; নলিনাক্ষের আশাও ছাড়িয়াছে।

অবশেষে পূজার সময় কলেজ স্ট্রীটের একটা বড় কাপড়ের দোকানে হঠাৎ শালীবাহনের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। আশ্চর্য হইয়া দেখিলাম, তাহার মুখে সেই পুরাতন বিকশিত-দন্ত হাসি ফিরিয়া আসিয়াছে। সানন্দে তাহার পিঠ চাপড়াইয়া

বলিলাম, 'আরে শালীবাহন! কেমন আছ?'

শালীবাহন এক জোড়া সস্তা সিল্কের জংলা শাড়ি দেখিতেছিল, সরাইয়া রাখিয়া হাসি মুখে বলিল, 'ভাল আছি ভাই।'

'তারপর, তোমার শালীদের খবর কি? বিয়ে হল?'

সলজ্জভাবে শালীবাহন বলিল, 'হ্যাঁ ভাই, হয়েছে। মানে—আমিই তাদের বিয়ে করেছি।'

স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

'বল কি! দু'জনকেই?'

'হ্যাঁ ভাই, দু'জনকেই। কি করি বল, কোথায় ফেলি ওদের? পয়সা নেই, পাত্র তো আর পেলুম না। স্ত্রীও মারা গেলেন। তাই শেষ পর্যন্ত—'

আমি আবার তাহার পিঠ ঠুকিয়া দিয়া বলিলাম, 'খাসা করেছ। বাহাদুর লোক বটে তুমি।'

শালীবাহন স্মিতমুখে নীরব হইয়া রহিল। আমি বলিলাম, 'যাক, মোটের উপর ভালই আছ তাহলে! অন্তত শালী-দায় থেকে তো উদ্ধার পেয়েছ। তা তোমার শালীরা কোন আপত্তি করলে না? আজকালকার মেয়ে—'

শালীবাহন বলিল, 'না, আপত্তি করেনি। আর করলেই বা উপায় কি ছিল বল। স্ত্রী মারা গেলেন; বাড়িতে আর দ্বিতীয় লোক নেই—আমি আর ওরা। ভাল দেখায় না—ওরা সোমত্ত হয়েছে, বুঝলে না? কাজেই—'

আমি সজোরে হাসিয়া উঠিলাম, 'তা বটে। যাক, শ্বশুর-কন্যার কোনটিকেই বাদ দিলে না। সাবাস শালীবাহন!'

শালীবাহন চোখ টিপিয়া খাটো গলায় বলিল, 'আস্তে! ওরা রয়েছে।'

চমকিয়া ফিরিয়া দেখিলাম। অদূরে দাঁড়াইয়া দুইটি যুবতী কাপড় পছন্দ করিতেছিল—লক্ষ্য করি নাই; এখন একযোগে তীক্ষ্ণ তীব্রদৃষ্টিতে আমার পানে তাকাইয়া আছে। থতমত খাইয়া গেলাম। শালীবাহন স্ত্রীদের লইয়া পূজার বাজার করিতে আসিয়াছে! লজ্জায় অস্পষ্টস্বরে শালীবাহনকে আমার বাড়িতে একদিন যাইতে বলিয়া তাড়াতাড়ি দোকান হইতে বাহির হইয়া গেলাম।

পথে যাইতে যাইতে যুবতী দুটির চোখের সেই দৃষ্টি আমাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। ভর্ৎসনা আর অভিমান! সত্যই তো, এ লইয়া হাসি তামাসা করিবার আমার কি অধিকার আছে? মনে হইতে লাগিল, ঐ ভর্ৎসনা আর অভিমানের সমস্তটাই আমার প্রাপ্য।

কিন্তু সে যাই হোক, শালীবাহনের শালী দুটি দেখিতে নেহাত মন্দ নয়। শালীবাহনকে ভাগ্যবান পুরুষ বলিতে হইবে।

৯ ভাদ্র ১৩৪৩

মায়ামৃগ

এই কাহিনীটি আমার নিজস্ব নয়; অর্থাৎ মস্তিষ্কের মধ্যে ধূমে বিশেষ সহযোগে ইহার উৎপত্তি হয় নাই। তাই সর্বাগ্রে নিজের সমস্ত দাবী-দাওয়া তুলিয়া লওয়া উচিত বিবেচনা করিতেছি।

যে হঠাৎ-লব্ধ বন্ধুটির মুখে এ কাহিনী শুনিয়াছিলাম, তিনি নিজের চারিধারে এমন একটি দুর্ভেদ্য রহস্যের জাল রচনা করিয়া রাখিয়াছিলেন যে তাঁহার গল্পকে ছাপাইয়া তাঁহার নিজের সম্বন্ধেই একটা প্রবল কৌতূহল আমার মনে রহিয়া গিয়াছে। মাত্র দুইবার তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম, তারপর তিনি সহসা অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। জানি না, এখন তিনি কোথায়। হয়তো শ্যামদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে দুরারোহ গিরি-সংকটের মধ্যে সেই অদ্ভুত মায়ামৃগের অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছেন। তবে নিশ্চয় ভাবে বলিতে পারি না; শুনিয়াছি বড় বড় শিকারীদের কথা একটু লবণ সহযোগে গ্রহণ করিতে হয়।

এই কাহিনী আমি যেমনটি শুনিয়াছিলাম ঠিক তেমনটিই লিপিবদ্ধ করিব। কয়েক স্থানে বুঝিতে পারি নাই, সুতরাং কাহাকেও বুঝাইতে পারিব না। ভরসা শুধু এই, যাঁহারা ইহা পড়িবেন তাঁহারা সকলেই আমা-অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান, বুঝিবার মত ইঙ্গিত কিছু থাকিলে তাঁহারা নিশ্চয় বুঝিয়া লইবেন, এবং কাহিনীটি যদি নিছক আষাঢ়ে গল্পই হয়, তাহা হইলেও তাঁহাদের ধরিয়া ফেলিতে বিলম্ব হইবে না। আমি কেবল মাছি-মারা ভাবে অবিকল পুনরাবৃত্তি করিয়া খালাস।

গত শীতকালে একদিন দুপুরবেলা হঠাৎ খেয়াল হইল পক্ষিশিকারে বাহির হইব। বড়দিনের ছুটি যাইতেছে, শীতও বেশ কন্‌কনে। বৎসরের মধ্যে ঠিক এই সময়টাতে, কেন জানি না, পক্ষিজাতির উপর নিদারুণ জিঘাংসা জাগিয়া উঠে।

সঙ্গী পাইলাম না; একাই বাইসিকেল আরোহণে বাহির হইয়া পড়িলাম। শহরের চার-পাঁচ মাইলের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড বন আছে, শস্যপুষ্ট নানাজাতীয় পক্ষী এই সময় তাহাতে ভিড় করিয়া থাকে।

সারা দুপুরটা জঙ্গলের মধ্যে মন্দ কাটিল না। কয়েকটা পাখিও জোগাড় হইল। কিন্তু অপরাহ্নে বাড়ি ফিরিবার কথা যখন স্মরণ হইল তখন দেখি, অজ্ঞাতে শিকারের সন্ধানে ঘুরিতে ঘুরিতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি—প্রায় বারো মাইল। শরীরও বেশ ক্লান্ত হইয়াছে এবং পাকস্থলী অত্যন্ত নির্লজ্জ ভাবে নিজের রিক্ততা ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

শীঘ্র বাড়ি পৌঁছিতে হইবে। বন হইতে পাকা সড়কে উঠিয়া গৃহাভিমুখে বাইসিকেল চালাইলাম। গৈরিক ধূলায় সমাচ্ছন্ন পথ, দু-ধারে কখনও অড়রের ঘন-পল্লব ক্ষেত, কখনও নিসিন্দের ঝাড়; কখনও বা ধূম-চন্দ্রাতপে ঢাকা ক্ষুদ্র দু-একটা বস্তি।

যথাসম্ভব দ্রুতবেগে চলিয়াছি; আলো থাকিতে থাকিতে বাড়ি পৌঁছিতে পারিলেই ভাল; কারণ বাইসিকেলের বাতি আনিতে ভুলিয়া গিয়াছি।

দিনের আলো ক্রমে নিবিয়া আসিতে লাগিল। গো-ক্ষুর ধূলায় শীত-সন্ধ্যার অবসন্ন

দীপ্তি আরও নিষ্প্রভ হইয়া গেল। এই আধা-আলো-অন্ধকারের ভিতর দিয়া নিষ্করুণ দীর্ঘ পথটা মৃত সর্পের মত পড়িয়া আছে মনে হইল।

চার-পাঁচ মাইল অতিক্রম করিবার পর দেখিলাম হাত দুটা শীতের হাওয়ায় অসাড় হইয়া আসিতেছে; বাইসিকেলের হ্যাণ্ডেল ধরিয়া আছি কিনা টের পাইতেছি না। দু-একবার ক্ষুদ্র ইটের টুকরায় ঠোকর খাইয়া পড়ি-পড়ি হইয়া বাঁচিয়া গেলাম। রাস্তার উপর কোথায় কি বিঘ্ন আছে, আর ভাল দেখিতে পাইতেছি না।

আরও কিছু দূর গিয়া বাইসিকেল হইতে নামিতে হইল। দ্বিচক্রযানে আরোহণ আর নিরাপদ নয়, এই স্থানে বাইসিকেল হইতে আছাড় খাইলে অবস্থা আরও সংগীন হইয়া উঠিবে।

এইবার সমস্ত চেতনাকে অবসন্ন করিয়া নিজের অবস্থাটা পরিপূর্ণ ভাবে হৃদয়ঙ্গম হইল। পৌষ মাসের অন্ধকার রাত্রে ক্ষুধার্ত ক্লান্ত দেহ লইয়া গৃহ হইতে ছয়-সাত মাইল দূরে পথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছি। কোথাও জনপ্রাণী নাই; সংগীর মধ্যে কয়েকটা মৃত পক্ষী, একটা ভারী বন্দুক এবং ততোধিক ভারী অকর্মণ্য দ্বিচক্রযান। এইগুলিকে বহন করিয়া বাড়ি পৌঁছিতে হইবে। পথ পরিচিত বটে, কিন্তু অন্ধকারে দিগ্‌ভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম নয়। নিজের অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া নৈরাশ্যে হাত-পা যেন শিথিল হইয়া গেল।

কিন্তু তবু দাঁড়াইয়া থাকিলে চলিবে না। দিল্লী দুরস্ত! যেমন করিয়া হোক বাড়ি পৌঁছানো চাই! বাইসিকেল ঠেলিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিলাম। এই দুঃসময়েও কবির বাক্য মনে পড়িয়া গেল—

ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ, ক'রো না পাখা।

কবির বিহঙ্গের অবস্থা আমার অপেক্ষাও শোচনীয় হইয়াছিল বলিয়া মনে হইল না।

বোধ হয় এক ঘণ্টা এইভাবে চলিলাম। শীতে ক্ষুধায় ক্লান্তিতে শরীর অবশ হইয়া গিয়াছিল, মনটাও সেই সঙ্গে কেমন যেন আচ্ছন্ন ও সাড়হীন হইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ সচেতন হইয়া মনে হইল, পথ হারাইয়া ফেলিয়াছি; কারণ পায়ের নীচে পাকা রাস্তার কঠিন প্রস্তরময় স্পর্শ আর পাইতেছি না,—হয় কাঁচা পথে নামিয়া আসিয়াছি, নয়তো অজ্ঞাতসারেই মাঠের মাঝখানে উপস্থিত হইয়াছি। সভয়ে দাঁড়াইয়া পড়িলাম। রন্ধ্রহীন অন্ধকারে পৃথিবীর সমস্ত দৃশ্য লেপিয়া মুছিয়া একাকার হইয়া আছে—কোনও দিকে দৃষ্টি চলে না। কেবল ঊর্ধ্বে নক্ষত্রগুলা শিকারী জন্তুর নিষ্করুণ চক্ষুর মত আমার পানে নির্নিমেষ লুব্ধতায় তাকাইয়া আছে।

এই নূতন বিপৎপাতের ধাক্কাটা সামলাইয়া লইয়া ভাবিলাম, যেদিকে হোক চলিতে যখন হইবেই তখন সামনে চলাই ভাল; পিছু ফিরিলে হয়তো আবার জঙ্গলের দিকেই চলিয়া যাইব। এটা যদি কাঁচা রাস্তাই হয় তবে ইহার প্রান্তে নিশ্চয় লোকালয় আছে। একটা মানুষের সাক্ষাৎ পাইলে আর ভাবনা নাই।

লোকালয় ও মানুষের সাক্ষাৎকার যে একেবারে আসন্ন হইয়া পড়িয়াছে তাহা তখনও বুঝিতে পারি নাই।

দু-পা অগ্রসর হইয়াছি এমন সময় চোখের উপর একটা তীব্র আলোক জ্বলিয়া উঠিল এবং আলোকের পশ্চাৎ হইতে কড়া সুরে প্রশ্ন আসিল, 'কে! কৌন্ হ্যায়?'

আলোকের অসহ্য রূঢ়তা হইতে অনভ্যস্ত চক্ষুকে বাঁচাইবার জন্য একটা হাত আপনা হইতে মুখের সম্মুখে আসিয়া আড়াল করিয়া দাঁড়াইল; তখন আরও কড়া হুকুম আসিল, 'হাত নামাও। কে তুমি?'

হাত নামাইলাম; কিন্তু কি বলিয়া নিজের পরিচয় দিব ভাবিয়া পাইলাম না, দু-বার 'আমি—আমি' বলিয়া থামিয়া গেলাম।

আলোকধারী আরও কাছে আসিয়া আমাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল। এতক্ষণে আমার চক্ষুও আলোকে অভ্যস্ত হইয়াছিল; দেখিলাম আলোকটা যত তীব্র মনে করিয়াছিলাম তত তীব্র নয়—একটা সাধারণ বৈদ্যুতিক টর্চ। আলোকধারীকেও আবছায়া ভাবে দেখিতে পাইলাম, সে বাঁ-হাতে টর্চ ধরিয়াছে এবং ডান হাতে কি একটা জিনিস আমার দিকে নির্দেশ করিয়া আছে।

আলোকধারী আবার কথা কহিল, এবার সুর বেশ নরম। বলিল, 'আপনি বাঙালী দেখছি। এ সময়ে এখানে কি করে এলেন?'

এই প্রশ্নটা আমার মনেও এতক্ষণ চাপা ছিল, পরিস্ফুট হইতে পায় নাই। আমি বলিলাম, 'আপনিও তো বাঙালী;—এখানে কি করছেন?'

'সে কথা পরে হবে। আপনি কেন এখানে এসেছেন আগে বলুন।' আবার সুর একটু কড়া।

ক্ষীণস্বরে বলিলাম, 'কাছেই জঙ্গল আছে, সেখানে শিকার করতে গিয়েছিলাম। ফিরতে রাত হয়ে গেল—পথ হারিয়ে ফেলেছি।'

'আপনার বাড়ি কোথায়?'

'মুঙ্গের, এখান থেকে চার-পাঁচ মাইল হবে।'

'নাম কি?'

নাম বলিলাম। মনে হইল যেন আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া উকিলের জেরার উত্তর দিতেছি।

কিছুক্ষণ আর কোনও প্রশ্ন হইল না। লক্ষ্য করিলাম, প্রশ্নকর্তার উদ্যত ডান হাতখানা পকেটের দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল। টর্চের আলোও আমার মুখ হইতে নামিয়া মাটির উপর একটা উজ্জ্বল চক্র সৃজন করিল।

'আপনি নিশ্চয় বাড়ি ফিরতে চান?'

সাগ্রহে বলিলাম, 'সে কথা আর বলতে! তবে একটা আলো না পেলে—' প্রচ্ছন্ন অনুরোধটা অসমাপ্ত রাখিয়া দিলাম।

কিছুক্ষণ কোনো জবাব নাই। তারপর হঠাৎ তিনি বলিলেন, 'আসুন আমার সঙ্গে। আপনি শিকারী; আমি শিকারীর ব্যথা বুঝি। বোধ হয় খুব খিদে পেয়েছে, ক্লান্তও হয়েছেন; এক পেয়ালা গরম চা বোধ করি মন্দ লাগবে না। আমি কাছেই থাকি।—আসুন।'

গরম চায়ের নামে সর্বাঙ্গ আনন্দে শিহরিয়া উঠিল। দ্বিরুক্তি না করিয়া বলিলাম, 'চলুন।'

দুই জন পাশাপাশি চলিলাম। টর্চের রশ্মি অগ্রবর্তী হইয়া আমাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল।

বেশী দূর যাইতে হইল না, বিশ কদম যাইতে-না-যাইতে একটি ভগ্ন জরাজীর্ণ বাড়ির উপর আলো পড়িল। বাড়ি বলিলাম বটে, কিন্তু বস্তুতঃ সেটা একটা ইট-কাঠের স্তূপ। চারিদিকে খসিয়া-পড়া ইট ছড়ানো রহিয়াছে; যেটুকু দাঁড়াইয়া আছে তাহাও জঙ্গলে, কাঁটাগাছে এমনভাবে আচ্ছন্ন যে সেখানে বাঘ লুকাইয়া থাকিলেও বিস্ময়ের

কিছু নাই। একটা তরুণ অশত্থগাছ সম্মুখের ছাদহীন দালানের ভিত্তি ফাটাইয়া মাথা তুলিয়াছে এবং ভিতরে প্রবেশের পথ ঘন পল্লবে অন্তরাল করিয়া রাখিয়াছে।

বাড়িখানা সত্তর-আশী বছর আগে হয়তো কোনও স্থানীয় জমিদারের বাসভবন ছিল, তারপর বহুকাল পরিত্যক্ত থাকিয়া প্রকৃতির প্রকোপে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। ভিতরে বাসোপযোগী ঘর দু-একখানা এখনও খাড়া থাকিতে পারে, কিন্তু বাহির হইতে তাহা অনুমান করিবার উপায় নাই।

বাড়ির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সঙ্গী বলিলেন, 'বাইসিকেল এইখানে রাখুন।'—বলিয়া ভিতরে প্রবেশের উপক্রম করিলেন।

আমি আর বিস্ময় চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না, বলিলাম, 'আপনি এই বাড়িতে থাকেন?'

'হ্যাঁ। আসুন।'

তাঁহার কণ্ঠস্বর পরিষ্কার বুঝাইয়া দিল যে অযথা কৌতূহল তিনি পছন্দ করেন না। আর প্রশ্ন করিলাম না, দেয়ালের গায়ে বাইসিকেল হেলাইয়া রাখিয়া তাঁহার অনুগামী হইলাম। তবু মনের মধ্যে নানা উত্তেজিত প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল। বিহারের এক প্রান্তে শহর—লোকালয় হইতে বহুদূরে একটি ভাঙা বাড়ির মধ্যে এই বাঙালী ভদ্রলোকটি কি করিতেছেন? কে ইনি! এই অজ্ঞাতবাসের অর্থ কি?

নানাপ্রকার ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার সঙ্গে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিলাম। অভ্যন্তরের পথ কিন্তু অতিশয় কুটিল ও বিঘ্নসঙ্কুল। সদর দ্বারের অশত্থগাছ উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলাম একটা দেয়াল ধ্বসিয়া পড়িয়া সম্মুখে দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করিয়াছে; তাহাকে এড়াইয়া আরও কিছুদূর যাইবার পর দেখা গেল, একটা প্রকাণ্ড শালের কড়ি বক্রভাবে প্রাচীর হইতে অবতীর্ণ হইয়া মাঝখানে আগড় হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। পদে পদে কাঁটাগাছ বস্ত্র আকর্ষণ করিয়া ধরিতে লাগিল; যেন আমাদের ভিতরে যাইতে দিবার ইচ্ছা কাহারও নাই।

যা হোক, অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে এক দরজার সম্মুখে আসিয়া আমার সঙ্গী দাঁড়াইলেন। দেখিলাম দরজায় তালা লাগানো।

তালা খুলিয়া তিনি মরিচা-ধরা ভারী দরজা উদ্ঘাটিত করিয়া দিলেন, তারপর আমাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। অন্ধকার গহ্বরের মত ঘর দেখিয়া সহসা প্রবেশ করিতে ভয় হয়। কিন্তু চক্রব্যূহের এতটা পথ নিরাপত্তিতে আসিয়াছি তাহার মুখ হইতে ফিরিব কি বলিয়া? বুকের ভিতর অজানা আশঙ্কায় দুরু দুরু করিয়া উঠিল—এই অজ্ঞাতকুলশীল সঙ্গীটি কেমন লোক? কোথায় আমাকে লইয়া চলিয়াছেন?

কণ্ঠের মধ্যে একটা কঠিন বস্তু গলাধঃকরণ করিয়া চৌকাঠ পার হইলাম। তিনিও ভিতরে আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। টর্চের আলো একবার চারিদিকে ঘুরিয়া নিবিয়া গেল।

রুদ্ধশ্বাসে অনুভব করিলাম, তিনি আমার পাশ হইতে সরিয়া গিয়া কি একটা জিনিস লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন। পরক্ষণেই দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলিয়া উঠিল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল ল্যাম্পের আলোয় ঘর ভরিয়া গেল।

এতক্ষণে আমার আবছায়া সঙ্গীকে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। মধ্যমাকৃতি লোকটি, রোগা কিংবা মোটা কোনটাই বলা চলে না, মুখের গড়নও নিতান্ত সাধারণ,—কেবল চোখের দৃষ্টি অতিশয় গভীর, মনে হয় যেন সে-দৃষ্টির নিকট হইতে কিছুই লুকান চলিবে না। চোয়ালের হাড় দৃঢ় ও পরিপুষ্ট, গোঁফ-দাঁড়ি কামান—বয়স বোধ হয় চল্লিশের

কাছাকাছি। পরিধানে একটা চেক-কাটা রেশমের লুঙ্গি ও পাঁশুটে রঙের মোটা কোট-সোয়েটার। তাঁহার চেহারা ও বেশভূষা দেখিয়া সহসা তাঁহার জাতি নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়ে।

তাঁহার গম্ভীর সপ্রশ্ন চোখদুটি আমার মুখের উপর রাখিয়া অধরে একটু হাসির ভঙ্গিমা করিয়া তিনি বলিলেন, 'স্বাগত। বন্দুক রাখুন।'

বন্দুক কাঁধেই ঝোলান ছিল; পাখির থলেটাও সঙ্গে আনিয়াছিলাম। সেগুলা নামাইতে নামাইতে ঘরের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। ঘরের মাঝখানে একটা প্যাকিং বাক্সকে কাত করিয়া টেবিলে পরিণত করা হইয়াছে, তাহার উপর কেরোসিন ল্যাম্প রক্ষিত। ল্যাম্পের আলোয় দেখা গেল, ঘরটি মাঝারি আয়তনের, এক কোণে পুরুভাবে খড় পাতা রহিয়াছে, ইহাই বোধ হয় বর্তমান গৃহস্বামীর শয্যা। ইহা ছাড়া ঘরে আর কোন আসবাব নাই। ঘরের লবণ-জর্জরিত দেওয়ালগুলি যেন আপনার নিরাভরণ দীনতার কথা স্মরণ করিয়াই ক্লেদসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

বন্দুক দেয়ালে হেলাইয়া রাখিলে গৃহস্বামী বলিলেন, 'আপনার ওটা কি বন্দুক?'

বলিলাম, 'সাধারণ শ্যট্-গ্যন্। খাঁটি দেশী জিনিস কিন্তু; এখানকারই তৈরি।'

তিনি আসিয়া বন্দুকটা তুলিয়া লইলেন। তাঁহার বন্দুক ধরার ভঙ্গী দেখিয়াই বুঝিলাম আগ্নেয়াস্ত্র-চালনায় তিনি অনভ্যস্ত নন। বন্দুকের ঘাড় ভাঙিয়া নলের ভিতর দিয়া দৃষ্টি চালাইয়া তিনি বলিলেন, 'মন্দ জিনিস নয়তো। পঁচাত্তর গজ পর্যন্ত পরিষ্কার পাল্লা মারবে। একটু বেশী ভারী—তা ক্ষতি কি?—কই, কি পাখি মেরেছেন দেখি?'

তিনি নিজেই থলে আজাড় করিয়া পাখিগুলি বাহির করিলেন। তারপর আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, 'বাঃ, এ যে তিতির আর বন-পায়রা দেখছি। দুটো হারিয়ালও পেয়েছেন; —এদিকে অনেক হারিয়াল পাওয়া যায়—আমি দেখেছি।'

দেখিলাম অকৃত্রিম শিশুসুলভ আনন্দে তাঁহার মুখ ভরিয়া গিয়াছে। এতক্ষণ আমাদের মাঝখানে যে একটা অস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবধান ছিল তাহা যেন অকস্মাৎ লুপ্ত হইয়া গেল।

পাখিগুলিকে সস্নেহে নাড়িয়া-চাড়িয়া অবশেষে তিনি সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন, একটু লজ্জিত স্বরে বলিলেন, 'চায়ের আশ্বাস দিয়ে আপনাকে এনে কেবল পাখিই দেখছি। আসুন, চায়ের ব্যবস্থা করি। আপনি বসুন; কিন্তু বসতে দেব কোথায়?—একটু অপেক্ষা করুন।' তিনি দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়া পরক্ষণেই দুটি ছোট মজবুত-গোছের প্যাকিং কেস লইয়া ফিরিয়া আসিলেন, একটিকে টেবিলের পাশে বসাইয়া এদিক-ওদিক চাহিয়া শয্যার দিকে গেলেন, সেখান হইতে একটা সাদা লোমশ আসন আনিয়া বাক্সের উপর বিছাইয়া দিয়া বলিলেন, 'এবার বসুন।'

সাদা আস্তরণটা আমার কৌতূহল আকৃষ্ট করিয়াছিল, সেটা হাতে লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, কোন জন্তুর চামড়া, ধবধবে সাদা রেশমের মত মোলায়েম দীর্ঘ লোমে ঢাকা চামড়াটি; দেখিলেই লোভ হয়। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কিসের চামড়া?'

তিনি বলিলেন, 'হরিণের।'

বিস্মিতভাবে বলিলাম, 'হরিণের! কিন্তু—সাদা হরিণ?'

তিনি একটু হাসিলেন, 'হ্যাঁ—সাদা হরিণ।'

সাদা হরিণের কথা কোথাও শুনি নাই, কিন্তু, কে জানে, থাকিতেও পারে। প্রশ্ন করিলাম 'কোথায় পেলেন? উত্তরমেরুর হরিণ নাকি?'

তিনি মাথা নাড়িলেন, 'না, অতদূরের নয়, শ্যামদেশের। ওর একটা মজার ইতিহাস আছে।—কিন্তু আপনি বসুন' বলিয়া আতিথিসৎকারের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

দেখা গেল তাঁহার প্যাকিং বাক্সটি কেবল টেবিল নয়, তাঁহার ভাঁড়ারও বটে। তাহার ভিতর হইতে একটি স্টোভ বাহির করিয়া তিনি জ্বালিতে প্রবৃত্ত হইলেন। চায়ের কৌটা, চিনির মোড়ক, জমানো দুধের টিন ও দুটি কলাই-করা মগ বাহির করিয়া পাশে রাখিলেন। তারপর একটি অ্যালুমিনিয়ামের ঘটিতে জল লইয়া স্টোভে চড়াইয়া দিলেন।

তাঁহার ক্ষিপ্র নিপুণ কার্যতৎপরতা দেখিতে দেখিতে আমি বলিলাম, 'আচ্ছা, আপনি যে একজন পাকা শিকারী তা তো বুঝতে পারছি, আপনার নাম কি?'

তাঁহার প্রফুল্ল মুখ একটু গম্ভীর হইল, বলিলেন, 'আমার নাম শুনে আপনার লাভ কি?'

'কিছুই না। তবু কৌতূহল হয় না কি?'

'তা বটে। মনে করুন আমার নাম—প্রমথেশ রুদ্র।'

বুঝিলাম, আসল নামটা বলিলেন না। কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল।

তারপর সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি একলা এই ভাঙা বাড়িতে কেন রয়েছেন এ প্রশ্ন করাও ধৃষ্টতা হবে কি?'

তিনি উত্তর দিলেন না, যেন আমার প্রশ্ন শুনিতে পান নাই এমনি ভাবে স্টোভে পাম্প করিতে লাগিলেন; মনে হইল তাঁহার চোখের উপর একটা অদৃশ্য পর্দা নামিয়া আসিয়াছে।

ক্রমে চায়ের জল স্টোভের উপর ঝিঁঝিপোকার মত শব্দ করিতে আরম্ভ করিল।

তিনি সহজভাবে বলিলেন, 'চায়ের জলও গরম হয়ে এল। কিন্তু শুধু চা খাবেন? আমার ঘরে এমন কিছু নেই যা-দিয়ে অতিথিসেবা করতে পারি। কাল রাত্রে তৈরি খানকয়েক শুকনো রুটি আছে, কিন্তু সে বোধ হয় আপনার গলা দিয়ে নামবে না।'

আমি বলিলাম, 'ক্ষিদের সময় গলা দিয়ে নামে না এমন কঠিন বস্তু পৃথিবীতে কমই আছে। কিন্তু তা ছাড়াও ঐ পাখিগুলো তো রয়েছে! ওগুলোর সৎকার করলে হয় না?'

'ওগুলো আপনি বাড়ি নিয়ে যাবেন না?'

'বাড়ি নিয়ে গিয়েও তো খেতেই হবে! তবে এখানে খেতে দোষ কি? পাখিগুলো একজন যথার্থ শিকারীর পেটে গিয়ে ধন্য হত।'

তিনি হাসিলেন, 'মন্দ কথা নয়। পাখির স্বাদ ভুলেই গেছি।' তাঁহার মুখে একটা বিচিত্র হাসি খেলিয়া গেল; যেন পাখির স্বাদ ভুলিয়া যাওয়ার মধ্যে একটা মিষ্ট কৌতুক লুক্কায়িত আছে। হাসিটি আত্মগত, আমাকে দেখাইবার ইচ্ছা বোধ হয় তাঁহার ছিল না; তাই ক্ষণেক পরে সচকিত হইয়া বলিলেন, 'তাহলে ওগুলোকে ছাড়িয়ে ফেলা যাক—কি বলেন? নরম মাংস, আধ ঘণ্টার মধ্যেই তৈরি হয়ে যাবে।'

তিনি অভ্যস্ত ক্ষিপ্রতার সহিত পাখি ছাড়াইতে লাগিলেন। আমি তাঁহার পানে তাকাইয়া বসিয়া রহিলাম। সেই পুরাতন প্রশ্নই মনে জাগিতে লাগিল—কে ইনি? লোকচক্ষুর আড়ালে লুকাইয়া শুকনা রুটি খাইয়া জীবনযাপন করিতেছেন কেন?

এক সময় তিনি সহাস্যে মুখ তুলিয়া বলিলেন, 'আজ একটু শীত আছে। চামড়াটা বেশ গরম মনে হচ্ছে তো?'

'চমৎকার! আচ্ছা, আপনি অনেক দেশ ঘুরেছেন—না?'

'হ্যাঁ।'

'প্রশ্ন করতে সাহস হয় না, তবে সম্ভবত শিকারের জন্যেই দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন?'

'তা বলতে পারেন।'

যিনি নিজের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে অপ্রসন্ন হইয়া উঠেন তাঁহার সহিত অন্য কথা বলাই ভাল। তাই ইচ্ছা করিয়া শিকারের আলোচনাই আরম্ভ করিলাম, বিশেষতঃ সাদা চামড়াটা সম্বন্ধে বেশ একটু কৌতূহলও জাগিয়াছিল।

বলিলাম, 'শ্যামদেশে সাদা হরিণ পাওয়া যায়? কিন্তু কোথাও পড়িনি তো?'

তিনি মুখ তুলিয়া বলিলেন, 'না পড়বারই কথা। ও হরিণ আর কেউ চোখে দেখেনি। চোখে দেখার জিনিস ও নয়।'

'কি রকম?'

'পৃথিবীতে যত রকম আশ্চর্য জীব আছে—ঐ হরিণ তার মধ্যে একটি। প্রকৃতির সৃষ্টিতে এর তুলনা নেই।'

'কি ব্যাপার বলুন তো? অবশ্য সাদা হরিণ খুবই অসাধারণ, কিন্তু—'

'আপনি কেবল সাদা চামড়াটা দেখছেন। আমি কিন্তু ওকে দেখেছি সম্পূর্ণ অন্য রূপে—অর্থাৎ দেখিনি বললেই হয়।'

'আপনি যে ধাঁধা লাগিয়ে দিলেন। কিছুই বুঝতে পারছি না।'

তিনি একটু ইতস্ততঃ করিয়া শেষে বলিলেন, 'অদৃশ্য প্রাণীর কথা কখনও শুনেছেন?'

'অদৃশ্য প্রাণী! সে কি?'

'হ্যাঁ—যাদের চোখে দেখা যায় না, চোখের সামনে যারা মরীচিকার মত মিলিয়ে যায়। শ্যামদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে দুর্ভেদ্য পাহাড়ে ঘেরা এক উপত্যকায় আমি তাদের দেখেছি,—বিশ্বাস করছেন না? আমারও মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, তখন ওই চামড়াটা স্পর্শ করে দেখি।'

'বড় কৌতূহল হচ্ছে; সব কথা আমায় বলবেন কি?'

তিনি একটু খামখেয়ালি হাসি হাসিলেন, বলিলেন, 'বেশ;—চায়ের জল হয়ে গেছে, মাংসটা চড়িয়ে দিয়ে এই অদ্ভুত গল্প আরম্ভ করা যাবে। সময় কাটাবার পক্ষে মন্দ হবে না।'

৩

চায়ের পাত্র সম্মুখে লইয়া দু'জনে মুখোমুখি বসিলাম। এক চুমুক পান করিতেই মনে হইল শরীরের ভিতর দিয়া অত্যন্ত সুখকর উত্তাপের একটা প্রবাহ বহিয়া গেল।

বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন চা?'

বলিলাম, 'চা নয়—নির্জলা অমৃত। এবার গল্প আরম্ভ করুন।'

তিনি কিছুক্ষণ শূন্যের পানে তাকাইয়া রহিলেন। ক্রমে তাঁহার চক্ষু স্মৃতিচ্ছায়ায় আবিষ্ট হইল। তিনি থামিয়া থামিয়া অসংলগ্ন ভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

'গত বছর এই সময়—কিছুদিন আগেই হবে; হ্যাঁ, নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি। আমি আর আমার এক বন্ধু পাকেচক্রে পড়ে বর্মার জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলুম।

'বন্ধুটির নাম জঙ-বাহাদুর—নেপালী ক্ষত্রিয়। আমাদের লটবহরের মধ্যে ছিল দুটি কম্বল আর দুটি রাইফেল। হঠাৎ একদিন মাঝরাত্রে যাত্রা শুরু করতে হয়েছিল তাই বেশী কিছু সঙ্গে নিতে পারিনি।

'অফুরন্ত পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে পথঘাট সব গুলিয়ে গিয়েছিল। যেখানে মাসান্তে মানুষের মুখ দেখা যায় না, এবং শিকারের পশ্চাদ্ধাবন করা বা শিকারী জন্তুর দ্বারা পশ্চাদ্ধাবিত হওয়াই পা-চালানোর একমাত্র লক্ষ্য, সেখানে স্থান-কাল ঠিক রাখা শক্ত।

আমরা শুধু পূর্বদিকটাকে সামনে রেখে আর-সব শ্রীভগবানের হাতে সমর্পণ করে দিয়ে চলেছিলুম। কোথায় গিয়ে এ যাত্রা শেষ হবে তার কোন ঠিকানা ছিল না।

'একদিন একটা প্রকাণ্ড নদী বেতের ডোঙায় করে পার হয়ে গেলুম। জানতেও পারলুম না যে বর্মাকে পিছনে ফেলে আর এক রাজ্যে ঢুকে পড়েছি। জানতে অবশ্য পেরেছিলুম—কয়েক দিন পরে।

'মেকং নদীর নাম নিশ্চয় জানেন। সেই মেকং নদী আমরা পার হলুম এমন জায়গায় যেখানে তিনটি রাজ্যের সীমানা এসে মিশেছে—পশ্চিমে বর্মা, দক্ষিণে শ্যামদেশ, আর পূর্বে ফরাসী-শাসিত আনাম। এ সব খবর কিন্তু পার হবার সময় কিছুই জানতাম না।

'মেকং পার হয়ে আমরা নদীর ধার ঘেঁষে দক্ষিণ মুখে চললুম। এদিকে পাহাড় জঙ্গল ওরই মধ্যে কম, মাঝে মাঝে দুই-একটা গ্রাম আছে। শিকারও প্রচুর। খাদ্যের অভাব নেই। জঙ-বাহাদুর এ দেশের ভাষা কিছু কিছু বোঝে, তাই রাত্রিকালে গ্রামে কোন গৃহস্থের কুটিরে আশ্রয় নেবার সুবিধা হয়—দুর্জয় শীতে মাথা রাখবার জায়গা পাই।

'বড় শহর বা গ্রাম আমরা যথাসাধ্য এড়িয়ে যেতুম। তবু একদিন ধরা পড়ে গেলুম। দুপুরবেলা দু'জনে একটা পাথুরে গিরিসঙ্কটের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ বাঁ-দিক থেকে কর্কশ আওয়াজে চম্‌কে উঠে দেখি, একটা লোক পাথরের চাঙড়ের আড়াল থেকে রাইফেল উঁচিয়ে আমাদের লক্ষ্য করে আছে। দিশী লোক—নাক চ্যাপ্টা, থ্যাবড়া মুখ কিন্তু তার পরিধানে সিপাহীর ইউনিফর্ম; গায়ে খাকি পোষাক, মাথায় জরির কাজ করা গোল টুপি, পায়ে পট্টি আর অ্যামুনিশন বুট।

'বুঝতে বাকী রইল না যে বিপদে পড়েছি। সিপাহী সেই অবস্থাতেই বাঁশী বাজালে; দেখতে দেখতে আরও দু'জন এসে উপস্থিত হল। তখন তারা আমাদের সামনে রেখে মার্চ করিয়ে নিয়ে চলল।

'কাছেই তাদের ঘাঁটি। সেখানকার অফিসার আমাদের খানাতল্লাস করলেন, অনেক প্রশ্ন করলেন যার একটাও বুঝতে পারলুম না. তারপর বন্দুক আর টোটা বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে চার জন সিপাহীর জিম্মায় দিয়ে আমাদের রওনা করে দিলেন।

'মাইল-তিনেক যাবার পর দেখলুম এক শহরে এসে পৌঁছেছি। নদীর ধারেই শহরটি—খুব বড় নয়, কিন্তু ছবির মত দেখতে।

'সিপাহীরা নদীর কিনারায় একটা বড় বাংলোয় আমাদের নিয়ে হাজির করলে। এখানে শহরের সবচেয়ে বড় কর্মচারী থাকেন।

'যথাসময়ে আমরা তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। দেখলুম তিনি একজন ফৌজী অফিসার—জাতিতে ফরাসী—বয়স বছর প'য়তাল্লিশ, তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি, গায়ের রং বহুকাল গরম দেশে থেকে তামাটে হয়ে গেছে।

'তিনি ইংরেজী কিছু কিছু বলতে পারেন। আমার সঙ্গে প্রথমেই তাঁর খুব ভাব হয়ে গেল। ফরাসীদের মত এমন মিশুক জাত আর আমি দেখিনি, সাদা-কালোর প্রভেদ তাদের মনে নেই। এঁর নাম কাপ্তেন দু'বোয়া। অল্পকালের মধ্যেই তিনি আমাদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ শুরু করে দিলেন। তাঁরই মুখে প্রথম জানতে পারলুম, আমরা আনাম দেশে এসে পড়েছি, নদীর ওপারে ঐ পর্বত-বন্ধুর দেশটা শ্যামরাজ্য। মেকং নদী এই দুই রাজ্যের সীমান্ত রচনা করে বয়ে গেছে।

'আমরা কোথা থেকে আসছি, কি উদ্দেশ্যে বেরিয়েছি, এ সব প্রশ্নও তিনি করলেন। যথাসাধ্য সত্য উত্তর দিলুম। বললুম, প্রাচ্যদেশ পদব্রজে ভ্রমণ করবার অভিপ্রায়েই বৃটিশ রাজ্য থেকে বেরিয়েছি, পাসপোর্ট নেওয়া যে দরকার তা জানতুম না। তবে শিকার এবং

দেশ-বিদেশ দেখা ছাড়া আমাদের কোন অসাধু উদ্দেশ্য নেই।

'নানাবিধ গল্প করতে করতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। এইবার কাপ্তেন দু'বোয়া ফরাসী শিষ্টতার চরম করলেন, আমাদের নৈশ ভোজনের নিমন্ত্রণ জানালেন। শুধু তাই নয়, রাত্রে তাঁর বাড়িতে আমাদের শয়নের ব্যবস্থা হল। রাজপুরুষের এই অযাচিত সহৃদয়তা আমাদের পক্ষে যেমন অভাবনীয় তেমনিই অস্বস্তিকর।

'রাত্রে আহারে বসে কাপ্তেন হঠাৎ এক সময় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা বৃটিশ ফৌজি-রাইফেল কোথায় পেলেন?'

'বললুম, 'আর্মি স্টোর থেকে মাঝে মাঝে পুরনো বন্দুক বিক্রী হয়, তাই কিনেছি।'

'কাপ্তেন আর কিছু বললেন না।

'অনেক রাত্রি পর্যন্ত গল্পগুজব হল। তারপর কাপ্তেন নিজে এসে আমাদের শোবার ঘরের দোর পর্যন্ত পেঁছে দিয়ে গেলেন। অনেক দিন পরে নরম বিছানায় শয়ন করলুম।

'কিন্তু তবু ভাল ঘুম হল। শেষরাত্রির দিকে জঙ-বাহাদুর আমার গা ঠেলে চুপি চুপি বললে, 'চলুন—পালাই।'

'আমি বললুম, 'আপত্তি নেই। কিন্তু দরজায় শান্ত্রী পাহারা দিচ্ছে যে।'

'জঙ-বাহাদুর দরজা ফাঁক করে একবার উঁকি মেরে আবার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

'ভোর হতে না হতে কাপ্তেন সাহেব নিজে এসে আমাদের ডেকে তুললেন। তারপর সুমিষ্ট স্বরে সুপ্রভাত জ্ঞাপন করে আমাদের নদীর ধারে বাঁধাঘাটে নিয়ে গেলেন।

'দেখলুম, কিনারায় একটি ছোট বেতের ডোঙা বাঁধা রয়েছে, আর ঘাটের শানের উপর বারো জন রাইফেলধারী সিপাহী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'কাপ্তেন আমাদের করমর্দন করে বললেন, 'আপনাদের সঙ্গ-সুখ পেয়ে আমার একটা দিন বড় আনন্দে কেটেছে। কিন্তু এবার আপনাদের যেতে হবে।'

'পরপারের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'শ্যামরাজ্যের ঐ অংশটা বড় অনুর্বর, এক-শ মাইলের মধ্যে লোকালয় নেই। আপনাদের সঙ্গে খাবার দিয়েছি। রাইফেলও দিলাম, আর পাঁচটা কার্তুজ। এরই সাহায্যে আশা করি, আপনারা নির্বিঘ্নে লোকালয়ে পেঁছতে পারবেন।—বঁ ভোয়াজ।'

'আমি আপত্তি করতে গেলুম, তিনি হেসে বললেন, 'ডোঙায় উঠুন। নদীর এপারে নামবার চেষ্টা করবেন না, তাহলে—' সৈন্যদের দিকে হাত নেড়ে দেখালেন।

'ডোঙায় গিয়ে উঠলুম, বারো জন সৈনিক বন্দুক তুলে আমাদের দিকে লক্ষ্য করে রইল।

'তীর থেকে বিশ গজ দূরে ডোঙা যাবার পর আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'আমাদের অপরাধ কি তাও জানতে পারব না?'

'তিনি ঘাট থেকে ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে বললেন, 'আনামে ব্রিটিশ গুপ্তচরের স্থান নেই।'

এই পর্যন্ত বলিয়া প্রমথেশ রুদ্র থামিলেন। তাঁহার মুখে ধীরে ধীরে একটি অদ্ভুত হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, 'একেই বলে দৈব বিড়ম্বনা। কাপ্তেন দু'বোয়া আমাদের হাতে মিলিটারি বন্দুক দেখে আমাদের ইংরেজের গোয়েন্দা মনে করেছিলেন।'

আমি বলিলাম, 'কিন্তু ইংলণ্ড আর ফ্রান্সে তো এখন বন্ধুত্ব চলছে!'

'হুঁ—একেবারে গলাগলি ভাব। কিন্তু ওরা আজ পর্যন্ত কখনও পরস্পরকে বিশ্বাস করেনি এবং যতদিন চন্দ্রসূর্য থাকবে ততদিন করবে না। ওরা শুধু দুটো আলাদা

জাত নয়, মানব-সভ্যতার দুটো সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শের প্রতীক। কিন্তু সে যাক—' বলিয়া আবার গল্প আরম্ভ করিলেন।

'যতক্ষণ নদী পার হলুম, সিপাহীরা বন্দুক উঁচিয়ে রইল। বুঝলাম দুটি মাত্র পথ আছে—হয় পরপার, নয় পরলোক। তৃতীয় পন্থা নেই।

'পরপারেই গিয়ে নামলুম। তারপর বন্দুক আর খাবারের হ্যাভারস্যাক্ কাঁধে ফেলে শ্যামদেশের লোকালয়ের সন্ধানে রওনা হয়ে পড়া গেল।

'প্রায় নদীর কিনারা থেকেই পাহাড় আরম্ভ হয়েছে। আনাম-রাজ্য এবং মেকং নদী পিছনে রেখে চড়াই উঠতে আরম্ভ করলুম। পাহাড়ের পথ বন্ধুর দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু আমরা পথশ্রমে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলুম; এই পার্বত্য ভূমি যত শীঘ্র সম্ভব পার হবার জন্যে সজোরে পা চালিয়ে দিলুম।

'দুপুরবেলা নাগাদ এমন এক জায়গায় এসে পেঁছিলুম যেখান থেকে চারিদিকে অগণ্য নীরস পাহাড় ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না—গাছপালা পর্যন্ত নেই, কেবল পাথর আর পাথর।

'বিলক্ষণ ক্ষিদে পেয়েছিল। খাবারের ঝুলি নামিয়ে দু'জনে খেতে বসলুম। ঝুলি খুলে দেখি, তাজা খাবার কিছু নেই, কেবল কতকগুলো টিনের কৌটা। যাহোক, যে-অবস্থায় পড়েছি তাতে টিনে-বন্ধ চালানি খাবারই বা ক'জন পায়?

'কিন্তু টিনের লেবেল দেখে চক্ষুস্থির হয়ে গেল —Corned beef—গো-মাংস! পরস্পর মুখের দিকে তাকালুম। জঙ-বাহাদুর খাঁটি হিন্দু, কিছুক্ষণ মূর্তির মত স্থির হয়ে বসে রইল, তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল।

'কোনও কথা হল না, দু'জনে আবার চলতে আরম্ভ করলুম। অখাদ্য টিনগুলো পিছনে পড়ে রইল।

'তারপর আমাদের যে দুর্গতির অভিযান আরম্ভ হল তার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে আপনাকে দুঃখ দেব না। আকাশে একটা পাখি নেই, মাটিতে অন্য জন্তু তো দূরের কথা, একটা গিরগিটি পর্যন্ত দেখতে পেলুম না। তৃষ্ণায় টাক্‌রা শুকিয়ে গেল কিন্তু জল নেই।

'প্রথম দিনটা এক দানা খাদ্য বা এক ফোঁটা জল পেটে গেল না। রাত্রি কাটালুম খোলা আকাশের নীচে কম্বল মুড়ি দিয়ে। দ্বিতীয় দিন বেলা তিন প্রহরে একটা জন্তু দেখতে পেলুম, কিন্তু এত দূরে যে, সেটা কি জন্তু তা চেনা গেল না। কিন্তু আমাদের অবস্থা তখন এমন যে, মা ভগবতী ছাড়া কিছুতেই আপত্তি নেই। প্রায় তিন-শ গজ দূর থেকে তার উপর গুলি চালালুম—কিন্তু লাগল না। মোট পাঁচটি কার্তুজ ছিল, একটি গেল।

'সেদিন সন্ধ্যার সময় জল পেলুম। একটা পাথরের ফাটল দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল চুইয়ে পড়ছে, আধ ঘণ্টায় এক গণ্ডূষ জল ধরা যায়। জঙ-বাহাদুরের মুখ ঝামার মত কালো হয়ে গিয়েছিল, আমার মুখও যে অনুরূপ বর্ণ ধারণ করেছিল তাতে সন্দেহ ছিল না। শরীরের রক্ত তরল বস্তুর অভাবে গাঢ় হয়ে আসছিল; সেদিন জল না পেলে বোধ হয় বাঁচতুম না।

'কিন্তু তবু শুধু জল খেয়ে বেঁচে থাকা যায় না। শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছিল, মাথাও বোধ হয় আর ধাতস্থ ছিল না। তৃতীয় দিনের ঘটনাগুলো একটানা দুঃস্বপ্নের মত মনে আছে। একটা লালচে রঙের খরগোশ দেখতে পেয়ে তারই পিছনে তাড়া করেছিলুম—দিগ্বিদিক্ জ্ঞান ছিল না। খরগোশটা আমাদের সঙ্গে যেন খেলা করছিল; একেবারে পালিয়েও যাচ্ছিল না, আবার বন্দুকের পাল্লার মধ্যেও ধরা দিচ্ছিল না।

তার পিছনে দুটো কার্তুজ খরচ করলুম; কিন্তু চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেছে, হাতও কাঁপছে, খরগোশটা মারতে পারলুম না।

'সন্ধ্যেবেলা একটা লম্বা বাঁধের মত পাহাড়ের পিঠের উপর উঠে খরগোশ মিলিয়ে গেল। দেহে তখন আর শক্তি নেই, বন্দুকটা অসহ্য ভারী বোধ হচ্ছে; তবু আমরাও সেখানে উঠলুম। বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে চলছি না, একটা অন্ধ আবেগের ঝোঁকেই খরগোশের পশ্চাদ্ধাবন করেছি। পাহাড়ের উপর উঠে দাঁড়াতেই মাথাটা ঘুরে গেল, একটা সবুজ রঙের আলো চোখের সামনে ঝিলিক্ মেরে উঠ্‌ল; তারপর সব অন্ধকার হয়ে গেল।

'যখন মূর্চ্ছা ভাঙল তখন রোদ উঠেছে। জঙ-বাহাদুর তখনও আমার পাশে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। আর—আর সামনেই ঠিক পাহাড়ের কোলে যত দূর দৃষ্টি যায় একটি সবুজ ঘাসে-ভরা উপত্যকা। তার বুক চিরে জরির ফিতের মত একটি সরু পার্বত্য নদী বয়ে গেছে।

'কিছুক্ষণ পরে জঙ-বাহাদুরের জ্ঞান হল। তখন দু'জনে দু'জনকে অবলম্বন করে টলতে টলতে পাহাড় থেকে নেমে সেই নদীর ধারে গিয়ে উপস্থিত হলুম।

'তৃষ্ণা নিবারণ হল। আকণ্ঠ জল খেয়ে ঘাসের ওপর অনেকক্ষণ পড়ে রইলুম। আপনি এখনি চায়ের সঙ্গে অমৃতের তুলনা করছিলেন; আমরা সেদিন যে-জল খেয়েছিলুম, অমৃতও বোধ করি তার কাছে বিস্বাদ।

'কিন্তু সে যাক—তৃষ্ণানিবারণের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধার ভাবনা এসে জুটেছিল। তাকে মেটাই কি দিয়ে?

'আমাদের উপত্যকার চারিদিকে তাকালুম, কিন্তু কোথাও একটি প্রাণী নেই। এখানে-ওখানে কয়েকটা গাছ যেন দলবদ্ধ হয়ে জন্মেছে, হয়তো কোন গাছে ফল ফলেছে এই আশায় উঠে বললুম—'জঙ-বাহাদুর, চল দেখি, যদি গাছে কিছু পাই।'

'গাছে কিন্তু ফল-ফলবার সময় নয়। একটা কুলের মত কাঁটাওয়ালা গাছে ছয়টি ছোট ছোট কাঁচা ফল পেলুম। তৎক্ষণাৎ দু'জনে ভাগাভাগি করে উদরসাৎ করলুম। দারুণ টক্—কিন্তু তবু খাদ্য তো!

'আরও ফলের সন্ধানে অন্য একটা ঝোপের দিকে চলেছি, জঙ-বাহাদুর পাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে চীৎকার করে উঠল,—'ঐ—ঐ দেখুন!'

'ঘাড় ফিরিয়ে দেখি—আশ্চর্য দৃশ্য! সাদা ধবধবে একপাল হরিণ নির্ভয়ে মন্থর-পদে নদীর দিকে চলেছে। সকলের আগে একটা শৃঙ্গধর মদ্দা হরিণ, তার পিছনে গুটি আট-দশ হরিণী। আমাদের কাছ থেকে প্রায় এক-শ গজ দূরে তারা যাচ্ছে।

'কিন্তু এ দৃশ্য দেখলুম মুহূর্ত কালের জন্যে। জঙ-বাহাদুরের চীৎকার বোধ হয় তাদের কানে গিয়েছিল—তারা একসঙ্গে ঘাড় ফিরিয়ে আমাদের দিকে চাইল। তারপর এক অদ্ভুত ব্যাপার হল। হরিণগুলা দেখতে দেখতে আমাদের চোখের সামনে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

'হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলুম; তারপর চোখ রগড়ে আবার দেখলুম। কিছু নেই—রৌদ্রোজ্জ্বল উপত্যকা একেবারে শূন্য।

'ভয় হল। এ কি ভৌতিক উপত্যকা? না আমরাই ক্ষুধার মত্ততায় কাল্পনিক জীবজন্তু দেখতে আরম্ভ করেছি? মরুভূমিতে শুনেছি ক্ষুধা-তৃষ্ণায় উন্মাদ পান্থ মৃত্যুর আগে এমনি মায়ামূর্তি দেখে থাকে। তবে কি আমাদেরও মৃত্যু আসন্ন!

'জঙ-বাহাদুরের দিকে চেয়ে দেখলুম, তার চোখ দুটো পাগলের মত বিস্ফারিত। সে ত্রাস-কম্পিত স্বরে বলে উঠল—'এ আমরা কোথায় এসেছি!'—তার ঘাড়ের রোঁয়া

খাড়া হয়ে উঠল।

'দু'জনে একসঙ্গে ভয়ে দিশাহারা হলে চলবে না! আমি জঙ-বাহাদুরকে সাহস দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলুম—কিন্তু বোঝাব কি? নিজেরই তখন ধাত ছেড়ে আসছে!

'একটা ঘন ঝোপের মধ্যে গিয়ে বসলুম। খাবার খোঁজবার উদ্যমও আর ছিল না; অবসন্ন ভাবে নদীর দিকে তাকিয়ে রইলুম।

'আধ ঘণ্টা এইভাবে কেটে যাবার পর হঠাৎ একটা শব্দ শুনে চমকে উঠলুম; ঠিক মনে হল একপাল হরিণ ক্ষুরের শব্দ করে আমাদের পাশ দিয়ে দ্রুত ছুটে চলে গেল। পরক্ষণেই পিছন দিকে ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘের চীৎকার যেন বাতাসকে চিরে ছিন্নভিন্ন করে দিলে। ফিরে দেখি, প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে প্রকাণ্ড দুটো ধূসর রঙের নেকড়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। কিছুক্ষণ নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে তারা আর একবার চীৎকার করে উঠল—শিকার ফস্কে যাওয়ার ব্যর্থ গর্জন। তারপর অনিচ্ছাভরে বিপরীত মুখে চলে গেল।

'অনেক দূর পর্যন্ত তাদের দেখতে পেলুম। এবার নূতন রকমের ধোঁকা লাগল। তাই তো! নেকড়ে দুটো তো মিলিয়ে গেল না! তবে তো আমাদের চোখের ভ্রান্তি নয়! অথচ হরিণগুলা অমন কর্পূরের মত উবে গেল কেন? আর, এখনই যে ক্ষুরের আওয়াজ শুনতে পেলুম সেটাই বা কি?

'ক্রমে বেলা দুপুর হল। শরীর নেতিয়ে পড়ছে, মাথা ঝিমঝিম করছে। উপত্যকায় পেঁছানোর প্রথম উত্তেজনা কেটে গিয়ে তিন দিনের অনশন আর ক্লান্তি দেহকে আক্রমণ করেছে। হয়তো এইভাবে নিস্তেজ হতে হতে ক্রমে তৈলহীন প্রদীপের মত নিবে যাব।

'নিবে যেতুমও, যদি না এই সময় একটি পরম বিস্ময়কর ইন্দ্রজাল আমাদের চৈতন্যকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তুলত। অসাড় ভাবে নদীর দিকেই তাকিয়েছিলুম, সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়েছিল। এই সময় দেখলুম নদীর কিনারায় যেন অস্পষ্ট ভাবে কি নড়ছে। গ্রীষ্মের দুপুরে তপ্ত বালির চড়ার ওপর যেমন বাষ্পের ছায়াকুণ্ডলী উঠতে থাকে, অনেকটা সেই রকম। ক্রমে সেগুলো যেন আরও স্থূল আকার ধারণ করলে। তারপর ধীরে ধীরে একদল সাদা হরিণ আমাদের চোখের সামনে মূর্তি পরিগ্রহ করে দাঁড়াল।

'মুগ্ধ অবিশ্বাস ভরে চেয়ে রইলুম। এও কি সম্ভব? এরা কি সত্যিই শরীর-ধারী? তাদের দেখে অবিশ্বাস করবার উপায় নেই; সাদা রোমশ গায়ে সূর্যের আলো পিছলে পড়ছে। নিশ্চিন্ত অসঙ্কোচে তারা নদীতে মুখ ডুবিয়ে জল খাচ্ছে, নিজেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি করে খেলা করছে,—কেউ বা নদীর ধারের কচি ঘাস ছিঁড়ে তৃপ্তি ভরে চিবচ্ছে।

'জঙ-বাহাদুর কখন রাইফেল তুলে নিয়েছিল তা জানতে পারিনি, এত তন্ময় হয়ে দেখছিলুম। হঠাৎ কানের পাশে গুলির আওয়াজ শুনে লাফিয়ে উঠলুম; দেখি জঙ-বাহাদুরের হাতে রাইফেলের নল কম্পাসের কাঁটার মত দুলছে। সে রাইফেল ফেলে দিয়ে বললে, 'পারলাম না, ওরা মায়াবী।'

'হরিণের দল তখন আবার অদৃশ্য হয়ে গেছে।

'এতক্ষণে এই অদ্ভুত হরিণের রহস্য যেন কতক বুঝতে পারলুম। ওরা অশরীরী নয়, সাধারণ জীবের মত ওদেরও দেহ আছে, কিন্তু কোনও কারণে ভয় পেলেই ওরা অদৃশ্য হয়ে যায়। খানিকক্ষণ আগে ওদের নেকড়ে তাড়া করেছিল, তখন ওদেরই অদৃশ্য পদধ্বনি আমরা শুনেছিলুম। প্রকৃতির বিধান বিচিত্র! এই পাহাড়-ঘেরা ছোট উপত্যকা-টিতে ওরা অনাদি কাল থেকে আছে; সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র জন্তুরাও আছে। তাদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার আর কোনও অস্ত্র ওদের নেই, তাই শত্রু দেখলেই ওরা

অদৃশ্য হয়ে যায়।'

বক্তা আবার থামিলেন। সেই গূঢ়ার্থ হাসি আবার তাঁহার মুখে খেলিয়া গেল।

আমি মোহাচ্ছন্নের মত শুনিতেছিলাম। অলৌকিক রূপকথাকে বাস্তব আবহাওয়ার মাঝখানে স্থাপন করিলে যেমন শুনিতে হয়, গল্পটা সেইরূপ মনে হইতেছিল; বলিলাম, 'কিন্তু একি সম্ভব? অর্থাৎ বিজ্ঞানের দিক দিয়ে অপ্রাকৃত নয় কি?'

তিনি বলিলেন, 'দেখুন, বিজ্ঞান এখনও সৃষ্টি-সমুদ্রের কিনারায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, তীরের উপলখণ্ড কুড়িয়ে ঝুলি ভরছে—সমুদ্রে ডুব দিতে পারেনি। তা ছাড়া, অপ্রাকৃতই বা কি করে বলি? ক্যামিলিয়ন নামে একটা জন্তু আছে, সে ইচ্ছামত নিজের দেহের রং বদলাতে পারে। প্রকৃতি আত্মরক্ষার জন্য তাকে এই ক্ষমতা দিয়েছেন। বেশী দূর যাবার দরকার নেই, আজ যে আপনি হারিয়াল মেরেছেন তাদের কথাই ধরুন না। হারিয়াল একবার গাছে বসলে আর তাদের দেখতে পান কি?'

বলিলাম, 'তা পাই না বটে। গাছের পাতার সঙ্গে তাদের গায়ের রং মিশে যায়।'

তিনি বলিলেন, 'তবেই দেখুন, সেও তো এক রকম অদৃশ্য হয়ে যাওয়া। এই হরিণের অদৃশ্য হওয়া বড়জোর তার চেয়ে এক ধাপ উঁচুতে।'

'তার পর বলুন।'

'ব্যাপারটা মোটামুটি রকম বুঝে নিয়ে জঙ-বাহাদুরকে বললুম, 'ভয় নেই জঙ-বাহাদুর, ওরা মায়াবী নয়! বরং আমাদের বেঁচে থাকবার একমাত্র উপায়।'

'একটি মাত্র কার্তুজ তখন অবশিষ্ট আছে—এই নিরুদ্দেশ যাত্রাপথের শেষ পাথেয়। এটি যদি ফস্কায় তাহলে অনশনে মৃত্যু কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।

'টোটা রাইফেলে পুরে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে বসে রইলুম—হয়তো তারা আবার এখানে আসবে জল খেতে। কিন্তু যদি না আসে? দু'বার এইখানেই ভয় পেয়েছে—না আসতেও পারে।

'দিন ক্রমে ফুরিয়ে এল; সূর্য পাহাড়ের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল। জঙ-বাহাদুর কেমন যেন নিঝুম তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে বসে আছে; আমি প্রাণপণ শক্তিতে নিরাশা আর অবসাদকে দূরে ঠেলে রেখে প্রতীক্ষা করছি।

'নদীর জলের ঝক্‌ঝকে রূপালী রং মলিন হয়ে এল, কিন্তু হরিণের দেখা নেই। নিরাশাকে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারছি না। তারা সত্যিই পালিয়েছে, আর আসবে না।

'কিন্তু প্রকৃতির বিধানে একটা সামঞ্জস্য আছে,—এমার্সন যাকে Law of compensation বলেছেন। এক দিক দিয়ে প্রকৃতি যদি কিছু কম দিয়ে ফেলেন, অন্য দিক দিয়ে অমনি তা পূরণ করে দেন। এই হরিণগুলোকে তিনি বুদ্ধি কম দিয়েছেন বলেই বোধ হয় এমন অপরূপ আত্মরক্ষার উপায় ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ দান করেছেন। অন্ধকার হতে আর দেরি নেই এমন সময় তারা আবার ঠিক সেই জায়গায় এসে আবির্ভূত হল।

'তাদের দেখে আমার বুক ভীষণ ভাবে ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। তারা আগের মতই দলবদ্ধ হয়ে এসেছে—তেমনই স্বচ্ছন্দ মনে ঘাস খাচ্ছে—খেলা করছে। আমি রাইফেলটা তুলে নিলাম। পাল্লা বড়জোর পঁচাত্তর গজ, রাইফেলের পক্ষে কিছুই নয়; তবু হাত কাঁপছে, কিছুতেই ভুলতে পারছি না এই শেষ কার্তুজ—

'নিজের রাইফেলের আওয়াজে নিজেই চমকে উঠলুম। একটা হরিণ খাড়া উঁচু দিকে লাফিয়ে উঠ্‌ল—তারপর আবার সমস্ত দল ছায়াবাজির মত মিলিয়ে গেল।

'শেষ কার্তুজও ব্যর্থ হল! পক্ষাঘাতগ্রস্ত অসাড় মন নিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলুম। তারপর আস্তে আস্তে চেতনা ফিরে এল। মনে হল যেখানে হরিণগুলো দাঁড়িয়ে

ছিল সেখানে একগুচ্ছ লম্বা ঘাস আপনা-আপনি নড়ছে।

'কি হল! তবে কি—? ধুকতে ধুকতে দুজনে সেখানে গেলুম।

'বাতাস বইছে না, কিন্তু তবু ঘাসগুলো নড়ছে—যেন কোন অদৃশ্য শক্তি তাদের নাড়াচ্ছে। ক্রমে ঘাসের আন্দোলন কমে এল। তারপর ছায়ার মত আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল—চারিটি হরিণের ক্ষুর।

'মরেছে! মরেছে।'—জঙ-বাহাদুর ভাঙা গলায় চীৎকার করে উঠল। আমি তখন পাগলের মত ঘাসের উপর নৃত্য শুরু করে দিয়েছি। একটা নিরীহ ভীরু প্রাণীকে হত্যা করে এমন উৎকট আনন্দ কখনও অনুভব করিনি।

'পনর মিনিটের মধ্যে মৃত হরিণের দেহটি পরিপূর্ণ দেখা গেল। মৃত্যু এসে তার প্রকৃত স্বরূপ আমাদের চোখের সামনে প্রকট করে দিলে।...

'তারই চামড়ার উপর আপনি আজ বসে আছেন।'

তাঁহার গল্প হঠাৎ শেষ হইয়া গেল।

আমি বলিলাম, 'তারপর?'

তিনি বলিলেন, 'তারপর আর কি—শূল্য মাংস খেয়ে প্রাণ বাঁচালুম। সাত দিন পরে সেই উপত্যকার গণ্ডী পার হয়ে লোকালয়ে পেঁছিলাম। তারপর দু'মাস একাদিক্রমে হেঁটে একদিন ব্যাঙকক শহরে পদার্পণ করা গেল। সেখান থেকে জঙ-বাহাদুর চীনের জাহাজে চড়ল; আর আমি—; মাংসটা বোধ হয় তৈরি হয়ে গেছে।'

আহার শেষ করিয়া যখন এই ভাঙা বাড়ি হইতে বাহির হইলাম তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে।

বন্ধু আমার সঙ্গে চলিলেন। টর্চ জ্বালিলেন না, অন্ধকারে আমার বাইকের একটা হাতল ধরিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন।

প্রায় দশ মিনিট নীরবে চলিয়াছি। কোন্ দিকে চলিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই; মনে হইতেছে যে-পথে আসিয়াছিলাম সে পথে ফিরিতেছি না।

হঠাৎ বন্ধু বলিলেন, 'আজ সন্ধ্যাটা আমার বড় ভাল কাট্‌ল।'

আমি বলিলাম, 'আপনার—না আমার?'

'আমার। মাসখানেকের মধ্যে মন খুলে কথা কইবার সুযোগ পাইনি।'

আরও পনর মিনিট নিঃশব্দে চলিলাম। তারপর তিনি আমার হাতে টর্চ দিয়া বলিলেন, 'পাকা রাস্তায় পেঁছে গেছেন, এখান থেকে সহজেই বাড়ি ফিরতে পারবেন। এবার বিদায়। আর বোধ হয় আমাদের দেখা হবে না।'

আমি বলিলাম. 'সে কি! আমি আবার আসব। অন্ততঃ আপনার টর্চটা ফেরত দিতে হবে তো।'

'আসার দরকার নেই। এলেও আমার আস্তানা খুঁজে পাবেন না। টর্চ আপনার কাছেই থাক—একটা সন্ধ্যার স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ। আমি দু'চার দিনের মধ্যেই চলে যাব।'

'কোথায় যাবেন?'

তিনি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'তা জানি না। হয়তো আবার শ্যামদেশে যাব। এবার একটা জীবন্ত হরিণ ধরে আনবার চেষ্টা করব—কি বলেন?'

'বেশ তো। কিন্তু—আর আমাদের দেখা হবে না?'

'সম্ভব নয়। আচ্ছা—বিদায়।'

'বিদায়। দুর্দিনের বন্ধু—নমস্কার।'

কিছুক্ষণ অন্ধকারে দাঁড়াইয়া থাকিয়া টর্চ জ্বালিলাম—দেখিলাম, তিনি নিঃশব্দে চলিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল না, আর একবার দেখা হইল। দিন-সাতেক পরে একদিন রাত্রি সাতটার ট্রেনে আমার এক আত্মীয়কে তুলিয়া দিতে স্টেশনে গিয়াছি—অকস্মাৎ তাঁহার সঙ্গে মুখোমুখি হইয়া গেল।

'একি! আপনি!'

তাঁহার মাথায় একটা কান-ঢাকা টুপি; গায়ে সেই সোয়েটার ও লুঙ্গি। একটু হাসিয়া বলিলেন, 'যাচ্ছি।'

এই সময় ঘণ্টা বাজিল। স্টেশনে ভীড় ছিল; একজন তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী প্রকাণ্ড পোঁটলাসুদ্ধ পিছন হইতে আমাকে ধাক্কা মারিল। তাল সামলাইয়া ফিরিয়া দেখি—বন্ধু নাই।

বিস্মিতভাবে এদিক-ওদিক তাকাইতেছি—দেখি আমাদের শশাঙ্কবাবু আসিতেছেন। পুলিশের ডি-এস্-পি হইলেও লোকটি মিশুক। পরিচয় ছিল, এড়াইতে পারিলাম না; জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি খবর? আপনি কোথায় চলেছেন?'

'যাব না কোথাও। স্টেশনে বেড়াতে এসেছি।'—বলিয়া মৃদু হাস্যে তিনি অন্য দিকে চলিয়া গেলেন।

গাড়ি ছাড়িবার সময় হইয়া গিয়াছিল। তবু বন্ধুকে চারিদিকে খুঁজিলাম; কিন্তু এই দুই মিনিটের মধ্যে তিনি তাঁহার মায়ামৃগের মতই এমন অদৃশ্য হইয়াছিলেন যে, আর তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইলাম না।

তারপর হইতে এই এক বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে দেখি নাই; আর কখনও দেখিব কিনা জানি না।

গল্প-সাহিত্যের আইন-কানুন অনুসারে এ কাহিনী বোধ হয় বহুপূর্বেই শেষ হইয়া যাওয়া উচিত ছিল। বস্তুতঃ মায়া-হরিণের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে বসিয়া দেখিতেছি, 'ধান ভানিতে শিবের গীতই' বেশী গাহিয়াছি; গল্পের চেয়ে গল্পের বক্তার কথাই বেশী বলিয়াছি। আমি প্রথিতযশা কথা-শিল্পী নই, এইটুকুই যা রক্ষা, নহিলে লজ্জা রাখিবার আর স্থান থাকিত না।

যা হোক, আইন-ভঙ্গ যখন হইয়াই গিয়াছে তখন আর একটু বলিব।

এই কাহিনী লেখা সমাপ্ত করিবার পর একটি চিঠি পাইয়াছি, সেই চিঠিখানি উপসংহার-স্বরূপ এই সঙ্গে যোগ করিয়া দিব।

প্রীতিনিলয়েষু,

আমাকে বোধ হয় ভোলেন নাই। শ্যামদেশে গিয়াছিলাম, কিন্তু সে-হরিণ ধরিয়া আনিতে পারি নাই। বন্দী-দশায় উহারা বাঁচে না—না খাইয়া মরিয়া যায়।

ইতি—

শ্রীপ্রমথেশ রুদ্র

চিঠিতে তারিখ বা ঠিকানা নাই। পোস্ট-অফিসের মোহরও এমন অস্পষ্ট যে কিছু পড়া যায় না।

২৮ পৌষ ১৩৪৩

হাসি-কান্না

অধরোষ্ঠ প্রসারিত করিয়া দন্তনিষ্কাশনপূর্বক সশব্দে অথবা নিঃশব্দে মুখের একপ্রকার ভঙ্গী করার নাম হাসি। আবার, ঠিক উক্ত প্রকারে অধরোষ্ঠ প্রসারণ ও দন্ত বিকাশ করিয়া অনুরূপ মুখভঙ্গী করিলে উহা কান্না নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উভয়বিধ অভিব্যক্তির মধ্যে সীমা-রেখা অতিশয় সূক্ষ্ম। তবে মৎসদৃশ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা সহজেই উহাদের পার্থক্য ধরিয়া ফেলিতে পারেন।

অপিচ, হাসির সহিত আনন্দ নামক মনোভাবের একটা নিত্য-সম্বন্ধ আছে এইরূপ অনেকে মনে করেন, এবং কান্নার সহিত তদ্বিপরীত। এরূপ মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। আমি একটি মহিলাকে জানিতাম, মনে কোনপ্রকার ক্লেশ উপস্থিত হইলেই তিনি হাসিতেন; এমন কি মৃত্যুকালেও তিনি হাসিয়াছিলেন। কিন্তু সে যাক।

আজ রুচিরার হাসি-কান্নার কাহিনী বলিব। রুচিরা মেয়েটি সামান্য নয়। তাহার বয়স ঊনিশ বছর, কলেজের বি. এ. ক্লাসের ছাত্রী এবং—কিন্তু সে কালো। তাহাকে কালো বলিলেই সে হাসিত।

কালো মেয়ে বাঙলাদেশে অনেক আছে, সেজন্য ক্ষতি ছিল না। কিন্তু দৈব-পরিহাস এই যে, রুচিরার খুড়তুত বোন ছন্দা অপূর্ব সুন্দরী, ডানাকাটা পরী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দু'জনে সমবয়স্কা, একসঙ্গে পড়ে, এক বাড়িতে থাকে, দু'জনেরই পিতা বর্তমান এবং একান্নবর্তী। ইহাতেও বোধ করি ক্ষতি ছিল না, কিন্তু একটি আগন্তুক কোথা হইতে আসিয়া রুচিরার হাসি-কান্নার সহিত মিশিয়া গিয়া ব্যাপারটা যৎপরোনাস্তি জটিল করিয়া তুলিয়াছিল।

এই আগন্তুকের কথা আনুপূর্বিক বলা প্রয়োজন। একদিন সন্ধ্যাকালে ছন্দা ও রুচিরা কোন একটি কৃত্রিম হ্রদের উপকণ্ঠে বসিয়া নিজেদের পড়াশুনার অসম্পূর্ণতার কথা লইয়া তর্ক করিতেছিল। বাৎসরিক পরীক্ষা সমাগতপ্রায়, অথচ দু'জনেরই এমন অ-প্রস্তুত অবস্থা যে, পরীক্ষায় প্রকাশ্যভাবে অপ্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে একজন গৃহ-শিক্ষকের সাহায্য যে একান্ত প্রয়োজন,

ইহাই দুই বোনে একমত হইয়া তর্ক করিতেছিল। মেয়েদের তর্ক করিবার ইহাই রীতি, তাহারা একমত হইলেও তর্ক শেষ হয় না।

ছন্দা বলিল, 'ইংরেজী আর বাংলা কোনও রকমে চালিয়ে নেব, কিন্তু আমার মাথা খাবে—সংস্কৃত। মৃচ্ছকটিক পড়েছিস? কিছু বুঝতে পারিস?'

রুচিরা আকাশের দিকে তাকাইয়া বলিল, 'আমার মাথা খাবে—ফিলজফি। ভোলিশান আর রিফ্লেক্স্ অ্যাক্শনের তফাৎ বুঝতে পারিস?'

ছন্দা বলিল, 'কিচ্ছু না; ঝাড়া মুখস্থ করেছি।—কিন্তু সংস্কৃত যে ছাই মুখস্থও হয় না।'

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া রুচিরা বলিল, 'মাস্টার—একটা মনের মতন মাস্টার না হলে দু'জনেই গেলুম—'

তাহাদের পিছনে রাস্তার পাশে মোটর দাঁড়াইয়া ছিল। মোটরে তাহারা বায়ু সেবন করিতে আসিয়াছে, মোটরেই ফিরিবে। রুচিরা উঠিবার উপক্রম করিল।

ছন্দা তাহার আঁচল ধরিয়া বসাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, 'কিন্তু এমন মনের মতন মাস্টার পাবি কোথায়?'

রুচিরা মাথা নাড়িল, 'নেই। আমার সঙ্গে ইয়ার্কি দেবার চেষ্টা করবে না, তোর পানে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকবে না—কেবল সংস্কৃত আর ফিলজফি পড়াবে—এমন মাস্টার ভূ-ভারতে নেই। চল, বাড়ি যাই।'

দু'জনে উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার বসিয়া পড়িল।

অনতিদূরে আর একটা বেঞ্চির উপর যে একজন লোক বসিয়া আছে, তাহা ইতিপূর্বে কেহই লক্ষ্য করে নাই। এখন লোকটি তাহাদের সম্মুখে আসিয়া একবার করযুগল যুক্ত করিয়া দাঁড়াইল, গম্ভীর স্বরে বলিল, 'মাফ করবেন, আপনারা কি মাস্টার রাখতে চান?'

ছন্দা ও রুচিরা নির্বাক হইয়া লোকটির পানে তাকাইয়া রহিল। টুইলের হাফ-শার্ট পরা যুবক, মাথার চুল এলোমেলো। চোখের দৃষ্টিতে গাম্ভীর্য, অধরোষ্ঠে একটু ছেলেমানুষী ভাব।

কিছুক্ষণ দম লইয়া রুচিরা ক্ষীণস্বরে প্রশ্নের উত্তর দিল; বলিল, 'হ্যাঁ।'

যুবক বলিল, 'তাহলে যদি আপত্তি না থাকে, আমি আপনাদের পড়াতে পারি। মৃচ্ছকটিক একটি বস্তুতান্ত্রিক নাটক; ইব্সেন অমন নাটক লিখতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করতেন। আর, ভোলিশান এবং রিফ্লেক্স্ অ্যাক্শনের তফাৎ আমি এক মিনিটে বুঝিয়ে দিতে পারি।'

ছন্দা আচ্ছন্নের মত বলিল, 'আপনি—আপনি কে?'

যুবক বলিল, 'আমার নাম সরিৎ হালদার। আমি একজন বেকার যুবক; অর্থাৎ কোনও কাজই করি না। তবে, সুযোগ পেলে কাজ করতে রাজী আছি।'

রুচিরা দ্বিধা-জড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল 'আপনি কি এম. এ. পাস করেছেন?'

সরিৎ বলিল, 'দু'বার। ফিলজফিতে এবং সংস্কৃতে।'

দুই বোন পরস্পর মুখের পানে চাহিল।

ছন্দা বলিল, 'বেশ। কাল আমাদের বাড়িতে গিয়ে দেখা করবেন।' বলিয়া নিজেদের ঠিকানা দিল। যুবকের চোখের গাম্ভীর্য ও অধরোষ্ঠের ছেলেমানুষী গাঢ়তর হইল; সে একবার মাথা ঝুঁকাইয়া প্রস্থান করিল।

গাড়িতে বাড়ি ফিরিতে ফিরিতে ছন্দা একসময় গাড়ির ভিতরকার আলো জ্বালিয়া রুচিরার দিকে চাহিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। রুচিরাও মুখ টিপিয়া হাসিল।

রুচিরার হাসিটি বড় মিষ্ট। আর ছন্দার—ছন্দার কথা বলিতে গেলেই রামেন্দ্র-প্রশস্তির কথা মনে পড়ে—তোমার হাস্য সুন্দর, তোমার চাহনি সুন্দর—ইত্যাদি।

পরদিন হইতে সরিৎ হালদার ছন্দা ও রুচিরার মাস্টার নিযুক্ত হইল। কর্তারা বুঝিলেন, ছোকরা দুঃস্থ এবং পণ্ডিত। মেয়েরা দেখিল, দুঃস্থ এবং পণ্ডিত হইলেও মাস্টার সাধারণ লোক নয়। সে রুচিরার সহিত ইয়ার্কি দিবার চেষ্টা করিল না, ছন্দার দিকে ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল না—চোখে গাম্ভীর্য ও অধরোষ্ঠে ছেলে-মানুষী ভাব লইয়া ছাত্রীদের সংস্কৃত ও ফিলজফি শিখাইতে লাগিল।

মাস্টারের বয়স বোধ করি চব্বিশের বেশী নয়। মাথার চুল এলোমেলো, বেশভূষার পারিপাট্য নাই, প্রত্যহ দাড়ি কামাইবার কথাও স্মরণ থাকে না। কিন্তু অদ্ভুত তাহার পড়াইবার ক্ষমতা: শুধু যে সে কঠিন বিষয়কে সহজ করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারে তাহাই নয়, শিক্ষার্থিনীদের মনের মধ্যে কঠিন বস্তুকে তরল করিয়া তাহাদের সত্তার সহিত মিশাইয়া দিতে পারে। বিদ্যা তখন কেবল জ্ঞানের পর্যায়ে থাকে না, উপলব্ধির পর্যায়ে গিয়া উপস্থিত হয়। ছাত্রী দু'টি লেখাপড়ার মধ্যে তন্ময় হইয়া গেল।

কিন্তু চিরন্তনী শবরী তো লেখাপড়ার মধ্যে তন্ময় থাকে না। পরমা প্রকৃতির বিধি-বিধান অন্যরূপ। ছন্দা ও রুচিরার সুগহন অন্তর্লোকে হয়তো গোপনে গোপনে যে দ্বন্দ্বের প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়া যায়, তাহা তাহারা নিজেরাও ভাল করিয়া জানিতে পারে না।

জলের ভিতর দিয়া বৈদ্যুতিক স্রোত প্রেরণ করিলে জল বিপরীতধর্মী দুটি বাষ্পে পরিণত হয়; হাইড্রোজেন আগুনের সংস্পর্শে জ্বলিয়া উঠে, অক্সিজেন নিজে না জ্বলিয়া অগ্নিকে আরও দীপ্তিমান করিয়া তোলে। আশ্চর্য প্রকৃতির ইন্দ্রজাল। ছন্দা ও রুচিরা এতদিন জলের মত ওতপ্রোতভাবে পরস্পর মিশিয়া ছিল, এখন যেন বিদ্যুতের সংস্পর্শে দ্বিধা হইয়া গেল। কবে এবং কখন এই সব বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ঘটিল, তাহা কেহ জানিল না।

দু'জনের পড়িবার ঘর একই; একটি টেবিলের দু'পাশে বসিয়া দু'জনে পড়াশুনা করে। মাস্টার আসিয়া তৃতীয় দিকে বসেন, এবং নিরপেক্ষভাবে দুই ছাত্রীর পানে পর্যায়ক্রমে তাকাইয়া শিক্ষা দান করেন। মাস্টারের এই অটল নিরপেক্ষতা বুঝি বা অন্তরে অন্তরে অনর্থের সৃষ্টি করে। নিরপেক্ষতা খুবই উচ্চ অঙ্গের চিত্তবৃত্তি; কিন্তু পক্ষপাতিত্বের একটা সুবিধা এই যে, কোনও পক্ষের মনেই সংশয়ের অবকাশ থাকে না।

মাস্টার সকালবেলায় পড়াইতে আসেন। ছাত্রীরা আগে হইতেই পড়ার ঘরে বসিয়া তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করে। কোনও দিন হয়তো ছন্দার একটু দেরি হইয়া যায়, সে তাড়াতাড়ি পড়ার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখে, মাস্টার তখনো আসেন নাই, রুচিরা একটা নোটের খাতা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে।

ছন্দা একবার রুচিরার মুখের দিকে তাকাইয়া নিজের চেয়ারে বসিতে বসিতে বলে, 'রুচি, তোর নাকের পাশে পাউডার লেগে আছে, মুছে ফেল।'

রুচিরা আঁচল দিয়া নাকের পাশে ঘষিতে ঘষিতে হাসে, বলে, 'কালো রঙের ওপর পাউডারের জেল্লা খোলে বেশী। তোর কিন্তু কিছু বোঝা যায় না।'

ছন্দা একটা বইয়ের পাতা খুলিয়া বলে, 'নেয়ে উঠে একটা কিছু মুখে না মাখলে মুখটা যেন চটচট করে।'

রুচিরা বলে, 'হ্যাঁ। আজকাল রোজ সকালে নাওয়া আরম্ভ করেছিস দেখছি। আমি ভাই পারি না।'

ছন্দা ঈষৎ তপ্তমুখে বলে, 'সকালে না নাইলে চুল শুকোয় না। এলোচুলে কলেজে যাওয়া একটা অসভ্যতা।'

দুই ভগিনীর মিষ্টালাপ শেষ হইবার পূর্বেই মাস্টার প্রবেশ করেন। ছাত্রীরা সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আবার বসে।

মাস্টার একটা বই তুলিয়া লইয়া বলিলেন, 'ছন্দা, ক'দিন ধরে লক্ষ্য করছি, ফিলজফি পড়াবার সময় তুমি মন দিয়ে শোন না।'

ছন্দা ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, 'শুনি তো।'

মাস্টারের চোখের গাম্ভীর্যের কাছে অধরের ছেলেমানুষী পরাভূত হইয়া পলায়ন করে। তিনি বলেন, 'শোন বটে, কিন্তু মন দাও না।—আর, রুচিরা, তুমিও দেখছি সংস্কৃত পড়ানোর সময় অন্যমনস্ক হয়ে পড়।'

রুচিরা অপরাধিনীর মত চক্ষু নত করিয়া থাকে, তারপর আস্তে আস্তে বলে, 'আর অন্যমনস্ক হব না।'

মাস্টার বলেন, 'বেশ! এস, আজ তোমাদের এথিক্‌স্‌ পড়াব।'

পাঠ আরম্ভ হয়।

কিন্তু ছাত্রীযুগল মাস্টার বিরক্ত হইয়াছেন মনে করিয়া মনে মনে যেন কাঁটা হইয়া থাকে।

আশ্চর্য। একদিকে দুইটি ধনীর কন্যা—অভিজাত সমাজের মধ্যমণি বলিলেও মিথ্যা বলা হয় না, অন্যদিকে দুঃস্থ বেকার মাস্টার। ইহাদের মধ্যে মাস্টার-ছাত্রী সম্বন্ধ ছাড়া অন্য কোনও সম্বন্ধ কল্পনা করাও যায় না। অথচ—

ভারি আশ্চর্য।

কিন্তু মাস্টার যদি শেষ পর্যন্ত দুঃস্থ বেকার মাস্টারই রহিয়া যায়, তাহা হইলে নির্মম কান্না অথবা নির্মমতর হাসি ছাড়া এ কাহিনীর অন্য পরিসমাপ্তি সম্ভব হয় না। তাহা হইলে রুচিরার হাসি-কান্না আসে কোথা হইতে? এবং মাস্টারের পরিপূর্ণ পরিচয়ই বা দেওয়া যায় কি করিয়া? যে মাস্টার চিরদিন দুঃস্থ ও বেকার রহিয়া যায়, তাহার পরিচয় দিবার আগ্রহ আর যাহার থাকে থাক, আমার নাই। আমি রূপকথা বলিতেই ভালবাসি।

বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হইয়া যাইবার পর একদিন মাস্টারের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ হইয়া পড়িল।

কলেজে পড়ার তাড়া নাই, মাস্টার সাধারণভাবে ছাত্রীদের সহিত কাব্য ও দর্শনের যোগাযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় ছন্দার বাবা ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে কয়েক কেতা নোট।

মাস্টারের মাহিনা তাহার হাতে দিতেই সে তাহা পকেটে রাখিয়া আবার আলোচনা আরম্ভ করিল।

ছন্দার বাবা হাইকোর্টের উকিল, তিনি একটি চেয়ারে বসিয়া কিছুক্ষণ মনঃসংযোগে আলোচনা শুনিলেন; তারপর সহসা মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার বাবার নাম কি?'

মাস্টার একটু চমকিত হইল। কিন্তু বাপের নাম ভাঁড়াইতে কাহারও কাহারও চক্ষুলজ্জায় বাধে। সরিৎ হালদার যথার্থ পিতৃনাম বলিল। নামের পুরোভাগে যে একটা রাজকীয় খেতাব ছিল তাহাও বাদ দিল না।

ছন্দার বাবা বলিলেন, 'হুঁ। কিন্তু তুমি এ ভাবে—?'

সরিৎ বলিল, 'আপনারা একটু ভুল বুঝেছিলেন। আমি বেকার বলে নিজের

পরিচয় দিয়েছিলুম বটে, কিন্তু নিজেকে দুঃস্থ বলিনি। সে সময় আমি বেকারই ছিলুম।'

ছন্দার বাবা বলিলেন, 'হুঁ—Suggestio falsi! কিন্তু এ অবস্থায়—'

সরিৎ বলিল, 'অবস্থার কোনও পরিবর্তনই ঘটেনি। বড়মানুষের ছেলে হয়ে জন্মানো শিক্ষক হবার অযোগ্যতা প্রমাণ করে না। তাছাড়া ছন্দা আর রুচিরাকে পড়াতে আমার ভাল লাগে, ওরা খুব মেধাবিনী ছাত্রী।' বলিয়া নিরপেক্ষ স্নিগ্ধ চোখে দু'জনের পানে চাহিয়া হাসিল।

ছন্দা ও রুচিরা এই বাক্যালাপের শুরু হইতেই মাস্টারের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে তাকাইয়া ছিল, এখনও তেমনি তাকাইয়া রহিল।

ছন্দার বাবা বলিলেন, 'তা বটে, কিন্তু—'

সরিৎ বলিল, 'আমি যেমন মাইনে নিচ্ছি, তেমনি নেব। আপনার ভয় নেই।'

সঙ্কোচ কাটিয়া গেল। ছন্দার বাবা হাসিলেন, বলিলেন, 'বেশ কথা।'

তিনি প্রস্থান করিলে ছন্দা হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া উত্তপ্ত-মুখে বলিল, 'আপনি এতদিন একথা লুকিয়ে রেখেছিলেন কেন?'

সরিৎ বলিল, 'না লুকোলে তোমাদের পড়াত কে?'

'কেন, আর কি লোক ছিল না?'

'ছিল। কিন্তু তারা রুচিরার সঙ্গে ইয়ার্কি দেবার চেষ্টা করত কিম্বা তোমার পানে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকত। ফলে তোমরা পরীক্ষায় ফেল করতে।' মাস্টারের স্বর গম্ভীর।

রুচিরার অধর একটু স্ফুরিত হইল, চোখের কূলে কূলে হাসি ভরিয়া উঠিল। মাস্টারের অধরে কিন্তু ছেলেমানুষীর চিহ্নমাত্র নাই।

ছন্দা যেন পরাস্ত হইয়া বসিয়া পড়িল; তারপর মিনতির স্বরে বলিল, 'বলুন না মাস্টার মশাই, সত্যি কেন লুকিয়েছিলেন?'

এতক্ষণে সরিতের অধরে ছেলেমানুষীর ভাব ফিরিয়া আসিল। সে বলিল, 'মিথ্যাকে সত্য করে তোলার নাম রোমান্স। রোমান্সের চূড়ান্ত হচ্ছে রূপকথা। আমি রূপকথা বড় ভালবাসি। ছদ্মবেশী রাজকুমারের কথা পড়েছ তো? আমি রাজকুমার নই, কিন্তু ছদ্মবেশের পরিপূর্ণ আনন্দ ভোগ করে নিয়েছি। এমন কি, ছদ্মবেশ ত্যাগ করবার পরও সে আনন্দ শেষ হয়নি।'

ছন্দা বলিল, 'ছদ্মবেশ?'

'হ্যাঁ। এইটেই জীবনের সব চেয়ে বড় রোমান্স। অধিকাংশ মানুষই জানে না যে সে ছদ্মবেশ পরে বেড়াচ্ছে, পদে পদে নিজের মিথ্যা পরিচয় দিচ্ছে। তাই তারা রূপ-কথার আনন্দ থেকে বঞ্চিত।'

ছন্দা সুন্দর অধর বিভক্ত করিয়া, দুই চোখে মুগ্ধ বিস্ময় ভরিয়া চাহিয়া রহিল; কালো মেয়ে রুচিরার কালো চোখে নিগূঢ় হাসি টলমল করিতে লাগিল।

সেরাত্রে শয়নের পূর্বে রুচিরা অনেকক্ষণ ধরিয়া আয়নায় নিজেকে নিরীক্ষণ করিল। তারপর তাহার দৃষ্টি গিয়া পড়িল আয়নার পাশে টাঙানো ছন্দার একটি ফটোর উপর। সে একটু একটু হাসিতে লাগিল। চকিতের জন্য তাহার দৃষ্টি আবার আয়নায় ফিরিয়া গেল। হঠাৎ সে একটু জোরে হাসিয়া উঠিল। তারপর ক্ষিপ্রহস্তে আলো নিবাইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

ছন্দা তাহার পাশের ঘরে শোয়। অনেক রাত্রে সে আসিয়া গা ঠেলিয়া রুচিরার ঘুম ভাঙাইয়া দিল, 'এই রুচি, ওঠ্—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ফোঁপাচ্ছিস কেন?'

ঘুম ভাঙিয়া রুচিরা কিছুক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল; তারপর অস্ফুট স্বরে বলিল, 'স্বপ্ন দেখছিলুম। ভারি মজার স্বপ্ন। শুগে যা ছন্দা, আর ফোঁপাব না।'

দিন যায়। মাস্টারও আসেন এবং যান। রুচিরা সমস্ত দিন হাসে; রাত্রে ঘুমের ঘোরে তাহার চোখের জলে বালিশ ভিজিয়া যায়। কি স্বপ্ন দেখে, কে জানে!

রুচিরা চালাক মেয়ে। অপ্রাপ্য বস্তুর পানে হাত বাড়াইয়া সে নিজেকে খেলো করিতে চায় না। ছন্দার গালদু'টিতে গোলাপ ফুটিয়া থাকে, চোখের চাহনিতে রূপ-কথার স্বপ্নাতুরতা। রুচিরা দেখিয়া হাসে; সে-হাসি ছন্দার কাছে ধরা পড়িয়া যায়। ছন্দার কপাল হইতে বুক পর্যন্ত রাঙা হইয়া ওঠে। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কেহ কিছু বলে না।

রুচিরা আগের মত পড়ার ঘরে বসিয়া মাস্টারের প্রতীক্ষা করে না। মাস্টার আসিয়াছেন খবর পাইলে, কোনও মতে হাত-ফের দিয়া চুলাগুলা জড়াইয়া নীচে নামিয়া যায়। নতনেত্রে বসিয়া অখণ্ড মনোযোগে মাস্টারের বক্তৃতা শোনে; তারপর পাঠ শেষ হইলে, একটু হাসিয়া দু'জনের প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া চলিয়া যায়।

মাস্টার হয়তো সবই লক্ষ্য করেন, কিন্তু তাঁহার তুলাদণ্ডের মত নিরপেক্ষতা তিল-মাত্র বিচলিত হয় না, চোখের গাম্ভীর্য ও অধরের চটুলতা আরও পরিস্ফুট হয় মাত্র।

একদিন সকালে মাস্টার পড়াইতে আসিলেন না। ছন্দা টেবিলের সম্মুখে বসিয়া ছটফট করিতে লাগিল, মুহুর্মুহুঃ দেওয়ালের ঘড়ির সঙ্গে চোখাচোখি হইল। ঘড়ি নির্বিকার মুখে টিক টিক শব্দ করিয়া চলিল। রুচিরা নিবিষ্ট চিত্তে মৃচ্ছকটিক পড়িতে পড়িতে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। সকাল কাটিয়া গেল।

ছুটির দিন ছিল। বৈকালবেলা রুচিরা পড়ার ঘরে অলসভাবে বসিয়া একটা খাতায় হিজিবিজি কাটিতেছিল, অযত্নবন্ধ চুলগুলা কাঁধের উপর খসিয়া পড়িতেছিল।

অন্যমনস্কভাবে সে খাতায় লিখিল—

যাহার ঢল ঢল নয়ন শতদল
তারেই আঁখিজল সাজে গো।

আজ সকালে সে হঠাৎ ছন্দার চোখে জল দেখিয়া ফেলিয়াছে।

নানা আবোল-তাবোল চিন্তা মাথায় আসিতে লাগিল। মগ্ন-চৈতন্য জিনিসটা কি? যত নিগৃহীত আশা-আকাঙ্ক্ষা সব কি ডানা-ভাঙা পাখির মত সেইখানে গিয়া আশ্রয় লয়?...মৃচ্ছকটিকে ধূতার চরিত্রটি কেমন? নিজের স্বামীকে বসন্তসেনার হাতে তুলিয়া দিল! কিন্তু—

ছন্দা বাহিরে যাইবার বেশে ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, 'রুচি, আমি মাসীমার বাড়ি যাচ্ছি; তাঁর কি হয়েছে, ডেকে পাঠিয়েছেন।'

কবিতার পংক্তিগুলি কাটিতে কাটিতে রুচি বলিল, 'আচ্ছা।'

ছন্দা যেন আরও কিছু বলিবে এমনিভাবে একটু ইতস্তত করিয়া চলিয়া গেল।

...রূপকথার রাজপুত্রেরা ছদ্মবেশ পরিয়া কিসের খোঁজে বাহির হন? সাতশ' রাক্ষসীর প্রাণ এক ভোমরা? সাপের মাথায় মাণিক? অপরূপ রূপসী রাজকন্যা...

পাশের ঘরটা ড্রয়িংরুম; সেখানে টেলিফোনের ঘণ্টি বাজিয়া উঠিল। রুচিরা অলস পদে উঠিয়া গিয়া ফোন ধরিল।

'কে আপনি?'

ভারি গলায় জবাব আসিল, 'আমি সরিৎ। তুমি কে? রুচিরা?'

রুচিরার গলা যেন বুজিয়া গেল, 'হ্যাঁ। আজ আসেননি কেন?'

'কাজ ছিল।'

হাসিবার চেষ্টায় রুচিরার গলা কাঁপিয়া গেল, 'আজ আপনার প্রথম কামাই। জরিমানা হবে।'

'জরিমানা করবে কে?'

'—ছন্দা।'

'ও! ভাল।—শোন, তোমার বাবা-কাকাবাবু এ'রা বাড়িতে আছেন?'

'হ্যাঁ। আজ ছুটি। কেন?'

'দরকার আছে। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে যাচ্ছি। তোমাদের না হয় পড়িয়ে আসব'—একটু ইতস্তত করিয়া—'ছন্দা নিশ্চয় বাড়িতে আছে?'

'না। ছন্দা মাসীমার বাড়ি গিয়েছে।'

মনে হইল, তারের অপর প্রান্ত হইতে একটা দীর্ঘশ্বাস ভাসিয়া আসিল।

রুচিরা হঠাৎ ধৃষ্টতা করিয়া বসিল, 'দুঃখ হচ্ছে বুঝি?'

'রুচিরা, তোমরা আমার ছাত্রী না?'

'দোষ করেছি, মাপ করুন।'

'আচ্ছা। তুমি বাড়িতে থাকবে তো?'

'থাকব।'

'আমি যাচ্ছি।—হ্যাঁ, শোনো! একটা কথা জানো?'

'কি?'

'হাসি-কান্নার মত দীর্ঘশ্বাসেরও দু'রকম মানে হয়।'

'বুঝতে পারছি না।'

'হাসিতে কি খালি আনন্দই বোঝায়? কান্না কি কেবল দুঃখেরই প্রতীক?'

'এখনও বুঝতে পারছি না।'

'আচ্ছা—আমি যাচ্ছি—'

রুচিরা ফিরিয়া আসিয়া পড়ার ঘরে বসিল। নিতান্তই স্ত্রী-স্বভাববশত নিজের বেশভূষার দিকে দৃষ্টি পড়িল। শাড়িটা আধময়লা, ব্লাউজ এককালে নূতন ছিল, এখন ধোপার কল্যাণে স্থানে স্থানে রং উঠিয়া গিয়াছে। তা হোক, ক্ষতি কি? অসহিষ্ণু হস্তে স্খলিত চুলগুলা রুচিরা টান করিয়া পিছনে জড়াইল। চুলগুলা একটা জঞ্জাল!—মেমেদের মত বব করিলে কেমন হয়!

দ্বৈপ্রাহরিক বিশ্রাম শেষ করিয়া বাবা ও কাকা ড্রয়িংরুমে আসিয়া বসিলেন। তাঁহাদের কথার গুঞ্জন মাঝের ভেজানো দরজা দিয়া অস্পষ্টভাবে আসিতে লাগিল।

আধ ঘণ্টা কাটিল। একটি পরিচিত পদধ্বনি পড়ার ঘরের সম্মুখ দিয়া গিয়া ড্রইংরুমের গালিচার উপর বিলুপ্ত হইল। বাবা ও কাকার সম্ভাষণ শোনা গেল, 'এস সরিৎ।'

তারপর তাঁহাদের বাক্যালাপ আবার গুঞ্জনধ্বনিতে পর্যবসিত হইল। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট—কথা যেন আর শেষ হয় না।

রুচিরা উঠিয়া একবার ভেজানো দরজার সম্মুখ দিয়া অলস নিঃশব্দ পদে হাঁটিয়া গেল। সরিতের কণ্ঠের দুই তিনটি কথা তাহার কানে গেল। সে আবার পা টিপিয়া নিজের স্থানে আসিয়া বসিল।

ও—এই কথা। টেলিফোনে কথাবার্তার ভঙ্গী হইতেই রুচিরার বোঝা উচিত ছিল। বিবাহের প্রস্তাব। পাত্রীর নামটি শোনা না গেলেও ছন্দা ছাড়া আর তো কেহ হইতে পারে না।

আরো অনেকক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্নের মত রুচিরা বসিয়া রহিল।...স্বপ্ন কখনও মিথ্যা

হয়?...সহসা চমক ভাঙিয়া সে দেখিল, সরিৎ আসিয়া টেবিলের অপর পাশে দাঁড়াইয়াছে। তাহার অধরের ছেলেমানুষী কোন অভাবনীয় উপায়ে চোখের মধ্যেও সঞ্চারিত হইয়াছে।

রুচিরা সহাস্যে উঠিয়া দাঁড়াইল।

সরিৎ কপট-কঠোর স্বরে বলিল, 'ফাজিল মেয়ে।'

'কি করেছি?'

সরিৎ উত্তর না দিয়া তাহার পানে কেবল কপট-কঠোর চক্ষে চাহিয়া রহিল।

রুচিরা তখন কৌতুক-তরল হাসিতে হাসিতে বলিল, 'বসুন, মাস্টার মশাই। আচ্ছা, এখনও কি আপনাকে মাস্টার মশায় বলতে হবে?'

সরিৎ বলিল, 'না।' তারপর যেন একটু বিবেচনা করিয়া বলিল, 'এখন তুমি আমাকে ওগো বলতে পার। কর্তারা অনুমতি দিয়েছেন।'

অদম্য আবেগে টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া রুচিরা কাঁদিতেছে। সরিৎ তাহার পাশে আসিয়া অযত্নবন্ধ চুলগুলি খুলিয়া দিয়া বলিল, 'চুল খুলে কাঁদতে হয়। কালিদাস বলেছেন,—বিললাপ বিকীর্ণমূর্দ্ধজা।'

অশ্রুপ্লাবিত মুখ ক্ষণেকের জন্য তুলিয়া রুচিরা বলিল, 'কিন্তু আমি যে কালো!'

সরিৎ তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া বিকীর্ণকুন্তল মাথায় পানে কিয়ৎকাল চাহিয়া রহিল, তারপর স্বপ্নাবিষ্ট কণ্ঠে বলিল, 'ওটা তোমার ছদ্মবেশ। তুমিই আমার রূপ-কথার রাজকন্যা।'

২২ ভাদ্র ১৩৪৪

প্রণয়-কলহ

অরুণা ও হিরণ পিঠোপিঠি হইয়া বিপরীত মুখে বসিয়াছিল। উদাস দৃষ্টি আকাশের দিকে। মাঝে মাঝে উভয়েই আড়চক্ষে পরস্পরকে দেখিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে।

দু'জনের মনে সংশয় জাগিয়াছে—ও আমাকে ভালোবাসে না। তাহাদের জীবনে এই প্রথম কলহ।

অরুণা সহসা ফিরিয়া বসিল; তাহার বয়স সতেরো, তাই ধৈর্য ও সংযম এখনও

দানা বাঁধে নাই। অবরুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—

'কেন আন বসন্ত নিশীথে
আঁখি-ভরা আবেশ বিহ্বল—
যদি বসন্তের শেষে শ্রান্ত মনে ম্লান হেসে
কাতরে খুঁজিতে হয় বিদায়ের ছল?'

হিরণও ফিরিল; তাহার বৈরাগ্যের ভস্মাবরণের ভিতর দিয়া ঈষৎ তৃপ্তির ঝিলিক খেলিয়া গেল। তবু সে উদাস গম্ভীর স্বরে বলিল,—

'কেন তুমি মূর্তি হয়ে এলে,
রহিলে না ধ্যান-ধারণার।
সেই মায়া-উপবন কোথা হল অদর্শন
কেন হায় ঝাঁপ দিতে শুকাল পাথার।'

অরুণার চোখের জল এবার ঝরিয়া পড়িল, সে বলিল,—

'বুঝেছি আমার নিশার স্বপন
হয়েছে ভোর।
মালা ছিল, তার ফুলগুলি গেছে,
রয়েছে ডোর।
নেই আর সেই চুপি-চুপি চাওয়া
ধীরে কাছে এসে ফিরে ফিরে যাওয়া—'

অরুণার মুখখানি নতবৃন্ত পুষ্পের মতো বুকের উপর নামিয়া পড়িল।

হিরণ বলিল,—

'দূরে দূরে আজ ভ্রমিতেছি আমি
মন নাহি মোর কিছুতে—'

তাহার উদাসীন দৃষ্টি যেন আকাশের দুরবগাহ দূরত্বের মধ্যে ডুবিয়া গেল! কিছুক্ষণ নীরব। তারপর কাতর চক্ষু তুলিয়া অরুণা থরথর স্বরে বলিল,—

'এখনি কি শেষ হয়েছে প্রাণেশ
যা কিছু আছিল মোর?
যত শোভা যত গান যত প্রাণ,
জাগরণ, ঘুমঘোর।
শিথিল হয়েছে বাহুবন্ধন
মদিরাবিহীন মম চুম্বন,
জীবনকুঞ্জে অভিসার-নিশা
আজি কি হয়েছে ভোর?
ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা,
আনো নব রূপ, আনো নব শোভা—'

প্রবল রোদনোচ্ছ্বাসে অরুণার কথা শেষ হইল না।

হিরণের মনটা গলিয়া টলমল করিতে লাগিল। কিন্তু তবু প্রথম কলহের নূতন ঐশ্বর্য সহজে ছাড়া যায় না। সে অন্য সুর ধরিল; ব্যথিত কণ্ঠে কহিল,—

'তুমি যদি আমায় ভালো না বাস
রাগ করি যে এমন আমার সাধ্য নাই,
এমন কথার দেব নাকো আভাসও
আমারো মন তোমার পায়ে বাধ্য নাই—'

অরুণা সচকিতে মুখ তুলিয়া চাহিল—
'ওগো ভালো করে বলে যাও—'
হিরণ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—
'বর্ষে বর্ষে বয়স কাটে,
বসন্ত যায় কথায় কথায়,
বকুলগুলো দেখতে দেখতে
ঝরে পড়ে যথায় তথায়,
মাসের মধ্যে বারেক এসে
অস্তে পালায় পূর্ণ ইন্দু,
শাস্ত্রে শাসায় জীবন শুধু
পদ্মপত্রে শিশির-বিন্দু।
তাঁদের পানে তাকাব না
তোমায় শুধু আপন জেনেই
সেটা বড়ই বর্বরতা,—
সময় যে নেই,—সময় যে নেই!'

অরুণা অভিমান-ভরা দুই চক্ষু ক্ষণকাল হিরণের উপর স্থাপন করিয়া দু'হাতে মুখ ঢাকিল।

হিরণ তখন উঠিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল, ক্ষুব্ধ স্বরে কহিল,—
'মিথ্যা আমায় কেন শরম দিলে
চোখের চাওয়া নীরব তিরস্কারে!'

অরুণাও চোখ মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—
'বুক ফেটে কেন অশ্রু পড়ে
তবুও কি বুঝিতে পার না?
তর্কেতে বুঝিবে তা কি? এই মুছিলাম আঁখি,
এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভর্ৎসনা।'

হিরণ কম্পিতহস্তে তাহার হাত ধরিল—
'হে নিরুপমা,
চপলতা আজ যদি কিছু ঘটে
করিয়ো ক্ষমা।
তোমার দুখানি কালো আঁখি'পরে
শ্যাম আষাঢ়ের ছায়াখানি পড়ে,
ঘনকালো তব কুঞ্চিত কেশে
যূথীর মালা।
তোমারি ললাটে নববরষার
বরণডালা।'

অরুণার চোখের ছায়া দূর হইল না; সে বলিল,—
'ভালোবাস কি না বাস বুঝিতে পারি নে—'

হিরণের বাহুবন্ধন আরও দৃঢ় হইল, সে বলিল,—
'তোমাকেই যেন ভালোবাসিয়াছি
শতরূপে শত বার
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।'

অরুণার চোখের দৃষ্টিতে যুগান্তরের কুহক ঘনাইয়া আসিল। উভয়ে পরস্পরের আরও নিকটবর্তী হইতে লাগিল। তারপর—

'রসভরে দুহুঁ তনু
থরথর কাঁপই—'

১৩৪৪

ধীরে রজনি!

পাশের বাড়িতে শানাই বাজিতেছে। কি মধুর শানাই বাজিতেছে! আজ ও-বাড়ির একটি মেয়ের বিবাহ।

মেয়েটিকে আমি দেখিয়াছি। নবোদ্ভিন্ন যৌবন, কিন্তু যৌবনরাজ্যের মন্ত্রে দীক্ষিত হয় নাই। চোখের দৃষ্টিতে বিস্ময় আর আনন্দ।

মেয়েটির নাম, শুনিয়াছি,—রজনী।

আজ তাহার বিবাহ।

ধীরে, রজনি,—ধীরে!

এখনও তুমি অন্ধ, তাই তোমার চোখে এত বিস্ময়, এত আনন্দ। যখন সোনার কাঠি স্পর্শে তোমার অন্ধতা ঘুচিয়া যাইবে, তখনও যেন তোমার দৃষ্টির বিস্ময় আর আনন্দ ঘুচিয়া না যায়। ধীরে রজনি—

তোমার হাতে প্রদীপ জ্বলিতেছে, আর জ্বলিতেছে তোমার অকলঙ্ক দেহবর্তিকায় কুমারী-মনের নিষ্কম্প শিখা। এই স্নিগ্ধ নির্মল দীপালোকে তোমার বাসরগৃহ আলোকিত হোক্।

আজ যে পথে তোমার অলক্ত-রাঙা চরণ অর্পণ করিলে, অভিসারিকার মতো তুমি চিরদিন সে পথে চলিও—সংগোপনে, কম্প্রবক্ষে, স্বপ্নবিজড়িত নেত্রে।

ওগো বধূ, রাখো তোমার লাজ
রাখো লাজ;
অতি যত্নে সীমন্তটি চিরে
সিঁদুর বিন্দু আঁকো নাই কি শিরে,
হয়নি সন্ধ্যা সাজ?

দয়িত যে তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে—অধীর উদ্বেল হৃদয়ে নবীনা অভিসারিকার পথ চাহিয়া আছে। তবু—ধীরে রজনি—। মন্দং নিধেহি চরণৌ। লঘু মন্থর পদে

অভিসার-গৃহে প্রবেশ কর। অয়ি প্রথম-প্রণয়ভীতে, ব্রীড়ায় সমস্ত দেহ আবৃত করিয়া, তুমি প্রিয়-সমাগম কর। তোমার সুমধুর আনন্দ-বিস্ময়-মাখা অন্ধতা ঘুচিয়া যাক্—

When beauty and beauty meet,
All naked fair to fair—
The earth is crying—sweet—
And scattering—bright the air
Eddying, dizzying, closing round
With soft and drunken laughter
Veiling all that may befall.
After—after—

নন্দনবন-মধুপূর্ণ পাত্র তুমি পান কর। অয়ি কুমারি, তুমি নারী হও—তবু—ধীরে, রজনি—ধীরে—

শানাইয়ের সুরের সঙ্গে মিশিয়া মনটা বোধ হয় কাব্যলোকে উত্তীর্ণ হইয়াছিল, হঠাৎ ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে বাস্তবলোকে নামিয়া আসিলাম। পাশের ঘরে দাদা ও বৌদিদির কথাবার্তা কানে আসিল:

দাদা খিঁচাইয়া বলিলেন, 'জামাতে যে একটাও বোতাম নেই, এটা কি চোখে দেখতে পাও না?'

বৌদিদি জবাব দিলেন, 'পারব না আমি। থাকে না কেন বোতাম? তোমার যদি দশটা দাসী-বাঁদী থাকে তাদের দিয়ে সেলাই করিয়ে নাওগে।'

দাদা বলিলেন, 'তা তো বটেই, নবাব-বংশের মেয়ে তুমি, বোতাম সেলাই করতে পার্‌বে কেন!'

বৌদিদি ঝাঁঝিয়া উঠিলেন, 'খবরদার বলছি, বাপ তুললে ভাল হবে না। তুমি কোন নবাব-বংশের ছেলে শুনি? ভাত-কাপড়ের কেউ নয়, কিল মারবার গোঁসাই!... ওরে লক্ষ্মীছাড়া, তুই থাম্‌বি, না কেবল বাপের মতো চেঁচাবি?'—বলিয়া দুই বছরের ছেলেটাকে দুম্‌দুম্‌ করিয়া পিটিতে লাগিলেন। ছেলেটা ব্যা ব্যা করিয়া তারস্বরে চীৎকার জুড়িয়া দিল।

এই সময় পাশের বাড়ির দরজায় ঘন ঘন শঙ্খ ও হুলুধ্বনি শুনা গেল। বর আসিয়াছে। বিবাহের আর দেরি নাই। এখনই দুইটি মানব-মানবী অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়িবে! আমি লাফাইয়া গিয়া জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম, 'ধীরে, রজনি—ধীরে!'

কিন্তু শঙ্খ ও হুলুধ্বনিতে আমার গলা চাপা পড়িয়া গেল।

১৩৪৪

শুক্লা একাদশী

আকাশের চন্দ্র ও পাঁজির তিথিতে কোনও মতভেদ ছিল না—আজ শুক্লা একাদশীই বটে।

রাত্রির আহারাদি শেষ করিয়া বিনয় তাহার বাঁশের বাঁশিটি লইয়া ছাদে উঠিয়াছিল। আকাশে শুক্লা একাদশীর চন্দ্রকুহেলি, চারিদিকে কলিকাতার সংখ্যাহীন ছাদের চক্রব্যূহ। বিনয় পরিতৃপ্ত মনে পাশের বাড়ির ছাদের দিকে তাকাইয়া বাঁশিতে ফুঁ দিয়াছিল। বাঁশি মুগ্ধ কূজনে বাজিতেছিল—

আজি শুক্লা একাদশী,
হের তন্দ্রাহারা শশী,
স্বপ্ন পারাবারের খেয়া
একেলা চালায় বসি।

পাশের বাড়ির ছাদে কিছুদিন যাবৎ একটি মেয়ের আবির্ভাব হইতেছিল। দুই ছাদের মাঝখানে একটি অতলস্পর্শ সংকীর্ণ গলির ব্যবধান; তবু আলিসার পাশে দাঁড়াইয়া হাত বাড়াইলে হাতে-হাতে ছোঁয়া-ছুঁয়ি হইতে পারে। মেয়েটি পাশের বাড়িতে সম্প্রতি আসিয়াছে; তাহার বোধ হয় রাত্রে শয়নের পূর্বে ছাদে বেড়ান অভ্যাস। দুই জনের অভ্যাস সমকালীন হওয়ায়, প্রথমে দেখাসাক্ষাৎ ও পরে আলাপ হইয়াছিল। মেয়েটির নাম বিনতা।

বিনতার বয়স কতই বা হইবে? বিনয়েরই সমবয়সী, কিংবা দু'এক বছরের ছোট। চাঁদের আলোতেই বিনয় তাহাকে দেখিয়াছিল। চোখ দুটি বড় বড়, মখমলের মতো নরম আর কালো; গায়ের রং কুমুদের মত সাদা। ঘন চুলের মাঝখানে সিঁথির সূক্ষ্ম রেখাটি নিষ্কলঙ্ক।

বলিয়া রাখা ভালো যে বিনয়ের ইতিপূর্বে একটিও মহিলা বন্ধু ছিল না; তাই অপ্রত্যাশিতভাবে ছাদের উপর একটি বন্ধু পাইয়া সে পরম যত্নে এই তত্ত্বটি সকলের কাছে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। এমন কি পাশের বাড়িতে খোঁজ খবর লইয়া বন্ধুটির পরিপূর্ণ পরিচয় পাইবার চেষ্টাও করে নাই। তাহাদের পরিচয় শুধু শয়নের পূর্বের ঐ অল্প সময়টুকুর মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল।

প্রথমে মেয়েটি নিজেই উপযাচিকা হইয়া বিনয়ের সহিত আলাপ করিয়াছিল। বিনয় ক'দিন ধরিয়া একটা গানের সুর লইয়া বাঁশির সহিত ধস্তাধস্তি করিতেছিল; কিন্তু বাঁশিও বাঁকিয়াছিল—কিছুতেই তাহার অভীষ্ট স্বরটি বাহির করিতেছিল না। শেষে বিনয় যখন হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিবার উপক্রম করিয়াছে, তখন পাশের ছাদ হইতে আওয়াজ আসিল, 'আপনি তিলক কামোদ বাজাবার চেষ্টা করেছেন—কিন্তু বেরুচ্ছে কেদারা। কড়ি মধ্যম দেবেন না, তা হলেই ঠিক হবে।'

ইহাই সূত্রপাত। তারপর বিনয় কড়ি-মধ্যম বর্জন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সমর্থ হয় নাই। মেয়েটি তখন অধীরভাবে বলিয়াছিল, 'দিন আমাকে বাঁশি, দেখিয়ে দিচ্ছি।'

অতঃপর একটি শুক্ল পক্ষ ও একটি কৃষ্ণ পক্ষ কাটিয়া গিয়া আজ আবার শুক্লা একাদশী আসিয়াছে। এই রাত্রির কয়েকটি মিনিট লইয়া আমাদের গল্প; তবু দুঃখ এই যে জীবনের মিনিটগুলি বিচ্ছিন্ন নিরাসক্তভাবে আসে না, তাহাদের পশ্চাতে অনাদি-

কালের উদ্যোগ সঞ্চিত হইয়া থাকে। 'কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে, ধরণীর তলে, ফুটিয়াছে আজি এ মাধবী—'

গান ও কবিতার সহিত প্রেমের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলিয়াই আমরা জানি। কিন্তু আশ্চর্য, বিনয় এতদিন তাহার এই গোপন বন্ধুত্বটির গোপনতার রসই সমস্ত দেহ মন দিয়া উপভোগ করিয়াছে; ইহার গভীরতর সম্ভাবনার ছায়া তাহার মনকে স্পর্শ করে নাই। অন্যপক্ষ হইতেও একটি সহজ সহৃদয়তা ছাড়া আর কিছুর ইঙ্গিত আসে নাই। দু'জনেই গান ভালোবাসে, গান লইয়া আলোচনাই বেশী হইয়াছে। সমাজ, সংস্কার, নীতি, স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রভৃতি অবান্তর কথাও মাঝে মাঝে উঠিয়াছে; কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্য। মোট কথা, এই দুইটি তরুণ তরুণীর মধ্যে প্রণয়ঘটিত কোনও কথাই হয় নাই। হয়তো কেহ বিশ্বাস করিতেছেন না; কি করিব আমি নিরুপায়।

কিন্তু এইবার বিশ্বাস করা বোধ হয় কঠিন হইবে না, কারণ—'আজি শুক্লা একাদশী—'

খাদ্যের সহিত প্রেমের কি কোনও সম্বন্ধ আছে? চিংড়ি মাছের কাট্‌লেট কি অন্তরে প্রণয় পিপাসা জাগাইয়া তোলে? নিষিদ্ধ অণ্ড কি উদরে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের আদিমতম সত্যের ইশারা করিতে থাকে? পাঁঠার মাংস কি অজ, নিত্য এবং শাশ্বত জীবধর্ম উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে? কে জানে? কিন্তু বিনয় আজ উক্ত তিনটি খাদ্যই প্রচুর পরিমাণে ভক্ষণ করিয়াছিল; এবং এই জন্যই বোধ করি তাহার বাঁশির গদ্‌গদ কূজনের সহিত সে মনে মনে বলিতেছিল—

আজি শুক্লা একাদশী—বিনতাকে আমি ভালোবাসি—
হের তন্দ্রাহারা শশী—তার অধর-ছোঁয়া এই বাঁশি—
মখমলের মতো কালো নরম তার চোখ দুটি—
সিঁথির সরু রেখায় নেই সিঁদুরের চিহ্ন—
ভালোবাসি—ভালোবাসি—ভালোবাসি।

চিংড়ি মাছ, ডিম্ব ও পাঁঠার আশ্চর্য ক্ষমতা। বিনয় তন্দ্রাতুর চোখে পাশের বাড়ির ছাদের দিকে তাকাইয়া বাঁশি বাজাইতেছে--তাহার হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। বাঁশির সুর বদলাইয়া গেল—

সেহ কোকিল অব লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু-চন্দা;
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ
লাখ পবন বহু মন্দা।

পাশের ছাদ হইতে হাসির শব্দ আসিল, 'তাল কেটে যাচ্ছে যে!'

বাঁশি ফেলিয়া বিনয় আলিসার পাশে গিয়া দাঁড়াইল।

'বিনতা—!' উদ্গত কথাটা হঠাৎ আটকাইয়া গেল।

'কি?'

বিনয় সামলাইয়া লইয়া আবার আরম্ভ করিল, 'বিনতা, আজ শুক্লা একাদশী।'

'হ্যাঁ।' একটু হাসিয়া বিনতা চাঁদের দিকে মুখ তুলিল।

তাহার উন্নমিত মুখের পানে চাহিয়া বিনয়ের কন্ঠাগত কথাটি বাধা পাইয়া থামিয়া গেল। বিনতার মুখখানি শুষ্ক, চাঁদের পরিপূর্ণ আলো পড়িয়া যেন অত্যন্ত ফ্যাকাসে দেখাইল।

'বিনতা, তোমার মুখ এত শুকনো কেন? যেন সমস্ত দিন খাওনি।'

বিনতা আবার একটু হাসিল, 'সত্যিই আজ সমস্ত দিন খাইনি। আজ যে একাদশী।'

২২ অগ্রহায়ণ ১৩৪৪

মন্দ লোক

অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার, নীতিবাগীশ বৃদ্ধ ও স্তন্যপায়ী শিশুর জন্য এ কাহিনী লিখিত হয় নাই। তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক পাতা উল্টাইয়া যাইবেন। কারণ, অযথা রিপুর উত্তেজনা সৃষ্টি করা আমার উদ্দেশ্য নয়।

কুড়ি বৎসর আগে আমার বয়স কুড়ি বৎসর ছিল। হিসাবে বর্তমান বয়সের যে অংকটা পাওয়া যাইতেছে, তাহা ছ্যাবলামির পক্ষে অনুকূল নয়। সিদ্ধার্থ এ বয়সে পৌঁছিবার পূর্বেই বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন; নেপোলিয়ন এ বয়সে অর্ধেক য়ুরোপের অধীশ্বর; আলেকজাণ্ডার এতদূর অগ্রসর হইতেই পারেন নাই, তৎপূর্বেই পৃথিবী জয় শেষ করিয়া ফোৎ হইয়াছেন। সুতরাং যাহা বলিতেছি তাহা বালসুলভ চপলতা নয়। কেহ দন্ত বাহির করিয়া হাসিবেন না।

কুড়ি বৎসর বয়সেই আমি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারিতে পসার জমাইয়া ফেলিয়াছিলাম। অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারগণ হয়তো রাগ করিতেছেন, কিন্তু আমি জানি ভাগ্যই সর্বত্র বলবান—পসার এবং পত্নী পূর্বজন্মার্জিত; পৌরুষ বা বিদ্যার বলে তাহাদের সংগ্রহ করা যায় না। যদি যাইত, পি সি ও বি সি রায় অদ্যাপি অনূঢ় কেন?

আরম্ভে অনেকগুলি বড় বড় লোকের নাম করিয়া গল্পটাকে শোধন করিয়া লইলাম, সঙ্কোচও অনেকটা কাটিয়াছে। অতএব এবার শুরু করিতে পারি।

ছোট একটি শহরে ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিলাম। তখনও বিবাহ করি নাই; ছোট একটি বাসায় একাকী থাকিতাম, স্বপাক আহার করিতাম এবং 'বিষস্য বিষমৌষধম্' এই তত্ত্ব ফলত সার্থক করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতাম। সকাল বিকাল আমার ছোট ঘরটি নানা জাতীয় রোগীতে ভরিয়া যাইত; অধিকাংশই গরীব, রোগের লক্ষণ বলিয়া অল্প মূল্যে ঔষধ কিনিয়া লইয়া যাইত। কদাচিৎ দুই-একটি সম্পন্ন ব্যক্তির বাড়ি হইতে ডাক পাইতাম। মোটের উপর ভালভাবেই চলিতেছিল; টাকা যত না হউক সুনাম অর্জন করিয়াছিলাম।

একদিন সকালবেলা রোগীর ভিড় হাল্‌কা হইয়া গেলে লক্ষ্য করিলাম, ঘরের কোণে একটি স্ত্রীলোক একখানা ময়লা চাদর মুড়ি দিয়া বসিয়া আছে। ঘর যখন একেবারে খালি হইয়া গেল তখন সে আস্তে আস্তে উঠিয়া জোড়হাতে আমার চেয়ারের পাশে দাঁড়াইল।

সপ্রশ্ন চক্ষে তাহার পানে চাহিলাম। অধিকাংশ রোগীই আমার পরিচিত, কিন্তু ইহাকে পূর্বে দেখি নাই। বয়স বোধ করি বছর চল্লিশ, থলথলে মোটা গড়ন; মুখের বর্ণ এককালে ফরসা ছিল, এখন মেছেতা পড়িয়া বিশ্রী হইয়া গিয়াছে। চিবুকের উপর অস্পষ্ট উল্কির দাগ, একটা কানের গহনা পরিবার ছিদ্র ছিঁড়িয়া দুইফাঁক হইয়া আছে। চোখে অসহায় উৎকণ্ঠার চাপা ব্যগ্র দৃষ্টি।

ও দৃষ্টি আমি চিনি। ঘরে যখন তিল-তিল করিয়া প্রিয়জনের মৃত্যু হইতেছে অথচ হাতে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ কিনিবারও পয়সা নাই, তখন মানুষের চোখে ওই দৃষ্টি ফুটিয়া উঠে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি হয়েছে?'

স্ত্রীলোকটি পাতিহাঁসের মত ভাঙা গলায় বলিল, 'বাবু, আমি মন্দ লোক।' তাহার দুই চোখে বিনীত দীনতা প্রকাশ পাইল।

একটু অবাক হইয়া গেলাম। নিজের সম্বন্ধে এতটা স্পষ্টবাদিতা তো সচরাচর দেখা যায় না। সত্যকাম ও জবালার কথা মনে পড়িয়া গেল।

আমি বুঝিতে পারি নাই দেখিয়া স্ত্রীলোকটি আমার চেয়ারের পাশে মেঝেয় বসিয়া পড়িয়া হেঁটমুখে জড়াইয়া জড়াইয়া নিজের যে পরিচয় দিল তাহাতে সমস্ত দেহ সংকুচিত হইয়া উঠিলেও বুঝিতে বাকি রহিল না—জবালাই বটে।

সংকোচ ও সংস্কার কাটাইয়া উঠা সহজ কথা নয়, এ জাতীয় রোগিণী আমার নাতিদীর্ঘ ডাক্তার-জীবনে এই প্রথম। তবু আমি ডাক্তার, নিজের দায়িত্বকে ছোট করিয়া দেখিলে ডাক্তারের চলে না। গলার স্বর ঈষৎ কড়া হইয়া গেলেও শান্তভাবেই জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি চাও?'

স্ত্রীলোকটি তখন উৎসাহ পাইয়া ভাঙা গলায় একগঙ্গা কথা বলিয়া গেল। উৎকণ্ঠা ও ব্যগ্রতার আতিশয্যে অনেক আবোল-তাবোল বকিল। তাহার কথার নির্যাস এই—

পাপ-ব্যবসায়ের একমাত্র মুনাফা একটি কন্যা লইয়া সে যৌবনের প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। টাকাকড়ি কিছু রাখিতে পারে নাই, দুই-চারিখানা গহনা যাহা ছিল তাহারই সাহায্যে কন্যার যৌবনপ্রাপ্তি পর্যন্ত কষ্টেসৃষ্টে কাটাইয়া দিবে ভাবিয়াছিল। কিন্তু মা মঙ্গলচণ্ডী তাহাতে বাদ সাধিয়াছেন। কন্যাটির বয়ঃক্রম এখন ত্রয়োদশ বৎসর; গত এক বৎসর ধরিয়া সে কোনও দুশ্চিকিৎস্য রোগে ভুগিতেছে। শহরের সকল ডাক্তারই একে একে চিকিৎসা করিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু কিছুই করিতে পারেন নাই। স্ত্রীলোকটির গহনা সব ফুরাইয়া গিয়াছে, ডাক্তারেরাও হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন। এখন আমি ভরসা।

বিবৃতির শেষে স্ত্রীলোকটি ব্যাকুলভাবে বলিল, 'বাবু, আমার আর কিচ্ছু নেই। নিজে খেতে পাই না, সে যাক—কিন্তু রোগা মেয়েটাকে খেতে দিতে পারি না। আমরা মন্দ লোক, কেউ আমাদের পানে মুখ তুলে চায় না। আপনি দয়া করুন, ভগবান আপনার ভাল করবেন।' বলিয়া অসহায়ভাবে কাঁদিতে লাগিল।

ভগবানের ভাল করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে যদিও আমার খুব উচ্চ ধারণা নাই, তবু কেন জানি না, এই ঘৃণিতা নারীটার প্রতি দয়া হইল। বিশেষত যে রোগীকে শহর-সুদ্ধ ডাক্তার জবাব দিয়াছে তাহাকে যদি বাঁচাইয়া তুলিতে পারি—

নিজের কৃতিত্ব দেখাইবার প্রলোভন ছোট বড় অনেক নৈতিক ও লৌকিক বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়া যায়। আমি বিনা পারিশ্রমিকে মেয়েটার চিকিৎসা করিতে সম্মত হইলাম। এমন কি, গাঁটের কড়ি খরচ করিয়া ভাড়াটে গাড়ি ডাকাইয়া তাহাকে দেখিয়া আসিলাম।

কুৎসিত পল্লীর কুৎসিততম প্রান্তে একটা খোলার ঘর। দৈন্য যে চরম সীমায় পেঁৗছিয়াছে তাহা একবার দৃষ্টিপাত করিলে আর সন্দেহ থাকে না। কতকগুলা ছেঁড়া কাঁথা ও চটের মধ্যে মেয়েটা পড়িয়া আছে; কাঠির মত সরু হাত পা, গলাটি নখে ছিঁড়িয়া আনা যায়। গায়ের চামড়া কুঁচকাইয়া চামচিকার মত হইয়া গিয়াছে—চর্মাবৃত কঙ্কাল বলিলেই হয়। যথার্থ বয়স জানা না থাকিলে নয়-দশ বছরের মেয়ে বলিয়া ভ্রম হইত।

পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, কঠিন রোগ—ম্যারাসমাস, তাহার উপর পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব। যেরূপ অবস্থায় পেঁৗছিয়াছে তাহাতে বাঁচার সম্ভাবনা খুবই কম। আমার মুখে চোখে বোধ হয় মনের ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল, মেয়েটা রোগ-বিষাক্ত অচঞ্চল সর্পচক্ষু মেলিয়া আমার পানে চাহিয়া রহিল।

ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া ও পথ্যের জন্য একটা টাকা স্ত্রীলোকটির হাতে দিয়া ফিরিয়া আসিলাম। মনে হইতে লাগিল টাকা ও পরিশ্রম দুইই জলে পড়িল।

অতঃপর স্ত্রীলোকটি রোজ আসে। কখনও ঔষধ, কখনও নির্গুণ বড়ি দিই; মাঝে মাঝে দুই-একটা টাকাও দিতে হয়। স্ত্রীলোকটি মুখ কাঁচুমাচু করিয়া দীনভাবে গ্রহণ করে; ভাল করিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে পারে না, ভাঙা গদগদ স্বরে বলে, 'বাবা, ভগবান আপনাকে রাজা করুন।'

এক মাস যখন মেয়েটা টিকিয়া গেল, তখন আমি নিজেই আশ্চর্য হইয়া গেলাম। স্ত্রীলোকটি হাত জোড় করিয়া বলিল, 'বলতে সাহস করি না বাবা, কিন্তু আর একবার যদি পায়ের ধুলো দেন। আজ মঙ্গলবার, খুঁড়ব না, কিন্তু আপনার ওষুধে কাজ হয়েছে। ঋতুরাণী আমার বাঁচবে।'

দেখিয়া আসিয়া আমিও বুঝিলাম, ঋতু বাঁচিবে। একটা মানুষকে—যতই ঘৃণ্য হউক—যমের মুখ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছি ভাবিয়া বড় আনন্দ হইল। নিজের শক্তির উপর শ্রদ্ধাও বাড়িয়া গেল।

মাস ছয়-সাত পরে কোন এক পর্ব উপলক্ষে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছি, ঘাটের উপর একটি মেয়ে হেঁট হইয়া আমাকে প্রণাম করিল। নিটোল স্বাস্থ্যবতী কিশোরী, গায়ের রং বেশ ফরসা, মুখখানিও মন্দ নয়—সদ্য স্নান করিয়া ভিজা চুলে আমার বিস্মিত চোখের সম্মুখে দাঁড়াইল। চিনিতে পারিলাম না। সে একটু ঘাড় বাঁকাইয়া লজ্জিত চক্ষু নত করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, 'আমি ঋতু।'

নিজের কৃতিত্বের জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ চোখের উপর দেখিয়া প্রচুর আনন্দ হইবার কথা, কিন্তু আমার মনটা হঠাৎ খারাপ হইয়া গেল। সমস্ত দিন ধরিয়া তাহার গৃহস্থ-কন্যার মত সলজ্জ কোমল মূর্তিটি চোখের সামনে ভাসিতে লাগিল, আর মনে হইতে লাগিল, তাহাকে না বাঁচাইলে বোধ হয় ভাল হইত।

গল্প এইখানেই শেষ হওয়া উচিত; কিন্তু আর একটু আছে। সেটুকু বলিতেই হইবে, সঙ্কোচ করিলে চলিবে না।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা ঋতুর মা অনেকদিন পরে আমার কাছে আসিল। মনটা খারাপ হইয়াই ছিল, তাহার উপর সে যে প্রস্তাব করিল তাহাতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ইহাদেরও নাকি নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান আছে, ঘটা করিয়া কার্যারম্ভ করিতে হয়। ঋতুর শুভ বলিদান কার্যটা আমার মত সৎ পাত্রের দ্বারাই ঋতুর মাতা সম্পন্ন করাইতে চায়।

অজস্র গালাগালি দিয়া অকৃতজ্ঞ পতিতা স্ত্রীলোকটাকে তাড়াইয়া দিলাম। সে ভীত নির্বোধের মত মুখ লইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল, আমার অসংযত উষ্মার কারণটা যেন বুঝিতে পারিল না।

তারপর কুড়ি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে; আমার বয়স এখন চল্লিশ। সেদিনের কথা স্মরণ হইলে মনে হয়, ঋতুর মাতা 'মন্দ লোক' ছিল বটে, কিন্তু বোধ হয় অকৃতজ্ঞ ছিল না। আদর্শের মাপকাঠি সকলের সমান নয়; বৈষ্ণবের কাছে যাহা মহাপাপ, শাক্তের কাছে তাহা পুণ্য। মানুষের অন্তর-গহনে যাঁহার অবাধ প্রবেশাধিকার তিনি হয়তো বুঝিয়াছিলেন, ঋতুর মাতা আমাকে পাপপথে প্রলুব্ধ করিতে আসে নাই, বরং তাহার পরিপূর্ণ প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার অর্ঘ লইয়া আসিয়াছিল—তাহার দীন জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দান পূজারিণীর মত আমার পদপ্রান্তে রাখিয়াছিল।

১ পৌষ ১৩৪৪

মায়া কানন

"অতি বিস্তৃত অরণ্য। অরণ্যমধ্যে অধিকাংশ বৃক্ষই শাল, কিন্তু তদ্ভিন্ন আরও অনেক জাতীয় গাছ আছে। গাছের মাথায় মাথায় পাতায় পাতায় মিশামিশি হইয়া অনন্ত শ্রেণী চলিয়াছে। বিচ্ছেদশূন্য, ছিদ্রশূন্য, আলোকপ্রবেশের পথমাত্র শূন্য; এইরূপ পল্লবের অনন্ত সমুদ্র, ক্রোশের পর ক্রোশ, ক্রোশের পর ক্রোশ, পবনে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে চলিয়াছে।..."

বনের মধ্যে কিন্তু অন্ধকার নাই। ছায়া আছে, অন্ধকার নাই। চন্দ্রসূর্যের রশ্মি প্রবেশ করে না, তবু বন অপূর্ব আলোকে প্রভাময়। কোথা হইতে এই স্বপ্নাতুর আলোক আসে কেহ জানে না। হয়তো ইহা সেই আলো যাহা স্বর্গ মর্ত্যে কোথাও নাই—The light that never was on Land or Sea—

এই বনে একাকী ঘুরিতেছিলাম। মানুষের দেখা এখনও পাই নাই, কিন্তু মনে হইতেছে আশেপাশে অনেক লোক ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। একবার অদৃশ্য অশ্বের দ্রুত ক্ষুরধ্বনি শুনিলাম, কে যেন ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়াছে। পিছনে রমণীকণ্ঠ গাহিয়া উঠিল—'দড় বড়ি ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি যাও রে!'

অশ্বারোহী ভারী গলায় উত্তর দিল—'সমরে চলিনু আমি হামে না ফিরাও রে।'

ক্ষুরধ্বনি মিলাইয়া গেল।

বনের মধ্যে পায়ে হাঁটা পথের অস্পষ্ট চিহ্ন আছে; তাহার শেষে একটা ভাঙা বাড়ি। ইটের স্তূপ; তাহার উপর অশথ বাব্‌লা আরও কত আগাছা জন্মিয়াছে।

বহুদিন আগে হয়তো ইহা কোনও অখ্যাত রাজার অট্টালিকা ছিল। এই ভগ্ন-স্তূপের সম্মুখে হঠাৎ একজনের সহিত মুখোমুখি দেখা হইয়া গেল। মজবুত দেহ, গালে গালপাট্টা, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, হাতে মোটা বাঁশের লাঠি। বিস্মিত হইয়া বলিলাম—'একি, দাড়ি বাবাজী! আপনি এখানে?'

দাড়ি বাবাজির চোখে একটা আগ্রহপূর্ণ উৎকণ্ঠা। তিনি বলিলেন—'দেবীকে খুঁজতে এসেছিলাম। এটা দেবীর পুরানো আস্তানা।'

'দেবী চৌধুরাণী?'

'হাঁ। দেবী নেই। দিবা নিশিও কোথায় চলে গেছে।' রঙ্গরাজের কণ্ঠস্বর ব্যগ্র হইয়া উঠিল,—'তুমি জানো দেবী কোথায়? তাঁকে বড় দরকার। ত্রিস্রোতার মোহানায় বজ্‌রা নোঙর করা আছে। তাঁকে এখনি যেতে হবে। তুমি জানো তিনি কোথায়?'

নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম—'দেবী মরেছে। প্রফুল্ল ছিল, সেও ব্রজেশ্বরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছে। আর তাকে পাবে না।'

'পাব না!' রঙ্গরাজের রাঙা তিলকের নীচে চক্ষু দুটা জ্বলিয়া উঠিল—'নিশ্চয় পাব। দেবীকে না হলে যে চলবে না। তাঁকে চাইই। যেমন করে হোক খুঁজে বার করতে হবে। ত্রিস্রোতার মোহানায় বজ্‌রা অপেক্ষা করছে। ব্রজেশ্বরের সাধ্য কি মা'কে ধরে রাখে।'

রঙ্গরাজ চলিয়া গেল। শুধু নিষ্ঠা এবং একাগ্র বিশ্বাসের বলে দেবীকে সে খুঁজিয়া পাইবে কিনা কে বলিতে পারে।

কিশোর কণ্ঠের মিঠে গান শুনিয়া চমক ভাঙিল। কয়েকটি বালিকা কাঁখে কলসী লইয়া মল বাজাইয়া চলিয়াছে—

চল্ চল্ সই জল আনিগে জল আনিগে চল্।

সকৌতুকে তাহাদের পিছু পিছু চলিলাম। কোন্ জলাশয়ে ইহারা জল আনিতে চলিয়াছে জানিতে ইচ্ছা হইল। আঁকিয়া বাঁকিয়া পায়ে হাঁটা পথে তাহারা স্বচ্ছন্দ চরণে চলিয়াছে, গানও চলিতেছে—

বাজিয়ে যাব মল।

অবশেষে তরুবেষ্টিত উচ্চ পাড়ের ক্রোড়ে একটি প্রকাণ্ড সরোবর চোখে পড়িল। নীল জল নিস্তরঙ্গ, দর্পণের মত আলোক প্রতিফলিত করিতেছে। মনে প্রশ্ন জাগিল, এ কোন্ জলাশয়? যে-দিঘির নিকট ইন্দিরার পালকির উপর ডাকাত পড়িয়াছিল সেই দিঘি? রোহিণী যাহার জলে ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল সেই বারুণী জলাশয়? কিম্বা শৈবলিনী যাহার জলে দাঁড়াইয়া লরেন্স্ ফস্টরকে মজাইয়াছিল সেই ভীমা পুষ্করিণী?

ঘাটের উপর দাঁড়াইয়া বালিকাদের আর দেখিতে পাইলাম না। বিস্তৃত ঘাটের অগণিত সোপান ধাপে ধাপে নামিয়া জলের মধ্যে ডুবিয়াছে।

ঘাটের শেষ সোপানে জলে পা ডুবাইয়া একটি রমণী বসিয়া আছে, পরিধানে শুভ্র বস্ত্র, রুক্ষ কেশরাশি পৃষ্ঠ আবৃত করিয়া মাটিতে লুটাইতেছে। বর্মাবৃত শিরস্ত্রাণধারী এক পুরুষ তাহার পাশে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিতেছেন—'মনোরমা, এই পথে কাহাকেও যাইতে দেখিয়াছ?'

'দেখিয়াছি।'

'কাহাকে দেখিয়াছ? কিরূপ পোশাক?'

'তুর্কির পোশাক।'

হেমচন্দ্র সবিস্ময়ে বলিলেন—'তুমি তুর্কি চেন? কোথায় দেখিলে?'

মনোরমা ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার মুখে বিচিত্র হাসি। আমি পা টিপিয়া টিপিয়া সরিয়া আসিলাম, তাহাদের কথাবার্তা অধিক শুনিতে ভয় হইল।

সেখান হইতে সরিয়া গিয়া বনের যে অংশে উপস্থিত হইলাম তাহা উদ্যানের মত সুন্দর। লতায় লতায় ফুল ধরিয়াছে, বৃহৎ বৃক্ষের শাখা হইতে ভাস্বর আলোকলতা ঝুলিতেছে। একটা কোকিল বুক-ফাটা স্বরে ডাকিতেছে—কুহু কুহু—

একি সেই কোকিলটা, ঘাটে যাইতে যাইতে রোহিণী যাহার ডাক শুনিয়া উন্মনা হইয়াছিল?

এক তরুতলে দুইটি রমণী রহিয়াছে। রূপের তুলনা নাই, তরুমূল যেন আলো হইয়াছে। একটি ক্ষুদ্রকায়া, তন্বী, মুকুলিত যৌবনা; ফোটে ফোটে ফোটে না। অন্যটি বিশালনয়না, পরিস্ফুটাঙ্গী রাজেন্দ্রাণী, শান্ত অথচ তেজোময়ী। উভয়ের বক্ষে জরীর কাঁচুলি; সূক্ষ্ম মলমলের ওড়না চন্দ্রকিরণের মত অনিন্দ্য সুন্দর তনুলতা বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে।

আয়েষা বলিলেন—'ভগিনী, তুমি বিষপান করিলে কেন? আমিও তো মরিতে পারিতাম কিন্তু মরি নাই, গরলাধার অঙ্গুরীয় দুর্গপরিখার জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম।'

দলনীর গোলাপ কোরকের মত ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতে লাগিল, সে বলিল—'আয়েষা, তুমি জানিতে তোমার হৃদয়েশ্বরকে পাইবে না, কোনও দিন পাইতে পার না। তোমার কত দুঃখ? কিন্তু আমি যে পাইয়াছিলাম, পাইয়া হারাইয়াছিলাম—' মুক্তাবিন্দুর মত অশ্রু দলনীর গণ্ড বহিয়া ঝরিয়া পড়িল। এখান হইতেও পা টিপিয়া টিপিয়া সরিয়া গেলাম।

অনতিদূরে আর একটি বৃক্ষতলে এক রমণী মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতেছে। রোদনের আবেগে তাহার দেহ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, পৃষ্ঠে বিলম্বিত কৃষ্ণবেণী কাল

ভুজঙ্গিনীর মত তাহাকে দংশন করিতেছে। রমণীর বাষ্পবিকৃত কণ্ঠ হইতে কেবল একটি নাম গুমরিয়া গুমরিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে,—'হায় মোবারক! মোবারক! মোবারক!'

বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী
বিললাপ বিকীর্ণমূর্ধজা।

এই বেদনাবিধুর উপবনে শব্দ করিতে ভয় হয়। বাতাস যেন এখানে ব্যথাবিদ্ধ হইয়া নিস্পন্দ হইয়া আছে। আমি এই অশ্রুভারাতুর উদ্যান ছাড়িয়া যাইবার চেষ্টা করিলাম।

পুষ্পোদ্যান প্রায় উত্তীর্ণ হইয়াছি, একটি লতানিকুঞ্জ হইতে হাসির শব্দে সেইদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। দুইটি স্ত্রীপুরুষ যেন রঙ্গ তামাসা করিতেছে, হাসিতেছে, মৃদু-কণ্ঠে কথা কহিতেছে। চাবির গোছা, চুড়ি, বালা ঝঙ্কার দিয়া উঠিতেছে।

বড় লোভ হইল; চুপি চুপি গিয়া লতার আড়াল হইতে উঁকি মারিলাম। লবঙ্গ-লতার আঁচল ধরিয়া রামসদয় টানাটানি করিতেছেন। লবঙ্গলতা বলিতেছে—'আঁচল ছাড়, এখনি ছেলেরা দেখতে পাবে। বুড়ো মানুষের অত রস কেন?'

রামসদয় বলিলেন—'আমি যদি বুড়ো, তুমিও তবে বুড়ী।'

লবঙ্গ বলিল—'বুড়োর বৌ যদি বুড়ী হয়, ছুঁড়ির বরও তবে ছোঁড়া।'

রামসদয় আঁচল টানিয়া লবঙ্গলতাকে কাছে আনিলেন, বলিলেন—'সে ভুল। তুমি বুড়ী হওয়ার চেয়ে আমিই ছোঁড়া হলাম। এখন ছোঁড়ার পাওনাগণ্ডা বুঝিয়ে দাও।' বলিয়া তাহার মুখের দিকে মুখ বাড়াইলেন।

আমার পিছন হইতে কে বলিয়া উঠিল—'আ ছি ছি ছি—'

লজ্জা পাইয়া সরিয়া আসিলাম। কে ছি ছি বলিল দেখিবার জন্য চারিদিকে চাহিলাম কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না।

দূর হইতে একটা শব্দ আসিল—মিউ!

বিড়াল! এ বনে বিড়ালও আছে। মিউ শব্দ অনুসরণ করিয়া খানিকদূর যাইবার পর দেখিলাম, ঘাসের উপর একটি বৃদ্ধগোছের লোক বসিয়া ঝিমাইতেছে; গলায় উপবীত, গালদুটি শুষ্ক, চক্ষু প্রায় নিমীলিত। একটি শীর্ণকায় বিড়াল তাহার সম্মুখে বসিয়া মাঝে মাঝে মিউ মিউ করিতেছে।

বৃদ্ধ বলিল—'মার্জার পণ্ডিতে, তোমার কথাগুলি বড়ই সোশ্যালিস্টিক্। আমি তোমাকে বুঝাইতে পারিব না, তুমি বরং প্রসন্ন গোয়ালিনীর কাছে যাও। সে তোমাকে দুগ্ধ দিতে পারে কিম্বা ঝাঁটাও মারিতে পারে। তা দুগ্ধ অথবা ঝাঁটা যাহাই খাও তোমার দিব্যজ্ঞান জন্মিবে। আর যদি তুরীয়-সমাধি লাভ করিয়া পরব্রহ্মে লীন হইতে চাও, আমার কাছে ফিরিয়া আসিও—এক সরিষা ভর আফিম দিব। এখন তুমি যাও, আমি মনুষ্যফল সম্বন্ধে চিন্তা করিব।'

বিড়াল নড়িল না। তখন কমলাকান্ত বলিলেন—'দেখ, বঙ্গদেশে সম্পাদক জাতীয় যে জীব আছে, ফলের মধ্যে তাহারা লঙ্কার সহিত তুলনীয়। দেখিতে বেশ সুন্দর, রাঙা টুক্‌টুক্ করিতেছে; মনে হয় কতই মিষ্টরসে ভরা। কিন্তু বড় ঝাল! দেখিও, কদাপি চিবাইবার চেষ্টা করিও না, বিপদে পড়িবে। সম্পাদকের কোপে পড়িলে আর তোমার রক্ষা নাই, বড় বড় ঝাঁঝালো লীডার লিখিয়া তোমার দফারফা করিয়া দিবে।'

অনেকগুলি সম্পাদকের সহিত সদ্ভাব আছে, তাই আমি আর সেখানে দাঁড়াইলাম না; কি জানি তাঁহারা মনে করিতে পারেন কমলাকান্ত চক্রবর্তীর মতামতের সহিত আমার সহানুভূতি আছে!

একজন শীর্ণাকৃতি লোক দীর্ঘ পা ফেলিয়া আসিতেছে আর মাঝে মাঝে পিছন ফিরিয়া তাকাইতেছে; কেহ যেন তাহাকে তাড়া করিয়াছে। লোকটির বগলে পুঁথি, অদ্ভুত সাজ-পোশাক—হিন্দু কি মুসলমান সহসা ঠাহর করা যায় না। আমাকে দেখিয়া সে বলিল—'খোদা খাঁ বাবুজীকে কুশলে রাখুন। ঘৃতভাণ্ডকে এদিকে দেখিয়াছেন?'

অবাক হইয়া বলিলাম—'ঘৃতভাণ্ড?'

সে বলিল—'বিমলা আমার ঘৃতভাণ্ড। মোচলমান বাবাবা যখন গড়ে এলেন, আমাকে বললেন, আয় বামুন তোর জাত মারি—'

'ও—আপনি বিদ্যাদিগ্‌গজ মহাশয়!'

'উপস্থিত শেখ দিগ্‌গজ'—পিছন দিকে তাকাইয়া শেখ সভয়ে বলিলেন—'ঐ রে, বুড়ী আসিতেছে, এখনি রূপকথা শুনাইবে—'সুদীর্ঘ পদযুগলের সাহায্যে গজপতি নিমেষ মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন।

ক্ষণেক পরে বুড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। হাতে জপের মালা, বুড়ী আপনমনে বিড়বিড় করিয়া কথা বলিতেছে—'সাগর আমার চরকা ভেঙে দিয়েছে। বামুনকে দুটো পৈতে তুলে দিতাম—তা যাক—' আমাকে দেখিয়া বুড়ীর নিষ্প্রভ চক্ষুদ্বয় ঈষৎ উজ্জ্বল হইল—'বেজ দাঁড়িয়ে আছিস! প্রফুল্ল ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে বুঝি? তোর যেমন বাগ্‌দিনী না হলে মন ওঠে না—বেশ হয়েছে। তা আয়, আমার কাছেই না হয় শো—'

কি সর্বনাশ! বুড়ী আমাকে ব্রজেশ্বর মনে করিয়াছে। পলাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ব্রহ্ম ঠাকুরাণীর হাত ছাড়ানো কঠিন কাজ।—'রূপকথা শুনবি। তবে বলি শোন্, এক বনের মধ্যে শিমুল গাছে—'

শেষ পর্যন্ত শুনিতে হইল। ব্যাঙগমা ব্যাঙগমীর গল্প শুনিয়া কিন্তু আশ্চর্য হইয়া গেলাম। বস্তুতন্ত্র একেবারে নাই। এত চমৎকার গল্প গত দশ বৎসরের মধ্যে কেহ লেখে নাই হলফ্ লইয়া বলিতে পারি।

ব্রহ্ম ঠাকুরাণীর নিকট বিদায় লইয়া আবার চলিয়াছি। বন যেন আরও নিবিড় হইয়া আসিতেছে। এ বনের শেষ কোথায় জানি না। শেষ আছে কি? হয়তো নাই, জগৎব্রহ্মাণ্ডের মত ইহাও অনন্ত অনাদি, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ।

গাছপালায় ঢাকা একটি ক্ষুদ্র কুটিরের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। মাটির কুঁড়ে ঘর, কিন্তু তক্‌তক্ ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। একটি সতেরো আঠারো বছরের মেয়ে হাসিমুখে আমার সম্বর্ধনা করিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'নিমাইমণি, জীবানন্দ কোথায়?'

নিমাইমণির হাসিমুখ ম্লান হইয়া গেল, চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। 'দাদা নেই; শান্তিও চলে গেছে। সেই যে সিপাহিদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল তারপর থেকে আর তারা আসেনি। ঐ দ্যাখো না, শান্তির ঘর খালি পড়ে রয়েছে।'

শান্তির ঘর দেখিলাম। পাখি উড়িয়া গিয়াছে, শূন্য পিঞ্জরটা পড়িয়া আছে। বুকের অন্তস্থল হইতে একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। নিমাইমণি চোখে আঁচল দিয়া বলিল—'সেই থেকে রোজ তাদের পথ চেয়ে থাকি। হ্যাঁগা, আর কি তারা আসবে না?'

আমিও তাহাই ভাবিতেছিলাম। আর আসিবে কি? জীবানন্দের ন্যায় পুত্র, শান্তির ন্যায় কন্যা বঙ্গজননী আর গর্ভে ধরিবে কি?

'জানি না' বলিয়া বিষণ্ণচিত্তে ফিরিয়া চলিলাম।

পিছন হইতে নিমাইমণির করুণ স্বর আসিল—'কিছু খেয়ে গেলেনা? গেরস্তর বাড়ি থেকে না খেয়ে যেতে নেই—'

জীবানন্দ গিয়াছে, শান্তি গিয়াছে; দেবীকে রঙ্গরাজ খুঁজিয়া পাইতেছে না। তবে কি তাহারা কেহই নাই, কেহই ফিরিয়া আসিবে না? সীতারাম রাজসিংহ মৃন্ময় চন্দ্রচূড় ঠাকুর—ইহারা চিরদিনের মত চলিয়া গিয়াছে?

বনের অনৈসর্গিক আলো ক্রমে নিভিয়া আসিতে লাগিল। প্রথমে ছায়া, তারপর অন্ধকার, তারপর গাঢ়তর অন্ধকার। সূচীভেদ্য অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইতেছি না। মহাপ্রলয়ের কৃষ্ণ জলরাশির মধ্যে আমি ডুবিয়া যাইতেছি। চেতনা লুপ্ত হইয়া আসিতেছে।

সহসা এই প্রলয় জলধি মথিত করিয়া জীমূতমন্দ্রকণ্ঠে কে গাহিয়া উঠিল—বন্দে মাতরম্!

আছে আছে—কেহ মরে নাই। ঐ বীজমন্ত্রের মধ্যে সকলে লুক্কায়িত আছে। দেবী আছে, জীবানন্দ আছে, সীতারাম আছে—

আবার তাহারা আসিবে—ঐ বীজমন্ত্রের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করিতে যেটুকু বিলম্ব। আবার আসিবে! আমিও ক্ষীণ দুর্বলকণ্ঠে সেই অমাতমস্বিনী রাত্রির মধ্যে চিৎকার করিয়া উঠিলাম—বন্দে মাতরম্!

৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

নিশীথে

রায় বাহাদুর দ্বিজনাথ চৌধুরীর কন্যার বিবাহ আগামী কল্য।

দ্বিজনাথ জেলার পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট, দস্তুরমত সাহেব, ঘোরতর নীতিপরায়ণ এবং কর্তব্যপালনে সম্পূর্ণ দয়ামায়া শূন্য। অত্যন্ত রাশভারি লোক; তাঁহার সম্মুখে গুরুতর বিষয় ছাড়া অন্য কথা উত্থাপন করিতে গেলে মনে হয় ধৃষ্টতা করিতেছি। আইন বা নীতি যে-ব্যক্তি একবার রেখামাত্র ক্ষুণ্ণ করিয়াছে, দ্বিজনাথবাবুর গৃহে তাহার প্রবেশ নিষেধ—তা সে যত বড়ই পরমাত্মীয় হোক না কেন।

তাঁহার স্ত্রী প্রথম শ্রেণীর ট্রামের পশ্চাতে দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রামের মত সর্বদা স্বামীর অনুগামিনী ছিলেন; স্বনির্বাচিত পথে চিন্তা করিবার শক্তি তাঁহার ফুরাইয়া গিয়াছিল। মাঝে মাঝে অতি গোপনে তাঁহার শীর্ণ গণ্ড বাহিয়া অশ্রুর ধারা নামিতে দেখা যাইত কিন্তু তাহা কেবল অন্তর্যামী দেখিতে পাইতেন।

মেয়ের বয়স আঠারো-উনিশ। সাহেবিয়ানার দৌলতে সে সমশ্রেণীর স্ত্রীপুরুষ সকলের সহিত মিশিতে পাইত; এমন কি স্বামী নির্বাচন ব্যাপারেও তাহার অভিরুচিকে

সম্পূর্ণ অবহেলা করা হয় নাই। কিন্তু দাড়ি লম্বা হইলেও খোঁটা এতই শক্ত ছিল যে নির্দিষ্ট গন্ডীর বাহিরে পা বাড়াইবার শক্তি তাহার ছিল না।

মেয়ের নাম রূপলেখা। সুন্দর মেয়ে, চোখের দৃষ্টি ভারি নরম, সর্বদাই চোখ-দুটিতে হাসির টুকরা ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। আবার কদাচিৎ বেদনার মেঘে ছায়াচ্ছন্ন হইয়া আসিতেও পারে। অন্তরের গভীরতা মুখের সহজ স্মিত প্রসন্নতায় সহসা ধরা পড়ে না। রূপলেখাকে তাহার পরিচিত বন্ধু-বান্ধবী সকলেই লেখা বলিয়া ডাকিত। কেবল দুই জন বলিত—রূপু। একজন তাহার মা; আর অন্য জন—

কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম প্রকাশ্যে উল্লেখযোগ্য নয়, দ্বিজনাথবাবু জানিতে পারিলে অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা।

রূপলেখার বিবাহের আগের সন্ধ্যায় দ্বিজনাথবাবুর ড্রয়িংরুমে একটি মাঝারি গোছের মজলিশ বসিয়াছিল। বাহিরের লোক বড় কেহ ছিল না; দু'চার জন আত্মীয়, রূপলেখার কয়েকটি ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবী এবং ভাবী বর।

দ্বিজনাথবাবু কোথায় একটা সরেজমিন তর্জাবিজে গিয়াছেন, এখনও ফেরেন নাই; বোধ করি কর্তব্য কর্মের শেষ বিন্দুটুকু অবশিষ্ট রাখিয়া ফিরিবেন না। গৃহিণী ঘরের এক কোণে একটি বৃহৎ চেয়ারে প্রায় নিমজ্জিত হইয়া বসিয়া আছেন এবং মাঝে মাঝে এদিক-ওদিক চাহিয়া সময়োচিত প্রফুল্লতার সহিত হাসিবার চেষ্টা করিতেছেন। আশে-পাশে বৃহদায়তন ঘরের এখানে-ওখানে অতিথিরা বসিয়া মৃদুস্বরে গল্পগুজব করিতে-ছেন। মাঝে মাঝে তক্‌মাধারী ভৃত্যেরা আসিয়া চা প্রভৃতি পরিবেশন করিয়া যাইতেছে। ঘরে আলোর বাহুল্য নাই, অথচ অন্ধকারও নয়; বেশ একটি মোলায়েম আবহাওয়া ঘরটিকে পরিবৃত করিয়া রাখিয়াছে।

ভাবী বরের নাম প্রমথ। সে লাজুক ও ভালমানুষ গোছের যুবক; ওকালতীতে সুবিধা করিতে না পারিয়া সুপারিশের জোরে মুন্সেব পদে উন্নীত হইয়াছে। ওকালতী করিবার জন্য যে-সব সদ্‌গুণ আবশ্যক, হাকিমীতে তাহার প্রয়োজন নাই, তাই সকলেই আশা করিতেছেন—

কিন্তু প্রমথর আদ্যোপান্ত পরিচয়ের প্রয়োজন নাই; সে ভালমানুষ ও সুশ্রী, রূপ-লেখা তাহাকে পছন্দ করিয়াছে এবং দ্বিজনাথবাবুর আপত্তি হয় নাই—আমাদের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।

ড্রয়িংরুমের যে-দরজাটা একটা বারান্দা পার হইয়া পাশের বাগানে গিয়া পড়িয়াছে তাহারই এক পাশে একটা কৌচে বসিয়া প্রমথ একাকী চা পান করিতেছিল ও চকিত-ভাবে এদিক-ওদিক তাকাইতেছিল। এই চকিত চাহনির কারণ, রূপলেখা এতক্ষণ এই ঘরেই ছিল কিন্তু সহসা কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। দ্বিজনাথবাবুর একটি বর্ষীয়সী আত্মীয়া হঠাৎ আসিয়া প্রমথর সহিত গল্প জুড়িয়া দিয়াছিলেন; প্রমথ তাঁহাকে লইয়াই ব্যস্ত ছিল। তারপর তিনি হঠাৎ উঠিয়া গিয়া আর একজনের সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিলেন। প্রমথ তখন ঘরের চারপাশে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল রূপলেখা ঘরে নাই—অলক্ষিতে কখন ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

অভাবনীয় ব্যাপার কিছু নয়। কিন্তু তবু প্রমথ উৎকণ্ঠিতভাবেই ইতি-উতি চাহিতেছিল। প্রেমিকের চক্ষু নাকি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয়; আজ এখানে পদার্পণ করিয়াই প্রমথ অনুভব করিয়াছিল কোথায় যেন একটু খিঁচ্ আছে। তাহাকে দেখিয়া রূপলেখার চোখে আলো ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠিয়াছিল বটে কিন্তু সেই আলোর পশ্চাতে অজ্ঞাত উদ্বেগের বাষ্প মেঘের আকারে পুঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে তাহাও যেন সে কোনও অতীন্দ্রিয় অনুভূতির দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছিল। তারপর রূপলেখা হাসিয়াছে কথা কহিয়াছে,

একবার চা দিবার ছলে ক্ষণেকের জন্য তাহার পাশে বসিয়াছে—কিন্তু তবু প্রমথর মনের কাঁটা দূর হয় নাই। তারপর দ্বিজনাথবাবুর বর্ষীয়সী আত্মীয়ার নিকট মুক্তি পাইয়া যখন সে দেখিল রূপলেখা ঘরে নাই, তখন সে বাহিরে ধীরভাবে চা পান করিতে থাকিলেও মনে মনে বেশ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

চায়ের বাটি শেষ করিয়া প্রমথ কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া অনিশ্চিত-ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে এমন সময় পাশের দরজা দিয়া রূপলেখা প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। প্রমথ দেখিল ঘরের মৃদু আলোকেও তাহার মুখ-খানা ফ্যাকাসে বোধ হইতেছে, নিশ্বাস যেন একটু দ্রুত চলিতেছে; চোখে চাপা উত্তেজনা।

প্রমথ কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই রূপলেখা চমকিয়া তাহার পানে তাকাইল, তারপর আত্মসম্বরণ করিয়া একটু ফিকা রকমের হাসিল।

প্রমথ বলিল, 'তোমাকে ঘরে দেখতে না পেয়ে—। বাগানে গিছলে বুঝি?'

'হাঁ—ঘরে গরম হচ্ছিল—তাই—একটু বাগানে গিয়ে বসেছিলুম—' রূপলেখার নিশ্বাসের দ্রুততা তখনও শান্ত হয় নাই।

প্রমথ গলা খাটো করিয়া সাগ্রহে বলিল, 'চল না—তাহলে বাগানেই খানিক বসা যাক—'

'বাগানে? না না—এখন থাক, এখন আর আমার গরম বোধ হচ্ছে না—'

গরম বোধ হইবার কথা নয়, কারণ সময়টা মাঘ মাস। এবং বাগানের অন্ধকারে বৃদ্ধ আর্দালি চৈত সিং চুপি চুপি কাগজের যে টুকরাটা তাহার হাতে গুঁজিয়া দিয়া প্রস্থান করিয়াছিল,তাহাতে উত্তাপের সংস্পর্শ কতখানি ছিল অন্তর্যামীই জানেন; কিন্তু বুকের অত্যন্ত নিকটে লুক্কায়িত থাকিয়া কাগজের টুকরাটা রূপলেখার বুকে দুরু দুরু কম্পনই জাগাইয়া দিয়াছিল।

বুকের উপর একবার হাত রাখিয়া সে ভীতভাবে আবার হাত সরাইয়া লইল।

'আমি—আমি এখুনি আসছি—'

প্রমথ দাঁড়াইয়া রহিল; রূপলেখা সহজতার একটা বাঁধা হাসি মুখে লইয়া সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া ঘরের অন্য একটা দরজা দিয়া অন্দরের দিকে প্রস্থান করিল।

কিন্তু সহজতার অভিনয় করিলেও কৌতূহলীর দৃষ্টি এড়ানো সহজ নয়। ঘরের মধ্যেই কেহ কেহ রূপলেখার মানসিক অ-সহজতার আভাস পাইয়াছিল, এবং নিম্ন কণ্ঠে কিছু জল্পনাও চলিতেছিল।

ঘরের নির্জন কোণে এক মিথুন বসিয়া বিশ্রম্ভালাপ করিতেছিলেন। মহিলাটি দৃষ্টি দ্বারা রূপলেখার অনুসরণ করিয়া শেষে বলিলেন, 'আজ লেখার কী যেন হয়েছে—ছটফট করে বেড়াচ্ছে।'

পুরুষটির অধর কোণে একটু হাসি খেলিয়া গেল, তিনি মহিলাটির প্রতি একটি অর্ধ-নিমীলিত কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, 'ও কিছু নয়। বিয়ের আগের রাত্রে মেয়েদের অমন হয়ে থাকে!

মহিলাটি একটু মাথা নাড়িলেন।

'না, ও সে জিনিস নয়। কিছু একটা হয়েছে।'

রূপলেখা তখন ঘরের বাহির হইয়া গিয়াছে। পুরুষটি ঘরের চারিদিকে চাহিতে চাহিতে বলিলেন, 'আজ আত্মীয় বন্ধু সকলেই এসেছেন দেখছি—শুধু—'

'শুধু একজন নেই।'

'চুপ্—দ্বিজনাথবাবু!'

গৃহস্বামী বাহির হইতে দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তীক্ষ্ণ চক্ষে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মাথার হেল্‌মেট খুলিয়া ফেলিলেন। ঘর নিস্তব্ধ হইয়া রহিল; কেহ কেহ উঠিয়া দাঁড়াইল। দ্বিজনাথবাবু তুষারকঠিন কণ্ঠে বলিলেন, 'আমার দেরি হয়ে গেল। কাজ ছিল। আসছি এখুনি—' বলিয়া টুপি মস্তকে স্থাপন করিয়া ভিতরের দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন।

দরজা পর্যন্ত পৌঁছিয়া তিনি একবার ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'রূপলেখা কোথায়?' তারপর উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই প্রস্থান করিলেন।

দ্বিজনাথবাবুর স্ত্রী উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, আবার ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িলেন। ঘরের মধ্যে বহু দীর্ঘনিশ্বাস পতনের সমবেত শব্দ হইল, যেন সকলে এতক্ষণ শ্বাসরোধ করিয়া বসিয়াছিল।

যে কন্যার বিবাহ আগামী কল্য, মধ্যরাত্রে তাহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করা রুচিবিগর্হিত কিনা এ বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে; কিন্তু ঐ কন্যার মনের মধ্যে প্রবেশ করা একেবারেই ভদ্রতা বিরুদ্ধ। কথায় বলে স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং। তাহাদের মন লইয়া নাড়াচাড়া করা নিরাপদ নয়; কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া সাপ বাহির হইয়া পড়িতে পারে। তাই আমরা ফটোগ্রাফের ক্যামেরার মত রূপলেখার বহিরাচরণ লিপিবদ্ধ করিয়াই নিরস্ত হইব, তাহার মনের ধার ঘেঁষিয়াও যাইব না।

গভীর রাত্রি। ঘর নিস্তব্ধ। শিঙার-মেজের উপর একটি মোমবাতি জ্বলিতেছে। বাহিরের দিকের জানালা ঈষৎ খোলা, কন্‌কনে বাতাস নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া বাতির শিখাটাকে মাঝে মাঝে কাঁপাইয়া দিতেছিল।

সন্ধ্যাবেলার পোশাকী সাজ ছাড়িয়া রূপলেখা মামুলি শাড়ি শেমিজের উপর একটা র‍্যাপার জড়াইয়া নিজের বিছানায় পা ঝুলাইয়া বসিয়াছিল। রাত্রি বারোটা অনেকক্ষণ বাজিয়া গিয়াছে; পাশের ঘরে দ্বিজনাথবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর কথাবার্তার শব্দ আধঘণ্টা পূর্বে থামিয়া গিয়াছে, বোধহয় তাঁহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। রূপলেখার চোখে কিন্তু ঘুম নাই; ঈষৎ-খোলা জানালাটার দিকে অপলক চক্ষে চাহিয়া সে বসিয়া আছে।

ঠং করিয়া কোথায় একটা ঘড়ি বাজিল।

রূপলেখা উঠিয়া দাঁড়াইল। মেঝেয় কার্পেট পাতা; তবু সে অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। ভেজানো দরজার ওপারে বাবা মা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন; রূপলেখা কান পাতিয়া শুনিল, ও ঘরে শব্দ মাত্র নাই। দ্বিজনাথবাবুর প্রচণ্ড দাপটে বাড়িতে কাহারও নাক ডাকিত না।

ফিরিয়া আসিয়া রূপলেখা শিঙার-মেজের সম্মুখে দাঁড়াইল। মোমবাতির পীতাভ শিখার দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বুকের ভিতর হইতে সেই কাগজের টুকরা বাহির করিল। সেটা খুলিয়া মোমবাতির আলোয় পড়িতে পড়িতে তাহার ঠোঁট দুটি কাঁপিতে লাগিল। চিঠিতে লেখা ছিলঃ

"এই দিক দিয়ে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ কি মনে হল ট্রেন থেকে নেমে পড়লুম। হঠাৎ চৈত সিংয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল; বুড়োর কাছে শুনলুম কাল তোমার বিয়ে! ! রাত্রে শোবার ঘরের জানলা খুলে রেখো। আমি আসব। তোমাকে একবার দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

চিঠিখানা পেন্সিলের আকারে পাকাইয়া রূপলেখা মোমবাতির শিখার কাছে লইয়া

গেল; কিন্তু আগুনে সমর্পণ করিতে পারিল না—কি ভাবিয়া সেটাকে খুলিয়া ভাঁজ করিয়া আবার বুকের মধ্যে রাখিয়া দিল। বুকের ভিতর হইতে একটি শিহরিত নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

'রূপু!'

অতি মৃদু ডাক কানে যাইতে রূপলেখা চমকিয়া জানালার দিকে বিস্ফারিত চক্ষু ফিরাইল; তারপর ছুটিয়া গিয়া জানালার কবাট খুলিয়া ধরিল।

অবলীলাক্রমে জানালা উল্লঙ্ঘন করিয়া যে যুবকটি ঘরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল তাহার বয়স বোধ করি বাইশ কি তেইশ! মাথায় রুক্ষ ঝাঁকড়া চুল, গায়ে একটা টুইলের আধ-ময়লা কামিজ; মুখে বেপরোয়া দুঃসাহসিক ধৃষ্টতার ভাব, চোখ দুটা জ্বলজ্বলে এবং অত্যন্ত সতর্ক। ঘরে অবতীর্ণ হইয়াই সে জানালা বন্ধ করিয়া দিল, তারপর রূপলেখার দুই হাত নিজের দুই মুঠিতে ধরিয়া বুকের কাছে তুলিয়া লইল। ব্যগ্র আনন্দে কথা কহিতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া শ্যেন দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাইল।

তাহার দৃষ্টি সমস্ত ঘর ঘুরিয়া যখন রূপলেখার মুখের উপর ফিরিয়া আসিল তখন রূপলেখার দুই চক্ষু ছাপাইয়া অশ্রুর ধারা নামিয়াছে; ঝাপসা অশ্রুর ভিতর দিয়া সে যুবকের মুখের পানে ক্ষুধিত চক্ষে চাহিয়া আছে।

নিঃশব্দ হাসিতে যুবকের মুখ ভরিয়া গেল। সে রূপলেখার হাত ছাড়িয়া দিয়া দু'হাতে তাহার কাঁধ ধরিয়া টানিয়া আনিল, তারপর তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ফিসফিস করিয়া বলিল, 'ও ঘরের খবর কি?'

রূপলেখা যুবকের বুকের কামিজের উপর গাল ঘষিয়া গালের অশ্রু মুছিয়া ফেলিল; ভগ্নস্বরে চাপা গলায় বলিল, 'মা বাবা ঘুমিয়েছেন।'

যুবক তখন চিবুক ধরিয়া রূপলেখার মুখখানি তুলিয়া ধরিল, কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া শেষে যেন নিজ মনেই বলিল, 'রূপুরাণীর কাল বিয়ে। আশ্চর্য! আমিও ঠিক এই সময়েই এসে পড়লুম!'

রুদ্ধস্বরে রূপু বলিল, 'আমি জানতুম—আজ সকালে ঘুম ভেঙে অবধি কেবল তোমার কথা—' তাহার গলা বুজিয়া গেল।

যুবক রূপলেখার হাত ধরিয়া খাটের দিকে লইয়া চলিল।

'এস—বসি।'

দু'জনে পাশাপাশি পা ঝুলাইয়া বসিল। বিছানাটি নরম ও শুভ্র; পায়ের কাছে লেপ পাট করা রহিয়াছে। যুবক আড়চোখে সেই দিকে একটা লুব্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া সবলে লোভ সম্বরণ করিয়া ফিরিয়া বসিল। বলিল, 'বেশীক্ষণ থাকতে পারব না—ক্ষণিকের অতিথি। সন্দেহ হয়, চৈত সিং ছাড়া আরও দু' একজন আমাকে চিনে ফেলেছে। আজ রাত্রেই পালাতে হবে।'

ত্রাসে রূপলেখার চক্ষু ডাগর হইয়া উঠিল, যুবকের হাত চাপিয়া ধরিয়া সে বলিল, 'তবে? কি হবে? যদি ধরা পড়—?'

রূপলেখার ভয় দেখিয়া যুবক নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল, শেষে বলিল, 'যদি ধরে ফ্যালে, ঝুলিয়ে দিতে বেশী দেরি করবে না। পুলিস সব ব্যবস্থা ঠিক করে রেখেছে।'

যুবকের ঠোঁটের উপর হাত রাখিয়া রূপলেখা আর্তস্বরে বলিয়া উঠিল, 'চুপ্ কর, চুপ্ কর—বোলো না—'

'আচ্ছা, ও কথা থাক।'

যুবক একটু চুপ করিল, ঘাড় বাঁকাইয়া একবার দরজার পানে তাকাইল, পাশের ঘরে নিদ্রিত থাকিয়াও দ্বিজনাথবাবু ইহাদের উপর অদৃশ্য প্রভাব বিস্তার করিতেছেন,

তাঁহার অদূর-স্থিতি ইহারা মুহূর্তের জন্যও ভুলিতে পারিতেছে না।

যুবক রূপলেখার আর একটু কাছে ঘেঁষিয়া বসিল, বলিল, 'ভারী বরের নাম শুনলুম প্রমথ। পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়নি। লোকটি কেমন?'

রূপু ঘাড় বাঁকাইয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল। যুবকের ঠোঁটে একটু হাসি খেলিয়া গেল; সে আবার প্রশ্ন করিল, 'দেখতে কেমন? শুনিই না। আমার চেয়ে দেখতে ভাল নিশ্চয়ই?'

রূপু পলকের জন্য যুবকের মুখের পানে চোখ তুলিয়া আবার চোখ নত করিয়া ফেলিল।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। ক্ষীণালোক ঘরে দুজনে পাশাপাশি শয্যার উপর বসিয়া আছে। যুবক রূপলেখার আপাদমস্তক চোখ বুলাইয়া মৃদু হাস্যে বলিল, 'গায়ে একটু মাংস লেগেছে দেখছি। —বিয়ের জল?'

পরিহাসে কান না দিয়া রূপলেখা মর্মপীড়িত চোখ তুলিয়া বলিল, 'কিন্তু তুমি যে—তুমি যে বড্ড রোগা হয়ে গেছ।—কেন? কেন?'

যুবক শুধু একটু হাসিল। রূপলেখা বলিতে লাগিল, 'এই শীতে—মাগো—ঠান্ডা মাথা—' বলিতে বলিতে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল।

যুবক কামিজ তুলিয়া দেখাইল ভিতরে একটা সস্তা জাপানী সোয়েটার আছে।

মাথা নাড়িয়া রূপলেখা বলিল, 'তা হোক, ওতে কি শীত ভাঙে!'

যুবক রূপলেখার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, 'রূপু, বুকের রক্ত যার গরম তার গরম জামা দরকার হয় না। কিন্তু এবার যেতে হবে। বিয়েটা দেখবার বড় সাধ হচ্ছিল, তা আর হল না।'

খামখেয়ালী হাসিয়া যুবক উঠিবার উপক্রম করিল।

রূপলেখা তাহার হাঁটুর উপর হাত রাখিয়া তাহাকে উঠিতে দিল না, মিনতির স্বরে বলিল, 'আমার একটা কথা শুনবে?'

'কি?'

আঙুল হইতে আঙটি খুলিতে খুলিতে রূপলেখা বলিল, 'এটা নাও। যদি কখনো দরকার হয়—বিক্রি করলে—'

যুবকের মুখ কঠিন হইয়া উঠিল, সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'রূপু, এ বাড়ির একটা কুটো আমি ছোঁব না।'

কাঁদিতে কাঁদিতে, আঙটিটা তাহার হাতে গুঁজিয়া দিতে দিতে রূপলেখা বলিল, 'এ বাড়ির নয়; এ আমার। উনি আমাকে দিয়েছেন—'

যুবক সচকিতে আঙটিটার দিকে চক্ষু ফিরাইয়া যেন পরম বিস্ময়ে সেটার পানে তাকাইয়া রহিল। তারপর রূপলেখার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল। নিঃশব্দ হাসি, কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া মনে হয়, দুর্নিবার অট্টহাসির ধমকে সে এখনি ফাটিয়া পড়িবে।

দীর্ঘকাল পরে হাসি থামিলে যুবক সংযতভাবে বলিল, 'আচ্ছা, নিলুম।' বলিয়া কড়ে আঙুলে আঙটি পরিধান করিল।

ঠং করিয়া কোথায় একটা ঘড়ি বাজিল। একটা—না দেড়টা?

যুবক নিতান্ত সহজভাবে বলিল, 'চললুম। আবার কবে কোথায় দেখা হবে জানি না। হয়তো—' কথা শেষ না করিয়া যুবক থামিয়া গেল, তারপর একটু হাসিয়া জানালার দিকে অগ্রসর হইল।

জানালার সম্মুখে পৌঁছিয়া কবাট খুলিয়াছে, এমন সময় পিছন হইতে রূপলেখার

সংহত কণ্ঠস্বর আসিল।

'যাচ্ছ?'

যুবক আবার ফিরিয়া আসিয়া রূপলেখার সম্মুখে দাঁড়াইল, ক্ষণকালের জন্য একটা ব্যথার ভাব তাহার মুখের উপর দিয়া খেলিয়া গেল।

'হ্যাঁ—চললুম। আড়াইটার সময় একটা ট্রেন আছে, সেইটে ধরব!'

তারপর গভীর স্নেহে তাহাকে জড়াইয়া লইয়া কপালে একটি চুম্বন করিল, অস্ফুটস্বরে বলিল, 'সুখী হও—চিরায়ুষ্মতী হও।'

জানালা ডিঙাইয়া যুবক নিঃশব্দে বাহিরের অন্ধকারে মিশাইয়া গেল। মোমবাতিটা পুড়িয়া পুড়িয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল; খোলা জানালা পথে শীতল বাতাস প্রবেশ করিয়া তাহার শিখাটাকে কাঁপাইয়া দিতে লাগিল।

রূপলেখা বিছানার উপর শুইয়া পড়িল। রোদনের অদম্য উচ্ছ্বাস শাসন মানিতে চায় না কিন্তু জোরে কাঁদিয়া মনের ব্যাকুলতাকে মুক্ত করিয়া দিবার উপায় নাই; পাশের ঘরে দ্বিজনাথবাবু ঘুমাইতেছেন। রূপলেখা সজোরে বালিশ কামড়াইয়া ধরিয়া ভাঙা ভাঙা স্বরে বার বার বলিতে লাগিল, 'দাদা! দাদা—!'

২ ফাল্গুন ১৩৪৬

রো মা ন্স

ছোটনাগপুরের যে অখ্যাতনামা স্টেশনে হাওয়া বদলাইতে গিয়াছিলাম তাহার নাম বলিব না। পেশাদার হাওয়া-বদলকারীরা স্থানটির সন্ধান পায় নাই; এখনও সেখানে টাকায় ষোল সের দুধ এবং দুই আনায় একটি হৃষ্টপুষ্ট মুরগী পাওয়া যায়।

কিন্তু চাঁদেও কলঙ্ক আছে। কবির ভাষায় বলিতে গেলে 'দোসর জন নহি সঙ্গ।' দিনান্তে মন খুলিয়া দুটা কথা বলিব এমন লোক নাই। পোস্ট-মাস্টারবাবু আছেন বটে, কিন্তু তাঁহার বয়স হইয়াছে এবং মেজাজ অত্যন্ত কড়া। তা ছাড়া স্টেশনের মালবাবুটি আছেন বাঙালী; কিন্তু তিনি রেলের মাল ও বোতলের মালের মধ্যে নিজেকে এমন নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়াছেন যে সামাজিক মনুষ্যহিসাবে তাঁহার আর অস্তিত্ব নাই।

দুগ্ধ ও কুক্কুটমাংসের সুলভতা সত্ত্বেও বিলক্ষণ কাতর হইয়া পড়িয়াছিলাম। দিন এবং রাত্রি কোন মতে কাটিয়া যাইত; কিন্তু বৈকাল বেলাটা সত্যই অচল হইয়া উঠিয়াছিল। যৌবনে বানপ্রস্থ অবলম্বনের যে বিধি ঠাকুর-কবি দিয়াছেন, তাহাতে সঙ্গী বা সঙ্গিনী গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা থাকিলে আমার আপত্তি নাই, নচেৎ প্রস্তাবটা

পুরামাত্রায় গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। যৌবনকালে অবিবাহিত অবস্থায় একাকী হাওয়া বদলাইতে আসিয়া ব্যাপারের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি।

কিন্তু দু-চার দিন কাটিবার পর সন্ধ্যা যাপন করিবার একটা চমৎকার উপায় আবিষ্কার করিয়া ফেলিলাম। রেলের স্টেশনটি নিরিবিলি; লম্বা নীচু প্ল্যাটফর্ম এ-প্রান্ত ও-প্রান্ত চলিয়া গিয়াছে—উপরে কোনও প্রকার ছাউনি নাই। মাঝে মাঝে একটি করিয়া বেঞ্চি পাতা আছে। একদিন বৈকালে নিতান্ত হতাশ্বাস হইয়াই একটা বেঞ্চির উপর গিয়া বসিয়া পড়িলাম। মিনিট কয়েক পরে স্টেশনে সামানে একটু চাঞ্চল্য দেখা দিল; তার পরই হু হু শব্দে পশ্চিম হইতে কলিকাতা-যাত্রী মেল আসিয়া পড়িল। যাত্রীর নামা-ওঠার উত্তেজনা নাই বলিলেই চলে; কিন্তু সারা গাড়িটা যেন মনুষ্যজাতির বিচিত্র সমাবেশে গুলজার হইয়া আছে। জানালা দিয়া কত প্রকারের স্ত্রী-পুরুষ গলা বাড়াইয়া আছে, কলরব করিতেছে। ফার্স্ট ক্লাসে দু'-চারিটি ইঙ্গ-সাহেব-মেম নিজেদের চারিপাশে স্বতন্ত্রতার দুর্ভেদ্য পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিয়া গম্ভীর মুখে বসিয়া আছে' ঘর্মাক্তকলেবর অর্ধ-উলঙ্গ এঞ্জিন-ড্রাইভারটা যেন এক পক্কড় কুস্তি লড়িয়া ক্ষণেকের জন্য মল্লভূমির বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মনে হইল, আমার চোখের সামনে লোহার খাঁচায় পোরা একটা ধাবমান মিছিল আসিয়া দাঁড়াইল।

এক মিনিট দাঁড়াইয়া ট্রেন-দৈত্য আবার ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। এখানে তাহার কোনই কাজ ছিল না, শুধু হাঁফ লইবার জন্য একবার দাঁড়াইয়াছিল।

কিন্তু আমার মনে একটা নেশা ধরাইয়া দিয়া গেল। এই আকস্মিক দুর্যোগের মত হঠাৎ আসিয়া হাজির হওয়া, তারপর তেমনই আকস্মিকভাবে উধাও হইয়া যাওয়া—ইহার মধ্যে যেন একটা রোমান্স রহিয়াছে। জীবনের গতানুগতিক ধারার মধ্যে এমনি বৈচিত্র্য আসিয়া প্রাণকে নাড়া দিয়া সজাগ করিয়া দেয়—ইহাই তো রোমান্স!

স্টেশন আবার খালি হইয়া গিয়াছিল। বেশ একটু প্রফুল্লতা লইয়া উঠি উঠি করিতেছি, ঠং ঠং করিয়া স্টেশনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সচকিতে গলা বাড়াইয়া দেখিলাম, বিপরীত দিক হইতে ট্রেন আসিতেছে। আবার বসিয়া পড়িলাম।

ইনিও মেল; কলিকাতা হইতে পশ্চিমে যাইতেছেন। তেমনই বিচিত্র স্ত্রী-পুরুষের ভিড়। জানালার প্রতি ফ্রেমে চলচ্চিত্রের এক-একটি দৃশ্য। তারপর সেই খাঁচায়-পোরা দীর্ঘ মিছিল লোহা-লক্কড় বাষ্প ও কয়লার জয়গান করিতে করিতে চলিয়া গেল।

স্টেশনে খবর লইয়া জানিলাম আজ আর কোন ট্রেন আসিবে না। শিস্ দিতে দিতে বাড়ি ফিরিলাম।

পরদিন বৈকালে আবার গেলাম। ক্রমে এটা একটা দৈনন্দিন অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইল। এমন হইল যে ঘড়ির কাঁটা পাঁচটার দিকে সরিতে আরম্ভ করিলেই আমার পদযুগলও অনিবার্য টানে স্টেশনের দিকে সঞ্চালিত হইতে থাকে। আধ ঘণ্টা সেখানে বসিয়া দু'টি ট্রেনের যাতায়াত দেখিয়া তৃপ্তমনে ফিরিয়া আসি। কোনও ট্রেন কোনও দিন একটু বিলম্বে আসিলে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠি। নিজের উৎকণ্ঠায় নিজেরই হাসি পায়, তবু উৎকণ্ঠা দমন করিতে পারি না; যেন ইহাদের যথাসময়ে আসা না-আসার দায়িত্ব কতকটা আমারই স্কন্ধে।

সেদিনের কথাটা খুব ভাল মনে আছে। ফাল্গুনের মাঝামাঝি; ঝির-ঝিরে বাতাস স্টেশনের ধারে ছোট ছোট পলাশগাছের পাতার ভিতর দিয়া লুকোচুরি খেলিতেছিল। আকাশে কয়েক খণ্ড হাল্কা মেঘ অস্তমান সূর্য হইতে আলো সংগ্রহ করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দিতেছিল, বাতাসের রং গোলাপী হইয়া উঠিয়াছিল। কনে-দেখানো আলো, এ আলোর নাকি এমন ইন্দ্রজাল আছে যে চলনসই মেয়েকেও সুন্দর মনে হয়।

স্টেশনে গিয়া বসিয়াছি, মনে এই কনে-দেখানো গোলাপী আলোর ছোপ ধরিয়া গিয়াছে। এমন সময় বংশীধ্বনি করিয়া কলিকাতা-যাত্রী মেল আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ির যে-কামরাটা ঠিক আমার সম্মুখে আসিয়া থামিয়াছিল, তাহারই একটা জানালা আমার চোখের দৃষ্টিকে চুম্বকের মত টানিয়া লইল।

জানালার ফ্রেমে একটি মেয়ের মুখ। কনে-দেখানো আলো সেই মুখখানির উপর পড়িয়াছে বটে কিন্তু না-পড়িলেও ক্ষতি ছিল না। এত মিষ্টি মুখ আর কখনও দেখি নাই। চুলগুলি অযত্নে জড়ানো, চোখদু'টি স্বপ্ন দেখিতেছে। আমার উপর তাহার চক্ষু পড়িল, তবু সে আমাকে দেখিতে পাইল না। বাহিরের দিকে তাহার দৃষ্টি নাই; যৌবনের অভিনব স্বপ্নরাজ্যে নূতন প্রবেশ করিয়াছে, তাহারই ঘোর চোখে লাগিয়া আছে। মনের বনচারিণী। অন্তরের কৌমার্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে; শিলারুদ্ধপথ তটিনীর মত পথ খুঁজিতেছে কিন্তু শিলা ভাঙিয়া ফেলিবার সাহস এখনও হয় নাই। যৌবনের তটে দাঁড়াইয়া তাহার পা দু'টি ন যযৌ ন তস্থৌ।

গাড়ির কিন্তু ন যযৌ ন তস্থৌ নাই। এক মিনিট কখন কাটিয়া গেল; গাড়ি গোলাপী বাতাসের ভিতর দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। আমার দৃষ্টির চুম্বক দিয়া লোহার গাড়িটা টানিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলাম। গাড়ি কিন্তু থামিল না।

তারপর কতক্ষণ সেখানে বসিয়া রহিলাম। পশ্চিমগামী গাড়ি আসিয়া চলিয়া গেল জানিতেও পারিলাম না। চমক ভাঙিতে দেখিলাম, ফাল্গুনের হাল্‌কা বাতাস তখনও পলাশপাতার ভিতর দিয়া লুকোচুরি খেলিয়া ফিরিতেছে কিন্তু আকাশের কনে-দেখানো আলো আর নাই, কখন মিলাইয়া গিয়াছে।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া ভাবিতে লাগিলাম। বাঙালীর মেয়ে নিশ্চয়; এত সুকুমার মুখ বাঙালীর মেয়ে ছাড়া হয় না। কিন্তু পশ্চিম হইতে আসিতেছে। তা পশ্চিমে তো কত বাঙালী বাস করে। কোথায় যাইতেছে? হয়তো কলিকাতায়। কিংবা আগেও নামিয়া যাইতে পারে। কোথায়? বর্ধমান? চন্দননগর? বাংলা দেশটা তো এতটুকু নয়। এই বিপুল জনসমুদ্রে এক বিন্দু শিশিরের মত সে কোথায় মিলাইয়া যাইবে!

কুতূহলী জল্পনা চলিতে লাগিল। মন নিজের কাছে ধরা পড়িয়া গিয়াও বিন্দুমাত্র লজ্জিত হইল না। আবার কখনও দেখা হইবে কি? ইংরেজি বচন মনে পড়িল—Ships that pass in the night! না, তা হইতেই পারে না। একবার মাত্র চোখের দেখায় যে মনের উপর এমন দাগ কাটিয়া দিল, সে চিরজীবনের জন্য অদৃশ্য হইয়া যাইবে! আর তাহাকে কখনও দেখিতে পাইব না!

আশ্চর্য! এমন তো কত লোককেই প্রত্যহ দেখিতেছি, কাহারও পানে ফিরিয়া তাকাইবার ইচ্ছাও হয় না—আয়নার প্রতিবিম্বের মত চোখের আড়াল হওয়ার সঙ্গে মনের আড়াল হইয়া যায়। অথচ এই মেয়েটি এক মিনিটের মধ্যে সমস্ত মন জুড়িয়া বসিল কি করিয়া?

সে কুমারী—আমার মন বুঝিয়াছে। তা ছাড়া সিঁথিতে সিন্দূর, মাথায় আঁচল ছিল না। ঠোঁট দুটিও অনাঘ্রাত কচি কিশলয়ের মত—

তবে? কে বলিতে পারে? জগতে এমন কত বিচিত্র ব্যাপারই তো ঘটিতেছে। হয়তো আমারই জন্য সে—

মন তাহাকে লইয়া মাধুর্যের হোলিখেলায় মত্ত হইয়া উঠিল।

পরদিন অভ্যাসমত আবার স্টেশনে গেলাম। দুটা গাড়িই পর-পর বিপরীত মুখে চলিয়া গেল; আজ তাহাদের ভাল করিয়া লক্ষ্যই করিলাম না। মন ও ইন্দ্রিয়গুলি অন্তর্মুখী; বহির্জগৎ যেন ছায়াময় হইয়া গিয়াছে।

হঠাৎ মাথার ভিতর দিয়া তড়িৎ খেলিয়া গেল। কে বলিতে পারে, হয়তো এই পথেই সে ফিরিয়া যাইবে। কোথা হইতে আসিয়াছিল জানি না, কোথায় গিয়াছে তাহাও অজ্ঞাত; তবু এই পথেই ফিরিতে পারে তো!

পরদিন হইতে আবার সতর্কতা ফিরিয়া আসিল। শুধু তাই নয়, এত দিন যাহা ছিল নৈর্ব্যক্তিক কৌতূহল তাহাই নিতান্ত ব্যক্তিগত প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইল। পশ্চিমযাত্রী গাড়ি আসিলে আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারি না; সময় অল্প, তবু সমস্ত প্ল্যাটফর্ম ঘুরিয়া সব জানালাগুলা অনুসন্ধান করিয়া দেখি। হঠাৎ জানালায় কোনও মেয়ের মুখ দেখিয়া বুক ধড়াস করিয়া উঠে। তার পরই বুঝিতে পারি এ সে নয়।

মাঝে মাঝে মনে সংশয় উপস্থিত হয়। সপ্তাহ কাটিয়া গেল, কই ফিরিল না তো! তবে কি অন্য পথে ফিরিয়া গিয়াছে? কিংবা—যদি না ফেরে? হয়তো চিরদিনের জন্য বাংলা দেশে থাকিয়া যাইবে। এমনও তো হইতে পারে, পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছিল, ফিরিবার পথে আমি তাহাকে দেখিয়াছি। তবে, আমি যে প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা ট্রেন সন্ধান করিতেছি, ইহা তো নিছক পাগলামি।

আবার কখনও কখনও মনের ভিতর হইতে একটা দৃঢ় প্রত্যয় উঠিয়া আসে। দেখা হইবেই। তাহাকে মনের মধ্যে এত ঘনিষ্ঠভাবে পাইয়াছি যে সে আমার মনের ঘরণী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাকে আর চোখে দেখিতে পাইব না, এ হইতেই পারে না।

কল্পনা করি, দেখা হইলে কি করিব। গাড়িতে উঠিয়া বসিব? কিংবা, এই বেঞ্চিতে বসিয়া হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিব। সে একটি কথা বলিবে না, গাড়ি হইতে নামিয়া আমার সামনে স্মিতমুখে আসিয়া দাঁড়াইবে। দু'-জন হাতধরাধরি করিয়া স্টেশনের বাহির হইয়া যাইব; পাথুরে কাঁকর-ঢালা পথ দিয়া গৃহে ফিরিতে ফিরিতে এক সময় জিজ্ঞাসা করিব,—এত দেরি করলে কেন?

কিন্তু তাহার দেখা নাই।

তার পর একদিন—

সে-দিনের কথাও বেশ ভাল মনে আছে।

পশ্চিমগামী মেল আসিয়া দাঁড়াইল। বেঞ্চি হইতে উঠিতে হইল না, ঠিক সামনের জানালায়। বারো দিনে পরে আবার ফিরিয়া চলিয়াছে।

লাল চেলিতে তাহার সর্বাঙ্গ ঢাকা, সিঁথিতে অনভ্যস্ত সিন্দুর লেপিয়া গিয়াছে। চোখের চাহনি তেমনই স্বপ্নাতুর। আমার উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল, কিন্তু এবারও সে আমাকে দেখিতে পাইল না। মনের বনচারিণী। কিন্তু তবু আজ কোথায় একটা মস্ত তফাৎ হইয়া গিয়াছে। সেদিন আকাশের কনে-দেখানো আলো যে বিভ্রম সৃষ্টি করিয়াছিল, আজ তাহা তাহার ভিতর হইতে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে।

এক মিনিট। গাড়ি চলিয়া গেল। তার পর কতক্ষণ বেঞ্চিতে বসিয়া রহিলাম। নিজের দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দে চমক ভাঙিতে দেখিলাম, ফাল্গুনের হাল্‌কা বাতাস পলাশপাতার ভিতর দিয়া লুকোচুরি খেলিয়া ফিরিতেছে।

৮ বৈশাখ ১৩৪৭

পিছু ডাক

বাংলা দেশের কোনও একটি বড় রেলওয়ে জংশনে প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণীর মেয়েদের ওয়েটিং-রুম। ঘরটি টেবিল চেয়ার গদি-আঁটা চওড়া বেঞ্চি প্রভৃতি যথোচিত আসবাবে সজ্জিত। মেঝে পরিষ্কার মোজেইক করা। ঘরের প্রবেশ দ্বারে সতরঞ্চির মত পর্দা ঝুলিতেছে, পাশে আর একটি দরজার মাথার উপর লেখা—ল্যাভেটারি। রাত্রি কাল; মাথার উপর তীব্রশক্তির দুটা ইলেকট্রিক ল্যাম্প জ্বলিতেছে।

প্রবেশ দ্বারের দিকে পিছন করিয়া ঘরের এক পাশে একটি স্ত্রীলোক মেঝেয় সতরঞ্চির উপর বসিয়া পান সাজিতেছে ও মৃদুগুঞ্জনে হিন্দী ঠুংরী ভাঁজিতেছে। সাজপোশাক ধনী শ্রেণীর বাঙ্গালী কুলকন্যার মত, সম্মুখে রুপার পানের বাটা। পিছনে কিছু দূরে কয়েকটা সুটকেস হোল্ডল বেতের ঝাঁপি প্রভৃতি ও একটা রুপার গড়গড়া রহিয়াছে; এগুলি এই স্ত্রীলোকেরই লটবহর, কারণ ঘরে অন্য কোনও যাত্রী নাই।

স্ত্রীলোকের বয়স অনুমান আটাশ বৎসর—তবু রূপের বুঝি অবধি নাই। যৌবন অপরাহ্নের দিকে গড়াইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সহসা তাহা ধরা যায় না। কী মুখের পরিণত সৌকুমার্যে, কী শরীরের নিটোল বাঁধুনিতে, যৌবন যেন এত রূপ ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছে না। চোখের দৃষ্টি স্বভাবতই গর্বিত ও প্রভুত্ব-জ্ঞাপক; লক্ষ্ণৌয়ের প্রসিদ্ধা গায়িকা কেশর বাঈ যে মুগ্ধা-নায়িকা নয়, বরং অত্যন্ত সচেতনভাবে স্বাধীন-ভর্তৃকা তাহা তাহার রানীর মত চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আর সন্দেহ থাকে না।

পান সাজা প্রায় শেষ হইয়াছে এমন সময় দরজার সতরঞ্চি রঙের পর্দা সরাইয়া ওয়েটিং-রুমের দাসী প্রবেশ করিল। রোগা ঘাঘ্‌রা পরা স্ত্রীলোক; হাড় বাহির করা গালের ভিতর হইতে পান দোক্তার ডেলা ঠেলিয়া আছে। বাঈজীকে সে প্রথম দেখিবামাত্র চিনিতে পারিয়াছিল। সে অতি নিম্ন শ্রেণীর ও নিম্ন চরিত্রের স্ত্রীলোক; ওয়েটিং-রুমের দাসীত্ব করাই তাহার একমাত্র উপজীবিকা নয়। তাই সমধর্মী আর এক নারীর গৌরব গরিমায় সে নিজেও যেন একটা মর্যাদা অনুভব করিতেছিল।

বিগলিত মুখের ভাব লইয়া সে কেশর বাঈয়ের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল।

দাসীঃ বাঈ সাহেবা, আপনি নিজে পান সাজছেন! দিন, আমি সেজে দিই।

বাঈজী তাচ্ছিল্যভরে একবার চোখ তুলিল।

কেশরঃ দরকার নেই। পরের হাতের সাজা পান আমি মুখে দিতে পারি না।

দাসী মুখ কাঁচুমাচু করিল।

দাসীঃ তাহলে—তামাক সেজে আনি?

পানের খিলি মুখের কাছে ধরিয়া কেশর ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিল।

কেশরঃ না থাক।

পান মুখে দিয়া কেশর বাকি পানগুলি ডিবায় ভরিতে ভরিতে একটা কোনও জিনিস এদিকে ওদিকে খুঁজিতে লাগিল। ওদিকে দাসী যাইতে চায় না, বাঈজীর জন্য একটা কিছু করিতে পারিলে সে কৃতার্থ হয়।

দাসীঃ বাঈ সাহেবার রাত্রের খানা-পিনাও তো এখন হয়নি। গাড়ি আসবে সেই পৌনে দশটায়—এখনও অনেক দেরি। যদি হুকুম হয় তো কেল্‌নারে ফরমাস দিয়ে আসি—

কেশরঃ খাবার পাট আমি চুকিয়ে নিয়েছি। ম্যানেজার সাহেব বাইরে আছেন? তুই একবার তাঁকে ডেকে দে।

দাসীঃ এই যে বিবি সাহেবা, এক্ষুনি দিচ্ছি। তিনি প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করছেন।

দাসী ব্যস্তভাবে বাহির হইয়া গেল। কেশর দুটি পান হাতে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। পানের সহিত যে বিশেষ মশলাটিতে সে অভ্যস্ত ঠিক মৌতাতের সময় তাহা হাতের কাছে না পাইয়া বাঈজী একটু অধীর হইয়া উঠিয়াছে।

পর্দা ঠেলিয়া যে লোকটি ঘরে প্রবেশ করিল তাহার নাম বিজয়। সে যে এককালে বিত্তবান ও ভদ্রশ্রেণীর লোক ছিল তাহার চেহারা দেখিয়া এখনও অনুমান করা যায়; ধানের শীষ পাটে আছড়াইলে শস্য ঝরিয়া গিয়া কেবল খড়ের গোছাটা যেমন দেখিতে হয়, অনেকটা সেইরূপ। শীর্ণ লম্বা লোক, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি; মাথার সম্মুখস্থ টাকের নগ্নতা ঢাকা দিবার জন্য পাশের লম্বা চুল টানিয়া আনিয়া টাকের লজ্জা নিবারণ করা হইয়াছে। এই লোকটির চেহারা হাসি কথাবার্তা সব কিছুর মধ্যেই একটু শুষ্কতা আছে। গত দশ বৎসরে নিজের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টুকু ও পূর্বপুরুষ সঞ্চিত সমস্ত অর্থ নিঃশেষে কেশর বাঈজীর পায়ে ঢালিয়া দিয়া এখন নিজেকেও সে বাঈজীর পদমূলে নিক্ষেপ করিয়াছে। নামে সে বাঈজীর বিজ্নেস ম্যানেজার; আসলে গলগ্রহ। বাঈজীর মনে বোধহয় দয়া-মায়া আছে, তাই সে বিজয়কে তাড়াইয়া না দিয়া অন্নদাস করিয়া রাখিয়াছে। বিজয় সে কথা বোঝে; তাই তাহার নিরুদ্ধ অভিমান নিজের চারিপাশে শুষ্কতা ও নীরস ব্যঙ্গ বিদ্রূপের একটা আবরণ ফেলিয়া রাখিয়াছে।

কেশরের দিকে আসিতে আসিতে বিজয়ের অধরের একপ্রান্ত গোপন ব্যঙ্গভরে নত হইয়া পড়িল।

বিজয়ঃ কি বাঈজী, খুঁজি খুঁজি নারি? অমূল্য নিধি খুঁজে পাচ্ছ না?

কেশর ঈষৎ বিরক্তি ভরে চোখ তুলিল।

কেশরঃ তুমিই পানের বাটা থেকে কখন সরিয়েছ। দাও কৌটো।

বিজয় কাত করা একটা সুটকেসের প্রান্তে বসিল।

বিজয়ঃ নেশা নেশা নেশা। দুনিয়ার এমন লোক দেখলুম না যার একটা নেশা নেই; সবাই নেশার ঝোঁকে চলেছে। মৌতাতের সময় নেশার জিনিসটি না পেলে বড় কষ্ট হয়, না কেশর বাঈ?

কেশরঃ হয়। এখন কৌটো দাও।

বিজয় ধীরে-সুস্থে পকেট হইতে একটি দেশলাই বাক্সের আকৃতির রূপার কৌটা বাহির করিল; সেটা নাড়াচাড়া করিতে করিতে কতকটা যেন নিজ মনেই বলিতে লাগিল—

বিজয়ঃ নেশা ভাল—তাতে মৌজ আছে। কিন্তু নেশা যখন ভূতের মতন ঘাড়ে চেপে বসে তখনই বিপদ। দেখো বাঈজী, নেশার পাল্লায় পড়ে যেন আমার মতন সর্বস্বান্ত হয়ো না। আমার দৃষ্টান্ত দেখে সামলে যাও।

কেশর ভ্রূ তুলিয়া চাহিল।

কেশরঃ তুমি কি নেশার পাল্লায় পড়ে সর্বস্বান্ত হয়েছ?

বিজয়ঃ তা ছাড়া আর কি? ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, নেশা রয়ে গেছে, কিন্তু মৌতাত আর পাওয়া যাচ্ছে না।

কেশরঃ তোমার মৌতাত তো মদ।

বিজয়ঃ মদ? উঁহু। মদ খাই বটে—না খেলে চলেও না—কিন্তু ওটা আমার আসল নেশা নয়। আমার আসল নেশা—

বিজয় অর্থপূর্ণভাবে কেশরের মুখের পানে চাহিয়া হাসিল; তারপর যেন কথা পাল্টাইয়া বলিল—

বিজয়ঃ মদের পয়সা না থাকলে মানুষ যেমন তাড়ি খায়, আমার মদ খাওয়া তেমনি—

ইঙ্গিতটা বুঝিতে কেশরের বাকি রহিল না কিন্তু সে অবহেলাভরে মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল—

কেশরঃ আবোল-তাবোল বোকো না; কেল্‌নারে ঢুকেছিলে বুঝি?

বিজয়ঃ (হাসিয়া) আরে, সেখানে ঢোকবার কি জো আছে—ট্যাঁক্‌ যে একেবারে ফাঁক! তাই ভাবছিলুম তুমি যদি—আজ শীতটাও পড়েছে চেপে—

কেশরঃ (দৃঢ় স্বরে) না। এখনও ট্রেনে অনেকখানি যেতে হবে। ঘরে মদ খেয়ে যা কর তা কর, বে-এক্তিয়ার হয়ে পড়ে থাক, আমি কিছু বলিনে। কিন্তু রাস্তায় ওসব চলবে না। যাও এখন, এটা মেয়েদের ওয়েটিং-রুম, এখানে বেশীক্ষণ থাকলে হয়তো স্টেশন-মাস্টার হাঙ্গামা করবে। বাইরে গিয়ে বসো গে—

বিজয়ঃ (উঠিয়া) তথাস্তু। আজ নিরামিষই চলুক তাহলে। কিন্তু সাদা চোখে এই স্টেশনে একলা বসে ধর্‌ণা দেওয়া—বড়ই একঘেয়ে ঠেকবে বাঈজী—

বিজয় বাহিরে যাইবার জন্য পা বাড়াইল।

কেশরঃ কৌটোটা দিয়ে যাও।

বিজয় হাসিয়া ফিরিয়া চাহিল।

বিজয়ঃ সেটা কি ভাল দেখাবে বাঈজী? ব্রত-উপবাস যদি করতেই হয় তবে দুজনে মিলেই করা যাক। তুমি কালিয়া পোলাও খাবে আর আমি দাঁত ছির্‌কুটে পড়ে থাকব, সেটা কি উচিত? তুমিই ভেবে দ্যাখো!

কেশর কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে বিজয়ের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর নিঃশব্দে একটা পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া তাহার হাতে দিল।

বিজয়ঃ ধন্যবাদ। দয়ার শরীর তোমার বাঈজী। এই নাও কৌটো।

দ্রুত হস্তে কৌটা লইয়া কেশর প্রথমে দুটা পান মুখে পুরিল, তারপর কৌটা হইতে এক চিমটি মশলা লইয়া গালে ফেলিল। বিজয় দাঁড়াইয়া দেখিতে দেখিতে বলিল—

বিজয়ঃ কেশর বাঈ, তুমি লক্ষ্ণৌয়ের নামজাদা বাঈজী, রূপে-গুণে, টাকায়-বুদ্ধিতে, ঠাটে-ঠমকে তোমার জোড়া নেই—তোমাকে উপদেশ দিতে যাওয়া আমার সাজে না। কিন্তু তবু বলছি, ও জিনিসটা একটু সাবধানে খেও। বিশ্রী জিনিস। একবার একটু মাত্রা বেশী হয়ে গেলে—এমন যে ভুবনমোহিনী তুমি, তোমাকেও আর বাঁচিয়ে রাখা যাবে না।

প্রথম চিম্‌টি মুখে দিবার সঙ্গে সঙ্গে কেশরের ঔষধ ধরিতে আরম্ভ করিয়াছিল, চোখে মুখে একটা উত্তেজনা-দীপ্ত প্রফুল্লতা দেখা দিয়াছিল; সে আর এক টিপ মশলা মুখে দিতে দিতে তাচ্ছিল্যের স্বরে বলিল—

কেশরঃ আমার মাত্রা বেশী হবে না। তুমি এখন এস গিয়ে।

বিজয়ের মুখে কিন্তু চকিত উদ্বেগের ছায়া পড়িয়াছিল, সে এক-পা কাছে আসিয়া বলিয়া উঠিল—

বিজয়ঃ মণি! আর খেও না! সত্যি বলছি, ওটা বড় সাংঘাতিক জিনিস! মণি—!

নিজের পুরাতন নামে সহসা আহূত হইয়া কেশরের নেশা-জনিত প্রসন্নতা মুখ হইতে মুছিয়া গেল; চমকিয়া সে বিজয়ের পানে বিস্ফারিত চক্ষু ফিরাইল।

কেশরঃ চুপ! ও নাম আবার কেন?

কেশর কট্ করিয়া মশলার কৌটা বন্ধ করিল। বিজয় হাসিল; তাহার কণ্ঠের স্বাভাবিক ব্যঙ্গ-ধ্বনি আবার ফিরিয়া আসিল।

বিজয়ঃ মাফ্ কর বাঈজী, বে-টক্করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। দশ বছরের অভ্যেস, যাবে কোথায়? প্রথম যখন ঘর ছেড়ে আমার সঙ্গে বেরিয়েছিলে, তখন 'মণি'ই ছিলে; আরও ক'বছর —যদ্দিন আমার টাকা ছিল—ঐ নামই জারি রইল। তারপর হঠাৎ একদিন তুমি মনমোহিনী কেশর বাঈ হয়ে উঠলে। ছিলাম তোমার মালিক, হয়ে পড়লাম—ম্যানেজার। কিন্তু মনের মধ্যে সেই পুরানো নামটি গাঁথা রয়ে গেছে। মণি মণি মণি! কি মিষ্টি কথাটি বল দেখি? সহজে কি ভোলা যায়?

শুনিতে শুনিতে কেশরের মুখ কঠিন হইয়া উঠিতেছিল, সে রুক্ষ স্বরে বলিল—

কেশরঃ আমার ভাল লাগে না। যা চুকে-বুকে গেছে তার জন্য আমার মায়াও নেই, দরদও নেই। ওসব আগের জন্মের কথা। আমি কেশর বাঈ—এ ছাড়া আমার অন্য পরিচয় নেই। আর কখনও ও-নামে আমাকে ডেকো না।

বিজয় মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল, তারপর অলস পদে দ্বারের দিকে যাইতে যাইতে মুখ ফিরাইয়া বলিল—

বিজয়ঃ এখনও তোমার ঘা শুকোয়নি বাঈজী।

বিজয় বাহির হইয়া গেল। কেশর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল; তারপর কতক নিজমনেই বলিল—

কেশরঃ ঘা শুকোয়নি! না মিছে কথা। আমার কোনও আপ্শোষ নেই। কিন্তু—কিন্তু—যখনই ঐ নামটা শুনি—মনে হয় কে যেন পিছন থেকে ডাক্ছে। পিছু ডাক!

কেশর মাথা নাড়িয়া চিন্তাটাকে যেন দূরে সরাইয়া দিল, তারপর অন্যমনস্কভাবে কৌটা খুলিয়া এক টিপ্ মশলা মুখে দিবার উপক্রম করিল।

মুখে দিতে গিয়া তাহার চমক ভাঙিল। সে মশলার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া আবার উহা কৌটায় রাখিয়া দিল। তারপর কৌটাটা পানের বাটার মধ্যে রাখিয়া দৃঢ়ভাবে বাটা বন্ধ করিল।

কেশরঃ উহুঃ, আর না। বেশী হয়ে যাবে।

ওয়েটিং-রুমের বাহিরে প্ল্যাটফর্মে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, পরক্ষণেই একটা ট্রেন আসিয়া দাঁড়াইল। ইঞ্জিনের চোঁ চোঁ হড়হড় শব্দ, যাত্রীদের ওঠা-নামার হুড়াহুড়ি,—'কুলী—কুলী'—'চা—গরম'—'হিন্দু পানি'—'কাবাব রোটি'—ইত্যাদি।

গোটা দুই কুলী কয়েকটা লটবহর লইয়া ওয়েটিং-রুমে প্রবেশ করিল এবং মোটগুলি ঘরের অন্য পাশে রাখিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল। ইত্যবসরে নবাগত মেল ট্রেনটিও বংশীধ্বনি করিয়া হুস্ হুস্ শব্দে বাহির হইয়া পড়িল।

এই সময় একটি পুরুষ গলা বাড়াইয়া ওয়েটিং-রুমে উঁকি মারিলেন। গায়ে ওভারকোট, মাথা ও মুখ বেড়িয়া পাঁশুটে রঙের একটি কম্ফর্টার—সম্ভবত সর্দি হইয়াছে। তিনি ঘরের ভিতরটা এক-নজর দেখিয়া লইয়া, বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া সর্দি-চাপা গলায় ডাকিলেন—

পুরুষঃ ওগো—! এই যে—এদিকে—

বাইশ-তেইশ বছরের একটি সুশ্রী যুবতী বছর-দুয়েকের ছেলে কোলে লইয়া প্রবেশ করিলেন; দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ছেলেকে কোল হইতে নামাইয়া দিতেই সে হাঁটিয়া ভিতরের দিকে চলিল। কেশর দ্বারের দিকে পিছন ফিরিয়া ছিল; দ্বারের নিকট

গলার আওয়াজ পাইয়া সে কেবল মাথার উপর আঁচলটা টানিয়া দিল।

পুরুষঃ তুমি তাহলে খোকাকে নিয়ে এখানেই থাক, আধ ঘণ্টার মধ্যেই ট্রেন এসে পড়বে। কাগজ-টাগজ কিছু কিনে এনে দেব? এখনও স্টল খোলা আছে।

যুবতীঃ দরকার নেই। তোমার ছেলে সামলাতেই আমার আধ ঘণ্টা কেটে যাবে। এত রাত্তির হল, এখনও ওর চক্ষে ঘুম নেই।

পুরুষঃ তাহলে না হয় ওকে আমিই নিয়ে যাই—আমার কাছে খেলা করবে।

যুবতীঃ না না, আমার কাছে থাক। খায়নি এখনও। তুমি যাও, আর ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থেকো না—

পুরুষঃ আমি ভাবছিলুম এইখানেতেই দোরের বাইরে চেয়ার নিয়ে বসে থাকি। যদি তোমার কিছু দরকার টরকার হয়—

যুবতীঃ কিছু দরকার হবে না আমার। সর্দিতে মুখ তম্‌তম্‌ করছে, বাইরে ঠাণ্ডায় বসে থাকবেন! যাও, ওয়েটিং-রুমে দোর বন্ধ করে বোসো গে। (পুরুষ যাইবার উপক্রম করিলেন) আর শোনো!—আমি বলি কি, কেল্‌নার থেকে একটু ব্রাণ্ডি আর কুইনিনের দুটো গুলি আনিয়ে নিয়ে খেও; এই সর্দির ওপর ট্রেনের ঠাণ্ডা—কি জানি বাপু আমার ভয় করছে—যদি আবার জ্বর-টর—

পুরুষ একটু ঠাট্টা করিলেন।

পুরুষঃ ডাক্তারের বোন কিনা, একটু ছুতো পেলেই ডাক্তারি করা চাই। আচ্ছা, দেখি চেষ্টা করে। কুইনিন গেলা শক্ত হবে না—বাঙালীর ছেলে অভ্যেস আছে—কিন্তু রমা, অন্য জিনিসটা যে গলা দিয়ে নামে না।

রমাঃ নামবে। লক্ষ্মীটি খেও; ওষুধ বৈ তো নয়, ঢক্‌ করে গিলে ফেলবে। যাও, আর দাঁড়িয়ে থেকো না—

পুরুষঃ বেশ। এর পরে কিন্তু মাতাল বলতে পাবে না, তা বলে দিলুম—

রমাঃ হয়েছে, আর রসিকতা করতে হবে না। যত বুড়ো হচ্ছেন— (কপট ভ্রূকুটি করিল)

পুরুষঃ ঘৃতভাণ্ড!—আচ্ছা—ট্রেনের সিগনাল দিলেই আমি আসব।

পুরুষ হাসি এবং কাশি একসঙ্গে চাপিতে চাপিতে প্রস্থান করিলেন। রমা ঘরের দিকে ফিরিয়া এক পা আসিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। খোকা ইতিমধ্যে ঘরের এদিক ওদিক ঘুরিয়া হঠাৎ কেশরের পিঠের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দুই ক্ষুদ্র হস্তে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া খল্‌খল্‌ হাস্য করিতেছে।

রমাঃ ওমা! ওরে ও দস্যি!

রমা তাড়াতাড়ি ছেলেকে কেশরের পৃষ্ঠ হইতে মুক্ত করিয়া লইল।

রমাঃ কিছু মনে করবেন না, ভারী দুরন্ত ছেলে—

কেশর সহাস্যে মাথার কাপড় সরাইয়া রমার পানে চাহিল। তাহার রূপ দেখিয়া রমার চোখ যেন ঝলসিয়া গেল; সে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিল।

কেশরঃ তাতে কী হয়েছে! এস খোকাবাবু, আমার কোলে এস।

খোকা তিলমাত্র দ্বিধা না করিয়া বুটসুদ্ধ কেশরের কোলে উঠিয়া বসিল। রমা বিপন্ন হইয়া পড়িল।

রমাঃ ঐ দেখুন! আপনার কাপড় নষ্ট করে দেবে!

কেশরঃ না না, কিছু করবে না। ভারী সপ্রতিভ ছেলে তো! আর, মুখখানি কি সুন্দর, যেন গোলাপ ফুল ফুটে আছে। তোমার নাম কি খোকাবাবু?

খোকা মাতার প্রতি একবার কটাক্ষপাত করিল।

খোকাঃ মা বলে—দস্চি।

কেশর হাসিয়া উঠিল।

কেশরঃ ওমা—দস্যি বলে! ভারি দুষ্টু তো তোমার মা! আচ্ছা, এবার সত্যিকার ভাল নাম কি তোমার বল তো বাবা?

খোকা একটি তর্জনী তুলিয়া সমুচিত গাম্ভীর্যের সহিত বলিল—

খোকাঃ পিটিং কুঃ!

কেশর স্মিত সপ্রশ্ন নেত্রে রমার পানে চাহিল; রমা হাসিল।

রমাঃ ওর নাম প্রীতিকুমার—প্রীতিকুমার গুহ। ভাল করে' বলতে পারে না—ঐ কথা বলে।

ক্ষণেকের জন্য কেশর একটু বিমনা হইল।

কেশরঃ প্রীতিকুমার—গুহ! (সামলাইয়া লইয়া) বা খাসা নাম—যেমন মিষ্টি খোকা, তেমনি মিষ্টি নাম—আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন না। এই সতরঞ্চিতেই বসুন। আসুন—

কেশর সতরঞ্চির উপর নড়িয়া বসিল। রমা একবার একটু ইতস্ততঃ করিল।

রমাঃ এই যে বসি। খোকা এখনও খায়নি, ওর খাবার নিয়ে বসি।

একটা বেতের বাক্স হইতে দুধের বোতল ও কয়েকখানা বিস্কুট লইয়া রমা কেশরের কাছে আসিয়া বসিল।

রমাঃ আয় খোকা, দুধ খাবি—

খোকা দ্বিধাভরে মাথা নাড়িল।

খোকাঃ ডুডু কাব না—বিক্কু কাব।

রমাঃ আগে দুধ খাবি, তবে বিস্কুট দেব। আয়।

খোকাকে নিজের কোলে শোয়াইয়া বোতলের স্তনবৃন্ত তাহার মুখে দিতেই খোকা আর আপত্তি না করিয়া দুধ খাইতে লাগিল।

এই দুধ খাওয়ানোর ব্যাপার দেখিতে দেখিতে কেশরের মুখখানা যেন কেমন এক-রকম হইয়া গেল; প্রবল আকাঙ্ক্ষার সহিত ঈর্ষার মত একটা জ্বালা মিশিয়া তাহার বুকের ভিতরটা আনচান করিতে লাগিল। খোকা পরম আরামে দুধ টানিতেছে; রমা স্মিতমুখ তুলিয়া কেশরের পানে চাহিল। কেশর চকিতে মুখে একটা হাসি টানিয়া আনিয়া সহৃদয়তার সহিত কথাবার্তা আরম্ভ করিল।

কেশরঃ আপনারা কোন দিকে যাচ্ছেন?

রমাঃ আমরা দেবীপুরে যাচ্ছি। ব্রাঞ্চ লাইনে যেতে হয়, রাত্রি একটার সময় পৌঁছুব।—আর আপনি?

কেশর একটু থতমত হইয়া গেল।

কেশরঃ আমি—আমিও দেবীপুর যাচ্ছি।

রমাঃ (সাগ্রহে) দেবীপুরে! কাদের বাড়ি যাচ্ছেন?—আপনি কি ওখানেই থাকেন?

কেশরের মুখ হঠাৎ লাল হইয়া উঠিল।

কেশরঃ না, আমি—একটা কাজে যাচ্ছি।

রমাঃ ও—তাই। দেবীপুরে আপনার মত এত সুন্দর কেউ থাকলে আমি জানতে পারতুম। আমি দেবীপুরেরই মেয়ে। অবশ্য সকলকে চিনি না, শহর তো ছোট নয়; কিন্তু—(হাসিয়া) আপনি থাকলে নিশ্চয় চিনতুম।

রূপের প্রশংসায় কেশরের কোনও দিন অরুচি হয় নাই কিন্তু আজ সে তাড়াতাড়ি কথা পাল্টাইয়া ফেলিল।

কেশরঃ আপনি বাপের বাড়ি যাচ্ছেন?

রমাঃ হ্যাঁ। সেও কাজে পড়েই যাওয়া। দাদার প্রথম কাজ—মেয়ের বিয়ে। খুব ঘটা করেই মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন; খবর পেয়েছি লক্ষ্মৌ থেকে বাইউলি আসবে। আমার দাদা দেবীপুরের খুব বড় ডাক্তার।

হঠাৎ কেশর পানের বাটার উপর ঝুঁকিয়া পান বাহির করিতে লাগিল। এই মেয়েটি যে-বাড়িতে যাইতেছে ভ্রাতার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে, সেই বাড়িতেই কেশর যাইতেছে নাচ গানের যোগান দিতে। এতক্ষণ সে রমার সহিত কথা কহিতেছিল সমকক্ষের মত, এমন কি মনের মধ্যে একটু সদয় মুরুব্বিয়ানার ভাবও ছিল; কিন্তু এখন তাহার মনে হইল সে এই মেয়েটার কাছে একেবারে ছোট হইয়া গিয়াছে। কেশর জোর করিয়া মুখ তুলিল, জোর করিয়াই নিজের সহজ গর্বকে উদ্রিক্ত করিবার চেষ্টা করিল। কয়েকটা পান হাতে লইয়া সে অনুগ্রহের কণ্ঠে বলিল—

কেশরঃ পান খাবেন?—এই নিন্।

যে অনুগ্রহ পাইয়া রাজা-রাজড়া, নবাব-তালুকদার কৃতার্থ হইয়া যায় রমা তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না, হাসিয়া মাথা নাড়িল।

রমাঃ আমি পান খাই না—মানত আছে।

ইতিমধ্যে খোকা দুগ্ধপান শেষ করিয়া উঠিয়া বসিয়াছিল; তাহার হাতে বিস্কুট দিতেই সে দু'হাতে দুটি বিস্কুট লইয়া ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কেশর রমাকে আর দ্বিতীয়বার পান খাইবার অনুরোধ করিল না, ভ্রূ তুলিয়া মুখের একটু বিকৃত ভঙ্গি করিয়া নিজে পান মুখে দিল। তাহার মন যে ভিতরে ভিতরে রমার প্রতি অকারণেই বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলেও সে তাহা দমন করিবার চেষ্টা করিল না।

কেশরঃ যিনি দোর গোড়ায় তোমার সঙ্গে কথা কইছিলেন উনি বুঝি তোমার কর্তা?

রমা হাসিয়া মাথা নীচু করিল।

কেশরঃ ঠিক আন্দাজ করেছি তাহলে! কথা শুনেই বোঝা যায়—কী দরদ, কী আত্তি—! কতদিন বিয়ে হয়েছে ভাই?

রমাঃ এই—পাঁচ বছর।

কেশরঃ পাঁচ বছর! বল কি? এখনও এত! পুরুষের আদর তো অ্যাদ্দিন থাকে না—তবে বুঝি তুমি দ্বিতীয় পক্ষ ভাই? শুনেছি দ্বিতীয় পক্ষের আদর ট্যাঁক্-সই হয়। কেমন, ধরেছি কিনা?

রমার মুখ একটু গম্ভীর হইল; সে খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—

রমাঃ হ্যাঁ—ঠিক ধরেছেন।

কেশরঃ (হাসিয়া) তা—দুঃখু কি ভাই। করকরে নতুন টাকা কি সবাই পায়? হাজার হাত ঘুরে এলেও টাকার দাম ষোল আনা। সতীন কাঁটা আছে নাকি?

রমাঃ না।

কেশরঃ ভাল ভাল। কাঁটা নেই, কেবল ফুল—এমন দ্বিতীয় পক্ষ হয়ে সুখ আছে। যাই বল।

কেশরের কথার মধ্যে যে ইচ্ছাকৃত খোঁচা আছে তাহা বুঝিতে না পারিলেও রমা মনে মনে একটু বিরক্ত হইয়াছিল; কিন্তু হাসিমুখেই বলিল—

রমাঃ আমার সব খবরই তো নিলেন; আমি কিন্তু আপনার কোনও পরিচয় পেলুম না—

কেশরঃ আমার পরিচয়—?

কেশরের চোখের দৃষ্টি কড়া হইয়া উঠিল। ক্ষণেকের জন্য মিথ্যা পরিচয় দিবার কথাও তাহার মনে আসিল। কিন্তু সে সগর্বে তাহা মন হইতে সরাইয়া দিয়া ব্যঙ্গভরে হাসিয়া উঠিল।

কেশরঃ আমার পরিচয় শুনবে? দেখো ভাই, শিউরে উঠ্‌বে না তো? তুমি আবার কুলের কুলবধূ—

রমা অবাক হইয়া রহিল। কেশর আর একটা পান মুখে দিয়া চিবাইতে চিবাইতে সম্মুখে ঊর্ধ্বদিকে তাকাইল; তারপর যেন তাচ্ছিল্যভরেই বলিল—

কেশরঃ কেশর বাঈয়ের নাম শুনেছ? লক্ষ্ণৌয়ের কেশর বাঈ?

রমা ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

রমাঃ (ক্ষীণ কণ্ঠে) কেশর বাঈজী! আপনিই—!

কেশরঃ আমিই—বিশ্বাস হচ্ছে না?

রমা একবার বিহ্বল-নেত্রে চারিদিকে তাকাইল; রূপার গড়গড়াটা চোখে পড়িল। তারপর সে অনুভব করিল, সে বাঈজীর সহিত একাসনে বসিয়া আছে; তাহার সমস্ত শরীর সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে হঠাৎ উঠিয়া যাইতেও পারিল না; তাহার বসার ভঙ্গীটা আড়ষ্ট হইয়া উঠিল মাত্র।

রমাঃ তাহলে আপনি—দাদার বাড়িতে—

কেশর রমার ভাব লক্ষ্য করিতেছিল, তীক্ষ্ণ হাসিয়া বলিল—

কেশরঃ হ্যাঁ। গান গাইতে যাচ্ছি। ভারী লজ্জার কথা—না?

রমাঃ না না, তা বলিনি—

রমা এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই, খোকা বিস্কুট খাইতে খাইতে বিস্কুটের অধিকাংশই দুই গালে মাখিয়া ফেলিয়াছিল, এই ছুতা পাইয়া রমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল।

রমাঃ ওরে দস্যি ছেলে, ও কি করেছিস—মুখময় বিস্কুট মেখে বসে আছিস। পারিনে আমি। চল্, গোসলখানায় মুখ ধুইয়ে দিইগে—

সে খোকার নড়া ধরিয়া গোসলখানার দিকে লইয়া চলিল। কিন্তু তাহার এই চাতুরী কেশরের কাছে গোপন রহিল না; কেশর বিদ্রূপ-ভরা সুরে হাসিয়া উঠিয়া বলিল—

কেশরঃ বলেছিলুম, শিউরে উঠবে। ঘরের বৌ—সতীলক্ষ্মী—শিউরে ওঠাই তো চাই, নইলে লোকে বলবে কি! আর, একজন বাঈজীর সঙ্গে এক সতরঞ্চিতে বসা—সে যে মহাপাতক। কি দুঃখু যে কাছেই গঙ্গা নেই, নইলে স্নান করে শুদ্ধ হতে পারতে!

রমাঃ আমি—সেজন্য নয়, খোকাকে—

কেশরঃ (কঠিন স্বরে) বলতে হবে না আমি বুঝতে পেরেছি, শাক দিয়ে কি মাছ ঢাকা যায়! কিন্তু তুমি মনে কোরো না যে তোমার মর্যাদা আমার চেয়ে একচুল বেশী—বরং ঢের কম। কে তোমাকে চেনে? তোমার মত বৌ বাংলা দেশের ঘরে ঘরে আছে—কিন্তু খুঁজে বার কর দেখি আর একটা কেশর বাঈ! তুমি যাচ্ছ বড়মানুষ ভায়ের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে, আর তোমার ভাই এক দিনের জন্য এক হাজার টাকা দিয়ে খোসামোদ করে আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন। কার মর্যাদা বেশী!

এই গায়ে-পড়া বচসায় রমা ঈষৎ ভ্রূ তুলিয়া কেশরকে লক্ষ্য করিতেছিল, শান্ত স্বরে বলিল—

রমাঃ আপনার মর্যাদা যদি বেশীই হয়—তা বেশ তো, মান-মর্যাদার কথা তো আমি তুলিনি।

কেশরঃ মুখে তোলনি কিন্তু ঠারে ঠোরে তাই তো বলছ! কিসের এত দেমাক তোমাদের? ঘরের কোণে স্বামীর লাথি ঝাঁটা খেয়ে তো জীবন কাটাও। তোমাদের আবার মান-মর্যাদা! হ্যাঁ, সে কথা আমি বল্‌তে পারি, মান-মর্যাদা খাতির সম্মান নিজের জোরে আদায় করেছি। কারুর দাসীবৃত্তি করি না—পুরুষ আমাকে মাথায় করে রেখেছে। এত খাতির এত সম্ভ্রম কখনও চোখে দেখেছ তোমরা?

কথা কহিলেই হয়তো ঝগড়ায় দাঁড়াইবে, তাই রমা আর কথা না বলিয়া ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইয়া গোসলখানায় প্রবেশ করিয়া দরজা ভেজাইয়া দিল।

উত্তেজনায় কেশর ফুলিতেছিল, রমা চলিয়া যাইবার পর সে ক্রমশঃ একটু শান্ত হইল, তারপর কৌটা হইতে খানিকটা মশলা লইয়া মুখে দিল।

এই সময় একটি মাতাল দরজার পর্দার ভিতর মুণ্ড প্রবেশ করাইয়া কেশরকে দেখিয়া মহা আহ্লাদে হাসিতে হাসিতে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। লোকটির বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ; গৌরবর্ণ দোহারা, মুখে একজোড়া পুরুষ্টু গোঁফ ও মাথায় চুনট্‌-করা সাদা টুপি। বড় বড় চক্ষু দুটি অরুনাভ।

মাতালঃ বন্দেগি বিবি সাহেবা। এক হাজার কুর্ণিশ! (নত হইয়া কুর্ণিশ করিল ও সেই সঙ্গে কেশরের মুখখানা ভাল করিয়া দেখিয়া লইল) নাঃ—যা রটে তা বটে! রূপ তো নয়, যেন গন্‌গনে আগুন। অ্যাদ্দিন কানে শুনেই মজে ছিলুম, এখন চোখে দেখে বুক ঠাণ্ডা হল।

কেশরঃ (রুক্ষস্বরে) কে আপনি?

মাতালঃ আমি—, কুলুজি গাইতে গেলে পুঁথি বেড়ে যাবে বিবিজান, তার দরকার নেই। তবে কেও-কেটা মনে কোরো না। এখানকারই একজন জমিদার। অবস্থা আগের মত আর নেই বটে, কিন্তু—শরীফ্‌ আদ্‌মি। রাম-তেলক সিংকে এদিকের জজ-ম্যাজিস্টর সবাই চেনে। একটু গান বাজনা আমোদ-আহ্লাদের সখ আছে; কতবার ভেবেছি তোমাকে আনিয়ে দু রাত্তির মুজ্‌রো শুনি। কিন্তু যা তোমার খাঁই, পেরে উঠিনি গুল্‌বদন। আজ কেল্‌নারে দু' পেগ্‌ টান্‌তে এসেছিলুম, শুনলুম এই আঁস্তাকুড়ে তোমার পায়ের ধুলো পড়েছে। ব্যস্‌, চলে এলুম; আর কিছু না হোক, দেবী দর্শনটা তো হয়ে যাক।

কেশরঃ আপনি এখন যান; এটা মেয়েদের ওয়েটিং-রুম।

মাতালঃ এমনি করেই কি বুকে ছুরি মারতে হয় বাঈজী! এই এলুম এই চলে যাব? (মেঝেয় উপবেশন করিল) বিশ্বাস হচ্ছে না যে আমি ভদ্রলোক? ভাবছ, ফোতো কাপ্তেন—দুদণ্ড এয়ার্কি মেরে কেটে পড়ব! (পকেট হইতে কয়েকটা নোট বাহির করিল) এক—দুই—তিন—চার—পাঁচ। এই দ্যাখো এখনও পঞ্চাশ টাকা পকেটে আছে। একটি ছোট্ট গজল শুনিয়ে দাও, বুলবুল বাঈ, পঞ্চাশটি টাকা পেন্নামি দিয়ে তর্‌ হয়ে বাড়ি চলে যাই।

কেশরঃ আপনি যদি এই দণ্ডে বেরিয়ে না যান, আমি স্টেশন-মাস্টারকে ডেকে পাঠাব।

মাতালের মুখের গদগদ ভাব মুহূর্তে অন্তর্হিত হইল, সে কর্কশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—

মাতালঃ স্টেশন-মাস্টারের বাবারও ক্ষমতা নেই আমার মুখের ওপর কথা বলে, জুতিয়ে খাল্‌ খিঁচে নেব। রাম-তেলক সিংকে এদিকের সবাই চেনে; যতক্ষণ ভদ্দর লোক আছি ততক্ষণ ভদ্দর লোক, কিন্তু বিগড়ে গেলে বাপের কুপুত্তুর। (রক্তনেত্রে চাহিয়া) নাও, আর দেরি কোরো না, ঝাঁ করে একটা গেয়ে ফ্যালো—

কেশরঃ আমি গাইব না। আপনি যান।

মাতালঃ (নিজের ঊরুতে চাপড় মারিয়া) গাইবে না কি, আলবৎ গাইবে! পয়সা দিচ্ছি—গাইবে না! ব্যবসাদার মেয়েমানুষ তুমি, যখন হুকুম করেছি, গাইতে হবে।

অসহায় ক্রোধে ও আশঙ্কায় কেশরের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিল। এই সময় গোসলখানার দরজা খুলিয়া খোকা কোলে রমা বাহির হইয়া আসিল।

একজন পুরুষকে ঘরের মধ্যে কেশরের অতি নিকটে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া রমা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, আঁচলটা মাথার উপর টানিয়া দিয়া তীক্ষ্ণ অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল—

রমাঃ এ কি! এ ঘরে পুরুষমানুষ কেন?

মাতাল রমাকে দেখিয়া ক্ষণকাল বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া রহিল, তারপর ধড়্মড়্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

মাতালঃ অ্যাঁ! এ যে—এ যে—! (হাতজোড় করিয়া) মাফ্ কর্বেন মা লক্ষ্মী—আমি জানতুম না—ভেবেছিলুম কেবল বাঈজীই ঘরে আছে। মাফ করবেন, আমি যাচ্ছি। (যাইতে যাইতে ঘুরিয়া) আমি ভদ্দর লোকের ছেলে, ঘরে ভদ্রমহিলা আছেন জানলে এ বেয়াদবি আমার দ্বারা হত না। আমি যাচ্ছি।

লজ্জিত মাতাল চলিয়া গেল। রমা খোকাকে ছাড়িয়া দিয়া একটা চেয়ারে বসিল। মর্যাদায় কে বড়, একটা মাতাল এই প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া দিয়া গিয়াছে; কেশর আর মুখ তুলিয়া রমার পানে চাহিতে পারিল না। রমার মুখ দেখিয়াও তাহার মনের ভাব বোঝা গেল না, কিন্তু কেশরের অহঙ্কার যে ধিক্কার ও অপমানে মাটির সহিত মিশিয়া গিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না।

ইহাদের মধ্যে আবার আলাপ আরম্ভ হইবার আর কোনও সূত্রই ছিল না। দুইজন বিভিন্ন জগতের অধিবাসীর মধ্যে ক্ষণিকের সংস্পর্শ ঘটিয়াছে। রমা গায়ে পড়িয়া এই পতিতার সহিত আবার আলাপ আরম্ভ করিবে তাহার এমন প্রবৃত্তি নাই। কেশরের বলিবার কিছু নাই। সুতরাং বাকি সময়টা হয়তো ইহাদের নীরবেই কাটিয়া যাইত; কিন্তু যিনি লজ্জা ধিক্কার শুচিতা অশুচিতার অতীত, সেই শিশু ভোলানাথ গোল বাধাইলেন। খোকা স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠ নির্বিকার চিত্তে কেশরের কোলে গিয়া বসিল।

খোকার এই অর্বাচীনতায় রমা সচকিতে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিল। কেশরের বুকের মধ্যে রোদনের মত একটা বাষ্পোচ্ছ্বাস গুমরিয়া উঠিল; তাহার ইচ্ছা হইল, পরম নিষ্পাপ, নবনীতের মত কোমল এই শিশুটিকে সজোরে বুকে চাপিয়া ধরে। কিন্তু সে খোকাকে দুই হাতে কোল হইতে তুলিয়া দাঁড় করাইয়া ভারী গলায় বলিল—

কেশরঃ না বাবা, তুমি আমার কোলে এসো না; তোমার মা হয়তো এখুনি তোমায় নাইয়ে দেবেন—

ইহা তেজের কথা নয়, অভিমানের কথা। মুহূর্তে রমার মন গলিয়া গেল।

রমাঃ না না, থাক না আপনার কাছে—কী হয়েছে? আমার ওসব কুসংস্কার নেই।

কেশর তিক্ত হাসিল কিন্তু খোকাকে আবার কোলে বসাইল।

কেশরঃ ওটা কথার কথা। কিন্তু সে থাক, তোমার ভাল-মন্দ তোমার কাছে আমার ভাল-মন্দ আমার কাছে—কেউ তো কারুর ভাগ নিতে পারবে না। তবে—আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড়, দুনিয়াও ঢের বেশী দেখেছি। মানুষ যা বলে তা সত্যি নয়, মানুষ যাকে যে চোখে দ্যাখে তাও সব সময় সত্যি দ্যাখা নয়।—

রমাঃ কি বলছেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

কেশর কিয়ৎকাল চুপ করিয়া রহিল, খোকার মাথায় একবার হাত বুলাইল, তারপর ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল—

কেশরঃ তোমার জীবন আমার অজানা নয়। আমিও একদিন তোমার মত ঘরের বৌ ছিলুম—স্বামীর ঘর করেছি। কিন্তু ভগবান ঘরের বৌ করে আমাকে সৃষ্টি করেননি। ভগবান আমাকে অসামান্য রূপ অসামান্য গুণ দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছিলেন, নিজের মুখে বললেও একথা সত্যি। যৌবনের আরম্ভে যখন নিজের কথা নিজে ভাবতে শিখলুম, তখন দেখলুম—এ আমি কোথায় কোন্ অন্ধকার কুয়োর মধ্যে পড়ে আছি! এর চেয়ে ঢের বড় জায়গা, খোলা জায়গা আমায় ডাকছে। এখানে আমার স্থান নয়, আমার স্থান অন্য আসরে।—লোকে আমাকে কুলটা বলতে পারে, ঘৃণাও করতে পারে, কিন্তু কী আসে যায় তাতে? কাঁটা কোথায় নেই? তোমার পথেও কাঁটা আছে, আমার পথেও কাঁটা আছে। আমার সান্ত্বনা এই যে, নিজের স্থান আমি বেছে নিয়েছি, নিজের আসন আমি অধিকার করেছি।

রমা গালে হাত দিয়া শুনিতেছিল; তেমনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। খোকা ইত্যবসরে কেশরের কোলে শুইয়া ঘুমাইবার উপক্রম করিতেছিল। কিছুক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল। তারপর রমা হাত হইতে মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল—

রমাঃ আপনি সুখী হয়েছেন?

কেশরঃ সুখী? হয়েছি বৈকি। অন্তত ঘরের কুলবধূ হয়ে থাকলে এরচেয়ে বেশী সুখী হতাম না একথা জোর করে বলতে পারি।

রমাঃ আমি বিশ্বাস করি না; আপনি সুখী হননি।—আপনি যার লোভে এ পথে পা দিয়েছিলেন তা পাননি, আপনার জাতও গেছে পেটও ভরেনি।

কেশর ক্ষণেক অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল; এতটা স্পষ্টবাদিতা সে নরম-স্বভাব রমার কাছে প্রত্যাশা করে নাই। তাহার মন আবার যুদ্ধোদ্যত হইয়া উঠিল।

কেশরঃ এটা তোমার কুসংস্কার, বুদ্ধি-বিবেচনার কথা নয়।

রমাঃ (দৃঢ়স্বরে) না, বুদ্ধি-বিবেচনারই কথা। সংসার করতে হলে শুধু কুসংস্কারের ওপর ভর দিয়ে বসে থাকলে চলে না, একটু-আধটু ভাবতেও হয়। আমি আপনার চেয়ে বয়সে অভিজ্ঞতায় ছোট হতে পারি, কিন্তু আমাকেও অনেক কথা ভাবতে হয়েছে। আপনি স্বাধীনতা চেয়েছিলেন, মান যশ মর্যাদা চেয়েছিলেন, মেনে নিলুম। স্বাধীনতা খুব বড় জিনিস, মান-মর্যাদাও তুচ্ছ নয়; কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন, মানুষের স্নেহ-ভালবাসা শ্রদ্ধা-মমতা তার চেয়ে ঢের বড় জিনিস। স্বাধীনতা মান-মর্যাদা ও-সব তো উপলক্ষ। আপনার রূপ-যৌবন আছে জানি; গুণও নিশ্চয় আছে—শুনেছি আপনি খুব ভাল নাচতে গাইতে পারেন—কিন্তু এ-সব তো চিরদিনের নয়; আজ আছে কাল শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু জীবন সেই সঙ্গে শেষ হবে না। তখন? (একটু চুপ করিয়া) দেখুন, কেবল যৌবনের কথা ভেবে সারা জীবনের ব্যবস্থা করা তো বুদ্ধি-বিবেচনার কাজ নয়। এর পর শুধু শুকনো স্বাধীনতায় আপনার মন ভরবে কি? ভরবে না। কারণ আপনিও চান মানুষের স্নেহ-ভালবাসা শ্রদ্ধা-মমতা। আর তা পাননি বলেই আপনার জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে!

কেশরঃ কে বলে আমার জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে! মিথ্যে কথা! আমি মানি না।

রমাঃ (শান্তস্বরে) না মানুন। কিন্তু আপনি মনে জানেন, যা পেয়েছেন তা তুচ্ছ; আর যা হারিয়েছেন তার জন্যে আপনার বুকে অসীম বেদনা লুকিয়ে আছে—আমি দেখতে পাচ্ছি। (নিশ্বাস ফেলিয়া) খোকা কি ঘুমিয়ে পড়েছে?

কেশর কোলে খোকার পানে চাহিল; সহসা তাহার দেহ-মন যেন কোন্ দুরন্ত

নিপীড়নে ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। সে বাষ্পবিকৃতকণ্ঠে বলিল—

কেশরঃ হ্যাঁ। তুমি নেবে?

রমাঃ না, থাক আপনারই কোলে। এখন তুল্‌তে গেলে হয়তো জেগে উঠ্‌বে।

কেশর একদৃষ্টে খোকার ঘুমন্ত মুখের পানে চাহিয়া রহিল; সে যখন চোখ তুলিল তখন তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিয়াছে।

কেশরঃ (রুদ্ধস্বরে) আর কিছু না, যদি এমনি একটি শিশুকে পৃথিবীতে আনবার অধিকার আমার থাকত—!

রমা তাহার পাশে নতজানু হইয়া বসিল, আর্দ্রকণ্ঠে কহিল—

রমাঃ আমি বুঝতে পেরেছি। আপনি বড় অভিমানী; লজ্জার মধ্যে অপমানের মধ্যে আপনি একটি নিষ্পাপ শিশুকে টেনে আনতে পারবেন না। (উচ্ছ্বসিত নিশ্বাস ফেলিয়া) বড় নিষ্ঠুর সংসার! কত লোক কত ভুল করে, সব শুধ্‌রে যায়; কিন্তু মেয়েমানুষের এ ভুলের যে ক্ষমা নেই দিদি।

কেশরঃ (চোখ মুছিতে মুছিতে) বোলো না—দিদি বলে ডেকো না—ও নামে আমার অধিকার নেই। আমি কেশর বাঈজী—কেন আমাকে পিছু-ডাক ডাকছ।

রমাঃ পিছু ডাক কি সবাই শুন্‌তে পায়? আপনিও শুন্‌তে পেতেন না যদি না আপনার পিছু টান থাকত। আপনি আগে যা ছিলেন মনের মধ্যে এখনও তাই আছেন।

কেশরঃ তাই আছি—সত্যি তাই আছি? তবে কেন সকলে আমাকে শাস্তি দেবে? আমি জানতে চাই—সব ভুলের ক্ষমা আছে, এর ক্ষমা নেই কেন?

রমাঃ তা আমি জানি না। (একটু চুপ করিয়া) আপনি নিজেও তো নিজেকে ক্ষমা করতে পারেননি—অপরাধের গ্লানি তো আপনার মনেও আছে—!

কেশরঃ (থতমত) গ্লানি! কিন্তু সে তো আমার মনের গ্লানি নয়। সমাজ গ্লানির বোঝা আমার মাথায় চাপিয়ে দিয়েছে—

বাহিরে ট্রেন আসিবার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে রমার স্বামী হন্তদন্ত হইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। গলায় গলবন্ধ নাই, এবার তাঁহার মুখাবয়ব ভাল করিয়া দেখা গেল। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়সের একটি অতি সাধারণ মানুষ।

রমার স্বামীঃ ট্রেন এসে পড়েছে, রমা, ট্রেন এসে পড়েছে। খোকা কৈ?

বলিতে বলিতে তিনি রমা ও কেশরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন।

ক্ষণকাল কেশর ও রমার স্বামী পরস্পরের পানে স্তম্ভিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন; তারপর রমার স্বামী এক-পা পিছাইয়া আসিলেন—

রমার স্বামীঃ মণি—!

বিদ্যুদাহতের মত কেশর দু'হাতে মুখ ঢাকিল। রমা চমকিয়া স্বামীর পানে চাহিল।

রমাঃ কি! কে ইনি? তুমি এ'কে চেনো? ইনি কে?

ক্ষণিকের মূঢ়তা ভাঙিয়া রমার স্বামী ক্ষিপ্রহস্তে ঘুমন্ত ছেলেকে কেশরের কোল হইতে ছিনাইয়া লইলেন; তারপর রমার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া কঠোর স্বরে বলিলেন—

রমার স্বামীঃ চলে এস রমা—

রমাঃ (ব্যাকুলস্বরে) কিন্তু—কে ইনি?

রমার স্বামীঃ কেউ না—কেউ না—তুমি চলে এস।

রমাকে একরকম টানিতে টানিতেই তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ইতিমধ্যে ট্রেন আসিয়া পড়িয়াছিল। দুইটা কুলী দৌড়িতে দৌড়িতে আসিয়া রমাদের বাক্স-বিছানা তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। কেশর এতক্ষণ মুখ ঢাকিয়া বসিয়া ছিল, এখন মুখ খুলিয়া হঠাৎ হাসিতে আরম্ভ করিল। হিস্টিরিয়ার হাসি, কিছুতেই থামিতে চায় না। অবশেষে হঠাৎ হাসি থামাইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল; চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল, মুখে একটা ব্যঙ্গ-বিকৃত ভঙ্গি। কেশর মশলার কৌটা উজাড় করিয়া হাতের উপর ঢালিল।

এই অবসরে বিজয় চোখ মুছিতে মুছিতে ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, কেশর সমস্ত মশলা মুখে দিবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া সে ছুটিয়া আসিয়া কেশরের হাতে চাপড় মারিয়া মশলা ফেলিয়া দিল।

বিজয়ঃ এ কি! পাগল হয়ে গেলে নাকি?

কেশরঃ পাগল! না পাগল হইনি। ওরা চলে গেছে?

বিজয়ঃ ওরা কারা?

কেশরঃ না না, কেউ নয়। ওরা তো এই গাড়িতেই যাবে।

বিজয়ঃ আমরাও তো এই গাড়িতেই যাব। দেরি কিসের? এখনি গাড়ি ছেড়ে যাবে—

কেশরঃ যাক ছেড়ে! বিজয়, আমি দেবীপুরে যাব না।

বিজয়ঃ দেবীপুরে যাবে না!

কেশরঃ না—ফিরে যাব।

বাহিরে হুইসল্ দিয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিল। কেশর উৎকর্ণ হইয়া গাড়ির আওয়াজ শুনিতে লাগিল। বিজয় হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

গাড়ির আওয়াজ দূরে মিলাইয়া গেলে বিজয় সুটকেসের কোণের উপর বসিল।

বিজয়ঃ কেল্নারে একলা বসে বসে একটু চোখ লেগে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে কি ঘটেছে কিছুই জানি না। ব্যাপারটা খুলে বল দেখি বাঈজী।

কেশরঃ (সম্মুখে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া) ব্যাপার! কিছু না। কয়েকজন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হল।

বিজয়ঃ চেনা লোক?

কেশরঃ হ্যাঁ—চেনা লোক—স্বামী, সতীন—সতীনের ছেলে—

কেশর একটু একটু হাসিতে আরম্ভ করিল; ক্রমে তাহার হাসি বাড়িতে লাগিল—উচ্চ হইতে উচ্চতর সপ্তকে।

হিস্টিরিয়ার হাসি।

২৪ অগ্রহায়ণ ১৩৪৯

গোপন কথা

প্রথম নাতিনী হইয়াছে, তাহাকেই দেখিবার জন্য ট্রেনে চড়িয়া বহুদূরের পথে যাত্রা করিয়াছিলাম।

প্রথম নাতিনী হইলে মনের ভাব কেমন হয়, তাহার বর্ণনা করিব না, সুহৃদ্বর তারাশঙ্কর সম্ভবত তাঁহার স্বীয় মনঃসমীক্ষণের বিবরণ সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন, —পঞ্চদশ বৎসর পরে তাঁহার নাতিনীটি পঞ্চদশ বৎসরের হইবে, এই সুমধুর ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া তিনি বিভোর, ইহা আমরা জানি। সুতরাং অলমিতি।

ট্রেনে অর্ধেক পথ অতিক্রম করিয়াছি, এখনও অর্ধেক বাকি। একটা বড় স্টেশনে গাড়ি থামিয়াছিল, আমি বোধ করি নবীনা নাতিনীর কথা ভাবিতে ভাবিতে একটু আচ্ছন্নের মত হইয়া পড়িয়াছিলাম, পাশের প্ল্যাটফর্মে উল্টা দিক হইতে একটা গাড়ি আসিয়া থামিতে সচেতন হইয়া উঠিলাম।

দুই গাড়ির মধ্যে হাত দুই-আড়াই ব্যবধান। জানালা দিয়া মুখ বাড়াইতেই ও-গাড়ির জানালায় একটি মহিলার সঙ্গে চোখাচোখি হইয়া গেল। যুবতী নয়, বয়স চল্লিশ পার হইয়া গিয়াছে; ভারিভুরি গড়ন। কিন্তু মুখ হইতে যৌবনের কমনীয়তা সম্পূর্ণ মুছিয়া যায় নাই। শাড়ির চওড়া লাল পাড় কাঁধের উপর খসিয়া পড়িয়া তাঁহার মুখটিকে যেন অপরাহ্নের অস্তরাগে মণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। ও-গাড়ির ভিতর দিকে বোধ হয় আরও দুই-চারিটি স্ত্রীলোক ছিলেন, কিন্তু আমার চোখে তাঁহারা অস্পষ্ট পশ্চাৎপটের মত আবছায়া হইয়া রহিলেন; আমি কেবল এই মহিলাটির দিকেই বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া রহিলাম।

তিনি প্রথমটা মুখ ফিরাইয়া লইয়া, আবার যেন দ্বিগুণ আগ্রহভরে আমার মুখের পানে চাহিলেন। দুইজন অপরিচিত প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া নির্লজ্জ উৎকণ্ঠায় পরস্পর মুখের পানে তাকাইয়া আছি। কিন্তু—সত্যই কি অপরিচিত? তাঁহার অধরোষ্ঠ ঈষৎ খুলিয়া গেল; দেখিলাম, সম্মুখের দুইটি দাঁতের মধ্যে একটি অপরটির উপর সামান্য অনধিকার অভিযান করিয়াছে।

পঁচিশ বৎসরের রুদ্ধ কবাট মুহূর্তে খুলিয়া গেল; একসঙ্গে অনেকগুলা কথা হুড়মুড় করিয়া কণ্ঠ দিয়া বাহির হইতে চাহিল, কিন্তু কোনটাই বাহির হইতে পাইল না। এই সময় হেঁচকা দিয়া আমার গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

ক্ষণকাল জড়বৎ বসিয়া রহিলাম, তারপর জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিলাম, 'গোপন কথা!'

তিনি তখন দূরে সরিয়া যাইতেছেন; দেখিলাম, শাড়ির লালপাড় আঁচলটা মাথায় তুলিয়া দিয়া তিনি মুখ বাড়াইয়া হাসিলেন, তারপর সঙ্কেত-ভরা একটি তর্জনী তুলিয়া ঠোঁটের উপর রাখিলেন। পঁচিশ বছরের পুরানো একটি দিন চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। ওই হাসি ও সঙ্কেতের মর্ম আমরা দুইজন ছাড়া পৃথিবীতে আর কেহ জানে না।

গোপন কথা! একটি নবীন যুবক ও একটি সম্পূর্ণ অপরিচিতা নব-যুবতীর মধ্যে একদিন একটি নির্জন স্থানে কিছু গোপন কথার বিনিময় হইয়াছিল। নিন্দনীয় কথা নয়, জানিতে পারিলে পুলিসে বাঁধিয়া লইয়া যাইবে এমন কথা নয়—তবু গোপন কথা! শতাব্দীর একপাদ ধরিয়া এই কথাটি বুকের মধ্যে লুকাইয়া রহিয়াছে; ইহজীবনে যে

নারীটির সহিত সর্বাপেক্ষা নিবিড়তম ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে, তাঁহার কাছেও কোনদিন প্রকাশ করি নাই। পাঠকের হয়তো কৌতূহল হইতেছে, কি এমন গোপন কথা! কিন্তু বলিব না। হয়তো তাহার মধ্যে একটু অম্লমধুর কৌতুকের রস ছিল, হয়তো যৌবনের অর্থহীন চপলতা ছাড়া তাহাতে আর কিছুই ছিল না। তবু বলিতে পারিব না, এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যিনি এই গোপন কথার অংশভাগিনী ছিলেন, যিনি এইমাত্র চকিতের জন্য দেখা দিয়া কোন্ অজানা নিরুদ্দেশের অভিমুখে চলিয়া গেলেন, যাঁহার সহিত ইহজীবনে বোধ হয় আর কখনও চোখাচোখি হইবে না, তিনিও এই কথা সযত্নে অতি সন্তর্পণে সকলের নিকট হইতে লুকাইয়া রাখিয়াছেন; যে পুরুষটির সহিত তাঁহার সর্বাপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে, তাঁহাকেও একটি কথা বলেন নাই।

মনটা কিছুক্ষণ পূর্বে দূরভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিতেছিল, এখন দূরতর অতীতের পানে ফিরিয়া চলিল। কি আশ্চর্য এই মানুষের মন! শুধু অতীত আর ভবিষ্যৎ লইয়াই কি তাহার অস্তিত্ব? বর্তমান কতটুকু? স্মৃতি ও আকাঙ্ক্ষার মাঝখানে দ্রুতসঞ্চরমান একটি বিন্দু! তাহাকে ধরিয়া রাখিবার উপায় নাই, এক ফোঁটা পারার মত কেবলই সে পিছলাইয়া হাতের বাহিরে চলিয়া যায়, ধাবমান ট্রেনের জানালা দিয়া দৃষ্ট নিসর্গের মত মুহূর্তে সম্মুখ হইতে পশ্চাতে অদৃশ্য হয়—

আমার নাতিনী যখন পনেরো বছরের হইবে, তখন তাহার কানে কানে আমার গোপন কথাটি বলিব কি? না, বলিব না। অতীতের এই সামান্য কথাটি ভবিষ্যতের কাছে চিরদিনের জন্য অকথিত থাকিয়া যাইবে। এইখানেই আমাদের গোপন কথার পরম পরিপূর্ণতা।

স্থানটি লোকালয় হইতে দশ-বারো মাইল দূরে। পাহাড় আছে, ভগ্নস্তূপ আছে, একটি মুখরস্রোতা গিরিনির্ঝরিণী আছে—আর আছে তন্দ্রানিবিড় মুগ্ধ নির্জনতা। একদিন ফাগুনের আরম্ভে একটি কবোষ্ণ দ্বিপ্রহরে বাইসিক্লে আরোহণ করিয়া একাকী এই স্থানে বেড়াইতে গিয়াছিলাম।

স্থানটি বড় ভাল লাগিয়াছিল। সুদূর অতীত যেন কর্মক্লান্ত বৃদ্ধার মত সংসারের কাজ শেষ করিয়া একান্তে বসিয়া ঝিমাইতেছে; আর তাহার কর্ম নাই, কর্মে আসক্তিও নাই, হয়তো তাহার স্বপ্নের মধ্যে পুরাতন স্মৃতি ছায়ার মত আনাগোনা করে। ভাঙা পাথরের ভূমিশয়ান মূর্তির উপর দিয়া শিকারসন্ধী বন্য গিরগিটি যখন সরসর করিয়া ছুটিয়া যায়, বুড়ী তন্দ্রার মধ্যে একটু উসখুস করে—

কিন্তু সেদিন আমার মনে ঐতিহ্যের রস ভাল করিয়া জমিতে পায় নাই। তাহার প্রধান কারণ, দুইটা কোকিল ভগ্নস্তূপের দুই প্রান্তের কোন্ পল্লব-পুঞ্জে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া বড় তর্ক আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। একটি তার্কিকের মেজাজ কিছু কড়া, অপরটি মৃদু ব্যঙ্গপ্রিয়। একজন যতই মোলায়েম সুরে ব্যঙ্গ করিতেছিল, অন্যটি ততই ঝাঁঝিয়া উঠিয়া রূঢ়কণ্ঠে জবাব দিবার চেষ্টা করিতেছিল। কি লইয়া তর্ক তাহা অনুমান করিতে পারি নাই, কিন্তু লক্ষ্যহীনভাবে এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে ঈষৎ কৌতুকের সহিত মনে হইয়াছিল, বুড়ী কাজ শেষ করিয়া যতই ঝিমাক, পৃথিবীতে যৌবন বসন্ত ও কোকিলের কাজ কোনও দিনই শেষ হইবে না।

তার্কিকদের তর্ক ক্রমশ উষ্ণতর হইয়া উঠিতেছিল। হঠাৎ এক সময় একটা ভাঙা মন্দিরের মোড় ঘুরিয়া দেখিলাম, ব্যঙ্গপ্রিয় কোকিলটি পাখি নয়—একটি মেয়ে। তাহার উৎকণ্ঠানিঃসৃত কুহুধ্বনি আমাকে দেখিয়া অর্ধপথে থামিয়া গেল।

মেয়েটি মন্দিরের দেয়ালে পিঠ দিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া আছে; আমার পানে অবাক হইয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তারপর বলিল, 'আপনি কোথা থেকে এলেন?'

আমিও কম অবাক হই নাই। তাহার বয়স ষোল কি সতেরো; দীঘল তন্বী, মুখখানি মোমের মত সুকুমার, গলাটি মিষ্ট; কিন্তু কোকিলের গলা যে অবিকল নকল করিতে পারে, তাহার গলা সম্বন্ধে অধিক বলাই বাহুল্য। আমি বলিলাম, 'আমি ভেবেছিলাম আপনি কোকিল।'

সে হাসিল। সম্মুখের একটি দাঁতের উপর অন্য দাঁতটি একটু অনধিকার অভিযান করিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিলাম। সে মৃদু তরল কণ্ঠে বলিল, 'আপনি বুঝি অন্য কোকিলটা?'

সত্যকার অন্য কোকিলটা অপর পক্ষের সাড়া না পাইয়া থামিয়া গিয়াছিল, এখন সহসা বিজয়োৎফুল্ল কণ্ঠে কয়েকবার দ্রুতচ্ছন্দে ডাকিয়া উঠিল, কু-কু-কু-কু-কু—

দুইজনে একসঙ্গে হাসিয়া উঠিলাম।

তারপর ভাব হইতে বিলম্ব হয় নাই। এত শীঘ্র এত ভাব হইয়া গিয়াছিল কি করিয়া এখন ভাবি। এ দেশটা বিলাত নয়, অন্তত তখনও বিলাত হইয়া উঠে নাই। অনাত্মীয়া যুবতীর সহিত নির্জনে আলাপ করিবার অভ্যাসও ছিল না। অথচ মুহূর্তের জন্যও বাধোবাধো ঠেকে নাই। বালক-বালিকা যেমন সহজ প্রীতির সহিত কিছুমাত্র আত্ম-সচেতন না হইয়া পরস্পর মিলিত হয়, আমরাও তেমনই মিলিত হইয়াছিলাম। তাহার নাম তটিনী; সে সপরিবারে এখানে বেড়াইতে আসিয়াছে; আর সকলে দুই মাইল দূরে আর একটা ভগ্নস্তূপ পরিদর্শন করিতে গিয়াছেন, তটিনী কিন্তু অনর্থক ঘুরিয়া বেড়ানোর চেয়ে এখানে বসিয়া কোকিলের সহিত কলহ করাই অধিক উপাদেয় মনে করিয়াছে—এসব কথা পরিচয়ের আরম্ভেই জানিতে পারিয়াছিলাম। আমিও পরিচয় দিতে কার্পণ্য করি নাই।

সেদিন বসন্তের বাতাস আতপ্ত আলিঙ্গনে আমাদের জড়াইয়া লইয়াছিল। কোকিল তো ডাকিয়াছিলই; কয়েকটা নবজাত প্রজাপতি চারিপাশে নাচিয়া নাচিয়া অকারণ চটুলতা প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু সেদিনকার স্মৃতির মঞ্জুষায় যে কথাটি আজও আমার মনে আনন্দের প্রভা বিকিরণ করিতেছে তাহা এই যে, বসন্ত আমাদের জয় করিয়া লইয়াছিল বটে, কিন্তু বসন্তসখার দেখা সেদিন পলকের জন্যও পাই নাই। বাঙালীর স্বর্গে কৌতুকের কোনও দেবতা আছেন কিনা জানি না; সম্ভবতঃ আছেন, কারণ তিনিই সেদিন আমাদের যৌবন-যজ্ঞে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন।

দুইজনে ছুটোছুটি করিয়াছিলাম, লুকোচুরি খেলিয়াছিলাম; নির্ঝরিণীর ধারে পাশাপাশি হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া অঞ্জলি ভরিয়া জল পান করিয়াছিলাম। এমন স্বাদু ও এত শীতল জল আর কখনও পান করি নাই। সেই ঝরণার জলের স্বাদ আজও আমার মুখে লাগিয়া আছে।

ক্রমে বিদায়ের কাল উপস্থিত হইয়াছিল।

'আপনি এবার চলে যাবেন?'

'হ্যাঁ। দূরে গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। ও'রা এসে পড়বার আগেই চলে যাই। নইলে আজকের এই নিখুঁত দিনটার ওপর দাগ পড়ে যাবে।—আচ্ছা, চললুম।'

অকপট সৌহার্দ্যে তাহার পানে হাত বাড়াইয়া দিয়াছিলাম। সে আমার হাতখানা দুই হাতে তুলিয়া লইয়া আমার মুখের পানে চাহিয়াছিল।

'আর কখনও আমাদের দেখা হবে না!'

'সম্ভব নয়। কিন্তু এই ভাল।'

'হ্যাঁ। আজকের দিনটা আমার অনেক দিন মনে থাকবে।'

হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি আসিল।

'এস, এক কাজ করি। তা হলে কেউ কাউকে ভুলব না। আমি তোমাকে আমার একটি গোপন কথা বলি, তুমি আমাকে একটি গোপন কথা বল। কিন্তু শপথ রইল, কেউ কোনদিন আর কারুর কাছে এ কথা বলব না।'

সে ক্ষণকাল ভাবিয়াছিল; ভাবিতে ভাবিতে তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

'আচ্ছা।'

আমি তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া একটি গোপন কথা বলিয়াছিলাম—শুনিয়া সে চকিত সকৌতুক দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়াছিল। তারপর একটু হাসিয়া একটু লাল হইয়া আমার কানে কানে তাহার গোপন কথাটি বলিয়াছিল।

সে দাঁড়াইয়া রহিল, আমি চলিয়া গেলাম। কিছুদূর গিয়া একবার ফিরিয়া দেখিলাম। সে একটু হাসিয়া ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিল।

১৪ ভাদ্র ১৩৫০

অপরিচিতা

একটি শ্যামাঙ্গী যুবতী মেঝেয় মাদুর পাতিয়া ঘুমাইতেছে। এলো চুলগুলি বালিশের উপর বিস্রস্ত; অধর পানের রসে রাঙা হইয়া আছে; গায়ের কাপড় কিছু শিথিল। হঠাৎ দেখিয়া আর চোখ ফিরাইতে পারিলাম না।

লুচ্চা মনে করিয়া আমাকে ঘৃণা করিবেন না; এমন মাঝে মাঝে সকলেই হয়। আমি বিবাহিত লোক, দশ বৎসর ধরিয়া দাম্পত্য-জীবন অতিবাহিত করিতেছি। আজ হঠাৎ গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে এই নিদ্রালসা যুবতীকে দেখিয়া আমার যে এমন আত্মবিস্মৃতি ঘটিবে তাহা আমি নিজেই কোনও দিন ভাবিতে পারি নাই।

ঘরে ঢুকিয়া মাদুরের উপর চোখ পড়িতেই চমকিয়া উঠিয়াছিলাম; কিছুক্ষণ দ্বারের কাছেই দাঁড়াইয়া রহিলাম। যুবতীর শিয়রে খোলা জানালা দিয়া অপর্যাপ্ত আলো প্রবেশ করিয়াছিল; লোভী আলো যেন লুব্ধতা সংবরণ করিতে না পারিয়া বিস্রস্ত-বসনার অঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। দাম্পত্য সৌভাগ্যের কৃপায় আমার মনে একটা বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে স্ত্রী জাতির দেহ-মন সম্বন্ধে সব কিছু অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধিৎসার অবসান হইয়াছে। কিন্তু হঠাৎ যেন অভিনব দৃষ্টি লাভ করিলাম; সচরাচর যে আটপৌরে দৃষ্টি দিয়া জগৎব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া থাকি তাহা পরকলার মত

খসিয়া গেল।

পা টিপিয়া টিপিয়া নিদ্রিতার পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম। তাহার চক্ষের দীর্ঘ পল্লবগুলি অল্প অল্প স্পন্দিত হইতেছে; পানের রসে রাঙা ঠোঁট একটু নড়িতেছে: গাল দুটিতে ঈষৎ রক্তিমাভা। দেখিলাম, বাহিরে নিদ্রিতা হইলেও অন্তর্লোকে সে কোন চটুল সকৌতুক খেলায় মাতিয়াছে।

রাঙা ঠোঁট ঈষৎ বিভক্ত হইয়া গেল; শুনিলাম অর্ধস্ফুট-কণ্ঠে সে বলিতেছে—

'...রাজার দুলাল...যাবে আজি মোর...'

কী সর্বনাশ! কবিতা!! রাজার দুলাল!! এ যে অতি বড় দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারি নাই!

নিদ্রিতার মুখের উপর দিয়া আরও কত বিচিত্র ভাব ক্রীড়া করিয়া গেল। আমি নিশ্বাস রোধ করিয়া দেখিলাম; বুক গুরু গুরু করিতে লাগিল।

আবার সে অস্ফুট স্বরে বলিল, 'না না রাজকুমার, এখন নয়...নিশীথে আইও ফুলবনে......'

নাভি হইতে তালু পর্যন্ত শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল। সত্যই তো, এ নারী আমার সম্পূর্ণ অপরিচিতা; চোখে যেমন নূতন দেখার স্বাদ পাইতেছি, মনেও তাই। কি আশ্চর্য! দশ বৎসর বিবাহ করিয়াছি, একসঙ্গে উঠিতেছি বসিতেছি, একদিনের জন্য কখনও ছাড়াছাড়ি হই নাই—অথচ—

হঠাৎ দারুণ ভয় হইল। তবে কি এ সে নয়? এতদিন ধরিয়া যাহাকে চিনিবার ভান করিয়াছি সত্যই তাহাকে চিনি না?

নিদ্রিতার গায়ে প্রবল একটা নাড়া দিয়া বলিলাম, 'ওগো, তিনটে বেজে গেল—ওঠ ওঠ!'

গৃহিণী নিদ্রা ভাঙিয়া সটান উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন, 'এসেছ? পাওনাদার মিন্‌সে এসেছিল—বলে গেছে—'

এই তো আমার চির-পরিচিতা! প্রকাণ্ড হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। বলিলাম, 'চুলোয় যাক্ পাওনাদার। এখন চট্ করে এক পেয়ালা চা তৈরি করে দাও তো দেখি। গলাটা ভারি শুকিয়ে গেছে।'

ঘড়ি

'আর্য সিকিউরিটি সংঘ' নামক লিমিটেড কোম্পানীর অফিস ভবনে ত্রিতলে একটি সুপরিসর কক্ষ। কক্ষটি বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স্-এর মন্ত্রণাগৃহ বা মীটিং রুম। ঘরের মধ্যস্থলে একটি ডিম্বাকৃতি টেবিল ঘিরিয়া কোম্পানীর পাঁচজন ডিরেক্টর বসিয়া আছেন; তিনকড়িবাবু সভাপতি—তাঁহার তিন থাক চিবুক, বড় বড় গোঁফ এবং উন্নত স্তন। ইনি কোম্পানীর হর্তাকর্তা; বাকি চারজন ডিরেক্টর অর্থাৎ রসময় বসাক, প্রাণহরি চৌধুরী, ঝাপড়মল কাপড়িয়া (মারোয়াড়ী) ও চতুর্ভুজ মেহতা (গুজরাতি) ইঁহারা তিনকড়িবাবুর ব্যক্তিত্ব ও দূরদর্শী বাণিজ্য-প্রতিভার নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া শেষ পর্যন্ত তাঁহারই কথায় সায় দিয়া থাকেন। আরও এক বিষয়ে সকলের মধ্যে ঐক্য দেখা যায়—সকলেই স্থূল কলেবর এবং অল্পবিস্তর পীন পয়োধরাঢ্য।

রাত্রিকাল; দেয়ালের ঘড়িতে সাড়ে আটটা বাজিয়াছে। ঘড়ির ঊর্ধ্বে দেয়ালের গায়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা A.S.S. Ltd. ঘড়ির নীচে একটি অগ্নি-প্রুফ সিঁদেল-প্রুফ লোহার সিন্দুক। ঘরের বিভিন্ন দেয়ালে চারিটি দরজা; তন্মধ্যে বাঁ-ধারের দরজাটি সদর দরজা, উহা বর্তমানে ভেজানো রহিয়াছে; বাকি দরজা তিনটি দিয়া পাশের ঘর-গুলির কিয়দংশ দেখা যাইতেছে।

ঝাপড়মল কাপড়িয়া প্রথম কথা কহিলেন। ইনি একজন ভোজন রসিক; প্রচুর অর্থ থাকা সত্ত্বেও অকালে জীবন সম্ভোগ-ক্রিয়ায় অসমর্থ হইয়া পড়ায় ইনি এখন একান্ত-ভাবে ভোজন ও ভুক্তবস্তুর পরিপাকে মনঃসংযোগ করিয়াছেন।

ঝাপড়মলঃ তিনকৌড়িবাবু, আপুনে আজ রাত্তির বেলা মীটিং কল্ করিলেন, হামার আবার নয়টার পর ঘুমালে হোজম হোয় না।

তিনকড়িঃ রাত্তিরে মীটিং কল্ করবার বিশেষ কারণ আছে, ঝাপড়মল্‌জি; ব্যাপারটা গোপনীয়।

ঝাপড়মলঃ তো কী গুফ্‌ত গু আছে জল্‌দি জল্‌দি শুরু করিয়ে দেন—রাত তো বহুত হৈল!

তিনকড়িঃ এই যে শুরু করি। কিন্তু তার আগে—

তিনকড়িবাবু টেবিলের পাশে বৈদ্যুতিক কল্-বেল্ টিপিলেন। ঘরের বাইরে কিড়িং কিড়িং শব্দ হইল। কয়েক মুহূর্ত পরে ভেজানো দরজায় টোকা মারিয়া একটি অল্প-বয়স্ক শীর্ণকায় কেরানী প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া ক্ষুধার্ত মনে হয়; হয়তো সেই সকালবেলা আহার করিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়াছিল, তারপর আর পেটে কিছু পড়ে নাই। তাহার নাম চরণদাস বিশ্বাস; সে তিনকড়িবাবুর সবচেয়ে অনুগত কেরানী, তাই তাহার অফিসে আসাযাওয়ার সময়ের কিছু ঠিক নাই। মাহিনা পঁয়ত্রিশ টাকা। আশায় ভর করিয়া চরণদাস অনন্যমনে প্রভুর সেবা করিয়া চলিয়াছে। প্রভুও ইঙ্গিতে ভরসা দিয়াছেন, এই ভাবে কাজ করিয়া চলিলে কোনও এক অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতে চাকরি পাকা হইতে পারে। চরণদাস তাহাতেই কৃতার্থ—

চরণদাসঃ আজ্ঞে—?

তিনকড়িঃ বিশ্বাস, অফিসে কেউ আছে?

চরণদাসঃ আজ্ঞে অ্যাকাউণ্টেণ্টবাবু এতক্ষণ ছিলেন; তাঁর হিসেব মিলছিল না। তিনি এই গেলেন।

তিনকড়িঃ এখন তাহলে অফিসে আর কেউ নেই?

চরণদাসঃ আজ্ঞে না, সবাই চলে গেছে। আমাকে থাকতে বলেছিলেন—তাই।

তিনকড়িঃ বেশ—শোনো এখন। তুমি নীচে গিয়ে সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকো! কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন লোক এসে আমার নাম করবে; ফরসা রং, মাথায় কোঁকড়া চুল, বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। সে এলেই বেল্ টিপে আমাদের খবর দেবে—তারপর তাকে সঙ্গে করে ওপরে নিয়ে আসবে।

চরণদাসঃ যে আজ্ঞে—

চরণদাস সন্তর্পণে দরজা ভেজাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল। প্রাণহরি চৌধুরী একটু অধীর হইয়া উঠিতেছিলেন। বেশী রাত্রি পর্যন্ত বাড়ির বাহিরে থাকিতে তিনি ভালবাসেন না। তাঁহার একটি বাই আছে; গৃহিণীর বয়স চল্লিশ পার হইয়া গেলেও তাঁহার সম্বন্ধে প্রাণহরিবাবুর মন এখনও অসন্দিগ্ধ হয় নাই। রাত্রে বাড়ি ফিরিতে একটু দেরি হইলেই নানাপ্রকার সন্দেহ তাঁহার মনে জটলা পাকাইতে থাকে।

প্রাণহরিঃ এত লুকোচুরি কিসের—কে লোকটা? হঠাৎ—

ঝাপড়মলঃ ওহি তো হামিভি ভাবছে—হ্যাঠাৎ! তিনকৌড়িবাবু, আপ্ হ্যাঠাৎ কোন্ আদমিকো বোলায়া—ক্যা মতলবসে—কুছু পাতা তো বাৎলান! হ্যাঠাৎ—

চতুর্ভুজ মেহতা এবার কথা কহিলেন। ইহার ধ্যানজ্ঞান সমস্ত জুড়িয়া বসিয়া আছে রেসের ঘোড়া; তাই তাঁহার প্রত্যেক কথার মধ্যে ঐ চতুষ্পদ জন্তুটির ক্ষুরধ্বনি পাওয়া যায়।

চতুর্ভুজঃ এ মানস্ কোন ছে, তিনু শেঠ? ডার্ক্ হর্স্ মালুম হোয়।

তিনকড়িঃ সেই কথা বলবার জন্যেই তো আজ আপনাদের ডেকেছি—ডার্ক্ হর্স্ না হলে এত সাবধান হবারই বা কি দরকার ছিল?

রসময়ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, কি বলবেন চট্ করে আরম্ভ করে দিন; আমার আবার সাড়ে নয়টার মধ্যে—

তিনি তীক্ষ্ন উৎকণ্ঠায় ঘড়ির পানে তাকাইলেন। রসময় বসাক মহাশয় রাত্রিকালে গৃহে শয়ন করেন না, যেখানে শয়ন করেন, সেখানে পৌঁছিতে দেরি হইলে বেদখল হইবার সম্ভাবনা।

তিনকড়িঃ হ্যাঁ, এই যে আরম্ভ করি। ব্যাপারটা বড় জটিল, গোড়া থেকে বেশ গুছিয়ে বলা দরকার—

তিনকড়িবাবু তাঁহার বিপুল দেহভার চেয়ার হইতে উত্তোলিত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি একটু নাটুকে ভঙ্গীতে বক্তৃতা দিতে ভালবাসেন, এ বিষয়ে স্বর্গীয় নট অমর দত্ত তাঁহার আদর্শ। যৌবন-কালে তিনি সখের অভিনেতা হিসাবে বেশ নাম করিয়াছিলেন। এখন ভীম সাজিতে লজ্জা করে, কিন্তু বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স-এর মিটিং থাকিলেই তিনি সহজ ভাষায় বক্তব্য প্রকাশ না করিয়া এই ছুতায় একটু নাটকীয় অভিনয় করিয়া লয়েন।

তিনকড়িঃ বন্ধুগণ, দেখিতে দেখিতে সুখ-স্বপ্নের মত পাঁচটা বছর কাটিয়া গেল। আমাদের সাধের আর্য সিকিউরিটি সংঘ—যাহাকে আমাদের শত্রুপক্ষ Ass অর্থাৎ গাধা লিমিটেড বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া থাকেন—সেই গাধা লিমিটেড আজ শত্রুর সমস্ত অবজ্ঞা নিষ্কলুষিত করিয়া, শত্রুর ভবিষ্যদ্বাণী ভূমিষ্ঠপাত করিয়া বন্ বন্ শব্দে এরোপ্লেনের মত আকাশে উড়িতেছে—

রসময়ঃ কি মুস্কিল—আসল কথাটা শুরু করুন না; এদিকে যে ঘড়িতে—

তিনকড়িঃ যে ক্ষুদ্র চারা গাছ আমরা বুকের রক্ত দিয়া রোপন করিয়াছিলাম

তাহা আজ আকাশ চুম্বনকারী শাল্মলীতরুর ন্যায় ফলে ফুলে সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছে। কী করিয়া ইহা সম্ভব হইল? কোন্ অমানুষিক উপায়ে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বী-দের পদদলিত করিয়া ব্যবসায় বৃক্ষের মগডালে উঠিতে সমর্থ হইলাম?

ঝাপড়মলঃ সে তো হাম সোবাই জানে—

চতুর্ভুজঃ হ্যাঁ, মুর্দা ঘোড়াকে চাবুক মারিলে কতো দৌড়িবে, তিনু ভাই? ইবার নয়ী কহানি শুরু করেন।

তিনকড়িঃ আপনাদের স্মরণ থাকিতে পারে, আরম্ভের দিকে আমাদের ব্যবসা ভাল চলিতেছিল না। এই সময় এক বৈজ্ঞানিক ছোকরাকে আমি আপনাদের কাছে লইয়া আসি। এই যুবক এক ডাক্তারি মলম আবিষ্কার করিয়াছিল—যুবতীগণের যৌবন রক্ষার এক অদ্ভুত মুষ্টিযোগ! কিন্তু আপনারা এই যুবকের দুর্ভিক্ষপীড়িত শীর্ণ চেহারা দেখিয়া তাহার কথায় বিশ্বাস করেন নাই। আমি জোর করিয়া তাহার মলম আমাদের সকলের উপর পরীক্ষা করাইয়াছিলাম। ফলে—

প্রাণহরিঃ ফলের কথা আর বলে কাজ নেই।

তিনকড়িঃ কেন কাজ নেই—নিশ্চয় আছে। (সাধু ভাষায়) ঔষধের অত্যাশ্চর্য ফল যখন আমাদের সকলের অঙ্গে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল, যখন মলমের মহিমা সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ রহিল না, তখন আমরা মাত্র দুই শত টাকা মূল্যে ঐ দরিদ্র যুবকের নিকট হইতে তাহার স্বত্ব কিনিয়া লইলাম। সেই দিন হইতে আমাদের ভাগ্য ফিরিয়া গেল; আমাদের শত্রুপক্ষ সাফল্যের সহিত পশ্চাদপসরণ করিল। আমরা মলমের নাম রাখিলাম—কুচকাওয়াজ। সেই কুচকাওয়াজ—আমাদের সাধের কুচকাওয়াজ আজ বাঙলার ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছে। হাজার হাজার টাকা মুনাফা আমরা কুচকাওয়াজের প্রসাদে অর্জন করিয়াছি। এই যে ইন্দ্রপুরীতুল্য অফিস বাড়ি—যাহার ত্রিতলে বসিয়া আমরা মহানন্দে সভা করিতেছি—এই যে আমাদের দিগ্বিদিক্—অর্থাৎ দিগন্তব্যাপী নাম যশ প্রতিষ্ঠা—এ সকলের মূলে কেবল কুচকাওয়াজ!

রসময়ঃ (অর্ধস্বগত) খেলে কচু, কাজের কথা বলবে না, কেবল কুচকাওয়াজ ক'রে চলেছে। ওদিকে রাত পুইয়ে গেল—

প্রাণহরিঃ তিনকড়িবাবু, এবার একটু তাড়াতাড়ি আসল কথাটা আরম্ভ করে দিন; যার আসবার কথা সে হয়তো এতক্ষণ এসে পড়ল—

তিনকড়িঃ সংক্ষেপেই তো বলছি। আপনারা একটুতেই হাঁপিয়ে ওঠেন; আপনাদের মত ব্যস্ত-সমস্ত স্বভাব নিয়ে ব্যবসা করতে যাওয়া বাতুলতা—শাস্ত্রে বলেছে—

প্রাণহরিঃ জানি জানি, আপনি আবার অন্য কথা আরম্ভ করবেন না; যা বল-ছিলেন তাই বলুন—কুচকাওয়াজ শেষ করুন।

ঝাপড়মলঃ একটা কথা পুছ করি, তিনকৌড়িবাবু। ঐ ছোকরাঠো কিধার গিয়া? উসকো দেকে ঔর একটা মলম যদি তৈয়ার করিয়ে নিতে পারেন তো লাখ লাখ রুপা উপায় হোয়—

তিনকড়িঃ তার খোঁজ করিয়েছিলাম; জানা গেল, ছোকরা যক্ষ্মা রোগে মারা গেছে। (সাধু ভাষায়) কিন্তু মরুক সে, তাহাতে কিছু আসে যায় না। একজন মরিলে আর একজন আসিবে—ইহাই জগতের নিয়ম। সেই কথাই বলিবার জন্য আজ এই এই মীটিং আহ্বান করিয়াছি।

চতুর্ভুজঃ আহ্হা—ডব্‌ল টৌট! তিনু ভাই ডবল্ টৌট মারিবার মতলব করিয়ে-ছেন—!

তিনকড়িঃ হ্যাঁ। আর একটি বৈজ্ঞানিক ছোকরাকে পাকড়াও করিয়াছি। যুবক

রুশ দেশে গিয়াছিল; সেখানে কোনও বৈজ্ঞানিক গবেষণা-মন্দির হইতে এক অদ্ভুত আবিষ্কার চুরি করিয়া পলাইয়া আসিয়াছে—

রসময়ঃ (সপ্রশংস কণ্ঠে) খলিফা ছেলে তো!—রাশিয়ানদের ঘাড় ভেঙেছে—!

প্রাণহরিঃ কিন্তু চোরাই মাল—

তিনকড়িঃ কে জানিবে চোরাই মাল—আমরা উহার পেটেণ্ট লইয়া রীতিমত আইন-সঙ্গতভাবে ব্যবসা করিব। কাহার সাধ্য আমাদের ধরে!

প্রাণহরিঃ ধরা না পড়লেই ভাল। আবিষ্কারটা কী?

তিনকড়িঃ অদ্ভুত আবিষ্কার—বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ! আজকাল এই যন্ত্রের যুগে কত রোমহর্ষণ কাণ্ডই না হইতেছে! আমরা আকাশে উড়িতেছি, সমুদ্রে ডুব-সাঁতার কাটিতেছি, শূন্যে ফসল ফলাইতেছি—কিছুতেই আশ্চর্য হইতেছি না। কিন্তু এই নবীন আবিষ্কারক যে অত্যাশ্চর্য যন্ত্র আমাদের কাছে আনিতেছে, তাহার কথা শুনিলে আপনারা একেবারে চমৎকৃত হইয়া যাইবেন।—ইহা একটি ঘড়ি!

সকলেই উৎসুক হইয়া একটা অভাবনীয় কিছুর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, ঘড়ি শুনিয়া নিরাশভাবে একবাক্যে প্রতিধ্বনি করিলেন—ঘড়ি!

তিনকড়িঃ হ্যাঁ, ঘড়ি। আপনারা অ্যালার্ম ঘড়ির কথা জানেন; দম দিয়া রাত্রে শয়ন করিলে সকালবেলা ঠিক সময়ে ঘুম ভাঙাইয়া দেয়! এ ঘড়ি আরও বিস্ময়কর; দম দিয়া শয্যার পাশে রাখিয়া শয়ন করুন, পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘুম পাড়াইয়া দিবে।

সকলে কিছুক্ষণ নির্বাক; তারপর ঝাপড়মল প্রথম কণ্ঠস্বর ফিরিয়া পাইলেন।

ঝাপড়মলঃ আপনে বোলেন কি, তিনকৌড়িবাবু! ঘড়ি হামাকে শুতিয়ে দিবে—এঁ?

রসময়ঃ ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি!

চতুর্ভুজঃ তাজ্জব হে! ঘড়িমে ভি ডোপ্ আছে কী?

তিনকড়িঃ তা না হলে আর বলছি কি! এই অদ্ভুত আবিষ্কার ছোকরা চুরি করে এনেছে—(সাধু ভাষায়) ভাবিয়া দেখুন এই আবিষ্কারের বিপুল সম্ভাবনা! আজকাল অনিদ্রা রোগ সভ্য মানুষের প্রধান রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; চিন্তা-জর্জরিত কর্মক্লান্ত মানব শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রার আরাধনা করিতেছে, কিন্তু নিদ্রাদেবী দেখা দিতেছেন না। ডাক্তারি ঔষধে কোনই ফল হয় না; উপরন্তু স্নায়ুর জটিলতা বাড়িয়া যায়। এরূপ অবস্থায় এই ঘড়ি মৃতসঞ্জীবনী সুধার কাজ করিবে; শয্যায় শয়ন করিয়া ঘড়ি চালাইয়া দিন—ঘড়ি হইতে মৃদু মৃদু স্বর্গীয় সংগীত উত্থিত হইবে—ব্যস্, শুনিতে শুনিতে পাঁচ মিনিটের মধ্যে আপনি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইবেন। আপনাদের আর অধিক কি বলিব আপনারা জ্ঞানী, গুণী, মনস্বী। এই ঘড়ি বাজারে বাহির হইলে ইহার জন্য কিরূপ কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইবে, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারেন।

প্রাণহরিঃ সে সব তো পরের কথা। আপনি ঘড়ি পরখ করে দেখেছেন?

তিনকড়িঃ পরীক্ষা করিবার জন্যই তো আজ নিশীথকালে এই সভা আহ্বান করিয়াছি। আপনারা সকলে পরীক্ষা করিয়া দেখুন; যুবক ঘড়ি লইয়া এখনি আসিবে; এইখানেই তাহার পরীক্ষা হইবে।

চতুর্ভুজঃ ই তো সারু বাত আছে। ঘোড়া পন্ ঘড়ি দোন্ বরাবর, কেম্ দৌড়ে দেখনেসে পতা লগে।

প্রাণহরিঃ কত দাম চায় কিছু বলেছে?

তিনকড়িঃ দামের বেলাতেই মোচড় দিচ্ছে, বলে দশ হাজারের কম নেবে না। আর আজ রাত্রেই লেখাপড়া সব শেষ করে ফেলতে চায়। বলে, আপনারা যদি না নেন,

অন্য লোক আছে।

রসময়ঃ হুঁ, গরম বেশী দেখছি, রাশিয়া ঘুরে এসেছে কিনা। একবার ওদিকে পা বাড়ালেই বেটাদের মাথা ঘুরে যায়। কুচকাওয়াজের বেলায় কিন্তু—

ঝাপড়ুমলঃ হ্যাঁ, দেখেন না, কুচকাওয়াজ কোত্তো সস্তা মিলা থা—উ তো বিলকুল ফোকট্‌মে মিলা থা!

তিনকড়িঃ তা বটে, কিন্তু সব জিনিস তো ফোকটে পাওয়া যায় না, ঝাপড়ুজি। আর এ ঘড়ি যদি সত্যি হয়, পঞ্চাশ লক্ষ টাকা লাভ তো বাঁধা। সে হিসেবে দশ হাজার টাকা জলের দর। তবে যদি আপনারা অমত করেন—

চতুর্ভুজঃ নেহি নেহি, তিনুভাই, বাত ই আছে কি অড্‌স যতো ভালা মিলে ওতোই মজা, পন্‌ যদি না মিলে তো কী উপায়!

তিনকড়িঃ তাহলে আপনাদের সকলের মত আছে?

সকলে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দিলেন।

তিনকড়িঃ আমি জানতাম আপনাদের অমত হবে না। তাই আগে থাকতেই দলিল তৈরি করিয়ে দশ হাজার টাকা এনে সিন্দুকে রেখেছি, সে আবার চেক নেবে না। আজ রাত্রেই এ ব্যাপারের নিষ্পত্তি করে ফেলা ভাল; নইলে হয়তো হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।

এই সময় দ্বারের নিকট বৈদ্যুতিক ঘণ্টি বাজিয়া উঠিল। তিনকড়িবাবু উপবেশন করিলেন। আর সকলে উৎসুকভাবে খাড়া হইয়া বসিলেন।

তিনকড়িঃ এসে পড়েছে। আপনারা বেশী আগ্রহ দেখাবেন না; বলা-কওয়া আমিই করব।

ঝাপড়ুমলঃ জয় গণেশ!

দ্বার ঠেলিয়া চরণদাস প্রবেশ করিল; সঙ্গে একটি যুবক। যুবকের ধুতি মালকোঁচা মারা, খদ্দরের পাঞ্জাবির উপর জহরলালী কুর্তা, হাতে একটি ছোট হ্যান্ডব্যাগ। যুবকের চেহারায় এমন কোনও বিশেষত্ব নাই; বাঙলাদেশে এরূপ একটি টাইপ মাঝে মাঝে দেখা যায়। রং ফরসা, মাথার চুল কাফ্রির মত কোঁকড়ানো, তাই সহসা তাহাকে বিরল-কেশ বলিয়া মনে হয়; মুখের হাড় শক্ত, যেন পেটাই করা।

তিনকড়িঃ আসুন মনুজবাবু। চরণদাস, তুমি নীচে গিয়ে বসো। আর কাউকে ওপরে আসতে দেবে না।

চরণদাসঃ যে আজ্ঞে—এঁ—বেশী রাত হবে কি? বাড়িতে মা'র অসুখ, ওষুধ নিয়ে যেতে হবে।

তিনকড়িঃ (ধমক দিয়া) যা বল্‌ছি কর।

চরণদাসঃ আজ্ঞে—

দীননেত্রে একবার ঘড়ির দিকে তাকাইয়া সে দ্রুত প্রস্থান করিল। তিনকড়িবাবু তখন আগন্তুককে সকলের কাছে পরিচিত করিলেন—

তিনকড়িঃ ইনিই হচ্ছেন শ্রীযুক্ত মনুজ কর—রাশিয়া ফেরত বৈজ্ঞানিক; আর এঁরা হচ্ছেন 'আর্য সিকিউরিটি সংঘে'র ডিরেক্টর—শ্রীপ্রাণহরি চৌধুরী, শ্রীচতুর্ভুজ মেহতা, শ্রীরসময় বসাক, শ্রীঝাপড়ুমল্‌ কাপড়িয়া।

মনুজ কর একবার নড্‌ করিল; অন্য পক্ষ কেবল নিষ্প্রাণ মৎস্যচক্ষু মেলিয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন।

মনুজঃ দরজা বন্ধ করে দিতে পারি?

অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই সে দরজায় ছিটকিনি লাগাইয়া দিল; তারপর

নিকটে আসিয়া হ্যাণ্ডব্যাগটি টেবিলের উপর রাখিল।

মনুজঃ আমার যন্ত্র আপনাদের দেখাবার আগে আমি টাকার কথা পাকা করে নিতে চাই। টাকা এনেছেন তো?

তিনকড়িঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, সেজন্যে আপনি ভাববেন না, টাকা মজুদ আছে--নগদ টাকা। (ইঙ্গিতে লোহার সিন্দুক দেখাইলেন) এখন আপনার যন্ত্র আমাদের পছন্দ হলেই—

মনুজঃ যন্ত্র পছন্দ না হয়ে উপায় নেই—হতেই হবে।

মনুজ কর ব্যাগ খুলিয়া একটি ঘড়ি বাহির করিল। নিতান্ত সাধারণ এলার্ম ঘড়ি; যেরূপ ঘড়ি পরীক্ষার সময় মাথার শিয়রে রাখিয়া ছাত্রেরা শয়ন করে। মনুজ ঘড়ির এলার্মে দম দিতে দিতে দাঁত বাহির করিয়া হাসিল।

মনুজঃ আমি তিনকড়িবাবুকে বলেছিলাম আমার ঘড়ি আপনাদের ঘুম পাড়িয়ে দেবে। কথাটা হয়তো পুরোপুরি সত্যি নয়, তবে এ ঘড়ি আপনাদের মনে চমক লাগিয়ে দিতে পারবে, এ বিশ্বাস আমার আছে। আসলে এটি ঘড়ি নয়--বোমা; যাকে বলে টাইম-বম্ব্!

মনুজ ঘড়িটি টেবিলের মধ্যস্থলে রাখিল। সকলে হতভম্ব হইয়া ক্ষণকাল সেইদিকে তাকাইয়া রহিলেন; তারপর ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

তিনকড়িঃ অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ—

রসময়ঃ আরে খেলে কচু!

ঝাপড়মলঃ লা হোল্ বিলাকুবৎ!

মনুজঃ (শান্তকণ্ঠে) ঘড়িতে দম দিয়ে দিয়েছি, ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যে বোমা ফাটবে।

আর কেহ দাঁড়াইলেন না, খোলা দরজাগুলি দিয়া মুহূর্তে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। কেবল তিনকড়িবাবু সদর দরজার দিকে দৌড়িয়াছিলেন, মনুজ তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল।

মনুজঃ এদিকে নয় ওদিকে; নীচে গিয়ে পুলিস ডাকবেন সেটি হচ্ছে না। আর সিন্দুকের চাবিটা দিয়ে যান।

তিনকড়িঃ বেল্লিক, বদ্মায়েস্, বোম্বেটে।

কদর্য গালাগালি দিতে দিতে তিনকড়িবাবু পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া দিলেন এবং অন্যান্য ডিরেক্টরদের মত পাশের একটা ঘরে লুকাইলেন।

চাবি পাইয়া মনুজ আর দেরি করিল না, ক্ষিপ্রহস্তে কাজ আরম্ভ করিয়া দিল। সিন্দুক খুলিয়া দেখিল, সম্মুখেই কয়েক তাড়া নোট রহিয়াছে। সে প্রত্যেকটি তাড়া মোটামুটি গণিয়া লইয়া নিজের ব্যাগে ভরিতে লাগিল। ভরা শেষ হইলে ব্যাগ বন্ধ করিয়া সে একবার চারিদিকে চাহিল; তাহার মুখে একটা কঠিন হাসি ফুটিয়া উঠিল। পকেট হইতে একটি চিঠি বাহির করিয়া সে টেবিলে ঘড়ির নীচে চাপা দিয়া রাখিল; তারপর ব্যাগ হাতে লইয়া বহির্দ্বারের পানে চলিল। দ্বারের ছিটকিনি খুলিয়া, ভিতরের দিকে ফিরিয়া সে উচ্চকণ্ঠে বলিল,—

মনুজঃ আপনারা এবার ফিরে আসতে পারেন, আমার কাজ হয়ে গেছে। ঘড়িটা একেবারে অহিংস, নিরামিষ ঘড়ি; ফাটবে না।

মনুজ উচ্চকণ্ঠে একবার হাসিয়া বাহির হইয়া গেল।

কিয়ৎকাল ঘর শূন্য। তারপর দরজাগুলির নিকট সন্ত্রস্ত মুণ্ড দেখা যাইতে লাগিল। ক্রমে সকলে সন্তর্পণে ঘরে পদার্পণ করিলেন। সন্দেহ, আশ্বাস, ক্রোধ, কি-জানি-কি-ঘটিবে এমনি একটা স্নায়বিক শঙ্কা মিলিয়া তাহাদের বিচিত্র মনোভাব এবং আনুষঙ্গিক অঙ্গভঙ্গি বর্ণনা করা অসম্ভব।

তিনকড়িঃ গেছে শালা, পাজি; নচ্ছার হারামজাদা!

ঝাপড়মলঃ চোট্টা ডাকু আওয়ারা!

রসময়ঃ গুণ্ডা বর্গী বোম্বাের!

প্রাণহরিঃ সিন্দুক তো ফাঁক করে দিয়ে গেছে দেখছি।

আর একপ্রস্থ অকথ্য গালাগালি বর্ষণ হইল। সকলেই বিভিন্ন দিক হইতে টেবিলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

রসময়ঃ যাবার সময় কী বলে গেল ব্যাটা, ঘড়িটা নিরামিষ?

প্রাণহরিঃ ভুল্‌কুনি দিয়ে টাকাগুলো নিয়ে গেল, বেইমান ব্যাটাচ্ছেলে!

তিনকড়িঃ পুলিসে দেব, জেলে পাঠাব স্কাউণ্ড্রেলকে! বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা, পীরের কাছে মাম্‌দোবাজী।

চতুর্ভুজঃ থাম্বা থাম্বা তিনু শেঠ। চিল্লানেসে কী হোবে? পঞ্ছী তো উড়িয়ে গেল।

প্রাণহরিঃ হ্যাঁ, এখন কিল খেয়ে কিল চুরি ছাড়া উপায় নেই; এ কেলেঙ্কারি জানাজানি হয়ে গেলে বাজারে আর মুখ দেখানো যাবে না। পুলিস হয়তো শেষ পর্যন্ত চোরাই মাল কিন্‌তে গেছলাম বলে আমাদেরই ধরে টানাটানি করবে।

রসময়ঃ ঘড়ির তলায় একটা কাগজ রয়েছে না?

প্রাণহরিঃ তাই তো মনে হচ্ছে। তিনকড়িবাবু, দেখুন না, হয়তো কিছু লিখে রেখে গেছে।

তিনকড়িঃ আমি দেখব! বেশ লোক তো আপনি! আর ঘড়ি যদি ফাটে—?

রসময়ঃ না না ফাটবে না—নিরামিষ ঘড়ি। ফাটবার হলে এতক্ষণ ফাট্‌ত না?

তিনকড়িঃ বলা যায় না, শয়তান-ব্যাটা হয়তো মতলব করেই ঘড়ির তলায় চিঠি রেখে গেছে। ঘড়িতে হাত দিলেই—

প্রাণহরিঃ কিন্তু এ আপনার কর্তব্য; আপনি আমাদের চেয়ারম্যান। আপনি যদি না করেন তখন বাধ্য হয়ে পুলিস ডাকতে হবে—

রসময়ঃ ঠিক কথা। সিন্নি দেখে এগিয়েছিলেন, এখন কোঁৎকা দেখে পেছুলে চল্‌বে কেন?

ঝাপড়মলঃ ডর খাচ্ছেন কেনো, তিনকৌড়িবাবু।—হাম্‌রা ভি তো আছি। এগিয়ে যন—এগিয়ে যান—

হঠাৎ চড়্‌বড়্‌শব্দে ঘড়ির এলার্ম বাজিয়া উঠিল। সকলে ঊর্ধ্বশ্বাসে দরজার দিকে ছুটিলেন। কিন্তু ঘড়ি ফাটিল না; কযেক সেকেণ্ড পরে এলার্ম থামিয়া গেল। সকলে আবার ফিরিলেন।

প্রাণহরিঃ দেখলেন তো, নেহাৎ মামুলি এলার্ম ঘড়ি; ব্যাটা দম দিয়ে রেখে গেছল। নিন্‌, এগোন—কোনও ভয় নেই।

তিনকড়িবাবু সৃক্কণী লেহন করিলেন।

তিনকড়িঃ—হুঁ—আচ্ছা—আমি দেখি—

অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে কয়েকবার হাত বাড়াইয়া এবং হাত টানিয়া লইয়া শেষে তিনকড়িবাবু চিঠিখানি ঘড়ির তলা হইতে উদ্ধার করিলেন। বাকি সকলে অলক্ষিতে পিছু হটিয়া প্রায় দেয়াল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; এখন আবার আসিয়া তিনকড়ি-বাবুকে ঘিরিয়া ধরিলেন—

চতুর্ভুজঃ কাগজ মে সুঁ আছে, তিনু ভাই, পোঢ়েন না।

তিনকড়িবাবু চিঠির ভাঁজ খুলিয়া কিছুক্ষণ তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন,

তারপর বিরাগপূর্ণ কণ্ঠে পড়িতে আরম্ভ করিলেন—

তিনকড়িঃ সবিনয় নিবেদন—হুঃ!—

প্রথমেই আমার প্রকৃত পরিচয় আপনাদের জানাতে চাই। যে হতভাগ্য যুবকের নিকট হইতে দুই শত টাকা মূল্যে আপনারা কুচকাওয়াজের স্বত্ব কিনিয়া লইয়াছিলেন, আমি তাঁহারই ছোট ভাই। আমার দাদার প্রতিভার ফলে আজ আপনারা বড়মানুষ; আর তিনি অন্নাভাবে যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

আপনাদের এই রক্তমাখা টাকা আপনারা কিভাবে সদ্ব্যয় করেন তাহাও আমি জানি। তিনকড়িবাবু থিয়েটার দলের অভিনেতা অভিনেত্রীদের পিছনে অজস্র টাকা খরচ করেন—তার উপর রায় বাহাদুর হইবার চেষ্টায়—

ঝাপড়মলঃ আরে ঠিক পাকড়া হ্যায়!

তিনকড়িঃ (ক্রুদ্ধভাবে) হ্যাঁ, খরচ করি। আমার টাকা আমি খরচ করি, কার বাবার কী!

প্রাণহরিঃ হ্যাঁ হ্যাঁ—তারপব পড়ুন—

তিনকড়িঃ প্রাণহরিবাবু নিজের স্ত্রীকে এখনও সন্দেহ করেন, তাই তাঁহাকে খুশি রাখিবার জন্য মাসে এক হাজার টাকার গহনা ও বস্ত্রাদি কিনিয়া দেন।

সকলের হাস্য।

তিনকড়িঃ শুনুন আরও আছে। চতুর্ভুজ মেহতা রেসের ঘোড়ার পিছনে বৎসবে বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় করেন। ঝাপড়মল কাপড়িয়া অকালে শক্তিহীন হইয়া এখন হজমি গুলি ও হকিমি দাওয়াইয়ের জন্য মাসিক দুই হাজার টাকা খরচ করিয়া থাকেন। রসময় বসাক ইহুদী উপপত্নীকে বারো শত টাকা বেতন দেন—

রসময়ঃ মিথ্যে কথা—মিথ্যে কথা—

ঝাপড়মলঃ বিল্‌কুল ঝুট্—

তিনকড়িঃ যে টাকা আমি আজ লইয়াছি, আপনাদের পক্ষে তাহা কিছুই নয়। কিন্তু শুনিয়া সুখী হইবেন, এই টাকা সৎকার্যে খরচ হইবে। আমি সত্যই একজন বৈজ্ঞানিক; এমন কোনও বিষয় লইয়া গবেষণা করিতেছি যাহাতে টাকার প্রয়োজন। আপনাদের নিকট বা আপনাদের মত অন্য কোনও ধনিকের নিকট হাত পাতিলে আপনারা টাকা দিতেন না; তাই এই উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে।

এ টাকা আর ফেরত পাইবেন না; পরিবর্তে এই ঘড়িটি আপনাদের দান করিলাম। ওটি স্মরণ চিহ্নস্বরূপ রক্ষা করিবেন, হয়তো মাঝে মাঝে সৎকার্যে টাকা খরচ করিবার ইচ্ছা জন্মিতে পারে। ইতি

চিঠি পড়া শেষ হইলে তিনকড়িবাবু দাঁত কড়মড় করিতে করিতে কাগজখানা দু'হাতে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

তিনকড়িঃ শালা! হারামজাদা! আমাদের ঘড়ি দান করেছেন!

ক্রোধান্ধ তিনকড়িবাবু ঘড়িটা তুলিয়া লইয়া মেঝেয় আছাড় মারিবার উপক্রম করিলেন। সকলে সন্ত্রাসে 'হাঁ হাঁ' করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন।

রসময়ঃ করেন কি? মাথা খারাপ হয়েছে না কি?

তিনকড়িঃ (থতমত) কেন—কি হয়েছে?

রসময়ঃ বলা তো যায় না, যদি ওর মধ্যে বোমা-টোমা কিছু থাকেই,—আছাড় মেরে শেষে প্রলয় ঘটাবেন!

তিনকড়ি সভয়ে ঘড়িটি টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন।

প্রাণহরিঃ এখন কথা হচ্ছে এ ঘড়ি নিয়ে কি করা যায়! হতে পারে নিতান্ত সহজ

ঘড়ি, আবার নাও হতে পারে। এখানে রেখে গেলেও বিপদ; রাত্রে যদি ফাটে লংকাকাণ্ড হবে—অফিস বাড়ি কিছুই থাকবে না—

রসময়ঃ জানালা গলিয়ে রাস্তায় ফেলে দিলে হয় না?

প্রাণহরিঃ হুঃ, রাস্তায় ফাটুক আর আমরা বাড়িসুদ্ধ হুড়মুড় করে রসাতলে যাই! আচ্ছা এক ফ্যাচাং লাগিয়ে রেখে গেল, হতভাগা শয়তান; টাকাকে টাকা গেল তার ওপর আবার—

সকলেই বিমর্ষভাবে চুপ করিয়া রহিলেন। শেষে তিনকড়িবাবু মুখ হাসি হাসি করিয়া বলিলেন—

তিনকড়িঃ দেখুন, আপনারা মিছে ভয় পাচ্ছেন। ঘড়িটা যে একেবারে গান্ধীমার্কা তাতে সন্দেহ নেই। তা আমি বলি কী, আপনারা কেউ ওটা বাড়ি নিয়ে যান না—

রসময়ঃ (রুক্ষস্বরে) আপনিই নিয়ে যান না! আপনি তো নাটের গুরু, নিতে হলে আপনারই নেওয়া উচিত—

তিনকড়িঃ না না, আপনাদের বঞ্চিত করে আমার নেওয়া উচিত নয়। প্রাণহরিবাবু আপনি?

প্রাণহরিঃ বাজে কথা রেখে দিন। আমি বাড়ি চল্‌লাম।

তিনকড়িঃ ঝাপড়মলজী? চতুর্ভুজভাই? দেখিয়ে, ফোকট্‌মে মিলতা হ্যায়।

উভয়ে দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িলেন।

ঝাপড়মলঃ হামলোক ভি ঘর চলা। বহুত রাত হুয়া, রাম রাম।

এই সময় বহির্দ্বারে টোকা পড়িল। চরণদাস দরজা ঈষৎ খুলিয়া মুণ্ড বাড়াইল।

তিনকড়িঃ কে—চরণদাস! কি চাও?

চরণদাস সঙ্কুচিতভাবে প্রবেশ করিল।

চরণদাসঃ আজ্ঞে কিছু নয়। সে-ভদ্রলোক অনেকক্ষণ হল চলে গেছেন, তাই ভাবলাম মিটিং শেষ হতে কত দেরি আছে—।

তিনকড়িবাবু একবার ঘড়ির দিকে একবার চরণদাসের দিকে তাকাইলেন; মুহূর্ত-মধ্যে সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। তিনি গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন—

তিনকড়িঃ মিটিং শেষ হয়েছে। চরণদাস, এদিকে এস।

সঙ্কুচিত উৎকণ্ঠায় চরণদাস নিকটে আসিল।

তিনকড়িঃ আজ মিটিংয়ে আমরা তোমার কর্মনিষ্ঠা এবং প্রভুভক্তি সম্বন্ধে রেজলুশন পাস করেছি। বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স খুশি হয়ে তোমাকে এই ঘড়ি উপহার দিয়েছেন।

চরণদাস এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে একেবারে দিশেহারা হইয়া গেল। গদগদ কৃতজ্ঞতায় সে অনেক কিছুই বলিতে চাহিল কিন্তু বেশী কিছু মুখ দিয়া বাহির হইল না।

চরণদাসঃ আজ্ঞে আপনাদের অনেক দয়া। আপনারা আমার—

তিনকড়িঃ (প্রসন্নকণ্ঠে) হয়েছে হয়েছে। এখন ঘড়ি নিয়ে বাড়ি যাও। এই যে ঘড়ি—নাও, তুলে নাও।

চরণদাস ঘড়ি তুলিয়া লইয়া বুকে চাপিয়া ধরিল।

চরণদাসঃ আমি—আমি আর কি বলব—আপনারা আমার অন্নদাতা—মা-বাপ।

তিনকড়িঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার বাড়ি যাও। কার অসুখ বলছিলে—যাও আর দেরি করো না।

চরণদাস আভূমি নত হইয়া কপালে দু'হাত ঠেকাইয়া সকলকে প্রণাম করিল, তারপর

কৃতজ্ঞতা বিগলিত মুখে ঘড়িটি বুকে ধরিয়া প্রস্থান করিল।

সকলে পরস্পর মুখের পানে চাহিলেন; সকলের মুখেই হাসি ফুটিয়া উঠিল।

১৪ বৈশাখ ১৩৫১

ই চ্ছা শ ক্তি

মনস্তত্ত্বের এক প্রচণ্ড পণ্ডিত বলিলেন, 'ইচ্ছাশক্তির দ্বারা হয় না এমন কাজ নেই। যদি মরীয়া হয়ে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতে পারো, যা চাইবে তাই পাবে। কোনও কাজ করতে হবে না, স্রেফ মনের ইচ্ছাটাকে প্রবল একাগ্র দুর্নিবার করে তুলতে হবে। সেকালের মুনি-ঋষিরা কথাটা জানতেন, তাই রামায়ণ-মহাভারতে এত বর দেওয়া আর শাপ দেওয়ার ছড়াছড়ি।'

পণ্ডিতের কথা সত্য কিনা পরীক্ষা করার প্রয়োজন যত না থাক, নিজের মনে একটা বাসনা লুব্ধভাবে কিছুদিন আনাগোনা করিতেছিল। এমন কিছু জোরালো বাসনা নয়—ভাসা-ভাসা একটা আকাঙ্ক্ষা। ভাবিলাম, দেখাই যাক্ না, কেবলমাত্র ইচ্ছাশক্তি খরচ করিয়া যদি কাম্য বস্তু পাওয়া যায়, মন্দ কি?

কাম্য বস্তুটি অবশ্য এমন কিছু অপ্রাপ্য বস্তু নয়—একটি ফাউণ্টেন পেন্। আমি লেখক; স্বীকার করিতে লজ্জা নাই, আমি ফাউণ্টেন পেন্ ভালোবাসি। আমার একটি ফাউণ্টেন পেন্ আছে; যুদ্ধের আগে কিনিয়াছিলাম। এখনও বেশ ভালোই চলিতেছে। কিন্তু যাহা ভালোবাসি তাহা একটিমাত্র লইয়া কি মন ভরে? সেকালের রাজারা এতগুলি করিয়া বিবাহ করিতেন কেন? বড়মানুষেরা অনেক টাকা থাকা সত্ত্বেও আরও টাকা চায় কেন? আমার মন চাহিতেছিল—আর একটি কলম। কিন্তু যুদ্ধের বাজারে ফাউণ্টেন পেনের দাম যেরূপ চড়িয়া গিয়াছে তাহাতে আমার মতো লেখক তো দূরের কথা, হায়দ্রাবাদের নিজাম ছাড়া আর কেহ কলম কিনিতে পারে বলিয়া তো মনে হয় না।

সুতরাং জোরসে ইচ্ছাশক্তি লাগাইয়া দিলাম। মনে মনে এই আশা উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিলঃ আমি লেখক; এমন কিছু মন্দ লিখি না; নিজামের মতো কোনও ব্যক্তি যদি আমাকে একটি ফাউণ্টেন পেন্ উপহারই দেন, তবে কি এতই অপাত্রে পড়িবে?

কি করিয়া ইচ্ছাশক্তিকে একাগ্র ও দুর্নিবার করিয়া তোলা যায় তাহার প্রক্রিয়া জানা না থাকিলেও, এঁটুলির মতো তাহার গায়ে লাগিয়া রহিলাম। দিবারাত্র কলমের চিন্তা করিতেছি—কলম চাই, কলম চাই—ইহা ছাড়া অন্য চিন্তা নাই। আমি বড় একরোখা লোক; যখন ধরিয়াছি তখন ইহার শেষ দেখিয়া ছাড়িব।

কয়েকদিন এই ভাবে কাটিল, কিন্তু কলমের দেখা নাই। একদিন একটা পারিবারিক প্রয়োজনে বাড়ির বাহির হইতে হইল। কিন্তু মনটা ইতিমধ্যে এমনই একগুঁয়ে হইয়া উঠিয়াছিল যে ট্রাম-বাসের গুঁতোগুঁতির মধ্যেও কলমের চিন্তা ছাড়িল না।

বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, আমার নিজের কলমটি কে কখন বুকপকেট হইতে তুলিয়া লইয়াছে।

কিছুক্ষণ হতভম্ব হইয়া রহিলাম; তারপর রাগে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলিয়া গেল। কোথায় আমি 'কলম দেহি কলম দেহি' করিয়া মনে মনে মাথা খুঁড়িতেছি, আর আমার নিজের কলমটাই কোন্ শ্যালকপুত্র হাত সাফাই করিল! রাম এমন উল্টা বোঝে কেন? দুত্তোর ইচ্ছাশক্তি! মনস্তত্ত্বের পণ্ডিতটার দেখা পাইলে হয়, তাহার মাথা ফাটাইয়া দিব।

কয়েকদিন বড়ই মন খারাপ গেল। তারপর হঠাৎ এক অপরিচিত ব্যক্তির নিকট হইতে ডাকযোগে একটি পার্শেল পাইলাম।

পার্শেলের মধ্যে একটি ফাউণ্টেন পেন্ ও চিঠি।

অপরিচিত ব্যক্তিটি লিখিয়াছেন যে, তিনি আমার লেখার অনুরাগী পাঠক—অনুরাগের চিহ্নস্বরূপ এই কলমটি আমাকে উপহার দিতেছেন, আমি উহা ব্যবহার করিলে ধন্য হইবেন।

কলমটি কাগজের খাপ হইতে বাহির করিয়া দেখিলাম, ঠিক আমার হারানো কলমের জোড়া! তবে নূতন—বেশ তক্তক্ ঝক্ঝক্ করিতেছে।

হঠাৎ মনে কেমন একটা খটকা লাগিল। অভিনিবেশ সহকারে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, কলমের গায়ে একটি দাগ রহিয়াছে—যেমন আমার কলমটিতে ছিল!

ইচ্ছাশক্তির এ কিরকম রসিকতা!

আমারই চোরা কলম কোনও ভদ্রলোক সস্তায় ক্রয় করিয়া, মাজিয়া ঘষিয়া নূতন বাক্সে পুরিয়া আমাকেই উপহার দিয়াছেন।

পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা হয় নাই, হইলে জিজ্ঞাসা করিব, ইচ্ছাশক্তি এমন জুয়াচুরি করে কেন?

২৪ মাঘ ১৩৫১

বাঘিনী

একটা বাঘিনী শিকার করিয়াছিলাম।

আমি শিকারী, অনেকগুলা বাঘ ভালুক মারিয়াছি। কিন্তু এই বাঘিনীটাকে

মারিবার পর তাহার সম্বন্ধে যে গল্প শুনিয়াছিলাম তাহা আমার মত পুরানো শিকারীকেও অবাক করিয়া দিয়াছিল। সাধারণ পাঠক হয়তো গল্পটা বিশ্বাস করিবেন না, মনে করিবেন আমি ঈশপের নব সংস্করণ রচনা করিতেছি কিম্বা বাঘিনীকে লইয়া একটু রঙ্গ-পরিহাস করিবার চেষ্টা করিতেছি। একথা সত্য, আমরা বাঙালী জাতি বাঘ-ভালুক লইয়া তামাসা করিতে ভালবাসি; কাতুকুতু দিয়া বাঘ মারা কিম্বা ভালুকের দাড়ি কামাইয়া তাহাকে বধ করার গল্প আমাদের অনাবিল আনন্দ দান করিয়া থাকে। ইহাতে নিন্দারও কিছু দেখি না। আমি শুধু বলিতে চাই, এ কাহিনীটি সে-জাতীয় নয়। আমি ইহা অবিশ্বাস করিতে পারি নাই, এবং আমার পাঠকগণের মধ্যে বাঘের চরিত্রজ্ঞ প্রবীণ শিকারী যদি কেহ থাকেন তিনিও হয়তো ইহা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিবেন না।

ভারতবর্ষের উত্তরদিকে বঙ্গ বিহারের সমতলভূমি যেখানে দেবতাত্মা হিমালয়ের পাদমূলে গিয়া মিশিয়াছে, সেই পাহাড় জঙ্গল ভরা দুর্গম কঠিন ভূভাগ এখনও মানুষের করায়ত্ত হয় নাই; এখনও সেখানে হরিণ শম্বর চমরী নীলগাই প্রভৃতি জন্তু এবং তাহাদের ভক্ষক বাঘ নেক্ড়ে চিতা হায়না স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে যে সব উপত্যকা আছে তাহাতে মানুষ জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া গ্রাম রচনা করিয়া বাস করিতেছে বটে কিন্তু তাহা যেন নিতান্তই ভয়ে ভয়ে—সসঙ্কোচে। শ্বাপদের অধিকারই এখনও বলবৎ আছে।

শিকারের সন্ধানে একবার ঐদিক পানে গিয়া পড়িয়াছিলাম। জনপদ-বিরল উপল-কর্কশ তরাইয়ের সীমান্ত ধরিয়া স্থানে স্থানে ছোট ছোট সরকারী চৌকি আছে, এইরূপ একটি চৌকিতে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম নিকটবর্তী একটি গ্রামে এক বাঘিনী বড় উৎপাত করিতেছে। গ্রামের দুইজন মাতব্বর চৌকিতে আসিয়াছিল; তাহাদের মুখে বাঘিনীর কাহিনী শুনিলাম।

মাতব্বর দুইজন জাতিতে পাহাড়ী; বেঁটে খাটো, চক্ষুর একটু বঙ্কিমতা আছে, মুখে দাড়ি গোঁফের বাহুল্য নাই। আমি শিকারী শুনিয়া তাহারা আমাকে ধরিয়া বসিল। তাহাদের গ্রামে কয়েক বছর ধরিয়া একটা বাঘিনী দারুণ উৎপীড়ন করিতেছে; কত যে স্ত্রীলোক আর গরু-মেষ মারিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। মাঝে তাহার হিংস্র অভিযান কিছুকালের জন্য বন্ধ ছিল, আবার সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে। ভয়ে গাঁয়ের মেয়েরা ঘরের বাহির হইতে পারে না। বাঘিনীর বিশেষত্ব এই, সে পুরুষকে বড় একটা আক্রমণ করে না, কিন্তু সুযোগ পাইলেই স্ত্রীলোক মারে। ফলে মেয়েদের জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহ করা, ক্ষেতে কাজ করা প্রভৃতি বন্ধ হইয়াছে।

এই লইয়া গ্রামের লোকেরা বারবার সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছে কিন্তু কোনও ফল পায় নাই। সরকার পঞ্চাশ টাকার একটি পুরস্কার ঘোষণা করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। এখন আমি যদি বাঘিনীটাকে মারিয়া এই করাল বিভীষিকার হাত হইতে গ্রামটিকে উদ্ধার করি তবেই রক্ষা, নচেৎ গ্রামে আর মানুষ থাকিবে না।

ঘাঁটিদার মহাশয়কে প্রশ্ন করায় তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সহিত অনুমতি দিলেন; বাঘিনীটার নিদানকাল যে এতদিন আমার মত একজন জাঁদরেল শিকারীর জন্য অপেক্ষা করিয়াছিল এবং পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার যে একমাত্র আমারই প্রাপ্য এ বিষয়ে তিনি নিঃসংশয় দৃঢ়বিশ্বাস জানাইলেন। তাঁহার এত উৎসাহের কারণ কিন্তু ঠিক বুঝিলাম না। তাঁহার নিজেরও বন্দুক আছে, তবে তিনি নিজেই বাঘিনীকে বধ করেন নাই কেন? আমার মত ধুরন্ধর শিকারীর জন্য প্রতীক্ষা করার কী প্রয়োজন ছিল? পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার কি তাঁহার কাছে এতই তুচ্ছ?

যাহোক, পরদিন অতি প্রত্যুষে মাতব্বর দুইজনের সঙ্গে পদব্রজে যাত্রা করিলাম। গ্রাম মাত্র পঁচিশ মাইল দূরে, শিকারীর পক্ষে পঁচিশ মাইল হাঁটা কিছুই নয়। সুতরাং দ্বিপ্রহরের মধ্যেই যে অকুস্থলে গিয়া পৌঁছিব তাহাতে সন্দেহ নাই। এমন কি, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইলে আজ রাত্রেই বাঘিনীকে মারিয়া কাল সন্ধ্যার মধ্যে ফিরিয়া আসিতে পারি।

পথের বিস্তারিত বিবরণ আর দিব না। দুইদিন পরে ক্ষতবিক্ষত চরণ ও ভাঙা চরচরে শরীর লইয়া গ্রামে উপস্থিত হইলাম। দূরত্ব পঁচিশ মাইল বটে, ঘাঁটিদার মহাশয় মিথ্যা বলেন নাই। কাক-পক্ষীর পক্ষে এ গ্রামে আসা খুবই সহজ, কিন্তু দ্বিপদ মনুষ্যকে যে এখানে আসিতে হইলে তিনটি উঁচু উঁচু পাহাড়ের পৃষ্ঠ উত্তীর্ণ হইয়া কখনও গাছের ডাল ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে, কদাচিৎ ইঁদুরের গর্তের মত সঙ্কীর্ণ রন্ধ্রপথে হামাগুড়ি দিয়া আসিতে হয়, এ কথার উল্লেখ করিতে তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন এবং কেন যে তিনি পঞ্চাশ টাকার পুরস্কারের সৌভাগ্য নিজে না অর্জন করিয়া উদারভাবে আমাকে অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা এই পথ অতিক্রম করিবার পর অতি বড় জর্মানিরেটেরও অনুমান করিতে বিলম্ব হয় না।

গায়ের ব্যথা মরিতে পুরা একদিন গেল। গ্রামবাসীরা কিন্তু খুবই আদর যত্ন করিল। গ্রামের প্রান্তে একটি খড়ের ঘর পুরাপুরি আমাকে ছাড়িয়া দিল এবং দধি দুগ্ধ এত সরবরাহ করিল যে তাহার দ্বারা একটি কন্যার বিবাহ সহজেই নিষ্পন্ন হয়। তাছাড়া. ইহারা শজারুর মাংস হইতে এমন উৎকৃষ্ট শিক-কাবাব তৈয়ার করিতে জানে যে তাহার স্বাদ আর ভোলা যায় না এবং ইহাদের চোলাই করা মহুয়ার আরকও অবহেলার বস্তু নয়।

গ্রামের লোকসংখ্যা ছেলে বুড়ো মিলাইয়া প্রায় শ'দেড়েক হইবে। সকলেই পাহাড়ী। তাছাড়া গৃহপালিত গরু মোষ ছাগল আছে। গাঁয়ের চারিপাশে জঙ্গল কাটিয়া চারণভূমি ও গমের ক্ষেত তৈয়ার হইয়াছে। কাছে-পিঠে অন্য গ্রাম নাই; সবচেয়ে নিকটবর্তী গ্রামটি দশ মাইল দূরে—এদেশের দশ মাইল। এমনিভাবে পৃথিবীর কলহ-কোলাহল হইতে একান্ত নির্বিবাদে দুর্গম গিরিসঙ্কটের মাঝখানে এই ক্ষুদ্র মনুষ্য-গোষ্ঠী বাস করিতেছে। ইহাদের জীবনে মদান্ধসিন্ধুরঘটার ঘণ্টারণৎকার নাই, লব্ধস্তুতি ভূপতির উগ্র অহংকার নাই। কেবল সম্প্রতি একটা বাঘিনী আসিয়া তাহাদের নির্বিঘ্ন নিরস্ত্র জীবনযাত্রাকে শঙ্কা-সঙ্কুল করিয়া তুলিয়াছে।

পরদিন দ্বিপ্রহরের মিঠে কড়া রৌদ্রে খোলা জায়গায় বসিয়া বন্দুকটিকে তৈলাক্ত করিতেছিলাম ও গ্রামবাসীদের গল্প শুনিতেছিলাম, তাহারা অনেকগুলি আমাকে ঘিরিয়া বসিয়াছিল। কেবল একটি ছোকরা অদূরে গাছের ডাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া নীরবে আমার মুখের পানে তাকাইয়া ছিল। পাহাড়ীদের বয়স অনুমান করা সহজ নয়, তবু তাহার বয়স যে কুড়ি-একুশের বেশী নয় তাহা বোঝা যায়। খর্ব দেহ, মুখখানি ভাবলেশহীন, কিন্তু কেন জানি না তাহার নিষ্পলক চক্ষুদুটি অস্বস্তিকর একাগ্রতায় আমার মুখের উপর স্থির হইয়া ছিল।

গ্রামবাসীদের কথাবার্তায় বাঘিনী সম্বন্ধে আরও কিছু খবর পাওয়া গেল। বাঘিনীটা অত্যন্ত নির্ভীক, দিনের বেলাতেও গ্রামের আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়, পাহাড়তলীর জলাশয়ের কাছে ওৎ পাতিয়া থাকে। মেয়েদের জল আনিতে যাওয়া বন্ধ হইয়াছে, পুরুষেরা দলবদ্ধ হইয়া লাঠি-কাটারি-টাঙি লইয়া জল ভরিতে যায়। মেয়েদের কাজ পুরুষদের করিতে হয় এজন্য পুরুষেরা লজ্জিত। আর একটা আশ্চর্য কথা শুনিলাম, বাঘিনী এই গ্রামটিকেই বিশেষভাবে নিজের লক্ষ্যবস্তু করিয়া বাছিয়া

লইয়াছে, অন্য কোনও গ্রামের প্রতি তাহার কোনও আক্রোশ নাই।

আমার মনে কেমন একটা খটকা লাগিল। বাঘের চরিত্রে এরূপ পক্ষপাত দেখা যায় না। প্রথমতঃ মানুষ বাঘের স্বাভাবিক খাদ্য নয়, নেহাৎ দায়ে পড়িয়া উহারা নরভুক হইয়া উঠে। শিকারীরা জানেন, কোনও কারণে বাঘের দাঁত ভাঙিয়া গেলে কিম্বা পায়ে স্থায়ী জখম হইয়া গতিবেগ হ্রাস হইলে তাহারা স্বীয় ন্যায্য শিকার ধরিতে পারে না, তখন বাধ্য হইয়া নরভুক হইয়া পড়ে। সবল সুস্থ বাঘ কখনও মানুষ খায় না। এই বাঘিনীটা যদি শারীরিক কোনও অসামর্থ্যের জন্যই নরভুক হইয়া থাকে, তবে সে কেবল স্ত্রীলোক ধরিয়া খাইবে কেন? তাছাড়া, বিশ মাইল পরিধির মধ্যে আরও পাঁচখানা গ্রাম আছে, সেগুলি ছাড়িয়া একান্তভাবে এই গ্রামের উপরেই তাহার নজর কেন?

গ্রামের অনেকেই বাঘিনীকে চক্ষে দেখিয়াছে, কিন্তু কেহই তাহাকে খোঁড়াইতে দেখে নাই। বাঘিনী দিব্য হৃষ্টপুষ্ট ও স্বাস্থ্যবতী। সে কখনও মদগর্বে হেলিয়া দুলিয়া হাঁটিয়া যায়, কখনও বিদ্যুতের পীতবর্ণ রেখার ন্যায় নিমেষে এক ঝোপ হইতে অন্য ঝোপে অদৃশ্য হয়। সুতরাং সে যে বার্ধক্যে অথর্ব হইয়া পড়ে নাই, ইহাও নিঃসংশয়ে বলা যায়।

প্রশ্ন করিলাম, এটা বাঘিনী—বাঘ নয়—তাহা তোমরা কী করিয়া বুঝিলে? ইহার সদুত্তর কেহ দিতে পারিল না, কিন্তু কয়েকজন তরুণ বয়স্ক ঘাড় ফিরাইয়া বৃক্ষতলস্থ ছোকরার পানে চাহিয়া হাসিল। আমিও চকিতে তাহার দিকে তাকাইলাম। তাহার মুখের কোনও ভাবান্তর নাই, সে তেমনি একাগ্র নির্নিমেষ চক্ষে আমার পানে চাহিয়া আছে। সমবয়স্কদের হাসির ইঙ্গিত তাহার কানে পৌঁছিল কি না সন্দেহ।

অপরাহ্ণের দিকে গ্রামবাসীরা একে একে যে যার কাজে চলিয়া গেল, কেবল ছোকরাটি গাছের তলায় পূর্ববৎ দাঁড়াইয়া রহিল। স্থান একেবারে শূন্য হইয়া গেলে সে ধীরে ধীরে আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলিল, 'সাহেব, বাঘিনীকে মারিয়া ফেলিবার প্রয়োজন আছে কি? উহাকে কোনও উপায়ে তাড়াইয়া দেওয়া যায় না?'

আমি বিস্মিতভাবে বলিলাম, 'তাড়াইয়া দিলে আবার আসিবে। আমি তো চিরকাল এখানে থাকিয়া বাঘ তাড়াইতে পারিব না।'

সে আর কিছু বলিল না, খানিকক্ষণ অপ্রতিভ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

এ পর্যন্ত যাহা লিখিলাম, দেখিতেছি বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচির মত তাহা বাঘ-মারার গৌরচন্দ্রিকা মাত্র। পাঠক নিশ্চয় অধীর হইয়া উঠিয়াছেন, ভাবিতেছেন বাঘিনী কৈ? আমার দুর্ভাগ্য আমি লেখক নই, শিকারী মাত্র। বাঘ শিকারের উদ্যোগ আয়োজনই দীর্ঘ, আসল হত্যাকাণ্ডটা অতি অল্প সময়েই সংঘটিত হয়। তাই বোধ হয় আমার কাহিনীতেও উদ্যোগপর্বটাই লম্বা হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আর নয়, এবার চটপট বাঘিনীকে সংহার করা প্রয়োজন।

মজার কথা এই যে, বাঘিনীকে সংহার করিতে আমাকে বিন্দুমাত্র বেগ পাইতে হয় নাই। গ্রাম হইতে আধ মাইল দূরে নিম্নভূমিতে গ্রামের জলাশয়, প্রথমে সেটি তদারক করিতে গেলাম। দেখিলাম জলের ধারে বড় বড় থাবার দাগ রহিয়াছে—বাঘিনী জল খাইতে আসে। সুতরাং তাহার খোঁজে ঘুরিয়া বেড়াইবার প্রয়োজন নাই, এইখানেই তাহাকে পাওয়া যাইবে।

জলাশয়টি বেশী বড় নয়, দুই পাশের পাহাড়-ঝরা জল এখানে সঞ্চিত হইয়া একটি

কুণ্ড রচনা করিয়াছে। জলাশয়ের একদিকের পাহাড়টা প্রায় খাড়া ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে। আমার ভারি সুবিধা হইল, মাচান বাঁধিবার প্রয়োজন হইল না; সন্ধ্যার পর ঐ পাহাড়ের গায়ে সমতল হইতে পঁচিশ হাত উঁচুতে একটা কুলুঙ্গির মত স্থানে উঠিয়া পাহারা আরম্ভ করিলাম। এখানে বাঘিনী কোনও ক্রমে আমার নাগাল পাইবে না, অথচ সে জল খাইতে আসিলে আমি তাহাকে সম্মুখেই দেখিতে পাইব। আকাশে প্রায় পূর্ণাকৃতি চাঁদ ছিল, সুতরাং শেষ রাত্রি পর্যন্ত আলো পাওয়া যাইবে।

শেষ রাত্রি পর্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে হইল না, দশটার মধ্যেই বাঘিনী আসিল। আমি জীবনে আটটা বাঘ মারিয়াছি কিন্তু এখনও অতর্কিতে বাঘ সম্মুখে উপস্থিত হইলে বুকের একটা স্পন্দন বাদ পড়িয়া যায়। দেখিলাম, জলাশয়ের ওপারে একটা কাঁটার ঝাড় নড়িয়া উঠিল, তারপরই বাঘিনী বাহির হইয়া আসিল। তাহার হলুদবর্ণ মসৃণ অঙ্গে চাঁদের আলো পিছলাইয়া পড়িতেছে—গতির কি অপূর্ব নির্ভীক সাবলীলতা! সুস্থ সবল বনের বাঘের মত এমন উগ্র ভয়ানক লাবণ্য আর কোনও জন্তুর নাই।

বাঘিনী ডাহিনে বাঁয়ে ভ্রূক্ষেপ করিল না। সটান জলাশয়ের কিনারায় আসিয়া চক্‌চক্‌ করিয়া জলপান করিতে লাগিল। চাঁদ মধ্যগগনে উঠিয়াছে, দেখিবার কোনও অসুবিধা নাই, প্রায় দিনের মতই আলো। আমি নিঃশব্দে বন্দুক তুলিয়া লইলাম। টোটা ভরাই ছিল, লক্ষ্য স্থির করিয়া সন্তর্পণে সেফ্‌টি-ক্যাচ্‌ টিপিলাম। খুট করিয়া শব্দ হইল। অমনি বাঘিনী মুখ তুলিয়া চাহিল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া টিপিলাম—কড়াৎ! বাঘিনী তীব্র একটা চীৎকার করিয়া শূন্যে লাফাইয়া উঠিল, তারপর মাটিতে পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল। মিনিটখানেক পরে তাহার ছটফটানি শান্ত হইল।

আমি আরও দশ মিনিট বন্দুক বাগাইয়া কুলুঙ্গিতে বসিয়া রহিলাম, কিন্তু বাঘিনী আর নড়িল না। তখন ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া গ্রামে ফিরিলাম। গ্রামের লোকেরা কান পাতিয়া ছিল, নিস্তব্ধ নৈশবাতাসে বন্দুকের আওয়াজও শুনিয়াছিল, কিন্তু ফলাফল সম্বন্ধে পাকা খবর না পাওয়া পর্যন্ত গ্রামের বাহির হইতে সাহস করিতেছিল না। এখন খবর পাইয়া তাহারা মহানন্দে নৃত্য শুরু করিয়া দিল। একদল যুবক তৎক্ষণাৎ বাঘিনীর মৃতদেহটা আনিতে ছুটিল। গ্রামের মেয়েরা, যাহারা এতকাল নিজ নিজ ঘরের চৌকাঠ পার হইতে সাহস করিত না, তাহারা দলে দলে বাহিরে আসিয়া কলকোলাহল করিতে লাগিল।

যুবকেরা বাঘিনীর মৃতদেহটা বাঁশে ঝুলাইয়া যখন লইয়া আসিল তখন আমার কুটিরের সম্মুখে প্রকাণ্ড ধুনী জ্বলিতেছে, গ্রামের লোকেরা পর্বতপ্রমাণ কাঠ জড় করিয়া তাহাতে আগুন দিয়াছে। বাঘিনীর দেহ আগুনের পাশে শোয়াইয়া দিতেই সকলে সেটাকে ঘিরিয়া ধরিল। জীবন্ত অবস্থায় যে জন্তুটা গ্রামের ত্রাসস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার মৃতদেহটাকে কেহই সম্ভ্রম দেখাইল না।

অতঃপর প্রায় সারারাত্রি ধরিয়া উৎসব চলিল। কয়েকটা আস্ত ছাগদেহ আগুনের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া শূল্য মাংস তৈয়ার হইতে লাগিল। ঘড়া ঘড়া মহুয়ার নির্যাস অতি দ্রুত সজীব আধারে স্থানান্তরিত হইয়া পাহাড়ীদের নৃত্যগীতানুরাগ অতিমাত্রায় বাড়াইয়া তুলিল।

গ্রামবাসীদের অপর্যাপ্ত কৃতজ্ঞতা, শূল্য মাংস এবং মহুয়ারস সেবন করিয়া আমি আগুনের পাশেই কম্বল বিছাইয়া শয়ন করিয়াছিলাম। উৎসবকারিদের ঢোল-খঞ্জনী প্রভৃতির শব্দের মধ্যেও ক্রমশঃ একটু তন্দ্রাবেশ হইয়াছিল। সত্য কথা বলিতে কি, আগুনের আতপ্ত প্রসাদে, সার্থকতার নিশ্চিন্ত তৃপ্তিতে এবং উদরস্থ খাদ্যপানীয়ের

অলক্ষিত প্রভাবে বোধহয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।

হঠাৎ এক সময় চট্কা ভাঙিয়া দেখি, উৎসবকারিরা কখন চলিয়া গিয়াছে, ধুনীর আগুন জ্বলিয়া জ্বলিয়া প্রকাণ্ড অঙ্গারগোলকে পরিণত হইয়াছে। হাতঘড়িতে দেখিলাম রাত্রি তিনটা। আগুন সত্ত্বেও শেষ রাত্রির ঠাণ্ডায় একটু গা শীত-শীত করিতেছিল, ঘরের ভিতর গিয়া শুইব কি না মনে মনে একটু গবেষণা করিতেছি, চোখ পড়িল মৃত বাঘিনীটার উপর। দেখি, একটা মানুষ বাঘিনীর মুণ্ড কোলে লইয়া বসিয়া আছে এবং অত্যন্ত স্নেহভরে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে। ভাল করিয়া চক্ষুর জড়তা দূর করিয়া দেখিলাম, সেই ছোকরা! তাহার মুখ আর ভাবহীন নয়, চক্ষু দিয়া নিঃশব্দ অশ্রুর ধারা গড়াইয়া পড়িতেছে, প্রিয়জন বিয়োগের নিঃসংশয় বেদনা তাহার মুখে অঙ্কিত রহিয়াছে।

এই দৃশ্য একটা উৎকট হাস্যরসাত্মক স্বপ্ন বলিয়াই মনে করিতাম যদি না ছোকরার সহিত দ্বিপ্রহরের আলাপের কথা স্মরণ থাকিত। আমি গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বসিলাম। ইহার পিছনে একটা গল্প আছে সন্দেহ নাই।

আমি জাগিয়াছি দেখিয়া সে বাঘিনীর মাথা নামাইয়া রাখিয়া আমার কাছে আসিয়া বসিল। নিজের অশ্রুচিহ্নিত শোক লুকাইবার চেষ্টা করিল না, ভগ্নস্বরে বলিল, 'ওর সঙ্গে আমার বড় ভালবাসা ছিল।'

বলিলাম, 'গল্পটা গোড়া থেকে বল।'

অতঃপর, সে যে-কাহিনী বলিয়াছিল, তাহাই বাংলায় ভাষান্তরিত করিয়া লিখিতেছি। তাহার নাম রূপদমন, সম্ভবতঃ রিপুদমনের অপভ্রংশ।

পাঁচ বছর আগে যখন রূপদমনের বয়স ষোল বছর ছিল, তখন সে কাটারি লইয়া বনে কাঠ কাটিতে যাইত। ঐ বয়সের ছেলেরা বনের গাছে উঠিয়া সরু সরু ডালগুলি কাটিয়া মাটিতে ফেলিয়া আসিবে, পরে সেই ডালগুলি শুকাইলে গ্রামের মেয়েরা গিয়া তাহা তুলিয়া আনিবে, ইহাই তাহাদের কাষ্ঠ আহরণের রীতি।

ছেলেরা দল বাঁধিয়া দুপুরবেলা কাঠ কাটিতে যাইত, তারপর এগাছ ওগাছ করিতে করিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িত। কখনও বা কাঠ কাটা শেষ হইলে তাহারা একত্র হইয়া বনের মধ্যে লুকোচুরি খেলিত, তারপর সকলে মিলিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিত। একটা মানুষ-খেকো বাঘ সম্প্রতি গ্রামে উৎপাত করিতেছে ইহা তাহারা জানিত। কিন্তু ও বয়সের ছেলেরা ডানপিটে হয়; বাঘের ভয় তাহাদের ছিল না। শিশুকাল হইতে তাহারা বনে বাঘ দেখিয়াছে, বাঘ কখনও তাহাদের অনিষ্ট করে নাই। বাঘ দেখিলেই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে বাঘ আর কিছু বলে না, ধীরে ধীরে আপন গন্তব্য স্থানে চলিয়া যায়। ইহাই তাহাদের শিক্ষা।

একদিন লুকোচুরি খেলিতে খেলিতে রূপদমন একটি ভারি সুন্দর লুকাইবার স্থান খুঁজিয়া পাইয়াছিল। কতকগুলা বড় বড় পাথরের চাঁই এক জায়গায় ঘাড়ে মুণ্ডে হইয়া পড়িয়া আছে, তাহাদের ফাঁকে ফাঁকে গুঁড়ি মারিয়া ভিতরে ঢোকা যায়। ভিতরে ছোট একটি কুঠুরীর মত স্থান, উপরদিকে কয়েকটা ফোকর আছে কিন্তু তাহাদের চারিপাশে কাঁটার ঝাড় এত ঘন হইয়া জন্মিয়াছে যে, আকাশ দেখা যায় না। এইখানে সবুজ আলোয় ভরা নিভৃত আশ্রয়টিতে রূপদমন লুকাইয়াছিল। সেদিন তাহার খেলার সাথীরা তাহাকে খুঁজিয়া পায় নাই।

অনেকক্ষণ একলা বসিয়া রূপদমন শেষে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তাহার সঙ্গীরা

তাহাকে খুঁজিয়া না পাইয়া কখন চলিয়া গিয়াছে, সে জানিতে পারে নাই। যখন তাহার ঘুম ভাঙিল তখন সন্ধ্যা হয়-হয়।

ঘুম ভাঙিল মুখের উপর ঝাঁঝালো একটা নিশ্বাসের স্পর্শে এবং সেইসঙ্গে কানের কাছে মৃদু গম্ভীর গুরু গুরু শব্দে। রূপদমন একটা পাথরে হেলান দিয়া ঘুমাইয়াছিল, চোখ মেলিয়া দেখিল চোখের সামনেই প্রকাণ্ড বাঘের মাথা! মূঢ়ের মত সে চাহিয়া রহিল। বাঘিনী ঠিক তাহার পাশে আসিয়া বসিয়াছে এবং হিংস্র-প্রখর দৃষ্টিতে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। তাহার গলা দিয়া একটা অবরুদ্ধ আওয়াজ বাহির হইতেছে—গর্‌র্‌—

বাঘের এতটা ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য রূপদমন আর কখনও লাভ করে নাই। সে অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিল। তাহার শরীরের স্নায়ুপেশী এমন পরিপূর্ণ ভাবে শিথিল হইয়া গেল যে মনে হইল সে আর কোনও কালেই হাত-পা নাড়িতে পারিবে না। তাহার পেটের ভিতরটা কেবল ক্ষীণভাবে ধুক্‌ধুক্‌ করিতে লাগিল।

তারপর ক্রমে ক্রমে তাহার শরীরের সাড় ফিরিয়া আসিল। নিজের অজ্ঞাতসারেই সে বোধহয় একটু নড়িয়াছিল, বিদ্যুদ্বেগে বাঘিনী থাবা তুলিল। সেই থাবার একটি থাবড়া খাইলে রূপদমনের মাথাটি বোধকরি পচা হাঁসের ডিমের মত দ্রব হইয়া যাইত; কিন্তু থাবা শূন্যে উদ্যত হইয়াই রহিল, পড়িল না। রূপদমনও সম্মোহিতের মত থাবার পানে তাকাইয়া রহিল।

থাবার কব্জির কাছে পুঁজ-রক্ত মাখানো রহিয়াছে। রূপদমন লক্ষ্য করিল, ক্ষত-স্থানের পুঁজরক্তের ভিতর কয়েকটা বড় বড় শলার মত কাঁটা এফোঁড় ওফোঁড় বিঁধিয়া আছে। দেখিতে দেখিতে রূপদমনের ভয় কাটিয়া গেল, সে বুঝিতে পারিল কেন বাঘিনী থাবা মারিয়া তাহার মাথাটি চূর্ণ করিয়া দেয় নাই—নিজের বেদনার ভয় তাহাকে নিরস্ত করিয়াছে।

কাহারও গায়ে কাঁটা বিঁধিয়া থাকিলে তাহা টানিয়া বাহির করিবার প্রবৃত্তি মানুষের স্বাভাবিক। মনস্তত্ত্ববিদেরা একথা জানেন কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু আমার শিকারী-জীবনে আমি ইহা অনেকবার লক্ষ্য করিয়াছি। কাহারও শরীরে কাঁটা বিঁধিয়া আছে দেখিলেই হাত নিস্‌পিস্‌ করিতে থাকে এবং সেটা টানিয়া বাহির না করা পর্যন্ত প্রাণে শান্তি থাকে না।

রূপদমন আস্তে আস্তে বাঘিনীর থাবার দিকে হাত বাড়াইল। বাঘিনী তাহাকে তীক্ষ্নভাবে নিরীক্ষণ করিতেছিল, এবার তাহার নড়াচড়ায় বিশেষ আপত্তি করিল না। কেবল তাহার গলার গুরুগুরু শব্দ একটু গাঢ় হইল এবং মুখখানা ব্যাদিত হইয়া ভয়ঙ্কর দাঁতগুলাকে প্রকট করিয়া দিল।

কিন্তু ক্ষতস্থানে হাত পড়িতেই বাঘিনীর কণ্ঠ হইতে এমন একটি রুদ্র গর্জন বাহির হইল যে মনে হইল বাঘিনী এখনি রূপদমনকে শতখণ্ডে ছিঁড়িয়া ফেলিবে। কিন্তু আশ্চর্য! বাঘিনী তাহাকে ছিঁড়িয়া ফেলিল না, যে থাবাটা চকিতের জন্য সরাইয়া লইয়াছিল তাহা আবার পূর্ববৎ তুলিয়া ধরিল। বাঘিনী মনে মনে কি বুঝিয়াছিল বাঘিনীই জানে কিন্তু আমি এই প্রহ্লাদ-মার্কা ছেলেটার দুর্জয় সাহস ও পরমায়ুর কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম।

বাঘিনীর গাঁক্‌ শব্দে রূপদমন হাত টানিয়া লইয়াছিল, কিছুক্ষণ পরে আবার সন্তর্পণে হাত বাড়াইল। প্রথম কাঁটা বাহির করার যন্ত্রণায় বাঘিনী সংযম হারাইয়া রূপদমনকে মুখের এক ঝাপ্‌টায় কামড়াইতে গেল কিন্তু শেষ মুহূর্তে কামড়ের বদলে তাহার গাল চাটিয়া দিল। কর্‌করে উখার মত জিভের ঘর্ষণে রূপদমনের গাল

জ্বালা করিয়া উঠিল কিন্তু পাহাড়ী বালক টুঁ শব্দ করিল না। অতঃপর বাঘিনী যেন নিজের সহজাত প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া রাখিবার জন্যই রূপদমনের সর্বাঙ্গ চাটিতে আরম্ভ করিল। এই অবসরে রূপদমনও কাঁটাগুলি একে একে বাহির করিল। কাঁটাগুলি সাধারণ উদ্ভিদ-কাঁটা নয়, শজারুর কাঁটা। বাঘিনী বোধ হয় কোনও সময় থাবা মারিয়া শজারু বধ করিতে গিয়াছিল, ইহা সেই অবিমৃষ্যকারিতার ফল।

কাঁটাগুলি সব বাহির হইয়া গেলে, বাঘিনী খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে একটু সরিয়া গিয়া গলার মধ্যে গর্‌গর্‌ শব্দ করিতে করিতে ক্ষতস্থান চাটিতে লাগিল। এদিকে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল, কোটরের আর বড় কিছু দেখা যাইতেছিল না, কেবল বাঘিনীর চোখদুটা জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। রূপদমন আস্তে আস্তে হামাগুড়ি দিয়া কোটর হইতে বাহিরের দিকে চলিল, বাঘিনী চোখ ঘুরাইয়া দেখিল কিন্তু বাধা দিল না। বাহিরে আসিয়া রূপদমন এক দৌড়ে গ্রামের দিকে রওনা হইল। ছুটিতে ছুটিতে একসময় পিছু ফিরিয়া দেখিল বাঘিনী কোটরের মুখের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং গলা উঁচু করিয়া তাহার পানে তাকাইয়া আছে। কিছুক্ষণ পরে সে আবার খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে রন্ধ্রের মধ্যে প্রবেশ করিল, রূপদমন বুঝিল ঐ কোটরটা বাঘিনীর বাসস্থান, লুকোচুরি খেলিতে গিয়া সে বাঘের ঘরে ঢুকিয়াছিল!

সেই রাত্রে রূপদমনের তাড়স দিয়া জ্বর আসিল। জ্বর তিন-চার দিন রহিল; তারপর সে সারিয়া উঠিল।

দিন দশেক পরে রূপদমন আবার কাঠ কাটিতে গেল। সঙ্গিসাথীদের বাঘিনীর কথা বলিয়াছিল, কেহ বিশ্বাস করিয়াছিল কেহ করে নাই। কিন্তু বনের ওদিকটাতে আর না যাওয়াই ভাল এবিষয়ে সকলেই একমত হইল। রূপদমনও প্রথম দিন অন্য সকলের সহিত রহিল, ওদিকে গেল না।

দ্বিতীয় দিন বনের ঐ দিকটা তাহাকে টানিতে লাগিল। সে সঙ্গীদের এড়াইয়া ঐ দিকে চলিল। আগুন লইয়া খেলা করিবার প্রবৃত্তি মানুষের চিরন্তন, যে বিপদের সহিত উত্তেজনা জড়িত আছে তাহার লোভ সে ছাড়িতে পারে না।

গন্তব্য স্থানের কাছাকাছি পৌঁছিয়া কিন্তু তাহার গতি আপনিই হ্রাস পাইল, পা আর চলে না। তাহার অবস্থা অনেকটা নবীন অভিসারিকার মত। আর অগ্রসর হইবে, না ফিরিয়া যাইবে তাহাই মনে মনে তোলপাড় করিতেছে এমন সময় পাশের একটা ঝোপের মধ্যে সর্‌সর্‌ শব্দ শুনিয়া চমকিয়া সেইদিকে ফিরিয়া দেখিল, কিছুই করিবার প্রয়োজন নাই, বাঘিনী নিজেই আসিতেছে। বাঘিনী আর খোঁড়াইতেছে না, স্বচ্ছন্দ সাবলীল শার্দূল বিক্রীড়িত ভঙ্গীতে তাহার দিকেই আসিতেছে।

রূপদমন কাঠের পুতুলের মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, বাঘিনী ঠিক তাহার সম্মুখে আসিয়া লম্বা হইয়া বসিল। চারিচক্ষুর নিষ্পলক বিনিময় অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিল। বাঘিনীর ল্যাজের ডগাটি একটু একটু নড়িতেছে, গলার মধ্যে গুর্‌গুর্‌ আওয়াজ হইতেছে, বাঘিনী এখনও রূপদমন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হইতে পারে নাই। রূপদমন আর পারিল না, হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া থপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িল।

বাঘিনী জিভ বাহির করিয়া সাদরে তাহার নাক চাটিয়া লইল, তারপর থাবাটি চিৎ করিয়া তাহার কোলের উপর রাখিল। রূপদমন দেখিল থাবার ঘা শুকাইয়া গিয়াছে, কব্জির চামড়ার উপর কয়েকটা দাগ আছে মাত্র।

এইরূপে বাঘিনীর সহিত রূপদমনের বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। ইহাকে বন্ধুত্ব বলিব কিম্বা অন্য কিছু বলিব বুঝিতে পারিতেছি না। যাহোক, রূপদমনের মুখের কথাই খানিকটা তুলিয়া দিতেছি—

—'সাহেব, মানুষে মানুষে ভালবাসা হয়, কিন্তু বাঘের মত এমন ভালবাসতে

কেউ পারে না। কুকুরের সঙ্গেও মানুষের ভালবাসা হয়, সে অন্য রকম, সেখানে মানুষ প্রভু, কুকুর তার অধীন। এখানে কিন্তু তা নয়, মানুষ আর বাঘ সমান সমান, কেউ কারুর চেয়ে খাটো নয়।

'তিনটি বছর আমি বাঘিনীর সঙ্গে কাটিয়েছি। আমি জানি, এ তিন বছরের মধ্যে এমন খুব অল্প দিনই গিয়েছে যেদিন আমাদের দেখা হয় নি। আপনি শিকারী, অনেক বাঘ মেরেছেন কিন্তু বাঘের সত্যি পরিচয় আপনি জানেন না। অমন স্নেহশীল উচ্চমনা জন্তু আর নেই। পৃথিবীতে যদি ভদ্রলোক থাকে তো সে বাঘ।

'আমরা দু'জনে দু'জনকে কি করে এত ভালবেসে ফেলেছিলুম তা জানি না, একদিন দেখা না হলে আমাদের মন মানত না। আমার সঙ্গে ভাব হবার পর থেকে সে গ্রামের মানুষ গরু ভেড়ার উপর উৎপাত করা ছেড়ে দিয়েছিল; গ্রামের দিকেই আর যেত না, বনের শম্বর পাহাড়ী ছাগল মেরে খেত। কিন্তু কোনও কারণে যদি আমি একদিন বনে না যেতে পারতুম তাহলে রাত্রে বাঘিনী গ্রামে আসত—গ্রামের চারিদিকে ঘুরে বেড়াত আর ডাকত। আমি ঠিক বুঝতে পারতুম আমাকে ডাকছে। একবার কয়েক দিনের জন্যে অসুখে পড়েছিলুম, সে রোজ রাত্রে এসে আমাকে ডাকত। গাঁয়ের লোকেরা আগুন জেবলে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে তাকে তাড়াতে পারত না।

'অসুখের পর যেদিন প্রথম বনে গেলুম সে তার কী আনন্দ! আমার গা চেটে চেটে গায়ের ছাল তুলে দিলে। আপনারা মনে করেন বাঘ হাসতে জানে না, সেটা আপনাদের ভুল। বাঘ হাসতে জানে। শুধু হাসতেই জানে না—ঠাট্টা করতে জানে, ঠাট্টা করলে বোঝে। আমার সঙ্গে ওর এক ঠাট্টা ছিল, আমাকে ভয় দেখানো। হঠাৎ গর্জন ছেড়ে প্রকাণ্ড হাঁ ক'রে আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ত। কিন্তু আশ্চর্য, ওর একটা নখের আঁচড় কখনও আমার গায়ে লাগেনি। প্রথম প্রথম আমার ভয় করত, তখন বাঘিনী আমাকে ছেড়ে দিয়ে দূরে গিয়ে বসত, মিট্‌মিট্ ক'রে আমার পানে চাইত আর হাসত।

'দুপুরবেলা আমি বাঘিনীর গুহায় যেতুম। যেদিন সে থাকত সেদিন দু'জনে মিলে খেলা করতুম। কী খেলা? কত রকম খেলা; লাফালাফি হুড়োহুড়ি—লুকোচুরি! বাঘেরা লুকোচুরি খেলতে জানে। যেদিন সে থাকত না সেদিন আমি গুহায় শুয়ে ঘুমোতুম, বাঘিনী এসে আমার পাশে শুতো, আমার বুকের ওপর থাবা তুলে দিয়ে ঘুমোত। এমনি ভাবে কতদিন যে আমরা ঘুমিয়েছি তার ঠিক নেই।

'একদিন আমি ওর জন্যে একদলা ক্ষীরের মণ্ড নিয়ে গিয়েছিলুম, খেয়ে ভারি খুশী। তার পরদিনই আমার জন্যে প্রকাণ্ড এক পাহাড়ী ছাগল মেরে এনে হাজির। আমি প্রথমটা বুঝতে পারিনি যে ওটা আমার জন্যেই এনেছে। কিন্তু সে কিছুতেই ছাড়ল না; কাঁধে তুলে ছাগলটা গাঁয়ে নিয়ে গেলুম। গাঁসুদ্ধ লোক ভোজ খেলে।'—

এইভাবে তিন বৎসর কাটিয়াছিল। আরও কত বৎসর কাটিত বলা যায় না যদি না আর একটা ঘটনা ঘটিয়া বাঘিনীর চরিত্রের অন্য একটা দিক প্রকট করিয়া দিত। রূপদমনের বয়স যখন উনিশ বছর তখন তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইল। রূপদমনের মা-বাপ ছিল, এ কাহিনীতে তাহাদের কোনও অংশ নাই বলিয়া তাহাদের উল্লেখ করি নাই।

বিবাহ হইবে দশ মাইল দূরের একটি গ্রামে। বিবাহ সম্বন্ধে রূপদমনের মনের ভাব কিরূপ ছিল তাহা আমি জানিতে পারি নাই; সম্ভবতঃ তাহার কোনও মতামতই ছিল না। এই বয়সে সকলেরই বিবাহ হয়, বাপ-মা সম্বন্ধ স্থির করিয়া বিবাহ দেয়, ছেলে বিবাহ করে। রূপদমনের বিবাহও তেমনি একটা পারিবারিক ঘটনা।

যথাসময় বরবেশ পরিয়া কাঁসি বাঁশী ও ঢোলের বাদ্যোদ্যম করিয়া গুটিদশ-বারো

বরযাত্রী সহযোগে রূপদমন বিবাহ করিতে গেল। মেয়ের গ্রাম দশ মাইল দূরে হইলে কি হয়, যাইতে-আসিতে তিন দিন লাগে। হাঁটিয়াই বিবাহ করিতে যাইতে হয়; যান-বাহনের ব্যবস্থা নাই তাহা বলাই বাহুল্য।

এইখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। যে কয়দিন রূপদমন বিবাহ উপলক্ষে গ্রামের বাহিরে ছিল, সে কয়দিন রাত্রে বাঘিনী গ্রামে খোঁজ লইতে আসে নাই বা ডাকাডাকি করে নাই। ইহা হইতে অনুমান হয়, রূপদমনের যাত্রাকালেই বাঘিনী জানিতে পারিয়াছিল যে সে বাহিরে যাইতেছে—হয়তো বনের মধ্যে তাহাকে বাজনা বাজাইয়া সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া যাইতে দেখিয়াছিল—এবং অলক্ষিতে যাত্রীদলের পিছু লইয়াছিল। বাঘিনী রূপদমনের অনুসরণ করিয়া ও-গ্রামে গিয়াছিল এবং ফিরিবার পথেও সবধূ রূপদমনকে লক্ষ্য করিতে করিতে আসিয়াছিল। ইহা অনুমান হইলেও পরবর্তী ঘটনায় তাহার সমর্থন পাওয়া যায়।

চতুর্থ দিন অপরাহ্ণে রূপদমন নববধূ লইয়া বাড়ি ফিরিল। গ্রামে পেঁছিতে আর পোয়াটাক রাস্তা আছে, বাদ্যকরেরা মৃদু মৃদু বাজনা বাজাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় বিকট গর্জন ছাড়িয়া বাঘিনী কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া বরযাত্রীদলের দশগজ সম্মুখে থাবা পাতিয়া বসিল। রূপদমন দেখিল বাঘিনীর হলুদবর্ণ দেহখানা আগুনের হল্কার মত জ্বলিতেছে, তাহার সর্বাঙ্গ দিয়া যেন বিদ্যুতের শিখা বাহির হইতেছে। বাঘিনীর এমন ভয়ঙ্কর চেহারা সে আগে কখনও দেখে নাই, তাহার পারার মত উজ্জ্বল চোখদুটি একবার রূপদমন ও একবার তাহার বধূর উপর তড়িদ্বেগে যাতায়াত করিতেছে। সে আর একবার গর্জন ছাড়িল; মনে হইল, ক্রোধে হিংসায় সে এখনি ফাটিয়া পড়িবে।

তাহার আকস্মিক আবির্ভাবে সকলে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল; বাদ্যকরেরাও নীরব হইয়া ছিল। কিন্তু কেহ ভয় পাইয়া এদিক-ওদিক পলাইবার চেষ্টা করে নাই। এসময় দলবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকাই যে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ তাহা তাহারা জানিত। রূপদমন সম্মুখেই ছিল, তাহার একবার ইচ্ছা হইল দল ছাড়িয়া বাঘিনীর কাছে গিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু বাঘিনীর মূর্তি দেখিয়া তাহার ভয় হইল, সে বুঝিল আজ বাঘিনী তাহাকে হাতের কাছে পাইলে মারিয়া ফেলিবে—তাহার সমস্ত ভালবাসা মারাত্মক হিংসায় পরিণত হইয়াছে। রূপদমন পা বাড়াইতে সাহস করিল না। পা না বাড়াইবার আর একটা কারণ ছিল, নববধূ ভয় পাইয়া তাহাকে সবলে জড়াইয়া ধরিয়াছিল।

বাঘিনী সেদিন বোধ হয় তাহাদের ছাড়িত না, দলের মধ্যে হইতেই ঘাড় ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইত। কিন্তু এই সময় বাধা পড়িল। গাঁয়ের লোকেরা বাজনার আওয়াজ শুনিতে পাইয়াছিল, তাহারা দল বাঁধিয়া হল্লা করিতে করিতে বরবধূকে আগাইয়া লইতে আসিয়াছিল। বাঘিনী পিছন দিকে মানুষের কলরব শুনিতে পাইয়া ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল; সুযোগ বুঝিয়া বরযাত্রীদলের বাজন্দারেরাও সজোরে বাজনা বাজাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। বাঘিনী আর পারিল না, ব্যর্থ আক্রোশে দুইবার ল্যাজ আছড়াইয়া গরজাইতে গরজাইতে পাশের জঙ্গলে গিয়া ঢুকিল। যাইবার আগে নবদম্পতির প্রতি যে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গেল তাহার সরল অর্থ বুঝিতে রূপদমনের কষ্ট হইল না।

পরদিন বাঘিনী বনে কাষ্ঠাহরণরতা একটি স্ত্রীলোককে মারিল। দ্বিতীয় দিন আর একটি। এইভাবে আরম্ভ হইয়া বাঘিনীর প্রতিহিংসা যেন গ্রামের সমস্ত নারি-জাতির উপরেই সংক্রামিত হইল। মেয়েদের ঘরের বাহির হওয়া বন্ধ হইল।

এইভাবে দেড় বৎসর কাটিয়াছে। রূপদমনের স্ত্রীকে মারিবার চেষ্টাতেই হয়তো

বাঘিনী সম্মুখে যে স্ত্রীলোককে পাইয়াছে তাহাকেই বধ করিয়াছে; কিন্তু তাহার ঈর্ষাবিষাক্ত জিঘাংসা তৃপ্ত হয় নাই। রূপদমনের বিশ্বাস বাঘিনী যদি বাঁচিয়া থাকিত তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত তাহার স্ত্রীকে না মারিয়া ছাড়িত না।

পরদিন দ্বিপ্রহরে ফিরিয়া চলিয়াছি।

প্রথম পাহাড়ের ডগায় উঠিয়া পিছু ফিরিয়া তাকাইলাম। নিম্নে উপত্যকার প্রান্তস্থিত ক্ষুদ্র গ্রামটি যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া নিশ্চিন্ত আলস্যে মাধ্যন্দিন রৌদ্র উপভোগ :। আর তাহার ভয় নাই, এখন হইতে গ্রামের মেয়েরা নির্ভয়ে বনে কাঠ যাইবে, জলাশয়ে জল আনিতে যাইবে। গ্রামের সহজ বৈচিত্র্যহীন জীবনযাত্রা আবার আরম্ভ হইবে। রূপদমনের বধূ বোধহয় স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া প্রথম মন খুলিয়া হাসিবে। কিন্তু রূপদমনের মনের কাঁটা কখনও দূর হইবে কি?

এই গ্রামে, নরসমাজ হইতে একান্ত বিজনে, জঙ্গল ও পাহাড়ের আদিম বাতাবরণের মধ্যে, এক স্বভাব-হিংস্র পশুর সহিত একজন মানুষের প্রণয়ের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। সার্কাসের মাদক-বিমূঢ় জন্তুর সহিত কৌশলী মানুষের লোকদেখানো হৃদ্যতা নয়, সত্যকার অকৃত্রিম ভালবাসা। এবং অকৃত্রিম বলিয়াই বোধহয় শেষে উহা এমন ভয়ানক রূপধারণ করিয়াছিল।

অনেকে এ কাহিনী বিশ্বাস করিবেন না। মানি, বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু এতই কি অসম্ভব? নিজের কথা বলিতে পারি, আমি রূপদমনের গল্প অবিশ্বাস করিতে পারি নাই।

২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২

দিগ্‌দর্শন

মাঘের সন্ধ্যায় গ্রামের মাথার উপরকার বায়ুস্তরে সাঁঝাল ধোঁয়ার ধূসর আস্তরণ বেশ ভারী হইয়া চাপিয়া বসিয়াছিল; যেন শীতরাত্রির ভয়ে গ্রামটি তাড়াতাড়ি গুটি-সুটি পাকাইয়া ভোটকম্বলের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

গ্রাম কিন্তু ঘুমায় নাই। ঐ সাঁঝাল ধোঁয়ার মত একটা গুরুভার দুর্ভাবনা গ্রামের দীনতম প্রজা হইতে জমিদার পর্যন্ত সকলের বুকের উপর চাপিয়াছিল। বৈকুণ্ঠবাবুকে প্রজারা ভালবাসিত এবং শ্রদ্ধা করিত; কারণ তিনি দরদী লোক ছিলেন, জমিদারীর ভার

নায়েব-গোমস্তার হাতে তুলিয়া দিয়া নিজে শহরে গিয়া বাস করেন নাই। তাই সকলের মনেই আশঙ্কা জাগিতেছিল, না জানি আজিকার রাত্রিটা কেমন কাটিবে; সুদূর সমুদ্র-পার হইতে যে সংবাদ আসিবার কথা, তাহা কিরূপ বার্তা বহন করিয়া আনিবে।

গ্রামের মাঝখানে জমিদারের প্রকাণ্ড বাড়ির ঘরে ঘরে আলো জ্বলিয়াছে; পরিজন, দাসদাসী চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু সকলেই পা টিপিয়া টিপিয়া হাঁটিতেছে কাহারও মুখে কথা নাই, কথা বলিবার একান্ত প্রয়োজন হইলে ফিস্‌ফিস্ করিয়া কথা বলিতেছে। যেন বাড়িতে কোথাও মুমূর্ষু রোগী অন্তিমশয্যায় পড়িয়া আছে, একটু শব্দ করিলে তাহার শেষ বিশ্রামে বিঘ্ন ঘটিবে।

সদর বৈঠকখানার ফরাসের উপর জমিদার বৈকুণ্ঠবাবু তাকিয়ায় কনুই রাখিয়া একাকী বসিয়াছিলেন। সম্মুখে দুইটি কাচের বাতিদানে মোমবাতি জ্বলিতেছিল। গড়গড়ার নলটি বাঁ-হাতে মুখের কাছে ধরা ছিল, মাঝে মাঝে তাহাতে মৃদু টান দিতেছিলেন। গায়ে একটি জাম রঙের বহরমপুরী বালাপোষ জড়ানো; গৌরবর্ণ দীর্ঘাঙ্গ পুরুষ, বয়স ষাটের কাছাকাছি; মুখে এমন একটি শুদ্ধ-সাত্ত্বিক বুদ্ধির দীপ্তি আছে যে, দেখিলে বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণপণ্ডিত বলিয়া মনে হয়।

বৈকুণ্ঠ শান্তভাবেই বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন; কিন্তু তাঁহার বুকের ভিতরটা তোলপাড় করিতেছিল। যখন প্রতীক্ষা করা ছাড়া আর কোনও কাজ থাকে না, তখন সময় যেন কাটিতে চায় না—কর্মহীন মুহূর্তগুলা পঙ্গুর মত এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হয়। আজ রাত্রি আটটার মধ্যে বিলাতী 'তার' আসিয়া পৌঁছিবার কথা; বৈকুণ্ঠ তাঁহার ছোট নায়েব প্রফুল্লকে সন্ধ্যার পূর্বেই ডাকঘরে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু ছয় ক্রোশ দূরে মহকুমা শহরে টেলিগ্রাফ অফিস; সুতরাং নয়টার পূর্বে কোনক্রমেই সংবাদ পাওয়া সম্ভব নয়। প্রফুল্ল অবশ্য বাইসিকেলে গিয়াছে—

বৈকুণ্ঠ দরজার মাথার উপর প্রাচীন ঘড়িটার দিকে তাকাইলেন। সাড়ে ছয়টা। এখনও আড়াই ঘণ্টা দেরি। সময়কে হাত দিয়া ঠেলিয়া দেওয়া যায় না।

দশ বছর ধরিয়া জমিদার বৈকুণ্ঠবাবু একটি মামলা লড়িতেছেন। মামুলী মামলা নয়—একেবারে জমিদারীর স্বত্বাধিকার লইয়া বিবাদ; জিতিলে সর্বস্ব বজায় থাকিবে, হারিলে পথে দাঁড়াইতে হইবে। দশ বৎসর এই মোকদ্দমা স্তরে স্তরে ঊর্ধ্বতর আদালতে উঠিয়া শেষে একেবারে চরম আদালত বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলে পৌঁছিয়াছে। সেখানে কয়েক মাস শুনানী চলিবার পর আজ রায় বাহির হইবার দিন। বৈকুণ্ঠের জীবনে এক মহা-সন্ধিক্ষণ আসন্ন হইয়াছে,—তিনি যেমন আছেন তেমনি থাকিবেন অথবা পথের ভিখারী হইবেন, তাহা আজ চরমভাবে নিষ্পন্ন হইয়া যাইবে।

অন্দরের ঠাকুরঘরে গৃহদেবতার শীতল ভোগের ঘণ্টি বাজিল। বৈকুণ্ঠ হাতের নল নামাইয়া রাখিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করিলেন। আজই কি তাঁহার শেষ পূজা? কাল প্রভাতে কি তাঁহার গৃহদেবতার পূজার অধিকার থাকিবে না? অন্য যজমান আসিয়া পূজা করিবে?

দীর্ঘশ্বাস দমন করিয়া বৈকুণ্ঠ আবার ঘড়ির দিকে তাকাইলেন—ছ'টা পঁয়ত্রিশ। মাত্র পাঁচ মিনিট কাটিয়াছে। আর তো সহ্য হয় না। মাসের পর মাস তিনি নীরবে শান্ত মুখে প্রতীক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু আজ যখন সময় একেবারে আসন্ন হইয়াছে, তখন আর তাঁহার মন ধৈর্য মানিতেছে না। অসহ্য এই সংশয়। এর চেয়ে যাহোক একটা কিছু হইয়া যাক।

গত কয়েকমাস ধরিয়া যে প্রলোভনটি তিনি অতি যত্নে দমন করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা আবার তাঁহার মনের মধ্যে মাথা তুলিল। দেখাই যাক না! অদূর ভবিষ্যৎ এখনই

তো বর্তমানে পরিণত হইবে—তবে আর ইতস্তত করিয়া কি লাভ। সংশয়ের যন্ত্রণা ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠিতেছে।

বালাপোষখানা কাঁধের উপর টানিয়া লইয়া বৈকুণ্ঠ ডাকিলেন—'হরিশ।'

হরিশ জমিদারীর ম্যানেজার। মোটা ধরণের মধ্যবয়স্ক লোক, গায়ের রঙ কালো, মাথার চুল খোঁচা খোঁচা; গত কয়দিনের দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় চোখের কোলে কালি পড়িয়াছে, গালের মাংস ঝুলিয়া পড়িয়াছে। হরিশ দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, উদ্বিগ্ন-চক্ষে প্রভুর মুখের পানে চাহিয়া ভাঙা গলায় বলিলেন—'কি দাদা?' নিজের অজ্ঞাতসারেই তাঁহার গলার স্বর একেবারে বসিয়া গিয়াছে।

বৈকুণ্ঠ তাহার পানে চাহিয়া একটু হাসিলেন, সহজ গলায় বলিলেন—'এস, এক বাজি রঙে বসা যাক।'

হরিশের কালিমালিপ্ত চোখে ভয়ের ছায়া পড়িল; তিনি বলিয়া উঠিলেন—'না না দাদা, কাজ নেই। আর তো ঘণ্টা দুই—'

বৈকুণ্ঠ বলিলেন—'তাইতো বলছি, এস খেলা যাক। নিষ্পত্তি যা হবার তা তো হয়েই গেছে, তবে আর খবরটা পেতে দেরি করি কেন? এস।'

হরিশ আর না বলিতে পারিলেন না; পাশার ছক পাতিয়া দুজনে খেলিতে বসিলেন। প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক সত্ত্বেও বৈকুণ্ঠ ও হরিশের মধ্যে একটা গভীরতর সম্বন্ধ ছিল, দীর্ঘ সংশ্রবের ফলে উভয়ে উভয়ের সত্যকার পরিচয় পাইয়াছিলেন এবং সে পরিচয়ে কেহই নিরাশ হন নাই। তাই জীবনের প্রারম্ভে শুষ্ক বৈষয়িকতার মধ্যে যে সম্বন্ধের সূত্রপাত হইয়াছিল জীবনের প্রান্তে তাহাই অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে পরিণত হইয়াছে। আজ যদি দুর্নিয়তির চক্রান্তে বৈকুণ্ঠকে পথে দাঁড়াইতেই হয়, হরিশও তাহার পাশে গিয়াই দাঁড়াইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পাশা খেলা আরম্ভ হইল। বৈকুণ্ঠের এই পাশা খেলার মধ্যে এক আশ্চর্য রহস্য নিহিত ছিল। ত্রিকালদর্শী জ্যোতির্বিদ যেমন নির্ভুল ভাবে ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া বলিতে পারেন, বৈকুণ্ঠও তেমনি পাশা খেলার ফলাফলের দ্বারা নিজের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ নির্ণয় করিতে পারিতেন। আজিকার কথা নয়, প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে খেলাচ্ছলেই তিনি এই বিস্ময়কর আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তারপর শতবার ইহার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে—পাশার ফলাফল কখনও ব্যর্থ হয় নাই। খেলায় জিতিলে বৈকুণ্ঠ বুঝিতেন আগামী সমস্যায় শুভ ফল ফলিবে, হারিলে বুঝিতেন কুফল অনিবার্য।

কালক্রমে এই পাশা খেলা তাঁহার জীবনে দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ছোট-বড় কোনও সমস্যা বা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হইলেই তিনি হরিশের সহিত রঙ খেলিতে বসিতেন। রঙের বাজি ব্যর্থ হইত না। বৈকুণ্ঠ নিঃসংশয় মনে অমোঘ ভবিষ্যতের পরীক্ষা করিতেন।

কিন্তু আজিকার এই জীবন-মরণ সমস্যার ফলাফল তিনি এই উপায়ে জানিবার চেষ্টা করেন নাই, বার বার ইচ্ছা হইলেও শেষ পর্যন্ত ভয়ে পিছাইয়া গিয়াছিলেন। কি জানি কি ফল দেখা যাইবে! যদি সত্যই মোকদ্দমায় হারিতে হয়, আগে হইতে জানিয়া দুর্বিষহ মানসিক যন্ত্রণা দীর্ঘ করিয়া লাভ কি?

এতদিন এই বলিয়া মনকে বুঝাইয়াছিলেন, কিন্তু এখন আর পারিলেন না—খেলিতে বসিলেন। খেলার সময় বৈকুণ্ঠ ও হরিশের মধ্যে একটা অকথিত বোঝা-পড়া ছিল, হরিশ ইচ্ছা করিয়া হারিবার চেষ্টা করিবেন না। দুজনেই ভাল খেলোয়াড়, দেখিতে দেখিতে তাঁহারা খেলায় মগ্ন হইয়া গেলেন।

রাত্রি আটটার সময় খেলা শেষ হইল।

বৈকুণ্ঠ হারিলেন।

হরিশ কিছুক্ষণ বুদ্ধিভ্রষ্টের মত বসিয়া রহিলেন, তারপর চোখে কাপড় দিয়া উঠিয়া গেলেন।

বৈকুণ্ঠের মুখখানা পাথরের মত হইয়া গিয়াছিল, তিনি আবার গড়গড়ার নল হাতে লইয়া তাকিয়ায় ঠেস দিয়া বসিলেন। যাক, তাঁহার ভাগ্য-বিধাতা ইহাই তাঁহার জন্য সযত্নে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সারা জীবন ঐশ্বর্য ও মর্যাদার মধ্যে কাটাইয়া বৃদ্ধ বয়সে রিক্ত নিঃস্ব বেশে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া পথে দাঁড়াইতে হইবে। নিরাসক্ত সংসার চাহিয়া দেখিবে, নির্মম শত্রু হাততালি দিয়া হাসিবে। উদরের অন্ন—যাহার জন্য জীবনে কখনও ভাবেন নাই—তাহারই কথা একাগ্র হইয়া ভাবিতে হইবে। স্ত্রী-পুত্র-পৌত্রের ক্ষুধিত মুখ দেখিতে হইবে।

ইহার চেয়ে কি মৃত্যু ভাল নয়?...

মর্মান্তিক চিন্তার তিক্ত সমুদ্রে বৈকুণ্ঠ ডুবিয়া গিয়াছিলেন, সময়ের প্রতি লক্ষ্য ছিল না। হঠাৎ দ্বারের কাছে একটা শব্দ শুনিয়া তিনি চোখ তুলিলেন।

দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া হরিশ প্রবল উত্তেজনায় হাঁপাইতেছেন, চক্ষু যেন ঠিক-রাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে—হাতে বাদামী রঙের একটা খাম। অসম্বৃত কণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন—'দাদা—'তার'—'

বৈকুণ্ঠ করুণনেত্রে হরিশের পানে তাকাইলেন, নিজের দুঃখ ছাপাইয়া হরিশের জন্য তাঁহার বুকের ভিতরটা টন টন করিয়া উঠিল। বেচারা! তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেও ডুবিল।

গলার স্বর সংযত করিয়া তিনি বলিলেন—'তুমিই খুলে পড়।'

'না না, আপনি খুলুন, দাদা—' হরিশ স্খলিত পদে আসিয়া বৈকুণ্ঠের পাশে দাঁড়াইলেন—'প্রফুল্ল বলছে—পোস্ট-মাস্টার নাকি মিষ্টি খেতে চেয়েছে—বলেছে আমরা জিতেছি—'

বৈকুণ্ঠের চক্ষু দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া আবার নিভিয়া গেল, তিনি খাম ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে শুষ্কস্বরে বলিলেন—'পাগল! প্রফুল্ল ভুল শুনেছে—'

টেলিগ্রাম বাহির করিয়া পড়িলেন, লেখা রহিয়াছে—আন্তরিক অভিনন্দন, আপনি মোকদ্দমা জিতিয়াছেন।

বৈকুণ্ঠের চারিদিকে পৃথিবীটা একবার ঘুরিয়া উঠিল; তিনি সংজ্ঞা হারাইয়া তাকিয়ার উপর এলাইয়া পড়িলেন।

সানাই বাজিতেছে, ঢাকঢোল বাজিতেছে। জমিদার বাড়ি আপাদমস্তক আলোক-মালায় ঝলমল করিতেছে। প্রজারা দলে দলে আসিয়া বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া সংকীর্তন করিতেছে, নাচিতেছে, তরজা গাহিতেছে। অন্দরে মেয়েরা শীত ভুলিয়া হোলি খেলা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। রাত্রি শেষ হইতে চলিল, এখনও বিরাম নাই।

বৈকুণ্ঠ আবার সুস্থ হইয়াছেন, বৈঠকখানা ঘরে তাকিয়ে হেলান দিয়া নল হাতে বসিয়াছেন। তাঁহার হাতটা এখনও একটু একটু কাঁপিতেছে। অমানুষিক চেষ্টার পর দুস্তর নদী পার হইয়া সাঁতারু যেমন বেলাভূমির উপর লুটাইয়া পড়ে, তারপর আবার সার্থকতার তৃপ্তিতে তাহার অন্তর ভরিয়া ভরিয়া উঠিতে থাকে—বৈকুণ্ঠের দেহ-মনও

তেমনি অসীম তৃপ্তিতে ক্রমশঃ ভরিয়া উঠিতেছে। ঠাকুর মুখ রাখিয়াছেন। ঠাকুর—ঠাকুর—ঠাকুর—

চারিদিকে উৎসব কোলাহল, প্রিয়জনের মুখে হাসি! কিন্তু তবু এই পরিপূর্ণ সফলতার মধ্যেও বৈকুণ্ঠের জীবনের একটি নিভৃত কোণ যেন সহসা খালি হইয়া গিয়াছে, পাশা খেলার ফল ব্যর্থ হইয়াছে। আর পাশা খেলার উপর নির্ভর করিয়া ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় হওয়া চলিবে না—কাণ্ডারীর দিগ্‌দর্শন যন্ত্র হঠাৎ বান-চাল হইয়া গিয়াছে।

বৈকুণ্ঠের মনে হইল আজিকার এই পরম পরিপূর্ণ আনন্দের দিনে একটি আজীবনের বন্ধু তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

১০ শ্রাবণ ১৩৫২

স্মর-গরল

ভোরবেলায় রান্নাঘরের মেঝেয় উপু হইয়া বসিয়া শশী ঝি চা তৈয়ার করিতেছিল এবং মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছিল। তাহার সম্মুখে দুটি সুশ্রী গড়নের ভাল পেয়ালা, একটি মোটা চীনা-মাটির শক্ত পেয়ালা এবং একটি পিতলের গেলাস। গেলাসে দুধ রহিয়াছে। সৌখীন পেয়ালা দুটি মামাবাবু ও নবীনা মামীমার জন্যে; মোটা পেয়ালাটি রতনের; এবং পেয়ালায় দুধ ঢালিয়া গেলাসে যাহা বাকি থাকিবে তাহাতেই অবশিষ্ট চায়ের জল ঢালিয়া শশীর নিজের চা হইবে। শশী চা ছাঁকিতে ছাঁকিতে নিজের মনে হাসিতেছিল, যেন এই চা ছাঁকার ব্যাপারে অনেকখানি দুষ্ট রসিকতা জড়িত আছে।

এক জাতীয় লঙ্কা আছে যাহা কাঁচা বেলায় কালো থাকে, পাকিলে কালোর সহিত লাল মিশিয়া একটা গাঢ় ঘন বেগুনী বর্ণ ধারণ করে। শশীর গায়ের রঙ্ ঠিক সেই রকম; যেন তাহার চামড়ার নীচেই লাল এবং কালোর একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছে। শশীর বয়স তেইশ-চব্বিশ; আঁটসাঁট কঠিন কর্মঠ যৌবন তাহার দেহে—এবং মনে তাহার একটি আদিম ভাবনা। লঙ্কার সহিত উপমাটা টানিয়া লইয়া গেলে বলা যায়, তাহার মনের মধ্যেও লঙ্কার ঝালের মত একটা দাহ অহরহ জ্বলিতেছে। তাহার চোখের দৃষ্টি কেরাসিনের কুপির ধূম-দূষিত শিখার মত যেন অন্তরের ঐ অনির্বাণ দহনই প্রকাশ করিতেছে। সেকালে এই জাতীয় স্ত্রীলোকের একটি সংজ্ঞা ছিল—হস্তিনী।

চা ছাঁকা শেষ করিয়া শশী নিজের গেলাসে বেশী করিয়া চিনি মিশাইল, তারপর

আঁচল দিয়া গেলাস ধরিয়া এক চুমুক চায়ের আস্বাদ লইয়া গেলাস হাতে উঠিয়া গেল।

রান্নাঘরের পাশের ঘরটিতে রতন থাকে। রতন গৃহস্বামীর ভাগিনেয়; বয়স ষোল কি সতেরো। বয়সের হিসাবে তাহার দেহের পরিপুষ্টি বেশী হইয়াছে—দীর্ঘাঙ্গ স্বাস্থ্যবান ছেলে। কিন্তু তাহার দেহের পরিণতি যে পরিমাণ হইয়াছে মনের পরিণতি সে পরিমাণ হয় নাই; বুদ্ধিও খুব ধারালো নয়। সে এখন স্কুলে পড়ে। তাহার গোলগাল, নূতন গুম্ফরেখাচিহ্নিত মুখ দেখিয়া মনে হয় তাহার দেহ তাহার মন বুদ্ধিকে অনেক দূর পিছনে ফেলিয়া আগাইয়া গিয়াছে।

রতন নিজের দোরগোড়ায় দাঁড়াইয়া দাঁতন করিতেছিল, শশী আসিয়া খাটো গলায় বলিল—'দাদাবাবু, চা হয়েছে, মামাবাবু আর মামীমাকে দিয়ে এস গে।'

রতন চকিত হইয়া দাঁতন থামাইল। নূতন পরিস্থিতি অনুধাবন করিতে তাহার একটু সময় লাগিল, তারপর সে বলিল—'কেন, তুমি দিয়ে এস না।'

শশী ফিক করিয়া হাসিয়া জিভ কাটিল—'বাপ্‌রে, আমি কি ওঁদের ঘুম ভাঙাতে পারি! পাপ হবে যে।'

চোখ নাচাইয়া শশী চলিয়া গেল। রতন তাহার ইঙ্গিত কিছুই বুঝিল না, বিস্মিত হইয়া ভাবিল, ঘুম ভাঙাইলে পাপ হইবে কেন? যাহোক একটা কিছু করা দরকার। মামাবাবু প্রত্যহ চা তৈয়ার হইবার আগেই ওঠেন, আজ তাঁহার শয্যাত্যাগ করিতে দেরি হইয়াছে। অথচ চা ঠান্ডা হইয়া গেলেও তিনি বিরক্ত হন। রতন একটু ইতস্তত করিয়া মামাবাবুর শয়নকক্ষের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ, কিন্তু বন্ধ দরজার ওপার হইতে যেন চাপা কথা ও হাসির গুঞ্জন আসিতেছে। আতপ্ত বিছানার ক্রোড় হইতে ভাসিয়া আসা মিহি-মোটা মেশানো অর্ধস্ফুট কাকলি কানে আসিল কিন্তু কথাগুলি সে স্পষ্টভাবে ধরিতে পারিল না।

কিন্তু মামাবাবু জাগিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই; রতন দ্বারে মৃদু টোকা দিয়া বলিল—'মামাবাবু, চা তৈরি হয়েছে।'

ভিতরের কূজন ক্ষণকালের জন্য নীরব হইয়া আবার আরম্ভ হইল, তারপর মামা-বাবুর উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'নিয়ে আয় রতন।'

খুট করিয়া দরজার ছিট্‌কিনি খুলিয়া গেল, দরজা একটু ফাঁক হইল। ফাঁক দিয়া কাহাকেও দেখা গেল না, পাশের দিক হইতে একটি রমণীর বাহু বাহির হইয়া আসিল। শুভ্র নিটোল বাহু, প্রায় কাঁধ পর্যন্ত দেখা গেল; শাড়ির পাড় বা আঁচল তাহাকে কোথাও আবৃত করে নাই। বাহুটি রতনের হাত হইতে একটি পেয়ালা লইয়া ভিতরে অদৃশ্য হইয়া গেল, আবার ফিরিয়া আসিয়া দ্বিতীয় পেয়ালাটি লইয়া ধীরে ধীরে দ্বার ভেজাইয়া দিল।

রতন ক্ষণকাল অনড় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রথম সিগারেট খাওয়ার তীব্র উত্তেজনার সহিত যেমন মাথা ঘুরিয়া পেটের ভিতরটা গুলাইয়া উঠে, তেমনই রতনের শরীরের ভিতরটা যেন পাক দিয়া উঠিল, হঠাৎ শীত করার মত একটা রোমাঞ্চ তাহার গলায় বুকে বগলে ফুটিয়া উঠিল।

শশী ঝি কলতলায় বাসন মাজিতে আরম্ভ করিয়াছে। রতন ফিরিয়া গিয়া মুখে চোখে জল দিয়া রান্নাঘরের মেঝেয় উপু হইয়া চা খাইতে বসিল। সকালবেলার এই চা'টি তাহার অতিশয় প্রিয় কিন্তু আজ একচুমুক খাইয়া চা তাহার মুখে বিস্বাদ ঠেকিল। তাহার মনে হইল, অকস্মাৎ তাহার জীবনে একটা নূতন কিছু আবির্ভাবের ফলে সমস্তই যেন ওলট-পালট বে-বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে।

আর একটু আগে হইতে বলা দরকার।

বিয়াল্লিশ বছর বয়সে শশাঙ্কবাবু—অর্থাৎ মামাবাবু—দ্বিতীয় পক্ষ বিবাহ করিলেন। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর সাত বৎসর তিনি নিষ্কলঙ্ক নিষ্কাম জীবন যাপন করিয়াছিলেন, লোকে মনে করিয়াছিল তিনি আর বিবাহ করিবেন না। তিনি কলিকাতায় থাকিয়া ভাল চাকরি করেন; পাড়ায় মানসম্ভ্রমও আছে। শরীর বেশ তাজা ও মজবুত। নিজের সন্তানাদি না থাকায় প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর মাতৃ-পিতৃহীন ভাগিনেয় রতনকে নিজের কাছে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। কলিকাতার একটি ক্ষুদ্র বাড়িতে তাঁহার জীবনযাত্রা একরকম নিরুপদ্রবেই কাটিয়া যাইতেছিল। কিন্তু বিয়াল্লিশ বছর বয়সে কেন জানিনা তাঁহার মনের গতি পরিবর্তিত হইল, তিনি আবার বিবাহ করিয়া নূতন বধূ ঘরে আনিলেন। পুন্নাম নরকের ভয়ে এই কার্য করিলেন কিংবা অন্য কোনও মনস্তত্ত্বঘটিত কারণ ছিল তাহা বলা শক্ত। শোনা যায়, এই বয়সটাতে নাকি যৌন প্রকৃতির নিবন্ত প্রদীপ একবার উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিয়া উঠে।

বধূটির নাম শান্তি; বয়স উনিশ-কুড়ি। মুখচোখ তেমন ভাল না হইলেও গায়ের রং বেশ ফরসা। তন্বী নয় কিন্তু দীর্ঘাঙ্গী। রূপ যত না থাক, তাহার দেহে যৌবনের ঢলঢল প্রাচুর্যই তাহাকে কমনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। পুরন্ত বুক, পুরন্ত ঠোঁট; সারা দেহে যেন পূর্ণ যৌবনের শ্লথমন্থর মদালসতা। শশাঙ্কবাবু তাঁহার সাত বৎসরের সংযম জীর্ণ-বস্ত্রের মত ফেলিয়া দিয়া যৌবনের এই ভরা নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন।

রতনের মনের উপর এই বিবাহের প্রতিক্রিয়া প্রথমে কিছুই হয় নাই। সে শান্তশিষ্ট ভালমানুষ ছেলে, মামার সংসারে থাকিয়া পড়াশুনা করিত ও মাঝে মাঝে মামার দুই-চারিটা ফরমাস খাটিত। তাই, সংসারে দুইটি মানুষের স্থলে যখন তিনটি মানুষ হইল তখনও তাহার জীবনের ধারা আগের মতই রহিল। শান্তির মনটি ভাল, আসিয়াই স্বামীর গলগ্রহটিকে বিষচক্ষে দেখে নাই, বরং তাহাকে স্বামীগৃহের একটি অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিল। শান্তির প্রকৃতি একটু মন্থর, আরামপ্রিয় ও আত্মকেন্দ্রিক, তবু বিবাহের মাস দেড়েকের মধ্যে রতনের সহিত তাহার অল্প ভাব হইয়াছিল। রতন একে বয়সে কনিষ্ঠ, তার উপর সম্পর্কেও ছোট, শান্তি তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিত, মাঝে মাঝে ছোটখাট ফরমাস করিত। একদিন তাহাকে বলিয়াছিল—'রতন, ইস্কুল থেকে ফেরবার সময় আমার জন্যে চকোলেট কিনে এনো তো।' রতন পরম আহ্লাদের সহিত চকোলেট আনিয়া দিয়াছিল।

তারপর একদিন ফাল্গুন মাসের সকালবেলা রতনের অন্তর্জীবনে অকস্মাৎ কী এক বিপর্যয় হইয়া গেল; বারুদের অন্তর্নিহিত নিষ্ক্রিয় দাহিকাশক্তি আচমকা আগুনের স্পর্শে প্রচন্ডবেগে বিস্ফুরিত হইয়া উঠিল।

সেদিন স্কুলে গিয়াও রতনের মন সুস্থ হইল না, একটা অশান্ত উদ্বেগ শারীরিক পীড়ার মত তাহার দেহটাকে নিগৃহীত করিতে লাগিল; মাঝে মাঝে কান দুটা গরম হইয়া অসম্ভব রকম জ্বালা করিতে লাগিল। আর তাহার চোখের সামনে ভাসিতে লাগিল—একটি নিটোল শুভ্র নগ্ন বাহু...

পরদিন সকালবেলা যখন চা তৈয়ার হইল, মামাবাবুর দরজা তখন খোলে নাই। শশী ঝি মুচকি হাসিয়া বলিল—'কাল আবার শনিবার গেছে, আজ কি আর এত শিগ্‌গির ঘুম ভাঙবে! যাও দাদাবাবু, ও'দের চা দিয়ে এস।'

শশীর কথার মধ্যে কিসের যেন ইঙ্গিত আছে, না বুঝিলেও তাহা মনকে বিক্ষিপ্ত করিয়া তোলে। রতন চায়ের পেয়ালা দুটি হাতে লইয়া শশাঙ্কবাবুর দরজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল; দেখিল দরজা একটু আল্‌গা হইয়া আছে। সে একবার গলা ঝাড়া

দিয়া ডাক দিল—'চা এনেছি।'

ভিতর হইতে ঘুমজড়িত কণ্ঠস্বর আসিল—'ভেতরে রেখে যাও রতন।'

রতনের বুকের ভিতরটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। সে পা দিয়া দরজা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরের বন্ধ বাতাস সমস্ত রাত্রির নিশ্বাসের তাপে ঈষদুষ্ণ হইয়া আছে: সেণ্ট্-ক্রীম-কেশতৈল মিশ্রিত একটি সুগন্ধ তাহাকে যেন আরও ভারী করিয়া রাখিয়াছে। বাহিরের ঠাণ্ডা বাতাস হইতে এই আবহাওয়ার মধ্যে প্রবেশ করিয়া রতনের স্নায়ুমণ্ডলী যেন কোন এক অনাস্বাদিত রসের আভাসে তীক্ষ্ন সজাগ হইয়া উঠিল। তাহার বুকের ধড়্ফড়ানি আরও বাড়িয়া গেল।

বন্ধ জানালার কাচের ভিতর দিয়া অল্প আলো আসিতেছিল। রতন শয্যার দিকে না তাকাইয়াও শয্যার খানিকটা দেখিতে পাইল......ঠুন্ করিয়া চুড়ির মৃদু আওয়াজ আসিল। রতন নিশ্বাস রোধ করিয়া ঘরের মাঝখানে একটি টেবিলের দিকে চলিল। টেবিলের উপর চায়ের পেয়ালা রাখিতে গিয়া সে দেখিল, শান্তির গলার হার, ব্লাউজ ও কাঁচুলি অবহেলাভরে সেখানে ছড়ানো রহিয়াছে। রতন হঠাৎ চোখ বুজিয়া পেয়ালা দুটি ঠক্ করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহার বুকের রক্ত তখন এমন তোলপাড় করিতেছে যে মনে হইতেছে হৃৎপিণ্ডটা বুঝি এখনি ফাটিয়া যাইবে।

কলতলায় গিয়া তপ্ত মুখখানা ধুইয়া ফেলিবার জন্য জলের চৌবাচ্চায় ঘটি ডুবাইতেই শশী বাসন মাজিতে মাজিতে মুখ তুলিয়া চাহিল; তাহার মুখ দেখিয়া শশী অনিমেষে তাকাইয়া রহিল, তারপর চাপা হাসিয়া বলিল—'ওমা, তোমার মুখ অমন রাঙা কেন, দাদাবাবু! কিছু দেখে ফেললে নাকি?'

রতন বিহ্বলভাবে বলিল—'না না—'

বলিয়াই শশীর দিকে চাহিয়া সে স্তব্ধ হইয়া গেল। শশী বাসন মাজার প্রয়োজনে দুই বাহু হইতে কাপড় কাঁধ পর্যন্ত তুলিয়া দিয়াছিল, রতন দেখিল—সেই বাহু! নিকষের মত কালো বটে কিন্তু তেমনি নিটোল চিক্কণ সাবলীলতায় যেন ময়াল সাপের মত দুলিতেছে!

শশীর অভিজ্ঞ চক্ষু রতনের পরিবর্তন আগেই লক্ষ্য করিয়াছিল; সে বুঝিয়াছিল। নিজের দিকে আড়চোখে তাকাইয়া সে হাতের পোঁচা দিয়া কাঁধের কাপড় একটু নামাইয়া দিল, চোখ নীচু করিয়া গদ্‌গদ স্বরে বলিল—'দাদাবাবু, তুমি আর ছেলেমানুষটি নেই—বড় হয়েছ।'

রতন আর সেখানে দাঁড়াইল না, হাতের ঘটি ফেলিয়া দুড়্‌দুড়্ করিয়া ছাদে উঠিয়া গেল।

ছোট এক ফালি ছাদ, বুক পর্যন্ত পাঁচিল দিয়া ঘেরা। রতন গিয়া দক্ষিণ দিকের পাঁচিলে হাত রাখিয়া দাঁড়াইল। ফাল্গুন প্রভাতের গায়েকাঁটা-দেওয়া নরম হাওয়া তাহার উত্তপ্ত মুখে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। কিন্তু, ঐ হাওয়ার স্পর্শে কী ছিল, রতনের মন ঠাণ্ডা হইল না, বরং আরও অধীর উদ্বেল হইয়া উঠিল।

জীবনের এই সন্ধিকালটি সুখময় সময় নয়; নবলব্ধ এক দুর্দম হর্ষবেগের তাড়নায় শান্তি সৌম্যতা সব নষ্ট হইয়া যায়। যাহাদের জীবনে এই রিপুর অভিযান অকস্মাৎ আসে, নিরস্ত্র অভিজ্ঞতাহীন বয়সে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা মারাত্মক হইয়া ওঠে।

রতনের চোখে পৃথিবীর চেহারা বদলাইয়া গেল; যাহা এতদিন নিষ্কাম নিষ্কলুষ তপোভূমি ছিল তাহাই সাক্ষাৎ কামরূপী হইয়া দাঁড়াইল। যেদিকে সে চক্ষু ফিরায় সেই

দিকেই যেন কামের লীলা চলিতেছে। বাহ্য জগৎ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া মনের মধ্যে লুকাইয়াও রক্ষা নাই; সেখানে কল্পনার ক্রিয়া এতই বাড়িয়া গিয়াছে যে বাস্তব জগৎ তাহার কাছে বর্ণ গরিমায় ম্লান হইয়া যায়,—একটি বাস্তব বাহু কল্পনা সৃষ্ট দেহের সংযুক্ত হইয়া দুর্দমনীয় উন্মাদনার কারণ হইয়া ওঠে।

রতন কল্পনাপ্রবণ ছেলে নয়, বরং বিপরীত; কিন্তু তাহার কল্পনাতে ইন্ধন যোগাই-বার মত যথেষ্ট উপকরণ বাড়িতেই ছিল। বাঁধভাঙ্গা বন্যার প্রথম প্রবল উচ্ছ্বাস যেমন ক্রমশ প্রশমিত হয়, রতনের তরুণ জীবনে প্রবৃত্তির এই প্রথম প্লাবন হয়তো কালক্রমে শান্ত হইয়া স্বাভাবিক আকার ধারণ করিত, কিন্তু বাড়ির রিরংসাসিক্ত আবহাওয়ায় তাহার সে সুযোগ মিলিল না। শশীর 'চলন-বলন' কটাক্ষ-ইঙ্গিত তো ছিলই, তাহার উপর নব পরিণীত মামা-মামীর আচরণ তাঁহাদের অজ্ঞাতসারেই রতনের পক্ষে সাংঘাতিক হইয়া উঠিয়াছিল।

শশাঙ্কবাবু মধ্য বয়সে যৌবনবতী ভার্যা বিবাহ করিয়াছিলেন, হয়তো বয়সের বৈষম্যের জন্য তাঁহার অন্তরের গোপন কোণে একটু আত্ম-সংকোচ বা inferiority complex ছিল, তাহাই চাপা দিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার আচরণে একটু মৃদু রকম exhibitionism প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। প্রথম লজ্জা কাটিয়া যাইবার পর তিনি তাঁহার দাম্পত্য জীবনকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখিবার জন্য আর বিশেষ যত্নবান রহিলেন না। রতনকে হয়তো নেহাত ছেলেমানুষ মনে করিয়াই তিনি তাহার সম্মুখে সমস্ত সাবধানতা ত্যাগ করিলেন। শান্তি প্রথমটা সংকোচ করিত, কিন্তু তাহার লজ্জাও ক্রমে উদাসীনতায় শিথিল হইয়া পড়িল। একদিন রবিবার অপরাহ্ণে শশী কাজ করিতে আসিয়া চুপি চুপি রতনের ঘরে প্রবেশ করিল। রতন পড়ার টেবিলে বসিয়া কি একটা করিতেছিল, শশী তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ফিসফিস করিয়া বলিল—'দাদাবাবু, মামা-মামীর ঘরের খবরটা একবার নিয়ে এলে না? সেখানে যে—' বলিয়া গলার মধ্যে হাসিয়া রতনের গায়ে ঢলিয়া পড়িল। রতন শিহরিয়া বলিল—'কেন, কি হয়েছে?'

'মুখে আর কত বলব, নিজের চোখেই দেখে এস না, চোখ সার্থক হবে।' বলিয়া শশী সারা অঙ্গ হিল্লোলিত করিয়া হাসি চাপিতে চাপিতে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ মূঢ়ের মত বসিয়া থাকিয়া রতন আস্তে আস্তে উঠিয়া বাহিরে গেল। লম্বা বারান্দার অন্য প্রান্তে মামাবাবুর ঘর। ঘরের দরজা খানিকটা ফাঁক হইয়া আছে, তাহার ভিতর দিয়া শয্যা দেখা যায়...দুইজন আত্মবিস্মৃত নরনারী—তাহারা ছাড়া পৃথিবীতে যে আর কেহ আছে সে জ্ঞান তাহাদের নাই...

রতন ছুটিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল, বালিশে মুখ গুঁজিয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল।

শশী কখন নিঃশব্দে আসিয়া তাহার বিছানায় বসিয়াছে সে জানিতে পারে নাই, গালের উপর শশীর করস্পর্শে চমকিয়া আরক্ত চোখ মেলিল। শশী তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া প্রায় গালের উপর মুখ রাখিয়া বলিল—'কি হয়েছে দাদাবাবু? অমন করছ কেন?'

রতন কাঁপা গলায় বলিয়া উঠিল—'কি হয়েছে—আমি জানি না—'

শশী তেমনি ভাবে গালে গাল রাখিয়া বলিল—'কি হয়েছে আমি বুঝিয়ে দেব।—এখন নয়; রাত্তিরে মামা-মামী ঘুমোলে চুপি চুপি উঠে সদর দরজা খুলে দিও। আমি আসব।—বুঝলে?'

দুই সপ্তাহ কাটিয়াছে।

প্রবল জ্বরের তাড়সে অঘোর অচৈতন্য হইয়া রতন বিছানায় পড়িয়া ছিল। তাহার দেহ যেন কোন বিষের জ্বালায় পুড়িয়া যাইতেছে; সারা গায়ে চাকা চাকা রক্তবর্ণ দাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শশাঙ্কবাবু ডাক্তার ডাকাইলেন। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া শশাঙ্কবাবুকে আড়ালে ডাকিয়া যাহা বলিলেন তাহা শুনিয়া শশাঙ্কবাবু একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন, তারপর ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন। নবপরিণীতা পত্নীর সম্মুখে তাঁহার বাড়িতে এমন কুৎসিত ব্যাপার ঘটিল, ইহাতে তাঁহার ক্রোধ আরও গগনস্পর্শী হইয়া উঠিল। কাঁপিতে কাঁপিতে রতনের ঘরে গিয়া তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন—'বেরিয়ে যা এই দণ্ডে আমার বাড়ি থেকে, হতভাগা কুলাঙ্গার।'

রতন বিহ্বল ভাবে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করিয়া চাহিয়া রহিল, তারপর অবরুদ্ধ স্বরে বলিল—'মামাবাবু, আমার জ্বর হয়েছে—'

'জ্বর হয়েছে! নচ্ছার পাপী কোথাকার।—যাও—এখনি বিদেয় হও। আমার বাড়িতে ও পাপের বিষ ছড়াতে দেব না।—উঃ, দুধকলা খাইয়ে আমি কালসাপ পুষেছিলুম—'

রতন টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল, দেয়াল ধরিয়া ধরিয়া স্খলিতপদে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল।...রাস্তায় লোকজনের ব্যস্ত যাতায়াত...পৃথিবীটা কোন্ যাদুকরের মন্ত্রবলে লাল হইয়া গিয়াছে...রক্তাভ কুয়াসার ভিতর দিয়া রাক্ষসের মত একটা মিলিটারী লরী ছুটিয়া আসিতেছে—রতন ফুটপাথ হইতে নামিয়া তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল...

রতনের মৃত্যুটা অপঘাত কিংবা আত্মহত্যা তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

২৭ অগ্রহায়ণ ১৩৫২

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে কলিকাতা শহরে এখানে ওখানে গুটিকয়েক লোন্-অফিস ছিল, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর তাহাদের সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে। লোন্ অফিসের মহাজনী কারবার অতি সরল ও সহজ। অভাবগ্রস্ত মানুষ নিজের অস্থাবর সম্পত্তি—ঘটি বাটি ঘড়ি কলম আনিয়া বন্ধক রাখিয়া টাকা লয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই টাকা শোধ হয় না, সময়ের মেয়াদ ফুরাইলে বন্ধকী মাল লোন্ অফিসের সম্পত্তি

হইয়া যায়। তখন তাহারা ঐ মাল নিজেদের শো-কেসে সাজাইয়া রাখে এবং সন্ধানী খরিদ্দারের নিকট লাভে বিক্রয় করে।

নগেন যুদ্ধের মরশুমে একটি লোন্-অফিস খুলিয়া বেশ গুছাইয়া লইয়াছিল। দেশে অভাবগ্রস্ত মানুষের কোনও দিনই অভাব নাই, তাহার উপর সাদা-কালো বহুজাতীয় সৈনিকের শুভাগমনে নগেনের ব্যবসা জাপানী খেল্না-বেলুনের মত অতি সহজেই ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিয়াছিল। বীর যোদ্ধৃগণের দৈহিক ক্ষুধা-তৃষ্ণা যখন দুর্নিবার হইয়া ওঠে তখন তাঁহারা বন্ধক রাখিতে পারেন না এমন জিনিস নাই।

নগেনের বয়স বেশী নয়, ত্রিশের নীচেই। সদ্‌বংশে জন্মিবার ফলে সে কয়েকটি নৈতিক সংস্কার লইয়া জন্মিয়াছিল, যদিও অর্থোপার্জনের সদসৎ উপায় সম্বন্ধে বাঙালী ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও নৈতিক সংস্কারই নাই। জুতা সেলাই হইতে চণ্ডী-পাঠ পর্যন্ত সব কাজই আমরা নিন্দাভাজন না হইয়া করিতে পারি যদি তাহাতে অর্থলাভ হয়। এই জন্যই বোধ হয় দারোগা হওয়ার আশীর্বাদকে আমরা নিছক পরিহাস বলিয়া গ্রহণ করি না এবং কালো-বাজারের কালীয় নাগদের প্রতি আমাদের বিদ্বেষও তেমন মারাত্মক হইয়া উঠিতে পারে নাই।

কিন্তু এসব অবান্তর কথা থাক। নগেনের সাফল্যমণ্ডিত বাহ্য জীবন হইতে তাহার অন্তর্জীবনে যেবস্তু প্রবেশ করিয়াছিল তাহার কথাই বলিব। তৎপূর্বে আর একটি কথা বলিয়া লওয়া প্রয়োজন; ইহাও অবশ্য নগেনের অন্তর্লোকের কথা এবং অতিশয় গুহ্য।

বয়স ত্রিশের কাছাকাছি হইলেও নগেন স্বাস্থ্যবান যুবক, তাহার রক্তের তাপ এখনও কমিতে আরম্ভ করে নাই। কিন্তু তাহার স্ত্রী ক্ষণিকা—সংক্ষেপে ক্ষণা—মাত্র তেইশ বছর বয়সেই তাহার ক্ষণযৌবনকে বিদায় দিয়াছিল। শুধু দেহের দিক দিয়া নয়, মনের দিক দিয়াও। ক্ষণা দেখিতে মন্দ নয়, নবযৌবনের আবির্ভাবে তাহার দেহে একটি শান্ত শ্রী দেখা দিয়াছিল; কিন্তু উপর্যুপরি দুইটি মৃত সন্তান প্রসব করিবার পর, তাহার দেহলাবণ্য তো গিয়াছিলই নারীত্বও যেন হঠাৎ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। যাহা রহিয়া গিয়াছিল তাহা গৃহকর্মনিপুণ সচল সবাক একটি যন্ত্র মাত্র।

নগেন চরিত্রবান যুবক কিন্তু সহজ স্বাস্থ্যবান পুরুষের ক্ষুধাতৃষ্ণা তাহার ছিল। তাই তাহার দাম্পত্য জীবনের এই অপ্রত্যাশিত অনাবৃষ্টি তাহার অন্তরের কাঁচা ফসলকে শুকাইয়া তুলিতেছিল। খাল কাটিয়া জলসিঞ্চনের কথা তাহার মনেই আসে না—তাহার মন সে ছাঁচে গঠিত নয় কিন্তু বঞ্চিত ব্যর্থ-যৌবনের ক্ষোভ তাহার নিভৃত অন্তরে সঞ্চিত হইয়া কোনও অনর্থের সৃষ্টি করিতেছিল কিনা তাহা কেবল বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরাই বলিতে পারেন।

হয়তো আমার এই কাহিনীর সহিত নগেনের নিরুদ্ধ ক্ষোভের কোনও সম্বন্ধ নাই। কিম্বা—কে বলিতে পারে!

১৯৪২ সালের শেষের দিকে কলিকাতা শহরে নানা বিজাতীয় সৈনিকের আবির্ভাবে তিল ফেলিবার ঠাঁই ছিল না; এমন বিভিন্ন বর্ণের ও বিভিন্ন আকৃতির মানুষ একই স্থানে সমবেত হইতে পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই। এই সময়ে নগেনের লোন্ অফিসে একটি লোক আসিল। মিলিটারী পোশাক পরা লম্বা জোয়ান; মাথার চুল কাফ্রির মত কোঁকড়ানো, গায়ের রং নারিকেল ছোব্ড়ার ন্যায়, চোখের মণি নীল। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলিল, 'আমি একটা জিনিস বন্ধক রেখে টাকা চাই।'

সে পকেট হইতে একটি ছুরি বাহির করিল। ছুরি না বলিয়া ছোরা বলিলেই ভাল হয়, যদিও পেন্সিল-কাটা ছুরির মত উহা ভাঁজ করিয়া বন্ধ করা যায়। হাড়ের বাঁট দীর্ঘকালের ব্যবহারে ও তামাকের রসে বাদামী হইয়া গিয়াছে কিন্তু ফলাটা

সতেজ উগ্রতায় ঝকঝক করিতেছে। ফলাটা প্রায় ছয় ইঞ্চি লম্বা, কিন্তু এমন অদ্ভুত তাহার গঠন দেখিলেই চমকিয়া উঠিতে হয়। নগেন সম্মোহিতের মত দেখিতে লাগিল। ছুরিটা যেন ছুরি নয়, বৃশ্চিকের মত ক্রূর জীবন্ত একটা প্রাণী; তাহার ফলাটা বন্য পশুর দন্ত নিষ্কাশনের মত বর্বরোচিত হিংস্রতায় হাসিতেছে।

ছুরি হইতে চোখ তুলিয়া নগেন দেখিল, ছুরির মালিকও পোকায়-খাওয়া ঘষা দাঁত বাহির করিয়া ব্যঙ্গভরে হাসিতেছে। নগেনের ব্যবসাবুদ্ধি ফিরিয়া আসিল, সে ছুরিটা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া বলিল, 'তিন টাকা দিতে পারি।'

ছুরির মালিক বলিল, 'আমার পাঁচ টাকা চাই।'

নগেন আর দ্বিরুক্তি না করিয়া রসিদ লিখিয়া তাহাকে পাঁচ টাকা দিল। সাত দিনের মেয়াদ, ইহার মধ্যে টাকা শোধ না করিতে পারিলে ছুরি বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। লোকটা রসিদ ও টাকা প্যাণ্টুলুনের পকেটে পুরিয়া বলিল, 'ছুরি সাবধানে রেখো, আমার বড় আদরের জিনিস। শিগ্‌গিরই আমি খালাস করে নিয়ে যাব।'

লোকটা কেমন একরকম ভাবে নগেনের দিকে তাকাইয়া একটু নড্ করিয়া চলিয়া গেল। নগেন কিছুক্ষণ দ্বারের পানে চাহিয়া রহিল। অদ্ভুত চেহারা লোকটার! কাফ্রির মত চুল, সাদা আদমির মত চোখ, এসিয়াবাসীর মত রঙ। যেন তিনটি মহাদেশের তিনজন মানুষকে একত্র করিয়া একটি মানুষ তৈয়ার হইয়াছে। কিম্বা ঐ একটা মানুষ হইতেই তিন মহাদেশের তিনটি জাতি বাহির হইয়া আসিয়াছে। লোকটার বয়স অনুমান করা যায় না; ত্রিশ বছরও হইতে পারে, আবার তিন হাজার বছর বলিলেও অসম্ভব মনে হয় না।

ছুরিটা টেবিলের উপর ছিল, সেটা তুলিয়া লইয়া নগেন আবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল। কি ধার! নগেন ছুরির ফলাটা নিজের রোমশ বাহুর উপর দিয়া একবার ক্ষুরের মত টানিয়া লইয়া গেল, লোমগুলি ঝরিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে একটা অপূর্ব হর্ষ তাহার দেহকে কণ্টকিত করিয়া তুলিল। অনুভূতির প্রকৃতিটা অজানা নয়, কিন্তু আরও তীব্র আরও কুটিল—পরকীয়া প্রীতির মত গোপন অপরাধের বিষ মেশানো।

সেদিন সমস্ত কাজকর্মের মধ্যে নগেনের মন ঐ ছুরির দিকেই পড়িয়া রহিল। তাহার মনে হইল, লোকটা যদি ছুরি উদ্ধার করিতে না আসে তো বেশ হয়। ছুরিটা তাহার হইয়া যাইবে; সে আর কাহাকেও বিক্রয় করিবে না।

ব্ল্যাক-আউটের কল্যাণে সন্ধ্যার সময়েই দোকান বন্ধ করিতে হয়। নগেন ছুরিটি সাবধানে সিন্দুকে বন্ধ করিয়া দোকানে তালা লাগাইয়া বাড়ি ফিরিল। কিছুদিন যাবৎ তাহার মনটা কেমন যেন নিঃসম্বল হইয়া ছিল, আজ তাহার মনে হইল সে হঠাৎ গুপ্তধন পাইয়াছে।

বাড়ি ফিরিয়া সে ক্ষণাকে ছুরির কথা বলিল না, দু'একবার বলি-বলি করিয়া থামিয়া গেল। ছুরিটা ব্যবহারিক জগতে এমন কিছু মহার্ঘ বস্তু নয়; তাছাড়া, নগেন নিজের মনের মধ্যে যে নূতন গুপ্তধন পাইয়াছে, ক্ষণাকে তাহার ভাগ দিতে রাজী নয়। একদিন ছিল যখন তাহারা মনের তুচ্ছতম অনুভূতিও আদানপ্রদান করিয়া সুখী হইত, কিন্তু এখন আর সেদিন নাই।

রাত্রির আহারাদি শেষ করিয়া নগেন শয়ন করিতে গেল। স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি ঘরে শয়ন করে, বছরখানেক হইতে এই ব্যবস্থাই চলিতেছে। বিছানায় শুইয়া কিছুক্ষণ বই পড়া নগেনের অভ্যাস, কিন্তু আজ আর বই পড়িতে ইচ্ছা হইল না। আলো নিভাইয়া সে শুইয়া পড়িল।

ঘুমাইয়া নগেন স্বপ্ন দেখিল, ছুরির মালিক হাতে ছুরি লইয়া দাঁড়াইয়া হাসিতেছে,

তাহার নীল চোখে উৎকট উল্লাস......কতকগুলো নগ্ন নধর মনুষ্যদেহ তাহার চারিপাশে তাল পাকাইতেছে; লোকটা হাসিতে হাসিতে তাহাদের দেহে ছুরি মারিতেছে। কিন্তু ইহা হত্যার লীলা নয়, ভোগের ক্রীড়া। কি সহজে ছুরি ঐ নগ্ন জীবন্ত মাংসের মধ্যে আমূল প্রবেশ করিতেছে আর রক্তাক্ত মুখে বাহির হইয়া আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে নগেনের শরীর উদ্দীপনায় আনচান করিতে লাগিল। নরম মাংসের উপর ছুরির ঐ পুনঃপুনঃ আঘাত তাহার ধমনীর রক্তে যেন আগুন ধরাইয়া দিল।

তীব্র উত্তেজনায় তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। এমন তীব্র উত্তেজনা সে অনেকদিন অনুভব করে নাই; তাহার দেহের ত্বক উত্তপ্ত হইয়া জ্বালা করিতেছে। সে কিছুক্ষণ বিছানায় বসিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে নামিল, অন্ধকারে হাতড়াইয়া পাশের ঘরে ক্ষণার শয্যার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণা ঘুমাইতেছে, ঘুমের মধ্যে একটা বিশ্রী শব্দ করিয়া তাহার নিশ্বাস পড়িতেছে। শয্যায় প্রবেশ করিতে গিয়া নগেন সরিয়া আসিল; শয্যার চারিদিকের বাতাস ক্ষণার নিশ্বাসের দূষিত বাষ্পে ভারী হইয়া উঠিয়াছে। একটা দৈহিক বিকর্ষণ নগেনের শরীরের মধ্যে বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। সে ফিরিয়া গিয়া এক গ্লাস জল পান করিয়া নিজের শয্যায় শুইয়া পড়িল।

পরদিন দোকানে গিয়া প্রথমেই নগেন সিন্দুক খুলিয়া ছুরির খবর লইল, ছুরি সিন্দুকের অন্ধকারের ভিতর হইতে চিকমিক করিয়া যেন তাহাকে অভিবাদন করিল। আশ্চর্য, ছুরিটা যেন কথা কয়। ফলা খুলিয়া বাঁটটা শক্ত করিয়া মুঠিতে ধরিতেই সে যেন সোল্লাসে বলিয়া উঠিল,—এই তো! এমনি ক'রে আমায় ধরতে হয়। এবার কোথাও বিঁধিয়ে দাও—! নরম জীবন্ত মাংস নেই? আমার কাজই তো নরম মাংসের মধ্যে বিঁধে যাওয়া—!

ঘরের কোণে একটা উঁচু টুলের উপর একটি মখমলের মোটা তাকিয়া রাখা ছিল; কেহ বাঁধা দিয়া গিয়াছে। নগেনের দৃষ্টি পড়িল সেটার উপর। ঘরে তখন অন্য মানুষ নাই; নগেন ছুরি পিছনে লুকাইয়া তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, তারপর সহসা ছুরি তুলিয়া সজোরে তাকিয়ার মধ্যে বসাইয়া দিল। একবার—দু'বার—তিনবার —দ্রুত পরম্পরায় আঘাত করিতে করিতে নগেন যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিল; তারপর আবার অকস্মাৎ তাহার রক্ত ঠান্ডা হইয়া গেল, অবসাদে মুষ্টি শিথিল হইয়া পড়িল। না, এ যেন দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাইবার চেষ্টা; মখমলের তাকিয়া নরম বটে কিন্তু রক্তমাংসের আস্বাদ তাহাতে নাই।

ছুরিটি সস্নেহে সিন্দুকে রাখিয়া দিয়া নগেন সমস্ত দিন লোন্ অফিসের কাজকর্ম করিল, কিন্তু তাহার মন একদণ্ডের তরেও নিরুদ্বেগ হইল না। প্রত্যেকটি নূতন খদ্দের তাহার দ্বার দিয়া প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তাহার বুকের ভিতরটা চম্‌কাইয়া ওঠে—ঐ বুঝি সেই লোকটা ছুরি ফিরাইয়া লইতে আসিল! লোকটা অবশ্য আসিল না; কিন্তু মাত্র পাঁচ টাকায় ছুরি বাঁধা রাখার জন্য তাহার অনুতাপ হইতে লাগিল, দশ টাকা কিংবা পনেরো টাকা দিলেই ভাল হইত, তাহা হইলে লোকটা সহজে ছুরি উদ্ধার করিতে পারিত না!

সন্ধ্যা হইতে না হইতে নগেন তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করিয়া ফেলিল, কি জানি লোকটা যদি আসিয়াই পড়ে! উপরন্তু ছুরিটা দোকানে রাখিয়া বাড়ি ফিরিতেও তাহার মন সরিল না। দোকানে রাত্রে কেহ থাকে না; যদি চোর ঢোকে? দিন কাল ভাল নয়; নগেন ছুরিটা পকেটে পুরিয়া লইল।

শীতের সন্ধ্যায় আকাশে মেঘ জমিয়া একেবারে অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল, গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছিল। কলিকাতা শহরের আলো পর্দানশীন হইয়া ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হইয়াছে, বাহিরে এক ফোঁটা আসিবার অধিকার নাই। সুতরাং পথ

দিয়া যে দু'একজন যাতায়াত করিতেছে তাহাদের অস্তিত্ব কেবল পদশব্দে অনুমান করা যায়। নগেনের অবশ্য বাড়ি বেশীদূর নয়, দশ মিনিটের রাস্তা, তার উপর পথও একান্ত পরিচিত। তবু নগেন সাবধানে হাঁটিতে লাগিল।

তিন-চার মিনিট হাঁটিবার পর তাহার মনে হইল, কে যেন তাহার পিছু লইয়াছে, পিছনে খসখস শব্দ হইতেছে। সে সতর্ক হইয়া ঘাড় ফিরাইল, কিন্তু অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইল না। পকেটে ছুরিটা শক্ত করিয়া ধরিয়া সে আরও দ্রুত পা চালাইল। পথ-ঘাট নিরাপদ নয়, এই ব্লাক-আউটের রাত্রে ঘাড়ের উপর গুণ্ডা লাফাইয়া পড়িলে মা বলিতেও নাই বাপ বলিতেও নাই।

পিছনে পায়ের শব্দ কিন্তু থামিল না, বরং আরও কাছে আসিয়াছে মনে হইল। নগেন চলিতে চলিতে ছুরিটা বাহির করিয়া ফলা খুলিয়া শক্তভাবে মুঠিতে ধরিল, তারপর হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কড়া সুরে বলিয়া উঠিল—'কে?'

পিছনে পদশব্দ খুব কাছে আসিয়া থামিয়া গিয়াছিল; নগেন কিন্তু কোনও মানুষ দেখিতে পাইল না। কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর তাহার মনে হইল, নীচে ফুটপাথের কাছে সাদা রঙের কী যেন একটা নড়িতেছে। সে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল; ক্রমশ ঐ সাদা বস্তুটা আকার ধারণ করিল। একটা সাদা কুকুর। নিতান্তই পথের কুকুর নির্জন পথে মানুষ দেখিয়া খাদ্যের আশায় তাহার সঙ্গ লইয়াছে।

নগেনের ঘনঘন নিশ্বাস পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল, কুকুর বুঝিতে পারিয়া তাহাব ভয় কমিল। শক্ত মুঠিতে ধরা ছুরিটা সে মুড়িয়া আবার পকেটে রাখিবার উপক্রম করিল।

কুকুরটা অস্পষ্টভাবে কুঁই কুঁই শব্দ করিতেছে, ফুটপাথের উপর পেট রাখিয়া সশঙ্কভাবে একটু একটু ল্যাজ নাড়িতেছে। নগেনের দুই চক্ষু হঠাৎ অন্ধকারে জ্বলিয়া উঠিল। সে সন্তর্পণে আবার ছুরির ফলা খুলিল; তাহার শরীরের মধ্যে রক্তের স্রোত প্রবল হর্ষোন্মাদনায় তোলপাড় করিয়া ছুটিতে লাগিল।

হাঁটু মুড়িয়া নগেন ফুটপাথের উপর অর্ধ-আনত হইয়া মুখে চুক্ চুক্ শব্দ করিল; কুকুরটা উৎসাহ পাইয়া প্রবল বেগে ল্যাজ নাড়িতে নাড়িতে হামাগুড়ি দিয়া তাহার কাছে আসিল। মানুষের কাছে এতখানি সমাদর সে কখনও পায় নাই।

হাতের নাগালের মধ্যে আসিতেই নগেন বিদ্যুদ্বেগে ছুরি চালাইল। 'ঘেউ' করিয়া একটা আর্ত চীৎকার—কুকুরটা বেশী দূর পালাইতে পারিল না, দু'পা সরিয়া গিয়া কাৎ হইয়া পড়িয়া গেল—

নগেন যখন বাড়ি পৌঁছিল তখন তৃপ্তি ও ক্লান্তিতে তাহার শরীর ভরিয়া উঠিতেছে। একটু হাসিয়া ক্ষণাকে বলিল, 'ক্লান্ত বোধ হচ্ছে, আজ বড় খাটুনি গেছে। একটু শুয়ে থাকি গে, খাবার হলে ডেকো।'

লুকাইয়া ছুরিটাকে ধুইয়া নগেন উহা বালিশের তলায় রাখিয়া দিল, তারপর নিশ্চিন্ততার নিশ্বাস ফেলিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। আঃ, কী আরাম! তাহার দেহমনে কোথাও এতটুকু অতৃপ্তি নাই।

পরের দিনটা একরকম নেশার ঝোঁকে কাটিয়া গেল। সকালে লোন্ অফিসে যাইবার পথে সে দেখিল, কুকুরটা ফুটপাথে মরিয়া পড়িয়া আছে, তাহার পাঁজরার সূক্ষ্ম কাটা দাগ হইতে রক্ত গড়াইয়া আছে। পথচারীরা তাহার সম্বন্ধে কোনই ঔৎসুক্য দেখাইতেছে না, পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছে। নগেনও মৃতদেহটা সম্বন্ধে কোনও ঔৎসুক্য অনুভব করিল না।

লোন্ অফিসে সমস্ত দিনটা আশঙ্কায় আশঙ্কায় কাটিল, কিন্তু সে লোকটা ছুরি উদ্ধার করিতে আসিল না। ছুরিটা আজ আর নগেন সিন্দুকে রাখে নাই,

নিজের কোটের বুক-পকেটে রাখিয়াছিল। বুকের কাছে তার স্পর্শটাও যেন পরম তৃপ্তিকর।

সন্ধ্যার সময় দোকান বন্ধ করিয়া সে বাড়ি ফিরিল। আজ আর পথে কোনও ব্যাপার ঘটিল না। বাড়ি আসিয়া যথাসময় আহারাদি করিয়া সে শুইয়া পড়িল। এই কয়দিনে ক্ষণার সহিত তাহার সম্বন্ধ যেন আরও শিথিল হইয়া গিয়াছে, নেহাত প্রয়োজন না হইলে কথা কহিতেও ইচ্ছা হয় না। ক্ষণার মনও তাহার সম্বন্ধে এতই নিরুৎসুক যে, স্বামীর জীবনে যে প্রকাণ্ড এক নূতন বস্তুর আবির্ভাব হইয়াছে তাহা সে অনুভবেও জানিতে পারে নাই।

গভীর রাত্রে নগেনের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে অনুভব করিল, ছুরিটা বালিশের তলায় থাকিয়া কথা কহিতেছে,—ছি ছি, এমন রাত্রিটা ঘুমিয়ে কাটালে! ভোগের শুভক্ষণ জীবনে ক'বার আসে? আমি আর কতদিন থাকব তোমার কাছে? কালই হয়তো আমার মালিক এসে আমাকে নিয়ে যাবে। ওঠ, ওঠ, এখনও সময় আছে—অন্ধকার নিরালা শহরে কত ছুটোছাটা শিকার ঘুরে বেড়াচ্ছে—কত লোক ফুটপাথে শুয়ে আছে—

নগেন বিছানায় উঠিয়া বসিল। ছুরিটা বালিশের তলা হইতে বাহির করিতেই তাহার সর্বাঙ্গ দিয়া তীব্র উত্তেজনার একটা শিহরণ বহিয়া গেল। সে শয্যা হইতে নামিয়া কোট পরিয়া গায়ে একটা র‍্যাপার জড়াইয়া লইল।

বাহিরে যাইতে হইলে ক্ষণার ঘর দিয়া যাইতে হয়, স্বতন্ত্র দ্বার নাই। নগেন নিঃশব্দ পদে ক্ষণার ঘরে গিয়া দেখিল, ক্ষণা লেপ গায়ে দিয়া ঘুমাইতেছে, তাহার মুখ দরজার দিকে। নিশ্বাস চাপিয়া নগেন দ্বারের দিকে গেল, কিন্তু হুড়কা খুলিতে গিয়া খুট করিয়া একটু শব্দ হইয়া গেল।

চমকিয়া জাগিয়া ক্ষণা বলিয়া উঠিল, 'কে?'

ঘরের কোণে তেলের রাত্রি-দ্বীপ তখনও নিভিয়া যায় নাই, ক্ষণা ঘাড় তুলিয়া নগেনকে দেখিয়া বলিল, 'ও—তুমি।' বলিয়া আবার চোখ বুজিল।

নগেনের বুকের ভিতরটা ধক্ ধক্ করিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ক্ষণা যখন কিছু সন্দেহ না করিয়া নিশ্চিন্তভাবে চক্ষু মুদিল, তখন নগেন বেশ শব্দ করিয়া বাহিরে গেল। বাহিরের খোলা বারান্দায় দাঁড়াইয়া সে ক্ষণেক চিন্তা করিল, আর যাওয়া চলিবে না—ক্ষণা জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহার বুকের মধ্যে অতৃপ্ত কামনা গুমরিয়া গুমরিয়া গর্জন করিতে লাগিল; ছুরিটাও যেন তাহার বদ্ধ মুষ্টির মধ্যে ফোঁস ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল। নগেন ফিরিয়া গিয়া সশব্দে দ্বার বন্ধ করিয়া নিজের বিছানায় শয়ন করিল।

পরদিনটা নগেনের অসহ্য মানসিক অস্থিরতার মধ্যে কাটিল। কিছুই ভাল লাগে না, কোনও কাজেই মন নাই; দিন যেন কাটে না। থাকিয়া থাকিয়া একটা দুর্দম আকাঙ্ক্ষা বুকের মধ্যে সাপের মত ফণা তুলিয়া উঠিতে থাকে। এইভাবে দিন কাটিবার পর নগেন বাড়ি ফিরিল, আহারে বসিয়া ক্ষণাকে বলিল, 'শোবার ঘরের দরজায় হুড়্কো লাগাবার কী দরকার? বাড়ি তো বন্ধই থাকে। কাল মিছিমিছি তোমার ঘুম ভেঙে গেল।'

ক্ষণা সরল মনে বলিল, 'বেশ, আজ থেকে দরজা ভেজিয়ে রাখব।'

রাত্রি ঠিক বারোটার সময় নগেন বিড়ালের মত নিঃশব্দপদে বাড়ি হইতে বাহির হইল। আজ আর ক্ষণা জাগিল না।

বাহিরে তখন নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের কম্বল মুড়ি দিয়া কলিকাতা শহর ঘুমাইতেছে। আকাশের তারাগুলো নগেনের মাথার আরও কাছে নামিয়া আসিয়া তাহার হাতের

ছুরির মতই নিষ্ঠুর হাসিতে লাগিল। নগেন নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত করিয়া নিশ্বাস গ্রহণ করিল, তারপর ক্ষুধার্ত শ্বাপদের মত এই অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

পরদিন সকালবেলা খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে নগেন দেখিল, স্টপ প্রেসে ছাপা হইয়াছে—গত রাত্রে কলিকাতার অমুক গলিতে একব্যক্তির মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে; মৃতদেহে ছয় সাতটি ছুরিকাঘাতের চিহ্ন ছিল। হত্যার কারণ বা হত্যাকারীর কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

সংবাদ পাঠ করিয়াও নগেনের মনের ভিতরটা প্রশান্ত নিস্তরঙ্গ হইয়া রহিল, এতটুকু চাঞ্চল্য সেখানে দেখা দিল না। কেবল একটি বিষয়ে তাহার মন সতর্ক হইয়া রহিল—কেহ জানিতে না পারে।

সে-রাত্রিটা গভীর স্বপ্নহীন নিদ্রায় কাটিল। বাঘ মহিষ মারিয়া আকণ্ঠ উদর পূর্ণ করিবার পর যেমন ঘুমায়, তেমনি আলস্যভারাক্রান্ত জড়ত্বভরা ঘুম নগেন ঘুমাইল।

কিন্তু পরদিন আবার তাহার ক্ষুধা জাগিয়া উঠিল। দুপুর রাত্রে আবার সে বাহির হইল।

আবার খবরের কাগজে বাহির হইল, রাস্তায় ছুরিকাহত একটি মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এ লইয়া বিশেষ হৈ চৈ হইল না, সারা পৃথিবী জুড়িয়া হত্যার যে মত্ত তাণ্ডব চলিয়াছে তাহাতে এই সামান্য একটা মানুষের মৃত্যু কাহাকেও উত্তেজিত করিতে পারিল না।

এইভাবে সাত দিনের মেয়াদ ফুরাইল। প্রায় প্রত্যহই একটি করিয়া বলি পড়িল।

সপ্তম দিনে দোকানে যাইতে যাইতে নগেন মনে মনে মতলব করিল, আজ যদি লোকটা ছুরি উদ্ধার করিতে আসে, সে বলিবে ছুরি হারাইয়া গিয়াছে, তোমার যত ইচ্ছা দাম লও। ছুরি সে কিছুতেই ফেরত দিবে না।

কিন্তু লোকটা আসিল না। সন্ধ্যা পাঁচটা পর্যন্ত দেখিয়া নগেন তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করিয়া ফেলিল, তারপর ছুরি পকেটে লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। তাহার যেন আনন্দ আর ধরিতেছে না—ছুরি এখন তাহার। আর ফেরত দিতে হইবে না। সে অনেকক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইল, তারপর অন্ধকার হইলে বাড়ি ফিরিল।

নিজের শয়নঘরের নির্জনতায় নগেন ছুরিটি খুলিয়া পরম স্নেহে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। কী সুন্দর জিনিস। এমন অপূর্ব বস্তু পৃথিবীতে আর আছে কি? ছুরিটিকে সে নিজের বুকে গলায় গালে স্পর্শ করিল। তাহার দেহ আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তারপর হঠাৎ ঘরের বাহিরে ক্ষণার সাড়া পাইয়া সে ক্ষিপ্রহস্তে ছুরি বালিশের তলায় লুকাইয়া ফেলিল।

সে-রাত্রে ঠিক বারোটার সময় তাহার ঘুম ভাঙিল; ছুরি যেন খোঁচা দিয়া ঘুম ভাঙাইয়া দিল। নগেন সম্পূর্ণ সজাগ হইয়া উঠিয়া বসিল; ভিতর হইতে তাগিদ আসিয়াছে, আজও বাহির হইতে হইবে। আজ ছুরিটি প্রথম তাহার নিজস্ব হইয়াছে, আজিকার রাত্রি বৃথা না যায়।

ক্ষণার ঘর দিয়া যাইবার সময় ক্ষণার শয্যার দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। দ্বারের দিকে যাইতে যাইতে সে থামিয়া গেল। ঈষদালোকিত ঘরে বিছানাটা অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে......চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে, তেমনি বিছানাটা নগেনকে টানিতে লাগিল। নগেন সতর্কভাবে শয্যার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল......ক্ষণাকে দেখা যাইতেছে, তাহার গায়ের লেপ সরিয়া গিয়াছে; ঘুমের মধ্যে তাহার দেহটা বিকলাঙ্গের মত অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়াছে, খোলা মুখ দিয়া সশব্দে নিশ্বাসপ্রশ্বাস বহিতেছে।

বিরাগ ও ঘৃণায় নগেনের মুখ বিকৃত হইয়া উঠিল। এই বীভৎস বিকলাঙ্গ

মূর্তিটা তাহার স্ত্রী! ইহাকেই লইয়া সে জীবন কাটাইতেছে! ছুরিটা ফিসফিস করিয়া তাহার কানে বলিতে লাগিল—বাইরে যাবার দরকার কি? একেই শেষ করে দাও। এই তো সুযোগ। দ্বিধা করছ? ছি ছি, সারা জীবন ধরে এই মড়া ঘাড়ে করে বেড়াবে! নাও নাও, আমি তো রয়েছি, বসিয়ে দাও ওর বুকে। জীবনের রঙ্ বদলে যাবে তোমার—আবার বিয়ে করতে পারবে—নতুন বৌ—

শুনিতে শুনিতে নগেন পাগল হইয়া গেল। তারপর কয়েক-মিনিটের কথা তাহার মনে নাই, যখন মাথাটা পরিষ্কার হইল তখন সে দেখিল, বিছানার উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া সে ক্ষণার বুকের উপর ছুরি বসাইতেছে। ক্ষণা একটু নড়েও নাই, যেমন শুইয়াছিল তেমনি মরিয়াছে।

সমগ্র চেতনা ফিরিয়া পাইয়া নগেন সভয়ে একবার ঘরের চারিদিকে তাকাইল, তারপর খাট হইতে নামিয়া দাঁড়াইল। পাগল হইয়া এ কী করিল সে! নিজের ঘরে খুন করিল! এখন লাস সরাইবে কি করিয়া? পাড়ায় জানাজানি হইবে। পুলিস আসিবে। পুলিস নিশ্চয় বাড়ি খানাতল্লাস করিবে—তখন ছুরি বাহির হইবে।

মেঝেয় বসিয়া পড়িয়া দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া নগেন ভাবিতে লাগিল ......ছুরিটা রক্তলিপ্ত অধরে তাহার কানে কানে কথা বলিতে লাগিল।—

পাঁচ মিনিট পরে নগেন তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আছে—উপায় আছে। সে ক্ষণার হাত হইতে সোনার চুড়িগুলি খুলিয়া লইল, গলা হইতে হার টানিয়া ছিঁড়িয়া পকেটে পুরিল। তারপর নিঃশব্দে বাড়ি হইতে বাহির হইল। ছুরি ও গহনাগুলা সে লোন্-অফিসে লুকাইয়া রাখিয়া আসিবে। তারপর—

অবয়বহীন ছায়ার মত সে পথ দিয়া ছুটিয়া চলিল। দশ মিনিটের পথ পাঁচ মিনিটে অতিক্রম করিয়া দোকানের রাস্তায় পড়িল।

দোকানের বন্ধ দরজায় ঠেস দিয়া কে একজন বসিয়া আছে। খুব কাছে না আসা পর্যন্ত নগেন তাহাকে দেখিতে পায় নাই, দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। লোকটাব মুখের কাছে অঙ্গারের মত চুরুটের আগুন জ্বলিতেছে; নগেনকে দেখিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল, মুখের কাছে মুখ আনিয়া বলিল, 'আহ্!'

নগেন চিনিল, ছুরির মালিক। সে জড়বৎ দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার মস্তিষ্ক আর কাজ করিতেছে না, এই অভাবনীয় সংস্থিতির ফলে যেন অসাড় হইয়া গিয়াছে। লোকটা বলিল, 'সন্ধ্যে থেকে এখানে বসে আছি; এত তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করেছিলে কেন? আমার ছুরি দাও।'

লোকটা হাত পাতিল। পকেটের মধ্যে ছুরি ও গহনাগুলা একসঙ্গে ছিল, নগেন যন্ত্রচালিতের মত সব কিছু বাহির করিয়া তাহার হাতে দিল।

লোকটার মুখে চুরুটের আগুন একটু উজ্জ্বল হইল, সে সম্মুখে ঝুঁকিয়া সেই আলোতে হাতের জিনিসগুলা পরীক্ষা করিল; তাহার নীল চক্ষুদুটা ও মুখের খানিকটা দেখা গেল। একটা অমানুষী উল্লাস তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল, গলার মধ্যে চাপা হাসির খসখস শব্দ হইল; যেন সে সব জানে, সব বুঝিয়াছে। তারপর হঠাৎ সে পিছু ফিরিয়া চলিতে আরম্ভ করিল; অন্ধকারে তাহার বুটের খট্‌খট্ শব্দ দূরে মিলাইয়া গেল।

নগেনের মনে হইল, তাহার দেহমনের সমস্ত শক্তি ফুরাইয়া গিয়াছে; দুর্বহ অবসাদ ও ক্লান্তি তাহাকে চাপিয়া মাটিতে মিলাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। এই কয়দিন সে একটা প্রবল নেশায় মত্ত হইয়া ছিল, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারে নাই; আজ হঠাৎ ছুরিটা চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে।

পা দু'টা অতিকষ্টে টানিয়া টানিয়া সে বাড়ি ফিরিল।

ক্ষণার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া বিছানার উপর ক্ষণার রক্তমাখা মৃতদেহটা দেখিয়া সে ভয়ে আর্তনাদ করিয়া উঠিল। সে জানে সে নিজেই এ কাজ করিয়াছে; তবু যেন ইহার জন্য সে দায়ী নহে। কোথাকার এক ভোগ-লোলুপ রাক্ষস ঐ অভিশপ্ত ছুরিটা পাইয়া নিজের লালসা চরিতার্থ করিয়াছে।

ছুটিতে ছুটিতে বাড়ির বাহির হইয়া সে পাশের বাড়ির দরজায় গিয়া সজোরে ধাক্কা দিতে লাগিল, 'ও মশায়, রমেশবাবু, শিগ্‌গির দরজা খুলুন—'

প্রতিবেশী ভদ্রলোক দরজা খুলিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'এ কি, কী হয়েছে!'

হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া নগেন বলিল, 'আমার স্ত্রীকে কারা খুন ক'রে রেখে গেছে।'

'অ্যাঁ! ঢুক্‌লো কি করে?'

'জানি না। হয়তো আমার স্ত্রী সদর দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল—তার হাতের চুড়ি গলার হার সব নিয়ে গেছে। আসুন শিগ্‌গির—'

ইহার পর প্রায় বছরখানেক কাটিয়া গিয়াছে। নগেন আবার বিবাহ করিয়াছে। নূতন বধূটি সুন্দরী নয়, কিন্তু উজ্জ্বল যৌবনবতী।

মাঝে মাঝে ছুরির কথা নগেনের মনে হয়। তখন তাহার শরীরের স্নায়ুপেশী শক্ত হইয়া ওঠে; সে দৃঢ়ভাবে চক্ষু বন্ধ করিয়া থাকে, প্রাণপণে ভুলিবার চেষ্টা করে। কিন্তু ছুরিটা তাহার জীবনে অভিশাপ কি আশীর্বাদ রূপে দেখা দিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারে না।

নবীনা বধূ পিছন হইতে আসিয়া তাহার কাঁধের উপর হাত রাখে, জিজ্ঞাসা করে, 'কিসের ধ্যান হচ্ছে?'

নগেনের স্নায়ুপেশীর কঠিনতা শিথিল হয়, ছুরির কথা আর তাহার মনে থাকে না। মন মাধুর্যে ভরিয়া ওঠে।

সে হাসিয়া বলে, 'তোমার।'

৩০ মাঘ ১৩৫২

নিষ্পত্তি

শহর হইতে মাইল তিনেক দূরে গঙ্গার তীরে একটি পাথরের টিলা আছে। মাটির দিক হইতে টিলাটি ধীরে ধীরে উঁচু হইয়াছে, কিন্তু গঙ্গার মুখোমুখি পৌঁছিয়া একেবারে হঠাৎ খাড়া নীচে নামিয়া গিয়াছে; মনে হয় গঙ্গাদেবী তাঁহার ক্ষুরধার স্রোতের

দ্বারা টিলাটির অর্ধেকটা কাটিয়া লইয়া গিয়াছেন। দূর প্রসারিত সমতলভূমির প্রান্তে নদীর কিনারে এই টিলা অনেক দূর হইতে দৃষ্টি আকর্ষণ করে; কিন্তু স্থানটি নির্জন, লোকজন বড় কেহ এদিকে আসে না। শোনা যায়, পুরাকালে কোন্ এক মুদ্‌গল মুনি এখানে বসিয়া তপস্যা করিতেন।

শরৎকালের এক স্বচ্ছ অপরাহ্ণে পরমেশবাবু গঙ্গার ধার দিয়া টিলার পানে চলিয়াছিলেন। সূর্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু পশ্চিম দিগ্‌বধূর বর্ণ-প্রসাধন এখনও আরম্ভ হয় নাই। গঙ্গার পালিশ করা সুচিক্কণ বুকে জলের গতি আছে, কিন্তু চঞ্চলতা নাই। পরমেশবাবুও চলিয়াছিলেন তৃপ্তি মন্থর চরণে; তাঁহার গতির একটা লক্ষ্য ছিল বটে, কিন্তু ত্বরা ছিল না।

পরমেশ কিছুদিন হইতে মনে একটি অচঞ্চল শান্তি অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহার বয়স এখন পঞ্চাশোর্ধে; সম্প্রতি মোটা পেন্সন লইয়া চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার গোলগাল শরীরটি এখনও বেশ নিরেট ও নিরাময় আছে। তিনি নিঃসন্তান; কয়েক বৎসর পূর্বে পত্নীও গত হইয়াছেন। এইরূপ সর্বাঙ্গীন অনুকূল অবস্থার মধ্যে পড়িয়া তাঁহার মনটি স্বভাবতই প্রসন্ন শান্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

চারিদিকে মুগ্ধ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে তিনি চলিয়াছিলেন, মনে মনে বলিতে-ছিলেন, 'আহা, মধু মধু—মধু বাতা ঋতায়তে—'

টিলার কাছাকাছি পৌঁছিয়া পরমেশের মনে পড়িল কেন তিনি বহুবর্ষ পরে এদিকে আসিয়াছেন। ছেলেবেলায় স্কুলে-কলেজে পড়ার সময় তিনি প্রায়ই এই টিলায় আসিয়া বসিতেন; কারণ তখন হইতেই তাঁহার মন ভাবপ্রবণ। কিন্তু গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে আর এদিকে আসা হয় নাই। পরমেশ সস্নেহ দৃষ্টিতে টিলা নিরীক্ষণ করিলেন; টিলা ঠিক তেমনই আছে। ত্রিশ বৎসরে কিছুমাত্র বদলায় নাই। ক্ষণেকের জন্য তাঁহার মনে হইল, ত্রিশ বৎসর বুঝি কাটে নাই, পৃথিবী যেমন ছিল তেমনি আছে। কিন্তু পরক্ষণে তাঁহার স্মরণ হইল, আজ সকালে তিনি একটি চিঠি পাইয়াছেন এবং তাহারই ফলে আজ এখানে আসিয়াছেন। তাঁহার মনের উপর একটি ছায়া পড়িল।

সকালবেলা তিনি যে চিঠি পাইয়াছেন তাহাতে এই কথাগুলি লেখা ছিল—

ভাই পরমেশ, আমাকে নিশ্চয় ভোলোনি। ইস্কুলে কলেজে একসঙ্গে পড়েছি; সর্বদা আমরা একসঙ্গে থাকতাম, প্রায় সন্ধ্যেবেলা সেই মুদ্‌গল মুনির পাহাড়ে গিয়ে বসতাম। লোকে বলত মাণিকজোড়। আমি সেই খোদন।

ছেলেবেলায় তুমিই ছিলে আমার প্রাণের বন্ধু— friend, philosopher and guide. তারপর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল, সে আজ কতদিনের কথা! তিরিশ বছরের কম নয়। সেই থেকে আর আমাদের দেখা হয়নি। কিন্তু তোমার কথা প্রত্যহ মনে পড়ে। অনেকবার মনে হয়েছে তোমাকে চিঠি লিখি, কিন্তু সংসারের নানা ঝঞ্ঝাটে লেখা হয়নি। তবে তুমি পেন্সন নিয়ে বাড়িতে আছ সে খবর পেয়েছি। আমারও তো পেন্সন নেবার সময় হল, কিন্তু—

ভাই, আমি বড় বিপদে পড়েছি। কী বিপদ তা চিঠিতে লেখা যাবে না। তোমার সঙ্গে দেখা করা দরকার কিন্তু তোমার বাড়িতে যাবার সাহস নেই। আগামী শুক্রবার সন্ধ্যার সময় তুমি যদি মুদ্‌গল মুনির টিলাতে যাও তাহলে আমার সঙ্গে দেখা হবে, তখন সব কথা বলব। ভাই, আমাকে উদ্ধার করতেই হবে; তুমি ছাড়া আর কেউ তা পারবে না। একলা এসো কেউ যেন জানতে না পারে। —তোমারই খোদন।

পুনঃ—পঞ্চাশটি টাকা সঙ্গে এনো; আমি তোমার কাছে ভিক্ষে চাইছি। যদি নিতান্তই না পারো অন্তত পঁচিশ টাকা এনো।

এতক্ষণে পরমেশ টিলার পাদমূলে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন; একটি নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি উপরে উঠিতে লাগিলেন। উঠিবার পথ চারিদিকে বড় বড় পাথরে আকীর্ণ সংসার পথের মতই দুর্গম। পরমেশের মনে পড়িল ছেলেবেলার খোদনের মুখ; সংসার চিন্তাহীন কাঁচ কিশোর মুখ। এখন তাহার চেহারা কেমন হইয়াছে কে জানে! পরমেশ একটু লজ্জিত হইয়া ভাবিলেন, গত ত্রিশ বছরের মধ্যে খোদনের স্মৃতি বোধ করি পাঁচ বারও তাঁহার মনে উদয় হয় নাই। অথচ একদিন সত্যই তাঁহারা অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন। কে জানে খোদনের কী বিপদ হইয়াছে।

টিলার ডগায় উঠিয়া তিনি কিন্তু খোদনের কথা ভুলিয়া গেলেন; চারিদিকের অপরূপ সৌন্দর্যে তাঁহার মন ভরিয়া গেল। আকাশে কাশপুষ্প উড়িতেছে, সম্মুখে সুদূর বিস্তার গঙ্গা। টিলাটি যেন একটি প্রকাণ্ড সিংহাসন, গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া বসানো হইয়াছে। পঞ্চাশ হাত নীচে তাহার প্রস্তরময় চরণ জলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। টিলার পাদমূলে গঙ্গার জল চঞ্চল, মজ্জিত পাথরে উপহত হইয়া কল কল শব্দে বহিয়া যাইতেছে।

পরমেশ হৃষ্টমনে উপবেশন করিলেন। কুলুঙ্গির মত বসিবার স্থান, পাথরের মেঝের উপর সবুজ মখমলের মত শ্যাওলার নরম আস্তরণ বিছানো রহিয়াছে। এখানে বসিলে পাশে বা পিছনে কিছু দেখা যায় না—কেবল পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত নদী ও বালুচর চোখের সম্মুখে বিস্তৃত হইয়া থাকে। এখানে জীবন ও মৃত্যুর ব্যবধান বড় কম, শরীরের ভারকেন্দ্র একটু বিচলিত হইলে পঞ্চাশ হাত নীচে পড়িয়া দেহত্যাগ অবশ্যম্ভাবী তো বটেই, সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গালাভ। মুদ্গল মুনি বাছিয়া বাছিয়া তপস্যা করিবার স্থানটি ভালই আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

জলকণাস্নিগ্ধ বায়ু পরমেশের ললাট স্পর্শ করিল। সূর্য প্রতীচীর দিকে আর একটু ঢলিয়াছে; নদীর বুকে রৌদ্রের প্রতিফলন কাঁসার বর্ণ ধারণ করিয়াছে। ওপারে চরের উপর কাশবনে কয়েকটি গরু চরিতেছে। পরমেশ মনে মনে বলিলেন,—'আহা—মাধুরীর্গাবো—'

এই রমণীয় নিসর্গ শোভা হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া পরমেশ সহসা চমকিয়া উঠিলেন; দেখিলেন পাশের দিকে হাত পাঁচ ছয় দূরে পাথরের চ্যাঙড়ের ওপারে একটি উট গলা বাড়াইয়া তাঁহার পানে চাহিয়া আছে। তিনি কেবল উটের মুখ হইতে গলা পর্যন্ত দেখিতে পাইলেন। উটের বোধ হয় কিছুদিন পূর্বে বসন্ত হইয়াছিল, কারণ তাহার মুখময় কালো কালো দাগ। তা ছাড়া, উট অন্তত দুই হপ্তা দাড়ি কামায় নাই, থলথলে অথচ শীর্ণ গালে রাশি রাশি কাঁচা-পাকা লোম গজাইয়াছে। রম্য পরিবেশের মাঝখানে এই বেখাপ্পা মূর্তি দেখিয়া পরমেশ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

উট তখন লম্বা লম্বা হলুদবর্ণ দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, 'চিনতে পারলে না—আমি খোদন। তোমাকে কিন্তু দেখেই চিনেছি।'

খোদন আসিয়া পরমেশের পাশে বসিল। বোতামহীন কামিজ ও ছেঁড়া ধুতির নোংরা মলিনতা অবর্ণনীয়; শরীরটা বোধ করি ততোধিক নোংরা। একটা দূষিত গন্ধ আসিয়া পরমেশের নাকে লাগিল। এই খোদন! দেখিলেও প্রত্যয় হয় না। কিন্তু পরমেশ লক্ষ্য করিলেন, এই ব্যক্তির নাকের ডগায় পরম পরিচিত একটি জটুল রহিয়াছে। সুতরাং চেহারার যত বদলই হোক, খোদনই বটে। কিন্তু খোদন এমন হইয়া গেল কি করিয়া!

পরমেশ গলাটা একবার ঝাড়িয়া প্রশ্ন করিলেন, 'কি হয়েছে তোমার?'

প্রশ্নটা একটু নীরস শুনাইল। এতদিন পরে বাল্যবন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ, কিন্তু চেষ্টা করিয়াও তিনি কণ্ঠস্বরে সহৃদয়তা আনিতে পারিলেন না।

খোদন ধূর্তভাবরা চক্ষুতে অনেকখানি করুণ রস সঞ্চারিত করিয়া হাত কচ্লাইতে লাগিল। তাহার শুধু চেহারার পরিবর্তন হয় নাই, মনের পরিবর্তন হইয়াছে। সে দমকা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'আরে ভাই, কথায় বলে দশচক্রে ভগবান ভূত। নইলে, ভাল চাকরি করছিলুম, ওপরওয়ালার সুনজরে ছিলুম, স্ত্রীপুত্র নিয়ে ঘর-সংসার করছিলুম—আমার আজ এ দশা হবে কেন?' এই পর্যন্ত বলিয়া হঠাৎ ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল, 'টাকাটা এনেছ তো ভাই?'

পরমেশ নিঃশব্দে পকেট হইতে পঞ্চাশ টাকার নোট বাহির করিয়া দিলেন। লুব্ধ ব্যগ্রতায় নোটগুলি ছোঁ মারিয়া লইয়া খোদন সেগুলি ক্ষিপ্রহস্তে গণিয়া দেখিল, তারপর অতি যত্নে কোমরে গুঁজিয়া রাখিতে রাখিতে বলিল, 'বাঁচালে। কিছুদিন এতেই চলবে।' তাহার ধূর্ত চক্ষু একবার পরমেশকে তীক্ষ্ণভাবে নিরীক্ষণ করিয়া লইল; যে লোক এককথায় পঞ্চাশ টাকা বাহির করিয়া দিতে পারে, তোয়াজ করিলে তাহার নিকট হইতে আরও অনেক টাকা দোহন করা যাইতে পারে, এই কথাটাই তাহার ধূর্ত দৃষ্টির আড়াল হইতে উঁকি মারিল। সে কণ্ঠস্বরে অনেকখানি চাটুতার রস নিঙড়াইয়া দিয়া বলিল, 'মহাপ্রাণ লোক ভাই তুমি। অনেক পুণ্যে তোমার মত বন্ধু পাওয়া যায়। ঠিক ছেলেবেলায় যেমনটি ছিলে এখনও তেমনি আছ। আর চেহারাও কি তোমার অতটুকু বদলায় নি! মনে হয় না যে বয়স হয়েছে।'

প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পেণীছিয়া এমন কথা শুনিলে মনে আনন্দ হইবার কথা। কিন্তু পরমেশ আনন্দ অনুভব করিলেন না; বরং তাঁহার মনটা কেমন ভারী হইয়া উঠিল। পশ্চিম দিকপ্রান্তে তখন দিনান্তের হোলিখেলা আরম্ভ হইয়াছে। শরতের দিনগুলি এমনি বর্ণগরিমায় আরম্ভ হয়, আবার এমনি প্রসন্ন লীলাবিলাসে সমাপ্ত হয়; তারপর ধীরে ধীরে চাঁদ উঠিয়া আসে। দিন ও রাত্রি, সীমা ও অসীম ওতপ্রোত একাকার হইয়া যায়—মহাকালের স্তিমিত নয়ন স্বপ্নাতুর হইয়া ওঠে—

পরমেশ ঈষৎ উদাসকণ্ঠে বলিলেন, 'তোমার এমন অবস্থা হল কি করে? কী করেছিলে?'

খোদন একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'ভাই, তোমার কাছে লুকিয়ে লাভ নেই—আমি পুলিসের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি।'

পরমেশের মনটা আরও ভারী হইয়া উঠিল। জীবনের অসংখ্য জটিলতা যেন আবার তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিতেছে। পুলিস! পুলিস নামক এক জাতীয় জীব যে পৃথিবীতে বাস করে একথা কিছুদিন যাবৎ তিনি ভুলিয়া ছিলেন।

'কেন? কি হয়েছিল?'

খোদন এবার সবিস্ময়ে নিজের জীবন কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল। এই ধরণের আত্মকথা মাঝে মাঝে পুস্তকাকারে প্রকাশ হয়; বক্তা অনুতাপচ্ছলে নিজের দুষ্কৃতির লোভনীয় ইতিহাস বর্ণনা করিয়া আনন্দ পায়। কণ্ডূয়ন প্রবৃত্তিই এই শ্রেণীর চরিত কথার মূল উৎস।

খোদন ভাল চাকরি পাইয়াছিল, বিবাহাদি করিয়া সংসারও পাতিয়াছিল; কিন্তু জীবনের সদ্ব্যবহার সে করে নাই। হয়তো সংসর্গদোষেই সে বিগ্ড়াইয়া গিয়াছিল। ক্রমে যোষিৎ আনন্দই তাহার বাঁচিয়া থাকার প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

পরমেশের মত সচ্চরিত্র বন্ধুর সৎসঙ্গের অভাবেই যে তাহার এমন অবনতি ঘটিয়াছিল তাহাতে খোদনের সন্দেহ নাই। কিন্তু সকলই গ্রহের ফের, অদৃষ্টের লিখন খণ্ডাইবে কে? নহিলে আজ তাহার কিসের অভাব। সে তিন শত টাকা পর্যন্ত মাহিনা পাইয়াছে, তা ছাড়া উপরিও যথেষ্ট ছিল। তবু শেষ বয়সে তাহার সর্বনাশ হইয়া গেল। দুর্দৈব আর কাহাকে বলে?

স্ত্রীজাতি অতি ভয়ঙ্কর জাতি। সারা জীবন ধরিয়া নাড়াচাড়া করিয়াও সে স্ত্রীজাতির নারকীয় চাতুরী চিনিতে পারিল না। শেষ বয়সে এক সর্বনাশী কুহকিনীর খপ্পরে পড়িল। খোদনের কোনই দোষ ছিল না, স্ত্রীলোকই তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া মোহের নাগপাশে বাঁধিয়া ফেলিল—

তারপর দোহন আরম্ভ হইল। টাকা চাই, সিল্কের শাড়ি চাই, জড়োয়া গহনা চাই। কী করিবে বেচারা খোদন? শেষ পর্যন্ত দায়ে পড়িয়া সে গভর্নমেণ্টের টাকা চুরি করিল। চুরি অবশ্য সে করে নাই, ধার বলিয়াই লইয়াছিল; কিন্তু গভর্নমেণ্ট তাহা বুঝিল না, তাহার নামে ওয়ারেণ্ট জারি করিল। নিরুপায় দেখিয়া খোদন ফেরার হইয়াছে।

বরবর্ণিনী দিগ্বধূর জলক্রীড়া দেখিতে দেখিতে কতকটা অন্য মনেই পরমেশ বসিয়া ছিলেন; কিন্তু কথাগুলা কানে যাইতেছিল। শুনিতে শুনিতে তাহার মনে হইতেছিল, সূর্যে গ্রহণ লাগিয়াছে, বাতাস দুর্গন্ধ অশুচি ধূমে আবিল হইয়া উঠিয়াছে; তাঁহার অন্তর্লোকে প্রসন্নতার যে শুভজ্যোতি কিছুদিন ধরিয়া নিষ্কম্প শিখায় জ্বলিতেছিল তাহা নিভিয়া গিয়াছে।

শেষ করিয়া খোদন বলিল, 'কপালে লিখিতং ঝ্যাঁটা কোন্ শালা কিং া। নইলে কত লোক কত কি করে তাদের কিছু হয় না, চোর-দায়ে ধরা পড়লুম আমি। মাঝে মাঝে মনে হয়—দুত্তোর, সন্ন্যেসী হয়ে যাই; কিন্তু ভাই, সংসার ছাড়তে মন সরে না। হাজার হোক, আমি সংসারী মানুষ; বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতে কি ভাল লাগে? তার ওপর শরীরে একটা পাজি রোগ ঢুকেছে—'

পরমেশ খোদনের কৃষ্ণবিন্দু চিহ্নিত মুখের পানে চাহিলেন—'কি রোগ?'

খোদন কহিল, 'বললুম না ধরা পড়েছে রাধা। সবাই ফুর্তি করে, রোগ হবার বেলা আমি। চিকিচ্ছে করবারও সময় পেলুম না, পালাতে হল। এখন তুমিই ভরসা তুমিই মরণ-বাঁচন। ছেলেবেলায় তোমার পরামর্শ শুনেই চলতুম, এখন তুমিই একটা বুদ্ধি দাও ভাই, যাতে এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাই। এ কষ্ট আর সহ্য হয় না।'

পরমেশের মনের ভিতরটা অন্ধকার হইয়া গেল—গাঢ় অন্ধকার—কিছু দেখা যায় না। তারপর ধীরে ধীরে রাহুগ্রস্ত সূর্য গ্রহণমুক্ত হইয়া বাহির হইয়া আসিল। সেই নবোন্মেষিত উগ্র আলোকে পরমেশ খোদনের মুক্তি-পথ দেখিতে পাইলেন। একমাত্র মুক্তি-পথ।

তিনি খোদনের দিকে ফিরিয়া সাগ্রহে বলিলেন, 'উদ্ধার পেতে চাও? একটা রাস্তা আছে—'

'কী—কী রাস্তা?'

'এই যে—' বলিয়া পরমেশ দুই হাতে সজোরে খোদনকে ঠেলিয়া দিলেন। খোদন কিছু বুঝিতে পারিবার আগেই শূন্যে একটা ডিগবাজি খাইয়া নীচে পড়িতে লাগিল।

পঞ্চাশ হাত নীচে গঙ্গার শিলা কণ্টকিত জলে ছপাৎ করিয়া শব্দ হইল।

পরমেশ টিলা হইতে নামিয়া আসিলেন।

সূর্য অস্ত গিয়াছে। সন্ধ্যা কিরণের সুবর্ণ মদিরা ভাগীরথীর স্ফটিক পাত্রে টলমল করিতেছে। মুদিত আলোর কমল কলিকাটি কোন্ কনকচ্ছটা বিচ্ছুরিত নব প্রভাতের অভিমুখে ভাসিয়া চলিয়াছে কে জানে।

খোদন বলিয়া কি কেহ ছিল? অথবা পরমেশের অবচেতনার নক্রসঙ্কুল সমুদ্র হইতে তাহার বিকলাঙ্গ বীভৎস স্মৃতি বাহির হইয়া আসিয়াছিল? ভয়ের মুখোস—?

কষ্টের বিকৃত ভান—?

গঙ্গার তীরে দাঁড়াইয়া পরমেশ চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন। কোথাও জনমানব নাই। তিনি তখন জামা কাপড় খুলিয়া রাখিয়া গঙ্গার জলে অবতরণ করিলেন। শরীর শীতল হইল। আহা, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ—

স্নান শেষ করিয়া পরমেশ আবার বস্ত্রাদি পরিধান করিলেন। দূরে গঙ্গার ওপারে চরের উপর পাখি ডাকিল—টিট্টি-টিট্টিহি—

পরম পরিতৃপ্তির একটি নিশ্বাস ফেলিয়া পরমেশ অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন, 'আহা, মধু মধু—'

৩০ আষাঢ় ১৩৫৩

শাদা পৃথিবী

৬ আগস্ট ১৯৪৬

বিগ্ বেন্ ঘড়িতে মন্দ্র-মন্থর শব্দে তিনবার ঘণ্টা বাজিল। রাত্রি তিনটা। নৈশ লণ্ডনের হিমাচ্ছন্ন বাতাসে এই গম্ভীর নির্ঘোষ তরঙ্গ তুলিয়া বহুদূর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল।

স্যর জন্ হোয়াইট তাঁহার লাইব্রেরী কক্ষে একটি চামড়া-মোড়া চেয়ারে বসিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া ছিলেন। মাথার উপর একটিমাত্র বৈদ্যুতিক দীপ শাদা বিম্বাবরণের ভিতরে থাকিয়া স্যর জনের কেশহীন ডিম্বাকৃতি মস্তকের উপর আলোক প্রতিফলিত করিতেছিল। অশীতি বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ স্যর জন্ হোয়াইটের নাম জানে না এমন লোক পৃথিবীতে কমই আছে। একাধারে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, কর্মী ও ভাবুক! পাশ্চাত্য জগতে তিনি একজন ঋষি বলিয়া পরিচিত। তাঁহার প্রাণের উদারতা ও জ্ঞানের গভীরতার সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা একবাক্যে তাঁহাকে আধুনিক যুগের সক্রেটিস্ বলিয়া স্বীকার করেন। এত বয়সেও তাঁহার দৈহিক স্বাস্থ্য ও মানসিক সজীবতা অক্ষুণ্ণ আছে।

বিগ্ বেনের শব্দতরঙ্গ কানে আসিয়া আঘাত করিতেই স্যর জনের ধ্যানস্থির দেহ একটু নড়িয়া চড়িয়া উঠিল, তিনি দেয়ালের ঘড়ির দিকে চক্ষু তুলিলেন। রাত্রি তিনটা! পুরা ছয় ঘণ্টা তিনি এই ভাবে বসিয়া আছেন! কি ভাবিতেছিলেন? সহসা তাঁহার মস্তিষ্কের মধ্যে সহস্র আণবিক বোমার অসহ্য আলোকের মত একটা গগন-বিদারী দীপ্তি জ্বলিয়া উঠিল। যে-প্রশ্ন গত ছয় ঘণ্টা ধরিয়া তাঁহার মস্তিষ্ক আলোড়িত করিতেছিল—যে-প্রশ্ন তাঁহার দীর্ঘ জীবনের অধিকাংশ সময় জুড়িয়া

বসিয়া আছে—সেই প্রশ্নের পরিপূর্ণ উত্তর মন্ত্রদ্রষ্টা কবির মত তিনি চোখের সম্মুখে দেখিতে পাইলেন।

স্নায়ুপেশী শক্ত করিয়া স্যর জন্ ঘড়ির দিকেই তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার চিন্তার গগনলেহী স্পর্ধা যেন তাঁহার মনকে ক্ষণকালের জন্য অসাড় ও স্তম্ভিত করিয়া দিল। তারপর তিনি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ঘরে কেহ থাকিলে লক্ষ্য করিত তাঁহার দুই হাত ও হাঁটু থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

স্খলিতপদে স্যর জন্ কয়েকবার ঘরের কার্পেট-ঢাকা মেঝের উপর পায়চারি করিলেন, তারপর হঠাৎ ফিরিয়া ঘরের কোণের দিকে গেলেন। ঘরের কোণে একটি ছোট টেবিলের উপর টেলিফোন ছিল. স্যর জন্ কম্পিত হস্তে তাহা তুলিয়া লইলেন।

পার্লামেণ্টে তখন গণসভার অধিবেশন চলিতেছিল। স্যর জন্ প্রায় পনেরো মিনিট অপেক্ষা করিবাব পর টেলিফোনের অপর প্রান্তে গলার আওয়াজ শোনা গেল। বিব্রত অধীর কণ্ঠস্বর বলিল, 'হ্যালো স্যর জন্? এত রাত্রে কি হল আপনার?'

স্যর জন্ ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন. 'কে, উনি? শোনো. তোমার সঙ্গে ভয়ানক জরুরী কথা আছে—'

বিব্রত কণ্ঠস্বর বলিল, 'কিন্তু এখন যে আমি ভারি ব্যস্ত, দশমিনিট পরে বক্তৃতা দিতে হবে। নতুন গভর্মেণ্ট ভারতবর্ষের কালা আদমিগুলোকে নাই দিয়ে মাথায় তুলেছে—তার বিরুদ্ধে বক্তৃতা—'

স্যর জন্ বলিলেন, 'চুলোয় যাক তোমার বক্তৃতা—যেমন আছ তেমনি চলে এস। খবর আছে—বিরাট বিপুল খবর। এত বড় খবর পৃথিবীতে কেউ কখনও শোনেনি—'

ওদিকে কণ্ঠস্বর এবার আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল, 'কী খবর? কিসের খবর?'

একটু নীরব থাকিয়া স্যর জন্ বলিলেন. 'আমি মানুষের মুক্তিপথ খুঁজে পেয়েছি—শাদা মানুষের মুক্তিপথ—'

তাঁহার গলা কাঁপিয়া গেল।

৫ জানুয়ারী ১৯৪৭

ইংলণ্ডে একটি সংবাদপত্রের রবিবাসরীয় সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। সংবাদপত্রটি মধ্যমশ্রেণীর একটি টোরী পত্রিকা। প্রবন্ধ লেখক একজন খ্যাতিমান সাংবাদিক; অবসরকালে রাজনীতি সম্বন্ধে খেয়ালী জল্পনামূলক অপিচ বিজ্ঞান-গন্ধী নিবন্ধ লিখিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

তাঁহার বর্তমান রচনাটি সংক্ষেপে এইরূপ—

'মানুষের বিজ্ঞানবুদ্ধি তাহার বিবেকবুদ্ধিকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। ফলে সে আরাম বিলাস ও ভোগের বহু নূতন উপাদান পাইয়াছে, শত্রু ধ্বংস করিবার বহু ভয়ংকর অস্ত্রলাভ করিয়াছে; তাহার জীবন উপভোগ করিবার লালসা শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু তদনুপাতে পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া ভ্রাতৃভাবে বাস করিবার কোনও উদ্যমই দেখা যায় না। খৃষ্টের অনুশাসন মানুষের জীবনে ব্যর্থ হইয়াছে।

'ইহা রূঢ় সত্য; ইহাকে এড়াইবার উপায় নাই। সুতরাং সত্যকে সহজভাবে স্বীকার করিয়া সতর্কতার সহিত তাহার সম্মুখীন হওয়াই সমীচীন। মানুষের পশুমূলক জৈবপ্রবৃত্তি দেড় লক্ষ বৎসরের কর্ষণের ফলেও যখন উন্মূলিত হয় নাই তখন আগামী দু'চার বছরে যে নির্মূল হইবে এমন সম্ভাবনা সুদূর পরাহত বলিয়াই মনে হয়। কোনও কোনও দিব্যদর্শী মননশীল ব্যক্তি মনে করেন মনুষ্যজাতি সমষ্টিগত-ভাবে অচিরাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

'মনুষ্য সম্প্রদায় কয়েকটি বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইয়া পৃথিবীপৃষ্ঠের ভিন্ন

ভিন্ন ভূভাগ দখল করিয়া আছে। ইহাদের মধ্যে ক্রমাগত সংঘর্ষ চলিতেছে; যে জাতি ছোট সে বড় হইতে চায়, যে বড় সে আরও বড় হইতে চায়, ভূমির ক্ষুধা ইহাদের কিছুতেই মিটিতেছে না।

'ইহার অর্থ কি? কোন্ নিগূঢ় প্রবৃত্তি জাতিকে জাতির বিরুদ্ধে, এমন মারাত্মক ভাবে হিংস্র করিয়া তুলিয়াছে? সকলেই জানে এই বিস্তীর্ণা পৃথিবীতে সকলের জন্যই পর্যাপ্ত স্থান আছে—যৌথভাবে কাজ করিলে সকলের জন্যই প্রভূত খাদ্য উৎপন্ন করা যায়—তবু কেন এই মারামারি হানাহানি?

'বর্তমান যুগের বুদ্ধিজীবী মানুষ বোধহয় বুঝিতে পারিয়াছে যে পৃথিবী বিস্তীর্ণা হইলেও সীমাহীন নয়; মানুষের জনসংখ্যা যে-হারে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীতে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিবার স্থানাভাব ঘটিবে। মানুষের নিশ্বাস পৃথিবীর সমস্ত বাতাস শুষিয়া লইবে।......

'অন্যকে নিহত করিয়াও নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবার প্রবৃত্তি জীবের সহজাত। এমন কি, আত্মরক্ষার জন্য হত্যা করার অধিকার প্রত্যেক সভ্য-জাতির আইনে স্বীকার করা হইয়াছে। ইহা মানুষের অবিসম্বাদী অধিকার।......

'প্রত্যেক জাতি এই মৌলিক অধিকার রক্ষা করিবার জন্য অপর সকল জাতিকে বিদ্বেষ করিতেছে, তাহাদের বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। আণবিক বোমা আবিষ্কৃত হইয়াছে; আরও ভয়ংকর অস্ত্র ক্রমে আবিষ্কৃত হইবে। হয়তো ইতিমধ্যে গোপনে গোপনে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং অন্ধ হানাহানির ফলে সমগ্র মানব-জাতি যে সমূলে বিনষ্ট হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। দিব্যদর্শী পণ্ডিতের ভবিষ্যদ্বাণীই ফলিবে।

'ইহার কি প্রতিকার নাই? পৃথিবী হইতে মানুষের বিলোপ কি অনিবার্য? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে হইবে। বুদ্ধ যীশু গান্ধীর পথে চলিবার আর সময় নাই। ভাবালুতার বাষ্পোচ্ছ্বাসে এই সমস্যাকে ঘোলা করিয়া তোলাও নিরাপদ নয়; বিজ্ঞান যে-সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে বিজ্ঞানের নির্মোহ দৃষ্টি দিয়াই তাহাকে পরীক্ষা করিতে হইবে!

'ইহা কূট-বাক্য (paradox) বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু পৃথিবীর জনসংখ্যা কমানোই মানুষকে বাঁচাইয়া রাখিবার একমাত্র উপায়।......জন্ম নিয়ন্ত্রণের দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারিত, কিন্তু কোনও জাতি সজ্ঞানে নিজ জনসংখ্যা কমাইতে সম্মত হইবে না। পৃথিবী জুড়িয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিবার জন্য রেষারেষি চলিতেছে।

'জনসংখ্যা কমাইবার দ্বিতীয় উপায়—কোনও কোনও বিশেষ জাতিকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সমূলে উচ্ছেদ করিয়া ফেলা। সমগ্রের কল্যাণে অংশকে বিনাশ করা নৈতিক অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হয় না; মানুষের জীবন রক্ষার জন্য অনেক সময় অস্ত্রোপচার করিয়া তাহার হাত-পা কাটিয়া ফেলিতে হয়।......

'এখন প্রশ্ন এইঃ কাহাকে রাখিয়া কাহাকে নিঃশেষ করিয়া ফেলা যাইতে পারে?

'আধুনিক বিজ্ঞান পাশ্চাত্য শ্বেতজাতির সৃষ্টি; এই বিজ্ঞান মানুষকে যে-শক্তি দিয়াছে বর্তমানে একমাত্র শ্বেতজাতিই তাহার অধিকারী। অতএব জীবনযুদ্ধে বাঁচিয়া থাকিবার নিঃসংশয় দাবী যদি কাহারও থাকে তো সে শ্বেতজাতির। বসুন্ধরা বীর-ভোগ্যা।

'পৃথিবী হইতে বর্ণযুক্ত জাতি—কৃষ্ণ পীত বাদামী মিশ্র—যদি বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া যায়, তবে পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ ভূমি শূন্য হইয়া যাইবে। অসুবিধা হয়তো কিছু ঘটিবে, কিন্তু সুবিধার তুলনায় তাহা অকিঞ্চিৎকর। প্রধান কথা, মনুষ্য জাতি

—অন্তত তাহার একটা অংশ—রক্ষা পাইবে। জৈব আইনের ধারা survival of the fittest—অব্যাহত থাকিবে। মানুষে মানুষে ভূমি লইয়া কাড়াকাড়ির আর প্রয়োজন থাকিবে না। বর্ণ-সমস্যা থাকিবে না। অত্যন্ত দুই হাজার বৎসরের মধ্যে মানুষের আর নির্বাণ প্রাপ্তির ভয় থাকিবে না।

'এই দুই হাজার বৎসরে মানুষ কি নিজেকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিবে না?'

—প্রবন্ধটি পাঠক মহলে কিছু আলোচনার সৃষ্টি করিল বটে কিন্তু অধিকাংশ পাঠকই উহা খেয়ালী কল্পনার উদ্ভট বিলাস মনে করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিল।

ইহার পর প্রায় দেড় বৎসর কাটিয়া গেল। সংবাদপত্র পাঠকের স্মৃতি স্বভাবতই হ্রস্ব হইয়া থাকে, প্রবন্ধটির কথা আর কাহারও মনে রহিল না।

অতঃপর পৃথিবীর নানা দেশে যে-সব ঘটনা ঘটিতে আরম্ভ করিল তাহাই সংক্ষেপে বিভিন্ন তারিখের শিরোনামায় বর্ণিত হইল।

২৫ জুন ১৯৪৮

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে তারযোগে রয়টারের ভয়াবহ সংবাদ আসিয়াছে। সমস্ত ভারতবর্ষ ভয়ে ও বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছে।

সকলেই জানেন, আমেরিকার নিগ্রোরা গত দুই বৎসরের অক্লান্ত আন্দোলনের ফলে নিজেদের জন্য একটি স্বতন্ত্র স্টেট বা রাষ্ট্র স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে; এই স্টেট আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ঊনপঞ্চাশ সংখ্যক রাষ্ট্র বলিয়া পরিচিত। আরিজোনা ও মেক্সিকোর সীমান্তে এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটি স্থাপিত হইয়াছে।

গত ছয় মাস ধরিয়া আমেরিকার সমস্ত নিগ্রো তাহাদের এই নূতন রাষ্ট্রে গিয়া সমবেত হইয়াছে; নিগ্রোজাতির আনন্দের সীমা নাই। গতকল্য তাহাদের নবগঠিত রাজধানীতে প্রথম রাষ্ট্র-পরিষদের অধিবেশন ছিল। রাজধানীর জনসংখ্যা হইয়াছিল প্রায় দশলক্ষ।

অতঃপর রয়টারের যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাই বিবৃত হইল—

সান্ফ্রানসিস্কো, জুন ২৪। নবনির্মিত নিগ্রো স্টেট মেক্সারিজ (Mexariz) এর রাজধানী হইতে একটি শোচনীয় দৈব দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। দ্বিপ্রহরে যে-সময় রাষ্ট্র-সভার বৈঠক বসিয়াছিল, সেই সময় রাজধানীর উপর দিয়া একটি Fortress শ্রেণীর এরোপ্লেন উড়িয়া যাইতেছিল। এরোপ্লেনে কয়েকটি আণবিক বোমা ছিল; এই নবাবিষ্কৃত ভীষণ শক্তিশালী বোমাগুলি পরীক্ষার জন্য প্রশান্ত মহাসাগরের কোনও দ্বীপে লইয়া যাওয়া হইতেছিল। এরোপ্লেনে মানুষ কেহ ছিল না; উহা রেডিও দ্বারা পরিচালিত হইতেছিল। দৈবাৎ এরোপ্লেনের যন্ত্র বিগড়াইয়া যায় এবং কোনও অজ্ঞাত কারণে আণবিক বোমাগুলি ফাটিয়া পড়ে।

অনুমান হয়, এই বিষম বিস্ফোরণের ফলে রাজধানীতে কেহই জীবিত নাই। নানা জাতীয় প্রাণঘাতী রশ্মি-বিকিরণের জন্য ঐ স্থান এখন মানুষের পক্ষে সুগম নয়। দূর হইতে এরোপ্লেন যোগে পরিদর্শনের ফলে জানা গিয়াছে যে নবরচিত রাজধানী একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে।

৩০ জুন ১৯৪৮

গত কয়েকদিন আমেরিকা হইতে আণবিক বোমা বিস্ফারণ সম্বন্ধে আর কোনও নূতন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। মনে হয় আমেরিকায় সংবাদের উপর কড়া censorship বসিয়াছে। রাশিয়ার টাস্ এজেন্সি কিন্তু নিম্নরূপ খবর দিয়াছে—

"আমেরিকায় সম্প্রতি যে দারুণ দুর্ঘটনা হইয়াছে তাহার ফলে আন্দাজ দশলক্ষ নিগ্রো মরিয়াছে। কিন্তু এ ব্যাপার সম্বন্ধে আরও একটি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহা আরও চাঞ্চল্যকর। যে নূতন আবিষ্কৃত আণবিক বোমাগুলি ফাটিয়া এই বিপত্তি ঘটে, জানা গিয়াছে সেই বোমায় নাকি এক প্রকারের নূতন রশ্মি বিকিরণের উপাদান ছিল; বোমা বিস্ফোরণের দেড়শত মাইলের মধ্যে সকল মানুষকে এই রশ্মি প্রভাবিত করিবে। জীবদেহে এই রশ্মির ফল—যাহারা আক্রান্ত হইয়াছে তাহারা আর বংশবৃদ্ধি করিতে পারিবে না।

"মেক্সিকোর অধিকাংশ অধিবাসীও এই অভিনব রশ্মি দ্বারা প্রভাবিত হইবে।"

পূর্বোক্ত সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রের গভর্মেণ্ট অস্বীকার করিয়াছেন।

১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮

দক্ষিণ আফ্রিকার শাদা কালো বিরোধ এতদিনে সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন হইল; এজন্য প্রধানত ইংলণ্ডের গণতান্ত্রিক মন্ত্রীমণ্ডলই প্রশংসার্হ। বৃটিশ কমন্‌ওয়েল্‌থকে দীর্ঘায়ু করিবার ন্যায়নিষ্ঠ পন্থা এতদিনে অবলম্বিত হইল।

ইংলণ্ডের অক্লান্ত চেষ্টা ও উদ্যমের ফলে অস্ট্রেলিয়া কানাডা প্রভৃতি কমন্‌-ওয়েল্‌থের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্র সমূহের একটি বৈঠক হইয়া গিয়াছে। তাহাতে স্থির হইয়াছেঃ দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী সমস্ত শ্বেতাঙ্গ জাতির লোক অস্ট্রেলিয়ায় গিয়া বসতি স্থাপন করিবে। দক্ষিণ আফ্রিকা অতঃপর স্থানীয় জাতি ও উপনিবেশী হিন্দুস্থানিগণ কর্তৃক শাসিত হইবে। আগামী দশ বৎসর ধরিয়া শ্বেতাঙ্গগণ ক্ষতি-পূরণ স্বরূপ পাঁচ লক্ষ তোলা সোনা পাইবে।

এই সকল শর্ত আফ্রিকার আদিম অধিবাসিরা এবং ভারতীয় উপনিবেশীরা আনন্দের সহিত স্বীকার করিয়াছে।

সাউথ আফ্রিকা হইতে শ্বেতাঙ্গ দলের রপ্তানি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গের জনসংখ্যা মুষ্টিমেয়; আশা করা যায় মাসখানেকের মধ্যে আফ্রিকায় আর শ্বেতাঙ্গ থাকিবে না।

দেখা যাইতেছে, পাশ্চাত্য দেশের রাজনৈতিক চিন্তাধারা এখন ভিন্নমুখী হইয়াছে; এসিয়াখণ্ডে—অস্ট্রেলিয়া ছাড়া—অন্য কোনও দেশে তাহারা উপনিবেশ বা অধিকার রাখিতে চাহে না। তাহাদের এই নূতন মনোবৃত্তি অতীব প্রশংসনীয়।

২৫ ডিসেম্বর ১৯৪৮

গত কয়েকমাসে পাশ্চাত্য দেশ হইতে প্রাচ্যদেশে সংবাদ সরবরাহ অনেক কমিয়া গিয়াছে। বোধ হয় সকল পাশ্চাত্য দেশেই সংবাদের উপর censorship বসিয়াছে। দেড় বৎসর আগে নিগ্রোদের নূতন রাষ্ট্রে বোমা বিস্ফোরণের পর যে বিপুল হৈ চৈ হইয়াছিল, তাহারই ফলে বোধ হয় পাশ্চাত্য দেশের শাসক সম্প্রদায় সাবধান হইয়াছেন।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সাউথ আফ্রিকা হইতেও সমস্ত খবর আসা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। একমাস হইতে রেডিও কেন্দ্রগুলি পর্যন্ত বন্ধ। সেখানে কী হইতেছে কেহ জানে না।

তবু, অতর্কিতে দু' একটি খবর বাহির হইয়া পড়ে। সম্প্রতি ভারতবর্ষে একটি উদ্বেগজনক সংবাদ পৌঁছিয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকায় নাকি এক প্রকার অদ্ভুত মারীভয় দেখা দিয়াছে। সহজ স্বাস্থ্যবান মানুষ রাস্তায় চলিতে চলিতে হঠাৎ পড়িয়া মরিয়া যাইতেছে! রোগের কোনও লক্ষণই এপর্যন্ত ধরিতে পারা যায় নাই। উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র কোনক্রমে বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই মহামারীকে পানামা কানালের

পরপারে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে।

মহামারী কিন্তু অন্যদিকে প্রসার লাভ করিয়াছে প্রশান্ত মহাসাগর ডিঙাইয়া ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জে দেখা দিয়াছে। আন্তর্জাগতিক সমিতি সমুদ্রের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে কেয়ারাণ্টাইন্ বসাইয়া এই মারীর প্রসার রোধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

১ জানুয়ারী ১৯৪৯

ইংলণ্ডেশ্বর ভারতবাসীকে তাহাদের স্বাধীনতা লাভের প্রথম বৎসর পূর্ণ হওয়ায় অভিনন্দন জানাইয়াছেন।

আর একটি সুখবর আছে। এতদিন, ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও অনেক ইংরেজ এদেশে বাস করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতেছিলেন। আজ ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভা ভারত-প্রবাসী ইংরেজের উপর এক হুকুম জারি করিয়াছেনঃ আগামী একমাসের মধ্যে সমস্ত ইংরেজকে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইতে হইবে, অন্যথায় বৃটিশ জাতিত্ব হইতে তাহারা খারিজ হইয়া যাইবে। ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের সম্প্রীতি রক্ষার উদ্দেশ্যেই এই আদেশ প্রচারিত হইয়াছে।

৩১ জানুয়ারী ১৯৪৯

করাচি বোম্বাই ও কলিকাতা বন্দর হইতে আজ য়ুরোপগামী শেষ জাহাজ ছাড়িল; ভারতবর্ষে যে-কয়জন ইংরেজ অবশিষ্ট ছিল তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া গেল। ফরাসী ও পোর্তুগীজরা ইতিপূর্বেই ভারত ত্যাগ করিয়াছে।

এতদিন ভারতবর্ষ কার্যতঃ স্বপ্রতিষ্ঠ স্বয়ংপ্রভু হইল। ইংরেজ শেষের দিকে সত্যই আমাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিয়াছে।

৭ মার্চ ১৯৪৯

স্যর জন্ হোয়াইট তিরাশী বৎসর বয়সে নোবেল প্রাইজ লাভ করিয়াছেন।

স্যর জন্ সাংবাদিকমণ্ডলীকে বিবৃতি দিয়াছেন—জীবনের শেষ পঞ্চাশ বৎসর আমি মানব জাতির সেবায় অতিবাহিত করিয়াছি—এই পুরস্কারের টাকাও আমি সেই উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিলাম...আমার দিন ফুরাইয়া আসিতেছে তথাপি আমি আশা করি মৃত্যুর পূর্বে মানুষের পরম পরিত্রাণ দেখিয়া যাইতে পারিবে।

১৫ মে ১৯৪৯

মহামারীকে আটকাইয়া রাখা গেল না। চীন ও বর্মায় মহামৃত্যুর ডঙ্কা বাজিয়া উঠিয়াছে। পথে ঘাটে মানুষ মরিতেছে। বসিয়া বসিয়া মানুষ মরিয়া যাইতেছে। রেঙ্গুনে একদিনে সাত হাজার লোক মরিয়াছে!

ভারতবর্ষের জাতীয় গভর্মেণ্ট চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে এই নামহীন মৃত্যু এদেশে প্রবেশ করিতে না পারে।

৭ জুন ১৯৪৯

আজ কলিকাতা শহরে একটি ঘটনা ঘটিয়াছে। প্রাতঃকালে আন্দাজ দশটার সময় একটি ট্যাক্সি দেশবন্ধু অ্যাভেনু্য দিয়া যাইতেছিল; পথের মাঝখান দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ ট্যাক্সি পাশের দিকে ফুটপাথের উপর উঠিয়া একটি বালককে চাপা দিয়া দেয়ালে আঘাত করে। বালকের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়; কিন্তু ট্যাক্সির বেগ তাহাতেও শান্ত হইল না; দেয়ালে প্রতিহত হইয়া পিছন দিকে কিছুদূর ফিরিয়া আসিয়া

ট্যাক্সি আবার দেয়াল আক্রমণ করিল। এবার আর ট্যাক্সি ফিরিয়া আসিল না, ইঞ্জিন বন্ধ হইয়া যাওয়ায় সেইখানেই দাঁড়াইয়া পড়িল।

পথচারীরা এতক্ষণ সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল, এবার ক্রোধান্ধভাবে ছুটিয়া গিয়া ট্যাক্সি চালককে টানিয়া গাড়ি হইতে বাহির করিল। দেখা গেল, দেহ সম্পূর্ণ অক্ষত হইলেও তাহার দেহে প্রাণ নাই...

৯ জুন ১৯৪৯

কলিকাতার লোক পালাইতে আরম্ভ করিয়াছে; মৃত্যুভয়ে উন্মত্ত হইয়া যে যেদিকে পারিতেছে পালাইতেছে। কিন্তু পালাইয়া যাইবে কোথায়? করাল মৃত্যুর বিষ দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে...বোম্বাই মাদ্রাজ লাহোর সর্বত্র এক অবস্থা. হাহাকার করিয়া মানুষ চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে; কখন কাহার ললাটে মরণ-কাঠির স্পর্শ লাগিবে কেহ জানে না...

মাছির মত মানুষ মরিতেছে; সৎকার করিবার কেহ নাই। শীঘ্রই এই বিশাল ভারতভূমি শ্মশানের মত হইয়া যাইবে। কেবল যাহা নির্জীব, যাহা ইট-কাঠ-পাথরে তৈরি তাহাই থাকিয়া যাইবে।

৬ আগষ্ট ১৯৫০

পৃথিবীর সবর্ণ জাতির আর একটি মানুষও বাঁচিয়া নাই। তাহাদের অস্থি-কঙ্কালে সমস্ত পৃথিবী শাদা হইয়া গিয়াছে।

লণ্ডনে একটি মহতী সভা আহ্বান করিয়া স্যর জন্ হোয়াইটকে সম্বর্ধনা করা হইয়াছে।

সভাস্থলে বিপুল আনন্দধ্বনির মধ্যে ঋষিকল্প বৃদ্ধ স্যর জন্ উঠিয়া বলেন—'বিজ্ঞান বিশ্বপ্রকৃতির দর্পণ, এই দর্পণে আমরা প্রকৃতির স্বরূপ দেখিতে পাই। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে দয়া মায়ার স্থান নাই; যে যোগ্য সেই বাঁচিয়া থাকে, যে অনধিকারী তাহার বাঁচিবার দাবী নাই। প্রকৃতির দরবারে আমাদের শ্বেতজাতির বাঁচিয়া থাকিবার দাবী মঞ্জুর হইয়াছে—'

এই পর্যন্ত বলিয়া স্যর জন্ থামিয়া গেলেন; তারপর সহসা ধরাশায়ী হইলেন। দেখা গেল তাঁহার দেহে প্রাণ নাই।

বিরাট সভা কয়েক মুহূর্তের জন্য নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। এই স্তম্ভিত নীরবতার মধ্যে বিগ্ বেন্ ঘড়িতে মন্দ্র-মন্থর শব্দে তিনটা বাজিল।

৩২ শ্রাবণ ১৩৫৩

ভাগ্যবন্ত

শরৎকালের আরম্ভে সাঁওতাল পরগণার প্রাকৃতিক অবস্থা বড়ই মনোরম হয়। কোনও তাপদিগ্ধা সুন্দরী সায়াহ্নকালে অপর্যাপ্ত জলে সাবান মাখিয়া স্নান করিবার পর দেহে ও মনে যেরূপ একটি শুচিস্নিগ্ধ লঘু প্রসন্নতা অনুভব করেন, এ যেন কতকটা সেইরূপ।

দিবা চলিয়া গিয়াছে, রাত্রি এখনও আসে নাই, মাঝের সন্ধিস্থলটি পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে শান্ত সোনালী একটি নিশ্চিন্ততা। এমনি সায়াহ্নে সাঁওতাল পরগণার নির্জন কঙ্করাকীর্ণ পথ দিয়া এক পথিক চলিয়াছিলেন। মাইলখানেক দূরে একটি শহর আছে, পথিকের গতি সেইদিকে। তাঁহার বয়স অনুমান পঞ্চাশ বৎসর; পরণে গেরুয়া আলখাল্লা, মুখে প্রচুর দাড়িগোঁফ, মাথায় রুক্ষ দীর্ঘ চুল—চোখের দৃষ্টিতে একটি মিষ্ট হাসি লাগিয়া আছে।

চলিতে চলিতে তিনি গুনগুন করিয়া গান গাহিতেছেন—

"আমার—কাজ ফুরলো ঘুচলো রে মোর চিন্তা!
এবার আমি গাইব রে গান নাচব তাধিন্ ধিন্‌তা।
কাজের বোঝা, ভাবনা-ভাবার দায়
ঠাকুর—এই রইল তোমার পায়,
এখন থেকে—খাট্‌বে তুমি, ভাববে তুমি,
আমি—নাচব তাধিন্ ধিন্‌তা।"

তাঁহাকে দেখিয়া এবং তাঁহার গান শুনিয়া মনে হয়, এই শরৎ-সন্ধ্যার মত তিনিও অন্তরে একটি লঘু নিশ্চিন্ত প্রসন্নতা লাভ করিয়াছেন।

পথের দুইপাশে শালবন। শহরের এলাকা এখনও আরম্ভ হয় নাই। পথিক মন্থরপদে চলিতে চলিতে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার গানও থামিল। শাল-বনের ফাঁকে অপ্রত্যাশিত একটি বাড়ি—পাঁচিল দিয়া ঘেরা ছোটখাটো সুন্দর একটি বাংলো।

বাংলোর সম্মুখে বাঁধানো চাতালের উপর দুইটি ইজি-চেয়ার পাতা রহিয়াছে, তাহার একটিতে মধ্যবয়স্ক টাক-মাথা একজন ভদ্রলোক বসিয়া নিবিষ্ট মনে খবরের কাগজ পড়িতেছেন।

পথিক ক্ষণেক দাঁড়াইয়া চিন্তা করিলেন। তাঁহার পা দুটি ক্লান্ত, আজ সমস্তদিন হাঁটিয়াছেন; যদি রাত্রির মত এইখানেই আস্তানা মিলিয়া যায় মন্দ কি? তিনি ফটক খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

গৃহস্বামী খবরের কাগজে মগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন, হঠাৎ সম্মুখে আগন্তুক দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন, 'কে? কি চাই?'

পথিক সবিনয়ে বলিলেন, 'আজ রাত্রির জন্যে আশ্রয় দেবেন কি? কাল সকালেই আমি চলে যাব।'

গৃহস্বামী ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিস্ময়োৎফুল্ল নেত্রে পথিকের পানে চাহিয়া রহিলেন। এই কয়েকটি কথা শুনিয়াই তাঁহার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, আগন্তুক ভেকধারী হইলেও আদৌ তাঁহারই সমশ্রেণীর বাঙালী ভদ্রলোক। বহুদিন অজ্ঞাতবাসের ফলে সমশ্রেণীর লোকের সহিত মেলামেশার সুযোগ তাঁহার ঘটে না। তিনি সাগ্রহে বলিলেন, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়! আসুন—বসুন! আপনি তো ভদ্রলোক,

মশাই; সাধু-সন্ন্যিসিদের মধ্যে ভদ্রলোক বড় দেখা যায় না। মানে—'

সন্ন্যাসী ঝুলি নামাইয়া অন্য চেয়ারটির প্রান্তে বসিলেন, একটু হাসিয়া বলিলেন, 'ভদ্রলোক ছিলাম অনেকদিন আগে, এখন ওসব হাঙ্গামা চুকে গেছে।'

গৃহস্বামী একটু অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন, পুনশ্চ উপবেশন করিয়া বলিলেন, 'হেঁ হেঁ,—ও হাঙ্গামা চুক্‌লেই ভাল। তা চায়ের অভ্যাস আছে কি?'

'এখন আর নেই—তবে আপনি দিলে খাব।'

'বেশ, বেশ। ওরে ঝড়ুয়া—'

গৃহস্বামীর হাঁকের উত্তরে, ঝড়ুয়া নামক সাঁওতাল ভৃত্যের পরিবর্তে একটি স্ত্রীলোক বাংলো হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোক, ভারিভুরি গড়ন; মুখখানি গোলাকৃতি, বড় বড় তীব্র-চাহনি-যুক্ত চোখে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি, কপালে ডগডগে সিঁদুরের ফোঁটা। তাঁহার গায়ে ভারি ভারি সোনার গহনা, পরণে চওড়া-পাড় শান্তিপুরে শাড়ি। তিনি যৌবনকালে তন্বী ও রূপসী ছিলেন তাহা অনুমান করা যাইতে পারে, কিন্তু বর্তমানে মেদ ও বয়সের তলায় রূপ-লাবণ্য চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

বাড়ির বাহিরে পা দিয়া সন্ন্যাসীকে দেখিয়াই তিনি থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন, তারপর দ্রুত ফিরিয়া গিয়া বাড়ির মধ্যে ঢুকিলেন। দরজার আড়াল হইতে রুক্ষ রুষ্ট স্ত্রীকণ্ঠ শোনা গেল, 'এসব আবার কি! মাথায় চুল নেই, কপালে তেলক। সাধু-সন্ন্যিসি নিয়ে ঢঙ্ আরম্ভ হয়েছে—'

গৃহস্বামীর টাক ও মুখ অরুণাভ হইয়া উঠিল, তিনি ত্বরিতে উঠিয়া বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সন্ন্যাসী বসিয়া মিটি মিটি হাসিতে লাগিলেন, যেন তিনি মনে মনে বলিতেছেন, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।

খানিক পরে গৃহস্বামী ফিরিয়া আসিতেই সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহজ বিনয়ের কণ্ঠে বলিলেন, 'আপনার যদি অসুবিধে হয় আমি যাচ্ছি। শহর বেশী দূর নয়, কোথাও রাত কাটিয়ে দিতে পারব।'

গোঁ-ভরে মাথা নাড়িয়া গৃহস্বামী বলিলেন, 'না, আজ এখানেই থাকুন।—চা আসছে।'

সন্ন্যাসী আবার বসিলেন। মনে মনে আমোদ অনুভব করিলেও গৃহস্বামীর প্রতি তাঁহার অন্তরে একটু সহানুভূতিরও সঞ্চার হইল। বেচারা সংসারী! লোকটি সদাশয়, কিন্তু অন্দরমহলের প্রবল শাসনে নিজের সত্তা হারাইয়া ফেলিয়াছেন, মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করিয়া মাথা তুলিতে চান, এই পর্যন্ত। লোকটি অবস্থাপন্ন তাহা দেখিলেই বোঝা যায়, তবে কেন লোকালয় ছাড়িয়া নির্জনে বাস করিতেছেন কে জানে! জীবনসঙ্গিনীটি সম্ভবতঃ রণচন্ডী খান্ডার—আহা বেচারা।

সোনালী সন্ধ্যা ক্রমে রূপালী রাত্রে পরিণত হইল। আজ বোধ হয় শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথি, মাথার উপরে আধখানা চাঁদ নীচের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল।

গৃহস্বামী গুম হইয়া বসিয়াছিলেন। ভৃত্য আসিয়া দুই পেয়ালা চা ও শালপাতার ঠোঙায় জলখাবার রাখিয়া গেল। এতক্ষণে ঈষৎ সজীব হইয়া গৃহস্বামী একটা পেয়ালা তুলিয়া লইয়া বলিলেন, 'নিন, জলযোগ করুন।'

নীরবে জলযোগ ও চা-পান চলিতে লাগিল। বাড়ির ভিতরে তখন কেরোসিন-আলো জ্বলিয়াছে। হঠাৎ ভিতর হইতে রৈ রৈ শব্দে কে গান গাহিয়া উঠিল। প্রথমটা চমকিয়া উঠিয়া সন্ন্যাসী বুঝিলেন, সজীব মানুষের গলা নয়, কলের গান। অন্তরালবর্তিনী গ্রামোফোন বাজাইয়া বোধ করি নিজের চিত্তবিনোদন করিতেছেন।

অরণ্যানীর জ্যোৎস্না-নিষিক্ত নীরবতার উপর এ যেন পাশবিক দৌরাত্ম্য। এর চেয়ে

শেয়াল-ডাকও শ্রুতিমধুর—অন্ততঃ স্থানকালের অধিক উপযোগী। সন্ন্যাসী আড়চোখে চাহিয়া দেখিলেন, গৃহস্বামীর মুখ হতাশাপূর্ণ বিরক্তিতে কুণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে; সম্ভবতঃ প্রত্যহ সন্ধ্যায় এই রেকর্ড-সংগীত তাঁহাকে শুনিতে হয়।

একটু কুণ্ঠিতভাবে তিনি বলিলেন, 'কই, আপনার বাড়িতে ছেলেপুলে—?'

'ছেলেপুলে নেই—আমি নিঃসন্তান—' গৃহস্বামী চায়ের খালি পেয়ালা নামাইয়া রাখিয়া নিজের চেয়ার সন্ন্যাসীর দিকে একটু সরাইয়া লইয়া বসিলেন, একটু অন্তরঙ্গভাবে প্রশ্ন করিলেন, 'আচ্ছা, কিছু মনে করবেন না, আপনি কতদিন এই—মানে—এই গৃহত্যাগ করেছেন?'

সন্ন্যাসী চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'তা প্রায় বছর পঁচিশ হতে চল্‌ল।'

'কিছু পেয়েছেন কি?'

সন্ন্যাসী একটু চুপ করিয়া বলিলেন, 'যোগসিদ্ধি বা বিভূতির কথা যদি বলেন, তাহলে কিছু পাইনি। তবে একটা জিনিস পেয়েছি—শান্তি।'

সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া গৃহস্বামী ইজি-চেয়ারের উপর চিৎ হইয়া চাঁদের পানে চাহিয়া রহিলেন। অনুমান পঁচিশ বছর আগে তাঁহার জীবনেও একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, তবে তাহা সন্ন্যাসগ্রহণের সম্পূর্ণ বিপরীত। তারপর প্রথম কিছুদিন মন্দ কাটে নাই। কিন্তু ক্রমে এই পঁচিশ বছরে পুষ্পমালা নিগড় হইয়া উঠিয়াছে। শান্তি! জীবনে এক মুহূর্তের জন্যও তিনি শান্তি পাইয়াছেন কি? হঠাৎ গৃহস্বামী হা হা করিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। হাঁ, শান্তি তিনি পাইয়াছেন বৈ কি! শান্তি-নামধারিণী একটি রমণী গত পঁচিশ বছর ধরিয়া এমন দৃঢ়ভাবে তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া আছেন যে, কে বলিবে তিনি শান্তি পান নাই! অদৃষ্ট এমন ইতর পরিহাসও করিতে পারে!

ঘরের মধ্যে তখন গ্রামোফোনের খোনা আওয়াজে কীচক-বধ পালা অভিনয় হইতেছে।

গৃহস্বামী উঠিয়া বসিয়া ব্যঙ্গ-তিক্ত কণ্ঠে বলিলেন, 'শুনতে পাচ্ছেন! ওদিকে কীচক-বধ শুরু হয়েছে। এদিকে আমি যে সারাজীবন ধরে কীচক-বধ হচ্ছি তা কেউ বুঝল না। কিন্তু আপনি সাধু-বৈরিগি লোক, আমার পাপতাপের কথা শুনিয়ে আপনার শান্তি নষ্ট করব না। তার চেয়ে আপনার কথাই বলুন শুনি। আপনি কেন সংসার ছাড়লেন, কি করে শান্তি পেলেন, যদি বাধা না থাকে আমায় বলুন।'

সন্ন্যাসী হাসিলেন, 'বাধা এখন আর কিছু নেই, বরং মনে পড়লে হাসি পায়। আপনি শুনতে চান বলছি। হয়তো আমার সংসারত্যাগের কাহিনী শুনে, আমি কত বড় আঘাত কাটিয়ে উঠেছি জেনে, আপনার কিছু উপকার হতে পারে।'

সন্ন্যাসী নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিলেন, 'আজ মনে হয়, উমেশ নিয়োগী বুঝি আর কেউ ছিল; আমিই যে উমেশ নিয়োগী একথা এখন বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। দুটো মানুষ আলাদা হয়ে গেছে।

'উমেশ ছিল যাকে বলে মধ্যবিত্ত লোক। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল ছাত্র ছিল, তাই একটা কলেজে দেড়শ'টাকা মাইনের চাকরি পেয়েছিল। কলকাতাতেই থাকত।

'উমেশের বাড়িতে এক বুড়ী মা ছিলেন। তিনিও বেশীদিন টিকিলেন না, উমেশ চাকরি পাবার কিছুদিন পরেই মারা গেলেন।

'তারপর এক সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ের সঙ্গে উমেশের বিয়ে হল। বংশ সম্ভ্রান্ত হলেও অবস্থা পড়ে গিয়েছিল, তাই বোধ হয় মধ্যবিত্ত উমেশের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। মেয়েটি সুন্দরী বিদুষী—তখনকার দিনের পক্ষে আধুনিকা! একদল অভিজাত-বংশীয় তরুণ বন্ধু সর্বদা তাকে ঘিরে থাকত।

'উমেশের মনে আনন্দের শেষ নেই; এমন স্ত্রী অনেক ভাগ্যে পাওয়া যায়। স্ত্রীর বন্ধুরা তারও বন্ধু হয়ে দাঁড়াল। যাওয়া-আসা খাওয়া-দাওয়া পার্টি-পিকনিক চলতে লাগল। সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে বলে উমেশের স্ত্রীর হাত ভারি দরাজ; বাজারে উমেশের কিছু ধার হল। কিন্তু উমেশ তা গ্রাহ্য করলে না। এমনিভাবে প্রায় বছর-খানেক কাটল।

'তারপর হঠাৎ একদিন বিনামেঘে বজ্রাঘাত হল; একজন তরুণ বন্ধু উমেশের স্ত্রীকে নিয়ে উধাও হলেন।'

সন্ন্যাসী মৃদুকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। গৃহস্বামী গালে হাত দিয়া শুনিতেছিলেন, মুখ না তুলিয়াই বলিলেন, 'তারপর?'

সন্ন্যাসী বলিলেন, 'তারপর কিছুদিনের জন্যে উমেশ যেন পাগল হয়ে গেল, একটা ছুরি নিয়ে বন্ধুদের বাড়ি-বাড়ি চোরাই মাল খুঁজে বেড়াতে লাগল। মতলবটা এই যে, কে তার বৌ চুরি করেছে জানতে পারলেই তাকে খুন করবে। কিন্তু অভিজাত বংশীয় লোকদের মধ্যে ভারি একতা আছে, তারা কেউ কাউকে ধরিয়ে দেয় না। উমেশ তার বৌ-চোরকে খুঁজে পেলে না।

'ক্রমে তার মনের গতি বদলে গেল। এদিকে পাওনাদারেরা টাকার তাগাদা আরম্ভ করেছিল। মানুষ জাতটার উপরেই উমেশের মন বিষিয়ে গেল; মনে হল, এমন নিষ্ঠুর পাজি জাত আর নেই। একদিন গভীর রাত্রে লোটা কম্বল নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল।'

'তারপর?'

'তারপর আর কি? পঁচিশ বছর ধরে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়িয়েছি। অনেক সাধু-মহাজনের দর্শন পেয়েছি। সাধন ভজন বিশেষ কিছু করিনি, কিন্তু তবু বড় আনন্দে আছি। অভাব যে মানুষের কতটুকু, তা সংসার না ছাড়লে বোঝা যায় না। এতটুকু সংযমের বিনিময়ে কতখানি আনন্দ পাওয়া যায়, একফোঁটা আত্মত্যাগের বদলে কি বিপুল শান্তি পাওয়া যায়—তা আপনাকে কি করে বোঝাব? আমার কোন অভাব নেই—আমি বড় আনন্দময় শান্তি পেয়েছি। গৃহী-জীবনের কথা আর মনে পড়ে না—পড়লেও আর কষ্ট হয় না।'

আহারাদির পর সন্ন্যাসী একটি ছোট কুঠুরিতে শয়ন করিলেন। বিছানাটি ভারি নরম, এত নরম বিছানায় সন্ন্যাসী অনেকদিন শয়ন করেন নাই; তিনি অবিলম্বে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

প্রত্যূষে ঘুম ভাঙিয়া সন্ন্যাসী দেখিলেন, শয্যার পাশে একটি চিঠি রাখা রহিয়াছে। তিনি চিঠি খুলিয়া পড়িলেন,—

ভাই উমেশ,

তুমি কাল যে গল্প বলেছিলে তাতে একটু ভুল ছিল। তোমার স্ত্রীকে কেউ চুরি করেনি, তোমার স্ত্রীই তোমার এক বন্ধুকে চুরি করে নিয়ে পালিয়েছিলেন। সে বন্ধুটি আমি।

তুমি আমাদের চিনতে পারনি, তাতে আশ্চর্য হইনি, আমাদের সকলেরই চেহারা বদ্‌লে গেছে। গল্প শুনে তোমাকে চিনতে পারলুম। তুমি ভাগ্যবান পুরুষ, তোমাকে নমস্কার।

তোমার স্ত্রীর মত এমন ভয়ানক, দজ্জাল, সন্দিগ্ধমনা, স্বার্থপর স্ত্রীলোক পৃথিবীতে আর আছে কিনা আমি জানি না, কারণ অন্য কোনও স্ত্রীলোকের প্রকৃতি জানবার সুযোগ আমার ঘটেনি। দুনিয়ার লোক আমাকে লম্পট দুশ্চরিত্র বলেই জানে,

তাদের চোখে আমি পরস্ত্রী-হরণকারী। কিন্তু ভগবান জানেন, আমার মত একনিষ্ঠ সচ্চরিত্র পুরুষ আর নেই। জীবনে একটা ভুল করেছিলুম, তার জন্যে সমাজ ছেড়েছি, সংসার ছেড়েছি, সন্তানসুখের আশা ছেড়েছি, আমার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি তোমার স্ত্রীর নামে লিখে দিয়েছি। সর্বশেষে তার সন্দেহের জ্বালায় এই বনের মধ্যে বাস করছি। ভাই, আমার যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে, আর না। এবার তোমার সম্পত্তি তুমি নাও। আমি চললুম।

তোমাকে দেখে তোমার কথা শুনে আমার বিশ্বাস হয়েছে যে তুমি শান্তি পেয়েছ; তাই আমারও লোভ হয়েছে চেষ্টা করে দেখি যদি শান্তি পাই। পঁচিশ বছর তোমার 'শান্তি'কে বহন করবার পর এ অধিকার আমার জন্মেছে—আশা করি তুমি স্বীকার করবে।

তোমার আলখাল্লা আর ঝুলিটা নিয়ে চললুম, কিছু মনে কোরো না।

তোমার ধনপতি

১৮ কার্তিক ১৩৫৩

মেঘদূত

জ্যৈষ্ঠ মাসের অপরাহ্ণে ব্রতীন মাঠ ভাঙিয়া গ্রামের দিকে চলিয়াছিল। সূর্য প্রায় হইয়াছে বটে কিন্তু তাহার চোখের রক্ত-রাঙা ক্রোধ এখনও নিভিয়া যায় নাই।

রৌদ্রে পোড়া চারণভূমি; ঘাস যে দু'চার গাছি ছিল জ্বলিয়া খড় হইয়া গিয়াছে। মাঠে জনপ্রাণী নাই। সম্মুখে প্রায় মাইলখানেক দূরে গ্রামের খোড়ো ঘরগুলি দিগন্তরেখাকে একটু অসমতল করিয়া দিয়াছে। তাহারই কাছাকাছি একটা নিঃসঙ্গ তালগাছ শূন্যে গলা উঁচু করিয়া যেন দূরের কোনও দৃশ্য দেখিবার চেষ্টা করিতেছে; অবসন্ন মূর্ছাহত দিগন্তের ওপারে শীতলতার কোনও আশ্বাস আছে কিনা তাহারই সন্ধান করিতেছে। ঐ তালগাছটা ব্রতীনের বাড়ির কাছেই।

তপতীর কথা ব্রতীনের মনে হইল; তপতী হয়তো জানালায় দাঁড়াইয়া তাহার পথ চাহিয়া আছে। ব্রতীন আরও জোরে পা চালাইল। একে তো ঘরমুখো বাঙালী; তার উপর ক্যাম্বিসের জুতার তলা ভেদ করিয়া মাটির উত্তাপ তাহার পায়ের চেটো পুড়াইয়া দিতেছে। সমস্ত দিনের অগ্নিক্ষারণ মাটির কটাহে সঞ্চিত হইয়া টগবগ করিয়া ফুটিতেছে।

ব্রতীন ভদ্রসন্তান; শহরের আবহাওয়ায় লেখাপড়া শিখিয়া সে মানুষ হইয়াছিল।

জীবনে বেশী উচ্চাশা তাহার ছিল না; গতানুগতিকভাবে চাকরি-বাকরি করিয়া সংসার পাতিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাইয়া দিবে এইরূপ একটা ভাসা-ভাসা অভিপ্রায় তাহার মনে ছিল। কিন্তু সহসা একদিন ভাব-বন্যার দুর্নিবার টানে তাহার ঘাটে-বাঁধা খেয়াতরী ভাসিয়া গিয়াছিল। তারপর বহু আঘাটা ঘুরিয়া অবশেষে তাহার জীর্ণ তরী এক যুগাবতার মহাপুরুষের আশ্রম-বন্দরে গিয়া ভিড়িয়াছিল।

আশ্রমে মহাপুরুষের সান্নিধ্যে থাকিয়া ব্রতীন শান্তি পাইয়াছিল, জীবনের একটি সুনির্দিষ্ট পন্থা দেখিতে পাইয়াছিল, মনুষ্যত্বের নিসংশয় মূল্য কোথায় তাহা অনুভব করিয়াছিল। ক্রমে আশ্রমের নিঃস্বার্থ ফললিপ্সাহীন কর্মের মধ্যে সে ডুবিয়া গিয়াছিল।

এই আশ্রমেই তপতীর সহিত তাহার পরিচয় হয়। তপতীও ব্রতীনের মত নোঙর-ছেঁড়া নৌকা। দু'জনের দু'জনকে ভাল লাগিয়াছিল; আশ্রমের বহু যুবকযুবতীর মধ্যে ইহারা পরস্পরকে বিশেষভাবে কাছে টানিয়া লইয়াছিল। এই প্রীতির মধ্যে জৈব আকর্ষণ কতখানি ছিল বলা যায় না, তাহারা সজ্ঞানে কিছুই অনুভব করে নাই।

কিন্তু মহাপুরুষ তাহাদের মনের অবস্থা অনুভবে বুঝিয়াছিলেন। একদিন তাহাদের নিভৃতে ডাকিয়া স্মিতমুখে বলিলেন, 'তোমাদের মনের কথা আমি জানি। বিয়ে করবে?'

দু'জনে গুরুর সম্মুখে পাশাপাশি বসিয়াছিল, তাঁহার কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল; পুলকিতচিত্তে ভাবিল, গুরু কি অন্তর্যামী? তাহাদের অন্তরের গূঢ়তম আকাঙ্ক্ষা তিনি জানিলেন কি করিয়া?

তাহাদের মুখের ভাব দেখিয়া গুরু আবার হাসিলেন, বলিলেন, 'বেশ, তোমাদের আমি বিয়ে দেব। কিন্তু একটি শর্ত আছে। যতদিন ভারতবর্ষ স্বাধীন না হয় ততদিন ব্রহ্মচর্য পালন করবে।'

শর্তের কথা শুনিয়া দু'জনেই লজ্জা পাইয়াছিল; একটু কৌতুকও অনুভব করিয়াছিল। মাছকে যদি বলা হয়, তুমি সারা জীবন জলে বাস করিবে তাহা হইলে সে কি দুঃখিত হয়? ব্রতীন ও তপতী এতাবৎ অনায়াসে অবহেলাভরে ব্রহ্মচর্য পালন করিয়াছে, কখনও গুরুতর চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটে নাই। তবে যে আজ তাহারা পরস্পরকে কামনা করিয়াছে, সে তো মনের প্রতি মনের আকর্ষণ; সান্নিধ্যের বাসনা, আত্মসমর্পণের আনন্দ। তাহারা পরস্পরের হইতে চায়, ইহার বেশী আর কিছু নয়।

নত মুখে ঘাড় নাড়িয়া তাহারা গুরুর শর্ত সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। অতঃপর মহাপুরুষ স্বয়ং তাহাদের বিবাহ দিয়াছিলেন।

বিবাহের কিছুদিন পরে মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন, 'এখানকার কাজ তোমাদের শেষ হয়েছে। এখন গ্রামে গিয়ে বাস কর; তোমাদের আদর্শে গ্রামবাসীকে গড়ে তোলো।'

ব্রতীনরা তিনপুরুষ আগে জমিদার ছিল। এখনও গ্রামে তাহাদের ভাঙা ভদ্রাসন ও কয়েক বিঘা জমি পড়িয়া ছিল। ব্রতীন তপতীকে লইয়া ভাঙা ভদ্রাসনে গিয়া উঠিল।

তদবধি গত কয়েকমাস ধরিয়া এই গ্রামে তাহাদের জীবনযাত্রা শান্ত ধারায় বহিয়া চলিয়াছে। ব্রতীন জমিজমা দেখে, গ্রামের ছেলেবুড়োকে পড়ায়; তপতী গৃহকর্ম করে, গ্রামের মেয়েদের সেলাই শেখায়, সুতা কাটিতে শেখায়। এমনিভাবে শীত বসন্ত কাটিয়াছে, জ্যৈষ্ঠও শেষ হইতে চলিল।

আজ সকালে ব্রতীন পাশের গ্রামে গিয়াছিল একজোড়া বলদ কিনিবার জন্য।

বর্ষা নামিতে আর দেরি নাই, এখন হইতে চাষবাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। নিদাঘের কঠোর পৌরুষ কখন সংযম হারাইয়া সঞ্জীবনী ধারায় পৃথিবীকে নিষিক্ত করিবে তাহার স্থিরতা নাই, রৌদ্রঋতুস্নাতা ধরিত্রী প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

পাশের গ্রামটি ক্রোশ দুই দূরে; সেখানে দ্বিপ্রহর কাটাইয়া ব্রতীন বাড়ি ফিরিতেছিল। বলদ দুটি তাহার পছন্দ হইয়াছে, দরদামও ঠিক হইয়াছে—কাল সকালে তাহার লোক গিয়া তাহাদের লইয়া আসিবে।

ব্রতীন ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছিল—বলদ দুটি তপতীর নিশ্চয় খুব পছন্দ হইবে। গোলগাল গড়ন, দুধের মত সাদা—যেন দুটি যমজ ভাই। ব্রতীন তাহাদের নাম রাখিবে কার্তিক গণেশ—না—গৌর নিতাই! তপতী তাহাদের না দেখা পর্যন্ত উত্তেজনায় ছটফট করিয়া বেড়াইবে—রাত্রে ঘুমাইতে পারিবে না। তপতীর একটা অভ্যাস কোনও বিষয়ে অধিক কৌতূহল হইলে সে বাঁ হাত দিয়া ডান হাতের তর্জনী মুঠি করিয়া ধরিয়া দুই হাত একসঙ্গে নাড়িতে থাকে এবং অনর্গল প্রশ্ন করে। আজও তেমনি ভাবে দুই হাত নাড়িতে নাড়িতে জিজ্ঞাসা করিবে,—বলনা কেমন দেখতে? কত বয়স? শিং খুব বড় বড়—?

চিন্তাস্মিত মুখে চলিতে চলিতে ব্রতীন সহসা অনুভব করিল তাহার চারিদিকে আলোর উগ্রতা যেন ম্লান হইয়া গিয়াছে। সে চকিতে চোখ তুলিয়া আকাশের পানে চাহিল; তারপর থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহার হর্ষোৎফুল্ল চোখে নীল কপিশ মেঘের ছায়া পড়িল। নৃত্য-পাগল বাউলের বিস্রস্ত জটা ছড়াইয়া পড়িয়াছে—সূর্যের চোখে গাঢ় মেঘের অঞ্জন। প্রবল বাতাসের ফুৎকারে ফুৎকারে মেঘের দল ছুটিয়া আসিতেছে—তাহাদের খাঁজে খাঁজে নীল্ বিদ্যুতের চাপা আগুন। বায়ুমণ্ডলে একটা শব্দহীন স্পন্দন উঠিতেছে—ঝনন্ ঝনন্—

ব্রতীন দাঁড়াইয়া প্রকৃতির এই হর্ষোন্মাদনা দেখিতে লাগিল। দূরে তাহার বাড়ির পাশের তালগাছটা নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, এখন হঠাৎ যেন কোন অপ্রত্যাশিত আনন্দ-সংবাদ পাইয়া বাহু আস্ফালন করিয়া উন্মত্ত বেগে নাচিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে বিদ্যুৎ-কশাহত মেঘের দল আসিয়া পড়িল, মাঠের রৌদ্রদগ্ধ তৃণদল থরথর বেগে কাঁপিয়া কাঁপিয়া ঝড়ের আবেগে সাড়া দিল। ব্রতীনের হাতে মুখে তপ্ত বাতাসের স্পর্শ লাগিল।

কিছুক্ষণ ঝড়ের মাতামাতি চলিবার পর বর্ষণ নামিল। বড় বড় ফোঁটা; প্রথমে অশ্রুজলের মত আতপ্ত, তারপর বরফের টুকরার মত ঠাণ্ডা। শীতলতা! কি অপূর্ব শীতলতা! চারিদিক বৃষ্টিধারায় ঝাপসা হইয়া গেল; দুর্মদ বাতাস বৃষ্টিধারাকে মথিত করিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল। সিক্তভূমি হইতে ঝাঁঝালো সোঁদা গন্ধ উঠিল—

ব্রতীন যখন বাড়ি ফিরিল তখন তাহার সর্বাঙ্গ দিয়া জলের স্রোত বহিতেছে। তপতী তাহাকে জানালা দিয়া দেখিয়াছিল, সে বারান্দায় উঠিতেই ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিল, হাসিভরা অনুযোগের কণ্ঠে বলিল, 'বা রে, তুমি কেমন ভিজলে. আমি ভিজতে পেলুম না!'

ব্রতীন আঙুল দিয়া নিজের মুখের জল চাঁছিয়া লইয়া তপতীর মুখে তাহার ছিটা দিয়া বলিল, 'এই তো, ভেজো না।'

পাখির কুহরণের মত ছোট একটি হাসি তপতীর কণ্ঠ হইতে বাহির হইল। 'ও বুঝি আবার ভেজা! বিষ্টিতে দাঁড়িয়ে না ভিজলে কি মজা হয়?'

ব্রতীন সিক্ত খদ্দরের পাঞ্জাবিটি খুলিয়া ফেলিতে ফেলিতে বলিল, 'বেশ তো, তাই ভেজো। আমি তো ভেবেছিলুম এসে দেখব তুমি দিব্যি ভিজে বসে আছ।'

'ইচ্ছে কি হয়নি? কিন্তু ভয় হল তুমি এসে যদি বকো—! ভিজি তাহলে?' নিমেষ মধ্যে আঁচলটা গাছকোমর করিয়া বাঁধিয়া সে তৈয়ার হইয়া দাঁড়াইল।

ব্রতীন স্নিগ্ধহাস্যে তাহার পানে তাকাইল। তাহার মনে হইল তপতী যেন হঠাৎ বদলাইয়া গিয়াছে, তাহার এ-রূপ তো সে আগে কখনও দেখে নাই। তপতীর দেহের যৌবন যেমন বস্ত্রের শাসন লঙ্ঘন করিয়া সহজে ধরা দেয় না, তাহার মনের ছেলেমানুষিও বাহিরের সংযত গাম্ভীর্য দিয়া ঢাকা থাকে, সহসা চোখে পড়ে না। কিন্তু আজ যেন বাহিরের সমস্ত আবরণ ফেলিয়া দিয়া তাহার ভিতরের চপলা তরুণীটি কলহাস্যে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ব্রতীন বিবাহের এতদিন পরে তাহার একটা নূতন পরিচয় পাইল।

ভিজা পাঞ্জাবিটা খুলিয়া মেঝেয় ফেলিতেই ব্রতীনের নগ্ন ঊর্ধ্বাঙ্গের উপর তপতীর দৃষ্টি পড়িল। বিস্তৃত বক্ষ, বলিষ্ঠ দুই বাহু; বুকের মাঝখান দিয়া বিরল রোমশতার একটি রেখা নামিয়াছে। তপতী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া ক্ষণেক চাহিয়া রহিল। ব্রতীনকে নগ্নদেহে সে ইতিপূর্বে দেখে নাই।

এই সময় শীকরসিক্ত বাতাসের একটা ঝাপটা আসিয়া তপতীর গায়ে লাগিল; তাহার বুকে গলায় রোমাঞ্চ সঞ্চার করিয়া সারা দেহে শিহরণ জাগাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। এই অনাহূত হর্ষের লজ্জা চাপিবার জন্যই যেন সে ব্রতীনের হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, 'চল, তোমাকেও ছাড়ব না—দু'জনে মিলে ভিজব—'

দু'জনে উঠানে গিয়া ভিজিল। তারপর মাঠে গিয়া বৃষ্টির মধ্যে ছুটাছুটি করিল। তপতী একবার পা পিছলাইয়া পড়িয়া গিয়া কাদায় মাখামাখি হইল; ঝড়ের গর্জনের সঙ্গে তাহাদের মিলিত হাস্যরব মিশিল। সন্ধ্যার নিস্তেজ আলোতে ঘন ধারাবর্ষণের কুজ্ঝটিকার মধ্যে তাহাদের এই উচ্ছ্বসিত ঋতু-সম্বর্ধনা কেহ লক্ষ্য করিল না।

অবশেষে ভিজিবার সাধ আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া তাহারা বাড়ি ফিরিয়া আসিল। বারান্দায় দু'জনে হাসিমুখে দু'জনের দিকে ফিরিল।

'কেমন, মন ভরেছে এবার—?' সকৌতুকে পরিহাস করিতে গিয়া ব্রতীনের গলার কথাটা আট্‌কাইয়া গেল, যেন কে তাহার গলা চাপিয়া ধরিয়াছে। বৃষ্টির মধ্যে হুড়াহুড়ি করিবার সময় সে এমন করিয়া তপতীর সিক্তবাস-দেহটি লক্ষ্য করে নাই, —এ যেন ভরা-পুকুরে প্রায়-ডুবিয়া-যাওয়া একটি কুমুদ ফুল ফুটিয়াছে; নারীত্বের গৌরবে তাহার যৌবন-শ্রী যেন উদ্ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ব্রতীন ক্ষণেক নিশ্বাস রোধ করিয়া রহিল, তারপর চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া বলিল, 'যাও, আর দেরি কোরো না, ভিজে কাপড় ছেড়ে ফেল।' বলিয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিল।

রাত্রি হইয়াছে। বায়ুর বেগ ও মেঘের গর্জন অনেকটা শান্ত হইয়াছে বটে কিন্তু বৃষ্টিধারা তেমনি অবিশ্রাম ঝরিয়া চলিয়াছে। মাঝে মাঝে অল্প বিদ্যুৎ চমকিতেছে —যেন পরিতৃপ্ত মুখের হাসি।

তপতীর শয়নঘরে খোলা জানালার সম্মুখে ব্রতীন ও তপতী পাশাপাশি দাঁড়াইয়া ছিল। ঘরের কোণে রেড়ির তেলের প্রদীপ—ঘরটি ছায়াময় স্বপ্নকুহকপূর্ণ। একপাশে তপতীর সঙ্কীর্ণ শুভ্র শয্যা অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

জানালার বাহিরে বৃষ্টির রোমাঞ্চবিদ্ধ অন্ধকার। মাথার উপর তালগাছটা গদ্‌গদকণ্ঠে অর্থহীন কথা বলিতেছে। কিন্তু যথার্থই কি অর্থহীন কথা? কান পাতিয়া শুনিলে যেন তাহার অর্থ বোঝা যায়—আদর-সোহাগ-প্রীতি মিশ্রিত রতির-সার্দ্র কলকূজন। ব্রতীন অনুভব করিল, মাটির তলায় অসংখ্য শুষ্ক বীজ সঞ্জীবিত

হইয়া উঠিতেছে—অঙ্কুরিত হইতেছে, তাহাদের কণ্ঠেও এই রসার্দ্র শীৎকার, গাঢ় গদভাষণ। ধরিত্রীর দেহ হইতে একটি সুমিষ্ট গন্ধ বাহির হইয়া আসিতেছে, যেন সম্ভুক্তা বধূর নিবিড় দেহ-সৌরভ।

তপতী শান্ত ভাবেই ব্রতীনের পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু তাহার মনের ভিতরটা কেমন যেন অশান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে পাশের দিকে তাকাইল, আবছায়া-আলোতে ব্রতীনের মুখ ভাল দেখা গেল না। নিরুৎসুক কণ্ঠে তপতী জিজ্ঞাসা করিল, 'বলদ কেমন দেখলে?'

'ভাল।' ব্রতীন তপতীর দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল, একটু করুণ হাসিয়া বলিল, 'আজ কি খেতে ইচ্ছে করছে জানো? মসুর ডালের খিচুড়ি আর ডিম ভাজা।'

'আমারও!' প্রবল উচ্ছ্বাসের সহিত কথাটা তপতীর মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল। তারপর দু'জনেই একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল। কিন্তু হাসির পিছনে অনেকখানি ব্যর্থতা ছিল। দু'জনেই জানে মসুর ডাল এবং ডিম নিষিদ্ধ খাদ্য—গুরুর নিষেধ।

তপতীর চোখ ছলছল করিয়া উঠিল—সে ব্রতীনের একটু কাছে সরিয়া আসিয়া তাহার হাতের উপর হাত রাখিল। ব্রতীন চমকিয়া উঠিল। তপতীর হাতের স্পর্শ তপ্ত—তাহার যেন জ্বর হইয়াছে।

ব্রতীন ধীরে ধীরে নিজের হাত সরাইয়া লইল, তারপর জানালার দিকে ফিরিয়া বাহিরের মসীলিপ্ত দুরবগাহ রহস্যের পানে চক্ষু মেলিয়া রহিল।

আজ বর্ষাগমের সঙ্গে সঙ্গে ব্রতীনের রক্তে ছন্দের একটা দোলা লাগিয়াছিল। এই ছন্দ মৃদঙ্গের মত তাহার মাথার মধ্যে বাজিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মন্থর লয়ে আরম্ভ হইয়া ক্রমে তাহার গতি দ্রুত হইতে দ্রুততর হইয়া এখন এমন এক স্থানে পৌঁছিয়াছিল যেখানে সব সঙ্গীত পরিণতির চরম সমে গিয়া পরিসমাপ্তি লাভ করে; অন্তঃপ্রকৃতির হর্ষাবেগ বহিঃপ্রকৃতির সহিত ওতপ্রোত একাকার হইয়া যায়। ব্রতীনের স্নায়ুশিরার এই পরমোৎকণ্ঠা দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছিল।

ঘরের কোণে প্রদীপের সোনালী শিখাটি অল্প অল্প নড়িতেছে, যেন একটি স্নিগ্ধ অথচ সতর্ক চক্ষু ব্রতীন ও তপতীর উপর দৃষ্টি রাখিয়াছে। ব্রতীনের নাভি হইতে একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল, সে তপতীর দিকে ফিরিল। তপতীর একটা হাত জানালার উপর রাখা ছিল, ব্রতীন তাহার উপর হাত রাখিয়া মৃদুকণ্ঠে ডাকিল—'তপতী।'

এবার তপতী হাত টানিয়া লইল। উচ্চকিত জিজ্ঞাসায় ব্রতীনের মুখের পানে চোখ তুলিয়া তপতীর সারা দেহ যেন ঝাঁকানি দিয়া কাঁপিয়া উঠিল; ব্রতীনের মুখের দর্পণে তপতীর মনের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। তপতীর বুকের ভিতরটা অসহ্য স্পন্দনে ধড়ফড় করিতে লাগিল, সে দু'হাতে বুক চাপিয়া ধরিল।

ব্রতীন আরও কাছে সরিয়া আসিয়া আবার ডাকিল, 'তপতী।'

ব্যাকুল চক্ষে চাহিয়া তপতী বলিয়া উঠিল, 'একটা কথা তোমায় বলা হয়নি। আজ গুরুদেবের চিঠি এসেছে।'

পাথরের মূর্তির মত ব্রতীন দাঁড়াইয়া রহিল। কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল সে নিজেই জানে না। তারপর মনের অতল হইতে উঠিয়া আসিয়া সে দেখিল জানালার উপর মুখ রাখিয়া তপতী নিঃশব্দে স্থির হইয়া আছে।

নীরস কণ্ঠে ব্রতীন বলিল, 'আজ রাত্রে কিছু খাব না—ক্ষিদে নেই।' বলিয়া নিজের শয়নঘরে গিয়া মাঝের দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

মধ্য রাত্রি। বর্ষণের ধারা এখনও থামে নাই—কিন্তু তাহার সুর বদলাইয়া গিয়াছে। ক্লান্ত দেহে বিস্রস্ত কুন্তলে সে যেন গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছে, মাটিতে

মাথা কুটিতেছে—

পাশাপাশি দুই অন্ধকার ঘরে দুইটি স্ত্রী-পুরুষ ঊর্ধ্বমুখ হইয়া শুইয়া আছে—তাহাদের অপলক চক্ষু অন্ধকারের রহস্য ভেদ করিতে পারিতেছে না। তাহাদের জীবনে ইহা পরম সিদ্ধি অথবা চরম ব্যর্থতা—তাহা কে বলিবে?

১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৫৩

বা ল খি ল্য

ক্ষুদিরামবাবুর শৈশবকালে যিনি তাঁহার নামকরণ করিয়াছিলেন, তিনি ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ ছিলেন এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। কিন্তু ক্ষুদিরামবাবুর পঞ্চাশ বছর বয়সে তাঁহার জীবনে এমন একটি ঘটনা ঘটিল যাহার পর নামমাহাত্ম্য সম্বন্ধে নূতন করিয়া গবেষণা করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। শেক্স্‌পীয়র বলিয়াছেন বটে—'নামে কিবা করে? গোলাপ, যে নামে ডাকো, সৌরভ বিতরে।' কিন্তু মহাকবির আপ্তবাক্য আর সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না।

ক্ষুদিরামবাবুর সহিত আমার অনেক দিনের ঘনিষ্ঠতা। বয়সে আমি প্রায় পনেরো বছরের কনিষ্ঠ, তবু আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বই ছিল বলিতে হইবে। কলিকাতার ভিন্ন পাড়ায় বাস করিলেও প্রায়ই তাঁহার বাড়িতে যাতায়াত করিতাম। তাঁহার দাম্পত্য জীবন সুখের ছিল না। গৃহিণীটি কিছু অধিক মাত্রায় প্রখরা, ক্ষুদিরামবাবুও একগুঁয়ে লোক; দু'জনের মধ্যে প্রায়ই খিটিমিটি লাগিয়া থাকিত, কদাচিৎ ঝগড়ার ঝড় বাদলে ফাটিয়া পড়িত। সন্তানাদি না থাকায় তাঁহাদের প্রকৃতিগত দূরত্বের মাঝখানে সেতু-বন্ধন রচিত হয় নাই।

শহরের দক্ষিণ অংশে একটি ছোটখাট দ্বিতল বাড়িতে এই প্রৌঢ়-দম্পতি বাস করিতেন। সংসারের যাবতীয় কাজ গৃহিণী করিতেন, ক্ষুদিরামবাবু কেবল তাঁহার লাইব্রেরী ঘরে বসিয়া বই পড়িতেন এবং অদ্ভুত যন্ত্রপাতি ও মালমশলা লইয়া বিষ-বৈদ্যের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহাদের অর্থের অভাব ছিল না, বাড়িটিও নিজস্ব।

ক্ষুদিরামবাবু যে পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্যের কোনও ছিরিছাঁদ ছিল না। আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত হঠযোগ ও তন্ত্রমন্ত্র মিশাইয়া তিনি তাঁহার মস্তিষ্কের মধ্যে এমন এক প্রকার খিচুড়ি তৈয়ার করিয়াছিলেন যাহা সাধারণ মানুষের পক্ষে একেবারেই দুষ্পাচ্য। অনেকে মনে করিত তাঁহার মাথায় ছিট আছে। অনুমানটা মিথ্যা না হইতেও পারে; কারণ এ সংসারে কাহার মাথায়

ছিট আছে এবং কাহার মাথায় নাই তাহা নির্ণয় করিবার মত প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি পৃথিবীতে বিরল। তবে ক্ষুদিরামবাবুর কথাবার্তা চালচলন সাধারণ মানুষের মত ছিল না তাহা স্বীকার করিতে হইবে। তিনি প্রায় সকল সময় গেরুয়া রঙে রঞ্জিত কোট-প্যাণ্টলুন পরিয়া থাকিতেন; আমি একদিন প্রশ্ন করায় তিনি প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া আমাকে বক্তৃতা শুনাইয়াছিলেন। সব যুক্তি তর্ক এখন মনে নাই, এইটুকু শুধু স্মরণ আছে যে গেরুয়া কোট প্যাণ্টলুন পরিলে শরীরে বৈদ্যুতিক শক্তি বৃদ্ধি পায়।

ক্ষুদিরামবাবুর এত পরিচয় দিবার কারণ, এই কাহিনীটি তাঁহারই জীবনের শেষ অধ্যায়ের ইতিহাস। তিনি আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ছিলেন, কয়েকটি কারণে আমি তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম; সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে কোনও অতিরঞ্জিত উদ্ভট কাহিনীর অবতারণা করিতেছি এরূপ কেহ যেন মনে না করেন।

শরীরটা কিছুদিন ভাল যাইতেছিল না, তাই ক্ষুদিরামবাবুর বাড়ি যাইতে পারি নাই। হঠাৎ একদিন খবর পাইলাম, তিনি নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। খুবই আশ্চর্য হইলাম; ক্ষুদিরামবাবু তো সাধু সন্ন্যাসী হইবার লোক নয়। তবে কিছুই বলা যায় না; গৃহিণীর সহিত অন্তর্দ্বন্দ্ব হয়তো ভিতরে ভিতরে চরমে উঠিয়াছিল। গৃহিণীর সহিত যেখানে মনের মিল নাই, সেখানে গৃহ ও অরণ্যে তফাৎ কোথায়?

অসুস্থ শরীর লইয়াই অপরাহ্ণে বালিগঞ্জে গেলাম। দেখিলাম, সংবাদ মিথ্যা নয়। ক্ষুদি-গিন্নী অনেক বিলাপ করিলেন। বয়স চল্লিশের নিকটবর্তী হইলেও তাঁহার চালচলন একটু নবীনধর্মী। তাঁহার বিলাপের ভিতর দিয়া এই ইঙ্গিতটাই স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল যে, পত্নীকে লোকসমাজে অপদস্থ করিবার জন্যই ক্ষুদিরামবাবু এমন রহস্যময় ভাবে অন্তর্ধান করিয়াছেন।

বস্তুত ক্ষুদিরামবাবুর অন্তর্ধানকে ঘোরতর রহস্যময় বলা যাইতে পারে। গত রাত্রে আহারাদির পর তিনি তাঁহার লাইব্রেরী কক্ষে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। দুইদিন যাবৎ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ ছিল, সুতরাং স্ত্রী রাত্রে স্বামীর কোনও খোঁজ খবর লন নাই। আজ সকালে উঠিয়া তিনি দেখিলেন, ক্ষুদিরামবাবু রাত্রে শয়ন করিতে আসেন নাই, লাইব্রেরী ঘরের দ্বার পূর্ববৎ বন্ধ আছে। ক্ষুদি-গিন্নী উদ্বিগ্ন হইয়া দরজায় ধাক্কা দিয়াছিলেন; দরজার ছিট্‌কিনি কিছু আল্‌গা ছিল, কিছুক্ষণ ঠেলাঠেলির পর খুলিয়া গেল। তখন ক্ষুদি-গিন্নী ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, স্বামী নাই। তাঁহার গেরুয়া কোট প্যাণ্টলুন চেয়ারের উপর পড়িয়া আছে কিন্তু তিনি অন্তর্হিত হইয়াছেন। দ্বিতলের এই ঘর হইতে বাহির হইবার অন্য কোনও পথ নাই; অবশ্য গরাদহীন একটা জানালা আছে, সেই পথ দিয়া অবতরণ করা কঠিন হইলেও একেবারে অসম্ভব নয়। ক্ষুদি-গিন্নী যথারীতি চেঁচামেচি করিয়াছিলেন কিন্তু স্বামীর সন্ধান পান নাই। শুধু তাই নয়, ক্ষুদিরামবাবুর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির পোষা বিড়ালটাও অদৃশ্য হইয়াছিল, তাহাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছিল না।

একি অসম্ভব ব্যাপার! ক্ষুদিরামবাবুর প্রাণে যদি বৈরাগ্যই জাগিয়াছিল তবে তিনি সম্পূর্ণ দিগম্বর বেশে কেবল একটি বিড়ালকে সঙ্গী লইয়া বিবাগী হইলেন কেন? ইহা তো সহজ মানুষের কাজ নয়। তবে কি কোনও কারণে তাঁহার মস্তিষ্ক-বিকার ঘটিয়াছে?

ক্ষুদি-গিন্নী আমাকে লাইব্রেরী ঘরে লইয়া গেলেন। ঘরটি বেশ বড়, দেয়াল ঘিরিয়া বইয়ের আলমারি। মাঝখানে একটি দেরাজ-যুক্ত টেবিল, তাহার উপর বিবিধ আকৃতির বোতল খল্ নুড়ি প্রভৃতি অগোছালো ভাবে ছড়ানো রহিয়াছে। এই ঘরে বসিয়া ক্ষুদিরামবাবুর কত আজগুবি গবেষণা শুনিয়াছি। দেখিলাম, তাঁহার চেয়ারের

উপর গেরুয়া কোট প্যাণ্টলুন পড়িয়া আছে; এমন কি আভ্যন্তরিক অংগবাসও তিনি ফেলিয়া গিয়াছেন। ক্ষুদি-গিন্নী সখেদে টেবিল ও আলমারিগুলি দেখাইয়া বলিলেন, 'এসব আর কিসের জন্যে ঠাকুরপো? তুমি তো অনেক জানো শোনো, এসব বিক্রি করে ফেলা যায় না?'

আশ্চর্য হইয়া বলিলাম, 'বলেন কি বৌদি? ক্ষুদিরামদা হয়তো কালই ফিরে আসবেন। যে-বেশে তিনি বেরিয়েছেন পুলিসের হাতে পড়াও অসম্ভব নয়। তাঁর এত আদরের জিনিসপত্র বিক্রি করে ফেলতে চান?'

ক্ষুদি-গিন্নী আর কিছু বলিলেন না। স্বামীর প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা উপলব্ধি করিয়া তিনি প্রসন্ন হইলেন কিনা বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ক্ষুদিরামদা চিঠিপত্র কিছু রেখে গেছেন কিনা খুঁজে দেখেছেন?'

'তুমিই খুঁজে দ্যাখো ভাই, আমি তো কিছু পাইনি।' বলিয়া তিনি ঘর হইতে প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর টেবিল দেরাজ সবই হাঁট্‌কাইয়া দেখিলাম, কিন্তু চিঠিপত্র কিছু পাওয়া গেল না; ক্ষুদিরামদা কোনও কৈফিয়ৎ না দিয়া নিঃসাড়ে সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। বিক্ষিপ্ত চিত্তে ঘরের এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, ক্ষুদিরামদা কিরূপ মনোভাব লইয়া গৃহত্যাগী হইয়াছেন অনুমান করিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু চেষ্টা বিফল হইল। কোনও অবস্থাতেই তাঁহার নাগা সন্ন্যাসী হওয়া কল্পনা করিতে পারিলাম না।

একটি আলমারির কবাট দুই ইঞ্চি ফাঁক হইয়া ছিল। মনে হইল কাল রাত্রে হয়তো এই আলমারি হইতে বই লইয়া ক্ষুদিরামদা পড়িয়াছিলেন। সংসার হইতে বিদায় লইবার প্রাক্কালে কিরূপ বই পড়িবার ইচ্ছা তাঁহার হইয়াছিল, জানিবার ঔৎসুক্য হইল। কাছে গিয়া কাচের ভিতর দিয়া দেখিলাম প্রেততত্ত্ব ঘটিত নানা জাতীয় পুস্তক। ইংরেজী বই আছে, বাংলা আছে।

'ওহে বিকাশ—!'

চমকিয়া উঠিলাম—কে ডাকিল? কণ্ঠস্বর চেনা চেনা, কিন্তু এত ক্ষীণ ও সূক্ষ্ম যে বিশ্বাস হয় না। রেডিও খুলিয়া দিবার পর প্রথমে যেরূপ বহু দূরাগত অস্ফুট আওয়াজ শোনা যায় এ যেন অনেকটা সেই রকম। কিন্তু কে আমাকে ডাকিল? ঘরের চারিদিকে সচকিত দৃষ্টিপাত করিলাম, কৈ কেহই তো নাই।

'ওহে বিকাশ—'

এবার চিনিতে পারিলাম—ক্ষুদিরামদা'র গলা; এবং তাহা আসিতেছে আলমারির ভিতর হইতে! তবে কি ক্ষুদিরামদা কোনও অভাবনীয় উপায়ে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন?

'শুনছ? আমি এখানে।'

অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে আলমারির দরজা আর একটু খুলিলাম। অমনি নীচের থাকের পুস্তকশ্রেণীর পিছন হইতে তড়াক করিয়া একটি জীব বাহির হইয়া আসিল। আমিও তড়াক করিয়া দুই পা পিছাইয়া আসিলাম। জীবনে এত বিস্মিত কখনও হই নাই।

ভূত-প্রেত নয়—জীবন্ত ক্ষুদিরামদা। সেই টাক মাথা; সেই নিকষ কৃষ্ণ বর্ণ, নাক মুখ চোখ সবই ঠিক তেমনি আছে—কিন্তু তাঁহার দৈহিক দৈর্ঘ্য স্রেফ্‌ ছয় ইঞ্চি হইয়া গিয়াছে। রুমালের মত একটা ন্যাক্‌ড়া কৌপীনের আকারে কোমরে জড়াইয়া তিনি ঊর্ধ্বমুখ হইয়া দৃপ্ত-ভঙ্গীতে আমার পানে তাকাইয়া আছেন।

আকস্মিক ধাক্কায় আমার বুদ্ধিসুদ্ধি প্রায় সবই দিশাহারা হইয়া গিয়াছিল,

তবু উবু হইয়া বসিয়া তাঁহাকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলাম। কেমন করিয়া সম্ভব হইল জানি না কিন্তু ইনি নিঃসংশয়ে ক্ষুদিরামদা'র অতি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। মাথাটি আমড়ার মত এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সেই অনুপাতে। সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা ক্ষুদিরামদা কোন ইন্দ্রজাল প্রভাবে এমন একরত্তি হইয়া গেলেন ভাবিয়া পাইলাম না।

আলো চালের মত দাঁত বাহির করিয়া ক্ষুদিরামদা হাসিলেন, তাঁহার সূক্ষ্ম অথচ স্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম, 'চিনতে পেরেছ তাহলে? ভয় পেও না। আগে ঘরের দরজা চট্ করে বন্ধ করে দাও। নইলে গিন্নী দেখতে পেলেই সর্বনাশ।'

তাড়াতাড়ি গিয়া দরজার ছিট্‌কিনি লাগাইলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখি ক্ষুদিরামদা কার্পেটের উপর পদ্মাসনে বসিয়াছেন; কৌপীন পরিহিত বেশে তাঁহাকে বালখিল্য মুনির মত দেখাইতেছে। আমিও তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট হইলাম।

তিনি বলিলেন, 'বড়ই বিপদে পড়েছি হে বিকাশ—'

বলিলাম, 'তাহলে সত্যিই আপনি ক্ষুদিরামদা?'

তিনি চোখ পাকাইয়া তাকাইলেন। তাঁহার মেজাজ স্বভাবতই একটু তিরিক্ষি, তাই তাড়াতাড়ি বলিলাম, 'না না, বুঝেছি আপনি ক্ষুদিরামদা। কিন্তু আপনার এ অবস্থা হল কি করে?'

তিনি বলিলেন, 'সে কথা পরে বলছি। ক্ষিদেয় নাড়ী জ্বলে যাচ্ছে, আগে খাবার ব্যবস্থা কর।'

'খাবার ব্যবস্থা! কিন্তু বৌদির কাছে খাবার চাইতে গেলে—'

'না না, ওদিকে যেও না। ঐ আলমারির মাথায় বিস্কুটের টিন আছে নামিয়ে নিয়ে এস।'

বিস্কুটের টিন নামাইয়া কয়েকটি বিস্কুট ক্ষুদিরামদা'কে দিলাম; তিনি একটি বিস্কুট দুই হাতে ধরিয়া কুটুর কুটুর করিয়া খাইতে লাগিলেন।

বলিলাম, 'এবার বলুন কী করে এই অদ্ভুত রূপান্তর হল।'

তিনি তখন বিস্কুট খাইতে খাইতে বলিতে আরম্ভ করিলেন, আমি তাঁহার দিকে যতদূর সম্ভব ঝুঁকিয়া শুনিতে লাগিলাম—

'আর বল কেন? বগুলাবাবার নাম শুনেছ তো? ব্যারাকপুরে এসে আছেন। কিছু দিন থেকে তাঁর কাছে যাতায়াত করছিলুম।—'

বগলানন্দ বাবাজীর নাম অনেকেই জানেন, তিনি একজন উগ্র প্রকৃতির তান্ত্রিক সাধু। বেশীর ভাগ সময় পাহাড় পর্বতে থাকেন; মাঝে মাঝে কলিকাতার উপকণ্ঠে যখন দেখা দেন তখন তাঁহার কাছে লোক ভাঙিয়া পড়ে। বাবাজী নাকি সিদ্ধপুরুষ, অনেক অলৌকিক ক্ষমতা আছে।

ক্ষুদিরামদা বলিয়া চলিলেন, 'বাবা অষ্টসিদ্ধি লাভ করেছেন। অষ্টসিদ্ধি জানো তো? অণিমা লঘিমা—এই সব। ভাবলুম, দেখি তো সত্যিই অষ্টসিদ্ধি বলে কিছু আছে কিনা। জোঁকের মতন বাবার পেছনে লেগে গেলুম। বাবা প্রথমে কিছুতেই আমল দিতে চান না, কয়েকবার গালাগালি দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন। শেষে কাল সকালবেলা নাছোড়বান্দা হয়ে বাবাকে ধরলুম। বললুম বাবা, আজকাল পৃথিবীর লোক কিছু বিশ্বাস করে না, বিজ্ঞান এসে মানুষের মাথা বিগড়ে দিয়েছে। এখন আপনি যদি অষ্টসিদ্ধি প্রমাণ করে দিতে পারেন তাহলে বিজ্ঞানের মুখে চুনকালি পড়বে, মানুষের ধর্মজ্ঞান ফিরে আসবে। শুনে বাবা বললেন, ঐসা বাৎ? আচ্ছা লেঃ! এই বলে ঝুলির ভেতর থেকে একটি পুরিয়া বার করে দিলেন। বললেন, এই পুরিয়ার মধ্যে মন্ত্রপূত গুঁড়ো আছে, মধু দিয়ে মেড়ে রাত্রে খাবি। জিজ্ঞেস করলুম, এতে কী হবে বাবা? বাবা হেসে বললেন, এখন বলব না; খেয়ে দ্যাখ্, বুঝতে পারবি।

'পুরিয়া নিয়ে ফিরে এলুম। মনে কেমন ধোঁকা লাগল। সাধু সন্ন্যাসির মন বোঝা ভার, কি জানি বাবা যদি আমার হাত ছাড়াবার মতলবে বিষ-টিষ কিছু দিয়ে থাকেন? কিন্তু এদিকে পরীক্ষা না করলেও নয়। একবার ভাবলুম গিন্নীর ওপর পরখ করে দেখি—যায় শত্রু পরে পরে। কিন্তু তাঁকে খাওয়াব কি করে? বিশেষত এখন ঝগড়া চলছে। শেষে ভেবে চিন্তে ঠিক করলুম আমিই খাব, তবে সবটা খাব না; একটুখানি খেয়ে দেখব কোনও ফল হয় কিনা। ভাগ্যিস একটুখানি খেয়েছিলুম, নইলে, একেবারে 'ভাইরাস্' হয়ে যেতুম, মাইক্রসকোপ দিয়েও আমাকে দেখতে পেতে না।

'যাহোক, কাল রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর এই ঘরে দোর বন্ধ করে বসলুম। পুরিয়া খুলে দেখি, হলদে রঙের একটুখানি গুঁড়ো। খল নুড়ি মধু জোগাড় করে রেখে-ছিলুম, গুঁড়ো খলে দিয়ে বেশ ভাল করে মধু দিয়ে মাড়লুম। মুখরোচক একটি সুগন্ধ বেরুতে লাগল।

'মাড়া শেষ হলে নুড়ির মাথায় যতটুকু ওঠে ততটুকু ওষুধ বেটে নিলুম। তারপর খল নুড়ি সরিয়ে রেখে চেয়ারে বসলুম।

'দু' মিনিট যেতে না যেতেই বুঝলুম—ওষুধ ধরেছে। শরীরের ভেতর থেকে একটা ঝাঁঝ বেরুচ্ছে। জ্বালা নয়—তাপ। মনে হল আমার শরীরের যতকিছু পদার্থ সব আগুনের তাপে বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে। ক্রমে তাপ অসহ্য হয়ে উঠল, আমি অজ্ঞান হয়ে গেলুম—

'যখন জ্ঞান হল রাত তখন দুটো। দেখি, চেয়ারের ওপর পড়ে আছি, চেয়ারটা মস্ত বড় দেখাচ্ছে। প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারলুম না, আমার কাপড়-চোপড় এত বড় হয়ে গেছে কী করে? তারপর বুঝলুম, আমিই ছোট হয়ে গেছি। কোটের পকেট থেকে অনেক কষ্টে রুমাল বার করে পরে ফেললুম। লজ্জা নিবারণ করতে হবে তো!'

এতক্ষণে ক্ষুদিরামদা'র অর্ধেক বিস্কুট খাওয়া হইয়াছে, তিনি পেটে হাত বুলাইয়া একটি উদ্গার তুলিলেন, বলিলেন, 'একটু জল পেলে ভাল হত—কিন্তু জল আর কোথায় পাবে? মধু'র বোতলটা নিয়ে এস।'

মধু'র বোতল টেবিলের উপর ছিল, আনিয়া দিলাম। ক্ষুদিরামদা দুই ফোঁটা মধু পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন।

বলিলাম, 'তারপর?'

তিনি কহিলেন, 'তারপর অনেক কায়দা করে চেয়ার থেকে নামলুম। কিন্তু দরজা খুল্ব কি করে, ছিট্‌কিনি তো নাগাল পাব না! ঘরময় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে ভাবতে লাগলুম, এখন কী করি? ওষুধ খেয়ে যে এই অবস্থা হবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। গিন্নী যদি জানতে পারেন আমি এতটুকু হয়ে গেছি, তাঁর আনন্দের সীমা থাকবে না, বলবেন তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করার ফলেই আমার এই দশা হয়েছে। তার ওপর তাঁর যে রকম বিষয়-বুদ্ধি, হয়তো আমাকে সার্কাসে দেখিয়ে টাকা রোজগারের ফন্দি বার করবেন। সুতরাং আর যাই করি গিন্নীকে জানতে দেওয়া হবে না। তোমার ওপর আমার আদেশ রইল একথা কাউকে বলবে না।' বলিয়া কট্‌মট করিয়া আমার পানে তাকাইলেন।

দেখিলাম, তাঁহার আকৃতি ছোট হইয়া গেলেও প্রকৃতি আগের মতই আছে। এতটুকু মানুষের আজ্ঞা পালন করিতে হইবে, ইহাতে মনটা খুঁতখুঁত করিতে লাগিল। কিন্তু তবু অমান্য করিবার উপায় নাই, তিনি গুরুজন। আপাততঃ আদেশ শিরো-ধার্য করিয়া লইয়া প্রশ্ন করিলাম, 'রাত্রে আর কিছু ঘটেনি?'

তিনি চক্ষু ঘুরাইয়া বলিলেন, 'ঘটেনি আবার? ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ এক সময় দেখি, জানলা দিয়ে একটা প্রকাণ্ড বাঘ ঘরে ঢুকছে। তারপরই বুঝতে

ছিল, শোবার ঘরে ঢুকেছিলুম। গিন্নী ভারি আরামে ঘুমোচ্ছিলেন—হুঁ হুঁ—তাঁর চুল ধরে টেনেছি, পায়ে সুড়সুড়ি দিয়েছি, আলো নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকারে খিক্ খিক্ করে হেসেছি। গিন্নীর অবস্থা যদি দেখতে—' বলিয়া তিনি দুই হাতে পেট চাপিয়া খিক্ খিক্ করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম, 'ছি ক্ষুদিরামদা, এ আপনার উচিত হয়নি। অবলা ভদ্রমহিলা—তাঁকে ভূতের ভয় দেখানো—'

তিনি বিদ্রোহীর মত ঘাড় বাঁকাইয়া বলিলেন, 'কেন ভয় দেখাব না? সারা জীবন জ্বালিয়েছে আমাকে। কিন্তু সে যাক, এখন আমার উপায় কি হবে বল।'

পরামর্শ করিয়া উপায় স্থির হইল। আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে, তাঁহার গৃহিণীকে সব কথা বলিয়া তাহাকেও দলে লওয়া হোক, কিন্তু ক্ষুদিরামদা সতেজে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। ছয় ইঞ্চি শরীর লইয়া কিছুতেই তিনি গৃহিণীকে দেখা দিবেন না। অগত্যা স্থির হইল, আমি তাঁহাকে লইয়া গিয়া নিজের কাছে রাখিব। আমি একলা মানুষ, আমার বাসায় থাকিলে সহজে ধরা পড়িবার ভয় নাই।

পাঞ্জাবির পকেটে ক্ষুদিরামদা'কে পুরিয়া চাদরটা ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া লইলাম। তারপর দূর হইতে বৌদির নিকট বিদায় লইলাম। তাঁহার বেশী কাছে যাইতে সাহস হইল না; তিনি যেরূপ সন্দিগ্ধ প্রকৃতির লোক, লাইব্রেরী হইতে কোনও মূল্যবান বস্তু চুরি করিয়া লইয়া পলাইতেছি মনে করিয়া খানাতল্লাসী আরম্ভ করিলেই বিপদ। যাহোক, তিনি বান্ধবীদের লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, কোনও বিভ্রাট ঘটিল না।

ক্ষুদিরামদা আমার বাসায় আসিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন। অতঃপর তাঁহার কাহিনী যথাসম্ভব সংক্ষেপে শেষ করিব। ইহা যদি কাল্পনিক কাহিনী হইত তাহা হইলে বেশ একটা জোরালো উপসংহার উদ্ভাবন করিয়া পাঠককে চমৎকৃত করিবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু সত্য ঘটনা climax-এর ধার ধারে না, বরং anticlimax-এর দিকেই তার ঝোঁক বেশী। ক্ষুদিরামদা'র কাহিনীর পরিসমাপ্তি পড়িয়া যদি কেহ নিরাশ হন আমার দায়-দোষ নাই, আমি নিছক সত্য কথা লিপিবদ্ধ করিয়া খালাস।

আমার বাসায় আমার শয়ন ঘরে একটি ঝাঁপির মধ্যে তূলা বিছাইয়া ক্ষুদিরামদা'র বাসস্থান নির্দেশ করিলাম। নরম বিছানা পাইয়া প্রথমেই তিনি খুব খানিকটা ঘুমাইয়া লইলেন।

তারপর তাঁহার নানাবিধ ফরমাস আরম্ভ হইল। বুরুশ দিয়া দাঁত মাজিবেন, দাড়ি কামাইবেন, রুমাল পরিয়া আর থাকিবেন না, ইত্যাদি। গেরুয়া কোট প্যাণ্টলুন যদি একান্তই সম্ভব না হয়, অন্ততঃ ধুতি এবং পাঞ্জাবি তাঁহার চাইই। ধুতি সহজেই ন্যাকড়া ছিঁড়িয়া তৈয়ার হইল, কিন্তু পাঞ্জাবি লইয়া বিশেষ বেগ পাইতে হইল। অবশেষে পুতুলের জামা তৈয়ার করাইতেছি এই ছল করিয়া এক দর্জিকে দিয়া পাঞ্জাবি তৈয়ার করাইয়া লইলাম। ধুতি পাঞ্জাবি পরিয়া ক্ষুদিরামদা ভারি খুশী হইলেন। কিন্তু তাঁহার মাপের জুতা কোনও মতেই জোগাড় করা গেল না। বুরুশ দিয়া দাঁত মাজা ও দাড়ি কামাইবার সাধও তাঁহার অপূর্ণ রহিয়া গেল।

সর্বশেষে তিনি বায়না ধরিলেন, হরিদ্বারে গিয়া বগুলাবাবাকে পাকড়াও করিবেন। এ বায়না তাঁহার পক্ষে নেহাৎ অযৌক্তিক নয়। আমার ডাক্তারও কিছুদিন হইতে আমাকে হাওয়া বদল করিবার অনুজ্ঞা জানাইতেছিলেন, সুতরাং এক ঢিলে দুই পাখি মারার উদ্দেশ্যে হরিদ্বার যাওয়াই সাব্যস্ত হইল।

ক্ষুদিরামদা'কে ঝাঁপিতে লইয়া হরিদ্বার রওনা হইলাম। পথে যেসব বিপদ আপদ ঘটিয়াছিল, ক্ষুদিরামদা ধরা পড়িতে পড়িতে কিরূপ বাঁচিয়া গিয়াছিলেন, বাহুল্য ভয়ে তাহা আর বর্ণনা করিলাম না।

হরিদ্বারে এক ধর্মশালায় আশ্রয় লইলাম। বগ্‌লাবাবার সন্ধান সহজেই মিলিল, তিনি শহরের বাহিরে এক নির্জন স্থানে বাস করিতেছেন। ঝাঁপি লইয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলাম।

বাবা একাকী ছিলেন। উগ্রমূর্তি রক্তচক্ষু সন্ন্যাসী, আমাকে দেখিয়া কট্‌মট্‌ করিয়া তাকাইলেন। আমি তাড়াতাড়ি ক্ষুদিরামদা'কে ঝাঁপি হইতে বাহির করিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া দিলাম। বাবা কিছুক্ষণ নিষ্পলক নেত্রে ক্ষুদিরামদা'কে নিরীক্ষণ করিলেন, তারপর তাঁহার জটিল দাড়ি গোঁফ উন্মথিত করিয়া ধমকে ধমকে হাসির লহর বাহির হইতে লাগিল। ক্ষুদিরামদা কাঁচুমাচু মুখ করিয়া হাসিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

বাবার হাসি থামিতেই ক্ষুদিরামদা জোড়হস্তে বলিলেন, 'বাবা, এ আমায় কী করে দিলে!'

বাবা বলিলেন, 'প্রমাণ চেয়েছিলি প্রমাণ পেয়েছিস। এখন দুনিয়ার লোককে দেখা।'

'না বাবা, আমাকে ভাল করে দাও।'

'ছোট হওয়া সহজ, বড় হওয়া অত সহজ নয়।'

'তবে কি চিরকাল এমনি থেকে যাব বাবা?'

'আগের মত হতে তোর দশ বছর লাগবে—যদি বেঁচে থাকিস। একটু একটু করে বাড়বি। যা—আর আমাকে বিরক্ত করিস না।' বলিয়া বাবা আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

চলিয়া আসিলাম। ক্ষুদিরামদা'র মন তো খারাপ হইলই, আমারও বুক দমিয়া গেল। দশ বছর ধরিয়া ক্ষুদিরামদা'কে বহন করিয়া বেড়াইতে হইবে! দশ বছর না হোক, পাঁচ ছয় বছর তো বটেই। হিসাব করিয়া দেখিলাম, বছরে ক্ষুদিরামদা ছয় ইঞ্চি করিয়া বাড়িবেন। আগামী বছর তাঁর দৈর্ঘ্য হইবে এক ফুট, তার পরের বছর দেড় ফুট। এই ভাবে কত দিন চালাইব? ক্ষুদিরামদা'কে আমি ভক্তি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু বছরের পর বছর তাঁহাকে ঝাঁপিতে লইয়া বহিয়া বেড়াইতেছি কল্পনা করিতেই হাত-পা শিথিল হইয়া গেল। বিধাতা যে অন্তরীক্ষে থাকিয়া আমার আশু মুক্তির উপায় চিন্তা করিতেছেন তাহা তখন জানিতাম না।

বগ্‌লাবাবার আশ্রম হইতে শহর অনেকখানি পথ। মাঝামাঝি আসিয়া ক্লান্ত পদে পথের ধারে একটি পাথরের পাটার উপর বসিলাম। ক্ষুদিরামদা ভিতর হইতে ঝাঁপি আঁচড়াইতে লাগিলেন; স্থান নির্জন দেখিয়া তাঁহাকে খুলিয়া বাহির করিয়া দিলাম।

দৃশ্যটি এখনও আমার চোখের উপর ভাসিতেছে। চারিদিকে উপলবন্ধুর ভূমি, ঊর্ধ্বে উজ্জ্বল নীল আকাশ। পথের ধারে চত্বরের মত একটি শিলাপট্টের উপর আমি বসিয়া আছি, আর একটি ক্ষুদ্র মানবক দুই হাত আস্ফালন করিয়া পাটার উপর পায়চারি করিতেছে।

ক্ষুদিরামদা ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিতেছেন, 'এ রকম হবে জান্‌লে কোন্‌ শা—। বগ্‌লাবাবা আমার সঙ্গে বজ্জাতি করেছে। নইলে ওষুধ দিয়ে আমাকে ভাল করে দিতে পারত না? নিশ্চয় পারত।'

ক্লান্ত স্বরে বলিলাম, 'আপনি অন্তর্সিদ্ধির প্রমাণ চেয়েছিলেন, এখন আর অনুযোগ করা সাজে না। বরং বাবা যা বলেছেন তাই করা উচিত, দুনিয়ার লোককে দেখানো উচিত যে ভারতের সাধনা মিথ্যে নয়। বিলেতের পণ্ডিতেরা—'

মহা খাপ্পা হইয়া ক্ষুদিরামদা পদদাপ করিলেন, বলিলেন, 'গোল্লায় যাক বিলেতের পণ্ডিতেরা। চিড়িয়াখানার জন্তুর মত আমাকে সবাই দেখবে, গিন্নী মুখে আঁচল দিয়ে হাসবে—সে কিছুতেই হবে না।'

'আমার কথা শুনুন—'

'না না না—কখখনো না।'

হঠাৎ মাথায় রাগ চড়িয়া গেল। বলিলাম, 'আপনি বড় একগুঁয়ে। নিজের ইচ্ছেয় যদি রাজী না হন আমি জোর করে সকলের সামনে আপনাকে দেখাব। কি করতে পারেন আপনি?'

সেদিন ধৈর্য হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম বলিয়া আজ দুঃখ হয়। ক্ষুদিরামদা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া হাত-পা ছুঁড়িতে লাগিলেন, চক্ষু ঘূর্ণিত করিতে করিতে বলিলেন, 'কী—তোমার এতবড় আস্পর্ধা—'

তাঁহার কথা শেষ হইতে পাইল না। সাঁই করিয়া একটা শব্দ হইল, পরমুহূর্তেই দেখিলাম একটা চিল ক্ষুদিরামদা'কে ছোঁ মারিয়া লইয়া উড়িয়া গেল। চিলের নখের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া ক্ষুদিরামদা চিলের মতই তীক্ষ্ণস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। আমি ক্ষণেক হতভম্ব থাকিয়া চীৎকার করিতে করিতে চিলের পিছনে ছুটিলাম। কিন্তু কোনও ফল হইল না, চিল অবলীলাক্রমে ক্ষুদিরামদা'কে বহন করিয়া দূর আকাশে বিলীন হইয়া গেল।

মৃত্যু কখন কোন দিক দিয়া আসিবে বলা যায় না। একচক্ষু হরিণ অপ্রত্যাশিত দিক হইতে তীর খাইয়াছিল। ক্ষুদিরামদা'র জীবন যে অকস্মাৎ চিলের পেটে গিয়া পরিসমাপ্তি লাভ করিবে তাহা কে কল্পনা করিতে পারিত?

অত্যন্ত ভারাক্রান্ত চিত্তে হরিদ্বার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। সাধুরা সত্যই বলিয়াছেন, সিদ্ধাই ভাল নয়। ক্ষুদিরামদা'র পক্ষে তাহা কল্যাণকর হয় নাই। তবু দুঃখ হয়, আমি যাহা দেখিয়াছি তাহা আর কাহাকেও দেখাইতে পারিলাম না।

ক্ষুদি-গিন্নীকে তাঁহার স্বামীর শোচনীয় পরিণামের কথা বলি নাই। তিনি মনে মনে এখনও আশঙ্কা করিতেছেন, হঠাৎ কোনদিন ক্ষুদিরামদা ফিরিয়া আসিবেন।

মেয়েমানুষের মনে একটু ভয় থাকা ভাল।

৬ ভাদ্র ১৩৫৪

পূর্ণিমা

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল—ফাগুন মাসের পূর্ণিমার চাঁদ; কলিকাতা শহরের অসমতল মস্তকের উপর অজস্র কিরণজাল ঢালিয়া দিতেছিল। এই ফাগুন পূর্ণিমার

চাঁদ সামান্য নয়; যুগে যুগে কত কবি ইহার মহিমা কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এই মহিমা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

সদর রাস্তা ও গলির মোড়ের উপর একটি বাড়ি। তাহার ত্রিতলের একটি ঘরে বাড়ির কর্তা মুরারি চাটুয্যে খাটের উপর হাঁটু তুলিয়া এবং মুখ বিকৃত করিয়া শুইয়া ছিলেন। রাত্রি আন্দাজ সাড়ে ন'টা। চাঁদ আকাশের জ্যোৎস্না-পিছল পথে পথে বেশ খানিকটা উঁচুতে উঠিয়াছে।

মুরারি চাটুয্যের হাঁটুর মধ্যে চিড়িক্ মারিতেছিল। তিনিও হঠাৎ চিড়িক্ মারিয়া ডাকিয়া উঠিলেন, 'গিনি—ওরে গিনি—'

কন্যা হেমাঙ্গিনী আসিয়া দাঁড়াইল।

'কি বাবা?'

চাটুয্যে বলিলেন, 'আমার খাবার ঘরেই দিয়ে যাবি। আজ নামতে পারব না।'

গিনি বলিল, 'বাতের ব্যথা বেড়েছে বুঝি?'

'হুঁ। আর শোন্, কবিরাজি তেল আর একটু আগুন করে নিয়ে আয়, সেঁক দিতে হবে।'

গিনি বলিল, 'আচ্ছা। আজ পূর্ণিমা কিনা, তাই বাতের ব্যথা চাগাড় দিয়েছে।'

চাটুয্যে দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিলেন, 'পূর্ণিমার নিকুচি করেছে।'

গিনি সেঁকের ব্যবস্থা করিতে গেল। তাহার মনে পড়িল, দু'বছর আগে এই ফাগুন পূর্ণিমার রাত্রে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। তারপর ছয় মাস কাটিল না, সব ফুরাইয়া গেল। কেবল সুদীর্ঘ শুষ্ক ভবিষ্যৎ পড়িয়া রহিল। গিনির মর্মতল মথিত করিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। ফাগুন পূর্ণিমা!

রান্নাঘরে গিয়া গিনি মালসায় আগুন তুলিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় তাহার দাদা জীবু দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। জীবুর চেহারা রোগা লম্বা, মাথাটাও লম্বাটে ধরনের, চোখ দুটো জ্বল্‌জ্বলে। তাহার গায়ে চাদর জড়ানো রহিয়াছে, চাদরের ভিতর দুই হাত বুকের উপর আবদ্ধ।

জীবু বলিল, 'গিনি, আমার খাবার ঢাকা দিয়ে রাখিস। আমি বেরুচ্ছি—'

গিনির বুকের ভিতর ছাঁৎ করিয়া উঠিল, 'এত রাত্রে বেরুচ্ছ!'

'হ্যাঁ'—জীবু চলিয়া গেল।

গিনি শঙ্কিত চক্ষে চাহিয়া রহিল। আজ পূর্ণিমা।

বাড়ি হইতে ফুটপাথে নামিয়া জীবু দেখিল, সম্মুখেই চাঁদ। সে বড় বড় দাঁত বাহির করিয়া হাসিল, তারপর আপন মনে চলিতে আরম্ভ করিল। চাদরের মধ্যে হাতের মুঠিতে যে-বস্তুটি শক্ত করিয়া ধরা আছে তাহা যেন হাতের উত্তাপে গরম হইয়া উঠিতেছে।

কিছুদূর চলিয়া জীবু থমকিয়া দাঁড়াইল। ফুটপাথের পাশেই একটা খোলা জানালা, ভিতর হইতে আলো আসিতেছে। জীবু গলা বাড়াইয়া জানালার ভিতর উঁকি মারিল, ডাকিল, 'ও মহীদা—'

ঘরের মধ্যে একটি লোক টেবিলের সম্মুখে বসিয়াছিল, সে উঠিয়া আসিয়া জানালার সম্মুখে দাঁড়াইল।

'কে, জীবু নাকি? কি খবর হে?'

জীবু বলিল, 'ভারি সুন্দর চাঁদ উঠেছে, চল না মহীদা, বেড়াতে যাবে।'

মহী বলিল, 'এত রাত্রে বেড়াতে? পাগল নাকি?'

জীবু মিনতি করিয়া বলিল, 'চল না মহীদা, এমন চাঁদের আলো—'

'আমি যাব না ভাই, তুমি যাও—' বলিয়া মহী জানালা বন্ধ করিয়া দিল। জ্বল্-

জ্বলে চোখ লইয়া জীবু কিছুক্ষণ বন্ধ জানালার বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর আবার চলিতে আরম্ভ করিল।

ঘরের ভিতর মহী আসিয়া আবার টেবিলের সম্মুখে বসিল। জীবুর সহিত রাত্রে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইবার পাগলামি তাহার নাই বটে, কিন্তু জীবুর কথাগুলা তাহার কানে বাজিতে লাগিল—ভারি সুন্দর চাঁদ উঠেছে...এমন চাঁদের আলো—

মহী একজন কবি। এবং প্রেমিকও বটে। তাহার ত্রিশ বছর বয়স এবং সচ্ছল অবস্থা সত্ত্বেও সে বিবাহ করে নাই; কারণ বারেন্দ্র শ্রেণীর হইয়া সে একটি রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কন্যাকে ভালবাসিয়াছিল।

যাহাকে সে ভালবাসিয়াছিল তাহার কী রূপ—যেন সর্বাঙ্গ দিয়া জ্যোতি ফাটিয়া পড়ে। পাড়া সম্পর্কে মহী তাহার বাড়িতে যাতায়াত করিত, কদাচ দু' একটা কথাও বলিত; কিন্তু মহী বড় মুখচোরা, তাহার মনের কথা ঘুণাক্ষরে প্রকাশ পায় নাই। উশীরের মত তাহার অন্তরের সমস্ত সৌরভ শিকড়ে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল এবং তাহাকে মধ্যম শ্রেণীর একটি কবি করিয়া তুলিয়াছিল।

দুই বছর আগে মেয়েটির বিবাহ হইয়াছিল, তারপর নবোঢ়া বধূ স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি চলিয়া গেল। কিন্তু ছয় মাস যাইতে না যাইতে সে বিধবা হইয়া আবার পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিল।...লোকে বলে বিষকন্যা ঐ রকম হয়, তাহাদের কেহ ভোগ করিতে পারে না...বিষকন্যা কি সত্য—না কবিকল্পনা? যদি কল্পনাই হয় তবে তাহার মধ্যে তীব্র কবিত্বের ঝাঁঝ আছে—

মহীর মাথার মধ্যেও কবিতা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। সে জানালা খুলিয়া একবার বাহিরে তাকাইল। সম্মুখেই পূর্ণিমার চাঁদ, জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভাসিয়া যাইতেছে—

মহী ফিরিয়া আসিয়া কবিতা লিখিতে বসিল।

—চাঁদের আলোয় তোমারে দেখিনি কভু
মনে হয় তুমি আরও সুন্দর হবে।
বিদ্যুৎ শিখা নবনীপিণ্ড হয়ে
জমাট বাঁধিয়া রবে।

কবিতা যখন শেষ হইল তখন চাঁদ মাথার উপর উঠিয়াছে, কলিকাতা শহর নিশুতি।

কিন্তু কবিতা লিখিয়া মহীর হৃদয়াবেগ সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয় নাই; তাহার উপর ঘুম চটিয়া গিয়াছে। সে ভাবিতে লাগিল, অনেকদিন গিনিকে দেখিনি...আজ এই চাঁদ্‌নি আলোতে সে যদি একবার জানলার কাছে এসে দাঁড়ায়...উন্মনা হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে...আমি রাস্তা থেকে চুপি চুপি দেখে ফিরে আসব।...

সম্ভাবনা কম, বুঝিয়াও মহী রাস্তায় বাহির হইল। সে হঠকারী নয়—কিন্তু আজ আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ—

জীবু অনেক রাস্তা ঘুরিয়া আবার নিজের পাড়ায় ফিরিয়াছিল। তাহার মাথার মধ্যে মাদকতার ফেনা গাঁজিয়া উঠিতেছিল। একটা মানুষকে নিরিবিলি পাওয়া যায় না? যতক্ষণ পথে মানুষ ছিল জীবু সতর্কভাবে তাহাদের নিরীক্ষণ করিয়াছে, কিন্তু কাহাকেও একলা পায় নাই। তাহার বুকের মধ্যে মত্ততা গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিয়াছে, চোখের দৃষ্টি ঘোলা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তবু সে আত্মসম্বরণ করিয়াছে; চাদরের আড়ালে মুঠোর ভিতর যে বস্তুটি দৃঢ়বদ্ধ আছে তাহা তপ্ত হইয়া যেন হাতের তেলো পুড়াইয়া দিতেছে। মহীকে জীবু ডাকিয়াছিল, সে যদি আসিত—

পথ একেবারে নির্জন হইয়া গিয়াছে, দোকান-পাট বন্ধ। নিজের বাড়ির কাছাকাছি

আসিয়া জীবন থমকিয়া দাঁড়াইল। চাঁদের আলোয় একটা মানুষ তাহার বাড়ির সম্মুখে ঘোরাঘুরি করিতেছে। একটা মানুষ—দ্বিতীয় কেহ নাই। জীবনুর চোখদুটা ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

জীবন পাগল। অন্য সময় সে সহজ মানুষ, কিন্তু পূর্ণিমা তিথিতে তাহার সুপ্ত পাগলামি সাপের মত মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, রক্তের মধ্যে হত্যার বীজাণু ছুটাছুটি করে! আজ পূর্ণিমা!

জীবন ছায়া আশ্রয় করিয়া অতি সন্তর্পণে লোকটার দিকে অগ্রসর হইল। কাছে আসিয়া চিনিতে পারিল—মহী! মহী তাহার বাড়ির উল্টা দিকের ফুটপাথে পায়চারি করিতেছে, তাহার দৃষ্টি ঊর্ধ্বে নিবদ্ধ। জীবন শ্বাপদের মত দন্ত বাহির করিয়া নিঃশব্দে আরও আগে বাড়িল। মহী এতরাত্রে এখানে কি করিতেছে এ প্রশ্ন তাহার মনে আসিল না। তাহার চিন্তা, শিকার না ফস্কায়!

তারপর চিতা বাঘের মত লাফ দিয়া জীবন মহীর ঘাড়ে পড়িল। তাহার হাতের ছুরিটা একবার জ্যোৎস্নায় চমকিয়া ভঠিল, তারপর মহীর গলায় প্রবেশ করিল। মহী বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া পড়িয়া গেল। তাহার কণ্ঠ হইতে উদ্‌গলিত রক্ত ফুটপাথের উপর ধারা রচনা করিয়া গড়াইতে লাগিল।

জীবন আর সেখানে দাঁড়াইল না। তাহার মাথার গরম নামিয়া গিয়াছে। সে তীরবেগে ছুটিয়া নিজের বাড়িতে ঢুকিয়া পড়িল।

মহীর মৃতদেহ ফুটপাথের উপর সারা রাত্রি পড়িয়া রহিল, কেহ দেখিল না। কেবল আকাশে ফাগুন পূর্ণিমার চাঁদ হাসিতে লাগিল।

২০ ফাল্গুন ১৩৫৪

স্বাধীনতার রস

পনেরোই আগস্ট ভোরবেলা একটা চায়ের দোকানে বসিয়া চা পান করিতেছিলাম। সারারাত্রি ছাপাখানার কাজ গিয়াছে; এই খানিকক্ষণ আগে খবরের কাগজ বাহির করিয়া দিয়া বাড়ি যাইতেছি; পথে এক পেয়ালা চা সেবন করিয়া লইতেছি।

রাত্রি বারোটায় যে মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছিল তাহা এখনও নিঃশেষ হয় নাই, আকাশে বাতাসে তাহার রেশ লাগিয়া আছে। সারারাত্রি দারুণ উত্তেজনা গিয়াছে, তাই ক্লান্ত মস্তিষ্ক লইয়া ভাবিতেছিলাম, আজ যদি বঙ্কিমচন্দ্র বাঁচিয়া থাকিতেন! দেশবন্ধু বাঁচিয়া থাকিতেন! রবীন্দ্রনাথ বাঁচিয়া থাকিতেন!

'বল হরি হরি বোল্' শব্দে চট্‌কা ভাঙিগয়া দেখি রাস্তা দিয়া মড়া লইয়া যাইতেছে।

আমার পাশের একটি টেবিলে দুইটি ছোকরা মুখোমুখি বসিয়া চা পান করিতেছিল; একজন দুঃখিতভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'ভদ্দরলোকের সইল না হে।'

বাহিরের দিকে তাকাইয়া সচকিত হইয়া উঠিলাম। আমাদের কেষ্ট গামছা কাঁধে মড়ার অনুগমন করিতেছে। কেষ্ট ছাপাখানায় আমার অধীনে কাজ করে। কাল রাত্রে দেড়টার সময় বাপের অসুখ বাড়ার খবর পাইয়া বাড়ি চলিয়া গিয়াছিল। তবে কি কেষ্টর বাবাই গেলেন নাকি?

তাড়াতাড়ি চায়ের দোকানের পাওনা চুকাইয়া রাস্তায় বাহির হইলাম। একটু পা চালাইয়া কেষ্টকে ধরিয়া ফেলিলাম, 'কি হে কেষ্ট—?'

কেষ্টর বাবাই বটে। দীর্ঘকাল পঙ্গু থাকিয়া কাল শেষ রাত্রে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

কেষ্ট ছেলেটা ভাল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে শ্মশান অভিমুখে চলিলাম। যাইতে যাইতে কেষ্টর মুখে তাহার বাবা নবগোপালবাবুর জীবন ও মৃত্যুর যে ইতিহাস শুনিলাম তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

আঠারো বৎসর পূর্বে নবগোপালবাবু এক বিলাতী সওদাগরী আপিসে বড়বাবু ছিলেন, সাংসারিক অবস্থা ভালই ছিল। তারপর তাঁহার রাহুর দশা পড়িল। একদিন আপিসের বড় সাহেবের সঙ্গে তাঁহার কথা কাটাকাটি হইল। সাহেব অত্যন্ত বদ-মেজাজী, উপরন্তু সেদিন দিনের বেলাই প্রচুর হুইস্কি টানিয়াছিল, সে নবগোপাল-বাবুকে লাথি মারিতে মারিতে বাহির করিয়া দিল।

নবগোপালবাবুর ব্লাড্প্রেসার ছিল। বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। পক্ষাঘাতের প্রথম আঘাত। নবগোপালবাবু মরিলেন না বটে কিন্তু তাঁহার বাম অঙ্গ অসাড় হইয়া গেল। কিছুদিন বিছানায় কাটিল। তারপর ক্রমে তিনি লাঠিতে ভর দিয়া ঘরের মধ্যে অল্পস্বল্প ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিলেন বটে কিন্তু তার বেশী নয়।

ছেলেরা তখন নাবালক, প্রথম কয়েক বছর খুবই দুর্দশা গেল। তারপর কেষ্ট ও তাহার বড় ভাই চাকরি পাইল। কায়ক্লেশে সংসার চলিতে লাগিল।

নবগোপালবাবু একটি ঘরে থাকিতেন। এই ধরনের রোগীরা যেরূপ হাঙ্গামা করে তিনি সেসব কিছুই করিতেন না। খাইতে দিলে খাইতেন, পঙ্গু শরীর লইয়া নিজের কাজ যতদূর সম্ভব নিজেই করিতেন। কেবল তাঁহার একটি অভ্যাস ছিল, পাশের বাড়ি হইতে ধার করা খবরের কাগজটি প্রত্যহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়িতেন। কোনও দিন কাগজ না পাইলে তাঁহার ক্ষোভের সীমা থাকিত না।

কথা তিনি বড় একটা কাহারও সহিত বলিতেন না; কিন্তু মাঝে মাঝে রক্তের চাপ বাড়িলে একটু বকাবকি করিতেন। তাহাও ব্যক্তিগত নালিশ নয়, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। তাঁহার রাজনৈতিক বুদ্ধি খুব পাকা ছিল না, তাই মাথায় রক্ত চড়িলে বলিতেন, 'ভালমানুষের কাজ নয়, অহিংসাতে চিঁড়ে ভিজবে না—মেরে তাড়াতে হবে—ওদের লাথি মেরে তাড়াতে হবে—'

ক্রমে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আসিয়া উপস্থিত হইল। নবগোপালবাবু কাগজ পড়িয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন—'এইবার শালারা প্যাঁচে পড়েছে—মারো মারো—লাথি মেরে দূর করে দাও—'

মহাযুদ্ধের ঘোলাটে বন্যা অনেক সাম্রাজ্যের ভিত ঢিলা করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। ইংরেজ ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত হইল; যে ঐশ্বর্য শিথিল হস্ত হইতে আপনি খসিয়া পড়িতেছে তাহাই দান করিয়া যশস্বী হইতে চাহিল।

নবগোপালবাবু কিন্তু ভয় পাইয়া গেলেন। ইংরেজ সত্যই স্বাধীনতা দিবে ইহা বিশ্বাস করা শক্ত। হয়তো ভিতরে কোনও শয়তানি আছে। স্বেচ্ছায় চলিয়া যাইতেছে ইহাও তাঁহার মনঃপূত নয়......

তারপর বহু বাধা-বিপত্তির ভিতর দিয়া চৌদ্দই আগস্ট আসিল। নবগোপালবাবু তন্নতন্ন করিয়া খবরের কাগজ পড়িলেন। না, স্বাধীনতাই বটে। কিন্তু—

রাত্রি বারোটার সময় চারিদিকে শাঁখ বাজিয়া উঠিল, মেয়েরা হুলুধ্বনি দিতে লাগিল। রাস্তায় রাস্তায় লোক গমগম করিতেছে, বিদ্যুতের আলোয় চারিদিক দিনের মত হইয়া গিয়াছে।

নবগোপালবাবু নিজের ঘরে জাগিয়া শুইয়া ছিলেন। হঠাৎ তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া লাঠি হাতে ঠক্ ঠক্ করিয়া রাস্তায় বাহির হইলেন।

রাস্তায় দলে দলে লোক চলিয়াছে, চীৎকার করিতেছে—জয় হিন্দ! বন্দে মাতরম্! গান গাহিতেছে—কদম কদম বাড়ায়ে যা—

নবগোপালবাবু লাঠিতে ভর দিয়া ফুটপাথে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার গাল বাহিয়া চোখের জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

বাড়ির ভিতর হইতে তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে ফিরিয়া আসিবার জন্য অনুনয় করিতে লাগিলেন, কিন্তু নবগোপালবাবু কর্ণপাত করিলেন না।

হঠাৎ তিনি দেখিলেন, নাবিকের বেশ পরিহিত একটা গোরা রাস্তা দিয়া আসিতেছে। নবগোপালবাবুর মাথায় রক্ত চড়িয়া গেল। নাবিকটা পাশ দিয়া যাইবার সময় তিনি তাহাকে একটি লাথি মারিলেন।

লাথিতে বিশেষ জোর ছিল না, নবগোপালবাবু নিজেই পড়িয়া গেলেন। গোরা নাবিক লাথি খাইতে অভ্যস্ত নয়, সে ঘুষি বাগাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু এই সময় রাস্তার কয়েকজন লোক দেখিতে পাইয়া হৈ হৈ করিয়া ছুটিয়া আসিল। নাবিক বেগতিক বুঝিয়া হাতের ঘুষি সম্বরণপূর্বক দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

নবগোপালবাবুকে ধরাধরি করিয়া বাড়ির ভিতর আনা হইল। কিন্তু তিনি তখন অজ্ঞান।

তাঁহার আর জ্ঞান হইল না; শেষ রাত্রির দিকে তিনি মারা গেলেন।......

চায়ের দোকানের ছোকরার আক্ষেপ মনে পড়িল,—'ভদ্দরলোকের সইল না হে!' নূতন স্বাধীনতার রস বড় উগ্র। নবগোপালবাবু সহ্য করিতে পারেন নাই। এখন আমাদের সহ্য হইলে হয়।

১ চৈত্র ১৩৫৪

যুধিষ্ঠিরের স্বর্গ

দশ বৎসর আগে আমি যখন কটকে বাস করিতাম তখন যুধিষ্ঠির দাস আমার ভৃত্য ছিল। কুড়ি বছরের নিকষকান্তি যুবক, পান ও গুন্ডির রসে মুখের অভ্যন্তর ঘোর রক্তবর্ণ; মাড়ির প্রান্তে ক্ষুদ্র দাঁতগুলি তন্ডুলকণার মত লাগিয়া আছে; মোটের উপর যুধিষ্ঠিরকে সুপুরুষ বলা চলে না। সে মাঝে মাঝে আমার জামার পকেট হইতে টাকা-পয়সা চুরি করিত; বোধ করি নবপরিণীতা বধূ রম্ভা দাসীর শখের জিনিস কিনিয়া দিবার জন্যই এই দুষ্কর্ম করিত। একদিন হাতে হাতে ধরা পড়িয়া গেল। প্রেমপীড়ির যুবকের অপরাধ কঠিন দণ্ডের যোগ্য নয়, বিশেষত যদি প্রেমের পাত্রীটি সুশ্রী সুচটুলা এবং চকিতনয়না হয়। মনে আছে যুধিষ্ঠিরকে সামান্য দু' এক ঘা দিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলাম।

তারপর দশ বৎসরে আমার জীবনে নানা ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে। বোম্বাই শহরে আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছি এবং সিনেমা সমুদ্রের তীরে চোরাবালির উপর অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া চলিয়াছি। সমুদ্রে নরভুক্ হাঙ্গর কুমীর আছে; তীরও নিরাপদ নয়, পদে পদে অতলে তলাইয়া যাইবার ভয়। সিনেমার মরীচিকা-মোহে যে হতভাগ্য মজিয়াছে তাহার চিত্তে সুখ নাই।

যাহোক, কোনও রকমে এখনও টিকিয়া আছি ইহাই ভাগ্য বলিতে হইবে। কাহাকেও এ পথে আসিতে উৎসাহ দিই না। অনেক অপক্ববুদ্ধি যুবক সিনেমা রাজ্যে প্রবেশ করিবার আশায় আমার কাছে দরবার করিতে আসে: তাহাদের দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিই। তাহারা বুঝিতে পারে না আমি তাহাদের কত বড় সুহৃৎ।

একদিন সায়ংকালে বাড়ির বারান্দায় একাকী বসিয়াছিলাম, একটি অপরিচিত লোক আসিয়া জোড়হস্তে প্রণাম করিল। অনুমান করিলাম, ইনিও একজন ভাবী চিত্রাভিনেতা, হিরোর ভূমিকা না হোক, অন্তত ভিলেনের ভূমিকা না লইয়া ছাড়িবে না।

ভ্রূকুটি করিয়া বলিলাম, 'কি দরকার বাপু?'

কর্ণচুম্বী হাস্যে অধরোষ্ঠ প্রসারিত করিয়া লোকটি বলিল, 'আজ্ঞে বাবু, আমি যুধিষ্ঠির দাস।'

ভাল করিয়া দেখিলাম, যুধিষ্ঠিরই বটে। তাহার গায়ে সাটিনের ঝকমকে কোট, গলায় পাকানো চাদর, পায়ে কিড্-লেদারের পালিশ-করা জুতা। বেশ একটু মোটা হইয়াছে। যুধিষ্ঠির আমার টাকা চুরি করিয়াছিল বটে কিন্তু অনেকদিন পরে তাহাকে দেখিয়া আনন্দ হইল। বলিলাম, 'আরে তাই তো—এ যে যুধিষ্ঠির! আয় আয়! এখানে কোত্থেকে এসে জুটলি?'

যুধিষ্ঠির এবার গড় করিয়া পদধূলি লইল। বলিল, 'আজ্ঞে বাবু, বোম্বাই আসা হল—তা এখানে আপনি আছেন তাই পেন্নাম করতে এলাম।'

বলিলাম, 'তা বেশ করেছিস। উঠেছিস কোথায়?'

সে একটি হোটেলের নাম করিল যাহার দৈনিক ভাড়া পঁচিশ টাকা! বুঝিলাম যুধিষ্ঠির বড়মানুষ মালিক পাইয়াছে, তাহারই সহিত বড় হোটেলে উঠিয়াছে।

তাহাকে আদর করিয়া বেঞ্চিতে বসিতে বলিলাম; সে একটু সঙ্কোচের সহিত বসিল। এদিক ওদিক দু'চার কথার পর প্রশ্ন করিলাম, 'তারপর তোর বৌ রম্ভা কেমন

আছে? ছেলেপুলে ক'টি?'

রম্ভার নামে যুধিষ্ঠিরের মুখ বিবর্ণ হইল, সে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'রম্ভা নেই, সে চলে গেছে বাবু।'

'চলে গেছে? কোথায় চলে গেল?'

'ছিনেমা করতে চলে গেছে। একটা ছিনেমা কোম্পানী এসেছিল, তাদেরই সঙ্গে পালিয়েছে।'

কিছুই বিচিত্র নয়। রম্ভার চেহারার চটক ছিল; হয়তো কোনও চিত্র প্রযোজকের নজরে পড়িয়া থাকিবে। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কতদিন হল পালিয়েছে?'

'সাত বছর হল। যুদ্ধের আগেই পালিয়েছে। প্রথমে মাদ্রাজে ছিল, অনেকগুলো তামিল ছবিতে হেরোইন সেজেছিল। খুব নাম করেছিল বাবু।—এখন শুনেছি বোম্বাই এসেছে।'

তামিল ছবির খবর রাখি না; কিন্তু বোম্বাই আসিয়া কোনও স্ত্রীলোক হিরোইন সাজিলে আমি খবর পাইতাম। প্রশ্ন করিলাম, 'বোম্বাই এসে হিরোইনের পার্ট করছে রম্ভা?'

যুধিষ্ঠির বলিল, 'আজকাল আর হেরোইনের পার্ট পায় না। বয়স গেছে, চেহারাও ভেঙেছে—আজকাল হেরোইনের মা'র পার্ট করে।'

হিরোইনদের অবশ্য ইহাই পরিণাম। তবে যাহারা বুদ্ধিমতী তাহারা সময় থাকিতে কিছু সঞ্চয় করিয়া লইয়া বিদায় গ্রহণ করে। সিনেমা যৌবনের ক্ষেত্র, বিগত যৌবনার স্থান এখানে অতি অল্প।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আবার বিয়ে করেছিস তো?'

যুধিষ্ঠির বিতৃষ্ণাসূচক মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, 'না বাবু, ন্যাড়া আর ক'বার বেলতলায় যায়? মেয়েলোকের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে।'

বুঝিলাম, সে বড় রকম দাগা পাইয়াছে। অন্য কথা পাড়িবার উদ্দেশ্যে বলিলাম, 'যাক্, তুই এখন কি কাজকর্ম করছিস বল্।'

যুধিষ্ঠির বলিল, 'কাজ আর এখন কিছু করি না। যুদ্ধের সময় খুব কাজ করেছিলাম বাবু। এখন ইচ্ছে হয়েছে ছিনেমার ছবি করব। তাই আপনার কাছে—' বলিয়া সলজ্জে ঘাড় বাঁকাইল।

হরি হরি! ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই সিনেমা। যুধিষ্ঠিরও সিনেমা করিতে চায়। হাসিও পাইল দুঃখও হইল। রম্ভা হিরোইন সাজিয়াছে তাই যুধিষ্ঠিরও হিরো সাজিয়া তাহার পাল্টা জবাব দিতে চায়। হায় মানুষের অভিমান!

গম্ভীর হইয়া বলিলাম, 'তা হয় না যুধিষ্ঠির। সিনেমার কাজ করতে গেলে চেহারাটা ওরই মধ্যে একটু ইয়ে হওয়া দরকার। তুই দুঃখ করিস নি—'

যুধিষ্ঠির বলিল, 'আজ্ঞে বাবু, আমি ছিনেমায় পার্ট করব না, টাকা দিয়ে ছবি তৈরি করাতে চাই।'

বলে কি যুধিষ্ঠির! সে অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর লোক বটে কিন্তু এত নির্বোধ তাহা ভাবি নাই। বিরক্ত হইয়া বলিলাম, 'টাকা দিয়ে ছবি তৈরি করাবি! তুই পাগল না ছন্ন? একটা ছবি করতে কত টাকা লাগে জানিস?'

'আজ্ঞে না বাবু!'

'একটা ছবি তৈরি করতে খুব কম করেও দেড় লাখ টাকা লাগে। পারবি দিতে?'

যুধিষ্ঠির ঘাড় চুল্কাইয়া বলিল, 'আজ্ঞে বাবু, তা পারব। যুদ্ধের সময় ঠিকেদারী করেছিলাম, মিলিটারিকে কুলি আর বাঁশ দিতাম—ভারি লাভের কাজ। তা কুড়িয়ে বাড়িয়ে দেড় লাখ টাকা দিতে পারব বাবু।'

অভিভূত হইয়া বসিয়া রহিলাম। আমার ভূতপূর্ব ভৃত্য যুধিষ্ঠির দেড় লাখ টাকার মালিক। আর আমি—! সে যাক্। কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। মিলিটারিকে বাঁশ দিয়া যুদ্ধের বাজারে অনেকেই লাল হইয়াছে, যুধিষ্ঠির হইবে না কেন? বিশেষত পরের পকেটে হস্ত প্রবিষ্ট করাইবার অভ্যাস তাহার পূর্ব হইতেই আছে। সে তো বড়মানুষ হইবেই। তাহার সাটিনের কোট ও কিড্-লেদার জুতার তাৎপর্য এতক্ষণ আমার কাছে একটু ঘোলাটে হইয়াছিল এখন তাহা ফটিক-জলের মত পরিষ্কার হইয়া গেল। দৈনিক পঁচিশ টাকা ভাড়ার হোটেলের রহস্যও সমাধান হইল। কিন্তু আশ্চর্য, দেড় লাখ টাকার মালিক হইয়াও তাহার মাথা গরম হয় নাই; নহিলে সে আমার বাড়িতে আসিয়া এমন কাঁচুমাচু ভাবে বেঞ্চিতে বসিয়া আছে কেন?

যুধিষ্ঠির বলিয়া চলিল, '—ছিনেমার কাউকে তো চিনি না—শুনেছি চোর বাটপাড় অনেক আছে, ভালমানুষের টাকা ঠকিয়ে নেয়। তাই আপনার কাছেই এলাম বাবু— আপনি আমায় একটা ছবি করে দেন।'

ভাবিলাম, যে দুর্লভ সম্ভাবনার গোলাপী স্বপ্ন দেখিয়া সিনেমা জগতের অর্ধেক মানুষ জীবন কাটাইয়া দেয়, তাহা যখন পায়ে হাঁটিয়া আমার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তখন তাহাকে অবহেলা করিব না। বরাত যদি খুলিয়াই থাকে, তাহাকে রোধ করিবে কে? যুধিষ্ঠির নিমিত্ত মাত্র।

বলিলাম, 'তোমার ছবি আমি করে দেব। কিন্তু তুমি যে অর্ধেক টাকা দিয়ে হাত গুটোবে তা হবে না।'

যুধিষ্ঠির বলিল, 'বাবু, আমি হাত গুটোব না। আপনি আমার দেড় লাখ টাকা নেন আর আপনার গপ্প থেকে আমায় একটা ছবি করে দেন। আর আমি কিছু চাই না।'

বলিলাম, 'বেশ। তুমি আমার নামে দেড় লাখ টাকা ব্যাঙ্কে জমা করে দেবে, সেই টাকায় ছ'মাসের মধ্যে আমি তোমাকে ছবি তৈরি করে দেব—এই শর্তে কণ্ট্রাক্ট হবে। ছবি আমার যেমন ইচ্ছে তেমনি করব, তুমি হাত দিতে পাবে না। কেমন— রাজী?'

যুধিষ্ঠির কৃতার্থ হইয়া বলিল, 'আজ্ঞে বাবু, আপনি যা বলবেন তাতেই রাজী। কেবল—ছবিতে আমার নামটাও একটু জুড়ে দেবেন, যাতে রুম্ভা—মানে সবাই জানতে পারে—'

'তোমার নাম নিশ্চয় থাকবে--বড় বড় অক্ষরে থাকবে। তাহলে কালই অ্যাটর্ণীর অফিসে গিয়ে দলিলপত্র তৈরি করে ফেলতে হবে। আর দেরি নয়।'

'আজ্ঞে যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল।' বলিয়া যুধিষ্ঠির আবার এক খাম্চা পায়ের ধূলা লইল।

হপ্তাখানেকের মধ্যে লেখাপড়া হইয়া গেল। যুধিষ্ঠির গুল মারে নাই, সত্যই দেড় লাখ টাকা আমার নামে ব্যাঙ্কে জমা করিয়া দিল। মহা উৎসাহে কাজে লাগিয়া গেলাম।

স্টুডিও ভাড়া লইয়া নট-নটী নির্বাচনের পালা আরম্ভ হইল। তাছাড়া আরও হাজার রকমের কাজ। আমি স্টুডিওর অফিসে বসিয়া সারাদিন কাজ করিতাম, আর যুধিষ্ঠির ঘরের এক কোণে চুপটি করিয়া বসিয়া থাকিত। কত রকম লোকের যাতায়াত, নট-নটী পরিদর্শন—যুধিষ্ঠির কোণে বসিয়া পরম আগ্রহভরে দেখিত, কিন্তু কখনও আপনা হইতে কথা কহিত না বা কোনও কাজে হস্তক্ষেপ করিত না। তাহার টাকায় এত ব্যাপার হইতেছে ইহা দেখিয়াই তাহার আনন্দ।

এইভাবে দিন পনেরো কাটিবার পর একদিন যুধিষ্ঠির অফিসে আসিল না।

সেদিন তাহার অনুপস্থিতি গ্রাহ্য করিলাম না, কিন্তু তাহার পর আরও দু'দিন আসিল না দেখিয়া ভাবনা হইল হয়তো অসুখে পড়িয়াছে। তাহার হোটেলের ঠিকানা জানা ছিল, অফিসের কাজকর্ম সারিয়া তাহাকে দেখিতে গেলাম।

অভিজাত শ্রেণীর হোটেল; তাহার পাঁচতলায় যুধিষ্ঠিরের স্যুট্। লিফ্টে চড়িয়া তাহার দ্বারে উপস্থিত হইলাম। এমন মানুষের মন, এত ব্যাপারের পরও যুধিষ্ঠিরের সহিত তাহার ঐশ্বর্যের সংগতি স্থাপন করিতে পারি নাই, সে যে এককালে আমার আজ্ঞাবহ ভৃত্য ছিল সেই কথাটাই মনের মধ্যে বড় হইয়া আছে। কিংবা হয়তো যুধিষ্ঠিরের তৃণাদপি সুনীচ অন্তরটি সত্য, তাহার ঐশ্বর্য অলীক, তাই উভয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিতে পারিতেছি না।

যুধিষ্ঠিরের ঘরের দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। টোকা দিতেই যুধিষ্ঠির দ্বার একটু ফাঁক করিয়া আমাকে দেখিয়াই সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। আমি বিস্মিত হইয়া ভাবিলাম—এ কি ব্যাপার!

ঘরের ভিতর হইতে ফিস্ ফিস্ কথার আওয়াজ আসিতেছে—

ঘরে নিশ্চয় দ্বিতীয় ব্যক্তি আছে। চলিয়া যাইব কিনা ভাবিতেছি এমন সময় দ্বার আবার খুলিয়া গেল। যুধিষ্ঠির অত্যন্ত সংকুচিতভাবে আমাকে অভ্যর্থনা করিল—

'আসুন বাবু, আমার ঘরে আপনার পায়ের ধুলো পড়্‌ল, এ আমার সাত পুরুষের ভাগ্যি।'

ঘরে প্রবেশ করিয়া বুঝিলাম, সেখানে খাওয়া-দাওয়া চলিতেছিল। চা কেক্ প্রভৃতি রহিয়াছে, কিন্তু যে-ব্যক্তিটি এই আমন্ত্রণের অতিথি তাহাকে দেখিলাম না। আমার আকস্মিক আবির্ভাবে সে বোধ করি বাথরুমে লুকাইয়াছে।

বেশীক্ষণ থাকিলাম না। যুধিষ্ঠিরের স্বাস্থ্য যে ভালই আছে তাহাতে সন্দেহ নাই; উপরন্তু সে যদি এমনি কোনও কাজে লিপ্ত থাকে যাহা সে আমার কাছে লুকাইতে চায়, তবে সে বিষয়ে আমার কৌতূহল থাকা উচিত নয়। তবু মনে খট্‌কা লাগিল। টাকা সর্বনেশে জিনিস; উপসর্গ জুটিতে বিলম্ব হয় না। যা হোক, ভরসার কথা, যুধিষ্ঠিরের অধিকাংশ টাকা এখন আমার হাতে, সে যে অসৎ-সঙ্গে পড়িয়া সব কিছু উড়াইয়া দিবে সে সম্ভাবনা নাই।

পরদিন হইতে যুধিষ্ঠির আবার স্টুডিওতে আসিতে লাগিল। কিন্তু লক্ষ্য করিলাম, সে যেন সর্বদাই অন্যমনস্ক হইয়া থাকে, স্টুডিওর কার্যকলাপে তাহার তেমন মন নাই।

ক্রমে মহরতের শুভ-মুহূর্ত আসিয়া পড়িল। নট-নটী যন্ত্র-যন্ত্রী সব ঠিক হইয়া গিয়াছে।

মহরতের আগের দিন সকালবেলা যুধিষ্ঠির আমার বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত। হাত কচ্‌লাইয়া বলিল, 'বাবু, একটা কথা বলব।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি কথা?'

আরও খানিকক্ষণ হাত কচ্‌লাইয়া যুধিষ্ঠির বলিল, 'রম্ভাকে ছবির হেরোইন করতে হবে।'

'রম্ভা! তাকে কোথায় পেলে?'

'আজ্ঞে—তার সঙ্গে দেখা হয়েছে। সে বড় কষ্টে আছে বাবু—কেউ তাকে ছবিতে নেয় না—'

বলিলাম, 'এখন আর হতে পারে না, আমি অন্য হিরোইন নিয়েছি।'

'না বাবু, তাকে নিতেই হবে।'

অত্যন্ত বিরক্ত হইলাম, 'তোমার মাথা খারাপ। নিজেই বল্‌চ, তাকে কেউ ছবিতে নেয় না, আমি নিলে আমার ছবির কি দশা হবে বুঝতে পারছ না? বুড়ো-হাব্‌ড়া দিয়ে হিরোইনের কাজ চলবে না। রম্ভা আবার তোমার ঘাড়ে চেপেছে দেখছি—সেদিন হোটেলে তাকেই চা কেক্‌ খাওয়াচ্ছিলে। তা খাওয়াও, আপত্তি নেই। কিন্তু তার জন্যে আমার ছবি নষ্ট করতে পারব না।'

তবু যুধিষ্ঠির ছাড়ে না, করুণ কণ্ঠে মিনতি করিতে লাগিল। আমি কিন্তু অটল রহিলাম। শেষে যুধিষ্ঠির হঠাৎ রাগিয়া উঠিল, বলিল, 'তবে আমার টাকা ফেরৎ দেন, আমি ছবি করব না।'

বলিলাম, 'আদালত থেকে টাকা আদায় কর গে যাও। তোমার এই দুর্মতি হবে জানতাম বলেই আগে থাকতে ব্যবস্থা করে রেখেছি।'

যুধিষ্ঠির তখন কাঁদিতে আরম্ভ করিল, হাউ হাউ করিয়া বালকের মত কাঁদিতে লাগিল। তাহার অশ্রুবিগলিত গদগদ কাতরোক্তিতে পাষাণও দ্রব হইয়া যায়। 'রম্ভা অবলা মেয়েমানুষ...নাচিতে গাহিতে জানে বলিয়াই না তার পতন হইয়াছিল! কিন্তু সেজন্য ভগবান তাহাকে যথেষ্ট শাস্তি দিয়াছেন—এখন পৃথিবীতে তাহার কেহ নাই, এখন যুধিষ্ঠির যদি তাহাকে সাহায্য না করে তো কে করিবে? বাবু, আপনি দয়া করুন—'

অবশেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া আমি বলিলাম, 'কেঁদো না, শোনো। তাকে যে নেবই এমন কথা দিতে পারি না। কিন্তু তুমি তাকে স্টুডিওতে নিয়ে এস, যদি দেখে আমার পছন্দ হয় পার্ট দিতে চেষ্টা করব।'

যুধিষ্ঠির এই আশ্বাসে সম্মত হইয়া চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল।

সেদিন স্টুডিওতে গিয়া রম্ভাকে দশ বৎসর পরে আবার দেখিলাম। আমার সম্মুখে আসিতে লজ্জায় ও কুণ্ঠায় সে যেন ভাঙিয়া পড়িল। যে-মেয়ে দীর্ঘকাল সিনেমায় অভিনেত্রীর কাজ করিয়াছে তাহার পক্ষে এতখানি লজ্জা প্রশংসার কথা বটে। কিন্তু শুধু লজ্জায় তো কাজ চলে না। রম্ভার সে রূপ-যৌবন সে চমক-ঠমক কিছুই নাই। সাত বৎসরের অবিরাম নিষ্পেষণ তাহার দেহটাকে নিঙ্‌ড়াইয়া ভাঙিয়া ছিঁড়িয়া একেবারে তচনচ করিয়া দিয়াছে। বয়স বোধ করি এখনও ত্রিশ পার হয় নাই কিন্তু চেহারা দেখিলে মনে হয়, দ্বিতীয় বয়ঃসন্ধির কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

যুধিষ্ঠির নিকটে দাঁড়াইয়া দীনভাবে হাত কচ্‌লাইতেছিল, তাহাকে বাহিরে যাইতে ইশারা করিলাম। তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা বৃথা। দেখি যদি রম্ভাকে বুঝাইতে পারি।

যুধিষ্ঠির ঘরের বাহিরে গেলে আমি রম্ভাকে বলিলাম, 'একবার যুধিষ্ঠিরের সর্বনাশ করে তোমার মন ওঠেনি, আবার তার সর্বনাশ করতে চাও?'

রম্ভা আমার পানে ভয়-চকিত একটা দৃষ্টি হানিয়া ঘাড় নীচু করিয়া ফেলিল। আমি নিষ্ঠুরভাবে বলিয়া চলিলাম, 'তুমি ছবির হিরোইন হলে ছবি একদিনও চলবে না, ওর দেড় লাখ টাকা ডুবে যাবে। ওকে আবার পথের ভিখিরি করতে চাও? ওর যখন টাকা ছিল না তখন ওকে ছেড়ে পালিয়েছিলে, আজ ওর টাকা হয়েছে তাই আবার ওকে ধরেছ? তোমার শরীরে কি লজ্জা নেই? কি রকম রক্তচোষা মেয়েমানুষ তুমি?'

রম্ভা ব্যাকুলভাবে মুখ তুলিল; দেখিলাম, তাহার দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইতেছে। সে ভাঙা ভাঙা গলায় বলিল, 'বাবু, আমি হিরোইন হতে চাইনি—ও-ই জোর ক'রে আমাকে...' বলিয়া মুখে আঁচল চাপিয়া কাঁদিতে লাগিল।

নরম হইয়া বলিলাম, 'বেশ। যুধিষ্ঠির বড় ভালমানুষ, তোমাকে ক্ষমা করেছে।

তোমার গায়ে যদি মানুষের চামড়া থাকে তাহলে তোমারও উচিত ওর স্বার্থের দিকে নজর রাখা। যাও, যুধিষ্ঠিরকে বুঝিয়ে বলবে। আর যেন এসব হাঙ্গামা না হয়।'

প্রায় বুজিয়া যাওয়া গলায় রম্ভা বলিল, 'আচ্ছা বাবু।'

রম্ভা চলিয়া গেল। মনুষ্য হৃদয়ের বিচিত্র কুটিল গতি অনুধাবন করিয়া বিস্ময় অনুভব করিবার অবসর ছিল না, আশু একটা বড় রকম ফাঁড়া কাটিয়াছে বুঝিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলাম।

মহরতের দিন যুধিষ্ঠির আসিল না।

শুটিং আরম্ভ হইল। সাতদিন কাটিয়া গেল তবু যুধিষ্ঠিরের দেখা যাই। অভিমান করিয়া আছে ভাবিয়া তাহার হোটেলে আবার দেখা করিতে গেলাম।

যুধিষ্ঠির নাই। ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিতে পারিলাম, শেষের দিকে একটি স্ত্রীলোক আসিয়া যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে বাস করিতেছিল, তারপর তাহারা এক-সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে।

অতঃপর দীর্ঘকাল যুধিষ্ঠিরের দেখা নাই। ভাবিয়াছিলাম টাকার গরজে শেষ পর্যন্ত নিজেই আসিবে, কিন্তু সে আসে নাই। ছবি তৈয়ার হইয়াছে, ছবিতে যুধিষ্ঠিরের নাম ছাপা হইয়াছে। বেশ ভাল দামে ছবি বিক্রয় করিয়াছি। ভারতবর্ষের সর্বত্র ছবি দেখানো হইতেছে। আমি টাকা ও খ্যাতির দিক দিয়া বিশেষ লাভবান হইয়াছি। যুধিষ্ঠিরের ভাগেও আসলের উপর পঞ্চাশ হাজার টাকা লাভ হইয়াছে। কিন্তু লাভের টাকা লইতে সে আসিল না। হতভাগ্য মূর্খ ঐ পতিতা স্ত্রীকে লইয়া কোথায় চলিয়া গেল। •

চলচ্চিত্র নির্মাণ সহজ কাজ নয়, শরীরে বেশ ধকল লাগে। তাই দ্বিতীয় ছবি আরম্ভ করিবার আগে ভাবিলাম, কিছুদিনের জন্য কোনও নির্জন স্থানে গিয়া বিশ্রাম করিয়া আসি। একজন ধনী বন্ধু সমুদ্র তীরে তাঁহার একটি প্রমোদভবনে আমাকে থাকিবার অনুমতি দিলেন।

বোম্বাই হইতে চারিশত মাইল দক্ষিণে সাগরকূলে একটি নগর, তাহারই উপকণ্ঠে বন্ধুর নিভৃত নির্জন প্রমোদভবন। বছরের অধিকাংশ সময়েই বন্ধ থাকে, মাঝে মাঝে গৃহস্বামী আসিয়া আমোদ প্রমোদ করিয়া যান।

বাড়িতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, বাড়ির রক্ষক-ভৃত্যরূপে বিরাজ করিতেছে —যুধিষ্ঠির।

বলিলাম, 'তুই এখানে!'

যুধিষ্ঠির আমাকে দেখিয়া প্রথমটা বোধ হয় সুখী হয় নাই, কিন্তু ক্রমশ সামলাইয়া লইল। তাহার পলায়নের কৈফিয়ৎ সে যাহা দিল তাহা এইরূপঃ শহর বাজারের গণ্ডগোল আর তাহার ভাল লাগে না। রম্ভাও চেনা লোকের মধ্যে থাকিতে লজ্জা পায়। তাই তাহারা জনারণ্যের বাহিরে এই একান্তে আশ্রয় লইয়াছে। এখানে সে ত্রিশ টাকা মাহিনা পায়, তাহার উপর খোরাক পোশাক। বড় সুখে আছে তাহারা। তাহাদের কোনও আক্ষেপ নাই।

আমি বলিলাম, 'কিন্তু তোর অত টাকা—'

যুধিষ্ঠির হাত-জোড় করিয়া বলিল, 'বাবু, ও টাকা আর আমাকে নিতে বলবেন না। আমরা বেশ আছি।'

কি জানি, হয়তো তাহার ভয় হইয়াছে টাকা এবং রম্ভা একসঙ্গে তাহার ভাগ্যে সহ্য হইবে না। আমি পীড়াপীড়ি করিলাম না; ভাবিলাম যদি কোনও দিন তাহার

মতিগতির পরিবর্তন হয় তখন তাহার টাকা ফেরৎ দিব, ততদিন আমার কাছে গচ্ছিত থাক।

ভারি আনন্দে এক মাস কাটিয়া গেল। যুধিষ্ঠির ভৃত্যের মতই আমার সেবা করিল। রম্ভা বোধ হয় লজ্জায় আমার সম্মুখে আসিত না; একবার চকিতের জন্য তাহাকে দেখিয়াছিলাম। রম্ভার চেহারার অনেক উন্নতি হইয়াছে। যৌবন আর ফিরিয়া আসে না, কিন্তু মনে হইল রম্ভা তাহার হারানো নারীত্ব ফিরিয়া পাইয়াছে।

চলিয়া আসিবার সময় যুধিষ্ঠির মিনতি করিয়া বলিল, 'বাবু, আমরা যে এখানে আছি তা কাউকে বলবেন না।'

টিকিট কিনিবার জন্য দশটাকার দশখানা নোট বাহির করিয়া পকেটে রাখিয়াছিলাম। স্টেশনে আসিয়া টিকিট কিনিতে গিয়া দেখি, একটি নোট কম—নয়খানা আছে!

হঠাৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। যুধিষ্ঠিরের পুরানো অভ্যাস এখনও যায় নাই।

২৩ শ্রাবণ ১৩৫৫

জোড় বিজোড়

খেলিতে বসিয়া যদি খেলার প্রতিপক্ষ না পাওয়া যায়, কিম্বা খেলিতে খেলিতে প্রতিপক্ষ যদি বলে আর খেলিব না, অথবা খেলার সময় এক পক্ষের যদি খেলায় মন না বসে—তাহা হইলে খেলা আর খেলা থাকে না, শুধু দিন যাপনের, শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি হইয়া দাঁড়ায়। তা সে তাস-পাশাই হোক, আর জীবনের গভীরতম খেলাই হোক।

কিন্তু খেলার নেশা যাহার কাটে নাই তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা যায় না, যেমন করিয়া হোক সে খেলিবেই। কানাকড়ি নিয়াও খেলিবে। পৃথিবীতে এই অবুঝ খেলোয়াড়দের লইয়াই বিপদ।

ছয় বৎসর পূর্বে নির্মলের সহিত যখন নির্মলার বিবাহ হইয়াছিল, তখন সকলে আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়াছিল। শুধু যে নামের সহিত নাম মিলিয়াছিল তাহা নয়, সব দিক দিয়াই রাজযোটক ঘটিয়াছিল। নির্মল জমিদারের ছেলে হইয়াও নির্মল চরিত্র এবং নির্মলা যেন হিমালয় শৃঙ্গের নিষ্কলঙ্ক তুষার দিয়া গড়া একটি প্রতিমা।

দুইটি তরুণ তরুণী পরস্পর আকৃষ্ট হইয়াছিল যেমন চুম্বক আর লোহা আকৃষ্ট হয়। দার্শনিক উপমা দেয়া যায়—চণকবৎ। চণকের একটি দানায় যেমন দুইটি দল থাকে সেইরূপ, দ্বিদল হইলেও এমন দৃঢ়সংবদ্ধ যে এক বলিয়া মনে হয়।

যৌবনের বিচিত্র রসে উচ্ছলিত দিনগুলি কাটিতে থাকে, হাসি অশ্রু আনন্দ বিষাদ সমস্তই পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া। জগতে যেন তৃতীয় প্রাণী নাই; বিশ্ব সংসার সংকুচিত হইয়া একটি গৃহের একটি কক্ষে আবদ্ধ হইয়াছে।

একটি গৃহের একটি কক্ষ! বাসক রজনীর স্বপ্ন-সুরভিত পালংক শয্যা। হৃদয়ের পূজা-মন্দির, বিদেহ দেবতার দেউল। এখানে দুইটি তদ্গত পূজার্থী ছাড়া আর কাহারও প্রবেশাধিকার নাই।

একটি একটি করিয়া বছর কাটে। বহির্জগতে পরিবর্তন হয়, যেন রঙ্গমঞ্চের নাট্যাভিনয়। নির্মলের বাবা মারা যান, নির্মল জমিদার হইয়া বসে। বৈঠকখানায় শিকার-লোলুপ বন্ধুর দল ফাঁদ পাতিয়া নির্মলকে ধরিবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাদের চেষ্টা সফল হয় না। অন্দর মহলে মাসি-পিসির দল হা-হুতাশ করে—নির্মলের সন্তান হইল না। কিন্তু নির্মল সন্তান চায় না; তাহার নিভৃত মিলনমন্দিরে ভাগীদার জুটিবে ইহা তাহার অসহ্য। সে যাহা পাইয়াছে তাহাতেই তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া আছে।

মাঝে মাঝে নির্মল হঠাৎ শিকার করিতে চলিয়া যাইত; তিন-চার দিন বনে জঙ্গলে বন্দুক ঘাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইত, তারপর গৃহে ফিরিয়া আসিত। তখন মনে হইত জীবনের রস আরও গাঢ় হইয়াছে। রসনার স্বাদ তীক্ষ্ণতর হইয়াছে। স্বেচ্ছাকৃত বিরহের পর মিলন মধুরতর হইয়া উঠিত।

এমনিভাবে ছয়টি বছর কোথা দিয়া কাটিয়া গেল। নির্মলের বয়স এখন ত্রিশ, নির্মলার তেইশ, যৌবনের মধ্যাহ্ন। কিন্তু মধ্যাহ্নেও কখনও কখনও সূর্য গ্রহণ হয়। তখন পৃথিবী অন্ধকার হইয়া যায়; কিছুক্ষণের জন্য মনে হয় এই অকাল-রাত্রি বুঝি আর প্রভাত হইবে না।

নির্মল সহসা একদিন অনুভব করিল তাহার ক্রীড়ামন্দিরে সে একা, তাহার খেলার সাথী কখন চলিয়া গিয়াছে। বাহিরের বিপুল সংসার তাহার লীলা-সঙ্গিনীকে গ্রাস করিয়া লইয়াছে।

এই ব্যাপার একদিনে ঘটে নাই। কিন্তু খেলায় মত্ত ছিল বলিয়া নির্মল তাহা দেখিতে পায় নাই, হঠাৎ নেশার ঘোরেই তাহার চোখ খুলিয়া গেল। নির্মলা আর তাহার অন্তরের অন্তরতমা নয়, সে সংসারের গৃহিণী হইয়া বসিয়াছে।

প্রেয়সী নারী যখন অন্তরের পালংক শয্যা ছাড়িয়া সংসারের সিংহাসনে আরোহণ করে তখন সে কী হারাইল এবং কতখানি লাভ করিল তাহার হিসাব কেহ রাখে নাই। নির্মলাও হিসাব করিয়া কিছু করে নাই; জোয়ারের জল যেমন অলক্ষিতে তীরস্থ শিলাখণ্ডকে নিমজ্জিত করে তেমনিভাবে নিজের অজানিতেই নির্মলা সংসারের অলক্ষ্য-গ্রসমান জলতলে ডুবিয়াছিল। প্রকৃতির বশে মানুষ যাহা করে তাহার উপর নিগ্রহ চলে না।

সংসার নারীকে স্বভাবতই আকর্ষণ করে। সংসারের অশেষ বৈচিত্র্য অনিবার্য কর্মপ্রবাহের আঘাতে আঘাতে ভাঙা-গড়ার খেলা, শাসন পালন ও নিয়ন্ত্রণের সুযোগ—এই সব মিলিয়া সংসারকে বুদ্ধিমতী ও কর্মিষ্ঠা নারীর কাছে পরম লোভন করিয়া তোলে। বিশেষত যে-সংসার কর্ণধারের অভাবে স্রোতের মুখে যথেচ্ছা ভাসিয়া চলিয়াছে তাহার হাল নিজের হাতে ধরিবার লোভ কোনও নারীই সম্বরণ করিতে পারে না। কিন্তু নির্মলের মন মানে না। পুষ্পে কীট সম তাহার মর্মে তৃষ্ণা জাগিয়া থাকে, লাঞ্ছিত ভ্রমরের ন্যায় তাহার আকাঙ্ক্ষা বাঞ্ছিতকে ঘিরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। কেন এমন হইবে? না, সে তাহার প্রেয়সীকে সংসারের স্রোতে ভাসিয়া যাইতে দিবে না; নিজের দৃঢ় বাহুবন্ধনের মধ্যে ধরিয়া রাখিবে।

কিন্তু কি দিয়া কাহাকে ধরিয়া রাখিবে? জাল দিয়া মাছ ধরা যায়, জলকে ধরিয়া রাখা যায় না। নির্মলা ও নির্মলের সম্বল ছিল মনের সম্বন্ধ, তাহাতে স্থূলতা ছিল না। দাম্পত্য জীবনের স্বাভাবিক মান অভিমান রতি বিরতি সবই ছিল, কিন্তু তাহার প্রকাশ ছিল অতি সূক্ষ্ম। ভ্রূকুটি রচনা দ্বারা কোপ প্রকাশ পাইত, নিগ্রহের অভিব্যক্তি হইত মৌন দ্বারা, স্মিতহাস্যে অনুনয় এবং দৃষ্টিতে প্রসন্নতা ব্যক্ত হইত; মনের গভীর কথা ভাষার অপেক্ষা রাখিত না। তাই নির্মলার মনকে যখন ধরিয়া রাখিবার প্রয়োজন হইল তখন নির্মল দেখিল নির্মলার মন ধরা-বাঁধার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে; যে অন্তর্লোকবাসিনী নীরব ইঙ্গিতের অর্থ বুঝিত সে এখন ভাষার ভাষ্য ছাড়া কিছুই বোঝে না। স্থূল সংসার নির্মলার অনুভূতিকে স্থূল করিয়া দিয়াছে।

নির্মল বাক্যের দ্বারা অভিযোগ প্রকাশ করিতে অভ্যস্ত নয়, কুণ্ঠা তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরে। কেবল মর্মমূলে অনির্বাণ মুর্মুর-দহন জ্বলিতে থাকে।

একদিন হঠাৎ নির্মলাকে কিছু না বলিয়া নির্মল শিকারে বাহির হইয়া গেল। অন্তঃপুরে নির্মলা দাসীর মুখে সংবাদ পাইয়া একটু বিমনা হইল, পূর্বে এমন কখনও ঘটে নাই। তারপর সে গৃহকর্মে মন দিল। মাস-কাবারী বাজার আসিয়াছে। অবহেলা করা চলে না।

নির্মল জঙ্গলের মধ্যে তাঁবু ফেলিয়াছে; মাঝে মাঝে শিকারের সন্ধানে বাহির হয়। কিন্তু শিকারে তাহার মন নাই; আবার বাড়ি ফিরিবার নামেও মন বিমুখ হইয়া ওঠে।

সাত দিন এইভাবে কাটিবার পর হঠাৎ নির্মলের মন দড়ি-ছেঁড়া হইয়া উঠিল। গৃহ আবার তাহাকে টানিতেছে। সে তাঁবু তুলিয়া ফিরিয়া চলিল।

বাড়ি ফিরিয়া নির্মল আপন প্রসাধনকক্ষে বেশবাস পরিবর্তন করিতেছিল, নির্মলা হাসি হাসি মুখে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল—'একটা মজার জিনিস করেছি। দেখবে এস।'

নির্মল হর্ষোৎফুল্ল চক্ষে নির্মলার পানে চাহিল। এই সাত দিনের ব্যবধান কি আবার তাহাদের মিলাইয়া দিল! অন্তরের ধন কি অন্তরে ফিরিয়া আসিল?

নির্মল পত্নীর পিছু পিছু শয়নকক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল......

দেখিল ঘর হইতে তাহাদের প্রকাণ্ড পালঙ্ক অন্তর্হিত হইয়াছে, তৎপরিবর্তে ঘরের দুই পাশে দুইটি অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট খাট বিরাজ করিতেছে।

নির্মলা উজ্জ্বল চোখে চাহিয়া বলিল—'কলকাতা থেকে জোড়া খাট কিনে আনিয়েছি, বিলিতী দোকান থেকে। কি সুন্দর স্প্রিংয়ের গদি দ্যাখো। আমি কাছে শুলে যদি তোমার ঘুম নষ্ট হয়—এখন থেকে আলাদা শোব। কেমন, ভাল হয়নি?'

নির্মল বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

শুধু ঘর হইতে নয়, এক ঘণ্টার মধ্যে নির্মল বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া গেল। নির্মলা শঙ্কিত হইয়া ভাবিল—কি হল! এতে রাগের কি আছে!

জানা গেল নির্মল কলিকাতায় গিয়াছে। কয়েকদিন কিছু ঘটিল না। নির্মলা অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া সংসারের কাজকর্মে মন দিল; ভাবিল—রাগ পড়িলেই বাড়ি ফিরিবে।

পনেরো দিন পরে নির্মল ফিরিল। সঙ্গে লাল চোলি পরা একটি মেয়ে। মেয়েটি নির্মলার মত সুন্দরী নয় কিন্তু বয়েস সতেরো আঠারো, সিঁথিতে সিন্দূর।

নির্মলা পাকশালে রান্নাবান্নার তদারক করিতেছিল, নির্মল একেবারে সেইখানে

উপস্থিত হইল। নব-বধূকে সম্বোধন করিয়া বলিল—'শোভা, ইনি তোমার দিদি, এ'কে প্রণাম কর।'

২১ অগ্রহায়ণ ১৩৫৮

বড় ঘরের কথা

নিম্নোক্ত কাহিনীটি আমি শুনিতে পাইতাম কি না সন্দেহ, যদি না সে-রাত্রে গ্রামের জমিদারবাবুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ থাকিত। আমি গ্রামে নবাগত, কিন্তু জমিদার মহাশয় তাঁহার কন্যার বিবাহে গ্রামসুদ্ধ লোককে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, আমিও বাদ পড়ি নাই।

যিনি গল্প বলিলেন তাঁহার নাম ভুবন বিশ্বাস। রোগা চিম্‌সে চেহারার বৃদ্ধ, নস্য লইয়া সজল চকিত চক্ষে এদিক ওদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং অসংলগ্ন দুই-চারিটি কথা বলিয়া চুপ করিয়া যান। পূর্বে তিনি পাশের কোনও এক জমিদারীর সরকার কিম্বা গোমস্তা ছিলেন। কয়েক বছর হইল অবসর লইয়াছেন। আমি গ্রামের বারোয়ারী গ্রন্থাগারের সমাবর্তন উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছি, দু'একদিন থাকিয়া চলিয়া যাইব। অন্যান্য গ্রামবাসীর মত ভুবনবাবুর সহিতও সামান্য পরিচয় হইয়াছিল।

জমিদার বাড়ির বিস্তীর্ণ বারান্দায় নিমন্ত্রিতদের জন্য শতরঞ্চি পাতা হইয়াছিল। অতিথিদের মধ্যে একদল অন্দরের উঠানে খাইতে বসিয়াছেন। আমরা দ্বিতীয় ব্যাচ বাহিরে প্রতীক্ষা করিতেছি। চারিদিকে গ্যাস বাতি ও ডে-লাইট জ্বলিতেছে; লোকজনের ছুটাছুটি হাঁকডাক। মাঝে মাঝে সানাই তান ধরিতেছে। রাত্রি আন্দাজ ন'টা।

আমি এবং ভুবনবাবু বারান্দার এক কোণে বসিয়াছিলাম। এদিকটা একটু নিরি-বিলি। ভুবনবাবু দুই একটা অসংলগ্ন কথা বলিতেছিলেন। এই সময় ফটকের সামনে একটি জুড়ি গাড়ি আসিয়া থামিল। ভুবনবাবু একবার গলা বাড়াইয়া দেখিয়া চট করিয়া পিছনে ফিরিয়া বসিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'কারা এল?'

ভুবনবাবু ঘাড় ফিরাইলেন না, ঠোঁটের কোণ হইতে তেরছাভাবে বলিলেন—'রামপুরের জমিদার আর তার মা।'

গৃহস্বামী ছুটিয়া আসিয়া নবাগতদের অভ্যর্থনা করিলেন। জুড়ি হইতে নামিলেন একটি বিধবা মহিলা এবং সিল্কের পাঞ্জাবি পরা এক যুবক। মহিলাটির বয়স অনুমান প'য়তাল্লিশ, এককালে রূপসী ছিলেন, রাশভারী চেহারা, মুখে আভিজাত্যের দৃঢ়তা পরিস্ফুট। পুত্রটি কিন্তু অন্য প্রকার। চেহারা এমন কিছু কুদর্শন নয় কিন্তু মুখে

আভিজাত্যের ছাপ নাই। সাজ-পোশাকের মহার্ঘতা এবং মুখের উন্নাসিক ঔদ্ধত্য দিয়া সহজাত কৌলীন্যের অভাব পূরণ করিবার চেষ্টা আছে, কিন্তু সে-চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই।

গৃহস্বামী মাননীয় অতিথিদের লইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। ভুবনবাবু এবার ফিরিয়া বসিলেন, দীর্ঘ এক টিপ্ নস্য লইয়া সজলচক্ষে এদিক ওদিক চাহিলেন, তারপর চাপা তিক্ত স্বরে বলিলেন—'বড় ঘরের বড় কথা।'

এখানেই গল্পের সূত্রপাত। তারপর কয়েক কিস্তিতে ভাঙা ভাঙা ভাবে গল্পটি শুনিয়াছিলাম। ভুবনবাবু কয়েক বছর আগে পর্যন্ত রামপুর জমিদার বাড়িতে সরকার ছিলেন; কি কারণে তাঁহার চাকরি যায় তাহা জানিতে পারি নাই। তবে তিনি ভূতপূর্ব প্রভুগোষ্ঠীর উপর প্রসন্ন ছিলেন না তাহা তাঁহার গল্প বলিবার ভঙ্গী হইতে অনুমান করিয়াছিলাম। কাহিনীর সব ঘটনা ভুবনবাবুর প্রত্যক্ষদৃষ্ট নয়, ময়না নাম্নী এক দাসীর কাছে তিনি অনেকখানি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তার উপর আমি খানিকটা রঙ চড়াইয়াছি। সুতরাং কাহিনীটি ষোল আনা নির্ভরযোগ্য মনে করিলে অন্যায় হইবে। রবীন্দ্রনাথের মানবীর মত ইহার অর্ধেক কল্পনা।

বর্তমান কালে বাংলাদেশের জমিদার শ্রেণীর যে দুরবস্থা হইয়াছে, ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেও ততটা হয় নাই। মারাত্মক রকম বদ্খেয়ালী না হইলে বেশ সম্ভ্রান্তভাবে চলিয়া যাইত, দোল দুর্গোৎসব বারো মাসে তেরো পার্বণ করিয়াও স্বচ্ছলতার অভাব ঘটিত না। রামপুরের জমিদার আদিত্যবাবু ছিলেন শুদ্ধ-সংযত চরিত্রের মানুষ, তাই জমিদারীটি মধ্যমাকৃতি হইলেও তিনি প্রজাদের উপর অযথা উৎপীড়ন না করিয়াও মর্যাদার সহিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিয়াছিলেন। ছত্রিশ বছর বয়সে তিনি বিপত্নীক হন এবং একমাত্র কন্যা প্রভাবতীর মুখ চাহিয়া পুন্নাম নরক হইতে ত্রাণ লাভের অজুহাতেও দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন নাই।

মাতার মৃত্যুকালে প্রভাবতীর বয়স ছিল নয় বছর। এ বয়সের মেয়েরা সাধারণত বেড়া-বিনুনি বাঁধিয়া খেলাঘরে পুতুল খেলায় মত্ত থাকে; কিন্তু প্রভাবতীর চরিত্র এই বয়সেই ছেলেমানুষী বর্জন করিয়া দৃঢ়ভাবে গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাকে লালন করিবার প্রয়োজন হয় নাই, সেই বরঞ্চ পরিবারস্থ সকলকে শাসন তাড়ন করিয়া বশীভূত করিয়াছিল। জমিদার পরিবারের অনিবার্য বিধবা পিসি-মাসিরা তাহাকে ভয় করিয়া চলিতেন, ঝি-চাকর নির্বিচারে তাহার আদেশ পালন করিত।

আদিত্যবাবু সগর্ব স্নেহে ভাবিতেন, আমার মেয়ে সাতটা ছেলের সমান। প্রভাবতীর ছেলেরাই হবে আমার বংশধর।

প্রভাবতীর বয়স যখন বারো বছর তখন আদিত্যবাবু তাহাকে জমিদারী সংক্রান্ত পরামর্শের আসরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। দেখা গেল এদিকেও তাহার বুদ্ধির প্রাঞ্জলতা কাহারও অপেক্ষা কম নয়; নায়েব মোক্তার এই একফোঁটা মেয়ের বুদ্ধি দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। আদিত্যবাবুর মুখ স্নেহগর্বে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নায়েব মোহিনীবাবু গদ্গদ স্বরে বলিলেন—'মা আমাদের রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী।'

তারপর হইতে যখনই বিষয় সংক্রান্ত সলাপরামর্শের প্রয়োজন হইত আদিত্যবাবু নায়েবকে বলিতেন—'আমাকে আর কেন? প্রভাকে জিগ্যেস কর গিয়ে।'

নায়েব অন্দরমহলে প্রবেশ করিতেন, ডাক দিয়া বলিতেন—'কোথায় গো মা লক্ষ্মী, তোমার সঙ্গে পরামর্শ আছে যে।'

ঠাকুর ঘর হইতে হাসিমুখ বাড়াইয়া প্রভাবতী বলিত—'কাকা! একটু বসতে হবে। ঠাকুরের প্রসাদ না পেয়ে যেতে পাবেন না।—ওরে ময়না, কাকার জন্যে আসন

পেতে দে।'

ময়না প্রভাবতীর খাস চাকরানী, বয়স দু'জনের প্রায় সমান। ময়না কার্পেটের আসন পাতিয়া দিত, নায়েব উপবেশন করিতেন। তারপর যথাসময় পূজা শেষ হইলে ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করিয়া নবীনা প্রভুকন্যার সহিত মন্ত্রণা করিতে বসিতেন।

এইভাবে জমিদার পরিবারের বাহ্য এবং আভ্যন্তরিক ক্রিয়া ঘড়ির কাঁটার মত চলিতে থাকিত।

প্রভাবতীর ষোল বছর বয়সে আদিত্যবাবু তাহার বিবাহ দিলেন। আগেই বিবাহ দিতেন, কিন্তু উপযুক্ত পাত্র খুঁজিয়া বাহির করিতে বিলম্ব হইল। পাত্রের নাম নবগোপাল; গোলগাল সুশ্রী চেহারা। গরীবের ছেলে, তিন কুলে কেহ নাই, লেখা-পড়ায় ভাল, বৃত্তি পাইয়া বি.এ. পাস করিয়াছে। আদিত্যবাবু ঘরজামাই করিবেন; সুতরাং নবগোপাল সব দিক দিয়া সুপাত্র।

মহা ধুমধামের সহিত বিবাহ হইল। নহবৎ বাজিল, ব্যান্ড বাজিল; সাতদিন ধরিয়া যাত্রা পাঁচালি কীর্তন চলিল, দীয়তাং ভুজ্যতাং হইল। না হইবেই বা কেন? জমিদারের একমাত্র কন্যা। সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। আদিত্যবাবু কোনও সাধই অপূর্ণ রাখিলেন না।

জামাই নবগোপাল শ্বশুরবাড়িতে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইল। নবগোপালের চেহারাটি যেমন মোলায়েম, স্বভাবও তেমনি মৃদু স্নিগ্ধ, মুখের কথা মুখে মিলাইয়া যায়। আদিত্যবাবু বাড়ির দ্বিতলের একটা মহল মেয়ে-জামাইয়ের জন্য আলাদা করিয়া দিলেন। নিভৃত নিরঙ্কুশ পরিবেশের মধ্যে প্রভাবতী ও নবগোপালের দাম্পত্য জীবন আরম্ভ হইল।

দাম্পত্য জীবনের প্রভাত। শীত রাত্রির অবসানে নবারুণপ্রফুল্ল শিশির-বিচ্ছুরিত প্রভাত। কিন্তু কখনও দেখা যায় শীতের রৌদ্র-ঝলমল প্রভাতে সূক্ষ্ম কুহেলিকা আসিয়া আকাশ ঝাপসা করিয়া দিয়াছে, সূর্যের প্রসন্নতা অশ্রুবাষ্পের অন্তরালে বিষণ্ন হইয়া পড়িয়াছে। বিবাহের এর একমাস কাটিয়া গেল; ধীরে ধীরে আদিত্যবাবু এবং পরিবারস্থ সকলেই যেন অনুভব করিলেন, যেমনটি হওয়া উচিত ছিল তেমনটি হয় নাই। কোথায় যেন খুঁত রহিয়া গিয়াছে।

কিন্তু কী খুঁত, কোথায় খুঁত? আদিত্যবাবু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, অথচ কাহাকেও প্রশ্ন করিতে পারিলেন না। গৃহিণী বাঁচিয়া থাকিলে প্রশ্ন করিবার প্রয়োজন হইত না, কিন্তু মাতৃহীনা কন্যার মনের কথা জানা যায় কি করিয়া? প্রভাবতীর মুখ দেখিয়া কিছু অনুমান করা যায় না। সে আগের মতই সাংসারিক ও বৈষয়িক কাজকর্ম পরিদর্শন করে; পূজার ঘরের সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন নিজের হাতে করে, বৃহৎ পরিবারের কোথায় কি ঘটিতেছে কিছুই তাহার চক্ষু এড়ায় না। তবু, আদিত্যবাবু যাহা দেখিতে পান না, পরিবারের অন্য কাহারও কাহারও চোখে তাহা চকিতের জন্য ধরা পড়িয়া যায়। প্রভাবতীর মনের চারিধারে যেন সূক্ষ্ম কুয়াশার জাল পড়িয়া গিয়াছে, যাহা পূর্বে অতিশয় স্পষ্ট ও নিঃসংশয় ছিল তাহা আবছায়া হইয়া গিয়াছে; সূর্যের চোখে চালশে পড়িয়াছে।

ওদিকে জামাই নবগোপালের জীবনের বাহ্য অংশ বেশ বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সে সকালবেলা দারোয়ানের সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হয়, ফিরিয়া আসিয়া দপ্তরে শ্বশুরের কাছে বসে; বেলা হইলে নিজের মহলে অন্তর্হিত হইয়া যায়। বৈকালে আবার বেড়াইতে বাহির হয়, ফিরিয়া শ্বশুরের কাছে বসে। শ্বশুর বুঝিতে পারেন ছেলেটি অতি শান্ত ও সুশীল। তাহার বুদ্ধির ধার হয়তো খুব বেশী নাই, কিন্তু ধীরতা আছে। জামাইয়ের আভ্যন্তরিক জীবনের চিত্র কিন্তু আদিত্যবাবু কল্পনা করিতে

পারেন না। নিজের মেয়েকেও তিনি চেনেন, জামাইকেও অল্প-বিস্তর চিনিয়াছেন, কিন্তু তবু মেয়ে-জামাইয়ের সম্মিলিত জীবন সম্বন্ধে কিছুই ধারণা করিতে পারিতেছেন না।

অনির্দ্দিষ্ট উদ্বেগের মধ্যে ছয় মাস কাটিয়া গেল। তারপর একদিন আদিত্যবাবু নিভৃতে ময়নাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ময়না প্রভাবতীর দাসী ও নিত্য সহচরী। সে বালবিধবা, কিন্তু জীবনের ভিত্তিস্থানীয় গোপন সত্যগুলি তাহার অপরিচিত নয়।

আদিত্যবাবু ময়নাকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া প্রশ্ন করিলেন, ময়নাও ঘুরাইয়া ফিরাইয়া উত্তর দিল। কিছুই পরিষ্কার হইল না, বরং আদিত্যবাবুর সংশয় আরও বাড়িয়া গেল।

কিন্তু এ প্রসঙ্গ লইয়া নায়েব-মোক্তারের সহিত আলোচনা করা চলে না। আদিত্যবাবু মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিলেন। অবশেষে তাঁহার মনে পড়িয়া গেল ডাক্তার সুরেন দাসের কথা। কলিকাতার বড় ডাক্তার, আদিত্যবাবুর বাল্যবন্ধু। যেমন হৃদয়বান তেমনি ঠোঁটকাটা। আদিত্যবাবু কাহাকেও কিছু না বলিয়া কলিকাতায় গেলেন।

পরদিন রামপুরে নায়েবের কাছে টেলিগ্রাম আসিল—প্রভাবতী ও নবগোপালকে পাঠাইয়া দাও। প্রভাবতী ও নবগোপাল কলিকাতায় গেল।

ডাক্তার সুরেন দাস কোনও প্রকার ভণিতা না করিয়া তাহাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিলেন। তারপর আদিত্যবাবুকে আড়ালে বলিলেন—'মেয়ের আবার বিয়ে দাও। এ বিয়ে বিয়েই নয়।'

পক্ষাঘাতগ্রস্ত মন লইয়া আদিত্যবাবু গৃহে ফিরিলেন। প্রভাবতী এবং নবগোপালও ফিরিল। প্রভাবতীর মনের কুয়াশা আর নাই, খর সূর্যালোক সমস্ত অস্পষ্টতা দূর করিয়া দিয়াছে।

দুই দিন আদিত্যবাবু কাহারও সহিত কথা বলিলেন না। কন্যার আবার বিবাহ দেওয়া দূরের কথা, মাতৃজারবৎ একথা কাহাকেও বলিবার নয়। মান-সম্ভ্রম বংশ-গৌরব সব ধূলিসাৎ হইয়াছে, মেয়েকে ঘিরিয়া যে নন্দনকানন রচনা করিয়াছিলেন তাহা ভস্মীভূত হইয়াছে। সব থাকিতে তাঁহার কিছু নাই, তিনি সর্বস্বান্ত হইয়াছেন।

তৃতীয় দিন সকালবেলা আদিত্যবাবু চুপি চুপি প্রভাবতীর মহলে গেলেন। প্রভাবতী এই সময় পূজার ঘরে থাকে।

প্রভাবতীর মহলে চার পাঁচটি ঘর, তার মধ্যে দুটি শয়নকক্ষ, একটি বসিবার ঘর। নবগোপাল চেয়ারে বসিয়া মাসিক পত্রিকা পড়িতেছিল, শ্বশুরকে আসিতে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

আদিত্যবাবু জামাইয়ের মুখের পানে তাকাইতে পারিলেন না, লজ্জায় তাঁহার দৃষ্টি মাটি ছাড়িয়া উঠিল না। তিনি অবরুদ্ধ স্বরে বলিলেন—'তুমি এমন কাজ কেন করলে?'

নবগোপাল উত্তর দিল না; নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

'এমন করে আমার সর্বনাশ করলে!'

এবারও নবগোপাল নিরুত্তর রহিল। পাশের ঘরে ময়না আসবাব ঝাড়ামোছা করিতেছিল, সে একবার দ্বার দিয়া উঁকি মারিল, তারপর পা টিপিয়া টিপিয়া সরিয়া গেল।

আদিত্যবাবুও আর কিছু না বলিয়া ফিরিয়া চলিলেন। কিছু বলিয়া লাভ কি? তিনি নিয়তির জালে জড়াইয়া পড়িয়াছেন, গলা ফাটাইয়া চিৎকার করিলেও মুক্তি নাই। শত বৎসর পূর্বে তাঁহার প্রপিতামহের আমলে এরূপ ব্যাপার ঘটিলে তিনি

হয়তো জামাইকে কাটিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিতেন। কিন্তু তাহাতেই বা কি লাভ হইত? কন্যার সুখ সৌভাগ্য বাড়িত না; বংশের মুখ উজ্জ্বল হইত না।

শ্বশুর প্রস্থান করিবার পর নবগোপাল আবার উপবেশন করিল; ঘরের চারিদিকে একবার মন্থর দৃষ্টি ফিরাইল, তারপর মাসিক পত্রিকা তুলিয়া লইল।

দিন কাটিতে লাগিল, দিনের পর দিন। প্রভাবতীকে দেখিয়া অনুমান করা যায় না তাহার মনের মধ্যে কী হইতেছে। তাহার শান্ত সহাস্য দৃঢ়তার অন্তরালে হয়তো ব্যর্থ অভীপ্সার আগুন চাপা আছে, কিন্তু বাহিরে কেহ তাহা দেখিতে পায় না।

তারপর হঠাৎ একদিন আদিত্যবাবু মারা গেলেন। যেন অদৃষ্টের দুর্নিবার আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিলেন। তাঁহার শরীর ভিতরে ভিতরে নির্জীব হইয়া পড়িয়াছিল, বাঁচিবার স্পৃহাও ছিল না। বুকে ঠাণ্ডা লাগাইয়া কয়েক দিনের জ্বরে তিনি ইহসংসার ত্যাগ করিলেন।

প্রভাবতী জমিদারীর সর্বেসর্বা অধিকারিণী হইল। কিন্তু এই সৌভাগ্যের জন্য সে লালায়িত ছিল না। পিতার মৃত্যুর পর সে চারদিন শয্যা ছাড়িয়া উঠিল না। পরে স্নান করিয়া সংযতভাবে পিতার চতুর্থী ক্রিয়া সম্পন্ন করিল।

জমিদার-সংসার পূর্বের মতই চলিতে লাগিল। গৃহে আদিত্যবাবুর স্থান শূন্য হইল বটে, কিন্তু সেজন্য কাজের কোনও ব্যাঘাত হইল না। নবগোপাল শ্বশুরের স্থান অধিকার করিবার চেষ্টা করিল না, যেমন নির্লিপ্ত ছিল তেমনি রহিল। নায়েব প্রভাবতীর সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ চালাইতে লাগিলেন।

তারপর যত দিন যাইতে লাগিল প্রভাবতীর স্বভাব তত পরিবর্তিত হইতে লাগিল। হঠাৎ কোনও পরিবর্তন ঘটিল না, ধীরে অলক্ষিতে ঘটিল। আগে তাহার চরিত্রে দৃঢ়তা ছিল, কর্কশতা ছিল না; কথায় শাসন ছিল, তাড়না ছিল না; দৃষ্টিতে গাম্ভীর্য ছিল, ছিদ্রান্বেষিতা ছিল না। এখন ক্রমে ক্রমে তাহার স্বভাব তীক্ষ্ণ কণ্টক সমাকুল হইয়া উঠিল। সেই সঙ্গে শুচিবাই দেখা দিল। পরিচরবর্গ তাহাকে সম্ভ্রম করিত, এখন ভয় করিয়া চলিতে লাগিল।

তাহার দেহও অদৃশ্য রিপুর আক্রমণ হইতে অক্ষত রহিল না। বিবাহের সময় তাহার রূপ ছিল সদ্য ফোটা গোলাপ ফুলের মত, লাবণ্যের শিশিরে সারা অঙ্গ ঝলমল করিত। ক্রমে শিশির শুকাইয়া আসিল। সেই সঙ্গে একটা স্নায়বিক রোগ দেখা দিল, হঠাৎ কাজ করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িত। আবার জ্ঞান হইলে যেন কিছুই হয় নাই এমনিভাবে কাজে মন দিত। কেহ ডাক্তার ডাকার প্রস্তাব করিলে অগ্নিশিখার মত জ্বলিয়া উঠিত।

আদিত্যবাবুর মৃত্যুর পর দুই বছর কাটিয়া গেল। তপঃকৃশ দেহমন লইয়া প্রভাবতী উনিশ বছরে পদার্পণ করিল।

নবগোপালের জ্বর হইতেছিল। ম্যালেরিয়া জ্বর, আসিবার সময় শীত করিয়া হাত-পা কামড়াইত। স্থানীয় ডাক্তার কুইনিন দিতেছিলেন।

বিকালবেলা নবগোপালের সাগু তৈরি হইল কি না দেখিবার জন্য প্রভাবতী রান্নাঘরের দিকে যাইতেছিল, ময়না আসিয়া খাটো গলায় বলিল—'দিদিমণি, জামাই-বাবুর বোধহয় আবার জ্বর আসছে!'

প্রভাবতী থমকিয়া দাঁড়াইল—'কি করে জানলি?'

ময়না সংকুচিত স্বরে বলিল—'আমি ঘরে গিছলাম, দেখলাম শুয়ে আছেন। আমাকে দেখে বললেন, বড্ড হাত-পা কামড়াচ্ছে, একটু টিপে দিলে আরাম হয়।'

প্রভাবতী কিছুক্ষণ ময়নার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল—'তা টিপে দিলি না কেন?'

ময়না লজ্জিত মুখে চুপ করিয়া রহিল, প্রভাবতী তখন বলিল—'আচ্ছা তুই সাবু নিয়ে আয়, আমি দেখছি।'

নবগোপাল নিজ শয়নকক্ষে একটা বিলাতী কম্বল গায়ে দিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া ছিল, প্রভাবতী খাটের পাশে গিয়া দাঁড়াইল। নবগোপাল একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—'আজ আবার জ্বর আসছে।'

প্রভাবতী নরম সুরে বলিল—'হাত-পা কামড়াচ্ছে? আমি টিপে দেব?'

নবগোপাল ব্যস্ত ও বিব্রত হইয়া উঠিল—'না, না, তুমি কেন? সদর থেকে একটা চাকরকে ডেকে পাঠালেই তো হয়।'

'তার দরকার নেই। আমি দিচ্ছি।'

প্রভাবতী খাটে উঠিয়া বসিয়া নবগোপালের গা-হাত টিপিয়া দিতে লাগিল। নবগোপাল আড়ষ্ট হইয়া শুইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর প্রভাবতী বলিল—'ডাক্তারটা হয়েছে হতচ্ছাড়া। কম্বুলে ডাক্তার আর কত ভাল হবে। এখুনি ডেকে পাঠাচ্ছি তাকে। জ্বর সারাতে হয় সারাক নইলে বিদেয় হোক।'

ইতিমধ্যে নবগোপালের কাঁপুনি বাড়িয়াছিল, সে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—'এখন ডাক্তার ডেকে কী হবে? জ্বরটা ছাড়ুক—' বলিয়া মাথার উপর কম্বল চাপা দিল।

প্রভাবতী উঠিয়া গিয়া নিজের ঘর হইতে আর একটা কম্বল আনিয়া নবগোপালের গায়ে চাপা দিল। বলিল—'আসুক ডাক্তার, নিজের চোখে দেখুক। ম্যালেরিয়া সারাতে পারে না!' এই সময় ময়না সাগুর বাটি লইয়া প্রবেশ করিলে প্রভাবতী বলিল—'ময়না, সাগু রাখ। সদরে গিয়ে ডাক্তারকে ডেকে আনতে বল। ডাক্তার এসে বসে থাকুক, জ্বর ছাড়লে ওষুধ দিয়ে তবে যাবে।'

অতঃপর ধমক খাইয়া ডাক্তার এমন ঔষধ দিল যে আর জ্বর আসিল না। নবগোপাল ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিল। গ্রাম্য ডাক্তার সাধারণত একটু হাতে রাখিয়া চিকিৎসা করে; এক দিনে জ্বর ছাড়িয়া গেলে জ্বরের লঘুতাই প্রমাণ হয়, ডাক্তারের কেরামতি প্রমাণ হয় না।

ইহার কয়েকদিন পরে সকালবেলা প্রভাবতী নায়েবকে ডাকিয়া পাঠাইল। নায়েব আসিয়া দেখিলেন প্রভাবতী নিজের শয়নঘরে মেঝেয় বসিয়া পান সাজিতেছে। প্রভাবতী নিজে বেশী পান খায় না, কিন্তু নবগোপাল পান দোক্তা খায়; ইহা তাহার একমাত্র ব্যসন। প্রভাবতী নিজের হাতে স্বামীর পান সাজে।

নায়েব প্রভাবতীর সম্মুখে আসনে বসিলেন। প্রভাবতী তাঁহার পানে চোখ না তুলিয়া বলিল—'কাকা, ও'র জন্যে একজন খাস-বেয়ারা রাখব ভাবছি। আপনি কি বলেন?'

নায়েব কিছুক্ষণ প্রভাবতীর নতনেত্র মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। এ বংশের সাবেক প্রথা, অন্দরের সকল কাজ, এমন কি পুরুষদের পরিচর্যা পর্যন্ত, ঝি-চাকরানী করিবে। আদিত্যবাবুরও খাস-বেয়ারা ছিল না। নায়েব কথাটা মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিয়া বলিলেন—'বেশ তো মা, তুমি যখন দরকার মনে করছ তখন রাখলেই হল। এ বংশে অবশ্য—'

'সে আমি জানি। কিন্তু দরকার হলে নিয়ম বদলাতে হয়।'

'তা তো বটেই। আমি লোক দেখছি।' একটু থামিয়া বলিলেন—'একটা লোক ক'দিন থেকে চাকরির জন্যে ঘোরাঘুরি করছে—'

প্রভাবতী মুখ তুলিল—'কি রকম লোক?'

নায়েব বলিলেন—'দেখে তো ভালই মনে হয়। ভদ্দর চেহারা, চালচলন ভাল, বলছিল

কলকাতায় কোন্ ব্যারিস্টারের বাড়িতে বেয়ারার কাজ করেছে।'

'তবে বোধহয় পারবে।'

'আপাতত ওকেই রেখে দেখা যাক। যদি না পারে তখন অন্য লোক দেখলেই হবে।' নায়েব উঠিলেন—'লোকটা এই সময় আসে। আজ থেকেই বহাল করে নিই, কি বল?'

প্রভাবতী বলিল—'তাকে একবার অন্দরে পাঠিয়ে দেবেন। আমি আগে একবার দেখতে চাই।'

'বেশ।' নায়েব চলিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে ময়না ছুটিতে ছুটিতে ঘরে প্রবেশ করিল। 'দিদিমণি—' বলিয়া ঘাড় ফিরাইয়া পিছন দিকে ইশারা করিল। তাহার চোখেমুখে চাপা উত্তেজনা।

প্রভাবতী অপ্রসন্ন চোখ তুলিয়া দেখিল দ্বারের কাছে উমেদার ভৃত্য আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ, ছিটের কামিজ পরা ছিমছাম চেহারা। মুখে চোখে বুদ্ধির সংযম। সে নত হইয়া জোড়া হাত কপালে ঠেকাইল।

প্রভাবতী তাহাকে এক নজর দেখিয়া পানের খিলি মুড়িতে মুড়িতে ধীর স্বরে বলিল—'তোমার নাম কি?'

'আজ্ঞে মোহন।'

'কি কাজ করতে হবে শুনেছ?'

'আজ্ঞে নায়েববাবু বলেছেন।'

'পারবে।'

'আজ্ঞে পারব।'

'বাবুকে তেল মাখানো, দরকার হলে হাত-পা টিপে দেওয়া, এসব করতে হবে।'

'আজ্ঞে করব।'

প্রভাবতী তখন ময়নাকে বলিল—'ময়না, ওকে কোণের ঘরটা দেখিয়ে দে, ঐ ঘরে ও থাকবে। আর বাবুর কাছে নিয়ে যা।'

মহলের এক কোণে লম্বা বারান্দার অন্য প্রান্তে একটি ঘর অব্যবহৃত পড়িয়া ছিল, ময়না মোহনকে সঙ্গে লইয়া ঘর দেখাইয়া দিল, তারপর নবগোপালের ঘরে লইয়া গেল।

খাস-বেয়ারা দেখিয়া নবগোপাল হাঁ-না কিছুই বলিল না। খুশি হইল কিনা তাহাও বোঝা গেল না। কয়েক মিনিট পরে ময়না মোহনকে নবগোপালের ঘরে রাখিয়া ফিরিয়া আসিলে প্রভাবতী বলিল—'ময়না, বাকী পানগুলো সেজে ডাবায় ভরে রাখ, আমার স্নানের সময় হল।'

প্রভাবতীর শয়নকক্ষের লাগাও স্নানের ঘর, সে স্নানের ঘরে প্রবেশ করিল। ময়না পান সাজিতে বসিল।

আজ ময়নার মন চঞ্চল, ইন্দ্রিয়গুলিও অত্যন্ত সজাগ। পান সাজা শেষ করিয়া সে বাটা ভরিয়া নবগোপালের ঘরে রাখিয়া আসিল। দেখিল নূতন চাকর নবগোপালের মাথায় তেল মাখাইয়া দিতেছে।

প্রভাবতীর ঘরে ফিরিয়া আসিয়া সে ঘরের এটা ওটা নাড়িয়া চাড়িয়া আঁচল দিয়া আয়নাটা মুছিবার ছুতায় নিজের মুখ দেখিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার সারা দেহে যেন ছট্‌ফটানি ধরিয়াছে। তারপর সে অনুভব করিল, স্নানের ঘর হইতে কোনও সাড়া শব্দ আসিতেছে না।

কিছুক্ষণ উৎকণ্ঠিত চক্ষে স্নানঘরের দ্বারের পানে চাহিয়া থাকিয়া ময়না সন্তর্পণে গিয়া দ্বার ঠেলিল। দেখিল প্রভাবতী অজ্ঞান হইয়া ভিজা মেঝের উপর পড়িয়া আছে। তাহার কাপড়-চোপড়ের অবস্থা দেখিয়া মনে হয় স্নান আরম্ভ করিবার পূর্বেই সে মূর্ছা গিয়াছে।

ময়না চেঁচামেচি করিল না, প্রভাবতীর পাশে ঝুঁকিয়া তাহার মুখে জলের ছিটা দিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে প্রভাবতীর জ্ঞান হইল। সে উঠিয়া বসিয়া বস্ত্রাদি সম্বরণ করিতে করিতে বলিল—'হয়েছে, তুই এবার নিজের কাজে যা। কাউকে কিছু বলবার দরকার নেই।'

নূতন ভৃত্য মোহন যে অতিশয় কর্ম-নিপুণ লোক এবং সব দিক দিয়া বাঞ্ছনীয় তাহা প্রমাণ হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। সে অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দেখিলে ভদ্রলোক বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু সে যত্নপূর্বক নিজেকে ভৃত্য পর্যায়ে আবন্ধ করিয়া রাখে; খাটো করিয়া কাপড় পরে, মাথায় টেরি কাটে না। তাহার সবচেয়ে বড় গুণ সে অযথা কথা বলে না, মুখে প্রফুল্ল গাম্ভীর্য লইয়া আপন মনে কাজ করিয়া যায়। ময়না যখন গায়ে পড়িয়া তাহার সহিত কথা বলিতে যায়, সে সংক্ষেপে উত্তর দেয়, মাখামাখির চেষ্টা করে না।

ময়নাকে লইয়াই গোলযোগ বাধিল।

ময়না মেয়েটা এমন কিছু ন্যাকা-বোকা নয়, তাহার পালিশ করা কালো শরীরে বেশ খানিকটা স্বচ্ছ সহজ বুদ্ধি ছিল। কিন্তু মোহন আসার পর হইতে তাহার বুদ্ধি-সুদ্ধি যেন জোয়ারের জলে ভাসিয়া গিয়াছিল। বিশেষত অবস্থাগতিকে দু'জনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছিল, ইচ্ছা থাকিলেও সান্নিধ্য বর্জন করিবার উপায় ছিল না।

সকল দিকেই প্রভাবতীর দৃষ্টি বড় তীক্ষ্ন, ময়নার রসবিহ্বলতা তাহার চক্ষু এড়ায় নাই। একদিন সে ধমক দিয়া বলিল—'হয়েছে কি তোর? অমন ছটফটিয়ে বেড়াচ্ছিস কেন? কাজকর্ম কিছু নেই?'

ময়না ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি প্রভাবতীর সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল।

এইভাবে, মোহন নিযুক্ত হইবার পর মাসখানেক কাটিল। গ্রীষ্মকাল আসিল। আকাশে যেমন অলক্ষিতে বাষ্প সঞ্চিত হইয়া কালবৈশাখীর ভূমিকা রচনা করে, তেমনি জমিদার পরিবারের শত কর্ম-বহুলতার অন্তরালে ধীরে ধীরে উষ্ণতার স্বচ্ছ মেঘ সঞ্চিত হইতে লাগিল।

বৈশাখ মাসের শেষের দিকে এক সকালে প্রভাবতী দ্বিতলের জানালায় দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া ছিল। রাত্রে গরমে ভাল ঘুম হয় নাই, উত্তপ্ত মুখের উপর সকালবেলার স্নিগ্ধ বাতাস মন্দ লাগিতেছিল না। কিন্তু এই স্নিগ্ধতা ক্রমে দ্বিপ্রহরের খর প্রদাহে পরিণত হইবে, এই শঙ্কা তাহার মনের সঙ্গে জড়াইয়া জড়াইয়া তাহার জীবনটাকেই দুর্বহ করিয়া তুলিতেছিল; মনে প্রশ্ন জাগিতেছিল, আরম্ভে এতটুকু সরসতা দিয়া ভগবান মানুষকে সারা জীবনের জন্য দুস্তর মরুভূমির শুষ্কতার মধ্যে ঠেলিয়া দিয়াছেন কেন?

—'মা, কালীপুরের ভবনাথ চৌধুরী মশায় তাঁর ছোট ছেলেকে নেমন্তন্ন করতে পাঠিয়েছেন!'

প্রভাবতী দিবাস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল, দেখিল নায়েব দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

'কিসের নেমন্তন্ন?'

নায়েব বলিলেন—'চৌধুরী মশায়ের প্রথম নাতির অন্নপ্রাশন, খুব ঘটা করেছেন। বলে পাঠিয়েছেন, তোমাকে যেতেই হবে।'

প্রভাবতীর মুখখানা সাদা হইয়া গেল। চৌধুরী মশায় পাশের গ্রামের জমিদার, আদিত্যবাবুর সহিত বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। দেড় বছর আগে তিনি বড় ছেলের বিবাহ দিয়াছিলেন; এখন নাতির অন্নপ্রাশন।

প্রভাবতী রুদ্ধস্বরে বলিল—'আমি যেতে পারব না কাকা।'

নায়েব বলিলেন—'কিন্তু সেটা কি উচিত হবে মা। আগ্রহ করে নিজের ছেলেকে নেমন্তন্ন করতে পাঠিয়েছেন—যদি না যাও ক্ষুন্ন হবেন। লোক-লৌকিকতাও রাখা দরকার।'

প্রভাবতী জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল, বলিল—'বলে দেবেন আমার শরীর খারাপ, যেতে পারব না। আর, ছেলের জন্যে রুপোর ঝিনুক-বাটি পাঠাতে হবে তার ব্যবস্থা করুন।'

নায়েব মহাশয় কিছুক্ষণ ক্ষুব্ধ মুখে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া গেলেন।

জানালার বাহিরে বাতাস ক্রমে উষ্ণ হইয়া উঠিতেছিল। প্রভাবতীর দুই চক্ষু জ্বালা করিয়া জলে ভরিয়া উঠিল। সে আঁচলে চোখ মুছিয়া পালঙ্কে আসিয়া বসিল। ধরা-ধরা গলা পরিষ্কার করিয়া ডাকিল—'ময়না!'

ময়নার সাড়া না পাইয়া প্রভাবতী বিরক্ত বিস্ফারিত চক্ষে দ্বারের পানে চাহিল। ময়না সর্বদা কাছে কাছে থাকে, একবারের বেশী দু'বার তাহাকে ডাকিতে হয় না। প্রভাবতী উঠিয়া ঘরের বাহিরে আসিল।

লম্বা বারান্দার অপর প্রান্তে মোহনের ঘর। ময়না দ্বারের চৌকাঠে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ঘরের ভিতরে চাহিয়া আছে।

প্রভাবতী নিঃশব্দ পদে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, তবু ময়না জানিতে পারিল না। মোহন ঘরের মেঝেয় মাদুর পাতিয়া নবগোপালের একখানা শান্তিপুরী ধুতি চুনট করিতেছে, ময়না তন্ময় সম্মোহিত হইয়া তাহাই দেখিতেছে।

এতক্ষণ প্রভাবতীর মনে যে অবরুদ্ধ বাষ্প তাল পাকাইতেছিল এই ছিদ্রপথে তাহা বাহির হইয়া আসিল। সে তীব্রস্বরে বলিল—'ময়না! কি হচ্ছে তোমার এখানে? ডাকলে শুনতে পাও না!'

ময়না চমকিয়া প্রভাবতীকে দেখিয়া যেন কেঁচো হইয়া গেল—'দিদিমণি, তুমি ডেকেছিলে? আমি—আমি শুনতে পাইনি।'

দাঁতে দাঁত চাপিয়া প্রভাবতী বলিল—'শুনতে পাওনি। এসো এদিকে একবার, ভাল করে শোনাচ্ছি।'

সে ফিরিয়া চলিল, ময়না শঙ্কিত শীর্ণ মুখে তার পিছনে চলিল। মোহন প্রভাবতীর স্বর শুনিয়া চকিতে মুখ তুলিয়াছিল, আবার ঘাড় হেঁট করিয়া কাজে মন দিল।

ময়নাকে লইয়া প্রভাবতী নিজের ঘরে দ্বার বন্ধ করিল, প্রজ্বলিত চক্ষে চাহিয়া বলিল—'ভেবেছিস কি তুই? সাপের পাঁচ-পা দেখেছিস?'

ময়না ক্রন্দনোন্মুখ ভয়ার্ত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। প্রভাবতী বলিল—'ভেবেছিস আমার চোখ নেই, কিছু দেখতে পাই না! মোহনের সঙ্গে তোর কী? খুলে বল্ হতভাগী, নইলে ঝেঁটিয়ে তোর বিষ ঝাড়ব।'

ময়না প্রভাবতীর পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—'আমি কোনও পাপ করিনি দিদিমণি, তোমার পা ছুঁয়ে বলছি।'

প্রভাবতী পা সরাইয়া লইয়া বলিল—'হয়েছে, আর ন্যাকামি করতে হবে না। আমি সব বুঝি। তোকেও ঝ্যাঁটা মেরে বিদেয় করব, ওকেও বিদেয় করব। আমার বাড়িতে ওসব চলবে না।'

'আমার কোনও দোষ নেই দিদিমণি!'

'তোর দোষ নেই! সব দোষ তোর। তুই না বিধবা! তোর মাথা মুড়িয়ে গাঁ থেকে

দূর করে দেব। নষ্টামির আর জায়গা পাস্‌নি।'

ভয়ে দিশাহারা হইয়া ময়না প্রভাবতীর পায়ে মাথা কুটিতে লাগিল—'আমার দোষ নেই—আমার দোষ নেই—মা কালীর দিব্যি—বাবা তারকনাথের দিব্যি। আমি কিছু করিনি—ওই আমাকে ডেকেছে—'

'কি বললি—তোকে ডেকেছে?'

'হ্যাঁ, আজ রাত্তিরে ওর ঘরে যেতে বলেছে।'

প্রভাবতী ক্ষণেকের জন্য হতবাক্ হইয়া গেল, তারপর গর্জিয়া উঠিল—'তাই বুঝি সকাল থেকে ওর দোরে ধর্না দিয়েছিস! হারামজাদি, তোকে আঁশ বঁটিতে কুটব আমি, কুটে কুকুর দিয়ে খাওয়াব।'

ময়না মাথা কুটিতে কুটিতে বলিল—'তাই কর দিদিমণি, তাই কর, আমার সব জ্বালা জুড়োক।'

প্রভাবতী কিছুক্ষণ অঙ্গারচক্ষু মেলিয়া ময়নার পানে চাহিয়া রহিল, তারপর তাহার নড়া ধরিয়া তুলিয়া স্নানঘরের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে বলিল—'আজ সারাদিন সারারাত ঘরে বন্ধ থাকবি তুই, খেতে পাবি না। আর মোহনের ব্যবস্থাও আমি করছি।' ময়নাকে সে স্নানঘরে ঠেলিয়া দিয়া বাহির হইতে শিকল টানিয়া দিল।

নিজের শয্যাপার্শ্বে ফিরিয়া আসিয়া সে কয়েক মিনিট গুম হইয়া বসিয়া রহিল, তারপর শুইয়া পড়িল। কিছুক্ষণের জন্য তাহার সংজ্ঞা রহিল না।

জ্ঞান হইবার পরও প্রভাবতী শয্যায় পড়িয়া রহিল, উঠিল না। দ্বিপ্রহরের খাইবার ডাক আসিলে সে বলিয়া পাঠাইল—'আমার শরীর খারাপ, কিছু খাব না। ময়নাও খাবে না।'

নবগোপাল আহারাদি সম্পন্ন করিয়া প্রভাবতীর খাটের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, শান্তকণ্ঠে বলিল—'শরীর খারাপ হয়েছে? ডাক্তারকে খবর পাঠাব?'

'দরকার নেই' বলিয়া প্রভাবতী পাশ ফিরিয়া শুইল।

নবগোপাল আরও কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া লঘুপদে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

নিঃসঙ্গ দ্বিপ্রহর ক্রমে পশ্চিমে গড়াইয়া পড়িল। হঠাৎ অসহ্য গরম কাটিয়া শন্ শন্ বাতাস বহিল, আকাশের কোণ হইতে রাশি রাশি কালো মেঘ ছুটিয়া আসিয়া আকাশ দখল করিয়া বসিল। ঝম্ ঝম্ ঝর্ ঝর্ বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

প্রভাবতী উঠিয়া জানালা খুলিয়া দিল। প্রবল বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টির ছাট তাহার মুখ ভিজাইয়া দিল, বুকের কাপড় ভিজাইয়া দিল। সে ঊর্ধ্বে মেঘের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্রমে দিন শেষ হইয়া রাত্রি আসিল, ঝড়-বৃষ্টি থামিল। আকাশে বাতাসে স্নিগ্ধ শীতলতা, ধরণীর বুকে তৃষ্ণা নিবৃত্তির পরিপূর্ণ তৃপ্তি। প্রভাবতী আবার শয্যায় গিয়া শয়ন করিল। শুষ্ক দহমান অন্তর লইয়া পড়িয়া রহিল। সৃষ্টির মধ্যে সেই যেন শুধু সৃষ্টিছাড়া।

দাসী ঘরে আলো দিতে আসিল। প্রভাবতী একবার চোখ খুলিয়া আবার চোখ বুজিল, বলিল—'আলো দরকার নেই, নিয়ে যা।'

দ্বিপ্রহর রাত্রি। বাড়িতে কোথাও আলো নাই, শব্দ নাই। নিশীথিনী যেন সর্বাঙ্গে শীতলতার চন্দন-প্রলেপ মাখিয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত।

অন্ধকার ঘরে প্রভাবতী শয্যায় উঠিয়া বসিল; কিছুক্ষণ কান পাতিয়া রহিল।

তারপর নিঃশব্দে উঠিয়া নবগোপালের ঘরে উঁকি মারিল। নবগোপালের ঘরে ক্ষীণ নৈশ-দীপ জ্বলিতেছে। নবগোপাল শয্যায় নিদ্রামগ্ন। তাহার অল্প অল্প নাক ডাকিতেছে।

ফিরিয়া আসিয়া প্রভাবতী নিজের স্নানঘরের বন্ধ দ্বারে কান লাগাইয়া শুনিল। শব্দ নাই। তখন সে সন্তর্পণে বাহিরের দ্বার খুলিয়া বারান্দায় বাহির হইল। বারান্দার অপর প্রান্তে একটা ঘর। নিঃশব্দ পদে বারান্দা অতিক্রম করিয়া সে দ্বারের গায়ে হাত রাখিল। দ্বার ভেজানো ছিল, আস্তে আস্তে খুলিয়া গেল।

প্রভাবতী দীপহীন কক্ষে প্রবেশ করিল।...

পরদিন প্রাতঃকালে প্রভাবতী শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিল, স্নানঘরের দ্বার খুলিয়া দেখিল ময়না মাটিতে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। তাহাকে জাগাইয়া দিয়া সদয়কণ্ঠে বলিল—'যা—এবার নীচে যা!'

ময়না চলিয়া গেলে প্রভাবতী স্নান করিল। তারপর পানের বাটা লইয়া পান সাজিতে বসিল।

নায়েব আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইলেন। 'কাল না কি মা তোমার শরীর খারাপ হয়েছিল?'

প্রভাবতী মুখ না তুলিয়া বলিল—'এমন কিছু নয়, আজ ভাল আছি। কাকা, ওই নতুন চাকরটাকে আজই বিদেয় করে দেবেন।'

নায়েব বলিলেন—'কাকে—মোহনকে? কিন্তু কাজকর্ম তো ভালই করছে শুনেছি।'

প্রভাবতী বলিল—'আমি ভেবে দেখলুম, অন্দর মহলে পুরুষ চাকর না রাখাই ভাল। ওকে পুরো মাসের মাইনে দিয়ে বিদেয় করে দেবেন। বলবেন যেন আমার এলাকা ছেড়ে চলে যায়।'

কাহিনী শেষ করিয়া ভুবনবাবু এক টিপ নস্য লইলেন এবং চকিত সজল নেত্রে চারিদিকে চাহিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'নবগোপাল কবে মারা গেল?'

ভুবনবাবু বলিলেন—'এই তো বছর দুই আগে। লোকটা ভারি অমায়িক ছিল, ছেলেকে খুব আদর করত।'

প্রশ্ন করিলাম—'আপনি ছাড়া একথা কে কে জানে?'

ভুবনবাবু বলিলেন—'সবাই জানে আবার কেউ জানে না। বড় ঘরের বড় কথা।'

অষ্টমে মঙ্গল

আমি যখন বিহারে বাস করিতাম, তখন আমার এক বন্ধু ছিল বৈজনাথ প্রসাদ। সে শহর হইতে ত্রিশ মাইল দূরে একটি বড় গ্রামে ডাক্তারি করিত। স্কুলে বৈজনাথের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়িয়াছিলাম, তারপর বড় হইয়া আমি যখন উকিল হইলাম এবং সে ডাক্তার হইয়া নিজের গ্রামে গিয়া বসিল, তখনও বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ রহিল। সদরে কাজ পড়িলে সে আমার বাড়িতে আসিয়া উঠিত এবং শীতকালে যখন আমার শিকারের বাতিক চাগাড় দিত, তখন আমি তাহার গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইতাম।

বৈজনাথ ডাক্তার ছিল বটে, কিন্তু ডাক্তারি তাহার পেশা ছিল না। গ্রামে তাহার বিস্তর জমি-জমা ছিল; তাহাই দেখাশুনা করিত এবং অবসরমত অবৈতনিকভাবে গ্রামবাসীদের ঔষধ দিত। তাহার ডাক্তারখানার চালাঘরটি প্রকৃতপক্ষে ইয়ার-বন্ধুদের আড্ডাঘর ছিল।

সেবার হেমন্তের শেষে বৈজনাথের গ্রামে গিয়াছি। বৈজনাথ জাতিতে কায়স্থ, সুতরাং ঘোর মাংসাশী; আমি যাইতেই একটা খাসি কাটিয়া ফেলিল। তারপর রান্নাবান্না, খাওয়া-দাওয়া, একটু-আধটু বিলাতী মদ্য—চিরদিনের কর্মসূচীর ব্যতিক্রম হইল না।

সে-রাত্রে এগারোটার সময় চন্দ্রোদয়, পাঁজিতে দেখিয়া আসিয়াছিলাম। চাঁদ উঠিলে ধানের ক্ষেতে হরিণ শূকর শস্য খাইতে আসে, তখনই তাহাদের বধ করিবার উপযুক্ত সময়। এই বধকার্য অমেধ্য নয়। আমাদের রোপিত শস্য খাইয়া তাহারা মোটা হয়, আমরা তাহাদের খাইয়া মোটা হই, এইভাবে প্রবর্তিত চক্র ঘুরিতে থাকে। এই প্রবর্তিত চক্র যে অনুবর্তন না করে, হে পার্থ, সে বৃথাই জন্মিয়াছে।

আমাদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হইতে সাড়ে দশটা বাজিয়া গেল। অতঃপর আমরা বন্দুক ঘাড়ে বাহির হইলাম।

কিন্তু এটা শিকারের গল্প নয়, মংলু মুশহরের করুণ কাহিনী। শিকারের কথা লিখিবার লোভ হইলেও লোভ সংবরণ করিতে হইতেছে। চাঁদের আলোয় যখন দূর-প্রসারী শস্যশীর্ষ কাঁপিতে থাকে এবং নিকটস্থ বনের ছায়াতল হইতে হরিণের দল সারি দিয়া বাহির হইয়া আসে, সে দৃশ্য ভুলিবার নয়। কিন্তু থাক।

শিকার মন্দ হইল না; দুটা হরিণ, একটা শূকর, একটা শজারু। শেষ রাত্রে ফিরিয়া আসিয়া হৃষ্টমনে শয্যা আশ্রয় করিলাম। বৈজনাথের ডাক্তারখানার একটা ঘরে চারপাই পাতিয়া আমার শয়নের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ,

ঘুম ভাঙিল অনেক বেলায়। ডাক্তারখানার সম্মুখে মনুষ্য কণ্ঠের কলরব, অনেক রুগী জড়ো হইয়াছে। আমি উঠিয়া গিয়া বাহিরের বারান্দায় তক্তপোশে বসিলাম। চাকর গুড়ের চা ও কন্দুর মোরব্বা দিয়া গেল, তাহা সেবন করিতে করিতে সিগারেট ধরাইলাম।

বৈজনাথের ডাক্তারি দেখিতেছি। চিরপরিচিত দৃশ্য। রুগী বা রুগীর আত্মীয় শিশি-হাতে বারান্দার নীচে বসিয়াছে। স্ত্রীলোক আছে, পুরুষ আছে, বালক-বালিকা আছে। বৈজনাথ একে একে তাহাদের ডাকিতেছে, প্রশ্ন করিতেছে। কাহারও দম্‌মা, কাহারও পিল্‌হী, কাহারও বোখার। বৈজু হাই তুলিতে তুলিতে তাহাদের গালিগালাজ করিতেছে এবং ঔষধ দিতেছে।

ক্রমে রুগীর দল ঔষধ লইয়া বিদায় হইল, অঙ্গন শূন্য হইয়া গেল। বৈজনাথ আমার পাশে বসিয়া চায়ের বাটি তুলিয়া লইল।

এই সময় লক্ষ্য করিলাম, সম্মুখের বিস্তৃত মাঠের অন্য প্রান্ত হইতে একটা লোক

আসিতেছে। লোকটার প্রকাণ্ড কাল দেহ, পিঠে কি-একটা গুরুভার বস্তু বহন করিয়া আসিতেছে।

বৈজনাথকে প্রশ্ন করিলাম—'ওটা কে? এদিকেই আসছে মনে হচ্ছে।'

বৈজনাথ একবার চোখ তুলিয়া বলিল—'মংলু মুশহর বৌ নিয়ে আসছে।'

'বৌ কোথায়?'

'ওই যে ওর পিঠে। মুশহরদের গ্রাম এখানে থেকে মাইল তিনেক দূরে। বৌ হেঁটে আসতে পারে না, তাই তাকে পিঠে করে আনে।'

'রোজ আনে?'

'রোজ নয়, হপ্তায় দু-তিন দিন।'

'রোগটা কি?'

'জটিল স্ত্রীরোগ। বছর দুই ধরে ভুগছে, বেজায় কাহিল হয়ে পড়েছে। তবে মুশহরদের কঠিন প্রাণ, সহজে মরে না।'

মুশহর জাতি বিহারের অন্ত্যজ পর্যায়ের জাতি। ইহারা ইঁদুর খায়, শুয়োর খায়; অসাধারণ কায়িক পরিশ্রম করিতে পারে। বিহারে যত পাকা সড়ক আছে, সমস্তই এই মুশহরদের তৈরি। ইহারাই পাথর ভাঙে, ইহারাই পথ গড়ে। খর রৌদ্রে সারাদিন কাজ করার ফলে ইহারা অধিকাংশই রাতকানা। দিনের কাজের শেষে এক বোতল ধেনো মদ এবং একটি সঙ্গিনী—ইহাই তাহাদের কাম্য, আর কিছু চায় না।

মংলু মুশহর আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, বৈজনাথের পানে চাহিয়া সসম্ভ্রমে হাসিল। তাহার পিঠে ময়লা কাপড়ে ঢাকা বৌটা চামচিকার মত আঁকড়াইয়া ছিল; মংলুর গলায় রুপার বালা-পরা দুটা হাত এবং কোমরে রুপার কড়া-পরা দুটা পা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাইতেছিল না। মংলু অতি যত্নে বৌকে পিঠ হইতে নামাইয়া মাটিতে বসাইল। নোংরা কাপড়ের আড়ালে বৌয়ের মুখ দেখিতে পাইলাম না।

কিন্তু মংলুর দিক হইতে চোখ ফেরানো যায় না। বয়স পঁচিশ হইতে ত্রিশের মধ্যে, পাথর-কোঁদা চেহারা। ছ' ফুট লম্বা, মুখশ্রী আদিম মানুষের মত কুৎসিত নয়, হাসিটি বড় মিষ্টি। কোমর হইতে জানু পর্যন্ত কাপড় দিয়া ঢাকা, বাকি অঙ্গ উন্মুক্ত। প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর হাতের কাছে কষ্টিপাথর পাইলে বোধ করি এমনি একটি মূর্তি গড়িতে পারিতেন।

বৈজনাথ বলিল—'কিরে মংলু, বৌয়ের খবর কি?'

মংলু হাসিমুখেই বলিল—'আর বলবেন না সরকার, বৌয়ের জন্য মরে গেলাম। কাজকর্ম শিকেয় উঠেছে, রোজগার বন্ধ। মরেও না নিগোড়ি, ম'লে আমি ছুটি পাই। সরকার একটা উপায় করুন।'

'কি উপায় করব? বিষ খাইয়ে মেরে ফেলব?'

মংলুর মুখের হাসিটি করুণ হইয়া গেল—'তাই কি বলেছি হুজুর? ওকে ভাল করে দিন।'

'ভাল করা ভগবানের হাত। ভেতরে নিয়ে আয়, দেখি।'

মংলু কাপড়ের পুঁটুলি দুই হাতে তুলিয়া লইয়া ভিতরে গেল।

পনেরো মিনিট পরে বৌকে পিঠে লইয়া মংলু আবার বাহির হইল।

বৈজনাথ বলিল—'ওষুধটা নিয়ম করে খাওয়াস্। আর শোন্, কাল রাত্রে শুয়োর মেরেছি, সেটা তুই নিয়ে যা। তোরা নিজেরা খাস্ আর গাঁয়ের লোককে বিলোস্।'

শুয়োর দেখিয়া মংলু একগাল হাসিল—'কাউকে বিলোতে পারব না হুজুর, আমরা নিজেরাই খাব। আমার এখন রোজগার নেই।'

পিঠে বৌ এবং হাতে আধ মণ ওজনের শুয়োরটাকে ঝুলাইয়া মংলু অবলীলাক্রমে চলিয়া গেল।

মংলু অন্তর্হিত হইলে বৈজনাথ বলিল—'মংলু বৌটাকে ভালবাসে। মুশহরদের মধ্যে একনিষ্ঠার বালাই নেই, মংলুটা কেমন ছটকে বেরিয়ে গেছে। বৌ নিয়েই আছে। ছোটলোকদের মধ্যে এমন দেখা যায় না।'

জিজ্ঞাসা করিলাম—'বাঁচবে বৌটা?'

বৈজনাথ হাত উল্টাইয়া বলিল—'কিছুই বলা যায় না। হয়তো এমনি ভুগে ভুগেই জীবনটা কাটিয়ে দেবে। মংলুর জন্যে দুঃখ হয়।'

সে যাত্রা আরও দু'দিন থাকিয়া আরও অনেকগুলো হরিণ-শুয়োর মারিয়া ফিরিয়া আসিলাম। তারপর কয়েক বছর নানা পাকচক্রে বৈজুর গ্রামে আর যাইতে পারি নাই। কিন্তু যখনই মুশহরদের গাঁইতি হাতে রাস্তায় কাজ করিতে দেখিয়াছি, তখনই মংলুকে মনে পড়িয়াছে। মংলুর বৌটা এখনও বাঁচিয়া আছে কি না, কে জানে। হয়তো টিকিয়া আছে, মংলু এখনও তাহাকে পিঠে করিয়া ডাক্তার দেখাইতে আসিতেছে। বৈজু বলিয়াছিল, ছোটলোকদের মধ্যে এমন দেখা যায় না। ভদ্রলোকদের মধ্যেও আজ পর্যন্ত কাহাকেও স্ত্রীকে পিঠে করিয়া ডাক্তারের কাছে যাইতে দেখি নাই।

চার বছর পরে আবার একদিন বৈজুর গ্রামে উপস্থিত হইলাম। তেমনি খাসি কাটা রান্নাবান্না পানভোজন চলিল। চাঁদনী রাত ছিল, মধ্য রাত্রে দু'জনে শিকারে গেলাম।

পরদিন সকালে ডাক্তারখানার সামনে তেমনি রুগীর ভিড়। দম্‌মা, পিল্‌হী, বোখার। বৈজু রুগীদের পরীক্ষা করিতেছে, গ্রাম্য ভাষায় গালাগালি দিতেছে, ঔষধ বিতরণ করিতেছে। মাঝে চার বছর কাটিয়া গিয়াছে বোঝা যায় না।

এক সময় চোখ তুলিয়া দেখি, চার বছরের পুরানো চিত্রটি সব দিক দিয়া পূর্ণাঙ্গ হইয়া গিয়াছে। মাঠ ভাঙিয়া মংলু আসিতেছে। পিঠে ময়লা কাপড়-ঢাকা বৌটা চামচিকার মত আঁকড়াইয়া আছে।

রুগীরা তখনও সব বিদায় হয় নাই। মংলু বৌকে সযত্নে নামাইয়া পাশে বসাইল। এই কয় বছরে মংলুর চেহারার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই; তেমনি নিরেট নিটোল কষ্টিপাথরের মূর্তি, মুখে তেমনি মিষ্ট হাসি।

বৌটা এখনও বাঁচিয়া আছে।

বৈজনাথের পুত্র বানারসী ওরফে বন্নু আসিয়া বলিল—'চাচা, দাদি তোমাকে ডাকছেন, হাত দেখাবেন।'

বন্নুর অনুসরণ করিয়া হাবেলিতে গেলাম। বৈজনাথের মা আমাকে স্নেহ করেন, কি করিয়া খবর পাইয়াছেন আমি হাত দেখিতে জানি। প্রত্যেক বারই তাঁহার কর-কোষ্ঠি দেখিতে হয়।

আধ ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখি রুগীরা প্রস্থান করিয়াছে, মংলুও বৌকে পিঠে ঝুলাইয়া মাঠের উপর দিয়া ঘরে ফিরিয়া যাইতেছে।

বৈজু তক্তপোশে বসিয়া গড়গড়া টানিতেছিল, আমার হাতে নল দিয়া বিমনাভাবে বলিল—'গ্রামের জীবনে ওঠা নামা নেই, আজও যেমন, কালও তেমনি। সেই একই মানুষ, একই ব্যারাম, একই জীবনযাত্রা। তুমি চার বছর আগে যা দেখেছিলে, আজও তাই দেখছ, আবার দশ বছর পরে যখন আসবে তখনও তাই দেখবে।'

মংলুর মূর্তি তখন দূরে মিলাইয়া যাইতেছে। আমি বলিলাম—'হয়তো মংলুর বৌটা তখনও বেঁচে থাকবে।'

বৈজু চকিতে আমার পানে চাহিল, তারপর হঠাৎ হাসিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—'হাসলে যে!'

বৈজু বলিল—'তুমি চার বছর আগে যাকে দেখেছিলে, এ সে বৌ নয়। সে বৌটা সেই শীতেই মারা গেছে। তারপর আবার মংলু বিয়ে করেছে; কিন্তু এমন ব্যাটার কপাল, এবারও ঠিক তাই। এখন এটা কদ্দিন টেকে দেখ।'

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'এ বৌকে মংলু ভালবাসে?'

বৈজু বলিল—'ঠিক আগের মতই। বিয়ের পর মাস কয়েক বৌটা ভাল ছিল, তারপর রোগে ধরেছে। মংলুর দাম্পত্য-জীবনে সুখ নেই। হয়তো গ্রহ-নক্ষত্রের দোষ আছে। তোমার জ্যোতিষ শাস্ত্রে কি বলে?'

বলিলাম—'হয়তো মংলুর অষ্টমে মঙ্গল।'

ক ল্প না

চিরযৌবনবাবুর আসল নাম অনেকেই জানেন না, আমাদেরও জানিবার প্রয়োজন নাই। 'চিরযৌবন' তাঁহার সাহিত্যিক ছদ্মনাম। এই নামে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে কীর্তি অর্জন করিয়াছেন।

চিরযৌবনবাবুর বয়স এখন পঞ্চাশের কাছাকাছি। পঁচিশ বছর পূর্বে যে নবীন বিদ্রোহীর দল বাঙলা সাহিত্যে নূতনত্বের বন্যা বহাইয়া দিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদেরই একজন। তারপর বন্যার তোড়ে অনেকেই ভাসিয়া গিয়াছেন; মুষ্টিমেয় যে কয়জন স্বকীয়তার বলে টিকিয়া আছেন, চিরযৌবনবাবু তাঁহাদের অগ্রণী। এখনও তাঁহার লেখায় দুর্দম যৌবনের তেজ ও বিদ্রোহিতা বিচ্ছুরিত হয়। তিনি নামেও যেমন, অন্তরেও তেমনি—চিরযৌবন।

চিরযৌবনবাবু বিপত্নীক। জীবনের মাত্র দুই-তিনটা বছর তাঁহার স্ত্রীসংসর্গ ঘটিয়াছিল, অন্যথা প্রায় সারা জীবনই একাকী কাটিয়াছে। একাকিত্বে তিনি অভ্যস্ত। কলিকাতার একটি মধ্যমশ্রেণীর দেশী হোটেলের ত্রিতলের ছাদে একটিমাত্র ঘর, সেই ঘরটিতে তিনি থাকেন। ঘরটির আসবাবপত্রে দেয়ালের ছবিতে শৌখিনতার ছাপ আছে, যদিও তাহা দুর্মূল্য শৌখিনতা নয়। সাহিত্যজীবী মানুষ অনাড়ম্বরভাবে যতখানি শৌখিনতা করিতে পারে, ততখানিই। হোটেলের ম্যানেজার তাঁহাকে স্থায়ী বাসিন্দারূপে পাইয়া গৌরব অনুভব করেন এবং ভৃত্যেরা তাঁহার আজ্ঞা পালনের জন্য ছুটা-

ছুটি করে। চিরযৌবনবাবু সুখে আছেন।

কখনও গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় সমকালীন সাহিত্যবন্ধুদের সমাগম হয়। খোলা ছাদের উপর মাদুর পড়ে, চা ও সিগারেটের ধোঁয়ায় বাতাস সুরভিত হয়। চিরযৌবনবাবু হয়তো নিজের সদ্য-রচিত গল্প পাঠ করেন। তারপর আবার একাকী। কল্পনার সমুদ্রে যৌবনের স্বপ্নভরা সোনার তরী ভাসিয়া চলে।

সেদিন সন্ধ্যার সময় চিরযৌবনবাবু বেড়াইতে বাহির হইতেছিলেন। ফাল্গুন মাস, কিন্তু এখনও সন্ধ্যার পর একটু ঠাণ্ডা পড়ে। পাটভাঙ্গা সিল্কের পাঞ্জাবির উপর আলোয়ানটা কাঁধে ফেলিয়া তিনি আয়নার দিকে চাহিলেন। ছিমছাম গৌরবর্ণ চেহারা, মুখের চামড়া এখনও কুঞ্চিত হয় নাই, মাথার চুল বারো আনা কাঁচা আছে। তিনি বুরুশ দিয়া চুলগুলিকে আরও চিক্কণ করিয়া তুলিলেন, সরু গোঁফের উপর একবার আঙুল বুলাইলেন। তারপর দ্বারে তালা লাগাইয়া বাহির হইলেন।

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে তাঁহার কণ্ঠে গানের কলি গুঞ্জরিত হইতে লাগিল —বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল-শাখাতে দিস্‌নে আজি দোল—

হোটেলের সদর একটি অপেক্ষাকৃত ছোট রাস্তার উপর; সেখান হইতে কুড়ি পঁচিশ কদম দূরে বড় রাস্তার মোড়। চিরযৌবনবাবু হোটেল হইতে বাহির হইয়া বড় রাস্তার দিকে চলিলেন। মাইল খানেক দূরে একটি পার্ক আছে। সেখানে বেঞ্চির উপর বসিয়া একটি সিগারেট সেবন করিবেন, তারপর আবার বাসায় ফিরিবেন।

তখনো রাস্তার আলো জ্বলে নাই। দিনের আলো মৌমাছি-ছোঁয়া লজ্জাবতী লতার মত মুদিয়া আসিতেছে। চিরযৌবনবাবু মোড় ঘুরিতে গিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িলেন। ঠিক মোড়ের উপর ল্যাম্পপোস্টের নীচে একটি যুবতী দাঁড়াইয়া আছে।

যুবতী চিরযৌবনবাবু অনেক দেখিয়াছেন, আজকাল রাস্তাঘাটে যুবতী দেখার কোনই অসুবিধা নাই। কিন্তু তিনি দাঁড়াইয়া পড়িলেন এবং নির্নিমেষ নেত্রে যুবতীর পানে চাহিয়া রহিলেন।

যুবতীর চেহারা ভাল। রঙ ফরসা, চোখ ও নাক যেমন ধারালো, গাল ও ঠোঁট তেমনি নরম। গড়ন মোটাও নয়, রোগাও নয়, শাঁসে-জলে। ঘাড়ের উপর খোঁপাটি এমনভাবে বাঁধা যেন খুলিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে। পরনে ফিকা নীল রঙের জর্জেট। বুকের কাছে দুই বাহুর মধ্যে বালিশের মত একটি ক্ষুদ্র পুঁটুলি ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং প্রচ্ছন্ন উদ্বেগভরা চোখে এদিক-ওদিক চাহিতেছে।

দুই মিনিট নিষ্পলক চাহিয়া থাকিবার পর চিরযৌবনবাবু সচেতন হইলেন। মেয়েটিও একবার তাঁহাব দিকে ভ্রূ তুলিয়া চাহিয়া অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। আর দাঁড়াইয়া থাকা যায় না, অসভ্যতা হয়। চিরযৌবনবাবু মেয়েটিকে পাশ কাটাইয়া একদিকে চলিতে আরম্ভ করিলেন।

কয়েক পা চলিবার পর কিন্তু তাঁহাকে থামিতে হইল। পিছন হইতে কেহ যেন রাশ টানিয়া ধরিয়াছে। রাস্তায় বেশী লোক ছিল না। চিরযৌবনবাবু কিছুক্ষণ নতচক্ষে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর ফিরিয়া চলিলেন।

মেয়েটি তখনও দাঁড়াইয়া আছে। তাহার দিকে যতই তিনি অগ্রসর হইলেন ততই তাঁহার গতি শিথিল হইতে লাগিল; তারপর অজ্ঞাতসারেই তিনি দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

যুবতী আবার ভ্রূ বাঁকাইয়া তাঁহার পানে চাহিল; তাহার চোখে অস্বাচ্ছন্দ্য ভরা। চিরযৌবনবাবু হঠাৎ চমকিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি যুবতীর উপর আবদ্ধ হইয়া রহিল।

মোড় ঘুরিয়া তিনি হোটেলের দিকে চলিলেন। যাইতে যাইতে একবার ঘাড়

ফিরাইয়া দেখিলেন। যুবতী তাঁহার পানে চাহিয়া ছিল, চোখাচোখি হইতেই চোখ ফিরাইয়া লইল।

হোটেলের দ্বারের কাছে আসিয়া চিরযৌবনবাবুর ঘাড় আবার যুবতীর দিকে ফিরিল। সে এইদিকেই তাকাইয়া আছে। চিরযৌবনবাবুর বুকের ভিতরটা একবার প্রবলভাবে হাঁচোড়-পাঁচোড় করিয়া উঠিল, তিনি হোটেলে প্রবেশ করিলেন।

নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া তিনি দ্বার ভেজাইয়া দিলেন। আলো জ্বালিলেন না, আলোয়ান আলনায় রাখিয়া আরাম-চেয়ারে অর্ধশয়ান হইলেন। আজ মনের এই বিহ্বলতার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। সিগারেট ধরাইয়া তিনি আত্মবিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।

যুবতীটি সুন্দরী বটে। কিন্তু চিরযৌবনবাবু লুচ্চা-লম্পট নয়, তবে তাহাকে দেখিয়া তিনি এমন আত্মবিস্মৃত হইলেন কেন? হয়তো যুবতীর দেহে রূপ ছাড়াও প্রবল জৈব আকর্ষণ আছে। কিম্বা চিরযৌবনবাবুরই দেহে-মনে অনাস্বাদিত যৌবনের রস দীর্ঘকাল ধরিয়া বিন্দু বিন্দু সঞ্চিত হইতেছিল, আজ বসন্ত সমাগমে সহসা উছলিয়া উঠিয়াছে।

যুবতীর বাহুবন্ধনের মধ্যে বালিশের মত জিনিসটা বোধ হয় একটি শিশু।—কার শিশু?

চিরযৌবনবাবুর মন স্বভাবতই কল্পনা-প্রবণ। তাঁহার চিন্তা বাতাসের মুখে সাবান-বুদ্বুদের মত ভাসিয়া চলিল।...

খুট্ খুট্—খুট্ খুট্। দ্বারে কে টোকা দিতেছে।

চিরযৌবনবাবু উঠিয়া দ্বার খুলিলেন। সেই যুবতী দাঁড়াইয়া আছে, বাহুবেষ্টনের মধ্যে কাপড় ঢাকা বালিশের মত পুঁটুলিটি। ভীরু কণ্ঠে বলিল—'আপনি কি চির-যৌবন—বাবু?'

চিরযৌবনবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন—'হ্যাঁ।'

'ভেতরে আসতে পারি?' মেয়েটির গলা কাঁপিয়া গেল।

'আসুন।'

মেয়েটি সঙ্কোচভরে ঘরে প্রবেশ করিল, চিরযৌবনবাবু একটি চেয়ার তাহার দিকে আগাইয়া দিলেন।

সে চেয়ারে বসিল না, ঘরের এক পাশে একটি চৌকি ছিল, তাহার উপর আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিল, পুঁটুলিটিকে কোলে শোয়াইয়া দিয়া মুখ তুলিল।

চিরযৌবনবাবু বলিলেন—'আপনাকে আমি চিনি না। কিন্তু আজ বোধ হয় মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি।'

মেয়েটি ঘাড় কাত করিয়া বলিল—'হ্যাঁ, আপনাকে কিন্তু আমি দেখেই চিনতে পেরেছি। আপনার লেখা আমার খুব ভাল লাগে।'

চিরযৌবনবাবু একটু সলজ্জতার অভিনয় করিলেন, বলিলেন—'তৃপ্তি পেলাম। আপনি কি—?'

'আমাকে আপনি বলবেন না, তুমি বলুন।'

'তা আচ্ছা। বয়সে আমি যখন বড়—'

'এমন কী বড়? আমার বয়স তেইশ।'

চিরযৌবনবাবু নিজের বয়স বলিলেন না, প্রশ্ন করিলেন—'তোমার নাম কি?'

'কল্পনা।'

চিরযৌবনবাবু স্মরণ করিবার চেষ্টা করিলেন, তাঁহার গল্প-উপন্যাসে কল্পনা নামে

কোনও চরিত্র আছে কিনা। না, নাই, নূতন নাম।

'তুমি মোড়ে দাঁড়িয়ে কারুর জন্যে অপেক্ষা করছিলে বুঝি?'

কল্পনা মুখ নত করিল, তাহার কপাল ও গাল দুটি ধীরে ধীরে রক্তিমাভ হইয়া উঠিল। চিরযৌবনবাবু বুকের কাছে সূচীবিদ্ধবৎ একটু জ্বালা অনুভব করিলেন।

'স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করছিলে?'

কল্পনা চকিতে চোখ তুলিয়া আবার নত করিল।

'আমার বিয়ে হয়নি।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর চিরযৌবনবাবু লক্ষ্য করিলেন, কল্পনার কোলে বস্ত্র-পিণ্ডটি অল্প অল্প নড়িতেছে, একটি শীর্ণ কাকুতি শোনা গেল।

'বাচ্ছাটির বয়স কত?'

'দশ দিন।'

'দশ দিন!—এ—কার বাচ্ছা?'

কল্পনা বিদ্রোহভরা সুরে বলিল—'আমার।'

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। শিশু পুনশ্চ আকুতি জানাইল। চিরযৌবনবাবু বলিলেন—'ওর বোধহয় ক্ষিদে পেয়েছে।'

কল্পনা বলিল—'হ্যাঁ, ক্ষিদে পেলে উসখুস করে।'

'তা—ওকে কিছু খেতে দেওয়া দরকার। কি দেবে? আমার ঘরে টিনের দুধ আছে।'

'এখনও টিনের দুধ খেতে শেখেনি।'

কল্পনা চিরযৌবনবাবুর দিকে পিছন ফিরিয়া বসিল। তিনি ক্ষণেক বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া লইলেন।

দশ মিনিট পরে কল্পনা আবার সামনে ফিরিয়া বসিল। পূর্ণোদর শিশু আর কোনও গণ্ডগোল করিল না।

চিরযৌবনবাবু একটু কাশিয়া বলিলেন—'তুমি কেন আমার কাছে এসেছ বললে না তো। কিছু চাই কি?'

কল্পনা ব্যগ্র চক্ষে চাহিয়া বলিল—'চাই। আজ রাত্রির জন্যে আমাদের আশ্রয় দিতে হবে।'

'তা—তোমার কি আর কোথাও যাবার নেই?'

'না। শুনবেন আমার ইতিহাস? নতুন কিছু হয়তো নয়, কিন্তু শুনলে আপনি বুঝবেন। আমি জানি যৌবনের স্বভাবধর্মকে আর যে যাই বলুক, আপনি কখনও অপরাধ বলে মনে করবেন না।'

চিরযৌবনবাবু দৃঢ়স্বরে বলিলেন—'না, যৌবনের স্বধর্মকে আমি অপরাধ বলে মনে করি না। বরং যারা যৌবনকে জোর করে পীড়ন করতে চায়, অপরাধী তারাই।'

কল্পনা প্রদীপ্ত চক্ষে বলিল—'তাই তো আপনার লেখা এত ভালবাসি—আপনি চিরযৌবন। এখন আমার ইতিহাস বলি। এই কলকাতা শহরেরই মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের মেয়ে আমি। ঘরে সৎমা আছেন। বিয়ে দেবার পয়সা বাবার নেই, তাই লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন।

'একজনকে ভালবেসেছিলাম। ভালবাসা বলতে ঠিক কি বোঝায় তা হয়তো মনস্তত্ত্ব-বিদেরা জানেন। তার কতখানি দৈহিক আকর্ষণ, কতখানি মানসিক, তা বিচার করার মত বুদ্ধি আমার নেই। বোধ হয় ডি এল রায়ের কথাই ঠিক—যখন থাকে না future-এর চিন্তা থাকে না ক' shame, তারেই বলে প্রেম। আমারও সাময়িকভাবে সেই অবস্থা হয়েছিল। বিয়ে হবার উপায় ছিল না, জাতের তফাত। লুকিয়ে লুকিয়ে

আমাদের দেখা হ'ত। একবার স্বামী-স্ত্রী সেজে একরাত্রি একটা হোটেলে ছিলাম। তারপর—

'সৎমা জানতে পারলেন, বাবার কানে উঠল। আমার তখন future-এর চিন্তা ফিরে এসেছে, প্রেমাস্পদকে বললাম—আমাকে বাঁচাও। উত্তরে প্রেমাস্পদ তার বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্র আমার হাতে দিল। তাকে দোষ দিই না। কারণ বিয়ের কথা তার সঙ্গে কোনও দিন হয়নি।

'তারপর যথাসময়ে বাবা আমাকে মেটার্নিটি হোমে ভর্তি করে দিয়ে বলে গেলেন—আর বাড়িতে ফিরে যেও না।

'তারপর আজ দশ দিন পরে মাতৃত্বের নিদর্শন নিয়ে মাতৃসদন থেকে বেরিয়েছি!'

কল্পনা চুপ করিল। চিরযৌবনবাবু সিগারেট ধরাইয়া নীরবে টানিতে লাগিলেন। পাঁচ মিনিট পরে সিগারেটের টোটা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—'আজ মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে ছিলে কেন? মনে হচ্ছিল কারুর জন্যে অপেক্ষা করছ।'

কল্পনা বলিল—'না। মোড়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম আমার মত মেয়েকে আশ্রয় দিতে পারে এমন কেউ রাস্তা দিয়ে যায় কিনা। তারপরেই আপনাকে দেখতে পেলাম। আপনার অনেক ছবি দেখেছি, চিনতে কষ্ট হল না। ভাবলাম, একটা রাত্রির জন্যে যদি কেউ আশ্রয় দিতে পারে তো সে আপনি। তাই এসেছি। দেবেন আশ্রয়?'

চিরযৌবনবাবু উঠিয়া গিয়া কল্পনার কাঁধের উপর হাত রাখিলেন—'শুধু এক রাত্রির জন্যে নয়, সারা জীবনের জন্যে যদি আশ্রয় চাও, তাও দিতে পারি।'

কল্পনা ঊর্ধ্বমুখী হইয়া বিভক্ত ওষ্ঠাধরে চাহিল—'সত্যি বলছেন?'

চিরযৌবনবাবু হৃদয়ের দ্রুত স্পন্দন দমন করিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—'হ্যাঁ। কিন্তু আমার বয়স হয়েছে—'

উদ্দীপ্তকণ্ঠে কল্পনা বলিল—'কে বলে বয়স হয়েছে? আপনি চিরযুবা—চির-নবীন—'

ঠক্ ঠক্! ঠক্ ঠক্—!

রূঢ় শব্দে চিরযৌবনবাবু ধড়মড় করিয়া ইজি-চেয়ারে উঠিয়া বসিলেন। কেহ দ্বারের কড়া নাড়িতেছে। তাঁহার কল্পনার সাবান-বুদ্বুদ এই শব্দের আঘাতে ফাটিয়া গেল।

আলো জ্বালিয়া তিনি দ্বার খুলিলেন।

সামনে দাঁড়াইয়া আছে সেই যুবতী যাহাকে ঘিরিয়া তিনি এতক্ষণ কল্পনার জাল বুনিতেছিলেন। সঙ্গে এক যুবা। প্যাণ্টুলুনের উপর পুল-ওভার; ডাম্বেলভাঁজা চেহারা। চোখে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি।

যুবতীর বুকের কাছে কাপড়ের পুঁটুলি; সে এক হাত মুক্ত করিয়া চিরযৌবনবাবুর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল—'এই বুড়োটা!'

যুবক উগ্রস্বরে বলিল—'কি রকম জানোয়ার তুমি হে! বুড়ো হয়েছ এখনও ভদ্রতা শেখোনি? ভদ্রমহিলা একলা রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন আর তুমি ড্যাম্ স্কাউণ্ড্রেল—'

মহিলা বলিলেন—'আমার পম্‌পম-এর অসুখ করেছে তাই, নইলে কুকুর লেলিয়ে দিতুম।'

পম্‌পম্ নামধারী ক্ষুদ্র কুকুর নিজের নাম শুনিয়া যুবতীর বাহুবদ্ধ বস্ত্রপিণ্ডের ভিতর হইতে ঝাঁকড়া মাথা তুলিল, চিরযৌবনবাবুকে ধমক দিয়া বলিল—'ভুক্ ভুক্—'

চিরযৌবনবাবু অভিভূতের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই সময় হোটেলের ম্যানেজার

উপরে আসিয়া বলিলেন—'কি হয়েছে মশাই? কি হয়েছে—?'

যুবক বলিল—'এই বুড়োটা! আমার স্ত্রীকে অপমান করেছে। আমার কুকুরটার অসুখ করেছিল, তাই আমার স্ত্রী তাকে নিয়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। আমার অফিস থেকে ফিরতে দেরি হচ্ছিল, ইতিমধ্যে এই বুড়োটা—' যুবক চিরযৌবনবাবুর দিকে ঘুষি পাকাইয়া বলিল—'বুড়ো বলে বেঁচে গেলে, নইলে আজ ঠেঙিয়ে পাট করে দিতুম।'

ম্যানেজার বলিলেন—'হাঁ হাঁ, বলেন কি, উনি একজন বিখ্যাত—'

যুবক বলিল—'ড্যাম্ বিখ্যাত।—ডোম চামার লোচ্চা—'

চিরযৌবনবাবু আর সহ্য করিতে পারিলেন না। সশব্দে দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন।

ঘর অন্ধকার করিয়া তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। ওই বুড়োটা! ওই বুড়োটা! ওই বুড়োটা!—তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল। তিনি বুড়া হইয়াছেন, সকলেই তাহা দেখিতে পাইতেছে। অথচ—প্রকৃতির এ কি পরিহাস! তাঁহার মন বুড়া হয় নাই কেন? মন কেন এখনও সরস সজীব আছে, যৌবনের রঙীন নেশায় বিভোর হইয়া আছে?

কেন? কেন? এ কি দুর্বিষহ বিড়ম্বনা!

কানু কহে রাই

ছোটনাগপুরের একটি বড় শহর হইতে যে পাকা রাস্তাটি ষাট মাইল দূরের অন্য একটি বড় শহরে গিয়াছে সেই রাস্তা দিয়া একটি মোটর গাড়ি চলিয়াছে। শীতান্তের অপরাহ্ণ, বেলা আন্দাজ তিনটা। রাস্তার দু'পাশে অসমতল জঙ্গল, কোথাও ঘন কোথাও বিরল, দূরে দূরে পাহাড়ের ন্যুব্জপৃষ্ঠ দেখা যায়। দৃশ্যটি নয়নাভিরাম, বাতাসের আতপ্ত শুষ্কতা স্পৃহণীয়।

মোটর মন্দগতিতে চলিয়াছে, ত্বরা নাই। স্টীয়ারিঙের উপর দুই অলস বাহু রাখিয়া মোটর চালাইতেছে একটি যুবতী। পরিণত-যৌবনা, বয়স অনুমান পঁচিশ। মুখের স্বাভাবিক সৌন্দর্যের উপর প্রসাধনের নৈপুণ্য মুখখানিকে আরও চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিয়াছে। চোখে হরিদাভ মোটর-গগ্‌ল্, পরিধানে কাশ্মীরী পশমের শাড়ি ও ব্লাউজ। সর্বোপরি সর্বাঙ্গ জড়াইয়া একটি আমন্থর আত্ম-প্রসন্নতা।

যুবতীর নাম মমতা। মোটর যে-শহরের দিকে চলিয়াছে, সেই শহরের ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার ভৌমিক তাহার স্বামী। সে যে-শহর হইতে ফিরিতেছে সেখানে তাহার মামার

বাড়ি, সে মামার বাড়িতে কয়েক দিনের জন্য বেড়াইতে গিয়াছিল, এখন স্বামিগৃহে ফিরিতেছে।

তাহার পাশে বসিয়া আছে তাহার মামাতো বোন সতী। বয়সে তাহার চেয়ে বছর তিনেকের ছোট, দেখিতে তাহার মত সুন্দরী নয়, কিন্তু শ্রী আছে। চোখদুটি চপল, অধর চটুল; সহজেই হাসিতে পারে। বেশভূষার বিশেষ পার্থক্য নাই, প্রসাধনের মধ্যে ভ্রূর মাঝখানে সিঁদুরের টিপ, গালে রুজের একটু আভাস। সতীর বাবা লন্ডনে হাই কমিশনারের অফিসে বড় চাকুরে; সতী সেই সূত্রে দুই বছর বিলাতে ছিল, সম্প্রতি ফিরিয়াছে। বর্তমানে সে মমতার সঙ্গে ভগিনীপতির গৃহে বেড়াইতে যাইতেছে।

গাড়িতে আর কেহ নাই। পিছনের আসনে দু'জনের ফার্ কোট, হ্যান্ডব্যাগ, দুটা বিলাতী কম্বল; গাড়ির পশ্চাদ্ভাগে খোলের মধ্যে দুটা স্যুটকেস ইত্যাদি।

গাড়ি স্বচ্ছন্দ গমনে চলিয়াছে। দুই বোনে বিশ্রম্ভালাপ করিতেছে; সতীই বেশী কথা বলিতেছে, মমতা সায় উত্তর দিতেছে।

সতী একসময় বলিল—'আমিই কেবল বলে চলেছি, তুই চুপটি করে আছিস। এবার তুই কথা বল, আমি শুনি।'

মমতা আলস্যভরে বলিল—'আমার বলার কিছু থাকলে তো বলব। তুই দু'বছর বিলেতে থেকে এলি, কত নতুন জিনিস দেখলি, তা বিলেতের কথা তো কিছুই বলছিস না।'

সতী বলিল—'কি বলব? বিলেত দেশটা মাটির, মানুষগুলো আমাদেরই মত, কেবল রঙ কটা।'

'আর কিছু বলবার নেই?'

'বলবার অনেক আছে, কিন্তু সেগুলো প্রশংসার কথা নয়। বিচ্ছিরি দেশ ভাই, আমার একটুও ভাল লাগেনি। এত মানুষ চারিদিকে যে মনে হয় যেন গিজগিজ করছে, একটু নিরিবিলি নেই কোথাও।'

'তা সভ্য দেশে মানুষ থাকবে না তো কি বাঘ ভাল্লুক থাকবে? আমি তো বাপু মানুষ না হলে একদণ্ড টিকতে পারি না, প্রাণ পালাই পালাই করে।'

সতী হাসিল—'তোর কথা আলাদা, তুই হলি সভ্য মানুষ। আমি একটু জংলি আছি। মানুষের সঙ্গ যে একেবারে ভাল লাগে না তা নয়, কিন্তু নিরিবিলিও চাই। এই দ্যাখ দেখি কি সুন্দর দেশের ভেতর দিয়ে আমরা চলেছি। কোথাও মানুষের চিহ্ন নেই; মাথার ওপর সূর্য, মিঠেকড়া বাতাস, চারিদিকে জঙ্গল। এমন দৃশ্য বিলেতে কোথাও নেই।'

মমতা বলিল—'গরম পড়ুক তখন এ দৃশ্যের চেহারা বদ্‌লে যাবে।'

সতী বলিল—'তা বদ্‌লাক। মাগো, বিলেতে কি ঋতু বলে কিছু আছে? শুধু হাড়ভাঙা শীত আর পচা বর্ষা। দ্যাখ দেখি আমাদের দেশ! শীত গেলেন তো এলেন ঋতুরাজ বসন্ত। তারপর এলেন গ্রীষ্ম, আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দশদিক শুদ্ধ করে নিলেন। গ্রীষ্মের পর বর্ষা এসে সব কালিঝুলি ধুয়ে দিয়ে গেলেন। অমনি এল সোনার শরৎ, তারপর হিমের আমেজ নিয়ে হেমন্ত। তারপর আবার শীত। কী সুন্দর বল দেখি, যেন ছটা ঋতু এস্রাজের তারের ওপর সা রে গা মা সাধছে।'

মমতার ঠোঁটের কোণ একটু অবনত হইল—'তোর কবিত্ব রোগ এখনও সারেনি দেখছি।'

সতী হাসিয়া উঠিল—'ও সারবার নয়। কিন্তু সত্যি বলছি দিদি, বিলেতে দু'বছর ছিলুম, একটাও কবিতা লিখিনি। যখন বড্ড মন খারাপ হত তখন ঘরে দোর বন্ধ করে

গান গাইতুম।'

'কি গান গাইতিস?'

'গাইতুম—ধনধান্যপুষ্পভরা—, গাইতুম—কোন্ দেশেতে তরুলতা—, গাইতুম—কানু কহে রাই—'

মমতা চকিত বিস্ফারিত চক্ষে চাহিল—'কানু কহে রাই—?'

সতী হাসিভরা মুখে খানিক মমতার পানে চাহিয়া রহিল, তরলকণ্ঠে বলিল—'হ্যাঁ। —কেন, ও গান কি বিলেতে গাইতে নেই?'

মমতা একটু গম্ভীর হইয়া রহিল, শেষে বলিল—'যা বলিস, গানটা কেমন যেন চাষাড়ে গোছের।'

সতী বলিল—'তা তো হবেই। চণ্ডীদাস যে চাষা ছিলেন। ধোপানীকে নিয়ে কি কাণ্ডটাই করেছিলেন। কিন্তু গানটি ভারি মিষ্টি ভাই।'

'আমার একটুও ভাল লাগে না। ড্রয়িংরুমে ও গান চলে না।' একটু নীরব থাকিয়া বলিল—'ওই গান গেয়েছিল বলে একজনকে বিয়ে করিনি।'

সতীর চোখে উত্তেজনাপূর্ণ কৌতূহল নৃত্য করিয়া উঠিল—'ওমা, তাই নাকি! আমি তো কিছু জানি না। বিলেত যাবার মাস কয়েক পরে খবর পেলুম তোর বিয়ে হয়েছে। কী হয়েছিল বল না ভাই।'

মোটর একটানা গুঞ্জন করিতে করিতে চলিয়াছে। মমতা ত্বরাহীন কণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিল—'দু'বছর আগেকার কথা, তুই তখন সবে বিলেত গিয়েছিস। কলকাতার বাড়িতে রোজ সন্ধ্যেবেলা চার পাঁচটি যুবা পুরুষের আবির্ভাব হয়, কেউ মিলিটারি ক্যাপ্টেন, কেউ সিভিলিয়ান, কেউ শুধুই অভিজাত-বংশের ছেলে। আমার কিন্তু কাউকেই ঠিক পছন্দ হচ্ছে না। বাবার ইচ্ছে ক্যাপ্টেনটিকে বিয়ে করি, মা'র ইচ্ছে চীফ্-সেক্রেটারীর অ্যাসিস্টাণ্ট্কে। আমি কিছু ঠিক করতে পারছি না; এমন সময় একজন এলেন। নূতন লোক, কলকাতায় থাকেন না, মাঝে মাঝে আসেন। শিক্ষিত, চেহারা ভাল, দেখে মনে হয় সিভিলাইজ্ড্ মানুষ। নাম মৌলিনাথ।'

সতী বলিল—'তুই বুঝি প্রেমে পড়ে গেলি?'

মমতা বলিল—'একটু একটু।'

সতী বলিল—'প্রেমে আবার একটু একটু পড়া যায় নাকি?'

'যায়! মনের জোর থাকা চাই।—তারপর শোন। বেশ ভাব হয়ে গেল। মা বাবারও পছন্দ। বিয়ে প্রায় ঠিক হয়ে গেল। একদিন বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে, মা'র ইচ্ছে ডিনারের পর এন্‌গেজমেণ্ট অ্যানাউন্স করবেন। ডিনারের আগে ড্রয়িংরুমে সবাই জড়ো হয়েছে। একজন অতিথি প্রশ্ন করলেন—মৌলিনাথবাবু, আপনি গান গাইতে জানেন? তিনি বললেন—জানি সামান্য। সবাই ছেঁকে ধরল, একটা গান করুন। তিনি বললেন—আমি পিয়ানো বাজাতে জানি না, সাদা গলায় গাইছি। এই বলে মেঠো সুরে গান ধরলেন—কানু কহে রাই!'

সতী কৌতুক-বিহ্বল কণ্ঠে বলিল—'তারপর?'

'আমার মাথায় বজ্রাঘাত। অতিথিরা গা টেপাটেপি করে হাসছে। এ যেন একটা বোষ্টম ভিখিরি ড্রয়িংরুমে ঢুকে পড়েছে। আমি মা'কে গিয়ে বললুম, আজ এন্‌গেজমেণ্ট অ্যানাউন্স কোরো না।—মৌলিনাথবাবু বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন। ডিনারের পর আমাকে আড়ালে ডেকে বললেন—একটা কথা আপনাকে বলা হয়নি। আমার এখন যে রূপ দেখছেন এটা আমার ছদ্মবেশ, আসলে আমি অসভ্য মানুষ, বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই। শহরে লোকজনের মধ্যে বেশী দিন থাকতে পারি না। আমাকে যিনি বিয়ে

করবেন তাঁকে বনে জঙ্গলেই থাকতে হবে। আমি বললুম—তাহলে এক কাজ করুন, একটি সাঁওতালের মেয়ে বিয়ে করুন। তিনি বললেন—আপনি ঠিক বলেছেন, আচ্ছা নমস্কার।—বলে সোজা বেরিয়ে গেলেন।'

সতী বলিল—'ভারি আশ্চর্য মানুষ তো! তারপর আর ফিরে আসেননি?'

মমতা বলিল—'না। এলেও আমি দেখা করতুম না। এই ঘটনার কয়েকদিন পরে ইনি এলেন।'

'ইনি কে? ম্যাজিস্ট্রেট সায়েব?'

'হ্যাঁ। এক মাসের মধ্যে বিয়ে হয়ে গেল।'

সতী একটি গভীর নিশ্বাস ফেলিল, বলিল—'নাটক বিয়োগান্ত কি মিলনান্ত বুঝতে পারছি না। দিদি, তোর মনে একটুও আপ্‌সোস নেই?'

মমতা দৃঢ় ওষ্ঠাধরে বলিল—'একটুও না। আমি যা চেয়েছি হাজারটার মধ্যে তাই বেছে নিয়েছি।'

সতী কিছুক্ষণ বিমনা থাকিয়া বলিল—'ম্যাজিস্ট্রেট সায়েবকে ভালবাসিস?'

মমতা বলিল—'স্বামীকে যতটা ভালবাসা উচিত ততটা ভালবাসি। আর কি চাই?'

কিছুক্ষণ আর কোনও কথা হইল না। গাড়ি চলিয়াছে। সূর্যের রঙ ঘোলা হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

হঠাৎ মোটরটা গোলমাল আরম্ভ করিল। এতক্ষণ বেশ অনাহতছন্দে চলিয়াছিল, এখন দু'চার বার হেঁচ্‌কা দিয়া চলিতে চলিতে শেষে ইঞ্জিন বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। দুই বোন শঙ্কিত দৃষ্টি বিনিময় করিল।

সতী বলিল—'এই মজিয়েছে।'

গাড়িকে সচল করিবার চেষ্টা সফল হইল না। মমতা বলিল—'বোধহয় কারবুরেটারে ময়লা ঢুকেছে।'

সতী বলিল—'স্পার্কিং প্লাগও হতে পারে।'

মমতা জিজ্ঞাসা করিল—'তুই মেরামতের কিছু জানিস?'

'কিছু না। তুই?'

'আমিও না। সব দোষ ওই হতভাগা ওসমানের! ওকে বলে দিয়েছিলুম গাড়ির কলকব্জা সব দেখেশুনে রাখতে, তা এই করেছে! দাঁড়াও না, আজ বাড়ি গিয়েই ওকে বিদেয় করব।'

'সে তো পরের কথা। এখন বাড়ি পৌঁছুবার উপায় কি?' সতী গাড়ি হইতে নামিল।

মমতা বলিল—'উপায় তো কিছু দেখছি না। এক যদি এ রাস্তায় মোটর যায় তবে লিফ্‌ট পাওয়া যাবে। কিন্তু এ রাস্তায় যে ছাই মোটরও বেশী চলে না।'

মমতা গাড়ি হইতে নামিল, চশমা খুলিয়া অত্যন্ত বিরক্তভাবে চারিদিকে চাহিল। 'জঙ্গলের মধ্যে আজ রাত কাটাতে হবে দেখছি।'

সতী প্রশ্ন করিল—'শহর এখান থেকে কত দূর?'

মমতা মাইল মিটার দেখিয়া হিসাব করিয়া বলিল—'দশ-এগারো মাইল।'

সতীর চোখে একটা নূতন আইডিয়ার ছায়া পড়িল, সে বলিল—'দশ-এগারো মাইল! তা আয় না এক কাজ করি। এখনও বেলা আছে, এখন থেকে হাঁটতে শুরু করলে সন্ধ্যে হতে হতে শহরে পেঁছে যাব। কি বলিস?'

মমতা রাস্তার ধারে একটা পাথরের চ্যাঙড়ের উপর বসিয়া পড়িল—'আমাকে কেটে ফেললেও আমি এগারো মাইল হাঁটতে পারব না।'

সতী আর একটা চ্যাঙড়ের উপর বসিল—'তবে তো মুস্কিল। অন্য মোটর যদি না আসে এইখানেই রাত্রিবাস করতে হবে। জঙ্গলে নিশ্চয় বাঘ ভাল্লুক আছে, আমাদের গন্ধ পেয়ে বেরিয়ে আসবে। নাঃ, আজ বেঘোরে প্রাণটা গেল।'

মমতা দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিল। সতী ছটফট করিয়া বেড়াইতে লাগিল। একবার উঠিয়া একবার বসিয়া মোটরের কলকব্জা নাড়াচাড়া করিয়া অবশেষে আবার চ্যাঙড়ে আসিয়া বসিল।

'দিদি, তোর ক্ষিদে পায়নি?'

মমতা চোখ তুলিল—'তেষ্টা পেয়েছে।'

'আমার পেট চুঁই চুঁই করছে। সঙ্গে খাবার কিছু আছে নাকি?'

'উঁহু। মামীমা দিতে চেয়েছিলেন, নিলুম না। ভেবেছিলুম চারটের মধ্যে বাড়ি পৌঁছে চা খাব।'

'হুঁ।' সতী বনের পানে চাহিয়া রহিল।

দশ মিনিট এইভাবে কাটিবার পর সতী হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—'ও দিদি, দ্যাখ্ দ্যাখ্—ধোঁয়া!'

মমতা চোখ তুলিল। বনের মধ্যে আন্দাজ সিকি মাইল দূরে তরুশ্রেণীর মাথায় ধোঁয়ার একটা স্তম্ভ ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বে উঠিতেছে।

সতী বলিল—'নিশ্চয় ওখানে সাঁওতালদের বস্তি আছে।—চল যাই। আর কিছু না হোক জল তো পাওয়া যাবে।'

মমতা বলিল—'যদি বস্তি না হয়! যদি জঙ্গলে আগুন লেগে থাকে?'

'দূর! আগুন লাগলে কি অমন তালগাছের মত সোজা ধোঁয়া ওঠে। আয়—আয়—'

'কিন্তু—মোটর এখানে পড়ে থাকবে?'

'তোর ভাঙা মোটর কেউ চুরি করবে না। আয়।'

'এখনি কিন্তু ফিরে আসব। রাত্তিরে আমি বনের মধ্যে থাকছি না। মোটরের কাচ তুলে সারা রাত্তির বসে থাকব সেও ভাল।'

'ভাবিসনি একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই।'

দুজনে গাড়ির ভিতর হইতে হ্যান্ডব্যাগ লইয়া গাড়ি লক করিয়া বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। বন ক্রমশ ঘন হইয়াছে বটে কিন্তু অন্ধকার নয়। জমি উঁচু নীচু এবং শিলামিশ্রিত, মাঝে মাঝে নালার মত খাঁজ পড়িয়াছে। দশ মিনিট হাঁটিবার পর তাহারা ধোঁয়ার উৎস মুখে উপস্থিত হইয়া হাঁ করিয়া দাঁড়াইল।

সাঁওতালদের বস্তি নয়। একটি মাত্র গৃহ। তাহাও এমন বিচিত্র যে মনে হয় ব্রহ্ম বা শ্যামদেশের জঙ্গলে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

বিঘাখানেক মুক্ত স্থান বড় বড় মহীরুহ দিয়া বেষ্টিত। মাঝখানে চত্বরের মত একটি প্রস্তরপট্ট। প্রস্তরপট্টের সম্মুখে কয়েকটি ঘনসন্নিবিষ্ট গাছের মাথা কাটিয়া কেবল স্তম্ভের মত কান্ডগুলিকে রাখা হইয়াছে, সেই স্তম্ভগুলির মাথায় কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো একটি ঘর। ঘরটি মাটি হইতে দশ-বারো হাত উচ্চে, মই দিয়া উঠিতে হয়। মইটি ঘরের দ্বারের সম্মুখে লাগানো আছে।

ঘরে জনমানব আছে বলিয়া মনে হইল না। কিন্তু প্রস্তরপট্টের উপর আগুন জ্বলিতেছে, তার উপর পাথরের ঝিঁকে বসানো একটি প্রকান্ড জলের কেট্লি।

সতী কিছুক্ষণ চক্ষু গোলাকার করিয়া দেখিল, তারপর করতালি দিয়া হাসিয়া উঠিল—'দিদি! হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? জাপানী রূপকথা! আমরা এক দৈত্যের আস্তানায় এসে পড়েছি। দেখছিস না কত বড় কেট্লিতে চা গরম হচ্ছে।'

মমতা বলিল—'হুঁ। কিন্তু দৈত্যটি কোথায়?'

সতী বলিল—'নিশ্চয় মানুষ শিকার করতে গেছে, চায়ের সঙ্গে খাবে। কিম্বা—হয়তো জাপানী দৈত্য নয়, আমাদের কুম্ভকর্ণ; ঘরে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে।—দেখব নাকি?'

সতী উৎসাহে মাতিয়া উঠিয়াছে, অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া মইয়ের সাহায্যে তর্ তর্ করিয়া উপরে উঠিয়া গেল; মইয়ের সর্বোচ্চ ধাপে উঠিয়া দ্বারের ভিতর উঁকি দিয়ে সে কলকূজন করিয়া উঠিল—'ও দিদি, শীগ্গির আয়, দেখবি আয় কি সুন্দর সাজানো ঘর!'

মমতা মইয়ের নীচে হইতে উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিল—'কেউ আছে নাকি?'

'কেউ না।' মমতা তবু ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া বলিল—'তোর কি মই বেয়ে উঠতে ভয় করছে নাকি?'

মমতা আর দ্বিধা করিল না, উপরে উঠিল। দুই বোন ঘরে প্রবেশ করিল।

টঙের উপর ঘরটি সমচতুষ্কোণ। তক্তার মেঝে, তক্তার দেওয়াল। তিনটি দেওয়ালে জানালা। মেঝের একপাশে বিছানা, বিছানার পাশে ভাল্লুকের চামড়ার উপর কয়েকটি বই। ঘরের অন্য পাশে দেওয়াল ঘেঁষিয়া সারি সারি গৃহস্থালীর দ্রব্য সাজানো; বড় বড় টিনে চাল ডাল, একটি জলের কলসী, থালা বাটি গেলাস, চায়ের প্যাকেট, বিস্কুটের টিন, প্রাইমাস স্টোভ, হ্যারিকেন লণ্ঠন ইত্যাদি। দেওয়ালের গায়ে সমতল ভাবে টাঙানো একটি রাইফেল ও একটি ছর্রা বন্দুক। পরিমিত আরাম ও নিরাপত্তার সহিত জঙ্গলে বাস করিতে হইলে সভ্য মানুষের যাহা যাহা প্রয়োজন সবই আছে।

চমৎকৃত চক্ষে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে সতী বলিল—'কি সুন্দর ঘর দিদি! আমার যদি এমন একটা ঘর থাকত আমি রাতদিন এই ঘরেই থাকতুম, একটিবার নীচে নামতুম না।'

মমতা কহিল—'জলের কলসী রয়েছে দেখছি, একটু খেলে হত।'

'খা না।—এই নে।' কলসী হইতে জল গড়াইয়া সতী মমতাকে দিল, তারপর বিস্কুটের টিন হইতে একমুঠি বিস্কুট লইয়া একটিতে কামড় দিল. অন্য বিস্কুটগুলি মমতার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল—'খাসা বিস্কুট—এই নে।'

মমতা বলিল—'পরের বিস্কুট না বলে খেতে নেই, রেখে দে।'

সতী বলিল—'তোর সব তাতেই আদব কায়দা। গৃহস্বামী যত বড় দৈত্যই হোন, দুটি অভুক্ত অতিথিকে নিশ্চয় খেতে দিতেন। নে—খা। (মমতা একটি বিস্কুট লইল) আয় বসি।'

'বসব কোথায়? চেয়ার কৈ?'

'ঐ তো বিছানা রয়েছে।'

'না।'

'কেন, পরপুরুষের বিছানায় বসলে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব রাগ করবেন? তবে আমিই বসি, আমার তো রাগ করবার লোক নেই।'

সতী বিছানার প্রান্তে হাঁটু তুলিয়া বসিল। মমতা দাঁড়াইয়া টিয়া পাখির মত বিস্কুটের কোণ ঠুকরাইতে লাগিল।

দু'খানা বই মাথার বালিশের পাশে পড়িয়া ছিল, সতী একটা বইয়ের পাতা উল্টাইয়া বলিয়া উঠিল—'ও দিদি—সঞ্চয়িতা। দৈত্য কবিতা পড়ে!—এটা কি বই দেখি —ও বাবা, মহাভারতের সারানুবাদ! আমাদের দৈত্য দেখছি ভারি শিক্ষিত দৈত্য।'

মমতা বলিল—'এবার চল, গাড়িতে ফিরে যেতে হবে। সন্ধ্যে হতে আর বেশী দেরি

নেই।'

'আর একটু বসবি না? দৈত্য হয়তো এখনি ফিরে আসবে।'

'না—চল।'

সতী অনিচ্ছাভরে উঠিল—'আর একটু থেকে গেলে হত, হয়তো দৈত্য মোটর ইঞ্জিন মেরামত করতে জানে। সেকালে ময়-দানব কত বড় ইঞ্জিনীয়র ছিল জানিস তো।'

মমতা বলিল—'জঙ্গলে টঙ্ বেঁধে থাকে, সে আবার মোটর মেরামত করবে। আয়, নীচে যাই।'

মই দিয়া উপরে ওঠা যত সহজ নীচে নামা তত সহজ নয়। দু'জনে অতি সন্তর্পণে নামিল। মমতা হাঁফ ছাড়িয়া বলিল—'বাঁচলুম।'

সতী চারিদিকে লুব্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া ফিরিয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইয়াছে এমন সময় বাধা পড়িল। জঙ্গলের ভিতর হইতে কে উচ্চৈঃস্বরে গাহিয়া উঠিল—

'কানু কহে রাই—'

আচম্‌কা গানের শব্দে দুই ভগিনী পরস্পর হাত চাপিয়া ধরিল। গান দ্রুত কাছে আসিতেছে—

—'কহিতে ডরাই
ধবলী চরাই মুই।'

সতী রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করিল—'দিদি—?'

মমতা ফ্যাকাসে মুখে বলিল—'মনে হচ্ছে মৌলিনাথবাবুর গলা—'

এইবার দেখা গেল ঘন গাছপালার চক্র অতিক্রম করিয়া একটি লোক আসিতেছে। তাহার সঙ্গে একটি শ্বেতবর্ণ গাভী। গরুর দড়ি ধরিয়া লোকটি আসিতেছে; পরিধানে হাফ-প্যাণ্ট ও গরম খাকি শার্ট, পায়ে হাঁটু পর্যন্ত হোস্ ও বুটজুতা। সে মনের আনন্দে তারস্বরে গাহিতেছে—

'আমি রাখালিয়া মতি কি জানি পিরিতি
প্রেমের পসরা তুই।'

হঠাৎ লোকটির গান থামিল, সে দাঁড়াইয়া পড়িল; গরুর দড়ি তাহার হাত হইতে খসিয়া পড়িল। তারপর সে দ্রুত অগ্রসর হইয়া মমতা ও সতীর সম্মুখে দাঁড়াইল।

সতী দেখিল লোকটি সুপুরুষ, মুখের গঠন সুন্দর এবং দৃঢ়, বলিষ্ঠ আয়ত দেহ। মাথার চুলে কদম-ছাঁট, কিন্তু সেজন্য তাহার মুখ শ্রীহীন হয় নাই, বরং করোটির সুন্দর অস্থি-গঠন আরও পরিস্ফুট হইয়াছে। সতী মনের মধ্যে একটা শিহরণ অনুভব করিল। এই মৌলিনাথ, যাহাকে মমতা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল।

মৌলিনাথ বলিল—'আপনারা—'

সতী এক নিশ্বাসে বলিল—'আমরা মোটরে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলুম, মোটর খারাপ হয়ে গেছে। রাস্তার ধারে বসেছিলুম, আপনার ধোঁয়া দেখে এখানে এসেছি। আপনার ঘরে ঢুকেছিলুম—বিস্কুট খেয়েছি। আপনি অ্যাত্তবড় কেট্‌লিতে চায়ের জল চড়িয়েছেন কেন? এত চা খাবেন?'

মৌলিনাথ গম্ভীর মুখে একবার কেট্‌লির দিকে তাকাইল, বলিল—'ওটা চায়ের জল নয়, স্নান করব বলে চড়িয়েছিলুম।'

সতী একটু হাঁ করিয়া বলিল—'ও, আপনি গরম জলে স্নান করেন।'

মৌলিনাথ বলিল—'রোজ গরম জলে স্নান করি না, কাছেই একটা ঝরনা আছে তাতে স্নান করি। আজ গরম জলে নাইবার ইচ্ছে হয়েছিল তাই জল চড়িয়ে ধবলীকে আনতে গিয়েছিলাম।'

সতী বলিল—'ও—আপনার গরুর নাম ধবলী। কোথায় ছিল?'

'ঝরনার ধারে চরছিল।'

'ও—ওর বাচ্ছা কোথায়?'

'বাছুরটা মারা গেছে।'

'আহা, কি হয়েছিল?'

'হয়নি কিছু। বাঘে নিয়ে গেছে।'

মমতা একটু অধীরভাবে ইহাদের বিশ্রব্ধ বাক্যালাপ শুনিতেছিল, বলিল—'এখানে বাঘ ভাল্লুক আছে নাকি?'

মৌলিনাথ মমতাকে নিশ্চয় চিনিয়াছিল কিন্তু চেনার কোনও লক্ষণ প্রকাশ করে নাই; এখনও অচেনার মতই বলিল—'বাঘ আছে কিন্তু মানুষখেকো বাঘ নয়; ছোট জাতের চিতা বাঘ, নেক্‌ড়ে বাঘ, এই সব। ভাল্লুকও আছে বটে কিন্তু তারা নিরামিষাশী। সে যাক, আপনারা দীনের কুটীরে পদার্পণ করেছেন আমার সৌভাগ্য। আপনাদের জন্যে কি করতে পারি?'

দুই বোন দৃষ্টি বিনিময় করিল। মমতা বলিল—'আপনি মোটর মেরামত করতে জানেন?'

মৌলিনাথ বলিল—'জানি সামান্য। যদি সর্দি কাশির মত মামুলি রোগ হয় তাহলে বোধহয় সারাতে পারব, কিন্তু যদি টাইফয়েড কি মেনিঞ্জাইটিস হয় তাহলে আমার বিদ্যেয় কুলোবে না। চলুন দেখি।'

তিনজনে মোটরের উদ্দেশ্যে চলিল। সতীর চোখে যেন বিদ্যুৎ খেলিতেছে, অধরের কূলে কূলে উত্তেজিত চাপা হাসি। মমতার মুখের ফ্যাকাসে ভাব এখনও কাটে নাই, পাতলা ঠোঁট দৃঢ়বদ্ধ।

মোটরের কাছে যখন তাহারা পেঁছিল তখন সূর্যাস্ত হইয়াছে। মৌলিনাথ বনেট খুলিয়া কলকব্জা নাড়াচাড়া করিল, কারবুরেটার দেখিল, স্পার্কিং প্লাগ খুলিল। তারপর বলিল—'কি হয়েছে বুঝতে পেরেছি, কিন্তু আজ রাত্রে মেরামত করা যাবে না। অন্ধকারে কিছু দেখতে পাব না।'

এতক্ষণে প্রায় অন্ধকার হইয়া গিয়া ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। মমতা ও সতী ফার্‌ কোট পরিয়া লইল।

'তাহলে—'

'আজ রাত্রিটা যদি দীনের কুটীরে কাটাতে রাজী থাকেন, কাল সকালে গাড়ি মেরামত করে দিতে পারি।'

ক্ষণেক নীরবতার পর সতী থামিয়া থামিয়া বলিল—'তাহলে—আজ রাত্তিরটা—দীনের কুটীরেই কাটানো যাক—কি বলিস দিদি?'

মমতা সিধা উত্তর দিল না, বলিল—'স্যুটকেস দুটো এখানে পড়ে থাকবে?'

মৌলিনাথ বলিল—'না, আমি নিচ্ছি।'

সে পিছনের খোলের ভিতর হইতে স্যুটকেস দুটি বাহির করিয়া দু'হাতে লইল। বিলাতী কম্বল দুটি সতী ও মমতা লইল।

মৌলিনাথ বলিল—'চলুন।'

তিনজনে আবার জঙ্গলে প্রবেশ করিল। মাঝখানে মৌলিনাথ, দু'পাশে দু'জন।

কিছুক্ষণ চলিবার পর মমতা বলিল—'কোন দিকে যাচ্ছি কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

মৌলিনাথ বলিল—'আমাকে দেখতে পাচ্ছেন তো? আমার ওপর নজর রাখুন, আর কিছু দেখবার দরকার হবে না।'

আরও কিছুক্ষণ অন্ধকারে চলিবার পর মমতা যখন কথা কহিল তখন তাহার কণ্ঠস্বরে যেন একটু তীক্ষ্ণতা ধরা পড়িল—'আমাকে বোধহয় আপনি চিনতে পারেননি?'

মৌলিনাথ সহজ সুরে বলিল—'চিনতে পেরেছি বৈকি! আপনার কাছে আমি লজ্জিত। আপনি যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা এখনও পালন করা হয়নি। সাঁওতাল মেয়ে জোগাড় করতে পারিনি।'

বাকি পথটা নীরবে কাটিল। গৃহের পদমূলে পৌঁছিয়া মৌলিনাথ বলিল—'কম্বল দুটো আমায় দিন। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যান। এই নিন দেশলাই, ঘরে লণ্ঠন আছে জেবলে নেবেন।'

মমতা জিজ্ঞাসা করিল—'শোবার কি ব্যবস্থা হবে?'

মৌলিনাথ বলিল—'ঘরে বিছানা আছে, তাতে আপনাদের দু'জনের কুলিয়ে যাবে। আমি নীচে শোব।'

সতী বলিল—'নীচে কোথায় শোবেন?'

'এই পাথরের চাতালের ওপর। গরমের রাত্রে বেশীর ভাগ এইখানেই শুই।'

দুই বোন উপরে উঠিয়া গেল। সতী লণ্ঠন জ্বালিল। বাহিরে তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। দুইজনে বিছানায় বসিয়া ফিকা হাসিল।

'দিদি, ভয় করছে নাকি?'

'একটু একটু।—তোর?'

'উঁহু—হাসি পাচ্ছে।'

কিছুক্ষণ পরে দ্বারের বাহিরে মৌলিনাথের মুণ্ড দেখা গেল।

'আসতে পারি?'

'আসুন।'

মৌলিনাথ আসিয়া স্যুটকেস দুটি মেঝেয় রাখিল। বলিল—'চা খাবেন নিশ্চয়। আমার সব জোগাড় আছে, কেবল টাট্‌কা দুধ নেই। টিনের দুধ চলবে কি?'

সতী বলিল—'খুব চলবে।'

মৌলিনাথ স্টোভ জ্বালিল। দশ মিনিট পরে ধূমায়িত চায়ের বাটি ও বিস্কুট সামনে রাখিয়া বলিল—'ডিম ভেজে দেব কি? তাজা ডিম আছে, আজ সকালে জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে এক বন-মুরগীর বাসা থেকে কয়েকটি সংগ্রহ করেছি।'

মমতা সতীর মুখের পানে চাহিল, সতী বলিল—'এখন থাক, রাত্তিরে হবে।'

মৌলিনাথ নিজের চা লইয়া তাহাদের অদূরে মেঝেয় বসিল।

'রাত্তিরের খাওয়ার কথা আমিও ভাবছি। কী রান্না হবে এ সম্বন্ধে মহিলাদের কিছু বলতে যাওয়া ধৃষ্টতা। আমার ঘরে চাল ডাল তেল ঘি আলু পেঁয়াজ আছে। এখন আপনারা ব্যবস্থা করুন কি রান্না হবে।'

মমতা চায়ের বাটিতে একবার ঠোঁট ঠেকাইয়া বলিল—'রান্না করা আমাদের অভ্যাস নেই, মৌলিনাথবাবু।'

মৌলিনাথ কিছুক্ষণ মমতার পানে চাহিয়া রহিল, তারপর নিজের চায়ে একটি চুমুক দিয়া সহজ সুরে বলিল—'তা বটে। বেশ, আমিই রাঁধব। শুধু ভয় হচ্ছে আমার রান্না আপনারা মুখে দিতে পারবেন না।'

সতী লজ্জিতভাবে একটু ইতস্তত করিয়া বলিল—'আমি মোটামুটি রাঁধতে জানি। বিলেতে যখন দিশী রান্না খাবার ইচ্ছে হত তখন নিজেই রেঁধে খেতুম।'

মৌলিনাথ এবার সতীর পানে ভাল করিয়া চাহিল। প্রথম সাক্ষাতের পর হইতে মৌলিনাথ যখনই কথা বলিয়াছে সিধা মমতাকে লক্ষ্য করিয়া কথা বলিয়াছে; অপর

পক্ষ হইতে সতী বেশী কথা বলিলেও মৌলিনাথ উত্তর দিয়াছে মমতাকেই। এতক্ষণে সে যেন সতীর স্বতন্ত্র সত্তা টের পাইল। সে কিছুক্ষণ নিবিষ্টভাবে সতীকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—'আপনি রাঁধবেন। তাহলে তো ভালই হয়। অনেক দিন মেয়েদের হাতের রান্না খাইনি। কিন্তু যে উপকরণ আছে তাতে বেশী কিছু রাঁধা চলবে না।'

সতী বলিল—'খিচুড়ি রাঁধা চলবে।'

মৌলিনাথ হৃষ্টমুখে বলিল—'খুব ভাল হবে। শাস্ত্রে লিখেছে—আপৎকালে খিচুড়ি।'

সতী বলিল—'আপনি খিচুড়ি ভালবাসেন তো? অনেকে ভালবাসে না।'

মৌলিনাথ বলিল—'খুব ভালবাসি। এ বিষয়ে আমি সম্রাট সাজাহানের সমকক্ষ।'

সতী হাসিল। মমতার মুখখানা কিন্তু কেমন যেন বিমর্ষ হইয়া রহিল। ভিতরের বাধা ঠেলিয়া তাহার ব্যবহার স্বাভাবিক হইতে পাইতেছে না।

চা শেষ হইলে মৌলিনাথ উঠিল, বলিল—'আমি এবার নীচে যাই, ধবলীকে বাঁধতে হবে।'

সতী জিজ্ঞাসা করিল—'কোথায় থাকে ধবলী?'

'এই ঘরের নীচে একটা খোঁয়াড় করেছি, রাত্রে সেখানেই বেঁধে রাখি। দিনের বেলা চরে বেড়ায়।'

মৌলিনাথ নামিয়া গেল। মমতা মুখ গম্ভীর করিয়া বসিয়া ছিল, পায়ের উপর একটা কম্বল টানিয়া লইয়া শুইয়া পড়িল। সতী তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া ফিস ফিস করিয়া বলিল—'দিদি, তুই অমন মনমরা হয়ে আছিস কেন? আমার তো খুব মজা লাগছে।'

মমতা চোখ বুজিয়া বলিল—'বিপদে পড়লে তোর মজা লাগতে পারে, আমার লাগে না।'

সতী বলিল—'বিপদ কৈ? বিপদ তো কেটে গেছে। কাল সকালেই বাড়ি যাবি।'

মমতা মুদিতচক্ষে ক্ষণেক নীরব রহিল, তারপর বলিল—'মৌলিনাথবাবুর কাছে অনুগ্রহ নিতে আমার ভাল লাগে না।'

সতী বলিল—'অনুগ্রহ কিসের? বাড়িতে অতিথি এলে সবাই যত্ন করে। তোর যে ওর সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিল তা ভুলে যা না। উনি তো ভুলে গেছেন বলেই মনে হচ্ছে।'

মমতা একবার চোখ খুলিয়া সতীর পানে চাহিল, তারপর পাশ ফিরিয়া শুইল।

সতী তখন উঠিয়া ফার্ কোট খুলিয়া ফেলিল, কোমরে আঁচল জড়াইয়া রান্নার আয়োজনে লাগিয়া গেল।

নীচে নামিয়া মৌলিনাথ ধবলীকে খোঁয়াড়ে বন্ধ করিয়া আসিল। প্রস্তর-চত্বরের মাঝখানে আগুন প্রায় নিব-নিব হইয়াছিল, তাহাতে কয়েকটা শুকনা গাছের ডাল ফেলিয়া দিয়া সম্মুখে বসিল, দুই জানু বাহুবেষ্টিত করিয়া শান্ত মুখে বসিয়া রহিল। উপরে লণ্ঠনের আলোতে ঘরের দরজায় একটি চতুষ্কোণ রচিত হইয়াছে, একটি অস্পষ্ট মূর্তি চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে—মনে হয় যেন মর্ত্যলোক হইতে স্বর্গের একটি আবছায় দৃশ্য দেখা যাইতেছে।

ঘণ্টাখানেক পরে সতী দ্বারের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, ডাকিল—'এবারে আপনি আসুন। খিচুড়ি তৈরি।'

মৌলিনাথ উপরে উঠিয়া গেল।

লণ্ঠন মাঝখানে রাখিয়া তিনজনে খাইতে বসিল। সতী ও মমতা বিছানার ধারে বসিল, মৌলিনাথ ভাল্লুকের চামড়ার উপর।

বাটিতে করিয়া গরম খিচুড়ি, সঙ্গে আলু-পেঁয়াজের চচ্চড়ি এবং ডিম ভাজা। মৌলিনাথ এক গ্রাস মুখে দিয়াই লাফাইয়া উঠিল—'আরে সর্বনাশ, একি!'

সতী শঙ্কিত কণ্ঠে বলিল—'খেতে ভাল হয়নি?'

মৌলিনাথ মাথা নাড়িয়া বলিল—'এ তো খিচুড়ি নয়, এ যে পোলাও।'

সতীর মুখে হাসি ফুটিল। সে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—'তবু ভাল। আপনি এমন ভয় পাইয়ে দিতে পারেন।। দিদি, সত্যি খিচুড়ি ভাল হয়েছে?'

মমতা বিরক্তি দমনের বিশেষ চেষ্টা না করিয়া বলিল—'হয়েছে রে বাপু হয়েছে। আমার মুখে এখন কিছুরই স্বাদ নেই। কোনও মতে রাতটা কাটাতে পারলে বাঁচি।'

সতী অপ্রতিভ হইল। মৌলিনাথ গম্ভীর চোখে মমতাকে নিরীক্ষণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল—'আপনার বিরক্তি স্বাভাবিক। কিন্তু উপায় তো নেই, কথায় বলে দুরবস্থায় পড়লে বাঘ ফড়িং খায়। আমারও এমন দুর্ভাগ্য অতিথিদের মনোরঞ্জন করতে পারলাম না।'

মমতা বোধহয় নিজের রূঢ়তায় একটু লজ্জিত হইয়াছিল, হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—'আপনাকে আমি দোষ দিচ্ছি না। আপনি যথাসাধ্য করেছেন, আপনাকে ধন্যবাদ।'

অতঃপর আহার প্রায় নীরবে সমাপ্ত হইল।

মৌলিনাথ নিজের কম্বলটা হাতের উপর ফেলিল, দেওয়াল হইতে রাইফেল নামাইয়া বগলে লইল, কয়েকটা টোটা পকেটে পরিল, হাসিমুখে বলিল—'এবার আপনারা শুয়ে পড়ুন।'

সতী বলিল—'অপনি রাইফেল নিয়ে যাচ্ছেন, তার মানে—'

মৌলিনাথ বলিল—'দরকার হবে বলে নিয়ে যাচ্ছি তা নয়। ওটা সঙ্গে থাকলে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোনো যায়।'

মৌলিনাথ সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল, সতী দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

'বাঘ কি মই বেয়ে উঠতে পারে?'

'না, ওদের ও বিদ্যে নেই। তবু দরজা বন্ধ করে দিন।'

এই সময় সতী নিজের কব্জিতে ঘড়ি দেখিয়া বলিয়া উঠিল—'একি, এখন যে মোটে সাড়ে সাতটা। আমি ভেবেছিলুম কত রাত্তির হয়ে গেছে।'

মৌলিনাথ বলিল—'জঙ্গলে সাড়ে সাতটাই রাত দুপুর। শুয়ে পড়ুন।'

'এত শীগ্‌গির ঘুম আসবে কেন। তার চেয়ে—আপনি বলছিলেন অতিথিদের মনোরঞ্জন করতে পারেননি। তাই না হয় করুন না।'

'কী করব? মহিলাদের মনোরঞ্জনের কোনও বিদ্যেই যে জানা নেই।'

'কেন, গান গাইতে তো জানেন।'

'গান!' হঠাৎ মৌলিনাথের কণ্ঠ হইতে স্বতঃস্ফূর্ত হাসির আওয়াজ উৎসারিত হইয়া উঠিল—'কি গান শুনবেন? কানু কহে রাই?'

'না, অন্য কিছু। গাইবেন?'

মৌলিনাথ উত্তর দিবার পূর্বেই মমতা বলিয়া উঠিল—'সতী, বাড়াবাড়ি করিসনি। যা রয়-সয় তাই ভাল। দোর বন্ধ করে দে।'

সতী ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল মমতা শুইয়া পড়িয়াছে। সে ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ করিয়া দিল, আলো কমাইয়া মমতার পাশে গিয়া শুইল। কম্বলটা ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া লইয়া তৃপ্তির একটি নিশ্বাস ফেলিল। বলিল—'যাই বলিস, আমাদের ভাগ্যি ভাল যে এই জঙ্গলের মধ্যে একজন ভদ্রলোকের দেখা পেয়েছি। ভদ্রলোক না হয়ে

ছোটলোকও হতে পারত।'

মমতা গলার মধ্যে কেবল একটা শব্দ করিল।

নীচে মৌলিনাথ প্রস্তরপট্টের উপর শয়ন করিয়াছিল; অর্ধেক কম্বলের বিছানা, বাকি অর্ধেক আবরণ। মাথায় রাইফলের কুঁদা। সে ঊর্ধ্ব মুখে আকাশের পানে চাহিয়া রহিল; তাহার অধরে বিচিত্র কৌতুকের হাসি খেলা করিতে লাগিল।

তারপর সে গান ধরিল; প্রথমে গুঞ্জরণ, তারপর স্পষ্ট স্বর—

কেউ ভোলে না কেউ ভোলে
অতীত দিনের স্মৃতি।
* * *
কেউ জ্বালে না আর বাতি
তার চির-দুখের রাতে
কেউ দ্বার খুলি জাগে
চায় নব চাঁদের তিথি।

গান শেষ হইল। উপরের ঘর হইতে কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। মৌলিনাথ পাশ ফিরিয়া চোখ বুজিল।

ঘরে মমতা ও সতী পাশাপাশি শুইয়া আছে। মমতার চক্ষু মুদিত, হয়তো ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সতী নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া আছে।

আজ বোধহয় কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া কি চতুর্থী। জঙ্গলের মাথা ছাড়াইয়া চাঁদ উঠিতেছে। নব চাঁদের তিথি।...

চাঁদ যখন মধ্যগগনে তখন মৌলিনাথের ঘুম ভাঙিয়া গেল। কোথায় যেন খুট্ করিয়া শব্দ হইয়াছে। একেবারে রাইফেল হাতে লইয়া সে উঠিয়া বসিল।

বাঘ নয়। মই দিয়া একজন নামিয়া আসিতেছে, ফার্ কোট পরা চেহারা—পিছন দিক হইতে দেখিয়া মৌলিনাথ চিনিতে পারিল না, মমতা না সতী।

সতী আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। ঊর্ধ্বমুখী হইয়া চাঁদের পানে চাহিল, চারিদিকে ঘাড় ফিরাইয়া আলো-ঝিলমিল বনানী দেখিল, তারপর পাথরের উপর বসিয়া পড়িল। বিছানায় বালিশের ঘর্ষণে তাহার খোঁপা খুলিয়া বেণী এলাইয়া পড়িয়াছে।

মৌলিনাথ রাইফেল রাখিয়া বলিল—'আপনি!'

সতী বলিল—'ঘুম হল না, তাই নেমে এলুম। দিদি ঘুমুচ্ছে।'

মৌলিনাথ বলিল—'নতুন জায়গায় সকলের ঘুম আসে না।'

সতী বলিল—'সেজন্যে নয়। এত ভাল লাগছে যে ঘুমুতে পারছি না।'

মৌলিনাথের কণ্ঠস্বরে একটু সকৌতুক বিস্ময় প্রকাশ পাইল—'এত ভাল লাগছে—!'

'বিশ্বাস করছেন না? সত্যি বলছি। যদি সারা জীবন এমনি জঙ্গলে কাটাতে পারতুম বোধ হয় আর কিছু চাইতুম না।'

'এখন তাই মনে হচ্ছে, দু'দিন থাকলে মন তখন পালাই পালাই করবে।'

'আপনার মন কি পালাই পালাই করে?'

'না। এ আমার নিজের জঙ্গল, এর প্রত্যেকটি গাছ আমার চেনা, প্রত্যেকটি পাখির সঙ্গে আলাপ আছে। বাঘ ভাল্লুকেরাও অপরিচিত নয়, কে কোথায় থাকে তার ঠিকানা জানি।'

সতী চুপ করিয়া রহিল। অনেক দূর হইতে ঐক্যতানের শব্দ ভাসিয়া আসিল; শৃগালেরা রাত্রির মধ্যযাম ঘোষণা করিতেছে।

'আপনার কি শহরে যেতে একেবারেই ভাল লাগে না?'

'মাসে দু'মাসে একবার যাই। যখন ফিরে আসি তখন আরও মিষ্টি লাগে।'

'আপনি মানুষের সঙ্গ ভালবাসেন না?'

মৌলিনাথ স্মিতমুখে নীরব রহিল।

'চুপ করে রইলেন যে! বলুন না।'

'ও কথা যেতে দিন না।'

'না, বলুন।'

মৌলিনাথ আর একটু ইতস্তত করিয়া বলিল—'কি বলব, মনের কথা কি স্পষ্ট করে বলা যায়। মোটামুটি এইটুকু বলা যায় যে মনের মানুষ যারা তাদের সঙ্গ ভাল লাগে, যারা তা নয় তাদের সঙ্গ ভাল লাগে না। কিন্তু সমানধর্মা মানুষ পৃথিবীতে বেশী নেই। যেখানে যত বেশী মানুষ সেখানে তত বেশী বিরোধ, তত তীব্র স্বার্থ-পরতা। তার চেয়ে আমার জঙ্গল ভাল।'

সতী একটু চিন্তা করিয়া বলিল—'জঙ্গলে কি বিরোধ স্বার্থপরতা নেই?'

'আছে। কিন্তু অহেতুক বিরোধ নেই, দলবদ্ধ স্বার্থপরতা নেই। বাঘেরা দল বেঁধে বাঘের সঙ্গে লড়াই করে না, হরিণেরা সংঘবদ্ধ হয়ে হরিণের সঙ্গে ঝগড়া করে না। আর আমি তো জঙ্গলের মধ্যে একা, কার সঙ্গে ঝগড়া করব?'

'তাহলে মোট কথা এই যে, মনের মানুষ অর্থাৎ সমানধর্মা মানুষ পেলে আপনি ঝগড়া করবেন না।'

'ঝগড়া আমি কোন অবস্থাতেই করব না, ঝগড়ার উপক্রম দেখলেই পালিয়ে যাব।'

'আপনি পুরুষ মানুষ, ঝগড়ার নামে পালাবেন? এ যে পলাতক মনোবৃত্তি।'

'হোক পলাতক মনোবৃত্তি। আমি পালাব।'

মৌলিনাথের বলিবার ভঙ্গী শুনিয়া সতী কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

'সতী!'

দু'জনে একসঙ্গে উপর দিকে তাকাইল। মমতা দ্বারের সামনে দাঁড়াইয়া। পশ্চিমে ঢলিয়া পড়া চাঁদের আলো তাহার মুখে পড়িয়াছে।

সতী বলিল—'দিদি, তোর ঘুম ভেঙেছে। নীচে আয় না।'

মমতা বলিল—'না, তুই ওপরে চলে আয়। এত রাত্রে ওখানে থাকতে হবে না।'

'ক'টা বেজেছে?' সতীর হাতে ঘড়ি নাই, সে ঘড়ি খুলিয়া শয়ন করিয়াছিল।

'তিনটে বেজে গেছে।'

'তবে তো ভোর হয়ে এল। আর ঘুমিয়ে কি হবে!'

'সতী! চলে এস! বড় বাড়াবাড়ি করছ তুমি। আইবুড় মেয়ের অত ভাল নয়।' মমতার স্বর কঠিন।

সতী কিছুক্ষণ হতবাক্ হইয়া রহিল, তারপর ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল মৌলিনাথ নিঃশব্দে হাসিতেছে। সে আর বাঙ্নিষ্পত্তি করিল না, উঠিয়া উপরে চলিয়া গেল।

রাত্রির যবনিকা উঠিয়া যাইতেছে; ভোর হইতে আর দেরি নাই। প্রথমে একটি বন-মোরগ তরুশীর্ষ হইতে ডাক দিল; তাহার ক্রোশন থামিতে না থামিতে দূরে আর একটি মোরগ ডাকিল; তারপর আরও দূরে আর একটি ডাকিল। এই শব্দে দোয়েল হাঁড়িচাঁচা টিয়া চড়ুই পায়রা ছাতারে সকলের ঘুম ভাঙিয়া গেল। বন মুখর হইয়া উঠিল।

সূর্যোদয় হইল।

মমতা ও সতী টঙ্ হইতে নামিয়া আসিল। তাহাদের কাঁধে বড় টার্কিশ্ তোয়ালে, হাতে টুথ্-ব্রাশ ও সাবানের কৌটা। মমতার মুখ গম্ভীর, সতীর মুখে গাম্ভীর্য ও হাসি লুকোচুরি খেলিতেছে।

মমতা মৌলিনাথকে বলিল—'ঝরনাটা কোন দিকে দেখিয়ে দিন তো!'

মৌলিনাথ তাহাদের ঝরনা পর্যন্ত পেঁছাইয়া দিল, ফিরিয়া আসিয়া চায়ের জল চড়াইল। ধবলী খোঁয়াড়ের মধ্যে হাম্বারব করিতেছিল, তাহাকে ছাড়িয়া দিল।

ঝরনার নির্জনতা হইতে ফিরিবার পথে মমতা কাঁটা-ঝোপের আকর্ষণ বাঁচাইয়া চলিতে চলিতে বলিল—'বাবা, জঙ্গলে মানুষ থাকে? ভাগ্যিস ওকে বিয়ে করিনি।'

সতী বলিল—'ভাগ্যিস।'

তাহারা ফিরিয়া আসিয়া দেখিল মৌলিনাথ পাটাতনের উপর চায়ের সরঞ্জাম সাজাইয়া অপেক্ষা করিতেছে।

ডিমসিদ্ধ ও বিস্কুট সহযোগে চা খাওয়া শেষ হইলে মৌলিনাথ বলিল—'এবার তাহলে মোটর মেরামতের চেষ্টায় যাওয়া যাক। আপনারা কি আমার সঙ্গে আসবেন?'

তাহার বক্তব্য শেষ হইল না, জঙ্গলের মধ্যে বিলাতী ব্লাড-হাউণ্ড্ কুকুরের গভীর ডাক শোনা গেল। তারপর কয়েকজন লোক তরুচক্রের মধ্যে প্রবেশ করিল।

সর্বাগ্রে আসিতেছেন কুকুরের শিকল ধরিয়া মমতার স্বামী ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার ভৌমিক; তাঁহার পিছনে উর্দি-পরা কয়েকজন লোক। মিস্টার ভৌমিকের চেহারা ইঞ্জিনের মত, কাষ্ঠ-লোষ্ট্র-ইষ্টক-দৃঢ় ঘর্নাপিনদ্ধ কায়া। এবং তাহার অভ্যন্তরে যে লৌহ-গলন শৈল-দলন অচল-চলন মন্ত্র নিহিত আছে তাহাও নিঃসংশয়ে বলা যায়।

মমতা ত্বরিতপদে গিয়া স্বামীর বাহুর সহিত বাহু জড়াইয়া লইল, কুকুরের মাথায় হাত বুলাইয়া আদর করিল। সেইখানে দাঁড়াইয়া মিস্টার ভৌমিক স্ত্রীর জবানবন্দী শুনিলেন, নিজের হালও বয়ান করিলেন। কাল রাত্রি দশটা পর্যন্ত স্ত্রী ও শ্যালিকা পেঁছিল না দেখিয়া তিনি টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন, তারপর আজ প্রাতঃকালে কুকুর লইয়া খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন।

এদিকে সতী ও মৌলিনাথ একক দাঁড়াইয়া আছে। সতী অনাবশ্যক সংবাদ দিল—'দিদির স্বামী মিস্টার ভৌমিক—ম্যাজিস্ট্রেট।'

উত্তরে মৌলিনাথ শুধু ভ্রূ তুলিল।

মিস্টার ভৌমিক স্ত্রীকে বাহুলগ্ন করিয়া অগ্রসর হইলেন। সতীর সম্মুখে আসিয়া টুপি খুলিয়া বলিলেন—'এই যে সতী। কেমন আছ?'

সতী বলিল—'আপনি কেমন আছেন?'

শ্যালিকাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মৌলিনাথের দিকে ফিরিলেন, কড়া সুরে বলিলেন—'এই ঘর আপনার?'

মৌলিনাথ বলিল—'হ্যাঁ।'

ম্যাজিস্ট্রেট বলিলেন—'আশা করি এ জমি আপনার, আপনি গভর্নমেণ্টের খাস মহলে trespass করেননি।'

মৌলিনাথ বলিল—'এ জঙ্গল আমার, আমি গভর্নমেণ্টের খাস মহলে trespass করিনি। এবং গভর্নমেণ্ট যদি আমার জঙ্গলে trespass করে আমি গভর্নমেণ্টের ঠ্যাং ভেঙে দেব।'

সতী অবাক হইয়া মৌলিনাথের পানে চাহিল; ঝগড়ার নামে যে-লোক পলায়ন করিতে বদ্ধপরিকর কথাগুলো তাহার মত নয়। সতী হঠাৎ সজোরে হাসিয়া উঠিল।

ম্যাজিস্ট্রেট কিন্তু হাসিলেন না, রাগও করিলেন না। আপন শক্তিতে তিনি অটল। স্ত্রীকে বলিলেন—'চল, এবার যাওয়া যাক। ভাঙা গাড়িটা টেনে নিয়ে যেতে হবে। তোমাদের জিনিসপত্র কোথায়?'

মমতা আঙুল দেখাইয়া বলিল—'ঐ ঘরে আছে। দুটো স্যুটকেস।'

ম্যাজিস্ট্রেট আর্দালিকে হুকুম দিলেন স্যুটকেস দুটা নামাইয়া আনিতে। আর্দালি উপরে উঠিবার উপক্রম করিলে সতী বলিল—'আমার স্যুটকেস নামাবার দরকার নেই।'

সকলের সপ্রশ্ন চক্ষু সতীর দিকে ফিরিল। সতী সহজ সুরে বলিল—'আমি এখন যাব না, এখানেই থাকব।'

সকলের চোখের প্রশ্ন কণ্টকবৎ তীক্ষ্ম হইয়া উঠিল। মমতা আর্ত অবিশ্বাসের সুরে বলিল—'সতী!'

সতী বলিল—'এতে আশ্চর্য হবার কি আছে। জায়গাটা আমার ভাল লেগেছে তাই থাকব।'

'কিন্তু—একলা থাকবি কি করে?'

'একলা কেন, উনিও তো থাকবেন,' বলিয়া সতী চিবুকের সঙ্কেতে মৌলিনাথকে দেখাইল।

মমতা জ্বলিয়া উঠিল—'তুই হলি কি! শিক্ষা-দীক্ষা মান-মর্যাদা সব জলাঞ্জলি দিলি।—ও সব হবে না, আমার সঙ্গে এসেছিস, আমার সঙ্গে ফিরে যেতে হবে। মামা-মামীমার কাছে আমার একটা দায়িত্ব আছে।'

'আমি যাব না।'

ম্যাজিস্ট্রেট এতক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চন করিয়া নীরব ছিলেন, মৌলিনাথের দিকে ফিরিয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন—'এর মানে কি?'

মৌলিনাথ বলিল—'মানে আমিও জানি না। একটু অপেক্ষা করুন, দেখি যদি বুঝতে পারি।'

হাতের সঙ্কেতে সতীকে ডাকিয়া মৌলিনাথ একটু দূরে লইয়া গেল, গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল—'ব্যাপার কি?'

সতীর চোখ ছল ছল করিতেছে, স্ফুরিত অধরে সে বলিল—'আমি যাব না, কিছুতেই যাব না।'

'কিন্তু—না যাওয়ার মানে বুঝতে পারছ?'

'পারছি। ছেলেমানুষ নই, একুশ বছর বয়স হয়েছে।'

'তার মানে আমাকে বিয়ে করতে রাজী আছ?—কেমন?'

সতীর বাঁ চোখ হইতে একফোঁটা জল গড়াইয়া গালের উপর পড়িল। সে উত্তর দিল না।

মৌলিনাথ বলিল—'মৌনং সম্মতিলক্ষণম্।—কিন্তু যতক্ষণ বিয়ে না হচ্ছে ততক্ষণ এখানে থাকবে কোথায়?'

'কেন, আমি ঘরে শোব, তুমি নীচে শুয়ো।'

'চমৎকার ব্যবস্থা। আমাকে যদি বাঘে নিয়ে যায়?'

'বেশ, আমি নীচে শোব, তুমি ঘরে শুয়ো।'

'আরও চমৎকার। তোমাকে বাঘে খেতে পারে না?'

'সে আমি জানি না।'

স্ত্রীজাতির ইহাই শেষ যুক্তি। মৌলিনাথ কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া ঘাড় চুল্‌কাইল, তারপর সতীর হাত ধরিয়া বলিল—'এস দেখি, যদি কিছু ব্যবস্থা হয়।'

দু'জনে পাশাপাশি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। ম্যাজিস্ট্রেট ইতিমধ্যে একটা প্রকাণ্ড সিগার ধরাইয়া ইঞ্জিনের মত ধোঁয়া ছাড়িতেছিলেন, মৌলিনাথ বলিল—'সতী এখানেই থাকবে। এমন কি সেজন্যে আমাকে বিয়ে করতে পর্যন্ত তৈরি আছে। আমারও অমত নেই।'

ম্যাজিস্ট্রেট বলিলেন—'ড্যাম্।'

মমতা দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল—'এমন বেহায়া মেয়ে দেখিনি। ছি ছি!'

মৌলিনাথ বলিল—'ঠিক বলেছেন। কিন্তু উপায় নেই, ও সাবালিকা। মিস্টার ভৌমিক, এক্ষেত্রে আপনিই সব দিক রক্ষে করতে পারেন। সতী আপনার শালী একথাটা স্মরণ রাখবেন।'

ম্যাজিস্ট্রেট বলিলেন—'হোয়া জু' মীন্?'

মৌলিনাথ বলিল—'আপনি ম্যাজিস্ট্রেট, বিয়ে দেবার অধিকার আপনার আছে। সাক্ষী-সাবুদও উপস্থিত। আপনি যদি বিয়ে না দিয়ে চলে যান একটা কেলেঙ্কারী হবে। সতী আপনার শালী, সুতরাং দুর্নাম হবে আপনারই বেশী।'

ম্যাজিস্ট্রেট ঘন ঘন ধূম উদ্‌গিরণ করিয়া মৌলিনাথ ও সতীকে দৃষ্টিপ্রসাদে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। তারপর তাঁহার ইঞ্জিনের মত মুখে অতি সামান্য একটু বাষ্পাচ্ছন্ন হাসির আভাস দেখা দিল। কখন পিছু হটিতে হয় ইঞ্জিন তাহা জানে।

অতঃপর এক ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া সস্ত্রীক সানুচর প্রস্থান করিয়াছেন। মমতা যাইবার সময় সতীর সঙ্গে কথা বলে নাই, মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গিয়াছে।

প্রস্তরপট্টের কিনারায় সতী ও মৌলিনাথ পা ঝুলাইয়া বসিয়া ছিল। দু'জনের মুখই চিন্তাগ্রস্ত।

মৌলিনাথ বলিল—'হিন্দুদের আট রকম বিয়ের ব্যবস্থা, তার মধ্যে গান্ধর্ব বিবাহ আছে, পৈশাচ বিবাহ আছে, রাক্ষস বিবাহ আছে, আমাদের বিয়েটা কোন্ বিবাহ বুঝতে পারছি না।'

সতী বলিল—'বোধহয় খোক্কস বিবাহ।'

মৌলিনাথ সতীর কাছে ঘেঁষিয়া বসিল। বলিল—'কি কাণ্ডটা করলে বল দেখি। এক রাত্তিরে এত হয়?'

সতী বলিল—'যার হবার তার এক রাত্তিরেই হয়।—জামাইবাবু কিন্তু খুব ভাল লোক। দিদিটা ইয়ে। ভাগ্যিস তোমাকে বিয়ে করেনি।'

'ভাগ্যিস। কিন্তু ও কথা যাক। যে কাণ্ড করলে তার ফলাফল চিন্তা করেছ কি?'

'কী ফলাফল?'

'রোজ নিজের হাতে রাঁধতে হবে।'

'রাঁধতে আমি ভালবাসি।'

'বাসন মাজতে হবে।'

'মাজব।'

'বাথরুম নেই, জলের কল নেই। ঝরনায় গিয়ে নাইতে হবে।'

'নাইব। কেট্‌লিতে জল গরম করেও নাইব।'

'ধবলী চরাতে হবে।'

সতী ঘাড় তুলিয়া বলিল—'আমি ধবলী চরাব কেন? চণ্ডীদাস কী লিখেছেন? ধবলী চরাবে তুমি।'

'আচ্ছা আচ্ছা।'

সতী মুচ্কি হাসিল।
'এবার তাহলে গানটা গেয়ে ফেল।'
'কোন্ গান?'
'কানু কহে রাই।'
দু'জনে আরো ঘনিষ্ঠ হইয়া বসিল। জঙ্গলে পশুপক্ষী ছাড়া সাক্ষী নাই, তাহারাও পরের প্রণয়লীলা গ্রাহ্য করে না। মৌলিনাথ সতীকে দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া লইয়া গান ধরিল। একটা কাঠঠোকরা অদৃশ্যে থাকিয়া গানের সঙ্গে ঠেকা দিতে লাগিল।

অপদার্থ

ঘটনাটি ঘটিয়াছিল অল্পাধিক চল্লিশ বছর আগে। তাহাও আবার বিহার প্রদেশের অজ পাড়াগাঁয়ে। সুতরাং ইহাকে আদিম কালের কাহিনী বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।
গঙ্গার তীরে চরের উপর গ্রাম—দিয়ারা মনপখল। শহর হইতে চৌদ্দ পনরো মাইল দূরে। সভ্যতার আলো এখানে মৃৎপ্রদীপের শিখা হইতে বিকীর্ণ হয়, কদাচিৎ হ্যারিকেন লণ্ঠনের ধোঁয়াটে কাচের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু তবু গ্রামটি সমৃদ্ধ। প্রায় তিন শত ঘর ভুঁইয়া রাজপুত এখানে বাস করে।

সম্পৎ সিং এই গ্রামে বর্ধিষ্ণু জোতদার, দেড়শত বিঘা জমি চাষ করেন। গৃহে লক্ষ্মীর কৃপা উছলিয়া পড়িতেছে। পঞ্চাশ বছর বয়স, গ্রামের সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিয়া চলে, বিপদে আপদে তাঁহার পরামর্শ ও সহায়তা অন্বেষণ করে। কিন্তু তাঁহার মনে সুখ নাই, একমাত্র পুত্র ভূপৎ সিং মানুষ হইল না।
ছেলেবেলা হইতেই ভূপতের স্বভাব কেমন এক রকম; কিছুতেই যেন আঁট নাই। তাহার স্বাস্থ্য ভাল, কিন্তু খেলাধূলায় তাহার মন নাই; লেখাপড়া ও না মা সি ধং পর্যন্ত করিয়া গুরুজির পাঠশালা ছাড়িয়া দিয়াছে। গ্রাম্য বড়মানুষের ছেলে অল্প বয়সে বখিয়া গেলে ভাঙ্ এবং গাঁজা ধরে, নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের সহিত অবৈধ ইয়ার্কির সম্বন্ধ পাতে। কিন্তু ভূপতের সে সব দোষ নাই, সে শুধু কাজ করিতে নারাজ।
অথচ গৃহস্থের সংসারে কত না কাজ। ক্ষেতে গিয়া চাষবাস তদারক করিতে হয়, ঘরে বসিয়া হিসাব নিকাশ করিতে হয়। যাহার দু'চার বিঘা জমিজমা আছে তাহারই মামলা মোকদ্দমা আছে, শহরে গিয়া উকিল মোক্তারের সহিত দেখা করিয়া মোকদ্দমার

তদ্বির করা প্রয়োজন। কিন্তু এই সব কাজ সম্পৎ সিংকে নিজেই করিতে হয়, উপযুক্ত পুত্র থাকিয়াও নাই।

পুত্রের চৌদ্দ বছর বয়স হইতেই সম্পৎ সিং তাহাকে সংসারে ছোটখাটো কাজে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু বিশেষ ফল হয় নাই। পিতার আজ্ঞায় ভূপৎ যথাসাধ্য উৎসাহ সংগ্রহ করিয়া কাজ করিবার চেষ্টা করিত; কিন্তু অল্পকাল পরেই তাহার উৎসাহ ফুরাইয়া যাইত, মন উদাস হইয়া পড়িত। একবার সম্পৎ সিং তাহাকে লইয়া মামলার তদ্বির করিতে শহরে গিয়াছিলেন। টাট্টু ঘোড়ায় চড়িয়া শহরে যাইতে মন্দ লাগে নাই; কিন্তু তারপর সারা দিন আদালতে উকিলের পিছু পিছু ঘুরিয়া এবং মামলা মোকদ্দমার অবোধ্য কচ্‌কচি শুনিয়া সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অতঃপর আবার শহরে যাইবার প্রস্তাব হইলে সে লুকাইয়া বসিয়া থাকিত। সম্পৎ সিং হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

পুত্রের সতেরো বছর বয়সে সম্পৎ সিং তাহার বিবাহ দিলেন। বধূটির নাম লছমী, যেমন সুন্দরী, তেমনি মিস্ট-স্বভাব; বয়স চৌদ্দ বছর, সেয়ানা হইয়াছে। সম্পৎ সিং ভাবিলেন, নিজের সংসার হইলে ভূপতের সংসারে মন বসিবে। কিন্তু হায় রাম! ভূপতের কর্মজীবনে তিলমাত্র পরিবর্তন দেখা গেল না। বরং আগে যদি বা নৈষ্কর্ম্যের পীড়নে উত্যক্ত হইয়া সে ক্ষেত খামারের দিকে পা বাড়াইত, এখন নিরবচ্ছিন্ন ঘরের কোণে আড্ডা গাড়িল।

লছমী মেয়েটি বড় বুদ্ধিমতী। সে দু'চার মাসের মধ্যেই শ্বশুরবাড়ির হালচাল বুঝিয়া লইল। শ্বশুরের দুঃখ অনুভব করিল, স্বামীও যে সুখী নয় তাহা অনুমান করিল। কিন্তু কেন যে স্বামীর মন কর্মবিমুখ তাহা বুঝিতে পারিল না। নির্জনে সে চোখের জল ফেলিয়া ভাবিত—পড়াপড়শী মেয়েরা বলে তাহার স্বামী অলস অপদার্থ অকর্মণ্য, তাহা সত্য নয়, তাহার স্বামী মানুষের মত মানুষ। কেবল নিয়তির দোষে এমন হইয়াছে। হে ভগবান, তুমি আমার স্বামীর নিয়তির দোষ কাটাইয়া দাও, আমি বুকের রক্ত দিয়া পুজা দিব।

ভূপতের নিয়তির দোষ কাটিল না। বছরের পর বছর কাটিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু ভূপৎ গ্রামের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কোনও কাজই করিল না।

ভূপতের বিবাহের আট বছর পরে একটি ঘটনা ঘটিল। ভূপতের বয়স তখন পঁচিশ, সে চারিটি সন্তানের পিতা। সম্পৎ সিংয়ের বয়স ষাটের কাছাকাছি, কিন্তু তিনি এখনও সমস্ত সংসারের কর্মভার একাই বহন করিতেছেন।

গ্রামে একটি যাযাবর বায়োস্কোপ কোম্পানী আসিল। তখন নির্বাক চলচ্চিত্র দেশে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। লাইম্‌-লাইটের পরিবর্তে বিদ্যুৎ-বাতির সাহায্যে চলচ্চিত্র প্রদর্শন প্রচলিত হইয়াছে। একদল ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন উৎসাহী লোক গরুর গাড়িতে যন্ত্রপাতি লইয়া গ্রামে গ্রামে বায়োস্কোপ দেখাইয়া ফিরিতেছে এবং প্রচুর পয়সা পিটিতেছে। এক আনা দু'আনার টিকিট, বায়োস্কোপ দেখিবার জন্য প্রত্যেক গ্রামে ছেলেবুড়ো ভাঙিয়া পড়ে।

গ্রামের মাঠে তাঁবু পড়িয়াছে। সন্ধ্যার পর ডায়নামো চালাইয়া বিদ্যুৎ-বাতি জ্বালা হইল। বিদ্যুৎ-বাতি গ্রামের কেহ পূর্বে দেখে নাই, আলো দেখিয়াই সকলের চক্ষু স্থির। তারপর যখন ছবি দেখিল তখন আর কাহারও মুখে বাক্য রহিল না।

ভূপৎও ছবি দেখিতে গিয়াছিল। কিন্তু তাহার চক্ষে ছবির চেয়ে বিদ্যুতের আলোই বেশী সম্মোহন বিস্তার করিয়াছিল। এ কি অপূর্ব আলো! এমন আলো মানুষ জ্বালিতে পারে! কেমন করিয়া জ্বালে? তেল নাই দেশলাই নাই, ফুঁ দিলে নেভে না, দেয়াল টিপিলেই জ্বলিয়া ওঠে!

রাত্রে ভূপৎ ভাল ঘুমাইতে পারিল না। যখন ঘুমাইল তখন দেখিল শত শত হুরীপরী বিজ্‌লি-বাতির মত ভাস্বর মূর্তিতে তাহাকে ঘিরিয়া নাচিতেছে। জাগিয়া দেখিল ঘরের কোণে রেড়ির তেলের মিটিমিটি আলো। কনুয়ে ভর দিয়া উঠিয়া সে লছমীর ঘুমন্ত মুখ দেখিল। না, এ আলোতে লছমীর মুখ ভাল দেখায় না, ওই আলো জ্বালিয়া লছমীর মুখ দেখিতে হয়। গাঢ় আবেগ ভরে সে লছমীর শিথিল অধরে চুম্বন করিল, লছমী আধ-জাগ্রত হইয়া তাহার গলা জড়াইয়া লইল।

সকালে ভূপৎ গিয়া বায়োস্কোপের মিস্ত্রির সহিত ভাব করিয়া ফেলিল, তাহাকে পেঁড়া গুলাবজামুন খাওয়াইল। মিস্ত্রি যত্ন করিয়া তাহাকে বিদ্যুজ্জনন যন্ত্র দেখাইল এবং প্রক্রিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিল। ভূপৎ কিছুই বুঝিল না কিন্তু চমৎকৃত হইয়া রহিল।

ব্যবসা এখানে ভাল চলিতেছে দেখিয়া বায়োস্কোপের দল দুই তিন দিন থাকিয়া গেল। তারপর একদিন সকালবেলা মালপত্র যন্ত্রপাতি গরুর গাড়িতে বোঝাই করিয়া প্রস্থান করিল। সেই দিন সন্ধ্যাবেলা দেখা গেল ভূপৎ গ্রামে নাই। বায়োস্কোপ দলের সঙ্গে সঙ্গে সেও অন্তর্ধান করিয়াছে।

সে-রাত্রে বেশী খোঁজ খবর লওয়া চলিল না। পর দিন প্রাতে সম্পৎ সিং চারিদিকে লোক পাঠাইলেন। কয়েক মাইল দূরের একটি গ্রামে বায়োস্কোপ দলের সন্ধান মিলিল, কিন্তু ভূপৎকে পাওয়া গেল না। সে তাহাদের সঙ্গে আসে নাই।

সম্পৎ সিং অতিশয় কাতর হইলেন, নাতি নাতিনীদের কোলে লইয়া 'বাবুয়া রে' 'বাবুয়া রে' বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। একে পুত্রস্নেহে তাঁহার হৃদয় বিকল, উপরন্তু তাঁহারই কোন অনীপ্সিত অবহেলার ফলে ভূপৎ অভিমানে গৃহত্যাগ করিয়াছে এই কথা ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

লছমী কিন্তু কাঁদিল না, সে শক্ত রহিল। ভূপৎ তাহাকে কিছু বলিয়া যায় নাই, কিন্তু সে মনে মনে বুঝিয়াছিল। শ্বশুরের কান্নাকাটি দেখিয়া সে দ্বারের আড়াল হইতে নিম্নস্বরে বলিল—'বাবুজি, হয়রান হবেন না, কোনও ভয় নেই।'

সম্পৎ সিং চক্ষু মুছিয়া ভগ্নস্বরে বলিলেন—'বেটি, তুমি কিছু জানো? কেন সে চলে গেল? কোথায় চলে গেল?'

লছমী বলিল—'জানি না। কিন্তু আপনি ভয় পাবেন না, উনি শীগ্‌গির ফিরে আসবেন।'

পুত্রবধূর দৃঢ়তায় সম্পৎ সিং আশ্বাস পাইলেন।

কিন্তু ছয় মাস কাটিয়া গেল, ভূপতের দেখা নাই। সম্পৎ সিং আবার ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিলেন। লছমীর মনেও অজানিত আশঙ্কার স্পর্শ লাগিল।

তারপর হঠাৎ একদিন ভূপৎ ফিরিয়া আসিল। ছোট বড় করিয়া চুল ছাঁটা, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, একমুখ হাসি। ভূপৎ যেন আর সে ভূপৎ নয়, তাহার আকৃতি-প্রকৃতি সমস্ত বদলাইয়া গিয়াছে।

ভূপৎ পিতার পদধূলি লইল। সম্পৎ সিং 'বাবুয়া রে—' বলিয়া পুত্রকে জড়াইয়া ধরিলেন।

অতঃপর তিনি একটু শান্ত হইলে ভূপৎ গত ছয় মাসের কাহিনী বলিল।—বায়োস্কোপ দলের মিস্ত্রির নিকট ঠিকানা জানিয়া লইয়া সে কলিকাতায় গিয়াছিল। কলিকাতায় একটি ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানীর কারখানায় চাকরি লইয়া বিদ্যুৎ বিদ্যা শিখিয়াছে। কোম্পানীর বড় সাহেব বিদ্যুৎ সম্বন্ধে তাহার সহজাত বুদ্ধি দেখিয়া তাহাকে চাকরি দিয়াছেন। শীঘ্রই পাটনায় বিদ্যুৎ-বাতি আসিবে, ভূপৎ কোম্পানীর পক্ষ হইতে পাটনায় বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও মেরামতির দোকান খুলিবে। পঞ্চাশ

টাকা মাহিনা ও কমিশন।

সম্পৎ সিং বলিলেন—'বেটা, তুমি পরের নৌকরি করবে কেন? তোমার কি পয়সার অভাব?'

ভূপৎ বলিল—'পয়সার জন্যে নয় পিতাজি, আমি বিজুলির কাজ করব। বিজুলির কাজ করতে আমি ভালবাসি। পাটনায় বাসা ঠিক করে আমি আপনার আশীর্বাদ নিতে এসেছি। বহুরুদেরও নিয়ে যাব।'

সম্পৎ সিং তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—'তোমার যে-কাজ ভাল লাগে তাই কর বেটা। আমিও তোমার সঙ্গে পাটনায় যাব, তোমার ঘর-বসত করে দিয়ে আসব।'

পরদিন ভূপৎ পিতা ও স্ত্রীপুত্র লইয়া পাটনা চলিয়া গেল। ভূপতের অপদার্থ নাম ঘুচিয়াছে, সে তাহার স্বধর্ম খুঁজিয়া পাইয়াছে।

ভাবিতেছি, ভূপৎ যদি শতবর্ষ পূর্বে, এমন কি পঞ্চাশ বছর পূর্বেও জন্মগ্রহণ করিত তাহা হইলে কী হইত? তখন বিদ্যুৎ-যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নাই, ভূপৎ সম্ভবত নিষ্কর্মা অপদার্থ বদনাম লইয়াই জীবন কাটাইয়া দিত। বর্তমানেও এমনি কত অপদার্থ মানুষ অজ্ঞাত ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া নিষ্ক্রিয় নিরর্থক জীবন কাটাইয়া দিতেছে কে তাহার হিসাব রাখে?

চরিত্র

যাঁহারা গল্প উপন্যাস লেখেন, চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহাদের সর্বদাই সতর্ক থাকিতে হয়। তাঁহাদের নিজেদের চরিত্রের কথা বলিতেছি না, সে বিষয়ে তাঁহারা নিরঙ্কুশ, নেশা ভাঙ পঞ্চমকার সব কিছুই চলিতে পারে। কিন্তু তাঁহারা যে চরিত্র সৃষ্টি করিবেন, সেগুলির সঙ্গতি থাকা দরকার, আত্মবিরোধী হইলে চলিবে না। যেমন ধরা যাক, চরিত্রহীন উপন্যাসে উপীনের চরিত্র। উপীন যদি সতীশের পকেট মারিত কিংবা কিরণময়ীর সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হইয়া পড়িত, তাহা হইলে সব মাটি হইয়া যাইত। সমালোচকেরা ভ্রূকুটি করিয়া বলিতেন, উপীনের চরিত্র অস্বাভাবিক। পাঠক সমাজ নাসিকা কুঞ্চিত করিতেন। শরৎচন্দ্র সাহিত্য সম্রাট হইতে পারিতেন না।

তাই ভাবিতেছি আমার বাল্যবন্ধু ভবেশের চরিত্রটা সত্যের প্রতি নিষ্ঠা রাখিয়া প্রকাশ করিলে সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয় কি না। বোধহয় হয় না। কিন্তু না হোক, সত্য কথা বলিতে দোষ কি? সাহিত্য না হয় না-ই হইল। আমরা যাহা লিখি, সবই

কি সাহিত্য হয়?

আমি ও ভবেশ স্কুলের এক ক্লাসে পড়িতাম। ছোট শহরের হাই স্কুল, অনেক রকম ছাত্র তাহাতে পড়িত। উ'চু ক্লাসে এমন দুই চারিজন ছাত্র ছিল যাহারা গোঁফ কামাইয়া স্কুলে আসিত, বছরের পর বছর একই ক্লাসে মৌরসীপাট্টা লইয়া বসিয়া থাকিত। মাস্টারেরা তাহাদের সমীহ করিয়া চলিতেন। কিন্তু সে যাক।

ভবেশের চেহারা ছিল হাড়-চওড়া পেশীপ্রধান মজবুত গোছের। মুখের আকৃতি গোল কিন্তু মাংসল নয়; ভ্রূ যুগল বয়সের অনুপাতে রোমশ। ভ্রূর নীচে চোখের দৃষ্টি প্রখর, চেয়ালের হাড় চিবুকের কাছে আসিয়া চৌকশ হইয়া গিয়াছে।

আমার সহিত ভবেশের বেশী বন্ধুত্বের কারণ বোধহয় এই যে, আমরা দু'জনেই স্কুলের ফুটবল টীমে খেলিতাম। তাছাড়া আর একটা মিল ছিল, দু'জনের স্কুল হইতে বাড়ি ফিরিবার পথ ছিল অনেকখানি একই দিকে। গল্প করিতে করিতে দু'জনে স্কুল হইতে ফিরিতাম, তাহার পর সে একটা মোড় ঘুরিয়া নিজের বাড়ির দিকে চলিয়া যাইত, আমি সোজা রাস্তা দিয়া আরও কিছু দূর গিয়া নিজের বাড়িতে পে'ীছিতাম। চৌদ্দ-পনের বছর বয়সে বন্ধুত্ব গাঢ় হইতে ইহার অধিক প্রয়োজন হয় না।

ভবেশের প্রকৃতির মধ্যে একটা প্রচণ্ডতা ছিল। সে যে স্বভাবতই রাগী ছিল তা নয়, কিন্তু একবার রাগিলে তাহার মুখ ফুটিবার আগেই হাত ছুটিত। মৌখিক ঝগড়া সে করিত না, সে করিত মারামারি। কিন্তু এ কথাও স্বীকার করিতে হয় যে, অন্যায়ভাবে সে কাহাকেও ঠেঙাইত না। তাহার মনে একটা কঠিন ন্যায়নিষ্ঠা ছিল, তাহাতে আঘাত লাগিলে সে আর ধৈর্য রাখিতে পারিত না, মারামারি বাধাইয়া দিত।

এই যুদ্ধ প্রবণতার জন্য শহরে তাহার অখ্যাতির অন্ত ছিল না। কিন্তু সেই অখ্যাতির সঙ্গে খানিকটা অনিচ্ছাদত্ত খ্যাতিরও ছিল। ব্যাদড়া ছেলেরা তাহাকে ভয় করিত, আবার ভাল ছেলেরাও তাহার সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে মিশিতে পারিত না। তাই বোধহয় আমি ছাড়া তাহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু কেহ ছিল না।

একদিনের ঘটনা বলিতেছি, তাহা হইতে ভবেশের তৎকালিক কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে। স্কুলে টিফিনের ছুটি হইয়াছে, ভবেশ আমাকে আড়ালে লইয়া বলিল— 'আজ জগন্নাথকে ঠুকব।'

জগন্নাথ লম্বা সিড়িঙ্গে গোছের একটা ছেলে, বয়স কুড়ি-বাইশ, ক্রমাগত টেস্ট পরীক্ষায় ফেল করিয়া পরিপক্ক হইয়াছিল। সে মাস্টারদের নল্চে আড়াল দিয়া স্কুলের প্রাঙ্গণেই সিগারেট টানিত এবং সমবয়স্ক কয়েকটা ছেলের সঙ্গে দল পাকাইয়া চাপা গলায় অশ্লীল গান গাহিত। কিন্তু সে আমাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখিত না, তাহাকে ঠুকিবার কী প্রয়োজন বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম— 'জগন্নাথকে ঠুকবি কেন?'

ভবেশের মুখ লাল হইয়াই ছিল, এখন তাহার গ্রীবা যেন ফুলিয়া স্থূল হইয়া উঠিল। সে বলিল—'বেটা মেয়ে-স্কুলের ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে, মেয়েরা যখন ছুটির পর স্কুল থেকে বেরোয় তখন তাদের পানে তাকিয়ে হাসে, শিস্ দেয়—'

প্রশ্ন করিলাম—'তুই জানলি কি করে?'

ভবেশ বলিল—'আমাদের পাশের বাড়ির একটি মেয়ে স্কুলে পড়ে, সে তার দিদিকে বলেছে, তার দিদি আমার দিদিকে বলেছে।'

যে সময়ের কথা সে-সময়ে মেয়েদের স্কুলে পড়া এমন সার্বজনিক হয় নাই, যাঁহারা স্কুলে মেয়ে পাঠাইতেন তাঁহারাও মেয়ের নৈতিক নিরাপত্তা সম্বন্ধে সর্বদা সশঙ্ক থাকিতেন। এরূপ ব্যাপার ঘটিতেছে জানিতে পারিলে অনেকেই বদনামের

ভয়ে মেয়ের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করিবেন। ইহার একটা বিহিত হওয়া দরকার। তবু দাঙ্গা-হাঙ্গামা না করিয়া যদি উপায় হয় এই উদ্দেশ্যে বলিলাম—'তা ঠোকবার দরকার কি! আমাদের হেডমাস্টারের কানে তুলে দিলেই তো হয়—।'

কিন্তু অত বাঁকাচোরা পথে চলিতে ভবেশ অভ্যস্ত নয়, সে মাথা ঝাঁকাইয়া বলিল—'না, ঠুকবো ব্যাটাকে। আজ ক্লাসের ছুটি হলেই যাব, যদি দেখি মেয়ে-স্কুলের ধারে কাছে আছে তাহলে ওরই একদিন কি আমারই একদিন।'

ভবেশ আমাকে মারামারিতে যোগ দিতে ডাকে নাই, আমি নিজেই বন্ধুত্বের খাতিরে গিয়াছিলাম। জগন্নাথ ভবেশের চেয়ে বয়সে অনেক বড়, গায়েও জোর বেশী, কিন্তু ভবেশ সেদিন তাহাকে দুর্দম ঠেঙাইয়াছিল, আমিও দুই চারিটা পদাঘাত মুষ্ট্যাঘাত যে করি নাই এমন নয়। জগন্নাথ মার খাইয়া পলায়ন করিয়াছিল এবং আর কখনও স্কুলের মেয়েদের উত্যক্ত করে নাই।

তাহার পর ভবেশ যতদিন স্কুলে ছিল ততদিন আরও অনেক মারামারি করিয়াছিল। কিন্তু সে সব কাহিনী লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই, তাহার চরিত্রের গতি ও প্রবৃত্তি নির্দেশ করাই আমার উদ্দেশ্য। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহার চরিত্র পরিপুষ্ট হইয়া কিরূপ আকার ধারণ করিবে তাহা অনুধাবন করা মনস্তত্ত্বনিপুণ ব্যক্তির পক্ষে কঠিন নয়। উঠন্তি মুলো পত্তনেই চেনা যায়।

ম্যাট্রিক পাস করার পর আমাদের ছাড়াছাড়ি হইল; ভবেশ কলিকাতায় পড়িতে গেল, আমি মফঃস্বলের এক কলেজে ভর্তি হইলাম। ছুটিছাটায় দেখা হইত, কলিকাতায় গিয়া তাহার মনে নারীর মর্যাদা এবং মারামারির উপকারিতা সম্বন্ধে কোনও ভাবান্তর হয় নাই। তারপর যখন আই. এ. পাস করিলাম তখন তাহার সহিত দেখা-সাক্ষাতের সূত্র একেবারে ছিন্ন হইয়া গেল। তাহার বাবা বদলি হইয়া অন্য জেলায় গেলেন।

প্রথম কিছুদিন চিঠিপত্র লেখালেখি চলিল, তাহার পর তাহাও বন্ধ হইয়া গেল। বি. এ. পরীক্ষার পর কাগজে দেখিলাম ভবেশ পাস করিয়াছে। অভিনন্দন জানাইয়া চিঠি লিখিব লিখিব করিয়া আর লেখা হইল না।

কয়েক মাস পরে ছাপা চিঠি আসিল—ভবেশের বিবাহ। চিঠির এক কোণে ভবেশ পেন্সিল দিয়া লিখিয়া দিয়াছে—নিশ্চয়ই আসিস।

আমার তখন বিলাতে যাইবার একটা সম্ভাবনা দানা বাঁধিতেছে। তাহার তদ্বির করিবার জন্য কলিকাতায় যাওয়া প্রয়োজন। এক ঢিলে দুই পাখি মারিলাম, ভবেশের বিবাহে যোগ দিলাম।

ভবেশ আমাকে দেখিয়া খুশী, আমি ভবেশের বৌ দেখিয়া খুশী। খাসা বৌ হইয়াছে, হাস্যমুখী স্বাস্থ্যবতী মেধাবিনী। ভবেশ চুপিচুপি জানাইল দুই পক্ষেই পূর্বরাগ হইয়াছিল। স্ত্রীজাতির সহিত তাহার গাঢ়ভাবে মেলামেশা এই প্রথম, দেখিলাম ভিতরে ভিতরে সে নার্ভাস হইয়া পড়িয়াছে।

যা হোক, ভবেশের ভয়ভঙ্গুর দাম্পত্য-জীবন আরম্ভ হইল, আমি বিলাত যাত্রা করিলাম।

তিন বছর পরে চাকরি লইয়া দেশে ফিরিলাম।

কলিকাতার কাছেই আমার আস্তানা পড়িয়াছে। প্রথম চাকরি-জীবনের উদ্যোগ উপক্রমের পালা শেষ করিয়া একদিন ভবেশের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম।

তাহার চেহারা খারাপ হইয়া গিয়াছে। শরীরের একপ্রকার পরিণতি আছে যাহার সহিত অকালপক্ক ফলের তুলনা করা চলে, ভবেশের দেহটা যেন ইঁচড়ে পাকিয়া গিয়াছে। বলিলাম—'কি হয়েছে তোর? শরীর খারাপ নাকি?'

সে হাসিল। হাসিটা কিন্তু তাহার স্বাভাবিক হাসির মত নয়, তাহাতে একটা

বক্রতা রহিয়াছে। বলিল—'শরীর ঠিক আছে। তোর খবর কি বল।'

তাহার বাবা বছর দুই আগে মারা গিয়াছেন, এখন সে অনেক টাকার মালিক। পাঁচ রকম কথাবার্তার মধ্যে এক সময় বলিল—'তুই শুনিসনি বোধহয়, আমার বৌ মারা গেছে।'

অবাক হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলাম, দেখিলাম তাহার মুখে বেদনা বা শোকের চিহ্নমাত্র নেই। জিজ্ঞাসা করিলাম—'কি হয়েছিল?'

'হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেল।'

'কদ্দিন হল?'

'বছরখানেক।—এখন আমি স্বাধীন।' বলিয়া দুই বাহু দুইদিকে প্রসারিত করিয়া আড়মোড়া ভাঙিল।

'ছেলেপুলে?'

'ছেলেপুলে হয়নি। অর্থাৎ হতে দিইনি।'

শুধু চেহারা নয়, তাহার মনের উপরও ভাঁটা পড়িয়া গিয়াছে। তাহার কথায় বার্তায় ভাবে ভঙ্গীতে এই সত্যটাই স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, সে ভদ্রলোক ছিল, এখন একেবারে চোয়াড় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভবেশ—সেই ভবেশ কি করিয়া এমন হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পর সে বলিল—'আমার বাড়িতে ভাল খাওয়ার ব্যবস্থা নেই। বেশীর ভাগ হোটেলেই খাই। চল, আজ তোকে হোটেলে খাওয়াব।'

বলিলাম—'চল।'

'একটু বস্, আমি কাপড়-চোপড় বদলে আসি।'

মিনিট কয়েক পরে সে বিলাতী পোশাক পরিয়া আসিল। মোটরে চড়িয়া দু'জনে বাহির হইলাম। উচ্চ শ্রেণীর এক সাহেবী হোটেলে গিয়া ভবেশ ডিনার ফরমাশ করিল। প্রথমে কক্‌টেল আসিল। ভবেশ এক চুমুকে নিজের পাত্র নিঃশেষ করিয়া আবার কক্‌টেল হুকুম দিল। আমি নিজের পাত্রটি হাতে লইয়া অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলাম। যাহারা মদ খায় তাহাদের প্রতি ভবেশের মনে তীব্র ঘৃণা ছিল। সেই ভবেশ।

আমাদের অদূরে একটি টেবিলে এক বঙ্গ-তরুণী আহারে বসিয়াছিলেন। আমি স্ত্রী-স্বাধীনতা বা আধুনিকতার নিন্দা করিতেছি না, কিন্তু এই তরুণীর বেশ-বাস এতই সংক্ষিপ্ত যে আমার মত বিলাত ফেরতের চক্ষুও লজ্জায় নত হইয়া পড়ে। ভবেশ তাঁহার দিকে নির্লজ্জভাবে চাহিয়া রহিল, যেন চক্ষু দিয়া তাঁহার কমনীয় দেহটি গিলিতে লাগিল, অতিবড় চাষাও বোধকরি ওভাবে স্ত্রীলোকের পানে তাকায় না। তাহার এই অসভ্যতা কিছুক্ষণ নীরবে সহ্য করিয়া হ্রস্বকণ্ঠে বলিলাম—'এই ভবেশ, ও কি হচ্ছে!'

ভবেশ আমার দিকে ক্ষণেকের জন্য চোখ ফিরাইয়া বক্রমুখে হাসিল, বলিল—'কি আর হবে, যা সবাই করে তাই করছি। তুই যে ভারি সাধুগিরি ফলাচ্ছিস। বলতে চাস কি? বিলেতে গিয়ে ফুর্তি করিসনি?'

'না করিনি। কিন্তু তোর হল কি ভবেশ। তোর মন তো এমন নোংরা ছিল না।'

'নে নে, আর ন্যাকামি করিসনি। সব মিঞাকে আমি চিনি, সবাই ডুবে ডুবে জল খায়।'

ভাগ্যক্রমে এই সময় ডিনার আসিয়া পড়িল। কোনও মতে আহার শেষ করিয়া বলিলাম—'এবার আমি উঠব। বাসায় ফিরতে রাত হবে।'

ভবেশ বলিল—'আরে এখনি কি! এই তো সবে কলির সন্ধ্যে।—কি খাবি বল্—

পোর্ট না শেরি?'

'কিছু খাব না ভাই, আমি এবার বাড়ি যাব।'

'ভয় নেই, আমি তোকে মোটরে পেঁছে দেব।—এক পেগ্ টানবি না? For old times sake?—বেশ, তবে চল।'

অনিচ্ছাভরে ভবেশ উঠিল, হ্রস্ববাস তরুণীর প্রতি নির্লজ্জ লোলুপ কটাক্ষপাত করিয়া বাহিরে আসিল।

মোটরে কিছুক্ষণ চলিবার পর মনে হইল সে অন্য দিকে চলিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম—'কোথায় নিয়ে চললি?'

'রেড রোডের দিকে। ডিনারের পর কিছুক্ষণ ওদিকে বেড়াতে বেশ লাগে।' তাহার কণ্ঠস্বরে যেন একটু দুষ্টবুদ্ধির আভাস পাইলাম।

আলো ছায়ায় অস্পষ্ট রেড রোড। সেখানে পৌঁছিয়া ভবেশের দুষ্টবুদ্ধি প্রকাশ পাইল। আমি জানিতাম না যে এই সময় এখানে পণ্যরমণীদের বেসাতি হইয়া থাকে। ভবেশ মোটর থামাইয়া গাড়ি হইতে নামিল, শিস্ দিতে দিতে রাস্তায় পায়চারি করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে কয়েকটি ছায়াময়ী নারীমূর্তির আবির্ভাব হইল।

'হ্যালো ডিয়ার!' 'হ্যালো ডার্লিং!' 'গুড ঈভ্নিং মাই ডিয়ার!'

ভবেশ দুইটি বাছিয়া লইয়া তাহাদের সহিত বাহু শৃঙ্খলিত করিয়া মোটরের দিকে ফিরিল।

আমি গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িলাম। বলিলাম—'ভবেশ, তোমার সঙ্গে আমার এই শেষ। তুমি উচ্ছন্ন যেতে চাও একলা যাও, আমাকে সঙ্গী পাবে না।—চললাম।'

পাঁচ বছর কাটিয়া গিয়াছে, ভবেশের সঙ্গে আর দেখা হয় নাই। ইতিমধ্যে আমি বিবাহ করিয়াছি, সুখে দুঃখে জীবন চলিতেছে। ভবেশের কথা মনে হইলে বিরক্তি ও ঘৃণায় মন ভরিয়া ওঠে। সে নিজে লম্পট দুশ্চরিত্র হইয়া গিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও দলে টানিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহার এই প্রবৃত্তি কোথা হইতে আসিল? তাহার ধাতুর মধ্যে কি এই অধঃপতনের বীজ নিহিত ছিল? গুটিপোকা হঠাৎ গুটি কাটিয়া প্রজাপতি রূপে বাহির হইয়া আসে। মানুষের মধ্যেও কি এই রূপান্তরের সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন আছে?

কিন্তু ভবেশের রূপান্তরের পালা এখনও শেষ হয় নাই। অকস্মাৎ তাহার নিকট হইতে এক চিঠি পাইলাম। সে লিখিয়াছে—

ভাই অরুণ, আমি চললাম। কোথায় যাচ্ছি এখনও জানি না। ব্যাঙ্কে আমার কিছু টাকা আছে, তোমাকে দিয়ে গেলাম। তুমি খরচ করলে টাকাগুলোর সদ্গতি হবে। ব্যাঙ্কে আমি চিঠি লিখে দিয়েছি, তুমি গিয়ে খবর নিলেই সব ব্যবস্থা হবে। —তোমার ভবেশ।

তাহার কিছুদিন পরে ব্যাঙ্ক হইতেও চিঠি আসিল। ব্যাঙ্কে গিয়া জানিতে পারিলাম ভবেশ প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা রাখিয়া গিয়াছে, আমি তাহা যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে পারি। আমি অবশ্য সে-টাকা স্পর্শ করি নাই, এখনও তাহা ব্যাঙ্কেই জমা আছে।

কিন্তু ভবেশ কোথায় গেল? এবং কেনই বা গেল? সে কি কোনও দুষ্কৃতি করিয়া ফেরারী হইয়াছে? সন্তর্পণে খোঁজ খবর লইলাম, কিন্তু তাহার নামে ওয়ারেণ্ট আছে এমন কোনও খবর পাওয়া গেল না। অকারণেই সে সব ফেলিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছে।

আরও পাঁচ-ছয় বছর কাটিয়া গেল। তাহার পর একদিন কলিকাতা হইতে হাজার মাইল দূরে নর্মদার তীরে এক বটবৃক্ষতলে ভবেশকে দেখিতে পাইলাম। ঘাটের ধারে বেড়াইতে গিয়াছিলাম, ন্যাড়া মাথা ও আলখাল্লা পরা লোকটাকে প্রথমে গ্রাহ্য করি নাই, তাহার পর কী মনে হইল, ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখি—ভবেশই বটে। দশ-বারো বছর দেখি নাই তবু চিনিতে পারিলাম। চেহারা তেমনি আছে, শুধু যেন একটু মোলায়েম হইয়াছে।

'ভবেশ!'

সে সলজ্জভাবে চক্ষু মিটিমিটি করিল।

বলিলাম 'এ আবার কী নতুন ঢং। সাধু হয়েছ দেখছি।'

সে বলিল—'সাধু নয় ভাই, ভিখিরি হয়েছি।' তাহার কণ্ঠস্বর কেন জানি না বড় মিষ্ট লাগিল।

'ভিখিরি হয়েছ!'

ভবেশ আবার অপ্রস্তুতভাবে চক্ষু মিটিমিটি করিল।

পুনশ্চ প্রশ্ন করিলাম—'ভিখিরি হয়ে কি লাভ হল?'

সে যেন কতকটা আত্মগত ভাবেই বলিল—'লাভ—লাভের আশায় তো ভিখিরি হইনি। তবে—লাভ হয়েছে। ভিক্ষায় চিত্তশুদ্ধি হয়, অহংকার নাশ হয়—'

'ছাই হয়। এটা তোমার একটা নতুন ধরনের বাঁদরামি।'

সে মৃদু হাসিল—'তাও হতে পারে, কিন্তু কি করব ভাই, আমি নিজের ইচ্ছেয় কিছুই করিনি। একদিন কে যেন ঘাড় ধরে আমাকে সংসার থেকে বার করে দিলে। এখন বুঝতে পারছি আমি জীবনে কোনও দিন নিজের ইচ্ছেয় কিছু করিনি, সব প্রকৃতি করিয়েছে। প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি—'

'ঢের হয়েছে, সংস্কৃত আউড়ে নিজের লজ্জা প্রকৃতির ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা কোরো না। এবার ভাল ছেলের মত গুটিগুটি দেশে ফিরে চল। তোমার টাকা আমি এক পয়সা খরচ করিনি। সংসারে থেকেও ভদ্রভাবে জীবনযাপন করা যায়।'

সে চুপ করিয়া রহিল। আমি তখন গাছের একটা শিকড়ের উপর বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাকে বুঝাইলাম। সে তর্ক করিল না। চুপ করিয়া শুনিল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে দেখিয়া আমি উঠিলাম। 'কাল আবার আসব' বলিয়া চলিয়া আসিলাম। পরদিন সকালবেলা গাছতলায় গিয়া দেখি সে চলিয়া গিয়াছে।

আর তাহার দেখা পাই নাই। কে জানে ইহার পর তাহার অন্য কোনও রূপান্তর ঘটিয়াছে কি না।

গীতা

গোবিন্দবাবু ও মুকুন্দবাবু দুই ভাই একান্নবর্তী ছিলেন। উভয়ে মিলিয়া বহু সম্পত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। গোবিন্দবাবুর দুই ছেলে, খগেন ও নগেন। মুকুন্দবাবু নিঃসন্তান।

গোবিন্দবাবু যখন পরিণত বয়সে দেহরক্ষা করিলেন তখন খগেন ও নগেন সাবালক হইয়াছে, তাহারা সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইতে চাহিল। খগেন অত্যন্ত বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন লোক, সে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করিতে চায়; নগেন ফুর্তিবাজ, সে ফুর্তি করিতে চায়। দু'জনেরই টাকা চাই, খুড়ার হাত-তোলায় থাকিতে তাহারা রাজী নয়।

মুকুন্দবাবু ধার্মিক ও ধীরবুদ্ধি লোক। তিনি ভাইপোদের, বিশেষত ফুর্তিবাজ নগেনকে মনে মনে ভালবাসিতেন। তিনি তাহাদের সৎপথে থাকিবার উপদেশ দিলেন, তারপর চুল চিরিয়া বিষয় ভাগ করিয়া দিলেন। কলহ মনান্তর কিছু হইতে পাইল না। খগেন ও নগেন নিজ নিজ অংশ লইয়া কলিকাতায় গেল। খগেন শেয়ার বাজারে ঢুকিল। নগেন পঞ্চমকার লইয়া পড়িল। এতদিন যাহারা একসঙ্গে ওঠা-বসা করিয়াছে তাহারা তিন ভাগ হইয়া গেল।

কয়েক বছর কাটিল। খগেন একাগ্রমনে ব্যবসা করিতেছে, নগেন অনন্যমনে ফুর্তি করিতেছে। খুড়া মুকুন্দবাবু মাসে একখানি করিয়া চিঠি লিখিয়া ভাইপোদের তত্ত্ব-তল্লাস লন। খগেন মাঝে মাঝে আসিয়া খুড়ার সঙ্গে দেখা করিয়া যায়। নগেন বড় একটা আসে না। নগেনের চেয়ে খগেনের বিষয়বুদ্ধি বেশী। কিন্তু তবু এমনই মানুষের মন যে, ধার্মিক মুকুন্দবাবু মনে মনে উচ্ছৃঙ্খল নগেনকে বেশী ভালবাসেন।

একদিন মুকুন্দবাবু বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার সময় হইয়াছে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি নিজ সম্পত্তির ব্যবস্থা করিলেন। ব্যবস্থা দেখিয়া সকলের হৃদয়ঙ্গম হইল যে, মুকুন্দবাবু ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বটে।

খগেন নিজের অফিসে কাজ করিতেছিল, খুড়ার এক পত্র পাইল। খামের মধ্যে এক তা কাগজ, মুকুন্দবাবু স্বহস্তে লিখিয়াছেন—

আমি আজ ১৮ জুলাই ১৯২৯ তারিখে সুস্থ মনে স্বেচ্ছায় এই উইল করিতেছি যে আমার মৃত্যুর পর আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান খগেন্দ্রনাথ আমার যাবতীয় সম্পত্তি পাইবে। শ্রীমুকুন্দলাল গাঙ্গুলী, বকলম খাস।

এই সময়ে কলিকাতার অন্য প্রান্তে নগেন খুড়ার নিকট হইতে একখানি চিঠি ও রেজিস্ট্রি-করা একটি প্যাকেট পাইল। নগেন তখন সবে ঘুম ভাঙিয়া বৈঠকখানায় বসিয়া আড়মোড়া ভাঙিতেছিল, চিঠি পড়িয়া দেখিল—

কল্যাণবরেষু,

নগেন, আমার শরীর ভাল নয়, বোধ হয় আর বেশী দিন বাঁচিব না। মৃত্যুর পূর্বে তোমার সঙ্গে দেখা হইবে এমন আশা করি না। তোমাকে দূর হইতেই আশীর্বাদ করিতেছি এবং সৎপথে চলিবার উপদেশ দিতেছি। আজ রেজিস্ট্রি ডাকে তোমার নামে একখানি শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতা পাঠাইলাম, বইখানি যত্ন করিয়া পড়িও। মৃত্যুকালে আমি তোমাকে ইহাই দান করিয়া গেলাম।

ইতি আশীর্বাদক—তোমার কাকা শ্রীমুকুন্দলাল গাঙ্গুলী।

চিঠি পড়িয়া নগেন মুখ বিকৃতি করিল। বিষয় সম্পত্তি টাকাকড়ি বোধহয়

দাদা পাইবে! আর আমার জন্য শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতা। নগেন রেজিস্ট্রি প্যাকেটখানা তুলিয়া লইয়া ঘোর ভক্তিভরে নিরীক্ষণ করিল, তারপর টান মারিয়া ঘরের এক কোণে ফেলিয়া দিল।

ভৃত্য আসিয়া প্যাকেট তুলিয়া লইয়া বলিল, 'এটা কি বাবু?'

নগেন মুখ বাঁকাইয়া হাসিল, 'গীতা। নিয়ে যা—যত্ন করে পড়িস।—আর. বীয়ার নিয়ে আয়।'

মাসখানেক পরে মুকুন্দবাবু মারা গেলেন। খগেন যথারীতি তাঁহার শ্রাদ্ধ করিল এবং উইল প্রুভ করিয়া সম্পত্তি দখল করিয়া বসিল। নগেন কোনও প্রকার আপত্তি উপস্থিত করিল না। তাহার হাতে এখনও অনেক টাকা, খুড়ার অনুগ্রহ সে চায় না।

তারপর দশ বছর কাটিয়া গিয়াছে। নগেন এখন নিঃস্ব। সম্পত্তি ফুরাইয়া গিয়াছে, বাড়ি বিক্রি হইয়াছে. এমন কি আসবাবপত্র লাটে উঠিয়াছে। বাড়ির নূতন মালিক নোটিশ দিয়াছে. আজ বাড়ি ছাড়িয়া দিতে হইবে।

নিরাভরণ বাড়ির মধ্যে নগেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কলসীর জল ঢালিতে ঢালিতে শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তৃষ্ণার শেষ নাই। নগেন বুকফাটা তৃষ্ণায় ছটফট করিয়া ফিরিতেছিল। মদ—এক গ্লাস মদ। আজ তাহার এমন অবস্থা যে এক গ্লাস মদ কিনিয়া খাইবার সামর্থ্য নাই। কেহ একটা টাকা ধার দিবে না। যে-সব বন্ধু তাহার পয়সায় মদ খাইত তাহারা সরিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু—এক গ্লাস মদ না পাইলে তাহার তৃষ্ণা মিটিবে কি করিয়া! কাল কি হইবে তাহা তো কালকের কথা, আজ এক গ্লাস মদ পাওয়া যায় কোথায়? একটা টাকা—আট আনা পয়সা কি কোথাও পাওয়া যায় না?

অশান্ত চামচিকার মত ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ তাহার নজর পড়িল—ঘরের একটা উঁচু তাকের উপর কি যেন রহিয়াছে। নগেন হাত বাড়াইয়া সেটা তাক হইতে পাড়িল। ধূলিধূসর একটা বাদামী কাগজ-মোড়া প্যাকেট। কিসের প্যাকেট নগেন মনে করিতে পারিল না। ধুলা ঝাড়িয়া দেখিল রেজিস্ট্রি—খোলা হয় নাই—প্রেরকের নাম মুকুন্দলাল গাঙ্গুলী। তখন মনে পড়িয়া গেল—গীতা! মৃত্যুর পূর্বে কাকা পাঠাইয়াছিলেন।

গীতা... গীতা বিক্রয় করিলে কত পয়সা পাওয়া যায়! গীতা কি কেউ কেনে? হয়তো এমন লোকও পৃথিবীতে আছে যাহারা গীতা কিনিয়া পড়ে। নগেন মোড়ক খুলিয়া ফেলিল।

সোনার জলে নাম লেখা কাপড়ের বাঁধাই গীতা—এখনও বেশ ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। কত দাম কে জানে। নগেন প্রথম পাতাটা খুলিল—

একখানা ভাঁজ করা কাগজ রহিয়াছে। নগেন খুলিয়া পড়িল. তাহার খুড়ার হস্তাক্ষর—

আমি আজ ১৯শে জুলাই ১৯২১ তারিখে সুস্থ মনে স্বেচ্ছায় এই উইল করিতেছি। পূর্বে যে উইল করিয়াছিলাম তাহা অত্র দ্বারা নাকচ করা হইল। আমার মৃত্যুর পর আমার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র খগেন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ আমার যাবতীয় সম্পত্তি ও টাকাকড়ি সমান ভাগে পাইবে। শ্রীমুকুন্দলাল গাঙ্গুলী, বকলম খাস।

পড়িতে পড়িতে নগেন তৃষ্ণা ভুলিয়া গেল। কাকার সম্পত্তির অর্ধেক, অর্থাৎ অন্তত লাখ খানেক টাকা। হায় হায়, এত দিন সে মোড়কটা খুলিয়া দেখে নাই কেন? যে উইলের জোরে দাদা সমস্ত সম্পত্তি দখল করিয়াছিল সে উইল কাকা নাকচ করিয়াছেন। এই উইলই বলবৎ। আর যাইবে কোথায়! দাদার গলা টিপিয়া

সে নিজের ভাগ বাহির করিয়া লইবে।

গীতা মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিয়া নগেন পাগলের মত ছুটিল। আগে সে উকিলের কাছে যাইবে, সেখান হইতে উকিলকে সঙ্গে লইয়া দাদার অফিসে যাইবে—

কিন্তু অতদূর যাইতে হইল না, দ্বারের কাছেই খগেনের সঙ্গে তাহার দেখা হইল। খগেন হাঁটিয়া আসিয়াছে—তাহার মুখ শুষ্ক, চুল উস্কখুস্ক। বারো বছর পরে দুই ভাইয়ে সাক্ষাৎ।

খগেন ব্যগ্রস্বরে বলিল, 'নগেন, তোর কাছে এসেছি, বড় দরকার। কিছু টাকা ধার দিতে পারিস?'

'ধার—!' নগেন ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

খগেন বলিল, 'হ্যাঁ। আমার সব গেছে। বাড়ি বিক্রি করতে হয়েছে, গাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে—তবু ধার শোধ হয়নি। এখন দশ হাজার টাকা বার করতে না পারলে শেয়ার মার্কেট থেকে নাম কেটে দেবে।'

নগেন হঠাৎ খগেনের ঘাড় ধরিয়া ঝাঁকুনি দিতে লাগিল—'কিন্তু কাকার যে এত টাকা পেয়েছিলি তার কি হল? তার অর্ধেক ভাগ যে আমার! এই দ্যাখ্ উইল—' নগেন খগেনের নাকের কাছে উইল মেলিয়া ধরিল।

খগেন বলিল, 'কিচ্ছু নেই, কিচ্ছু নেই। তুই পারবি না দিতে? দিবি না? দশ হাজার টাকা—'

এবার নগেন হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল—'দশ হাজার টাকা!—একটা জিনিস আছে—গীতা। আয় দাদা, গীতা বিক্রি করব। একটা টাকা পাওয়া যাবে না? তুই আট আনা নিস, আমি আট আনা নেব। কেমন, হবে তো? হা হা হা—'

ঘড়িদাসের গুপ্তকথা

চল্লিশ বছর কাটিয়া যাইবার পর কোনও গুপ্ত কথারই আর ঝাঁঝ থাকে না, ছিপি-আঁটা বোতলের আরকের মত অলক্ষিতে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। বিশেষত গুপ্তকথার স্বত্বাধিকারী যদি সামান্য লোক হয়। আমার তরুণ বয়সের বন্ধু ঘড়িদাস অসামান্য লোক ছিল না; তাই চল্লিশ বছর আগে তাহার গুপ্তকথায় যে বিচিত্র চমৎকারিত্বের স্বাদ পাইয়াছিলাম, তাহা হয়তো বহু পূর্বেই পান্সে হইয়া গিয়াছে। সে এখন কোথায় আছে, বাঁচিয়া আছে কিনা, কিছুই জানি না। সম্ভবত মরিয়া

গিয়াছে, কারণ বাঁচিয়া থাকিলে তাহার বয়স এতদিনে সত্তরের কাছাকাছি হইত। এত বয়স পর্যন্ত কয়জন বাঙ্গালী বাঁচিয়া থাকে? সে বিবাহ করে নাই, সন্তান সন্ততির অভাব। তাই ভাবিতেছি, ঘড়িদাসের গুপ্তকথা এখন প্রকাশ করিলে অন্যায় হইবে না।

বাংলা দেশের প্রত্যন্তভাগে মধ্যমাকৃতি একটি জেলা-শহরে তখন বাস করিতাম। রাস্তায় মোটর গাড়ির চেয়ে ঘোড়ার গাড়ি বেশী চলিত, রাত্রে কেরোসিনের বাতি জ্বলিত। ফ্রয়েডের নাম তখনও ভারতবর্ষে কেহ শোনে নাই।

ঘড়িদাসের আসল নাম হরিদাস। তাহার একটি ঘড়ি মেরামতের দোকান ছিল, তাই স্বভাবতই সকলে তাহাকে ঘড়িদাস বলিয়া ডাকিত। আমি যদিও ঘড়িদাসের চেয়ে চার-পাঁচ বছরের ছোট ছিলাম, তবু তাহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। আমার বয়স তখন ছিল উনিশ-কুড়ি; তাহার কাছে আমি দাবা খেলিতে ও সিগারেট খাইতে শিখিয়াছিলাম।

বাজারের মণিহারী পটির একপাশে ঘড়িদাসের দোকান ছিল। সামনে পিছনে দুটি ঘর। সামনের ঘরে দোকান, পিছনের ঘরে ঘড়িদাস বাস করিত। মনে আছে, তাহার বাসার ভাড়া ছিল সাড়ে চার টাকা। একবার তাহাকে ভাড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সে সগর্বে বলিয়াছিল—'হাফ পাস্ট ফোর।' ঘড়িদাসের বিদ্যা ছিল স্কুলের সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত, কিন্তু সে সুবিধা পাইলেই ইংরেজি বলিত।

ঘড়িদাসের মা-বাপ ছিল না। এক মামা ছিল, কলিকাতায় চাকরি করিত; মাঝে-মধ্যে ঘড়িদাসকে চিঠি লিখিত। তাহার বাসায় আত্মীয়স্বজন কাহাকেও কখনও দেখি নাই। সকালবিকাল সে দোকানে একটি দেরাজযুক্ত জলচৌকির সম্মুখে বসিয়া ঘড়ি মেরামত করিত, বাকি সময়টা পিছনের ঘরে শুইয়া কাটাইত। আমার সহিত তাহার আলাপের সূত্র, পরীক্ষার আগে আমার এলার্ম ঘড়িটা খারাপ হইয়া গিয়াছিল, তাহার কাছে মেরামত করাইতে লইয়া গিয়াছিলাম। সে মেরামত করিয়া দিয়াছিল, পয়সা লয় নাই। লোকটিকে আমার ভাল লাগিয়াছিল। তারপর হইতে দুপুরবেলা অবসর থাকিলে তাহার ঘরে গিয়া আড্ডা দিতাম। লুকাইয়া ধূমপান ও দাবা খেলা চলিত।

একদিন জৈষ্ঠ্যের আম-পাকানো দুপুরবেলা ঘড়িদাসের দোকানে গিয়াছি। দুপুরবেলা যদি কোনও খদ্দের আসে, এইজন্য সদরের দরজা ভেজানো থাকে। আমি তাহার দোকানঘর পার হইয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম; সে তক্তপোশে লম্বা হইয়া একখানা পোস্টকার্ড পড়িতেছে। আমি বলিলাম—'এ কি ঘড়িদা, তোমাকে চিঠি লিখল কে? প্রেমপত্র নাকি?'

ঘড়িদাস হাসিতে হাসিতে উঠিয়া বসিল—'প্রেমপত্রই বটে। মামা কলকাতা থেকে চিঠি লিখেছে, আমার বিয়ের সম্বন্ধ করেছে।'

বলিলাম—'বেশ তো, লাগিয়ে দাও। আমি বরযাত্র যাব।'

ঘড়িদাস বলিল—'তুই ক্ষেপেছিস! যা আমার চেহারা, বৌ শেষকালে ছাঁদনাতলা থেকে abscond করুক আর কি! ওসবের মধ্যে আমি নেই বাবা।'

বস্তুত ঘড়িদাসের চেহারা মনোমুগ্ধকর নয়। কালো রোগা লম্বা দেহ, হাড় বাহির করা মুখ, নাকটা মুচড়াইয়া একদিকে বাঁকিয়া আছে, মাথার চুল খোঁচা খোঁচা। তাছাড়া তাহার পা দুটার দৈর্ঘ্যও সমান নয়, তাই সে বেশ একটু খোঁড়াইয়া চলে। এরূপ স্বামী পাইয়া কোনও মেয়ে আনন্দে আত্মহারা হইবে সে সম্ভাবনা কম।

ঘড়িদাস চিঠিখানা বালিশের তলায় রাখিয়া বলিল—'আয়, এক দান খেলা যাক।'

বিছানার উপর দাবার ছক পাতিয়া ঘুঁটি সাজাইতে সাজাইতে সে বলিল—'মেয়ে-মানুষ ভারি ডেঞ্জারাস্, বিয়ে হয়েছে কি পট করে বাচ্চা! আমার মামার সাত মেয়ে

তিন ছেলে, মাইনে পায় কুল্‌লে দেড়শো টাকা। মানে গড়পড়তা সাড়ে বার টাকা per head! বাপস্‌! আমি একলা মানুষ, আমারই মাসে ত্রিশ টাকা খরচ!'

সে আমাকে একটা কাঁচি সিগারেট দিল, নিজে একটা ধরাইল। খেলা আরম্ভ হইল। কিছুক্ষণ খেলা চলিবার পর লক্ষ্য করিলাম, অন্য দিন যেমন পাঁচ-সাত দান দিবার পরই সে আমার টুঁটি টিপিয়া ধরে আজ তাহা পারিতেছে না। মামার চিঠিখানা বোধ হয় ভিতরে ভিতরে তাহার মনকে বিক্ষিপ্ত করিয়াছে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য মাৎ হইয়া গেলাম। ঘড়িদাস ঘুঁটিগুলি কৌটার মধ্যে ভরিতে ভরিতে বলিল—'শশা, একটা কুকুরছানা জোগাড় করতে পারিস?'

অবাক হইয়া বলিলাম—'কুকুরছানা কি হবে?'

সে বলিল—'পুষব। বেশ একটা তুলতুলে লোমওলা কুকুরছানা। জানিস তো কুকুর হচ্ছে মানুষের best friend.'

আমি বলিলাম—'কুকুর তুমি পুষো না ঘড়িদা, ভারি ঘরদোর নোংরা করে। তার চেয়ে পাখি পোষো, কোনও ঝামেলা নেই।'

'পাখি!' ঘড়িদাস চিন্তা করিয়া বলিল—'মন্দ বলিস নি। টিয়া পাখি! রাধা কেষ্ট পড়বে। কিম্বা এক খাঁচা মুনিয়া পাখি—'

তখন আমার বয়স কম ছিল, ঘড়িদাসের পশুপক্ষী-প্রীতির মর্মার্থ বুঝি নাই।

আর একদিন দুপুরবেলা এমনি খেলিতে বসিয়াছি। সে দিনটা বোধ হয় ঘড়িদাসের জীবনে সব চেয়ে স্মরণীয় দিন। খেলিতে খেলিতে দু'জনেই তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম, যে অবস্থায় দাবা-খেলোয়াড় 'কাদের সাপ?' প্রশ্ন করে আমাদের তখন সেই অবস্থা। তাই বাহিরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ কানে প্রবেশ করিলেও মন পর্যন্ত পেঁছায় নাই। হঠাৎ যখন চমক ভাঙিল তখন ঘাড় তুলিয়া দেখি, একটি যুবতী শয়নকক্ষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

দু'জনে হতভম্ব হইয়া চাহিয়া রহিলাম। সেকালে পথেঘাটে ভদ্রশ্রেণীর যুবতী চোখে পড়িত না, কদাচিৎ চোখে পড়িলে মনে হইত বুঝি অলৌকিক আবির্ভাব। হৃদয় রসায়িত হইত, কল্পনা জাল বুনিতে আরম্ভ করিয়া দিত। এই যুবতীটি কিন্তু আমাদের অপরিচিত নয়, শহরের পথে বিপথে বিদ্যুচ্চমকের মত তাহাকে বহুবার দেখিয়াছি। সিভিল সার্জন সুব্রত ঘোষালের কন্যা প্রমীলা।

প্রমীলা ঘোষাল সত্যই সুন্দরী ছিল, কিম্বা আমরা অবরুদ্ধ কৌমার্যের চক্ষু দিয়া তাহাকে সুন্দর দেখিয়াছিলাম, তাহা আজ আর স্মরণ করিতে পারি না। মনে হয় তাহার গায়ের রঙ ফরসা ছিল, চোখে ছিল প্রগল্‌ভ চটুলতা, আর সারা গায়ে ছিল ভরা যৌবন। এ ছাড়া তাহার চেহারার সমস্তই ঝাপসা হইয়া গিয়াছে। তাহার একটি ছোট্ট মোটর-গাড়ি ছিল, সেটি নিজে চালাইয়া সে যখন রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইত তখন মনে হইত যেন একটা রোমহর্ষণ কাণ্ড ঘটিয়া গেল। এই নিজে মোটর-গাড়ি চালানোই ছিল তখন এক অপরিমেয় বিস্ময়। তাছাড়া জনশ্রুতি ছিল, সে সাহেবদের ক্লাবে গিয়া বলডান্স করে। সব মিলিয়া প্রমীলা ঘোষাল এক পরম রমণীয় রোমাণ্টিক মূর্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কল্পনাবিলাসী যুবকেরা ঘুমাইয়া তাহাকে স্বপ্ন দেখিত।

এমন যে প্রমীলা ঘোষাল, সে ঘড়িদাসের শয়নকক্ষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; আমরা নির্বাক, নিষ্পলক, প্রায় নিস্পন্দ। তারপর বাঁশীর মত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম—'ঘড়িদাস কার নাম?'

ঘড়িদাস সূচীবিদ্ধবৎ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—'আমি—মানে—আমি হরিদাস—'

প্রমীলা তাহার পানে চাহিয়া মুচকি হাসিল—'কড়া নেড়ে সাড়া পেলুম না, তাই ভেতরে ঢুকেছি। আপনি ঘড়ি মেরামত করেন?'

ঘড়িদাস বলিল—'হ্যাঁ—আমি—হ্যাঁ।'

প্রমীলা বলিল—'আমার রিস্ট-ওয়াচটা চলছে না, আপনি ঠিক করে দিতে পারবেন?'

ঘড়িদাস বলিল—'রিস্ট-ওয়াচ! হ্যাঁ পারব—নিশ্চয় পারব।'

প্রমীলার কব্জি হইতে একটি ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলিতেছিল, সে তাহা খুলিয়া ছোট্ট একটি সোনার ঘড়ি বাহির করিয়া ঘড়িদাসের হাতে দিল। ঘড়িদাস নাড়িয়া চাড়িয়া পরীক্ষা করিল, দম দিয়া দেখিল, তারপর বলিল—'মেন্-স্প্রিং ভেঙে গেছে।'

প্রমীলা বলিল—'ও।—তা আপনি মেরামত করতে পারবেন তো? নইলে আবার কলকাতায় পাঠাতে হবে।'

'না না, আমি পারব।'

'আমার কিন্তু শীগ্‌গির চাই।'

'কাল পরশুর মধ্যে ঘড়ি মেরামত করে আমি আপনার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসব।'

প্রমীলা তাহার প্রতি স্মিত কটাক্ষপাত করিল—'আপনি আমার বাড়ি চেনেন? ভালই হল, বাড়িতেই পৌঁছে দেবেন। বিল নিয়ে যাবেন, টাকা চুকিয়ে দেব।'

ঘড়িদাস কি একটা বলিতে চাহিল, কিন্তু বলিতে পারিল না। প্রমীলা একটু ঘাড় হেলাইয়া প্রস্থানোদ্যতা হইল, তারপর ফিরিয়া বলিল—'ঘড়িটা দামী, দু'শো টাকা দাম। আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি, হারিয়ে টারিয়ে যাবে না তো?'

'না না, কোনও ভয় নেই—'

'আচ্ছা। কাল পরশুর মধ্যে নিশ্চয় যেন পাই।'

প্রমীলা খুট্ খুট্ জুতার শব্দ করিয়া চলিয়া গেল, ঘড়িদাস তাহার পিছন পিছন গেল। আমি ঘরে বসিয়া শুনিতে পাইলাম, প্রমীলার মোটর চলিয়া গেল। তারপর ঘড়িদাস ফিরিয়া আসিয়া তক্তপোশের পাশে বসিল। তাহার মুঠির মধ্যে ঘড়িটা ছিল, মুঠি খুলিয়া সম্মোহিতের মত সেটাকে দেখিতে লাগিল।

আমি বলিলাম—'ঘড়িদা, তোমার খ্যাতি অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে দেখছি, প্রমীলা ঘোষালও নাম জানে!'

ঘড়িদাস একবার চোখ তুলিয়া ফিকা হাসিল, তারপর আবার ঘড়ির প্রতি মনঃসংযোগ করিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম—'বাজিটা শেষ করবে নাকি?'

'বাজি? ও—না ভাই, আজ থাক, আর একদিন খেলা শেষ করা যাবে।' বলিয়া ঘড়িদাস দোকানঘরে তাহার জলচৌকির সামনে গিয়া বসিল। চৌকির উপর কয়েকটা ঘড়ি যত্রতত্র ছড়ানো ছিল, সেগুলো এক পাশে সরাইয়া প্রমীলার ঘড়ি খুলিতে প্রবৃত্ত হইল।

আমি চলিয়া আসিলাম।

পরদিন দুপুরে ঘড়িদাসের কাছে যাই নাই। সন্ধ্যার পর পড়িতে বসিয়াছি, ঘড়িদাস আসিয়া উপস্থিত। মাথার চুল উস্কখুস্ক, চোখের দৃষ্টি বিভ্রান্ত, নাকটা যেন আরও বাঁকিয়া গিয়াছে, খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আমার পড়ার ঘরে ঢুকিয়া বলিল—'ওরে শশা, সর্বনাশ হয়েছে, ঘড়িটা চুরি গেছে।'

'কোন্ ঘড়ি? প্রমীলা ঘোষালের ঘড়ি?'

'হ্যাঁ। এখন আমি কি করি?'

'চুরি গেল কি করে?'

'দুপুরবেলা কেউ ঘরে ঢুকে চুরি করে নিয়ে গেছে। আমি শোবার ঘরে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—'

'পুলিসে খবর দিয়েছ?'

'ও বাবা, পুলিসে খবর দিলে তারা হয়তো আমাকেই ধরে হাজতে পুরবে। সিভিল সার্জনের মেয়ের ঘড়ি।'

'তবে কি করবে?'

'কি করব ভেবে পাচ্ছি না। তুই বল্ না।'

আমি কি বলিব ভাবিয়া পাইলাম না। তখন ঘড়িদাস নিজেই বলিল—'এক উপায় দাম দিয়ে দেওয়া। প্রমীলা বলেছিল ঘড়ির দাম দু'শো টাকা—'

জিজ্ঞাসা করিলাম—'দু'শো টাকা তুমি দিতে পারবে?'

'কোথায় পাব দু'শো টাকা? কুড়িয়ে বাড়িয়ে টাকা পঞ্চাশেক হতে পারে।'

'তাহলে উপায়?'

ঘড়িদাস আমার হাত ধরিয়া করুণ বচনে বলিল—'শশা, তুই আমাকে বাঁচা, নইলে সুইসাইড হয়ে যাব। যেখান থেকে হোক শ' দেড়েক টাকা জোগাড় করে দে। আমি যেমন করে পারি তিন মাসে শোধ করে দেব।'

শেষ পর্যন্ত সেই রাত্রেই দেড়শো টাকা সংগ্রহ করিলাম। সংগ্রহ করা খুব সহজ হয় নাই, অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সে যাক। সুখের বিষয় ঘড়িদাস মেয়াদ পূর্ণ হইবার পূর্বেই টাকা শোধ করিয়াছিল, কথার খেলাপ করে নাই।

পরদিন সকালবেলা ঘড়িদাস আবার আসিয়া উপস্থিত। বলিল—'ভাই, একলা যেতে ভয় করছে, তুইও সঙ্গে চল। সিভিল সার্জন সায়েব শুনেছি কড়া পিত্তির লোক, যদি মার-ধর করে!'

সুতরাং আমিও সঙ্গে গেলাম।

সাহেব-পাড়ায় ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোর পাশে সিভিল সার্জনের বাংলো। বাগানের মাঝখানে বাড়ি, উর্দি-পরা আর্দালি বেয়ারা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমরা এত্তালা পাঠাইয়া বলিদানের জোড়া পাঁঠার মত ঘোষাল সাহেবের সম্মুখীন হইলাম।

ঘোষাল সাহেব রীতিমত সাহেব, চেহারাও সাহেবের মত। অফিসে বসিয়া কাগজপত্র দেখিতেছিলেন, আমাদের দিকে ভ্রূ বাঁকাইয়া চাহিলেন। ঘড়িদাস আমার পানে কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, আমি কোনও রকমে বক্তব্যটা বলিয়া ফেলিলাম।

'আমার মেয়ের ঘড়ি চুরি গেছে!' ঘোষাল সাহেবের গৌরবর্ণ মুখ অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি টেবিলস্থ ঘন্টির উপর মুষ্ট্যাঘাত করিলেন, আর্দালি ছুটিয়া আসিল। তিনি চাপা গর্জনে বলিলেন—'মিসিবাবাকো বোলাও।'

আর্দালী ছুটিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। ঘোষাল সাহেব ব্যাঘ্র-দৃষ্টিতে আমাদের পানে চাহিয়া রহিলেন।

দুই মিনিট পরে প্রমীলা প্রবেশ করিল। সে বোধহয় সবেমাত্র ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়াছে, মুখ থমথমে, চোখে ঘুম-ঘুম ভাব, অবিন্যস্ত বেণীর প্রান্তে বিনুনি একটু শিথিল হইয়া আছে। আমাদের দিকে একবার অলস কটাক্ষপাত করিয়া বাপের টেবিলের পাশে গিয়া দাঁড়াইল—'কি বাবা?'

ঘোষাল সাহেব আমাদের দিকে তর্জনী নির্দেশ করিয়া বলিলেন—'তুমি এদের ঘড়ি মেরামত করতে দিয়েছিলে। আমি তখনি মানা করেছিলাম। তোমার ঘড়ি চুরি গেছে। অন্তত এরা তাই বলছে।'

প্রমীলা আমাদের দিকে ফিরিয়া বিস্ফারিত চক্ষে চাহিল, তারপর আর্ত স্বরে বলিল—'অ্যাঁ,—চুরি গেছে। সে যে আমার জন্মতিথির ঘড়ি। বাবা!'

ঘোষাল সাহেব তর্জন ছাড়িলেন—'পুলিসে দেব! আমার সঙ্গে চালাকি! ঘড়ি হজম করবে!—এই বেয়ারা!'

আমি মরীয়া হইয়া বলিলাম—'ঘড়ির দাম ইনি দিতে রাজী আছেন। আপনার মেয়ে বলেছিলেন ঘড়ির দাম দু'শো টাকা। ইনি দু'শো টাকা এনেছেন।'

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের হাওয়া যেন বদলাইয়া গেল। প্রমীলার আর্ত ব্যাকুলতার ভাব আর রহিল না, ঘোষাল সাহেবের রক্ত-চক্ষু নিমেষ মধ্যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। পিতা-পুত্রীর মধ্যে একবার চকিত দৃষ্টি বিনিময় হইল। তারপর ঘোষাল সাহেব অপেক্ষাকৃত নরম সুরে বলিলেন—'টাকা এনেছ?'

'আজ্ঞে এই যে—' বলিয়া ঘড়িদাস পকেট হইতে টাকা বাহির করিল।

ঘোষাল সাহেব প্রসন্ন স্বরে বলিলেন—'রেখে যাও। তোমার কম বয়স তাই এবার ছেড়ে দিলাম। ভবিষ্যতে সাবধান থেকো। যাও।'

ঘর হইতে বাহির হইবার সময় আমি একবার পিছু ফিরিয়া চাহিলাম। দেখিলাম পিতাপুত্রী পরস্পরের পানে চাহিয়া সানন্দে মৃদু মৃদু হাসিতেছেন।

রাস্তায় চলিতে চলিতে আমার মনটা কেমন খুঁত খুঁত করিতে লাগিল। বলিলাম—'ঘড়িটার দাম বোধহয় দু'শো টাকা নয়, বোধহয় গিল্টি সোনা।'

ঘড়িদাস আমার দিকে তাকাইল না, অন্য দিকে ঘাড় ফিরাইয়া বলিল—'হুঁ!'

দেখিলাম ঘড়িদাস জানে। সে ঘড়ির কাজ করে, ঘড়ির দাম জানা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু জানিয়া শুনিয়া বেশী দাম কেন দিল বুঝিলাম না। হয়তো ভাবিয়াছে এ লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিলে লোকে জানিতে পারিবে, তাহার ব্যবসার ক্ষতি হইবে, তাই চাপিয়া গিয়াছে।

যা হোক, এই ঘটনার পর কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে। গ্রীষ্ম গিয়া বর্ষা আসিয়াছিল, তাহাও বিগত হইয়া শারদীয়া পূজা আসিয়া পড়িয়াছে। আমরা ক্লাবে থিয়েটারের মহলা আরম্ভ করিয়াছি।

দিন ছয়-সাত ঘড়িদাসের ওখানে যাই নাই, একদিন বিকালে গিয়া দেখি, সে কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া আছে। বলিলাম—'একি ঘড়িদা, এই গরমে কম্বল?'

ঘড়িদাস কম্বলের ভিতর হইতে মুণ্ড বাহির করিল—'ম্যালেরিয়া ধরেছে রে শশা' বলিয়া আবার কম্বলে মুখ লুকাইল।

ম্যালেরিয়ার সময় বটে। বলিলাম—'কবে থেকে ধরেছে?'

ঘড়িদাস কম্বলের ভিতর হইতে বলিল—'পরশু থেকে।'

'কুইনিন্ খেয়েছ?'

'না।'

আমি তক্তপোশের পাশে গিয়া বসিলাম। জ্বরের ঝোঁকে তাহার সর্বশরীর কাঁপিতেছে, এমন কি তক্তপোশটা পর্যন্ত কাঁপিতেছে। বলিলাম—'খেলে না কেন? দশ গ্রেণ পেটে পড়লেই জ্বরটা বন্ধ হত!'

সে উত্তর দিল না, লেপ মুড়ি দিয়া কাঁপিতে লাগিল। আমি বলিলাম—'তোমার দেখাশোনা করছে কে?'

এবার সে বলিল—'দেখাশোনা কে করবে? একলাই তিনদিন পড়ে আছি। তুই ছিলি কোথায়?'

থিয়েটার লইয়া মত্ত ছিলাম বলিতে পারিলাম না। বলিলাম—'আমি কি জানতাম তুমি জ্বরে পড়েছ? যা হোক, তুমি শুয়ে থাকো, আমি ডাক্তারখানা থেকে ওষুধ

নিয়ে আসি।'

সে কম্বল হইতে মুখ বাহির করিল, আরক্ত চক্ষু আমার মুখের উপর স্থাপন করিয়া বলিল—'আমার কিন্তু হাতে একটি পয়সা নেই। মামা পুজোর সময় টাকা চেয়েছিল, হাতে যা ছিল পাঠিয়ে দিয়েছি। ওষুধের দাম তোকেই দিতে হবে।'

'দেব' বলিয়া আমি বাহির হইলাম।

আধ ঘণ্টা পরে কুইনিন্-মিক্শ্চারের শিশি, বিস্কুট সাবু বার্লি প্রভৃতি লইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখি ঘড়িদাসের কাঁপুনি কমিয়াছে, জ্বর ছাড়িতেছে। তাহাকে এক দাগ মিক্শ্চার গিলাইয়া সাবু করিতে বসিলাম। ঘড়িদাসের একটা প্রাচীন স্টোভ ছিল।

সন্ধ্যার সময় তাহার জ্বর ছাড়িয়া গেল, সে কম্বল ফেলিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল। গদ্‌গদ্ স্বরে বলিল—'তুই না থাকলে আমার কি হত রে শশা?'

বলিলাম—'শেয়ালে টেনে নিয়ে যেত। এখন একটু নড়ে বসো দেখি, ভাল করে বিছানাটা পেতে দিই। ভারি অপরিষ্কার হয়েছে।'

সে ব্যগ্র হইয়া বলিল—'না না, কিছু দরকার নেই। তুই এবার বাড়ি যা।'

আমি তাহার আপত্তি উপেক্ষা করিয়া প্রথমেই মাথার বালিশটা তুলিয়া উল্টাইতে গেলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থিরচক্ষু হইয়া গেলাম। বালিশের তলায় যে-বস্তুটি ছিল তাহা আমার চক্ষু এবং মনকে যুগপৎ ধাঁধিয়া দিল।

প্রমীলা ঘোষালের সোনার ঘড়ি।

'একি, এ যে প্রমীলার ঘড়ি!' বলিয়া আমি ঘড়িটা তুলিয়া লইতে গেলাম।

ঘড়িদাস ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ঘড়িটা আমার হাত হইতে প্রায় কাড়িয়া লইল। তারপর গুটিশুটি পাকাইয়া বিছানায় শুইয়া মাথায় কম্বল চাপা দিল।

কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না। প্রমীলার ঘড়ি চুরি যায় নাই, ঘড়িদাস কম দামী ঘড়ির দু'শো টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়া নিজের কাছে রাখিয়াছে। ঘড়ি চুরি গিয়াছে বলিয়া খাসা অভিনয় করিয়াছে। কিন্তু কেন? কেন?

কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আমি দ্বারের দিকে চলিলাম—'আচ্ছা চলি। তুমি কিন্তু চমৎকার অভিনয় করতে পার ঘড়িদা।'

ঘড়িদাস কম্বল হইতে মুখ বাহির করিয়া সলজ্জকণ্ঠে বলিল—'শশা, কাউকে বলিস্ নি ভাই।'

সেদিন ঘড়িদাসের অদ্ভুত আচরণের অর্থ খুঁজিয়া পাই নাই। এখন ফ্রয়েড্ পড়িয়া বুঝিয়াছি। সে কুকুর পুষিতে চাহিয়াছিল, পাখি পুষিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু দুধের স্বাদ ঘোলে মেটে না।

ঘড়িদাস যদি বাঁচিয়া থাকে, ঘড়িটা এখনও তাহার কাছে আছে কি? না যৌবনের নেশা যৌবনের সঙ্গে শেষ হইয়া গিয়াছিল?

এমন দিনে

দিনের পর দিন কাঠ-ফাটা গরম ভোগ করিয়া মানুষ যখন আশা ছাড়িয়া দিয়াছে তখন বৃষ্টি নামিল। শুধু বৃষ্টি নয়, বজ্র বিদ্যুৎ ঝোড়ো-হাওয়া। শহরের তাপদগ্ধ মানুষগুলাকে শীতলতার সুধাসমুদ্রে চুবাইয়া দিল।

বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে বেলা আন্দাজ তিনটার সময়। সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ দরবিগলিত ধারায় ভিজিতে ভিজিতে বাতাসের ঝাপ্‌টা খাইতে খাইতে সমীর গৃহে ফিরিল। শহরের প্রান্তে ছোট্ট একটি বাড়ি; নীচে দুটি ঘর, উপরে একটি। এইখানে সমীর তাহার বৌ ইরাকে লইয়া থাকে। দুটি প্রাণী। মাত্র বছর দেড়েক বিবাহ হইয়াছে। এখনও কপোতকূজন শেষ হয় নাই।

বাড়ির দরজা-জানালা সব বন্ধ। সমীর দ্বারের পাশে ঘণ্টি টিপিতেই দ্বার খুলিয়া গেল। ইরা দ্বারের কাছেই দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল। চকিত ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল, 'খুব ভিজেছ তো?'

সমীর ভিতরে আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল, তারপর ভিজা জামাকাপড় সুদ্ধ ইরাকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। তাহার কোটপ্যাণ্টুলুন হইতে নির্গলিত জল ইরার দেহের সম্মুখভাগ ভিজাইয়া দিল। সমীর বলিল, 'কী মজা! আজ খিচুড়ি খাব।'

ইরার মাথাটা সমীরের চিবুক পর্যন্ত পেঁছায়। সে সর্বাঙ্গ দিয়া সমীরের দেহের সরসতা যেন নিজ দেহে টানিয়া লইল, তারপর ডিঙি মারিয়া তাহার চিবুকে অধর স্পর্শ করিয়া বলিল, 'নিজে ভিজেছ, আবার আমাকেও ভিজিয়ে দিলে। ছাড়ো এবার। শীগ্‌গির জামাকাপড় ছেড়ে ফেলো, বাথরুমে সব রেখেছি। যা তোমার ধাত, এখুনি গলায় ঠাণ্ডা লেগে যাবে।'

সমীর বলিল, 'কী, আমার গলার নিন্দে! শোন তবে—' বলিয়া গান ধরিল, 'এমন দিনে তারে বলা যায়—'

সমীরের গলা সুরের ধার দিয়া যায় না। ইরা তাহার বুকে হাত দিয়া নিজেকে মুক্ত করিয়া লইল; বলিল, 'বাথরুমে গিয়ে গান গেও। কি খাবে—চা না কফি?'

সমীর তান ছাড়িল, 'চা—চা—চা! যে চা মান্য অতিথিদের জন্যে সঞ্চয় করা আছে, যার দাম সাড়ে সাত টাকা পাউন্ড, আজ সেই চা খাব। সখি রে-এ-এ-এ'— সমীর গিয়া বাথরুমে দ্বার বন্ধ করিল।

ইরা একটু দাঁড়াইয়া ভাবিল। সেও শাড়ি ব্লাউজ ছাড়িয়া ফেলিবে? না থাক, এ জল গায়েই শুকাইয়া যাক।..

বসিবার ঘরে আলো জ্বলিয়াছে। সমীর ও ইরা সামনাসামনি বসিয়া চা খাইতেছে। চায়ের সঙ্গে ডিম-ভাজা।

বাহিরে বর্ষণ চলিয়াছে। কখনও হাওয়ার দাপট বাড়িতেছে, বৃষ্টির বেগ কমিতেছে; কখনও তাহার বিপরীত। মেঘের গর্জন প্রশমিত হইয়া এখন কেবল গলার মধ্যে গুরুগুরু রব। ক্বচিৎ বিদ্যুতের একটু তৃপ্তহাসি।

এবেলা ঝি আসে নাই। বাঁচা গেছে। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর সমীরের এক বন্ধু তাহার বাসায় আসিয়া আড্ডা জমায়, সে আজ বৃষ্টিতে বাহির হয় নাই। ভালই হইয়াছে। আজ বাড়িতে শুধু তাহারা দু'জন। এই জনাকীর্ণ নগরীর লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে থাকিয়াও তাহারা সম্পূর্ণ পৃথক; বৃষ্টি তাহাদের নিঃসঙ্গ করিয়া

দিয়াছে। পরস্পরের সঙ্গ-সরস নিবিড় নিঃসঙ্গতা।

আজ সকালে অফিস যাইবার সময় সমীরের সঙ্গে ইরার একটু মনান্তর হইয়াছিল। সমীর মুখ ভার করিয়াছিল, ইরার অধর একটু স্ফুরিত হইয়াছিল। তখন দুঃসহ গরম। তারপর—পৃথিবীর বাতাবরণ বদলাইয়া গেল। কী লইয়া মনান্তর হইয়াছিল? ইরা অলসভাবে স্মরণ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু স্মরণ করিতে পারিল না।

চা শেষ হইলে ইরা ট্রে সরাইয়া রাখিয়া আসিয়া বসিল, সমীর সিগারেট ধরাইল। দুজনে পরিতৃপ্ত মনে কোনও কথা না বলিয়া মুখোমুখি বসিয়া রহিল।

পৃথিবীর সকল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনের মিল হয় না। যেখানে যেখানে মিল হইয়াছে সেখানেও ষোলোআনা মিল না হইতে পারে। দেহের স্তরে, হৃদয়ের স্তরে এবং বুদ্ধির স্তরে মিল কোটিকে গুটিক মিলে। সমীর ও ইরার ভাগ্যক্রমে তাহাদের মধ্যে দেহ-মন ও বুদ্ধির মিল অনেকখানিই হইয়াছিল; তাহাদের দেহ-মন পরস্পরের মধ্যে পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তির স্বাদ পাইয়াছিল; বুদ্ধির দিক দিয়াও তাহারা পরস্পরকে সাগ্রহে বুঝিবার চেষ্টা করিত এবং অনেকটা বুঝিয়াছিলও। তবু মাঝে মাঝে কোন্ অসমতার ছিদ্রপথে দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হইত, দুজনকেই ব্যাকুল করিয়া তুলিত। বোধকরি দেহ-মন-বুদ্ধির অতীত একটা স্তর আছে, হয়তো তাহা পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের স্তর; সেখানে কেহ উঠিতে পারে না। তাই নিভৃত মনের গোপন কন্দরে একটু শূন্যতা থাকিয়া যায়।

কিন্তু আজ, বর্ষণ-পরিপ্লুত রাত্রে, সমীর ও ইরার মনে কোনও শূন্যতাবোধ ছিল না। বন্যার জলে যখন দশদিক ভাসিয়া গিয়াছে তখন কূপে কতখানি জল আছে কে তাহা মাপিয়া দেখিতে যায়।

দুইজনে গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ পরস্পরের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর সমীর বলিল, 'অত দূরে কেন, কাছে এসে বোসো।'

ইরা বলিল, 'তুমি এস।' বলিয়া সোফা দেখাইল।

দুজনে উঠিয়া গিয়া বেতের সোফায় পাশাপাশি বসিল। জানালার কাচের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ মুচকি হাসিল, মেঘ চাপা স্বরে গুরুগুরু করিল। সমীর বলিল, 'কেমন লাগছে?'

সমীরের সিল্কের কিমোনোর কাঁধে গাল রাখিয়া ইরা অর্ধনিমীলিত নেত্রে চুপ করিয়া রহিল, শেষে অস্ফুটস্বরে বলিল, 'বলা যায় না।'

সমীর বলিল, 'কিন্তু কবি লিখেছেন বলা যায়।'

'কবি বলতে পারেন, তাই বলে কি আমরা পারি?'

'পারি।' কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সমীর ইরাকে বুকের কাছে টানিয়া লইল, 'আজ বলব তোমাকে। তুমি বলবে?'

অনেকক্ষণ সমীরের বাহুবেষ্টনের মধ্যে পড়িয়া থাকিয়া ইরা চুপিচুপি কহিল, 'বলব।'

সে-রাত্রে তাড়াতাড়ি আহার সারিয়া তাহারা দ্বিতলের ঘরে শুইতে গেল।...

রাত্রি এগারোটা। বৃষ্টি মাঝে থামিয়া গিয়াছিল, আবার শুরু হইয়াছে। শিথিল বৃষ্টি, অবসন্ন মেঘের শ্লথ মুষ্টি হইতে অবশে ঝরিয়া পড়িতেছে।

সমীর ও ইরা বিছানায় পাশাপাশি শুইয়া আছে। নীলাভ নৈশ দীপের মৃদু প্রভায় ঘরটি স্বপ্নাবিষ্ট। দুজনে চোখ বুজিয়া জাগিয়া আছে।

ইরার একটা হাত অলস তৃপ্তিতে সমীরের গায়ে পড়িল; সে কহিল, 'এবার বল।'

সমীর হাত বাড়াইয়া সুইচ টিপিল, নৈশ দীপ নিভিয়া গেল। অন্ধকারে ইরা প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ সমীরের সাড়া না পাইয়া ইরা আঙুল নাড়িয়া তাহার পাঁজরায় সুড়-সুড়ি দিল। সমীর তখন ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল—

হিসেব করছিলাম কতদিন আগেকার কথা। মাত্র সাত বছর, আমার বয়স তখন কুড়ি। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কবেকার কথা। তখন আমি কলকাতায় থেকে থার্ড ইয়ারে পড়ি আর কলেজের হোস্টেলে থাকি।

লম্বা ছুটিতে বাড়ি যেতাম, কিন্তু ছোটখাটো দু'এক দিনের ছুটিতে বাড়ি যাওয়া হত না। ডায়মণ্ড হারবার লাইনে আমার এক পিসেমশাই থাকতেন, তাঁর কাছে যেতাম। বেশী দূর নয়, শিয়ালদা থেকে ঘণ্টা দেড়েকের রাস্তা; আধা-শহর আধা-পাড়াগাঁ জায়গাটা। কলকাতা থেকে মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে থাকতে বেশ লাগত। গাছের ডাব, পুকুরের মাছ, পিসিমার হাতের রান্না—

পিসেমশায়ের সংসারে ওঁরা দুজন ছাড়া আর একটি মানুষ ছিল, পিসেমশায়ের ভাগ্নী সরলা। পিসিমাদের একমাত্র ছেলে অজয়দা নদীয়ার কলেজে প্রফেসারি করতেন, বাড়িতে বড় একটা আসতেন না। এঁদের সংসার ছিল এই তিনজনকে নিয়ে

সরলা বাপ-মা-মরা মেয়ে, মামার কাছে মানুষ হয়েছিল। বয়সে আমার চেয়ে দু'এক বছরের ছোট; বিয়ে হয়নি। রোগা লম্বা চেহারা, ফ্যাল্‌ফেলে দু'টো চোখ, মেটে-মেটে রঙ। কিন্তু সব মিলিয়ে দেখতে মন্দ নয়। একটু যেন ভীরু প্রকৃতি, সহজভাবে কারুর সঙ্গে মিশতে পারত না। প্রথম প্রথম আমাকে দেখে পালিয়ে বেড়াত। তারপর 'সমীরদা' বলে ডাকত, কিন্তু চোখে চোখ মিলিয়ে চাইতে পারত না।

আমার তখন যে বয়স সে-বয়সে সব মেয়েকেই ভাল লাগে। সরলাকেও আমার ভাল লাগত। কিন্তু মনে পাপ ছিল না। তাছাড়া আমি কি রকম আনাড়ি ছিলাম তা তো তুমি জানো। মেয়েদের যতই ভাল লাগুক, তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার কায়দা-কানুন জানতাম না।

যাহোক, একদিন পিসিমার বাড়িতে গিয়েছি। সেটা ফাগুন কি চৈত্র মাস ঠিক মনে নেই। বিকেলবেলা পৌঁছে দেখি বাড়িতে হৈ-হৈ কাণ্ড। নবদ্বীপ থেকে টেলিগ্রাম এসেছে অজয়দার ভারি অসুখ; পিসেমশাই আর পিসিমা এখনি নবদ্বীপ যাচ্ছেন। আমাকে দেখে পিসিমা বললেন—তুই এসেছিস বাবা, ভালই হল। অজুর অসুখ, আমরা এখুনি নবদ্বীপ যাচ্ছি। ঠাকুরের দয়ায় যদি অজু ভাল থাকে, তোর পিসেমশাই কালই ফিরে আসবেন। তুই ততক্ষণ বাড়ি আগ্‌লাস্। সরলাও রইল।

পিসিমা আর পিসেমশাই প্রায় একবস্ত্রে ইস্টিশানে চলে গেলেন। বাড়িতে রয়ে গেলাম আমি আর সরলা।

ক্রমে সন্ধ্যে হল, সন্ধ্যে থেকে রাত্রি। আমার মনে যেন একটা কাঁটা বিঁধে আছে। সরলা রান্না করতে গেল। খাবার তৈরি হলে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলাম। সরলার সঙ্গে আমার তিনটে কথা হল কিনা সন্দেহ। সে আমার পানে কেমন একরকমভাবে তাকাচ্ছে, আবার তখনি চোখ সরিয়ে নিচ্ছে। তার চাউনির মানে ধরতে পারছি না, কিন্তু মনটা অশান্ত হয়ে উঠছে। এক বাড়িতে আমি আর একটি যুবতী, আর কেউ নেই। আগুন আর ঘি—

রাত বাড়তে লাগল। আমি বাড়ির দোড়তাড়া বন্ধ করে শুতে গেলাম। আমার

শোবার ঘর নীচে, বৈঠকখানার পাশে; সরলা শোয় ওপরে।

দরজা ভেজিয়ে দিয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। খাটটা বেশ বড়; হাত-পা ছড়িয়ে শোয়া যায়। জানালা দিয়ে ঝিরঝিরে বাতাস আসছে। আমার মনটা বেশ শান্ত হয়ে এল। তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল একজনের গায়ে হাত ঠেকে। চোখ চেয়ে দেখি সরলা আমার পাশে বিছানায় শুয়ে আছে।...তারপর—তারপর সে-রাত্রির বর্ণনা দিতে পারব না। সারারাত্রি নিজের সঙ্গে লড়াই করতে করতে কাঠ হয়ে বিছানার একপাশে শুয়ে কাটিয়ে দিলাম। সরলাও বোধহয় সারারাত জেগে ছিল; ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পরের দিনটা কাটল দুঃস্বপ্নের মতো। একসঙ্গে ওঠা-বসা, সে রাঁধছে আমি খাচ্ছি, অথচ কেউ কারুর মুখের পানে তাকাতে পারছি না। আজ যদি পিসেমশাই ফিরে না আসেন, যদি রাত্রে আবার কালকের মতো ব্যাপার ঘটে, তাহলে—

সরলার মনে কি ছিল জানি না। হয়তো সে ভূতের ভয়েই আমার কাছে এসে শুয়েছিল। কিন্তু আমি নিজের কথা বলতে পারি, ভূতের চেয়েও বড় ভূত আমার কাঁধে ভর করেছিল। সেদিন যদি পিসেমশাই না আসতেন—

ভাগ্যক্রমে পিসেমশাই বিকেলবেলা ফিরে এলেন। অজয়দার পান-বসন্ত হয়েছে, ভয়ের কোনও কারণ নেই। আমি সেই রাত্রেই কলকাতায় চলে এলাম। তারপর সরলাকে আর দেখিনি; ওদিকেই আর পা বাড়াইনি। তবে শুনেছি সরলার বিয়ে হয়ে গেছে।

সমীর নীরব হইল। ইরাও কথা কহিল না। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিবার পর সমীর জিজ্ঞাসা করিল, 'কেমন শুনলে?'

ইরা সমীরের দিকে পাশ ফিরিয়া শুইল। বলিল, 'আনাড়ি ছিলে বলেই বেঁচে গিয়েছিলে। কিন্তু ভারি রোমাণ্টিক আর রহস্যময়।' তাহার কণ্ঠস্বরে একটু তরলতার আভাস পাওয়া গেল।

সমীর প্রশ্ন করিল, 'আর তোমার?'

'আমার ভারি সীরিয়স ব্যাপার হয়েছিল।'

ইরা ধীরে ধীরে থামিয়া থামিয়া বলিতে আরম্ভ করিল—

আমার তখন সতরো বছর বয়স, বছর চারেক আগেকার কথা। সবে স্কুল থেকে কলেজে ঢুকেছি।

আমার প্রাণের বন্ধু সাধনা একবছর আগে কলেজে ঢুকেছে। একদিন চুপিচুপি আমায় বলল, সে প্রেমে পড়েছে। এক গল্পলেখকের সঙ্গে। তাদের মধ্যে চিঠি লেখালেখি চলছে। আমাকে চিঠি দেখাল।

দেখেশুনে আমার ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল। আমি যেন সব-তাতেই পেছিয়ে আছি। কী উপায়? আমার বাপের বাড়িতে মেয়েদের ওপর ভারি কড়া নজর। মেয়ে-কলেজে পড়ি, গাড়ি চড়ে গুড়গুড় করে কলেজে যাই, গুড়গুড় করে ফিরে আসি। ছোঁড়াদের সঙ্গে হুল্লোড় করার সুবিধে নেই। বাবা জানতে পারলে কেটে ফেলবেন।

সাধনার কথাবার্তা থেকে মনে হয় প্রেমে না পড়লে জীবনই বৃথা। শেষ পর্যন্ত মরীয়া হয়ে প্রেমে পড়ে গেলুম। আমাদের কলেজের হিস্ট্রির প্রফেসর দিগম্বরবাবুর সঙ্গে।

তুমি যা ভাবছ তা নয়; দিগম্বরবাবুর নামটাই বুড়ো, তিনি মানুষটা বুড়ো নয়। ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়স, পাতলা ধারালো মুখ, খাঁড়ার মতো নাকের ওপর রিম্‌লেস চশমা। তাঁর কথা-বলার ভঙ্গীতে এমন একটা চাপা বিদ্রূপ থাকত যে মেয়েরা মনে মনে তাঁকে ভয় করত, তাঁর সঙ্গে প্রেমে পড়ার সাহস কারুর ছিল না। আমিই বোধহয় প্রথম।

প্রফেসরদের মধ্যে দিগম্বরবাবুই ছিলেন অবিবাহিত। আর যাঁরা ছিলেন তাঁরা আমার বাবার বয়সী; কারুর তিনটে ছেলে, কারুর পাঁচটা মেয়ে।

দিগম্বরবাবু যখন ক্লাসে আসতেন আমি একদৃষ্টে তাঁর মুখের পানে চেয়ে থাকতাম। তাঁর নাকের ফুটো ছিল ভীষণ বড় বড়, কানে খাড়া খাড়া লোম, মাথার ঠিক মাঝখানে ঘষা পয়সার মতো খানিকটা জায়গায় চুল পাতলা হয়ে গিয়েছিল, মাথা হেঁট করলেই চক্‌চক্ করে উঠত। বোধহয় টাকের পূর্বলক্ষণ। কিন্তু তিনি পড়াতেন ভারি চমৎকার, শুনতে শুনতে মগ্ন হয়ে যেতুম।

কিছুদিন এইভাবে দূর থেকে প্রেম-নিবেদন চলল। কিন্তু এভাবে কতদিন চলে? সাধনা প্রায়ই জিজ্ঞেস করে—প্রেম কতদূর? আমি কিছুই বলতে পারি না। সাধনার প্রেম অনেকদূর এগিয়েছে: তারা এখন লুকিয়ে লুকিয়ে একসঙ্গে সিনেমা দেখতে যায়, পার্কে বসে অনেক রাত্রি পর্যন্ত প্রেমালাপ করে। এদিকে আমার প্রেম যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে আছে, এক পা এগুচ্ছে না। এগুবে কোত্থেকে? দিগম্বরবাবুর কাছে গিয়ে কথা কইবার নামেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

শেষে এক চিঠি লিখলুম। হৃদয়ের আবেগ-ভরা লম্বা চিঠি। তারপর কলেজের ঠিকানায় প্রফেসর দিগম্বর ঘোষালের নামে পাঠিয়ে দিলুম। চিঠিতে সবই ছিল, কেবল একটা ভুল হয়ে গিয়েছিল। নিজের নাম দস্তখত করিনি।

পরদিন বিকেলবেলা হিস্ট্রির ক্লাস। দিগম্বরবাবু ক্লাসে এলেন। লেক্‌চার আরম্ভ করবার আগে পকেট থেকে আমার চিঠিখানা বার করে বললেন, 'আমি আজ একটা প্রেমপত্র পেয়েছি, তোমাদের পড়ে শোনাতে চাই।'

দিগম্বরবাবু চিঠি পড়তে লাগলেন। মেয়েরা প্রথমে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তারপর মুখ-তাকাতাকি করতে লাগল। দিগম্বরবাবুও চিঠি পড়তে পড়তে চোখ তুলে আমাদের মুখের ভাব লক্ষ্য করতে লাগলেন।

আমার অবস্থা বুঝতেই পারছ। মনে হল আমার বুকের দুমদুম শব্দ সবাই শুনতে পাচ্ছে। কেন যে তখনই ধরা পড়ে যাইনি তা জানি না। দিগম্বরবাবু কিন্তু চিঠির সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করলেন না, চিঠি শেষ করে একটু মুচকি হেসে লেক্‌চার আরম্ভ করলেন।

কলেজে এই নিয়ে বেশ একটু হৈ-চৈ হল। দিগম্বরবাবু অন্য ক্লাসের মেয়েদেরও চিঠি পড়ে শুনিয়েছেন। সব মেয়েরা উত্তেজিত, কে চিঠি লিখেছে? ভাগ্যিস, চিঠিতে সই করতে ভুলে গিয়েছিলুম, নইলে বিষ খেতে হত।

আমার প্রেম তখন মুমূর্ষু, পুরুষ জাতটা যে কী ভীষণ হৃদয়হীন তা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু সাধনা আমাকে বোঝাচ্ছে যে, প্রেমের পথ কণ্টকাকীর্ণ, ওতে ভয় পেলে চলবে না। আমি কিন্তু ভয়ে কাঠ হয়ে গেছি। বাবা যদি জানতে পারেন—

দশ-বারো দিন কেটে গেল, তারপর এক নতুন খবর কলেজে ছড়িয়ে পড়ল—দিগম্বরবাবু স্কলারশিপ নিয়ে বিলেত যাচ্ছেন। আমার খুবই দুঃখ হবার কথা, কিন্তু দুঃখ মোটেই হল না। ভাবলুম এবার বুঝি প্রেমের দায় থেকে নিষ্কৃতি পাব।

কিন্তু নিষ্কৃতি অত সহজ নয়। বিলেত যাবার আগের দিন দিগম্বরবাবু আমাকে ক্লাস থেকে ডেকে পাঠালেন। কাঁপতে কাঁপতে তাঁর অফিস-ঘরে গেলুম। তিনি

টেবিলের সামনে বসে কাগজপত্র সই করছিলেন, ঘরে আর কেউ ছিল না। আমাকে দেখে ঘাড় নেড়ে বললেন, 'বোসো'।

আমি তাঁর সামনের চেয়ারে বসলুম। তিনি কাগজে সই করতে করতে বললেন, 'চিঠিখানা তুমি লিখেছিলে?'

আমি কেঁদে ফেললুম।

তিনি উঠে এসে আমার চেয়ারের পাশে দাঁড়ালেন; নরম সুরে বললেন, 'তুমি সত্যি আমায় ভালবাস?'

অত বড় উচ্ছ্বাসময় চিঠির পর আর অস্বীকার করা চলে না। আমি ঘাড় নেড়ে জানালুম, 'হ্যাঁ, ভালবাসি।'

তিনি তখন বললেন, 'কিন্তু আমি যে কালই বিলেত চলে যাচ্ছি, বছরখানেক সেখানে থাকতে হবে। তুমি একবছর অপেক্ষা করতে পারবে?'

আমি ঘাড় নাড়লুম—'হ্যাঁ, পারব।'

তিনি হেসে পিঠ চাপড়ে দিলেন; বললেন, 'বেশ বেশ। এখন যাও, মন দিয়ে লেখাপড়া করবে। আমি ফিরে আসি, তারপর দেখা যাবে।'

দিগম্বরবাবু বিলেত চলে গেলেন। প্রথম কিছুদিন খুব আনন্দে কাটল। তারপর ক্রমে দুর্ভাবনা। যতই দিন ফুরিয়ে আসছে ততই ভয় বাড়ছে। এইভাবে একবছর যখন শেষ হয়ে এসেছে তখন দিগম্বরবাবুর এক চিঠি পেলুম। বোধহয় কলেজ থেকে আমার ঠিকানা জোগাড় করেছিলেন। এই তাঁর প্রথম এবং শেষ চিঠি। তিনি লিখেছেন—'কল্যাণীয়াসু, আমি শীঘ্রই দেশে ফিরব। তুমি শুনে সুখী হবে, আমি এখানে এসে একটি ইংরেজ মেয়েকে বিয়ে করেছি। তার নাম নেলি। মিষ্টি নাম নয়? আশা করি, তুমি মন দিয়ে লেখাপড়া করছ। ইতি—'

কি আনন্দ যে হয়েছিল তা আর বলতে পারি না। তারপর আর কি? আর প্রেমে পড়িনি। দু'বছর পরে তোমার সঙ্গে বিয়ে হল।

সমীর হাত বাড়াইয়া নৈশ দীপ জ্বালিল। দুইজনে কিছুক্ষণ মুখোমুখি শুইয়া রহিল। তারপর অতিদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সমীর বলিল, 'দিগম্বরবাবু ভদ্রলোক ছিলেন তাই বেঁচে গিয়েছিলে। কিন্তু ইরা, সত্যি যদি একটা নোংরা ব্যাপার হত? তুমি আমাকে বলতে পারতে?'

ইরা কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়া রহিল। আজ মনকে চোখ ঠারিবার দিন নয়; সে মনের অন্তস্তল পর্যন্ত খুঁজিয়া দেখিল। না, আজিকার রাত্রে সে সমীরের কাছে কোনও কথাই লুকাইতে পারিত না। সে চোখ খুলিয়া বলিল, 'পারতাম।'

আবার বৃষ্টির জোর বাড়িয়াছে। জানালার বাহিরে একটানা ঝরঝর শব্দ। দুইজনে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে শুইয়া ভাবিতেছে। আজ তাহারা যেমন পরিপূর্ণভাবে পরস্পরকে পাইয়াছে এমন আর পূর্বে কখনও পায় নাই; তাহাদের মাঝখানে যেটুকু ফাঁক ছিল তাহা নিবিড়ভাবে ভরাট হইয়া গিয়াছে।

সাক্ষী

জেলা-কোর্টের দায়রা এজলাসে খুনের মামলা শেষ হইয়াছে। আসামী বেকসুর খালাস পাইয়াছে। আমরা যে-কয়জন কলিকাতার সাংবাদিক লোমহর্ষণ পরিস্থিতির খবর পাইয়া এখানে আসিয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে অন্য সকলেই ফিরিয়া গিয়াছে, কেবল আমি রহিয়া গিয়াছি। মামলার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে এবং আসামী সুবিচার পাইয়াছে তাহাতেও সন্দেহ নাই; তবু আমার মন সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। কোথায় যেন একটি গুরুতর প্রশ্ন অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছে।

শহরের ধনী এবং উচ্ছৃঙ্খল যুবক মোহিতমোহন রক্ষিত নিজের স্ত্রীকে হত্যা করিয়া ফেরারী হয়, তারপর ধরা পড়িয়া যায়। প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবশ্য ছিল না, কেহ মোহিতকে খুন করিতে দেখে নাই; কিন্তু জোরালো circumstantial evidence ছিল। মোহিতের স্ত্রী অন্নপূর্ণা ছিল কটুভাষিণী খান্ডার মেয়ে; মোহিতের সহিত প্রায়ই তাহার ঝগড়া হইত। এমন কি মাঝে মাঝে মারপিটও যে হইত, পাড়াপড়শী তাহার সাক্ষী ছিল। মোহিত দায়রা-সোপর্দ হইল।

মামলা যখন সঙীন হইয়া উঠিয়াছে, মোহিতের প্রাণরক্ষার কোনও রাস্তাই নাই, এমন সময় কালীময় ঘোষ নামক এক স্থানীয় ভদ্রলোক স্বেচ্ছায় কোর্টের পক্ষ হইতে সাক্ষী দিলেন। তিনি বলিলেন, যে-রাত্রে এগারোটার সময় অন্নপূর্ণা খুন হয় সে-রাত্রে সওয়া দশটা হইতে প্রায় বারোটা পর্যন্ত মোহিত কালীময়ের গৃহে ছিল, মোহিত তাঁহার স্ত্রীর উপপতি। সওয়াল জবাবের পর সন্দেহ থাকে না যে কালীময় ঘোষ সত্য কথা বলিতেছেন। তাঁহার সাক্ষ্যের জোরে মোহিত মুক্তি পায়।

মফঃস্বলের মামলায় কলিকাতা হইতে সাংবাদিকেরা বড় একটা আসে না, স্থানীয় সংবাদদাতারাই খবর পাঠায়। এই মামলার শেষের দিকে আমরা টেলিফোনে খবর পাইয়া আসিয়া জুটিলাম। কাগজে খুব হৈ-হৈ হইল। তারপর মামলার নিষ্পত্তি হইলে সকলে ফিরিয়া গেল। আমি কেবল রহিয়া গেলাম।

পরদিন বৈকালে আন্দাজ পাঁচটার সময় আমি কালীময় ঘোষের বাড়িতে গেলাম। পাড়াটা নিরিবিলি, কয়েকঘর ভদ্র গৃহস্থের বাস। বাগান-ঘেরা একতলা ছোট ছোট বাড়িগুলি, সবগুলিই প্রায় এক ছাঁচের। কেবল একটা বাড়ি দ্বিতলের গর্বে মাথা উঁচু করিয়া আছে। সেটি মোহিত রক্ষিতের বাড়ি। কালীময়বাবুর বাড়ি হইতে মোহিত রক্ষিতের বাড়িটা ষাট-সত্তর গজ দূরে। আমরা এখানে আসিয়া প্রথমেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়াছিলাম, স্থানটার প্ল্যান জানা ছিল।

কালীময় ঘোষের ছোট্ট বাগান পার হইয়া বাড়ির সামনে উপস্থিত হইলাম। বাড়িটা নির্জন মনে হইল। একা কালীময়বাবু সম্মুখের বারান্দায় মাদুরে বসিয়া বঁড়শিতে সুতা বাঁধিতেছেন। চারিদিকে মাছ-ধরার সরঞ্জাম, হুইলযুক্ত দুইটা ছিপ, মুগার সুতা, ময়ূরপুচ্ছের ফাৎনা ইত্যাদি।

কালীময়বাবুর বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ। দোহারা বলিষ্ঠ গোছের চেহারা, মাথার চুল ও গোঁফ ছোট করিয়া ছাঁটা। খাটো ধুতির উপর ময়লা সোয়েটার পরিয়া তিনি বসিয়া আছেন; যে বয়সে মানুষ নিজের দৈহিক পারিপাট্য সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া পড়ে সেই বয়স। আমাকে দেখিয়া হাঁটুর উপর একটু কাপড় টানিয়া দিয়া ভ্রূ তুলিলেন, 'আপনি?'

কালীময়বাবুকে আমি ইতিপূর্বে আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দেখিয়াছি। তাঁহার বাহ্য আচার ব্যবহার ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আমার মনে বেশ স্পষ্ট ধারণা আছে, কিন্তু তাঁহার চরিত্র-চিত্র অঙ্কিত করা সহজ নয়। লোকটি ভদ্রশ্রেণীর, জাতিতে কায়স্থ, অভাবগ্রস্ত নয়, সচ্ছল অবস্থার মানুষ; অশিক্ষিত নয়, বি-এ বি-এল; তবু তাঁহার কথায় ও আচার ব্যবহারে কোথাও যেন একটু চাষাড়ে ভাব আছে। চাষাড়ে কথাটা হয়তো ঠিক হইল না, শহুরে পালিশের অভাব বলিলে ভাল হয়। পাড়াগাঁয়ের চন্ডীমন্ডপে তাঁহাকে বেমানান মনে হইবে না, কিন্তু কলিকাতার মার্জিত সমাজের কোনও ড্রয়িংরুমে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে তিনি হংসমধ্যে বকের ন্যায় প্রতীয়মান হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমি নিজের পরিচয় দিলাম, তারপর তাঁহার কাছে গিয়া মাদুরের প্রান্তে বসিলাম। তিনি একবার রুক্ষ চোখে আমার পানে চাহিলেন; বলিলেন, 'সব তো চুকে-বুকে গেছে। আবার কেন?'

আমি বলিলাম, 'না না, আমি সাংবাদিক হিসেবে আপনার কাছে আসিনি। নিতান্তই ব্যক্তিগত কৌতূহল; আপনার মতো চরিত্রবল আজকালকার দিনে দেখা যায় না। একটা দুশ্চরিত্র লম্পটের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে আপনি—'

তোয়াজে কাজ হইল না, তিনি দৃঢ়ভাবে বাধা দিয়া বলিলেন, 'ওসব কথা ছাড়ুন দিন। কি জানতে চান?'

সঙ্কুচিত প্রশ্ন করিলাম, 'আপনার স্ত্রী—?'

'সে পালিয়েছে'—কালীময়বাবু আবার বঁড়শি বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

'সেকি! কোথায়? কার সঙ্গে?'

'জানি না। খোঁজ করিনি।'

কিছুক্ষণ নীরবে তাঁহার বঁড়শি-বাঁধা দেখিলাম। একটি মুগার সুতায় দু'টি বঁড়শি বাঁধিতেছেন। বর্ধমানের ভাল বঁড়শি। বঁড়শি বাঁধিবার বিশেষ কায়দা আছে, যেমন তেমন করিয়া বাঁধা চলে না। প্রথমে একটি বঁড়শিকে সুতার এক ধারে বাঁধিয়া দুই পাশের সুতা পাকাইয়া এক করিতে হয়। তারপর অন্য বঁড়শি সুতার অন্য প্রান্তে অনুরূপ প্রথায় বাঁধিতে হয়। দুইটি বঁড়শি পাশাপাশি ঝুলিতে থাকে।

'আপনি ছিপে মাছ ধরতে ভালবাসেন?'

'হ্যাঁ।'

'রাত্রে মাছ ধরেন কেন?'

'মজা আছে। দিনে মাছ-ধরার চেয়ে ঢের বেশী মজা। কারবাইডের সাইকেল-ল্যাম্প জেলে জলের ওপর আলো ফেললে মাছ আসে।'

'আজ রাত্রে মাছ ধরতে যাবেন নাকি?'

'না, আজ আর হবে না।'

'আপনার বাড়িতে এখন কে কে আছে?'

'কেউ নেই, আমি একা। নিজে রেঁধে খাচ্ছি।'

কিছুক্ষণ বঁড়শি-বাঁধা দেখিয়া বলিলাম, 'আচ্ছা, মোহিত রক্ষিত তার স্ত্রীকে খুন করেনি তা যেন প্রমাণ হল, কিন্তু কে খুন করেছিল তা তো জানা গেল না।'

কালীময় আমার পানে একটি অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'আপনি আইনের কিছু জানেন না দেখছি। কে খুন করেছে এ-মামলায় তা জানবার দরকার নেই, মোহিত রক্ষিত খুন করেনি প্রমাণ হলেই যথেষ্ট।'

'তবু, কে খুন করেছে জানা দরকার তো।'

'সে ভাবনা পুলিসের।'

'তা বটে। তবু—'

বঁড়শি-বাঁধা শেষ হইলে কালীময় সুতা তুলিয়া ধরিয়া নিরীক্ষণ করিতে করিতে যেন অন্যমনস্ক ভাবেই প্রশ্ন করিলেন, 'আপনি মদ খান?'

'মদ!'

'হ্যাঁ—মদ। হুইস্কি ব্রাণ্ডি জিন। খান?'

সত্য কথা বলিলাম, 'পরের পয়সায় পেলে খাই।'

'তবে আসুন।'

কালীময় আমাকে বাড়ির ভিতর বসিবার ঘরে লইয়া গেলেন।

কালীময়ের মনের মধ্যে অনেক কথা জমা হইয়া ছিল। সে-রাত্রে আমরা দুজনে মুখোমুখি বসিয়া একটি বোতল হুইস্কি সাবাড় করিয়াছিলাম। সেই সঙ্গে তাঁর মুখে যে বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলাম তাহার সহিত আদালতে প্রদত্ত এজেহার মিলাইয়া একটা গোটা কাহিনী খাড়া করা যাইতে পারে। তাঁহার পলাতকা স্ত্রী দামিনীর একটি ফটোও দেখিয়াছিলাম। এমন কিছু আহা-মরি চেহারা নয়, কিন্তু বয়স কুড়ি-বাইশ; শরীরের বাঁধুনি আছে এবং চোখে আছে কপট ভালমানুষী।

কালীময় এই জেলারই লোক। ছেলেবেলায় পাড়াগাঁয়ে ছিলেন, তারপর শহরে আসিয়া লেখাপড়া শিখিয়াছেন, উকিল হইয়াছেন; গ্রামের জমিজমা বিক্রয় করিয়া শহরে বাড়ি কিনিয়া বাস করিতেছেন। ওকালতিতে তাঁহার পসার বেশী নয়; জরীপের কাজ করিয়া অল্পস্বল্প রোজগার হয়। হাতে কিছু নগদ টাকা আছে, লগ্নি কারবারেও মন্দ উপার্জন হয় না। মোটের উপর সচ্ছল অবস্থা। প্রায় বিশ বছর শহরে আছেন। শহরের সকলের সঙ্গে পরিচয় আছে, কিন্তু বেশী ঘনিষ্ঠতা কাহারও সঙ্গে নাই। যে-ব্যক্তি একাধারে উকিল এবং মহাজন, তাহার সঙ্গে কাহারও বেশী ঘনিষ্ঠতা বোধ-হয় সম্ভব নয়।

কালীময়ের প্রথমপক্ষের স্ত্রী রুগ্না ছিলেন, বিবাহিত জীবনের প্রায় পনরোটা বছর নিরবচ্ছিন্ন শয্যাগত থাকিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় স্বর্গারোহণ করেন। কালীময়ের বয়স তখন চল্লিশ পার হইয়া গিয়াছে; পুনর্বার বিবাহ করিবার জন্য তিনি বিশেষ উৎসুক ছিলেন না, পুন্নাম-নরকের ভয়ও তাঁহার ছিল না। কিন্তু কালীময়ের এক দূর-সম্পর্কের বোন ছিল, তাহার বিবাহ হইয়াছিল অন্য জেলায়; কালীময় বিপত্নীক হইয়াছেন শুনিয়া সে আসিয়া দাদাকে ধরিয়া বসিল—তাহার স্বামীর এক দূর-সম্পর্কের ভগিনী আছে, মেয়েটি অনাথা, তাহাকে উদ্ধার করিতে হইবে। রূপবতী গুণবতী কন্যা, নেহাত অনাথা বলিয়াই দূর-সম্পর্কের ভায়ের গলায় পড়িয়াছে।

শেষ পর্যন্ত কালীময় দামিনীকে বিবাহ করিলেন। দামিনী সাধারণ বিচারে দেখিতে-শুনিতে ভালই, রূপ যত না থাক, চটক আছে। গুণের পরিচয় ক্রমে প্রকাশ পাইল। সংসারের কাজ জানিলেও সেদিকে স্পৃহা নাই। ভালমানুষের মতো ঘরে থাকে বটে, কিন্তু মন বাহিরের দিকে। ঘরের কাজ ফেলিয়া বিছানায় শুইয়া রোমাঞ্চকর উপন্যাস পড়িতে ভালবাসে, সাজ-গোজের দিকে নজর বেশী, সিনেমা দেখার দিকে প্রচণ্ড লোভ।

প্রথমে কালীময় কিছু দেখিতে পান নাই। ক্রমে নব-পরিচয়ের ঘোলা জল পরিষ্কার হইতে লাগিল। কিন্তু নূতন বৌয়ের যে দোষগুলি তিনি দেখিতে পাইলেন সেগুলি তাঁহার মারাত্মক মনে হইল না। দামিনী সাধারণ মেয়ে, এইরূপ সাধারণ মেয়ের সাধারণ দোষগুণ লইয়া সংসারসুদ্ধ লোক ঘর করিতেছে। কালীময় বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন না।

বছরখানেক কাটিয়া গেল। কালীময় ধীরে ধীরে উপলব্ধি করিলেন, দামিনী সাধারণ মেয়ে নয়। সে অত্যন্ত স্বার্থপর, অন্যের সুখ-সুবিধা সামর্থ্যের কথা সে ভাবে না। তাহার একটা প্রচ্ছন্ন জীবন আছে; তাহার অতীত-জীবনে কোনও গুপ্ত-রহস্য আছে। সে অত্যন্ত সরল নিরীহ মুখ লইয়া অনর্গল মিথ্যা কথা বলে। সে লুকাইয়া লুকাইয়া কাহাকে চিঠি লেখে।

একদিন একটা সামান্য ঘটনা ঘটিল। কালীময়ের বাড়ির ঠিক সামনে রাস্তার ধারে একটা ডাক-বাক্স আছে; দুপুরবেলা কালীময় একটা দলিল লইবার জন্য কোর্ট হইতে বাড়ি ফিরিতেছিলেন। পথঘাট শূন্য, মোড় ঘুরিয়া নিজের রাস্তায় পড়িয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, দামিনী টুক্ করিয়া ফটকের বাহিরে আসিয়া একখানা খামের চিঠি ডাকে ফেলিয়া আবার সুট্ করিয়া বাড়িতে ফিরিয়া গেল।

কালীময় গৃহে প্রবেশ করিয়া দামিনীকে বলিলেন, 'আজ দুপুরে ঘুমোওনি দেখছি। কাকে চিঠি লিখলে?'

সরল বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দামিনী বলিল, 'চিঠি! কৈ, আমি লিখিনি তো!'

কালীময়ের ধোঁকা লাগিল। তবে কি তিনিই ভুল দেখিয়াছেন! তিনি আর কিছু বলিলেন না, দলিল লইয়া আদালতে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার মনটা অনিশ্চয়ের সংশয়ে প্রশ্নসঙ্কুল হইয়া উঠিল।

দুই তিন দিন পরে কালীময়ের দূর-সম্পর্কের সেই ভগিনীপতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন; যাঁহার গৃহে দামিনী থাকিত ইনি তিনিই। বয়সে কালীময়ের চেয়ে ছোট, শক্ত-সমর্থ চেহারা, চোখে শিকারী বিড়ালের সতর্কতা। বলিলেন, 'কাজে এসেছিলাম, ভাবলাম দেখা করে যাই।'

তিনি কালীময়ের গৃহেই রহিলেন; কালীময় তাঁহাকে যথেষ্ট আদর যত্ন করিলেন। দুই দিন ও এক রাত্রি কালীময়ের গৃহে কাটাইয়া অতিথি বিদায় লইলেন। কিন্তু তিনি কী কাজে আসিয়াছিলেন তাহা ঠিক বোঝা গেল না, কারণ এখানে আসিয়া তিনি একবারও গৃহের বাহির হন নাই। কালীময় অবশ্য যথারীতি দুপুর-বেলা কোর্টে গিয়াছেন।

অতঃপর তিনি মাঝে মাঝে আসেন, দু'একদিন থাকিয়া চলিয়া যান। কালীময় সন্দিগ্ধ প্রকৃতির লোক নন, কিন্তু তাঁর মনেও খট্‌কা লাগে। লোকটি সম্পর্কে দামিনীর ভাই, অথচ তাহাদের সম্পর্কটা ঠিক যেন স্বাভাবিক নয়। কালীময়ের সম্মুখে তাহারা এমন সঙ্কুচিত হইয়া থাকে কেন? কোথায় যেন কিছু গলদ আছে।

যাহোক, এইভাবে আরও বছরখানেক কাটিয়া গেল। কালীময় দিনের বেলা কোর্টে যান, সন্ধ্যার পর একটু হুইস্কি পান করেন। এ অভ্যাস তাঁহার আগে ছিল না, সম্প্রতি হইয়াছে। তাঁহার ভারি মাছ-ধরার শখ, আগে হপ্তায় অন্তত একবার চৌধুরীদের পুকুরে রাত্রিকালে মাছ ধরিতে যাইতেন, এখন আর অত বেশী যাওয়া হয় না; তবুও মাঝে মাঝে যান। জরীপের কাজ পড়িলে দুই তিন দিনের জন্য বাহিরে যাইতে হয়। তখন দামিনী বাড়িতে একলা থাকে। একলা থাকিতে তাহার ভয় নাই।

কালীময়ের বাড়িতে বেশী লোকের আসা-যাওয়া নাই, যাহারা আসে, কাজের দায়ে আসে; কদাচিৎ দু'একজন মক্কেল, কখনও খাতক টাকা ধার লইতে বা শোধ দিতে আসে। পড়শীদের সঙ্গে কালীময়ের নামমাত্র পরিচয়, কেবল মোহিত রক্ষিতের সহিত একটু ব্যবহারিক ঘনিষ্ঠতা আছে।

মোহিত রক্ষিত ফুর্তিবাজ ছোকরা। সুদর্শন চেহারা, মিষ্ট আচার ব্যবহার;

কিন্তু প্রচণ্ড জুয়াড়ী। বন্ধুদের পাল্লায় পড়িয়া মাঝে মাঝে মাদকদ্রব্য সেবন করে কিন্তু নেশাখোর নয়। প্রকাশ্যে চরিত্রদোষ ছিল না, কারণ ঘরে ছিল খাণ্ডার বৌ। এই মোহিত রক্ষিত মাঝে-মধ্যে আসিত কালীময়ের কাছে টাকা ধার লইতে। তাহার পিতা তাহার জন্য যথেষ্ট সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু নগদ টাকা এমন ভাবে বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছিলেন যে, প্রতি মাসে একটা বাঁধা বরাদ্দের বেশী সে হাতে পাইত না। তাই মাসের শেষের দিকে হঠাৎ টাকার ঘাট্‌তি হইলে মোহিত কালীময়ের নিকট রিস্ট-ওয়াচ বা আংটি বাঁধা রাখিয়া, কখনও বা শুধু হাতেই, টাকা ধার লইত। আবার হাতে টাকা আসিলেই ঋণ শোধ করিয়া দিত। কালীময় মোহিতকে মনে মনে পছন্দ করিতেন, কারণ সে জুয়াড়ী হইলেও মহাজনকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিত না।

একবার কালীময় জরীপের কাজে দু' তিন দিনের জন্য গ্রামাঞ্চলে গিয়াছিলেন. ফিরিয়া আসিয়া দামিনীকে দেখিয়া তাঁহার মস্তিষ্কে সন্দেহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। দামিনী ভাল মেয়ে নয়, নষ্ট মেয়ে। তাহার গুপ্ত নাগর আছে। সে লুকাইয়া ব্যভিচার করে।

সন্দেহ বস্তুটা যে সকল আণুবীক্ষণিক প্রমাণের উপর নির্ভর করে সে-প্রমাণ কাহাকেও দেখানো যায় না, এমন কি নিজের কাছেও তাহারা খুব স্পষ্ট নয়। তবুও এজাতীয় সন্দেহের হাত ছাড়ানো যায় না। কালীময় মাথার মধ্যে তুষের আগুন জ্বালিয়া ভাবিতে লাগিলেন—দামিনী বিবাহের আগে হইতেই দুশ্চরিত্রা...এইজন্যই তাঁহার দূর-সম্পর্কীয়া ভগিনী তাহাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করিয়াছিল...ভগিনীপতির সঙ্গে নটঘট...লোকটা ঐজন্যই আসে...তাহারা সম্পর্কে ভাই-বোন, কিন্তু যাহারা নষ্ট-দুশ্চরিত্র তাহাদের কি সম্পর্ক জ্ঞান থাকে?...শুধু তাই নয়, এখানেও দামিনীর গুপ্ত-প্রণয়ী আছে...কে সে? বাড়িতে তো সে-রকম কেহ আসে না...তাঁহার অনুপস্থিতি-কালে কাহার যাতায়াত আছে? কে সে?

কালীময় স্থির করিলেন, কেবল সন্দেহের তুষানলে দগ্ধ হইয়া লাভ নাই, ধরিতে হইবে। হাতে-নাতে ধরিয়া তারপর নষ্ট স্ত্রীলোকটাকে দূর করিয়া দিবেন। কেলেঙ্কারী হইবে. শহরে কান পাতা যাইবে না—তা হোক।

শনিবার বিকালে আদালত হইতে ফিরিয়া জলযোগ করিতে করিতে কালীময় বলিলেন. 'আজ রাত্তিরে মাছ ধরতে যাব।' তাঁহার বাহ্য ব্যবহার দেখিয়া মনের কথা অনুমান করা যায় না।

দামিনীর চোখের মধ্যে ঝিলিক খেলিয়া গেল। সে তৎক্ষণাৎ চোখের উপর পল্লবের আবরণ নামাইয়া বলিল, 'ও।—তাহলে তোমার রাত্তিরের খাবার তৈরি করি। ফিরতে কি রাত হবে?'

কালীময় বলিলেন, 'যেমন হয়, একটা-দেড়টা।'

রাত্রি সাড়ে আটটার পর কালীময় বাহির হইলেন। একটি চটের থলিতে মাছ-ধরার সরঞ্জাম; চার, টোপ, ভাজা খোল ও মেথির গুঁড়া, একটি কারবাইডের সাইকেল-ল্যাম্প। সেই সঙ্গে একটি দেড় ফুট লম্বা লোহার ডাণ্ডা। রাত্রে মাছ ধরিতে গেলে এই ডাণ্ডাটি তাঁহার সঙ্গে থাকে। নির্জন স্থানে একাকী রাত্রি-যাপন, আত্মরক্ষার একটা অস্ত্র সঙ্গে থাকা ভাল।

এক হাতে ছিপ, অন্য হাতে থলি লইয়া কালীময় বাহির হইলেন। তিনি ফটক পার না হওয়া পর্যন্ত দামিনী দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর দ্বার বন্ধ

করিয়া দিল। বাড়িতে আর কেহ নাই; ঠিকা ঝি দিনের বেলা কাজ করিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে, আবার কাল সকালে আসিয়া রাত্রির এঁটো বাসন মাজিবে।

কালীময়ের বাড়ির সম্মুখের রাস্তাটির দুইটি মুখ; একটি বাজারের দিকে, অন্যটি শহরের বাহিরে গিয়াছে। কালীময় বাহিরের রাস্তা ধরিলেন। চৌধুরীদের বাগানবাড়িটা শহরের দুই মাইল বাহিরে। প্রকান্ড পুকুর, পুকুরে খল্সে পুঁটি হইতে বড় বড় রুই কাৎলা মৃগেল চিতল সব মাছই আছে। চৌধুরীরা কালেভদ্রে বাগানবাড়িতে আমোদ করিতে যান; একটা মালী বাগানবাড়ির তত্ত্বাবধান করে। চৌধুরীরা বড় জমিদার; কালীময় তাঁহাদের এস্টেটের একজন উকিল। পুকুরে মাছ ধরিবার ঢালাও হুকুম আছে।

কিছুদূর চলিবার পর মোহিত রক্ষিতের বাড়ির কাছাকাছি মোহিতের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইয়া গেল। সে বলিল, 'এই যে ঘোষ মশাই! আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম।'

কালীময় দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'কি ব্যাপার?'

'কিছু টাকার দরকার পড়েছিল।'

'কত?'

'শ' দুই।'

'তা এখন তো হবে না, কাল সকালে এস।'

'তাই যাব। কোথায় চলেছেন? চৌধুরীদের পুকুরে?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ আছেন!' একটু হাসিয়া মোহিত চলিয়া গেল। নিজের বাড়িতে ফিরিয়া গেল না, শহরে কোনও জুয়ার আড্ডায় গেল।

মোহিতের বাড়ির সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় কালীময় শুনিতে পাইলেন বাড়ির ভিতর হইতে কাংস্যকণ্ঠের তীক্ষ্ণ স্বর আসিতেছে— '...বাড়িতে মন বসে না, দিনরাত শুধু জুয়া আর জুয়া! লক্ষ্মীছাড়ার দশা!...বাপ যা রেখে গেছে সব ছারে গোল্লায় দিয়ে তবে নিশ্চিন্দি হবে...'

চলিতে চলিতে কালীময় ভাবিতে লাগিলেন—মোহিতের বৌ সুন্দরী এবং যুবতী; কিন্তু কী গলা! কী মেজাজ! দুনিয়ায় বিবাহ করিয়া কেহ সুখী হইয়াছে কি? তিনি নিজে দুইবার বিবাহ করিয়াছেন; প্রথমটি চিররুগ্না, দ্বিতীয়টি ভ্রষ্টা। মানুষ বিবাহ করে কেন?

রাস্তাটা আরও আধ মাইল গিয়া মিউনিসিপাল এলাকার শেষ প্রান্তে পৌঁছিয়াছে অতঃপর আর আলোকস্তম্ভ নাই। এইখানে পৌঁছিয়া কালীময় একটি গাছের তলায় উপস্থিত হইলেন। রাত্রিকালে এ রাস্তায় লোকচলাচল খুবই কম, তবু কালীময় গাছের পিছনদিকে গিয়া ছিপটি গাছের গুঁড়িতে হেলাইয়া দিলেন; থলিটি মাটিতে রাখিয়া নিজে একটি উন্নত শিকড়ের উপর উপবেশন করিলেন। এখানে বসিলে রাস্তা দিয়া মোটর-গাড়ি যাইলেও তাহার হেড-লাইটের আলোয় তাঁহাকে দেখা যাইবে না।

পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া কালিময় ধরাইলেন; ধরাইবার সময় দেশলাইয়ের আলোতে হাতঘড়িটা দেখিয়া লইলেন। ন'টা বাজিয়া পাঁচ মিনিট।

আজ সিগারেট বড় শীঘ্র শেষ হইয়া গেল। তিনি আর একটা সিগারেট ধরাইলেন। সেটা শেষ হইলে আর একটা...

দশটা বাজিলে কালীময় পায়ের জুতা খুলিয়া ফেলিলেন; জুতাজোড়া গাছের স্কন্ধে তুলিয়া রাখিলেন, শিয়াল-কুকুরে লইয়া না যায়। তারপর থলি হইতে লোহার ডান্ডাটি লইয়া থলিও গাছের একটি গোঁজের মতো ডালে ঝুলাইয়া দিলেন। ছিপটি

যেমন ছিল তেমনি রহিল। কালীময় লোহার ডাণ্ডাটি দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া নিঃশব্দে ফিরিয়া চলিলেন। রাস্তায় জনমানব নাই।

নিজের পাড়ায় যখন ফিরিলেন তখন পাড়া নিষুতি; সব বাড়িতে আলো নিভিয়া গিয়াছে, কেবল মোহিতের বাড়ির একটা ঘরে আলো জ্বলিতেছে।

কালীময়ের নিজের বাড়িও অন্ধকার, কোথাও সাড়াশব্দ নাই। তিনি চোরের মত প্রবেশ করিলেন। বাড়ির প্রবেশদ্বার দুইটি—একটি সামনে, একটি পিছনে। কালীময় অনুভব করিয়া দেখিলেন, দুইটি দ্বারই ভিতর হইতে বন্ধ। তিনি তখন নিঃশব্দপদে শয়নঘরের জানালার বাহিরে গিয়া দাঁড়াইলেন। জানালার একটি কপাট অল্প খোলা রহিয়াছে; ঘরের ভিতর অন্ধকার। কান পাতিয়া থাকিলে ফিসফিস গলার আওয়াজ শোনা যায়। কিছুক্ষণ কান পাতিয়া শুনিবার পর কালীময় কণ্ঠস্বর দু'টি চিনিতে পারিলেন—একটি তাঁহার স্ত্রী দামিনীর, অপরটি তাঁহার খাতক মোহিত রক্ষিতের।

পরদিন সকালবেলা পাড়ায় হুলস্থূল কাণ্ড। মোহিত রক্ষিত নিজের স্ত্রীকে খুন করিয়া ফেরারী হইয়াছে। বাড়িতে পুলিস আসিয়াছে।

মোহিতের বাড়ির বাঁ পাশে গোপাল নিয়োগীর বাড়ি, ডান পাশে থাকেন প্রতাপ চন্দ। দু'জনেই প্রৌঢ় ব্যক্তি; তাঁহারা পুলিসের কাছে এজেহার দিলেন। মোহিত এবং অন্নপূর্ণার কলহ দৈনন্দিন ব্যাপার। কাল রাত্রি আন্দাজ এগারোটার সময় তাঁহারা মোহিতের বাড়ি হইতে অন্নপূর্ণার চীৎকার ও গালিগালাজের শব্দ শুনিতে পান। মোহিত কোনও দিনই চেঁচাইয়া ঝগড়া করে না, কালও তাহার কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শোনা যায় নাই। হঠাৎ অন্নপূর্ণা—'মেরে ফেললে' 'মেরে ফেললে' বলিয়া দুই তিন বার চীৎকার করিয়াই চুপ করিল। ব্যাপার এতটা চরমে আগে কখনও ওঠে নাই। কিন্তু দাম্পত্য কলহে বাহিরের লোকের হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়া মূঢ়তা, তাই গোপাল নিয়োগী এবং প্রতাপ চন্দ অত রাত্রে আর বাড়ির বাহির হন নাই। বিশেষত অন্নপূর্ণা যখন হঠাৎ চুপ করিয়া গেল তখন তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন মোহিত বৌকে পিটাইয়া শায়েস্তা করিয়াছে। সে যে বৌকে খুন করিতে পারে এ সম্ভাবনা তাহাদের মাথায় আসে নাই। সারারাত্রি মৃতদেহ খোলা বাড়িতে পড়িয়া ছিল, সকালবেলা ঝি আসিয়া আবিষ্কার করিয়াছে। ঝিয়ের চেঁচামেচিতে গোপালবাবু ও প্রতাপবাবু এ বাড়িতে আসিয়াছেন এবং মৃতদেহ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছেন।

কালীময় মোহিতের বাড়িতে গেলেন। পাড়ায় এমন একটা কাণ্ড হইয়া গেল, সকলেই গিয়াছে, তিনি না গেলে খারাপ দেখায়। পুলিস দারোগা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কিছু জানেন?'

এজেহার দিবার ইচ্ছা কালীময়েব ছিল না, তিনি ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, 'কখন—এই ব্যাপার ঘটেছে?'

দারোগা গোপাল নিয়োগী ও প্রতাপ চন্দকে দেখাইয়া বলিলেন, 'এঁদের কথা থেকে মনে হয় রাত্রি আন্দাজ এগারোটার সময় খুন হয়েছে। অন্য সাক্ষী নেই, বাড়িতে ঝি-চাকর কেউ থাকত না।'

কালীময় বলিলেন, 'এগারোটার কথা জানি না, আমি চৌধুরীদের পুকুরে মাছ ধরতে গিয়েছিলাম। কিন্তু রাত্রি আন্দাজ সাড়ে আটটার সময় মোহিতের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।'

দারোগা বলিলেন, 'তাই নাকি! কোথায় দেখা হয়েছিল?'

কালীময় গতরাত্রে মোহিতের সহিত পথে সাক্ষাতের বিবরণ বলিলেন। শুনিয়

দারোগা কহিলেন, 'হুঁ। আর একটা জোরালো মোটিভ পাওয়া যাচ্ছে। মৃত মহিলার গলায় দশ-বারো ভরি ওজনের সোনার হার ছিল, খুনী সেটা নিয়ে গেছে।—মোহিত রক্ষিত আপনার কাছে টাকা ধার নিতে যাচ্ছিল, কিন্তু আপনার কাছে ধার না পেয়ে শুধু-হাতেই জুয়ার আড্ডায় গিয়েছিল। সেখানে বোধহয় আমল পায়নি, তাই বৌয়ের গলার হার নিতে এসেছিল। তারপর—'

দারোগা পাড়ার আরও অনেককে প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু নূতন কোনও তথ্য পাওয়া গেল না। মোহিত জুয়াড়ী ছিল, দলে পড়িয়া মাঝে মাঝে মদ খাইত, কিন্তু মোটের উপর মানুষ মন্দ ছিল না; অন্নপূর্ণার সহ্যগুণ ছিল না, মুখের রাশ ছিল না, সামান্য কারণে ঝগড়া বাধাইয়া পাড়া মাথায় করিত—এই তথ্যগুলিই সকলের মুখে প্রকাশ পাইল।

তদন্ত শেষ করিয়া দারোগা লাশ লইয়া চলিয়া গেলেন। পলাতক মোহিত রক্ষিতের নামে পুলিসের হুলিয়া বাহির হইল।

গতরাত্রে প্রায় একটার সময় কালীময় মাছ ধরিয়া বাড়ি ফিরিয়াছিলেন। দামিনী ঘুমচোখে আসিয়া দোর খুলিয়া দিয়াছিল, জড়িতস্বরে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'মাছ পেলে?'

কালীময় সংক্ষেপে বলিয়াছিলেন, 'না।'

আর কোনও কথা হয় নাই। দামিনী গিয়া আবার শয়ন করিয়াছিল; কালীময় হাত মুখ ধুইয়া তাহার পাশে শয়ন করিয়া ছিলেন। দামিনী কয়েকবার আড়মোড়া ভাঙিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, কালীময় সারারাত্রি জাগিয়া ছিলেন।

সকালবেলা দু'জনের মধ্যে লুকোচুরি খেলা আরম্ভ হইল। বাহির-বাড়িতে খুনের খবর পাইয়া কালীময় অন্দরে আসিলেন; দামিনীকে বলিলেন, 'কাল রাত্রে মোহিত রক্ষিত বৌকে খুন করে পালিয়েছে।'

দামিনী চা তৈরি করিতেছিল, তাহার মুখখানা হঠাৎ শুকাইয়া শীর্ণ হইয়া গেল, সে চকিত-ভয়ার্ত চক্ষু একবার তুলিয়া তৎক্ষণাৎ নত করিয়া ফেলিল। কালীময় বলিলেন, 'মোহিতকে তুমি দেখেছ নিশ্চয়। আমার কাছে আসতো টাকা ধার করতে।'

দামিনী চোখ তুলিল না, জড়াইয়া জড়াইয়া বলিল, 'কি জানি—মনে পড়ছে না—'

চা পান করিয়া কালীময় ঘটনাস্থলে গেলেন। সেখান হইতে ফিরিতে বেলা প্রায় দুপুর হইল। বাড়ি আসিয়া তিনি দামিনীকে বলিলেন, 'কাল রাত্তির এগারোটার সময় মোহিত তার বৌকে খুন করেছে।'

দামিনীর চোখে ঝিলিক খেলিয়া গেল। সে অন্যদিকে চোখ ফিরাইয়া বলিল, 'তাই নাকি?' কথাটা অত্যন্ত নীরস ও অর্থহীন শুনাইল। মনের স্পর্শহীন নিষ্প্রাণ বাঁধা বুলি।

পরদিন সোমবার। মোহিতের হুলিয়া শহরের বাহিরেও জারি হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মোহিত এখনও ধরা পড়ে নাই।

শহর হইতে তিন স্টেশন দূরে বড় জংশন। সোমবার সন্ধ্যাবেলা পুলিসের জমাদার অভয় শিকদার জংশনের সদর প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করিতেছিল। সে এক-রাত্রির জন্য ছুটি লইয়া ধুতি-পাঞ্জাবি পরিয়া শ্বশুরবাড়ি যাইতেছে। তাহার বয়স সাতাশ-আটাশ, প্রথম পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে; তাই পুত্রমুখ দর্শনের জন্য সে একরাশি

ছুটি পাইয়াছে। তাহার শ্বশুরবাড়ি বেশী দূরে নয়, ট্রেনে ঘণ্টা তিনেকের রাস্তা। কিন্তু জংশন পর্যন্ত আসিয়া সে আটকাইয়া গিয়াছে; ওদিকের ট্রেনের কি গোলযোগ হইয়াছে, আড়াই ঘণ্টা লেট।

অভয় শিকদার অধীর ভাবে প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করিতেছে। সময় যেন কাটিতে চায় না। সে স্টেশনের পরিচিত মালবাবু ও চেকারদের সঙ্গে গল্প করিয়াছে; স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে যে ছোট পুলিস-থানা আছে সেখানে বসিয়া আড্ডা দিয়াছে. পলাতক খুনী আসামী মোহিত রক্ষিত সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছে. .আসামীকে সে চেনে, কিন্তু এখন আর তাহাকে কোথায় পাওয়া যাইবে? সে এতক্ষণে হিল্লী-দিল্লী মক্কা-মদিনা পার হইয়া গিয়াছে।...কাল আবার শেষরাত্রেই ট্রেনে চড়িয়া ফিরিতে হইবে। দারোগাবাবু বলিয়া দিয়াছেন, পুত্রমুখ-দর্শনে আত্মহারা হইয়া দেরি করিলে চলিবে না, ভোরবেলায় যথাসময়ে ডিউটিতে আসা চাই।

প্ল্যাটফর্মে অন্য গাড়ি আসিতেছে যাইতেছে, যাত্রীরা উঠিতেছে নামিতেছে; একটা ট্রেন চলিয়া গেলে কিছুক্ষণের জন্য প্ল্যাটফর্ম খালি হইয়া যাইতেছে। ক্রমে স্টেশনের আলোগুলি জ্বলিয়া উঠিল। এতক্ষণে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছিয়া যাইবার কথা। দুত্তোর!

অভয় ক্লান্তভাবে একজন চেকারকে গিয়া বলিল, 'আর কত দেরি দাদা? গাড়ি আসছে?'

চেকার বলিলেন, 'আসছে, আসছে, আর মিনিট কুড়ি।—তারপর, মিষ্টি খাওয়াচ্ছ কবে?'

অভয় হুঁ-হুঁ করিয়া হাসিয়া বলিল, 'সব হবে দাদা, আগে ছেলেটাকে দেখে আসি। আপাতত এই একটা চলুক।' বলিয়া সিগারেটের প্যাকেট বাহির করিয়া দিল।

চেকার সিগারেট লইয়া প্রস্থান করিলে অভয় অনুভব করিল তাহার ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে। সম্ভবত মিষ্টি খাওয়ানোর কথায় ক্ষুধার কথা মনে পড়িয়া গিয়াছে। সে থার্ডক্লাস যাত্রীদের বিশ্রাম-মণ্ডপের দিকে চলিল, সেখানে খাবার ও চায়ের স্টল আছে।

মণ্ডপের প্রকাণ্ড চত্বরে দুই-চারিজন যাত্রী, কেহ শুইয়া কেহ বসিয়া সময় কাটাইতেছে; ইলেকট্রিক বাতির আলোতে অন্ধকার দূর হইয়াছে বটে, কিন্তু আবছায়া কাটে নাই। চায়ের স্টলে উজ্জ্বল আলো আছে। অভয় স্টলে গিয়া চা ও বিস্কুট চাহিল।

স্টলের সামনে কেবল একজন লোক দাঁড়াইয়া চা খাইতেছিল; মাথায় বর্মী ভঙ্গীতে রুমাল বাঁধা, মুখে দু'তিন দিনের দাড়ি। অভয় স্টলে আসিলে সে একটু সরিয়া গিয়া তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া চা খাইতে লাগিল।

অভয় প্রথমে তাহাকে লক্ষ্য করে নাই; বিস্কুট সহযোগে চা খাইতে খাইতে সে একসময় লোকটার মুখের পাশ দেখিতে পাইল। গালে গভীর কালির দাগের মতো দাড়ি সত্ত্বেও অভয় চিনিতে পারিল; হাতে চায়ের পেয়ালাটা একবার পিরিচের উপর নাচিয়া উঠিল। তারপর ক্ষণেকের জন্য সে নিশ্চল হইয়া গেল।

মাথার মধ্যে প্ল্যান ঠিক করিতে করিতে অভয় চা শেষ করিল, স্টলওয়ালাকে পয়সা দিয়া অলসকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'পানের দোকানটা কোন্ দিকে?'

স্টলওয়ালা বলিল, 'পান-সিগ্রেট আপনি প্ল্যাটফর্মে পাবেন—হকারের কাছে।'

যেন কোনই তাড়া নাই এমনি মন্থরপদে অভয় প্ল্যাটফর্মে ফিরিয়া গেল। তারপর ছুটিতে ছুটিতে থানার ঘরে প্রবেশ করিল।

পাঁচ মিনিট পরে সে আবার চায়ের স্টলে ফিরিয়া আসিল। মাথায় রুমাল-বাঁধা লোকটা চা শেষ করিয়া দোকানদারকে পয়সা দিতেছে। অভয় তাহার পিছনে গিয়া

দাঁড়াইল।

সে ফিরিতেই অভয়ের সহিত তাহার চোখাচোখি হইল। সে অভয়কে চিনিল না, পাশ কাটাইয়া যাইবার চেষ্টা করিল। ইতিমধ্যে দুই দিক হইতে পুলিসের পোশাক-পরা দুইজন লোক অগ্রসর হইয়া আসিতেছে।

অভয় বলিল, 'তোমার নাম মোহিত রক্ষিত। তুমি ফেরারী আসামী।'

মোহিত ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া গেল, তারপর ভড়কানো ঘোড়ার মতো পালাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু পালাইতে পারিল না, তিন দিক হইতে তিন জন তাহাকে চাপিয়া ধরিল।

থানার ঘরে লইয়া গিয়া মোহিতকে সার্চ করা হইল। তাহার কাছে তাহার মৃত স্ত্রীর সোনার হার এবং কয়েক গণ্ডা পয়সা পাওয়া গেল। নগদ টাকার অভাবে সে বেশীদূর পালাইতে পারে নাই।

সে-রাত্রে অভয়ের পুত্রমুখ দর্শন হইল না, গাড়ি আসিয়া চলিয়া গেল। অভয় মোহিতের হাতে হাতকড়া পরাইয়া দুইজন কনেস্টবল সঙ্গে শহরে ফিরিয়া চলিল।

মোহিতের মামলা কমিটিং কোর্ট পার হইয়া দায়রা আদালতে উঠিল। মোহিতের পক্ষে একজন নামজাদা ফৌজদারী উকিল নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে দুই তিন জন জুনিয়র। সরকারের পক্ষে ছিলেন স্থানীয় প্রবীণ পাবলিক প্রসিকিউটার। কালীময় যদিও কোনও পক্ষেই নিযুক্ত হন নাই, তবু তিনি বরাবর কোর্টে হাজির ছিলেন, অন্য আরও অনেক জুনিয়র উকিল উপস্থিত ছিল। তা ছাড়া শহরের কৌতূহলী জনসাধারণ ভিড় করিয়া মজা দেখিতে আসিয়াছিল।

আসামীর কাঠগড়ায় মোহিত রক্ষিত একমাথা রুক্ষ চুল ও একমুখ দাড়ি লইয়া নতনেত্রে দাঁড়াইয়া ছিল।

হাকিম রামরাখাল সেন আসিয়া বিচারকের সামনে উপবিষ্ট হইলে মামলা আরম্ভ হইল। রামরাখাল সেন কড়া মেজাজের বিচারপতি, তাঁহার এজলাসে উকিলেরা বৃথা বাক্যব্যয় বা চেঁচামেচি করিতে সাহস করে না। জুরীনির্বাচন সম্পন্ন হইলে সরকারী উকিল সংক্ষেপে মামলা বয়ান করিলেন—

মোহিত রক্ষিত উচ্ছৃঙ্খল যুবক, জুয়া এবং আনুষঙ্গিক নানাপ্রকার কদাচারে পৈতৃক পয়সা ওড়ানোই তাহার একমাত্র কাজ ছিল। তাহার সতীসাধ্বী স্ত্রী অন্নপূর্ণা তাহাকে সৎপথে আনিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু পারিয়া উঠিত না। এই লইয়া স্বামী-স্ত্রীতে প্রায়ই বচসা হইত। নিজের রুচি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী কার্যে বাধা পাইয়া মোহিত স্ত্রীর প্রতি অতিশয় বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল।

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর শনিবার স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ চরমে উঠিল। মোহিতের জুয়া খেলিবার প্রবৃত্তি চাগাড় দিয়াছিল, অথচ মাসের শেষে তাহার হাতে টাকা ছিল না। সে প্রথমে টাকা ধার করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ধার না পাইয়া স্ত্রীর গলার হার বন্ধক দিয়া টাকা সংগ্রহ করিবার মতলব করিল। রাত্রি সাড়ে দশটার পর সে গৃহে ফিরিয়া স্ত্রীর নিকট হার চাহিল। অন্নপূর্ণা হার দিতে অস্বীকার করিল। তখন মোহিত স্ত্রীর মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করিয়া তাহাকে খুন করিল এবং তাহার গলা হইতে হার খুলিয়া লইয়া ফেরারী হইল।

দুই দিন পরে সোমবার সন্ধ্যায় রেলওয়ে জংশনে পুলিস মোহিতকে গ্রেপ্তার করে। তাহার সঙ্গে তখনও তাহার মৃত স্ত্রীর হার ছিল। সেই হার পুলিস কর্তৃক কেমিক্যাল-অ্যানালিস্টের কাছে প্রেরিত হয়। হার পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে তাহাতে

রক্ত লাগিয়া ছিল, এবং সেই রক্ত মোহিতের স্ত্রীর রক্ত; অন্তত একই গ্রুপের রক্ত। ডাক্তারিতে যাহাকে AB গ্রুপের রক্ত বলে, সেই রক্ত।

খুনের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী অবশ্য নাই, কিন্তু সব প্রমাণ মিলাইয়া অনিবার্যভাবে প্রতিপন্ন করা যায় যে, মোহিত নিজের স্ত্রীকে খুন করিয়াছে, এ বিষয়ে reasonable doubt-এর অবকাশ নাই।

আসামীকে প্রশ্ন করা হইল, তুমি দোষী কি নির্দোষ? মোহিত হাতজোড় করিয়া হাকিমকে বলিল, 'হুজুর, আমি মহাপাপী কিন্তু আমি আমার স্ত্রীকে খুন করিনি।' বলিয়া অসহায়ভাবে কাঁদিতে লাগিল।

আসামী পক্ষের উকিল বলিলেন, 'হুজুর, আমার মক্কেল বেকসুর, তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষী-সাবুদ কিছুই নাই। সরকারী উকিল আগে নিজের কেস প্রমাণ করুন; আসামীর সাফাই এখন উহ্য রহিল, প্রয়োজন হইলে পরে হুজুরে দাখিল করিব।'

অতঃপর একে একে সাক্ষীরা আসিয়া জবানবন্দী দিতে লাগিল। অনেক সাক্ষী। গোপাল নিয়োগী এবং প্রতাপ চন্দ সাক্ষ্য দিলেন। কালীময়েরও সাক্ষ্য দিবার কথা, কিন্তু তিনি পূর্বেই পাবলিক প্রসিকিউটারের কাছে গিয়া নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়াছিলেন। তিনি উকিল, তাঁহার যে তেজারতির কারবার আছে এ কথা প্রকাশ্য আদালতে প্রচার হইলে তাঁহার নিন্দা হইবে। পাবলিক প্রসিকিউটার বলিয়াছিলেন, 'আপনাকে না হলেও চলে যাবে। দু'জন মাড়োয়ারী সাক্ষী আছে, তাদের দিয়ে কাজ চালিয়ে নেব।'

প্রথম দিন তিন চার জন সাক্ষীর এজেহার হইল। মোহিতের উকিল দীর্ঘকাল জেরা করিয়াও সাক্ষীদের টলাইতে পারিলেন না। সেদিনের মতো মোকদ্দমা শেষ হইলে মোহিতকে আবার লক্-আপে লইয়া যাওয়া হইল। সে জামানত পায় নাই।

আদালত হইতে ফিরিয়া কালীময় হাত মুখ ধুইয়া জলযোগ করিতে বসিলেন। ঘরে তিনি আর দামিনী ছাড়া আর কেহ নাই। দামিনী খাঁচায় ধরা-পড়া ইঁদুরের মতো ঘরের এদিক হইতে ওদিক ছটফট করিয়া বেড়াইতেছে, বাহির হইবার পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না। সে জানে আজ হইতে মোহিতের মোকদ্দমা আরম্ভ।

কালীময় জলযোগ করিতে করিতে বলিলেন, 'আজ দায়রা এজলাসে লোকে লোকারণ্য, তিল ফেলবার জায়গা ছিল না। সবাই মোহিতের মোকদ্দমা শুনতে এসেছে।'

দামিনী কথা বলিল না, তাহার অস্থিরতা যেন আর একটু বাড়িয়া গেল।

কালীময় আবার বলিলেন, 'মোহিত বললো, সে মহাপাপী, কিন্তু বৌকে খুন করেনি।...হয়তো সত্যি কথাই বলেছে, হয়তো যে-সময় তার বৌ খুন হয় সে-সময়ে সে অন্য কোথাও ছিল। কিন্তু প্রমাণ করবে কি করে?'

দামিনীর ছটফটানি আরও বাড়িয়া গেল, কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

কালীময় দামিনীর মুখের পানে চোখ তুলিয়া বলিলেন, 'মোহিত যদি প্রমাণ করতে না পারে যে, খুনের সময় অন্য কোথাও ছিল, তাহলে বোধহয় তার ফাঁসি হবে। রামরাখালবাবু বড় কড়া হাকিম—'

দামিনী হঠাৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, যেন খাঁচার ইঁদুর পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে।

পরদিন মোহিতের বিচারে আরও সাক্ষী আসিল। সরকারী ডাক্তার শব-ব্যবচ্ছেদের রিপোর্ট দিলেন; মাথায় ভারী ভোঁতা অস্ত্রের আঘাতে অন্নপূর্ণার মৃত্যু ঘটিয়াছে;

মৃত্যুর সময় মধ্য-রাত্রির কাছাকাছি। অন্নপূর্ণার রক্ত AB গ্রুপের। AB গ্রুপের রক্ত খুবই বিরল, শতকরা তিনজনের মধ্যে পাওয়া যায়। অতঃপর পুলিসের যে দারোগা তদন্তের ভার পাইয়াছিলেন তিনি সাক্ষী দিলেন। দুই জন মাড়োয়ারী সাক্ষী দিল: খুনের রাত্রে আন্দাজ ন'টার সময় মোহিত তাহাদের কাছে টাকা ধার লইতে গিয়াছিল; কিন্তু তাহারা জানিত মোহিত জুয়াড়ী, তাই শুধু-হাতে টাকা ধার দেয় নাই, বলিয়াছিল, বন্ধকী দ্রব্য পাইলে টাকা ধার দিতে পারে। মোহিত চলিযা গিয়াছিল, আর ফিবিয়া আসে নাই।

সাক্ষীদের জেরা শেষ করিতে করিতে দ্বিতীয় দিনের শুনানী শেষ হইল। সাক্ষীরা অটল রহিল।

তৃতীয় দিনের সাক্ষীরা ভাল করিয়া মোহিতের গলায় ফাঁসির দড়ি পরাইল। প্রথমে অভয় শিকদার আসিয়া মোহিতকে গ্রেপ্তার করিবার ইতিহাস বলিল, গ্রেপ্তারের সময় মোহিত পালাইবার চেষ্টা করিয়াছিল তাহাও উল্লেখ করিল। জংশন স্টেশনের পুলিস দারোগা মোহিতের বাড়ি সার্চ করিয়া সোনার হার পাইয়াছিলেন তাহা প্রকাশ করিলেন; সোনার হারে রক্ত-চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া তিনি উহা খামে ভরিয়া তদন্তের ভার-প্রাপ্ত কর্মচারীর কাছে পাঠাইয়া দেন। হারটি এক্‌জিবিট রূপে কোর্টে দাখিল করা হইল।

অতঃপর আসিলেন সরকারী রাসায়নিক পরীক্ষক। তিনি বলিলেন, হারে যে-রক্ত লাগিয়াছিল তাহা তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন; উহা মানুষের রক্ত এবং AB গ্রুপের রক্ত। শব-ব্যবচ্ছেদক ডাক্তারের সাক্ষ্যের সহিত মিলাইয়া কাহারও সন্দেহ রহিল না যে, মোহিত রক্ষিত রক্তাক্তদেহা মৃতা স্ত্রীর গলা হইতে হার খুলিয়া লইয়াছিল। এবং সে যদি খুন না করিয়া থাকে তবে ফেরারী হইল কেন? Reasonable doubt-এর কোন অবকাশ নাই।

পাবলিক প্রসিকিউটার হাকিমকে বলিলেন, 'হুজুর, আমার সাক্ষী শেষ হয়েছে, এবার আসামী-পক্ষ সাফাই পেশ করতে পারেন।'

আসামীর উকিল উঠিয়া বলিলেন, 'হুজুর, সরকারী উকিল নিঃসংশয়ে প্রমাণ করতে পারেননি যে আসামী খুন করেছে। যাহোক, আজ আর সময় নেই। কাল আমি সাফাই সাক্ষী দাখিল করব। তারা প্রমাণ করবে যে খুনের রাত্রে আসামী অন্যত্র ছিল।'

আসামীর কাঠগড়ায় মোহিত একবার ভীত-ব্যাকুল চক্ষে চারিদিকে চাহিল, যেন চীৎকার করিয়া কিছু বলিতে চাহিল, তারপর দু'হাতে মুখ ঢাকিল।

উকিল কিরূপ সাফাই সাক্ষী দিবেন তাহা সে জানিত না। উকিল মোহিতের কাছে সত্য কথা জানিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিফল হইয়া নিজেই সাক্ষীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

সে-রাত্রে শয়নের পূর্বে কালীময় আলমারি হইতে হুইস্কির বোতল বাহির করিলেন। গেলাসে হুইস্কি ঢালিয়া তাহাতে জল মিশাইয়া গেলাস হাতে বিছানার পাশে আসিয়া বসিলেন। দামিনী শয়নের পূর্বে আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মুখে ক্রীম মাখিতেছিল।

কালীময় বলিলেন, 'মোহিতকে দেখে দুঃখ হয়। কী যেন বলতে চাইছে কিন্তু বলতে পারছে না। মোকদ্দমার অবস্থা ভাল নয়, বোধকরি ওর ফাঁসি হবে।'

দামিনী কালীময়ের দিকে মুখ ফিরাইল না, দু'হাতের আঙুল দিয়া মুখে ক্রীম ঘষিতে লাগিল।

কালীময় গেলাসে চুমুক দিয়া বলিলেন, 'আমার কি মনে হয় জানো? এর মধ্যে স্ত্রীলোক-ঘটিত ব্যাপার আছে। মোহিতের সঙ্গে বোধহয় কোনও কুলবধূর

নটঘট ছিল। যে-রাত্রে খুন হয় সে-রাত্রে মোহিত তার কাছে গিয়েছিল, কিন্তু সে-কথা এখন বলতে পারছে না। এমন অনেক অপরাধ আছে-যা স্বীকার করার চেয়ে ফাঁসি যাওয়াও ভাল।'

দামিনী আলো নিভাইয়া দিয়া বিছানায় প্রবেশ করিল। কালীময় অন্ধকারে হুইস্কির গেলাস শেষ করিয়া শয়ন করিলেন। লেপের মধ্যে দামিনীর হাতে তাঁহার হাত ঠেকিল; দামিনীর হাত বরফের মতো ঠাণ্ডা।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কালীময় বলিলেন, 'মোহিত লুচ্চা-লম্পট হোক, ওর মনটা ভদ্র। যার সঙ্গে ওর পিরিত তার কিন্তু উচিত এগিয়ে আসা, সকলের সামনে দাঁড়িয়ে বলা—মোহিত খুনের রাত্রে কোথায় ছিল। নিন্দে হবে, কলঙ্ক হবে; তবু একটা নির্দোষ মানুষের প্রাণ তো বাঁচবে। উচিত কিনা তুমিই বল।'

দামিনী লেপের ভিতর হইতে ফোঁস করিয়া উঠিল, 'আমি কি জানি!' মোহিতের মোকদ্দমা সম্বন্ধে এই সে প্রথম কথা বলিল।

কালীময়ের ইচ্ছা হইল শয্যা হইতে উঠিয়া গিয়া বাহিরের ঘরের চৌকির উপর রাত্রি যাপন করেন। কিন্তু—

সতীসাধ্বী স্ত্রী অপেক্ষা নষ্ট-স্ত্রীলোকের চৌম্বক-শক্তি আরও প্রবল।

চতুর্থ দিন মোহিতের উকিল আদালতে তিনটি সাফাই সাক্ষী পেশ করিলেন। সাক্ষী তিনটিকে দেখিলেই চেনা যায়, নাম-কাটা সেপাই। ভদ্রসন্তান হইলেও ইহারা সমাজের যে-স্তরে বাস করে তাহাকে সমাজের অধমাঙ্গ বলা চলে। নেশা, জুয়া এবং সর্ববিধ অসাধুতা তাহাদের মুখে পোস্ট-অফিসের শিলমোহরের মতো কালো ছাপ মারিয়া দিয়াছে।

তাহারা একে একে আসিয়া সাক্ষ্য দিল যে, খুনের রাত্রে তাহারা তিনজনে মোহিতের সঙ্গে রাত্রি সাড়ে ন'টা হইতে একটা পর্যন্ত ব্রিজ খেলিয়াছিল। ব্রিজ খেলা জুয়া নয়, game of skill, সুতরাং জুয়াখেলা সম্বন্ধেও তাহারা নিষ্পাপ। শহরে একটি সিনেমা-মন্দির আছে, তাহারই সংলগ্ন একটি কুঠুরীতে বসিয়া তাহারা ব্রিজ খেলিয়াছিল। সিনেমা-মন্দিরের অ্যাসিস্টাণ্ট পুরোহিত তাহাদের বন্ধু, তাই উক্ত কুঠুরীতে বসিয়া তাহারা প্রায়ই তাস-পাশা খেলে। সেদিন রাত্রি একটার সময় মোহিত উঠিয়া বাড়ি চলিয়া যায়। তারপর কী ঘটিয়াছে তাহারা জানে না।

ইহাদের সাক্ষ্য ধোপে টিঁকিল না, পাবলিক প্রসিকিউটারের জেরায় ভাঙিয়া পড়িল। দেখা গেল, ব্রিজ খেলায় হরতন বড় কি চিড়িতন বড় তাহা তাহারা জানে না; সিনেমায় সেদিন কোন ছবি প্রদর্শিত হইতেছিল তাহাও তাহারা স্মরণ করিতে পারিল না। একজন সাক্ষী বলিয়া ফেলিল, সেদিনটা শুক্রবার ছিল কি শনিবার ছিল তাহা তাহার ঠিক স্মরণ নাই।

তিনটি সাক্ষীর এজেহার শেষ হইতে অপরাহ্ণ গড়াইয়া গেল। হাকিম রামরাখাল-বাবুর ললাটে ভ্রূকুটি জমা হইতেছিল, তিনি আসামীর উকিলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এরকম সাক্ষী আপনার আর ক'টি আছে?'

উকিল অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, 'আজ্ঞে, আমার কেস্ ক্লোজ করলাম, আর সাক্ষী দেব না।'

'ভাল।' হাকিম একবার দেয়াল-ঘড়ির দিকে দৃক্পাত করিলেন, 'এবার তাহলে আরগুমেণ্ট শুরু করুন!'

—'হুজুর!'

আসামীর উকিল বহস্ আরম্ভ করিবার পূর্বে কাগজপত্র নাড়াচাড়া করিতে করিতে জুনিয়রদের সঙ্গে নিম্নস্বরে কথা বলিতেছেন, এমন সময় কালীময় কোর্টের পিছনদিকের একটি বেঞ্চি হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'হুজুর, আমার কিছু বক্তব্য আছে। আমি এই মোকদ্দমায় কোর্টের পক্ষ থেকে সাক্ষী দিতে চাই।'

হাকিম চকিত ভ্রূভঙ্গী করিয়া মুখ তুলিলেন।

কালীময় কোর্টের সামনে আসিয়া সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠিলেন; হাকিমকে বলিলেন, 'হুজুর, আমি একজন উকিল, এই শহরের বাসিন্দা, আসামীর প্রতিবেশী। মামলা সম্বন্ধে আমি কিছু জানি, হুজুরে তা পেশ করবার অনুমতি দেওয়া হোক।'

হাকিম কিয়ৎকাল স্থিরচক্ষে কালীময়কে নিরীক্ষণ করিলেন, তারপর ঘাড় নাড়িলেন।

কালীময়কে হলফ পড়ানো হইল। তিনি হাকিমের দিকে ফিরিয়া ধীর মন্থর কণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিলেন, 'হুজুর, এই মামলার গোড়া থেকে আমি কোর্টে হাজির আছি, সব সাক্ষীর জবানবন্দী শুনেছি। সরকারী উকিল সাক্ষী-সাবুদ দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে গত ২৭শে সেপ্টেম্বর রাত্রি আন্দাজ এগারোটার সময় মোহিত রক্ষিত তার স্ত্রী অন্নপূর্ণাকে খুন করেছে। হুজুর, অন্নপূর্ণাকে কে খুন করেছে আমি জানি না, কিন্তু আমি হলফ নিয়ে বলতে পারি সে-রাত্রে এগারোটার সময় মোহিত তার নিজের বাড়িতে ছিল না।'

কালীময় একটু থামিলেন। হাকিম গভীর ভ্রূকুটি করিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'কোথায় ছিল?'

কালীময় বলিলেন, 'আমার বাড়িতে, হুজুর।'

হাকিম রামরাখালবাবুর অধরোষ্ঠ বিদ্রূপে বক্র হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, 'রাত্রি এগারোটার সময় আসামী আপনার বাড়িতে কি করছিল? আপনার সঙ্গে তাস খেলছিল?'

কালীময় ঈষৎ গাঢ়স্বরে বলিলেন, 'না হুজুর, আমি বাড়িতে ছিলাম না।'

হাকিম ভ্রূ তুলিলেন, 'তবে?'

মাথা হেঁট করিয়া কালীময় বলিলেন, 'আমি বাড়ি নেই জানতো বলেই মোহিত আমার বাড়িতে গিয়েছিল। মোহিত আমার স্ত্রীর উপপতি।'

কোর্ট-ঘরের মাথার উপর বজ্রপাত হইলেও এমন লোমহর্ষণ পরিস্থিতির উদ্ভব হইত না। কোর্টে উপস্থিত লোকগুলি যেন ক্ষণকালের জন্য অসাড় হইয়া গেল তারপর পিছনদিকের ভিড়ের মধ্যে একটা চাপা কলরব উঠিল। হাকিম রামরাখালবাবুর কষায়িত নেত্রপাতে আবার তৎক্ষণাৎ কক্ষ নীরব হইল বটে, কিন্তু সকলের উত্তেজিত চক্ষু পর্যায়ক্রমে একবার কালীময়ের ও একবার আসামী মোহিত রক্ষিতের পানে ফিরিতে লাগিল। মোহিত কালীময়কে কাঠগড়ায় উঠিতে দেখিয়া কাঠ হইয়া গিয়াছিল, এখন দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিল।

রামরাখালবাবু সাক্ষীর দিকে ফিরিলেন, 'আপনি বলছেন আপনি বাড়ি ছিলেন না।'

'আজ্ঞে না, আমি রাত্রি আন্দাজ সাড়ে আটটার সময় চৌধুরীদের পুকুরে মাছ ধরতে গিয়েছিলাম।'

'হুঁ। তাহলে আপনি জানলেন কি করে যে আসামী আপনার বাড়িতে গিয়েছিল?'

'আজ্ঞে, আমি আবার ফিরে এসেছিলাম। আমি দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহ করেছি। কিছুদিন থেকে আমার সন্দেহ হয়েছিল যে আমার স্ত্রীর চালচলন ভাল নয়। তাই সেদিন যাচাই করবার জন্যে মাছধরার ছল করে বেরিয়েছিলাম।'

হাকিম কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তারপর কড়া সুরে বলিলেন, 'এতদিন এ কথা বলেননি কেন?'

কালীময় বলিলেন, 'লজ্জায় বলতে পারিনি, হুজুর। নিজের স্ত্রীর কলঙ্কের কথা কে প্রকাশ করতে চায়? তা ছাড়া, মোহিত আমার বন্ধু নয়, আমার শত্রু, তাকে বাঁচাবার কোনও দায় আমার নেই। কিন্তু যখন দেখলাম তার ফাঁসির সম্ভাবনা অনিবার্য হয়ে পড়েছে তখন আর থাকতে পারলাম না। যতবড় পাপীই হোক, সে খুন করেনি।'

এই সময় মোহিত চাপা গলায় কাঁদিয়া উঠিল।

সরকারী উকিল উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'হুজুর, আমি সাক্ষীকে জেরা করতে চাই।'

হাকিম বলিলেন, 'অবশ্য। কিন্তু আজ আর সময় নেই। কাল সকালে সাক্ষীর জবানবন্দী নেওয়া হবে।'

সেদিন কোর্ট উঠিল।

সন্ধ্যার সময় কালীময় গৃহে ফিরিলেন। মফঃস্বলের শহরে পরের কেচ্ছা হাওয়ার আগে ছোটে। কালীময় বাড়ি ফিরিয়া দেখিলেন, শয়নঘরের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। তিনি কয়েকবার দরজায় ধাক্কা দিলেন, কিন্তু দামিনী বাহির হইল না।

কালীময় বাহিরের ঘরে চৌকির উপর শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করিলেন।

আদালতের ভিড় প্রথম দিনের ভিড়কেও ছাড়াইয়া গিয়াছে; বিচার-গৃহ ছাপাইয়া, বারান্দা ছাপাইয়া উদ্বেল জনতা মাঠের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আমরা কলিকাতার কয়েকজন সাংবাদিক রাত্রে খবর পাইয়া আসিয়া জুটিয়াছি এবং বিচারকক্ষে স্থান করিয়া লইয়াছি।

আসামীর কাঠগড়ায় মোহিতকে দেখা যাইতেছে না, সে কাঠগড়ার খাঁচার মেঝেয় বসিয়া সর্বজনের চক্ষু হইতে নিজেকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছে।

কালীময়ের জবানবন্দী আরম্ভ হইল। তিনি নূতন কিছু বলিলেন না, পূর্বে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই বিস্তারিত করিয়া বলিলেন।

মোহিতের উকিল অপ্রত্যাশিত সাক্ষী পাইয়া ভরাডুবি হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন, তিনি কালীময়কে জেরা করিলেন না। পাবলিক প্রসিকিউটার ডালকুত্তার মতো কালীময়কে আক্রমণ করিলেন, সমধর্মী উকিল বলিয়া রেয়াৎ করিলেন না। কিন্তু তাঁহার জেরা ব্যর্থ হইল, কালীময়কে তিনি টলাইতে পারিলেন না।

সওয়াল জবাবের কিয়দংশ নিম্নে দিলাম।—

প্রশ্নঃ কতদিন হল আপনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছেন?

উত্তরঃ বছর দুই হল।

প্রশ্নঃ কবে আপনি জানতে পারলেন যে আপনার স্ত্রীর চালচলন ভাল নয়?

উত্তরঃ জানতে পারিনি, সন্দেহ করেছিলাম।

প্রশ্নঃ কবে সন্দেহ করেছিলেন?

উত্তরঃ এই ঘটনার দু'চার দিন আগে।

প্রশ্নঃ কী দেখে সন্দেহ হয়েছিল?

উত্তরঃ চালচলন দেখে।

প্রশ্নঃ স্ত্রীকে এ বিষয়ে কিছু বলেছিলেন?

উত্তরঃ না।

প্রশ্নঃ কেন বলেননি?

কালীময় জিজ্ঞাসু ভাবে হাকিমের দিকে চাহিলেন। হাকিম বলিলেন, 'প্রশ্ন অবান্তর। অন্য প্রশ্ন করুন।'

প্রশ্নঃ আপনি বলেছেন সে-রাত্রে নিজের শোবার ঘরের জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে আড়ি পেতেছিলেন। ক'টা থেকে ক'টা পর্যন্ত আড়ি পেতেছিলেন?

উত্তরঃ আন্দাজ সওয়া দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত।

প্রশ্নঃ এই পৌনে দু'ঘণ্টা আপনি চুপটি করে জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন?

উত্তরঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ ঘর অন্ধকার ছিল, কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন না?

উত্তরঃ না।

প্রশ্নঃ কিন্তু ওদের কথা শুনতে পাচ্ছিলেন?

উত্তরঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ ওরা বেশ জোরে জোরে কথা বলছিল?

উত্তরঃ না, চুপিচুপি কথা বলছিল।

প্রশ্নঃ চুপিচুপি কথা বলা সত্ত্বেও আপনি আসামীর গলা চিনতে পারলেন?

উত্তরঃ শুধু গলা শুনে নয়, ওদের কথা থেকেও বুঝতে পেরেছিলাম।

প্রশ্নঃ কী কথা থেকে বুঝতে পেরেছিলেন?

উত্তরঃ আসামী একবার বলেছিল—'মোহিত রক্ষিত ভদ্রলোকের ছেলে, প্রাণ গেলেও ভদ্রমহিলার কলঙ্ক হতে দেবে না; মোহিত রক্ষিতের মুখ থেকে এ কথা কেউ জানতে পারবে না।'

প্রশ্নঃ আর কি-কি কথা শুনেছিলেন?

কালীময় চক্ষু নত করিয়া নীরব রহিলেন। হাকিম উকিলকে বলিলেন, 'অন্য প্রশ্ন করুন।'

প্রশ্নঃ যাক। আপনি যখন জানতে পারলেন যে আপনার স্ত্রী ব্যভিচারিণী, তখন আপনার রক্ত গরম হয়ে ওঠেনি? রাগ হয়নি?

উত্তরঃ হয়েছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে ভয়ও হয়েছিল।

প্রশ্নঃ ভয় কিসের?

উত্তরঃ রাগের মাথায় ইচ্ছে হয়েছিল দোর ভেঙে ঢুকে দু'জনকেই ঠ্যাঙাই। কিন্তু ভয় হল, আমি একা, ওরা দু'জন—ওরা যদি আমায় খুন করে?

প্রশ্নঃ তাই ফিরে গিয়ে মাছ ধরতে লাগলেন?

উত্তরঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ (ঘৃণাভরে) আপনি মানুষ না কেঁচো!

কালীময় নীরব রহিলেন। হাকিম কড়া স্বরে সরকারী উকিলকে বলিলেন, 'আপনি বার বার Evidence Act- এর বাইরে যাচ্ছেন। এসব প্রশ্ন অবান্তর এবং অসঙ্গত। আপনার যদি আর কোনও প্রশ্ন না থাকে, আপনি বসে পড়ুন।'

'আর একটা প্রশ্ন, হুজুর'—সরকারী উকিল সাক্ষীর দিকে ফিরিলেন।

প্রশ্নঃ আপনার স্ত্রী এখনও আপনার বাড়িতেই আছে?

উত্তরঃ আজ সকাল পর্যন্ত ছিল।

প্রশ্নঃ এই ব্যাপারের পর তার সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ কী রকম?

হাকিম আবার ধমক দিয়া উঠিলেন—'অসঙ্গত—অবান্তর। কেসের সঙ্গে প্রশ্নের কোনও সম্বন্ধ নেই।'

কালীময় হাকিমের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'হুজুর, প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার

আপত্তি নেই।—আমি প্রৌঢ়, যুবতীকে বিবাহ করা আমার উচিত হয়নি। তাই যখন স্ত্রীর স্বভাব-চরিত্রের কথা জানতে পারলাম তখন মনে মনে স্থির করেছিলাম, কোনও রকম হাঙ্গামা না করে চুপিচুপি ওকে ত্যাগ করব। কিন্তু মাঝখান থেকে এই খুনের মামলা এসে সব গণ্ডগোল করে দিল।'

সরকারী উকিল একবার হাকিমের মুখ দেখিলেন, একবার জুরীদের মুখ দেখিলেন; তাঁদের মনের ভাব বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। মামলার হাল একেবারে উল্টাইয়া গিয়াছে। তিনি আর প্রশ্ন না করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

ইতিমধ্যে মোহিতের উকিল গিয়া মোহিতের সঙ্গে কথা বলিয়া আসিয়াছিলেন, তিনি উঠিয়া বলিলেন, 'হুজুর, এবার আসামী নিজের মুখে তার statement দেবে।'

কোর্টের সকলে শিরদাঁড়া খাড়া করিয়া বসিল।

মোহিত ধীরে ধীরে কাঠগড়ায় উঠিয়া দাঁড়াইল। দাড়ি গোঁফ ও রুক্ষ চুলের ভিতর হইতে তাহার মুখখানা দেখিয়া মনে হয়, সে একটা পাগল ভিখারী। কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখদুটো জবাফুলের মতো লাল। সে হাতজোড় করিয়া ভগ্নস্বরে বলিতে আরম্ভ করিল, 'ধর্মাবতার, আমি মহাপাপী, ফাঁসিই আমার উপযুক্ত শাস্তি। কিন্তু আমি আমার স্ত্রীকে খুন করিনি। কালীময়বাবু যা বলেছেন তার একবর্ণও মিথ্যে নয়। তিনি যদি এসব কথা না বলতেন তাহলে আমিও চুপ করে থাকতাম। কিন্তু এখন চুপ করে থাকার কোনও সার্থকতা নেই।

'সে-রাত্রে আন্দাজ বারোটার সময় আমি নিজের বাড়িতে ফিরে যাই। গিয়ে দেখলাম, সদর দরজা খোলা, সামনের ঘরে আলো জ্বলছে, আমার স্ত্রী অন্নপূর্ণা মেঝেয় মরে পড়ে আছে। আমি ভয়ে দিশাহারা হয়ে গেলাম। ভাবলাম আমাকেই সবাই খুনী বলে সন্দেহ করবে; অন্নপূর্ণার সঙ্গে আমার সদ্ভাব নেই, এ কথা সবাই জানে। প্রাণ বাঁচাবার একমাত্র উপায় পালিয়ে যাওয়া।

'কিন্তু আমার পকেটে মাত্র দু'তিন টাকা আছে, দু'তিন টাকায় কতদূর পালাতে পারব? আমি অন্নপূর্ণার গলা থেকে হার খুলে নিয়ে পালালাম। তাতে যে রক্ত লেগে আছে তা জানতে পারিনি।

'সেই রাত্রেই জংশনে পৌঁছুলাম। কিন্তু সেখান থেকে দূর-দেশে যেতে হলে টাকা চাই। জংশনে কাউকে চিনি না, কার কাছে হার বিক্রি করব? রবিবার সারাদিন জংশনে লুকিয়ে রইলাম, কিন্তু হার বিক্রি করার সাহস হল না। ভয় হল, হার বিক্রি করতে গেলেই ধরা পড়ে যাব।

'সোমবার দিনটাও জংশনে কাটল। তারপর সন্ধ্যেবেলা ধরা পড়ে গেলাম। হুজুর, এই আমার বয়ান। আমি যদি একটি মিথ্যেকথা বলে থাকি, আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়।'

রুদ্ধশ্বাস বিচারগৃহে আসামীর উকিল ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'হুজুর, এর পর আমি আর একটা কথাও বলতে চাই না। সরকারী উকিল তাঁর ভাষণ দিতে পারেন।'

সরকারী উকিল দীর্ঘ ভাষণ দিলেন। ভাষণ শেষ হইবার আগেই লাঞ্চের বিরাম আসিল, বিরামের পর তিনি আবার ভাষণ চালাইলেন। কালীময় যে মিথ্যা-সাক্ষী, নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গ করিতেছেন, এই কথা তিনি বার বার জুরীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহার কথা কিন্তু কাহারও মনে স্থান পাইল না; তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে হাকিম জুরীদের মামলার মোদ্দাকথা বুঝাইয়া দিলেন। জুরী উঠিয়া গিয়া পাঁচ মিনিট নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিলেন, তারপর ফিরিয়া

আসিয়া রায় দিলেন—আসামী নির্দোষ।

হুইস্কির বোতলটি নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল, তলায় মাত্র দুই আঙুল পরিমাণ তরল দ্রব্য ছিল। রাত্রি দশটা বাজিতে বেশী দেরি নাই। কালীময়বাবুর বসিবার ঘরে বোতল মাঝখানে রাখিয়া আমরা দু'জনে মুখোমুখি বসিয়া আছি। আমার মাথার মধ্যে রুমঝুম নূপুর বাজিতেছে, কিন্তু বুদ্ধিটা পরিষ্কার আছে। কালীময় রক্তাভ নেত্রে মদের বোতলটার দিকে চাহিয়া আছেন।

আমি বলিলাম, 'তার পর?'

কালীময় বোতল হইতে চক্ষু সরাইলেন না, বলিলেন, 'কাল কোর্ট থেকে বাড়ি ফিরে এসে দেখলাম দামিনী পালিয়েছে। কোথায় গেছে জানি না। হয়তো দূর সম্পর্কের ভায়ের কাছেই ফিরে গেছে।'

'আর মোহিত?'

'সে আছে। কাল রাত্রে এসেছিল, পায়ে ধরে মাপ চেয়ে গেল।'

কিছুক্ষণ কোনও কথা হইল না। আমার মাথার মধ্যে রুমঝুম শব্দের সঙ্গে একটা বেতালা চিন্তা ঘুরিতেছে। শেষে বলিলাম, 'একটা প্রশ্নের কিন্তু ফয়সালা হল না।'

কালীময় আমার পানে রক্তাক্ত চোখ তুলিলেন।

বলিলাম, 'অন্নপূর্ণাকে খুন করল কে?'

কালীময় নির্নিমেষ আমার পানে চাহিয়া রহিলেন।

বলিলাম, 'আপনি সে-রাত্রে লোহার ডাণ্ডা নিয়ে আড়ি পাততে এসেছিলেন। আদালতে লোহার ডাণ্ডার কথা কিন্তু বলেননি।'

কালীময় আরও কিছুক্ষণ আমাকে স্থিরনেত্রে নিরীক্ষণ করিলেন, 'তোমার বিশ্বাস আমি অন্নপূর্ণাকে খুন করেছি!'

বলিলাম, 'বিশ্বাস নয়, সন্দেহ। আপনি পৌনে দু'ঘণ্টা জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন, এ কথা মেনে নেওয়া শক্ত। আপনি কেঁচো নয়, মানুষ।'

হঠাৎ কালীময় হুইস্কির বোতলটা ধরিয়া নিজের গেলাসের মধ্যে উজাড় করিয়া দিলেন। তাহাতে জল মিশাইলেন না, নিরম্বু তরল আগুন গলায় ঢালিয়া দিলেন। আমি অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

তিনি বলিলেন, 'হ্যাঁ, অন্নপূর্ণাকে আমি খুন করেছিলাম। তোমাকে বলছি, কিন্তু তুমি যদি অন্য কাউকে বল, আমি অস্বীকার করব। আমার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নেই।

আমার মাথার মধ্যে বেতালা চিন্তাটা এবার তালে নাচিয়া উঠিল। প্রশ্ন করিলাম, 'অন্নপূর্ণাকে খুন করলেন কেন? সে তো কোনও অপরাধ করেনি।'

কালীময় বলিলেন, 'তাকে খুন করবার মতলব ছিল না। নিজের ঘরের ব্যাপার দেখে মাথায় আগুন জ্বলে উঠেছিল। আমি গিয়েছিলাম প্রতিশোধ নিতে।'

'প্রতিশোধ নিতে!'

'হ্যাঁ। মোহিত আমার মুখে চুনকালি দিয়েছে, তাই আমি গিয়েছিলাম তার গালে চুনকালি দিতে। কিন্তু অন্নপূর্ণা অন্য জাতের মেয়ে, সে দামিনী নয়। আমার মতলব যখন সে বুঝতে পারল তখন আমার কোঁচা চেপে ধরে বললো, 'তবে হাড়-হাবাতে অলপ্পেয়ে মিন্‌সে, তোর মনে এত ময়লা! দাঁড়া তোর পিণ্ডি চট্‌কাচ্ছি!' এই বলে সে আমার কোঁচা ধরে প্রাণপণে চেঁচাতে লাগল—'মেরে ফেললে! মেরে

ফেললে!'—তখন আর আমার উপায় রইল না, এখনি চীৎকার শুনে পাড়াপড়শী এসে পড়বে। হাতে লোহার ডান্ডা ছিলই—'

অনেকক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল। শেষে আমি উঠিবার উপক্রম করিলাম; বলিলাম, 'আচ্ছা, রাত হয়ে গেছে, আজ তাহলে উঠি।'

কালীময় চকিতে চোখ তুলিলেন, তাঁহার মুখ হইতে স্মৃতির গ্লানি মুহূর্তে মুছিয়া গেল। তিনি বলিলেন, 'এত রাত্রে কোথায় যাবে? আজ এখানেই থেকে যাও। খিদে পেয়েছে? দেখি রান্নাঘরে কিছু আছে কিনা।'

হে ম ন লি নী

বৈদ্যনাথবাবু বর্তমানে যে শহরটিতে বাস করিতেছেন তাহার নাম উহ্য রহিল। বৈদ্যনাথবাবুর নামও বৈদ্যনাথ নয়। অজ্ঞাতবাস করিতে হইলে নাম-ধাম সম্বন্ধে একটু সতর্কতা প্রয়োজন।

শহরটি খুব বড় নয়, মহকুমা শহর। বাঙালীর সংখ্যা মুষ্টিমেয়। এইখানে একটি ছোট বাসা লইয়া গত ছয় মাস বৈদ্যনাথবাবু একাকী অজ্ঞাতবাস করিতেছেন।

বৈদ্যনাথবাবুর বয়স ছাপ্পান্ন বছর, মাত্র এক বছর তিনি সরকারী চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। শুষ্ক নীরস গোছের চেহারা; মাথার চুল ছোট করিয়া ছাঁটা; নাকের নীচে গোঁফের প্রজাপতি সাদা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার শরীর এখনও বেশ সতেজ ও সমর্থ আছে।

বৈদ্যনাথবাবুর সংসারে গৃহিণী, এক পুত্র এবং পুত্রবধূ ছিল। পুত্রটি ভাল চাকরি করে, পুত্রবধূও শান্তশিষ্ট মেয়ে, কিন্তু গৃহিণীর স্বভাব ছিল প্রচন্ড। তবু, যতদিন বৈদ্যনাথবাবু চাকরিতে ছিলেন ততদিন যুদ্ধবিগ্রহের অবকাশ বেশী ছিল না। কিন্তু তিনি যখন অবসর লইয়া গৃহে আসিয়া বসিলেন, তখন রণরঙ্গ প্রায় অষ্টপ্রহরব্যাপী হইয়া উঠিল। বৈদ্যনাথবাবুর হৃদয়ে যথেষ্ট তেজ থাকিলেও রসনার প্রাখর্যে তিনি গৃহিণীর সমকক্ষ ছিলেন না। প্রতি খন্ডযুদ্ধে তাঁহার পরাজয় ঘটিতে লাগিল।

এইরূপ পরিস্থিতি বৈদ্যনাথবাবু ছয় মাস সহ্য করিলেন, তারপর একদিন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন। চুপিচুপি ব্যাঙ্কের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তিনি ফেরারী হইলেন।

ব্যাঙ্কের সহিত ষড়যন্ত্রের কারণ, পেন্সনের টাকা যথাস্থানে পৌঁছানো চাই।

তদবধি বৈদ্যনাথবাবু শান্তিতে আছেন। জগবন্ধু নামক এক ভৃত্য পাইয়াছেন, সে রন্ধন করিয়া খাওয়ায়; ক্ষুদ্র বাড়ির চারিপাশে ক্ষুদ্র বাগান আছে, সকাল বিকাল তাহার পরিচর্যা করেন, দ্বিপ্রহরে খবরের কাগজ পড়েন; সন্ধ্যার সময় পার্কে বেড়াইতে যান; এবং রাত্রিকালে একাকী শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যান। তাঁহার মনে কোনও খেদ নাই; কেবল একটি আশঙ্কা মাঝে মাঝে তাঁহার মনে উঁকিঝুঁকি মারেঃ গৃহিণী সন্ধান করিয়া এখানে না আসিয়া জোটেন!

যাহোক, এখানে নিরুপদ্রবে ছয় মাস কাটিয়া গিয়াছে; বৈদ্যনাথবাবু অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। একদিন শীতের সন্ধ্যায় তিনি বেড়াইতে বাহির হইলেন। তাঁহার বাড়ি হইতে পার্ক মাইলখানেক দূরে; বেশী লোকের ভিড় নাই। প্রত্যহ এখানে গিয়া বৈদ্যনাথবাবু একটি বেঞ্চিতে বসিয়া বিশ্রাম করেন, তারপর পকেট হইতে দু'টি বিস্কুট বাহির করিয়া ভক্ষণ করেন। তারপর সন্ধ্যা ঘনীভূত হইলে বাড়ি ফিরিয়া আসেন।

আজ শীতটা বেশ চাপিয়া পড়িয়াছে, পার্কে লোক নাই বলিলেই হয়। বৈদ্যনাথ-বাবু একটি বিস্কুট শেষ করিয়া দ্বিতীয়টিতে কামড় দিতে যাইবেন এমন সময় পায়ের গোড়ালির কাছে বরফের মত সিক্ত-শীতল স্পর্শ অনুভব করিয়া চমকিয়া উঠিলেন। হেঁট হইয়া বেঞ্চির তলায় দেখিলেন—

একটি ময়লা হল্‌দে রঙের কুকুরছানা তাঁহার পায়ের পিছনে বসিয়া আছে এবং ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতেছে। কুকুর শাবকের বয়স তিন চার মাসের বেশী হইবে না; অস্থিসার ক্ষুধার্ত চেহারা, শীর্ণ ল্যাজটি অল্প অল্প নড়িতেছে। বৈদ্যনাথবাবুর সঙ্গে চারি চক্ষুর মিলন হইতেই সে গলার মধ্যে কুঁই কুঁই শব্দ করিল।

বৈদ্যনাথবাবু একটু বিব্রত হইলেন। কুকুরের সঙ্গে তাঁহার কোনও প্রকার ঘনিষ্ঠতা ছিল না, কখনও কুকুর পোষেন নাই। রাস্তার দুই চারিটা কুকুর দেখিয়াছেন, এই পর্যন্ত। তবে এই কুকুরটা তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিতে চায় কেন? পা চাটিয়া দিল কোন্ উদ্দেশ্যে?

তিনি কুকুরকে একটা ধমক দিলেন এবং কাছা দিয়া আসিতে বলিলেন। কুকুর কিন্তু নড়িল না, বেঞ্চির তলায় বসিয়া কুঁই কুঁই করিতে লাগিল। বৈদ্যনাথবাবু তখন তাহাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া আবার বিস্কুট মুখে দিবার উদ্যোগ করিলেন।

অমনি কুকুরটা আবার তাহার পা চাটিয়া দিল। ভিজা জিভের স্পর্শে তিনি শিহরিয়া পা টানিয়া লইলেন। কি আনন্দ!

তাঁহার সন্দেহ হইল ক্ষুধার্ত কুকুর তাঁহাকে বিস্কুট খাইতে দেখিয়া লুব্ধ হইয়াছে। তিনি বিস্কুট অর্ধেক ভাঙিয়া কুকুরের সামনে ফেলিয়া দিলেন। পলকের মধ্যে কুকুর বিস্কুট গলাধঃকরণ করিল এবং বেঞ্চির তলা হইতে বাহিরে আসিয়া বাকি বিস্কুটের পানে নিষ্পলক চাহিয়া রহিল।

বিরক্ত হইয়া বৈদ্যনাথবাবু বিস্কুটের অর্ধাংশ কুকুরের সামনে ফেলিয়া দিলেন এবং উঠিয়া গৃহে ফিরিয়া চলিলেন। রাত্রি হইয়া গিয়াছে, রাস্তার আলো জ্বলিয়াছে। নির্জন রাস্তায় কনকনে ঠান্ডা হাওয়া যেন আক্রমণ করিবার লোক খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

বৈদ্যনাথবাবু পশমের গলাবন্ধ ভাল করিয়া মাথায় জড়াইয়া লইলেন। কিছু দূর গিয়া একটা আলোক স্তম্ভের কাছে আসিয়া তিনি পিছু ফিরিয়া চাহিলেন। কুকুরটা তাঁহার অনুসরণ করিয়াছে। দশ গজ পিছনে আসিতেছে।

তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দুই হস্ত আস্ফালন করিয়া তর্জন করিলেন। কুকুর

দাঁড়াইয়া পড়িল, কিন্তু পলায়ন করিল না। তিনি আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন। কুকুর দূরত্ব রক্ষণ করিয়া পিছনে চলিল। বিস্কুট তাহার ভাল লাগিয়াছে সন্দেহ নাই।

গৃহে পৌঁছিয়া ফটক খুলিতে খুলিতে তিনি পিছনের অন্ধকারে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি প্রেরণ করিলেন। দশ গজ দূরে একটা কিছু নড়িতেছে। ঠাহর করিয়া দেখিলেন, কুকুরের ল্যাজ। তিনি চট্ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া ফটক বন্ধ করিয়া দিলেন।

ঘরে গিয়া বসিতেই ভৃত্য জগবন্ধু গরম চায়ের পেয়ালা আনিয়া সম্মুখে রাখিল। তিনি এক চুমুক চা খাইয়া ভারি আরাম অনুভব করিলেন। বলিলেন, 'জগবন্ধু, একটা বিস্কুট এনে দে। আজ একটা বৈ বিস্কুট খাওয়া হয়নি।'

'আজ্ঞে'—বলিয়া জগবন্ধু একবার প্রভুর মুখের পানে সপ্রশ্ন দৃষ্টিপাত করিল। বৈদ্যনাথবাবু বলিলেন, 'একটা কুকুর। এমন জ্বালাতন করল—'

জগবন্ধু প্লেটে করিয়া বিস্কুট আনিয়া দিল। তিনি চা সহযোগে খাইতে খাইতে ভাবিতে লাগিলেন—কুকুরটা বোধহয় এখনও ফটকের সামনে দাঁড়াইয়া ল্যাজ নাড়িতেছে। কিংবা হয়তো ফটক বন্ধ দেখিয়া চলিয়া গিয়াছে।

রাত্রে আহারাদি করিয়া তিনি শয়ন করিলেন। তাঁহার অভ্যাস, রাত্রে শয্যায় শুইয়া তিনি একটি রহস্য কাহিনী পাঠ করেন। দু'একটা খুন-খারাপি রক্তারক্তি না হইলে তাঁহার ঘুম আসে না।

লেপের মধ্যে শরীর বেশ গরম হইয়া আসিয়াছে। চোখের সামনে রহস্য কাহিনীর পাতা ঝাপসা হইয়া যাইতেছে, এমন সময় তাঁহার তন্দ্রাজড়িত চেতনায় একটি ক্ষীণ শব্দ অনুপ্রবিষ্ট হইল—কুঁইকুঁই কুঁইকুঁই—

তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। বৈদ্যনাথবাবু কান খাড়া করিয়া রহিলেন। হ্যাঁ, কুকুরই বটে। কোনও অজ্ঞাত উপায়ে ফটক পার হইয়াছে এবং তাঁহার শয়নকক্ষের দরজার কাছে বসিয়া কুঁইকুঁই করিতেছে।

জ্বালাতন! বৈদ্যনাথবাবু পাশ ফিরিয়া কানের উপর লেপ চাপা দিলেন, কিন্তু কুকুরের কাকুতি লেপ ভেদ করিয়া তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। কোথাকার আপদ আসিয়া জুটিল। একটা কিছু করা দরকার, নহিলে সারারাত ধরিয়া হয়তো কুঁইকুঁই শব্দ চলিতে থাকিবে।

শয্যায় উঠিয়া বসিয়া বৈদ্যনাথবাবু ডাকিলেন, 'জগবন্ধু!' কিন্তু জগবন্ধুর সাড়া পাওয়া গেল না। সে রান্নাঘরে শোয় সম্ভবত কানে কম্বল চাপা দিয়া ঘুমাইতেছে।

তিনি তখন নানা প্রকার বিরক্তিসূচক শব্দ করিতে করিতে লেপ ছাড়িয়া উঠিলেন। বাহিরের দরজা খুলিতেই এক ঝলক হাড়-কাঁপানো হাওয়া তাঁহাকে অভিষিক্ত করিয়া দিল। তিনি দেখিলেন, সেই কুকুরটা অদূরে দাঁড়াইয়া ঘন ঘন ল্যাজ নাড়িতেছে। তাঁহার যেমন রাগ হইল তেমনি একটু দয়াও হইল। আহা, এই শীতে একটা প্রাণী তাঁহার আশ্রয় চায়। কিন্তু তিনি তিরিক্ষি ভাবে বলিলেন, 'কি চাস্?'

কুকুরটা বোধহয় তাঁহার কণ্ঠস্বরে করুণার আভাস পাইয়াছিল, সে বাক্যব্যয় না করিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। বৈদ্যনাথবাবু ত্বরিতে দ্বার বন্ধ করিয়া ঠাণ্ডা হাওয়ার পথ রোধ করিলেন।

কুকুরটা দেয়াল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া আড় চোখে তাঁহার পানে চাহিতে লাগিল তাহার ল্যাজটি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নাড়িয়া চলিল। বৈদ্যনাথবাবু ভাল করিয়া তাহাকে দেখিলেন। মাদি কুকুর, সরু ছুঁচোলো মুখ, কানদুটো তীক্ষ্ণভাবে উঁচু হইয়া আছে, গায়ের হলদে লোম স্থানে স্থানে উঠিয়া গিয়াছে, একেবারে খাঁটি নেড়ি কুত্তা। ইহারা রাস্তায় জন্মগ্রহণ করে, রাস্তায় জীবন যাপন করে এবং অন্তিমে রাস্তায় প্রাণ বিসর্জন করে। ইহাদের গৃহ নাই।

বৈদ্যনাথবাবু বিরাগপূর্ণ স্বরে বলিলেন, 'আজ থাকো। কাল সকালেই বিদেয় করে দেবো।'

শয়ন করিতে গিয়া তিনি থামিয়া গেলেন। কুকুরটা হয়তো সারা দিনে ওই একটা বিস্কুট ছাড়া আর কিছুই খায় নাই। আশ্রয় যখন দিয়াছেন তখন তাহার পেটের জ্বালা নিবারণ করিলে দোষ কি? তিনি রান্নাঘরে গিয়া এক টুকরা পাঁউরুটি আনিয়া কুকুরটার সামনে ফেলিয়া দিলেন। সে পাঁউরুটির উপর লাফাইয়া পড়িয়া খাইতে লাগিল, তাহার ল্যাজটা উন্মত্তভাবে নৃত্য শুরু করিয়া দিল।

বৈদ্যনাথবাবু লেপ মুড়ি দিয়া শয়ন করিলেন। তাঁহার খাটের পাশে একটা হরিণের চামড়ার পাপোষ ছিল, আলো নিভাইবার পূর্বে তিনি লক্ষ্য করিলেন, কুকুরটা আহার সম্পন্ন করিয়া দ্বিধাজড়িত পদে আসিয়া হরিণের চামড়ার উপর কুণ্ডলী পাকাইয়া শয়ন করিল।

দুই

কুকুরটাকে কিন্তু তাড়ানো গেল না। বৈদ্যনাথবাবুর মনে বোধ হয় তেমন লৌহ-কঠিন দৃঢ়তা ছিল না, উপরন্তু দেখা গেল জগবন্ধুর কুকুরের প্রতি বিশেষ আসক্তি আছে। সে বলিল, 'বাড়িতে একটা কুকুর থাকা ভাল বাবু, বাড়ি পাহারা দিতে পারবে। আজকাল যা চোরের দৌরাত্ম্যি হয়েছে।'

বৈদ্যনাথবাবু দোনা-মনা হইয়া সম্মতি দিলেন, 'বেশ থাক। কিন্তু আমি কুকুরের তরিবৎ করতে পারব না। যা করবার তুই করবি।'

জগবন্ধু বলিল, 'আজ্ঞে। তরিবৎ আর কী, এঁটো-কাঁটা খাবে আর বাড়িতে থাকবে। চারটে পয়সা দিন বাবু, একটা কারবলিক সাবান কিনে আনি।'

সেদিন দুপুরবেলা কুকুর কারবলিক সাবান মাখিয়া গরম জলে স্নান করিল। বৈকালে জগবন্ধু কুকুরের গলায় দড়ি বাঁধিয়া আনিয়া বৈদ্যনাথবাবুকে দেখাইল। তিনি দেখিলেন সাবান দিয়া স্নান করিয়া কুকুরের শ্রী ফিরিয়াছে, গায়ের হলদে লোমে সোনালি ঝিলিক খেলিতেছে। তিনি প্রশ্ন করিলেন, 'ওকে দড়ি দিয়ে বেঁধেছিস কেন?'

জগবন্ধু বলিল, 'দিনের বেলা বেঁধে রাখলে রাত্তিরে কুকুরের রোক বাড়ে বাবু।'

বৈদ্যনাথবাবু ভাবিলেন, 'হুঃ, লেড়ি কুত্তার আবার রোক!'

সেদিন সন্ধ্যাবেলা বেড়াইতে বাহির হইয়া তিনি পার্কে গেলেন না, বাজারের দিকে গেলেন। বাজারের রাস্তায় ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁহার চোখে পড়িল, একটা দোকানের সামনে লম্বা লম্বা শিকল ঝুলিতেছে। একটু ইতস্তত করিয়া তিনি একটা শিকল কিনিয়া ফেলিলেন, দোকানিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইয়ে—কুকুরের বকলস আছে নাকি?'

'আজ্ঞে আছে'—দোকানি চামড়ার চকচকে বকলস বাহির করিয়া দিল। বৈদ্যনাথ-বাবু বকলস কিনিলেন। এই সময় তাঁহার পিছন হইতে ভারী গলায় একজন বলিল, 'এই যে বদ্যিনাথবাবু! কার জন্যে বকলস কিনছেন?'

বৈদ্যনাথবাবু ফিরিয়া দেখিলেন—শঙ্করাচার্য। এ শহরে আসিয়া বৈদ্যনাথবাবুর কেবল এই ব্যক্তিটির সহিত সামান্য হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল। তাঁহার নাম শঙ্করনাথ আচার্য। শহরের ফাজিল ছেলেরা তাঁহাকে শঙ্করাচার্য বলিত। বিপুল চেহারা, মাথায় প্রকাণ্ড টাক; শঙ্করবাবু সকল বিদ্যার পারঙ্গম ছিলেন। পৃথিবীতে এমন প্রশ্ন

নাই যাহার উত্তর তিনি জানিতেন না। এবং তাঁহার মন্তব্য যত বিস্ময়করই হোক তাহা খণ্ডন করিবার সাহস কাহারও ছিল না।

বৈদ্যনাথবাবু থতমত হইয়া বলিলেন, 'এই—একটা কুকুর পুষেছি—তাই—'

শঙ্করবাবু প্রশ্ন করিলেন, 'কী কুকুর পুষেছেন? অ্যাল্সেশিয়ান ড্যাল্মেশিয়ান স্পেনিয়েল পিকেনিজ পুড্ল্—?'

'ওসব নয়। রাস্তার কুকুর।'

শঙ্করবাবু গম্ভীর ভর্ৎসনার কণ্ঠে বলিলেন, 'রাস্তার কুকুর বলে কোনও কুকুর নেই, সব কুকুরই কুকুর, সব কুকুরেরই কুকুরত্ব আছে। চলুন দেখি গিয়ে।'

দু'জনে ফিরিয়া আসিলেন। চা পান করিতে করিতে শঙ্করবাবু কুকুর পরিদর্শন করিলেন। কুকুরের নখ দেখিলেন, কান ধরিয়া টানিলেন, ল্যাজ মাপিলেন। তারপর বলিলেন, 'জাতের ঠিক নেই বটে কিন্তু ভাল কুকুর। অন্তর্তেজা কুকুর।'

বৈদন্যাথবাবু বলিলেন, 'অন্তর্তেজা!'

শঙ্করবাবু বলিলেন, 'বাইরে থেকে বোঝা যায় না কিন্তু ভেতরে তেজ আছে। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি এর বাপ ছিল গোল্ডেন ককার আর দাদামশাই ছিল অ্যাল্সেশিয়ান। আপনি পুষতে পারেন।'

বৈদ্যনাথবাবু বলিলেন, 'ওর একটা নাম দরকার, কি নাম রাখি বলুন তো?'

শঙ্করবাবু কুকুরের সোনালি লোম দেখিলেন, কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভাবিলেন, তারপর বলিলেন, 'হেমনলিনী।'

তিন

হেমনলিনী বৈদ্যনাথবাবুর গৃহে শশিকলার মত বাড়িতে লাগিল। শীত গিয়া বসন্ত আসিল, বসন্তের পর গ্রীষ্ম, হেমনলিনী সাবালিকা হইয়া উঠিল।

জগবন্ধু তাহার পরিচর্যা করে, স্নান করায়, খাইতে দেয়। কিন্তু হেমনলিনীর সমস্ত ভালবাসা পড়িয়াছে বৈদ্যনাথবাবুর উপর। সে দিনের বেলায় সামনের বারান্দায় বাঁধা থাকে, সন্ধ্যার সময় তাহাকে খুলিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু সে ফটকের বাহিরে পদার্পণ করে না। বৈদ্যনাথবাবু খবরের কাগজ পড়িতে বসিলে সে অপলক নেত্রে তাঁহার পানে চাহিয়া থাকে। তিনি বেড়াইতে বাহির হইবার উপক্রম করিলে সে ল্যাজ নাড়িতে নাড়িতে তাঁহার আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু বৈদ্যনাথবাবু তাহাকে সঙ্গে লইয়া যান না। রাস্তার কুকুরগুলো ভারি বজ্জাত, হেমনলিনীকে কামড়াইয়া দিতে পারে।

রাত্রে বৈদ্যনাথবাবুর খাটের নীচে পাপোষের উপর হেমনলিনী শয়ন করে; সে অন্য কোথাও শুইবে না। তিনি যতক্ষণ রহস্য কাহিনী পড়েন ততক্ষণ সে মিটিমিটি চাহিয়া থাকে, তিনি আলো নিভাইয়া শয়ন করিলে সেও তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া নিদ্রা যায়।

হেমনলিনী তেজস্বিনী কিনা এ বিষয়ে এখনও কোনও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সামনের রাস্তা দিয়া প্যাণ্টুলুন-পরা মানুষ যাইলে সে একটু বকাবকি করে, এই পর্যন্ত। বাড়িতে অপরিচিত লোক প্রবেশ করে ইহাও সে পছন্দ করে না। নচেৎ তাহার মেজাজ ভারি ঠাণ্ডা।

বৈদ্যনাথবাবু আনন্দে আছেন। হেমনলিনীর প্রতি তাঁহার স্নেহ জন্মিয়াছে। কী একটা অভাব তাঁহার জীবনে ছিল, তাহা যেন পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু অলক্ষিতে আকাশের ঈশান কোণে যে মেঘ সঞ্চিত হইতেছে তাহার খবর তিনি জানিতেন না। হঠাৎ কালবৈশাখীর ঝড় আসিয়া পড়িল।

সন্ধ্যাকালে বৈদ্যনাথবাবু যথারীতি ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। পার্কের দিকে অর্ধেক পথ যাইবার পর তিনি পকেটে হাত দিয়া দেখিলেন বিস্কুট আনিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি ফিরিয়া চলিলেন।

চারিদিক ঘোর-ঘোর হইয়া আসিয়াছে, তিনি নিজের বাড়ির পঞ্চাশ গজের মধ্যে আসিয়াছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, একটা ছ্যাকড়া গাড়ি বিপরীত দিক হইতে আসিয়া তাঁহার বাড়ির সামনে থামিল। গাড়ির মাথায় কয়েকটা বাক্স প্যাঁটরা রহিয়াছে। বৈদ্যনাথবাবুর বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। তিনি রাস্তার পাশে একটা গুলমোর গাছের তলায় দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন।

গাড়ি হইতে একটি মহিলা অবতরণ করিলেন। গাছতলায় বৈদ্যনাথবাবুর নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল। কি সর্বনাশ—গৃহিণী! গুপ্তগৃহের সন্ধান পাইয়াছেন! নিশ্চয় ব্যাঙ্ক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। বাক্স প্যাঁটরা লইয়া গৃহিণী কায়েমী ভাবে বসবাস করিবার জন্য আসিয়াছেন। এখন উপায়?

গলদঘর্ম বৈদ্যনাথবাবু দেখিতে লাগিলেন, গাড়ি দাঁড়াইয়া রহিল, গৃহিণী গজেন্দ্রগমনে ফটক খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার তীক্ষ্ন কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কিন্তু কথাগুলা বোঝা গেল না। বোধকরি ভৃত্য জগবন্ধুকে তিরস্কার করিতেছেন। এক মিনিট কাটিয়া গেল।

তারপর—তারপর হেমনলিনীর কন্ঠস্বর শোনা গেল, ঘেউ—ঘেউ—ঘেউ। হেমনলিনীর এমন ভয়ঙ্কর ডাক বৈদ্যনাথবাবু পূর্বে কখনও শোনেন নাই। তাঁহার সর্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

এবার হেমনলিনীর কণ্ঠস্বরের সহিত গৃহিণীর কণ্ঠস্বর মিশিল—'ওরে বাবারে! মেরে ফেললে রে!' তারপর গৃহিণী তীরবেগে ফটক দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন, পশ্চাতে কালরূপিনী হেমনলিনী। গৃহিণী গাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন, হেমনলিনী শেষবার তাঁহার গোড়ালিতে কামড়াইয়া দিল।

গাড়ি ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

শঙ্করাচার্যই ঠিক বলিয়াছিলেন—হেমনলিনী অন্তর্তেজা কুকুরই বটে। তাছাড়া সে বৈদ্যনাথবাবুকে ভালবাসে। যতদিন হেমনলিনী আছে ততদিন বৈদ্যনাথবাবুর ভয় নাই।

ঘটনাক্রমে সেইদিন উপরোক্ত ব্যাপারের ঘণ্টাখানেক পরে শঙ্করবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখিলেন, বৈদ্যনাথবাবু হেমনলিনীকে কোলে লইয়া বসিয়া আছেন। তিনি বলিলেন, 'কাণ্ডটি কী? কুকুর কোলে করে বসে আছেন যে!'

বৈদ্যনাথবাবু গদগদ কণ্ঠে হাসিয়া বলিলেন, 'শঙ্করবাবু, আমি হেমনলিনীর বিয়ে দেব। আপনাকে একটি সৎপাত্র জোগাড় করে দিতে হবে।'

পতিতার পত্র

সুলোচনার নাম ভদ্রসমাজে পরিচিত হইবার কথা নয়। তবে ভদ্রসমাজে থাকিয়াও যাঁহারা সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকিয়া সন্দেহজনক গলিঘুঁজিতে বিচরণ করেন, তাঁহারা অবশ্যই তাহার নাম জানেন। আর জানি আমি।

আমি ডাক্তার, সুলোচনার মৃত্যুকালে তাহার চিকিৎসক ছিলাম। কঠিন ব্যাধিতে কয়েক মাস ভুগিয়া তাহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় তাহার বয়স আটত্রিশ কি উন-চল্লিশ হইয়াছিল।

মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে সে একটি পুরু খাম আমার হাতে দিয়া বলিয়াছিল, 'ডাক্তারবাবু, আমার সময় ঘনিয়ে আসছে, আর বড় জোর দু-চার দিন। এটা রাখুন, আমার মৃত্যুর পর খুলে পড়বেন।'

খামের মধ্যে একটি উইল ও একটি দীর্ঘ চিঠি ছিল। উইলে সুলোচনা আমাকে তাহার যথাসর্বস্ব, আন্দাজ ত্রিশ হাজার টাকা, নিঃশর্তে দান করিয়াছে। চিঠিখানা তাহার আত্মকথা। এদেশে পতিতার আত্মকথা জাতীয় যে-সব লেখা বাহির হইয়াছে ইহা সে-ধরনের নয়। মানুষের জীবনধারা কোন্ বিচিত্র পথে কোথায় গিয়া উপস্থিত হয় এই কাহিনী তাহারই একটি উদাহরণ। নোংরামিও ইহাতে কিছু নাই। তাই নির্ভয়ে ছাপিতে দিলাম।

ডাক্তারবাবু,

জীবনে আমি অনেক পুরুষের সংসর্গে এসেছি। সবাই মন্দ লোক নয়, অনেকে দোষে-গুণে সাধারণ মানুষ। দু-একজন সত্যিকার সজ্জন ব্যক্তিও দেখেছি। আপনি ডাক্তার, এতে আশ্চর্য হবেন না। কোনও মানুষই নিখুঁত নয়, সত্যিকার সাধু-সজ্জন ব্যক্তিরও দোষ-দুর্বলতা থাকে।

আপনি যেদিন প্রথম আমার চিকিৎসা করতে আসেন, সেদিন আপনাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলুম। যেমন রুক্ষ চেহারা তেমনি কঠিন ব্যবহার। আপনি কী করে এতবড় ডাক্তার হলেন ভেবে অবাক হলুম। এখন জানি, আপনার কঠিনতার আড়ালে একটি করুণ সদয় হৃদয় আছে, আর আছে রোগ সারাবার অসামান্য ক্ষমতা। আমার রোগ আপনি সারাতে পারেননি, সে দোষ আপনার নয়। প্রথম দিন আমাকে পরীক্ষা করে আপনার মুখে যে-ভাব ফুটে উঠেছিল তা থেকে বুঝেছিলাম এ-রোগ সারবার নয়। আপনি আমাকে মিথ্যে আশ্বাস দেননি, বলেছিলেন, 'যন্ত্রণার উপশম করতে পারি। তার বেশী কিছু হবে না।'

আপনার কথা মেনে নিয়েছিলুম। আপনি অন্য ডাক্তারকে দেখাতে বলেছিলেন, আমি দেখাইনি। কেন দেখাইনি জানেন? আপনার স্পষ্টবাদিতা ভাল লেগেছিল, ভেবেছিলুম যদি মরতেই হয় আপনার হাতেই মরব। আপনাকে ভাল লাগার আর-একটা কারণ, আপনাকে দেখে আর-একজনের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল, যিনি ছিলেন আপনার মতই কঠিন আর কঠোর। তাঁর হাতে একবার মরেছি, এবার শেষ মরা আপনার হাতে মরব।

আমার ঘরের দেয়ালে পাশাপাশি দুটি ছবি টাঙানো আছে। দুটি যুবাপুরুষ। বিশ বছর আগে ও'রা যুবাপুরুষই ছিলেন; একজনের মুখ ফুলের মত নরম, অন্যজনের মুখ পাথরের মত শক্ত। অপরিচিত নগণ্য মানুষ নয়, দেশ-জোড়া ও'দের নাম। দু'জনের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব; স্বাধীনতার যুদ্ধে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ও'রা

লড়েছিলেন।

যেদিন প্রথম আপনার দৃষ্টি ওই ছবিদুটির ওপর পড়ল সেদিন আপনি ভুরু তুলে আমার পানে চেয়েছিলেন। আপনার ভুরুতোলা প্রশ্নের জবাব তখন দিইনি। আজ এই চিঠিতে জবাব দিচ্ছি। চিঠি পড়লেই বুঝতে পারবেন আমার এই পাপ-জীবনের সঙ্গে ওই দুটি মহাপ্রাণ দেশনেতার কী সম্বন্ধ।

মরবার আগে আমি আমার জীবনের কাহিনী একজন কাউকে শুনিয়ে যেতে চাই। অন্য কাউকে শোনাতে গেলে সে মুখ বেঁকিয়ে হাসবে, হয়তো ওঁদের দু'জনের নামে মিথ্যে রটনা করবে। কিন্তু আপনি তা করবেন না, আপনি বুঝবেন। ওই বোঝাটুকুই আমার দরকার।

আমি ভদ্রঘরের মেয়ে, বেশ্যার ঘরে আমার জন্ম নয়। বাবা ছিলেন বাংলা দেশের পশ্চিম সীমানায় এক শহরের উকিল। শুধু উকিল নয়, একজন স্থানীয় জননায়ক। রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি প্রাণ-মন ঢেলে দিয়েছিলেন। ওকালতি করার সময় পেতেন না, তাই আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। কিন্তু সুনাম ছিল দেশজোড়া। বাবা অনেক দিন হল মারা গেছেন, কিন্তু জেলার লোক তাঁর নাম এখনও ভোলেনি।

আমি স্কুলে লেখাপড়া শিখেছিলাম। কলেজে পড়িনি। বাড়িতে সৎমা ছিলেন। তিনি আমাকে সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর নিজের সন্তান ছিল না বলেই বোধ হয় আমার ওপর প্রচণ্ড আক্রোশ ছিল। বাবা আমাকে স্নেহ করতেন, আমি তাঁর একমাত্র সন্তান। কিন্তু সংসারের দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল না, তিনি সর্বদা রাজনীতি নিয়ে মেতে থাকতেন।

ষোল বছর বয়সে আমার বিয়ে হল। সৎমা পাত্র জোগাড় করেছিলেন। বাবা একটু খুঁত-খুঁত করলেন; কিন্তু নিজে ভাল পাত্র খুঁজে বার করার সময় নেই তাঁর। তিনি খুঁত-খুঁত করতে করতে রাজী হয়ে গেলেন।

বিয়ের মাস তিন-চার পরে স্বামী মারা গেলেন। তাঁর চালচুলো ছিল না, ছিল গুপ্ত ক্যান্সার রোগ; বিয়ের পর ধরা পড়ল। সৎমা নিশ্চয় রোগের কথা জানতেন না, জানলে যত আক্রোশই থাক, বিয়ে দিতেন না। আমাকে বিদেয় করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু চার মাস পরে বিধবা হয়ে আমি আবার বাপের বাড়ি ফিরে এলুম। সংসারের হাওয়া বিষিয়ে উঠল।

সংসারের বিষাক্ত হাওয়া থেকে পালাবার একটা রাস্তা ছিল আমার। রাজনৈতিক আন্দোলন উপলক্ষে শহরে প্রায়ই সভা-সমিতি হত। ছেলেবেলা থেকেই আমি সভা-সমিতির অধিবেশনে গান গাইতুম। আমার গলা ভাল ছিল, সবাই প্রশংসা করতেন। বিধবা হবার পরও আমার সভায় গান গাওয়া বন্ধ হল না। থান পরে যেতুম, গান গাইতুম। বাবা বলতেন, 'দেশের কাজে নিজের দুঃখ ভুলে যাও।' তিনি নিজে আমার অকালবৈধব্যে দুঃখ পেয়েছিলেন, তাই আমাকে এবং নিজেকে ভোলাবাব চেষ্টা করতেন।

আমার তখন ভরা যৌবন; যৌবনের স্বাদ পেয়েছি, কিন্তু সাধ মেটেনি। বাবার উপদেশ আমার কানে যেত, কিন্তু মন পর্যন্ত পেঁছুত না। রাজনৈতিক আন্দোলনে অনেক যুবাপুরুষ ছিলেন। তাঁদের দেখতাম, মনটা উন্মুখ উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত। কিন্তু আমি বিধবা; তাঁরা আমার পানে উৎসুক চোখে তাকালেও কেউ এগিয়ে আসতেন না।

এইভাবে বছর দেড়েক কাটল। তার পর দু'জন যুবাপুরুষ এলেন আমাদের শহরে। তরুণ বয়স, কিন্তু দেশজোড়া নাম। দেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছেন; তাঁদের অগ্নিময়ী বক্তৃতা শোনবার জন্যে হাজার হাজার লোক ছুটে আসে; তাঁরা

হাত পাতলে মেয়েরা হাজার হাজার টাকার গয়না গা থেকে খুলে দেয়। তাঁরা দু'জন যেন জোড়ের পাখি; একসঙ্গে থাকেন, একসঙ্গে কাজ করেন; অনেকবার একসঙ্গে জেল খেটেছেন। লোকে বলত, মাণিকজোড়। কেউ বলত, রাম-লক্ষ্মণ। কেউ বলত, কানাই-বলাই।

আমি তাঁদের রাম-লক্ষ্মণ বলব। দু'জনের চেহারা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। রাম ছিলেন নরম-সরম, নবজলধর কান্তি; ভারি মিষ্টি চেহারা। আর লক্ষ্মণ যেন গনগনে হোমের আগুন; টকটকে রঙ, লম্বা চওড়া কঠিন দেহ; মুখে হিমালয়ের গাম্ভীর্য।

আমি দু'জনকেই ভালবেসে ফেলেছিলাম। একথা সাধারণ লোক হয়তো বুঝবে না, কিন্তু আপনি বুঝবেন। আমার মনের কৌমার্য তখনও নষ্ট হয়নি, হৃদয় ভালবাসার জন্যে উন্মুখ হয়ে ছিল। তাই এঁরা দু'জন যখন আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়ালেন তখন বাছ-বিচার করতে পারলুম না, দু'জনের পায়ের কাছেই আমার হৃদয়-মন ঢেলে দিলাম। যিনি আমাকে পায়ের কাছ থেকে তুলে নেবেন আমি তাঁরই।

সেবার আমাদের শহরে বিরাট সভার আয়োজন হয়েছিল। চার-পাঁচ দিন ধরে অধিবেশন চলবে; দেশের গণ্যমান্য সব নেতাই এসেছেন। স্থানীয় দেশ-সেবকদের বাড়িতে নেতাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে: কারুর বাড়িতে দু'জন, কারুর বাড়িতে তিনজন। আমাদের বাড়িতে উঠেছেন রাম আর লক্ষ্মণ। বাইরের একটা ঘর ওঁদের দু'জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

আমি যেন স্বর্গ হাতে পেয়েছি। সারাক্ষণ তাঁদের সেবা করছি। আমার সৎমা ছিলেন গোঁড়াপ্রকৃতির মানুষ, পর্দার আড়াল ছাড়েননি; স্বাধীনতা-আন্দোলনেও বেশী সহানুভূতি ছিল না। তাই আমিই অষ্টপ্রহর অন্দর থেকে বাইরে ছুটোছুটি করতুম। যতক্ষণ রাম-লক্ষ্মণ বাড়িতে থাকতেন আমি তাঁদের আশেপাশেই ঘুরে বেড়াতুম। তাঁদের খাওয়ার ব্যবস্থা, স্নানের আয়োজন, মাথার তেল, আয়না, চিরুনি, বিছানা পাতা, বিছানা তোলা—সব আমি করতুম। শরীরে ক্লান্তি আসত না, মনে হত ধন্য হয়ে গেলুম।

রাম-লক্ষ্মণ কেবল আমার সেবা গ্রহণ করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। আমার সভায় যাবার অবকাশ ছিল না, তাই তাঁরা আমায় সভার গল্প করতেন। লক্ষ্মণ ভারি গম্ভীর মানুষ, তিনি বেশী কথা বলতেন না; কিন্তু রাম বলতেন। ভারি মজার কথা বলতেন তিনি, মনটা ছিল রঙ্গরসে ভরপুর। সভায় কে কত গরম বক্তৃতা দিলে, কার ওপর পুলিসের নজর বেশী, এই সব কথা বেশ রঙ চড়িয়ে বলতেন। আমার সঙ্গেও রঙ্গরসিকতা করতেন। বলতেন, 'সুলোচনা, তুমি আমাদের খাইয়ে-দাইয়ে যে-রকম তাজা করে রেখেছ তোমাকেই আগে পুলিসে ধরবে; ক্যাঁক করে ধরে হাজতে পুরবে।'

লক্ষ্মণ ঠাট্টা-তামাসা করতেন না, কিন্তু তাঁর তীক্ষ্ন চোখ দুটি সর্বদা আমাকে লক্ষ্য করত, যেন আমাকে বোঝবার চেষ্টা করত। আমার বুক গুরগুর করতে থাকত। কাকে যে বেশী ভাল লাগে, বুঝে উঠতে পারতুম না।

দ্বিতীয় দিন দুপুরবেলা রাম হঠাৎ সভা থেকে ফিরে এলেন। আমি তখন ওঁদের ঘরেই ছিলাম, আসবাবপত্র ঝাড়ামোছা করছিলুম; তাঁকে দেখে চমকে গেলুম। তিনি ক্লান্তভাবে বিছানায় বসে বললেন, 'সুলোচনা, আজ ঝাড়া দু' ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়েছি, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। আমাকে এক পেয়ালা চা খাওয়াতে পারবে?'

আমি ছুটে গিয়ে চা তৈরি করে আনলুম। তিনি শুয়ে পড়েছিলেন, উঠে চায়ের পেয়ালা হাতে নিলেন। এক চুমুকে চা খেয়ে করুণ চোখে আমার পানে তাকিয়ে বললেন, 'জীবনের সদর-মহলে পঁয়ত্রিশটা বছর গেল। অন্দর-মহলের খবর নেওয়া

হল না।'

আমার বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। তিনি আবার বললেন, 'অন্দর-মহলে যে এত মিষ্টি জিনিস আছে তা আগে জানলে হয়তো সদর-মহলে আসাই হত না।'

এই সময় আমার সৎমা দরজার বাইরে থেকে খাটো গলায় ডাকলেন, 'সুলোচনা, এদিকে শুনে যাও।'

বুকের ধড়ফড়ানি আরও বেড়ে গেল; সেই সঙ্গে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। কোনও রকমে ঘরের বাইরে এলুম। সৎমা আমাকে আমার শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন, কিছুক্ষণ কঠিন দৃষ্টিতে আমার পানে তাকিয়ে থেকে কঠিন স্বরে বললেন, 'ভুলে যেও না তুমি বিধবা।'

এইটুকু বলে তিনি চলে গেলেন; আমি বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লাম।

সত্যিই ভুলে গিয়েছিলুম আমি বিধবা।

শুয়ে শুয়ে মন বিদ্রোহ করল। বিধবা তো কী? আমার রূপ, আমার যৌবন, আমার ভালবাসা, কিছুই মূল্য নেই এ-সবের? আমি কি কাগজের ফুল, চীনেমাটির পুতুল? না, আমি চীনেমাটির পুতুল হয়ে বেঁচে থাকতে চাই না। আমি ভালবাসা চাই, শ্রদ্ধা চাই, সম্ভ্রম চাই—

কতক্ষণ সময় কেটে গেছে খেয়াল করিনি। সৎমার গলা শুনতে পেলাম—'বিছানায় শুয়ে থাকলে সংসার চলে না। তোমার বাপ সভা থেকে ফিরে এসেছেন, আরও সবাই এসেছেন। তাঁদের চা-জলখাবার দিতে হবে।'

বাইরের ঘরে আট-দশ জন দেশনেতা জমা হয়েছেন। বেশীর ভাগই প্রবীণ; রাম-লক্ষ্মণও আছেন। রাজনীতির তীব্র আলোচনা হচ্ছে। আমি স্বপ্নাচ্ছন্নের মত সকলকে চা-জলখাবার দিলুম। আমাকে কেউ লক্ষ্য করলেন না, এমন কি রামও না। কেবল লক্ষ্মণের ধারাল চোখ দুটি আমাকে অনুসরণ করে বেড়াতে লাগল।

অনেক রাত্রে বৈঠক ভাঙল। সে-রাত্রে আমি কিছু না খেয়ে শুয়ে পড়লুম, কিন্তু ভাল ঘুম হল না। আমার জীবনে যেন একটা প্রবল বন্যা আসছে, কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে কিছু জানি না। ভয় ভয় করছে, আবার উত্তেজনায় মুখ-চোখ গরম হয়ে উঠছে। রাম আর লক্ষ্মণ দু'জনেই কি আমাকে চান? বুঝতে পারছি না। আমি ওঁদের মধ্যে কাকে চাই? তাও বুঝতে পারছি না।

পরদিন সকালে ওঁরা সভায় চলে গেলেন। সভার কাজ শেষ হয়ে আসছে, আজ আর কাল দু' দিন বাকী। তারপর সবাই চলে যাবেন। আর আমি—?

দুপুরবেলা রাম ফিরে এলেন। আমাকে দেখে ক্লান্ত হেসে বললেন, 'আজ আর কোনও কাজ হল না, শুধু নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি। বিরক্ত হয়ে চলে এলাম।'

তিনি নিজের বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে চোখ বুজে রইলেন। আমি কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে জিগ্যেস করলুম, 'চা আনব?'

তিনি চোখ খুলে একটু হাসলেন: 'না, দরকার নেই। তুমি বরং আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দাও।'

ডাক্তারবাবু, মানুষের দেহ-মনের সব খবরই আপনি জানেন, তাই আমার তখনকার দেহ-মনের কথা বিস্তারিতভাবে লিখে আপনার ধৈর্যের উপর জুলুম করব না। পরপুরুষের অঙ্গস্পর্শ সম্বন্ধে হিন্দু মেয়ের মনে তীক্ষ্ণ সচেতনতা আছে আপনি জানেন।...আমি খাটের শিয়রে দাঁড়িয়ে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলুম। ঘন কোঁকড়া চুল, সিঁথি নেই, কেবল কপাল থেকে পিছন দিকে বুরুশ করা।...

তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন না, মাঝে মাঝে চোখ খুলে আমার পানে তাকাতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ বিছানায় উঠে বসে কতকটা বক্তৃতার ভঙ্গীতে বলে উঠলেন,

'আমাদের সমাজে বিধবার এত অমর্যাদা কেন? কী অপরাধ বিধবার? স্বামী মরে গেলেই স্ত্রীর জীবন শেষ হয়ে যাবে কেন? তার কি স্বতন্ত্র সত্তা নেই? আমাদের সমাজ নিষ্ঠুর, স্ত্রীজাতির প্রতি দয়ামায়া নেই; একটু ছুতো পেলেই তাদের দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। অন্য সভ্য সমাজে কিন্তু এ-রকম নেই, বিধবা হবার দোষে কোনও মেয়ের জাত যায় না—'

আমি সমস্ত শরীর শক্ত করে শুনছি, এমন সময় লক্ষ্মণ ঘরে ঢুকলেন।

তাঁর মুখ অন্ধকার; চোয়ালের হাড় লোহার মত শক্ত হয়ে উঠেছে। তিনি রামের পানে একবার তাকালেন, তারপর আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে মুখে একটু হাসি আনবার চেষ্টা করে বললেন, 'আমার জন্যে এক পেয়ালা চা আনতে পারবে?'

আমি চোরের মত পালিয়ে গেলুম ঘর থেকে।

পনরো মিনিট পরে দু' পেয়ালা চা নিয়ে ফিরে এসে দেখলুম, ঘরের দরজা বন্ধ, ভিতর থেকে দু'জনের চাপা গলার আওয়াজ আসছে। চাপা গলা হলেও আওয়াজ নরম নয়, করাতের শব্দের মত কর্কশ। ওঁদের মধ্যে চাপা গলায় বচসা হচ্ছে। কথা সব বোঝা যাচ্ছে না। একবার মনে হল লক্ষ্মণ বলছেন, 'তুমি কোন্ পথে যাচ্ছ—'

দোরে টোকা দিতে সাহস হল না, চায়ের পেয়ালা নিয়ে ফিরে এলুম। রান্নাঘরে একলা বসে থরথর করে কাঁপতে লাগলুম। কী হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছি না। আমার জন্যেই কি দুই বন্ধুর মধ্যে—! তবে কি ওঁরা দু'জনেই আমাকে চান?

সন্ধ্যার পর আজও বৈঠক বসল, খুব তর্কাতর্কি হল। রাম আর লক্ষ্মণ কিন্তু ঘরের দুই কোণে গম্ভীর মুখে বসে রইলেন, আলোচনায় যোগ দিলেন না। কেবল আমি যখন সকলকে চা দেবার জন্যে ঘরে এলুম তাঁদের চোখ আমার পিছনে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

রাত্রি নটা আন্দাজ বৈঠক ভাঙল, সকলে উঠলেন। বাবা আর রাম অভ্যাগতদের সঙ্গে কথা কইতে কইতে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন। বাড়ির সদরে লক্ষ্মণ আর আমি দাঁড়িয়ে রইলুম।

হঠাৎ লক্ষ্মণ আমার হাত চেপে ধরলেন। আমি চমকে প্রায় চীৎকার করে উঠেছিলুম, কিন্তু তিনি আমার কানের কাছে মুখ এনে গাঢ়স্বরে বললেন, 'সুলোচনা, তোমার সঙ্গে আমার গোপনীয় কথা আছে। কিন্তু এখন নয়। কাল আমাদের সভার অধিবেশন শেষ হবে, তারপর বলব। তুমি তৈরি থেক। যাও, এখন ভেতরে যাও। কাউকে কিছু বোল না।'

আমার মাথাটা বনবন করে ঘুরে উঠল; অন্ধের মত হাতড়াতে হাতড়াতে বাড়ির মধ্যে গেলুম।

সারা রাত জেগে শুধু ভাবলুম, কী কথা বলবেন আমাকে? কিসের জন্যে তৈরি থাকব?

পরদিন সকাল থেকে হৈ-হৈ লেগে গেল। আজ সভার শেষ অধিবেশন, এলোমেলো নানা কাজ হবে। তার ওপর গুজব রটে গেছে যে, কয়েকজন নেতাকে পুলিস অ্যারেস্ট করবে। ভোর থেকে বাড়িতে মানুষের যাতায়াত শুরু হয়েছে। বাবা চা খেয়েই রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে সভায় চলে গেলেন। আমাকে বলে গেলেন, 'তুমিও এস। সভায় বন্দে মাতরম্ গাইবে।'

সেদিন বন্দে মাতরম্ গাওয়া কিন্তু আমার হল না। সভায় উপস্থিত হয়ে দেখলুম, চারিদিকে পুলিস গিসগিস করছে; জনতা মুহুর্মুহু চীৎকার করছে—ইনক্লাব জিন্দাবাদ! বন্দে মাতরম্!

তিন-চার জন বড় বড় নেতা গ্রেপ্তার হয়েছেন; তার মধ্যে রাম একজন। লক্ষ্মণ

গ্রেপ্তার হননি। আমি যখন উপস্থিত হলুম তখন পুলিস বন্দীদের নিয়ে মোটরে তোলবার উপক্রম করছে। বন্দীদের সকলের মুখে উদ্দীপ্ত হাসি।

গাড়িতে উঠতে গিয়ে রাম ফিরে দাঁড়ালেন। জনতার মধ্যে চারিদিকে চোখ ফেরালেন, যেন কাউকে খুঁজছেন। তারপর তাঁর চোখ পড়ল আমার উপর। তিনি একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে রইলেন, মুখের উদ্দীপ্ত হাসি মিলিয়ে গেল। তিনি আমাকে লক্ষ্য করেই বজ্রকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'আমি শীগ্‌গিরই ফিরে আসব। ইংরেজের জেল আমাকে ধরে রাখতে পারবে না।'

বন্দীদের নিয়ে পুলিসের গাড়ি চলে গেল। তারপর সভায় কী হল আমি জানি না, চোখের জল ফেলতে ফেলতে বাড়ি ফিরে এলুম। সভায় আরও অনেক মেয়ে ছিল, তারা সবাই সেদিন কেঁদেছিল; আমার চোখের জল কেউ লক্ষ্য করেনি। আমার চোখের জলের উৎস যে আরও গভীর তা কেউ জানতে পারল না। কেবল, বাড়ি ফিরে আসবার পর, সৎমা আমাকে কাঁদতে দেখে মুখ বেঁকিয়ে বললেন, 'ঢঙ দেখে আর বাঁচি না।'

ইচ্ছে হল, বাড়ি ছেড়ে ছুটে কোথাও চলে যাই। বিধাতা যে অলক্ষ্যে সেই ব্যবস্থাই করছেন তা তো তখন জানতুম না।

দুপুরবেলা লক্ষ্মণ বাড়ি এলেন। মুখ বিষণ্ণ কঠিন। আমার পানে খানিক তাকিয়ে রইলেন, মুখ একটু নরম হল। আবার বজ্রের মত কঠিন হয়ে উঠল। তাঁর মনের মধ্যে যেন প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে, কিন্তু কী নিয়ে যুদ্ধ বোঝা যায় না। আমি কেবল সম্মোহিতের মত চেয়ে রইলুম।

তিনি বললেন, 'আমাদের জীবনে জেলখানা ঘর-বাড়ি, ওতে বিচলিত হলে চলে না। আমাকেও হয়তো আজ নয় কাল যেতে হবে। কিন্তু তার আগে অনেক কাজ সেরে নেওয়া চাই—সুলোচনা!'

ঘরে আর কেউ ছিল না। আমি তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম, মুখ তুলে তাঁর মুখের পানে চাইলুম।

তিনি আমার কাঁধে হাত রাখলেনঃ 'তুমি আমার সঙ্গে পালিয়ে যাবে?'

আমার মস্তিষ্কের মধ্যে চিন্তার সব ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল। শুধু বললাম, 'যাব।'

'স্বেচ্ছায় যাবে? আমি জোর করছি না।'

'যাব।'

'হয়তো যা আশা করছ তা পাবে না। তবু যাবে?'

'যাব।'

তিনি গভীর দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাইলেন; চোখ দুটি যেন করুণায় ভরে উঠল। তারপর আমার কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে আমার দিকে পিছন ফিরে খানিক দাঁড়িয়ে রইলেন। সেইভাবে দাঁড়িয়েই বললেন, 'বেশ। এখন আমি যাচ্ছি। রাত্রে আবার ফিরে আসব। বারোটার পর। গাড়ি নিয়ে আসব। তুমি তৈরি থেক।'

'আচ্ছা।'

তিনি চলে গেলেন।

সেদিনের কথা এখন ভাবলে মনে হয়, কেন তাঁর কথার মানে বুঝিনি। তিনি তো ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। আমার ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাঁর অটল হৃদয়ও ক্ষণেকের জন্যে টলে গিয়েছিল। সেদিন যদি আমি 'না' বলতুম! যদি বলতুম—যাব না তোমার সঙ্গে, যিনি জেলে গেছেন তাঁর জন্যে প্রতীক্ষা করব, তাহলে আমার জীবনটাই অন্য পথে যেত। কিন্তু তা তো হবার নয়। আমি যে ওদের দু'জনকেই সমান ভাবে চেয়েছিলুম। সৎমা যে আমার ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন। পালানো ছাড়া

আমার গতি ছিল না।

দুপুর রাত্রে তিনি গাড়ি নিয়ে এলেন। আমি তৈরি ছিলুম, গাড়িতে উঠে বসলাম। আমার নিরুদ্দেশের পথে অভিসার শুরু হল।

প্রথমে রেলের স্টেশন, সেখান থেকে ট্রেনে চড়ে কাশী। ডাক্তারবাবু, শেষ কথাগুলো তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলি। সব কথা খুঁটিয়ে লিখতে ক্লান্তি আসছে।

লক্ষ্মণ আমাকে কাশীর একটা সরু গলিতে অন্ধকারে একটা বাড়িতে তুললেন। আধবয়সী একজন স্ত্রীলোক এসে আমাকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেল, একটা সাজানো ঘরে বসাল। লক্ষ্মণ ঠিকে গাড়ির ভাড়া মেটাবার জন্যে পিছিয়ে ছিলেন, আমি তাঁর অপেক্ষা করতে লাগলুম। কিন্তু তিনি এলেন না। আধবয়সী স্ত্রীলোকটাকে প্রশ্ন করলুম, সে বলল, 'আসবেন, বাছা আসবেন। কত বাবু-ভায়েরা আসবেন। নাও, এই শরবতটুকু খেয়ে ফেল। তেষ্টার সময়, শরীর ঠাণ্ডা হবে।'

সেই রাত্রে আমার জীবনে বেঁচে থাকার পালা শেষ হল, প্রেত-জীবন আরম্ভ হল। ভদ্রঘরের মেয়ে ছিলুম, পতিতা হলুম।

পরদিন সকালবেলা লক্ষ্মণ এলেন। তাঁকে দেখে আমি কেঁদে উঠলুমঃ 'আপনি আমার এই সর্বনাশ করলেন!'

তিনি নীরস নিষ্প্রাণ কন্ঠে বললেন, 'আমি তোমার যে-সর্বনাশ করেছি তার জন্যে ভগবান আমাকে শাস্তি দেবেন। কিন্তু আমার বন্ধুকে বাঁচাবার অন্য কোনও উপায় ছিল না।'

'কিন্তু আমি কী অপরাধ করেছিলুম?'

'অপরাধ কেউ করেনি। তুমি আমার বন্ধুকে চেন না, আমি তাকে চিনি। তার মন তোমার দিকে ঝুঁকেছিল; আমি যদি তোমাকে চিরদিনের জন্যে তার সামনে থেকে সরিয়ে না দিতাম, সে হয়তো তোমাকে বিয়ে করত।'

'তাতে কি এতই ক্ষতি হত?'

'ক্ষতি হত। তার সর্বনাশ হত, দেশের সর্বনাশ হত। তাকে আমি জানি। তার মন একবার যেদিকে ঝুঁকবে সেদিক থেকে আর তাকে নড়ানো যাবে না। তার মনে প্রচণ্ড শক্তি আছে, কিন্তু সেই শক্তিকে পাঁচ ভাগ করে পাঁচ দিকে চালাবার ক্ষমতা তার নেই। সে যদি তোমাকে বিয়ে করত, তাহলে দেশের কাজ আর করত না, তোমাকে নিয়েই মেতে থাকত।'

'কিন্তু আমার কী হবে?'

'দেশের জন্যে অনেকে আত্মবলি দিয়েছে; যথাসর্বস্ব খুইয়েছে, প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছে। আমি আজ এই মহাপাতক করলাম। কিসের কী ফল হবে জানি না, নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছি। আমার বন্ধু যখন জেল থেকে বেরিয়ে তোমাকে খুঁজতে আসবে তখন তোমাকে পাবে না। পরে যদি তোমাকে খুঁজে পায়ও তোমার কাছে আসতে পারবে না। এই ভরসায় এত বড় পাপ করেছি।—চললাম। আর দেখা হবে না।'

তিনি চলে গেলেন।

তারপর কুড়ি বছর কেটে গেছে। সেদিন আমার যে-জীবন আরম্ভ হয়েছিল তাও শেষ হয়ে আসছে। আমার ঘরের দেয়ালে যে-দুটি ছবি দেখে আপনি ভুরু তুলেছিলেন তার মানে বোধ হয় এখন বুঝতে পারছেন। ভারত আজ স্বাধীন হয়েছে, ওঁরা দু'জন ভারতের ভাগ্যবিধাতা। ওঁদের নাম জানে না এমন মানুষ পৃথিবীতে নেই। ওঁদের আমি আর দেখিনি, কেবল ছবি টাঙিয়ে রেখেছি নিজের ঘরে। মাঝে মাঝে ভাবি, আমার কথা কি ওঁদের মনে পড়ে? দেশের কল্যাণে যিনি আমাকে নরকের মুখে ঠেলে

দিয়েছিলেন আমার কথা মনে পড়লে তাঁর মন কি বেদনায় টনটন করে ওঠে?

কিন্তু আমার কারুর বিরুদ্ধে নালিশ নেই। সবই আমার ভাগ্য, আমার জন্মান্তরের কর্মফল। তবু মনে প্রশ্ন জাগে, আমার সর্বনাশ না হলে কি ভারতবর্ষ স্বাধীন হত না?—

এবার শেষ করি। ডাক্তারবাবু, আমার পাপ-জীবনের সঞ্চয় মৃত্যুর পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা আপনাকে দিয়ে গেলাম। আপনার নিজের টাকার দরকার নেই জানি। কিন্তু আমার টাকাকে আপনি ঘৃণা করবেন না। টাকা কখনও নোংরা হয় না ডাক্তারবাবু। যত নোংরা স্থান থেকেই আসুক, টাকায় কলঙ্ক লাগে না। আপনি আমার টাকা নিজের বিবেচনামত সৎকার্যে ব্যয় করবেন।

আপনি আমার অন্তিম প্রণাম নেবেন।

ইতি—

সুলোচনা

ডাক্তারের ফুটনোটঃ—সুলোচনার টাকা আমার হাতে আসিলে আমি তাহা 'লক্ষ্মণের' নামে বেনামী চাঁদারূপে পাঠাইয়া দিয়াছি। 'লক্ষ্মণ' কেন্দ্রীয় শাসকমণ্ডলের উচ্চস্থ ব্যক্তি, তিনি নিশ্চয় এই টাকার সদ্‌গতি করিতে পারিবেন।

সেই আমি

ষাট বছর বয়সে কবিতা লিখিয়াছি। আধ্যাত্মিক কবিতা নয়, রসের কবিতা।

আমার কবিতা কেহ পড়ে না, পত্রিকা-সম্পাদকেরা ছাপিতে চান না; তাই ইদানীং কবিতা লেখা ছাড়িয়া দিয়াছি। শুধু গদ্য লিখি। তবে আজ কবিতা লিখিলাম কেন, তাহার একটা কৈফিয়ত প্রয়োজন।

কাল সকালে চোখে চশমা আঁটিয়া লিখিতে বসিয়াছি, দ্বারের সম্মুখে একটি ছায়া পড়িল। চোখ তুলিয়া দেখিলাম, কেহ একজন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার মুখ-চোখ দেখিতে পাইলাম না, কাপড়ের রং দেখিয়া বুঝিলাম, স্ত্রী-জাতীয় জীব।

আমার দুটি চশমা; একটি দেখার জন্য, অন্যটি লেখার জন্য। যখন লিখিতে বসি, তখন বহির্জগৎ আবছায়া হইয়া যায়। আমি লেখার চশমা খুলিয়া দেখার চশমা পরিধান করিলাম, তারপর চোখ তুলিয়া দ্বারবর্তিনীর পানে অপলকে চাহিয়া রহিলাম।

সতরো-আঠারো বছরের একটি কুমারী মেয়ে। বর্ণনার প্রয়োজন নাই; সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী সুনয়না মেয়ে, এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে। ভাবভঙ্গীতে সহজ স্বচ্ছন্দতা। কিন্তু আমি যে তাহার পানে নিষ্পলক চাহিয়া ছিলাম, তাহার কারণ তাহার স্নিগ্ধ-মধুর যৌবনশ্রী নয়, অন্য কারণ ছিল।

সে বলিল, 'আসতে পারি?'

বলিলাম, 'এস।'

সে আমার টেবিলের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি নাকের উপর চশমাটা ভালভাবে বসাইয়া আরও খানিকক্ষণ তাহাকে দেখিলাম। শেষে বলিলাম, 'কি দরকার, বল তো?'

সে একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, 'আপনি লিখতে বসেছিলেন, আমি এসে বিরক্ত করলুম!' লেখার খাতা সরাইয়া রাখিয়া বলিলাম, 'তা হোক। তোমার নাম কি?'

সে বলিল, 'আমার নাম মল্লী—মল্লী মিত্র। আমি মা-বাবার সঙ্গে দেশ বেড়াতে বেরিয়েছি, এখানে তিন চার দিন আমরা থাকব। আপনি এখানে থাকেন জানি, তাই কলকাতা থেকে বেরুবার আগে আপনার ঠিকানা জোগাড় করেছিলুম।'

মল্লীকে একটু পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা হইল। বলিলাম, 'বোসো। তুমি কি বেথুন কলেজে পড়ো? আমি একবার বেথুন কলেজে গিয়েছিলাম, অনেক ছাত্রীদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ভাবছি, তুমি হয়তো তাদেরই একজন।'

মল্লী বসিল না; বলিল, 'না, আমি গোখেলেতে পড়ি। আপনি আমাকে আগে দেখেননি।'

আমি আবার খানিকক্ষণ তাহার মুখখানি দেখিয়া বলিলাম, 'ওকথা যাক। তুমি আমার মতন একটা বুড়োকে দেখবার জন্যে নিশ্চয় আসো নি। কি চাই বলো।'

তাহার হাতে একটি শ্রীনিকেতনের চামড়ার ব্যাগ ছিল, সে তাহার ভিতর হইতে একটি মরক্কো-বাঁধানো খাতা বাহির করিয়া আমার সামনে রাখিল; বলিল, 'আমার অটোগ্রাফের খাতায় আপনার হাতের লেখা নেই।'

খাতাটি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিলাম, অনেক মহাজনের করাঙ্ক তাহাতে আছে; কেহ উপদেশ দিয়াছেন, কেহ শুধুই দস্তখত মারিয়াছেন।

আমি কলম লইয়া নিজের নাম লিখিতে উদ্যত হইয়াছি, মল্লী বলিল, 'একটু কিছু লিখে দেবেন না?'

কলম রাখিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিলাম, শেষে বলিলাম, 'তুমি কাল বিকেলবেলা আর একবার আসতে পারবে?'

মল্লী বলিল, 'আসব।'

বলিলাম, 'আচ্ছা। আমি তোমার জন্যে কিছু লিখে রাখব। আর দেখ, কাল যখন আসবে, তোমার খোঁপায় বেলফুলের বেণী পরে এস। বেণী কাকে বলে জানো? এদেশে খোঁপায় পরার মালাকে বেণী বলে।'

সে ক্ষণেক অবাক্ হইয়া আমার পানে চাহিল। হয়তো ভাবিল, লেখকত্ব ও পাগলামির মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই। তারপর একটু হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া চলিয়া গেল।

তাহার খাতাটি নাড়াচাড়া করিতে করিতে অনেক চিন্তা করিলাম, অনেক হিসাব-নিকাশ করিলাম। আঠারোতে আঠারো যোগ দিলে ছত্রিশ হয়, তাহাতে আঠারো যোগ দিলে হয় চুয়ান্ন। ঠিক ধরিয়াছি। মল্লী...বাসন্তী...মিত্র...বসু...গোত্র গোত্রান্তর.. দিদিমা...ঠাকুরমা...

তারপর কবিতা লিখিলাম—

তোমারে হেরিয়াছিনু একদিন কুঙ্কুম-অরুণিত সন্ধ্যায়
স্মরণ-সরণি ধরি' আজিও সেদিন পানে মন ধায়।—
তোমার নয়নে ছিল পল্লব-ছায়া-করা স্বপ্ন-মদির সুখ-তন্দ্রা
কবরী ঘেরিয়া সখি ফুটিয়া উঠিয়াছিল মল্লীমুকুল মধুগন্ধা...

কিন্তু আর বেশী কবিতা করিব না, পাঠক-পাঠিকারা চটিয়া যাইতে পারেন।

আজ সূর্যাস্তের সময় মল্লী আসিল। তাহার কবরীতে মল্লীমুকুলগুলি একটি একটি করিয়া ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বলিলাম, 'বোসো।'

মল্লী বসিল, উৎসুক চোখে আমার পানে চাহিল।

বলিলাম, 'এই নাও তোমার খাতা। কবিতা লিখে দিয়েছি। এখন প'ড়ো না, ফিরে গিয়ে প'ড়ো।'

মল্লী কবিতাটি বহু যত্নে ব্যাগের মধ্যে রাখিল। তখন আমি বলিলাম, 'তুমি কাল বলেছিলে, আমি তোমাকে আগে দেখিনি। কথাটা ঠিক নয়। আমি তোমাকে আগে দেখেছি।'

মল্লী বিস্ময়োৎফুল্ল মুখে বলিল, 'দেখেছেন! কবে? কোথায়?'

বলিলাম, 'সেই যে—নির্জন বালুচরের ওপর দিয়ে ছোট্ট একটি নদী বয়ে যাচ্ছিল, পশ্চিমের আকাশে সূর্যাস্তের হোলীখেলা চলছিল—সেইখানে আমি তোমায় দেখেছিলাম। তোমার মনে পড়ছে না?'

মল্লী স্বপ্নাতুর চক্ষে চাহিয়া বলিল, 'না, আমার তো মনে পড়ছে না। কবে—কতদিন আগে—?'

মনে মনে আগেই হিসাব করিয়া রাখিয়াছিলাম, তবু হিসাবের ভান করিয়া বলিলাম, 'চল্লিশ বছর আগে।'

মল্লীর চোখদুটি বিস্ফারিত হইয়া খুলিয়া গেল, তারপর সে কলস্বরে হাসিয়া উঠিল, 'চল্লিশ বছর আগে! কিন্তু আমার বয়স যে মোটে আঠারো বছর।'

বলিলাম, 'তা হবে। চল্লিশ বছর আগেও তোমার বয়স ছিল আঠারো। তখন তোমার নাম ছিল বাসন্তী।'

সে উচ্চকিত হইয়া প্রতিধ্বনি করিল, 'বাসন্তী! কিন্তু বাসন্তী যে আমার—'

'দিদিমার নাম।'

মল্লী কিছুক্ষণ অধরোষ্ঠ বিভক্ত করিয়া চাহিয়া রহিল, 'হ্যাঁ। আপনি জানলেন কি করে?'

প্রশ্নের উত্তর দিলাম না, বলিলাম, 'আমার কাছে তোমার নাম মল্লী নয়, বাসন্তী। কাল তোমাকে দেখেই চিনতে পেরেছিলাম।'

'আপনি আমার দিদিকে চিনতেন!'

অতঃপর তাহাকে অনেক কথা বলিলাম যাহা লিখিবার প্রয়োজন নাই। কাহিনীতে প্রজনন-বিজ্ঞান বাঞ্ছনীয় নয়। শেষে প্রশ্ন করিলাম, 'তোমার দিদি ভাল আছেন?'

মল্লী ছলছল চক্ষে বলিল, 'দু'বছর আগে দিদি মারা গেছেন।'

অনেকক্ষণ পরে কথা কহিলাম। বলিলাম, 'না। তোমার দিদি বেঁচে আছেন, চিরদিন বেঁচে থাকবেন। আমিও চিরদিন বেঁচে থাকব। তোমার নাতনীর বয়স যখন আঠারো বছর হবে তখনও আমরা বেঁচে থাকব। কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি।—আচ্ছা, আজ তুমি এস। আবার দেখা হবে।'

দেখার চশমা খুলিয়া লেখার চশমা পরিয়া ফেলিলাম। গদ্য লিখিতে হইবে। কবিতার দিন গিয়াছে।

মানবী

কাহিনীর সূত্রপাত আজ হইতে পঞ্চাশ বছরেরও আগে। বিংশ শতাব্দীর বয়স তখন অনুমান ছয় বৎসর।

বাগবাজার নিবাসী কৃষ্ণকান্ত দাসের গৃহে উৎসবের ধুম লাগিয়া গিয়াছে। তাঁহার একমাত্র পুত্র রাধাকান্তের বিবাহ। কৃষ্ণকান্ত বিত্তবান ব্যক্তি, কাগজের ব্যবসা করিয়া তিনি ভাগ্যলক্ষ্মীকে প্রসন্ন করিয়াছেন। তাঁহার লক্ষ্মীশ্রী দিনে দিনে বাড়িতেছে। কিন্তু তিনি বিপত্নীক। বয়স এখনও পঞ্চাশ পূর্ণ হয় নাই।

বিবাহ উপলক্ষে আত্মীয়-কুটুম্বে ঘর ভরিয়া গিয়াছে। রসুনচৌকি বাজিতেছে। আজ বর-বধূ গৃহে আসিবে। বাড়ির সদর উঠানে আলপনা পড়িয়াছে; ফটকের মাথায় তোরণমাল্য। কন্যাপক্ষ কলিকাতারই বাসিন্দা, এখনি বর-কনে আসিবে। বাড়িতে স্ত্রী-লোকের সংখ্যাই বেশী, কারণ পুরুষ আত্মীয়েরা সকলেই বরযাত্র গিয়াছে।

রসুনচৌকির মিঠা আওয়াজ চাপা দিয়া মোড়ের মাথায় গোরার ব্যাণ্ড শোনা গেল। দমাদম শব্দে চারিদিক সচকিত করিয়া শোভাযাত্রা আসিয়া পড়িল। সামনে ব্যাণ্ড বাজাইতে বাজাইতে পদাতিক গোরার দল; পিছনে দীর্ঘ বিসর্পিত ঘোড়ার গাড়ির সারি। প্রথমেই একটি পুষ্পমাল্যমণ্ডিত ল্যাণ্ডো গাড়ি, তাহাতে বর ও বর-কর্তা শোভা পাইতেছেন। অনন্তর পিছনে মখমলের ঘেরাটোপ ঢাকা পাল্‌কি; ইহার মধ্যে আছেন নববধূ। অতঃপর নানাজাতীয় যানবাহনের মধ্যে বরযাত্রীর দল।

বাড়ির বর্ষীয়সী মেয়েরা ফটকের বাহিরে উঁকি মারিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিতে লাগিল—'ঐ আসছে—ঐ বর-কনে আসছে!'

শোভাযাত্রা বাড়ির সম্মুখে থামিল, গোরার বাদ্যও নীরব হইল। কৃষ্ণকান্ত লাফাইয়া ল্যাণ্ডো হইতে নামিয়া পড়িলেন, পিছন পিছন রাধাকান্তও নামিল। রাধাকান্তের মাথায় জরিদার টুপি, আগাপাস্তলা লাল মখমলের পোশাক। তাহার বয়স বারো বছর।

কৃষ্ণকান্ত একটু ব্যস্তবাগীশ লোক, গাড়ি হইতে নামিয়াই উচ্চকণ্ঠে হাঁকাহাঁকি শুরু করিলেন—'কোথায় গেল সব! বর-কনে নিয়ে এলুম, সবাই হাঁ করে দাঁড়িয়ে

আছিস! চন্দ্রমুখী কৈ? ক্ষেন্টমণি!—ওরে, শিগ্গির ঘড়ায় করে জল নিয়ে আয়—মঙ্গলঘট—কনে বৌ-এর পাল্কির সামনে জল ঢাল—'

দুইজন সধবা স্ত্রীলোক কাঁখে কলসী লইয়া আগাইয়া আসিল এবং পাল্কির সামনে জল ঢালিয়া দিল। কৃষ্ণকান্ত তখন সগর্বে গিয়া পাল্কির ঘেরাটোপ তুলিয়া দিলেন এবং পাল্কির ভিতর হইতে একটি মেয়েকে টানিয়া কোলে তুলিয়া লইলেন। মেয়েটির বয়স বড়জোর সাত বছর, সোনার গহনায় সর্বাঙ্গ মোড়া। কৃষ্ণকান্ত মহানন্দে বলিলেন—'দ্যাখো, দ্যাখো, কেমন বৌ এনেছি দ্যাখো! যেমন দেখতে তেমনি নাম—দেবী! সাক্ষাৎ দেবী—সাক্ষাৎ মা জগদ্ধাত্রী! কৈ রে রাধাকান্ত, কোথায় গেলি! শিগ্গির আয়, আমার পাশে এসে দাঁড়া।'

রাধাকান্ত দ্রুত আসিয়া বাপের পাশে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল। কৃষ্ণকান্ত হাঁকিলেন—আরে, ফটোগ্রাফার কোথায় গেল? শিগ্গির শিগ্গির ফটো তুলে নাও—'

কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা ফটোগ্রাফার ত্রিপদবিশিষ্ট ক্যামেরা সম্মুখে লইয়া অগ্রসর হইল, ক্যামেরা কৃষ্ণকান্তের সম্মুখে রাখিয়া ঘোমটা হইতে মুখ বাহির করিল, বলিল—'স্থির হয়ে দাঁড়ান...কেউ নড়বেন না...খুকি, একটু হাসো তো—!'

ফুলশয্যার রাত্রি। একটি ঘর ফুল দিয়া সাজানো হইয়াছে। পালঙ্কে ফুলের বিছানা। মৃদু আলো জ্বলিতেছে। রাধাকান্ত ও দেবীকে দুই হাতে ধরিয়া কৃষ্ণকান্ত প্রবেশ করিলেন। কয়েকটি পুরাঙ্গনা দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া কৌতুক-কৌতূহলী চক্ষে এই দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

কৃষ্ণকান্ত বর-বধূকে পালঙ্কের কাছে লইয়া গিয়া বলিলেন—'আজ তোমাদের ফুলশয্যা। জীবনে সবচেয়ে সুখের রাত্রি। নাও, দুজনে বিছানায় শুয়ে পড়।'

পালঙ্কটি বেশ উঁচু। রাধাকান্ত উঠিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল, কিন্তু দেবী উঠিতে পারিল না। কৃষ্ণকান্ত তখন তাহাকে ধরিয়া খাটে তুলিয়া দিলেন, সনিশ্বাসে বলিলেন— 'আহা, আজ যদি গিন্নী বেঁচে থাকতেন!'

দেবী রাধাকান্তের পাশে বালিশে মাথা দিয়া শয়ন করিল। কৃষ্ণকান্ত দুইজনকে পরম স্নেহে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—'আচ্ছা, এবার তোমরা ঘুমোও। —রাধাকান্ত, মনে রেখো, দেবী তোমার স্ত্রী, তোমার সহধর্মিণী। ওর সঙ্গে ঝগড়া কোরো না।'

কৃষ্ণকান্ত দ্বারের কাছে কৌতূহলী মেয়েদের দেখিয়া বলিলেন—'তোরা এখানে কেন? যা সব পালা! খবরদার, আড়ি পাতবি না।'

মেয়েরা হাসিতে হাসিতে সরিয়া গেল। কৃষ্ণকান্ত ঘরের দ্বার ভেজাইয়া দিয়া ক্ষণেক কান পাতিয়া রহিলেন, যেন ঘরের ভিতরের কথাবার্তা শুনিবার চেষ্টা করিতেছেন।

খাটের উপর রাধাকান্ত ও দেবী পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতেছে, তাহাদের দৃষ্টিতে অনুরাগের চেয়ে বিরাগই বেশী প্রকাশ পাইতেছে। অবশেষে রাধাকান্ত বলিল—'আমি তোমার স্বামী, আমার সঙ্গে ঝগড়া করবে না।'

দেবী তৎক্ষণাৎ জবাব দিল—'আমি কারুর সঙ্গে ঝগড়া করি না। আমি লক্ষ্মী মেয়ে।'

রাধাকান্ত তাহার দিকে একটা পা ছড়াইয়া দিয়া বলিল—'তুমি আমার বৌ। পা টিপে দাও।'

দেবী সতেজে বলিল—'টিপবো না। আমি কি তোমার চাকর?'

রাধাকান্ত বলিল—'তবে তুমি লক্ষ্মী মেয়ে নয়। আমি তোমার সঙ্গে কথা কইব না।'

দেবী বলিল—'আমিও কথা কইব না। কাল আমি বাপের বাড়ি চলে যাব।'

দুজনে দুদিকে মুখ ফিরাইয়া শুইল।

কৃষ্ণকান্ত দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া নব-দম্পতির প্রণয়-সম্ভাষণ শুনিতেছিলেন, মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিলেন।

পরদিন প্রভাতে কৃষ্ণকান্ত আবার আসিয়া দেখিলেন, বর-বধূ নিঃসাড়ে ঘুমাইতেছে। একজনের মাথা পশ্চিম দিকে, অন্যের মাথা দক্ষিণ দিকে। দেবীর পদযুগল পতিদেবতার বক্ষের উপর স্থাপিত। কৃষ্ণকান্ত গভীর স্নেহে ঘুমন্ত দেবীকে কোলে তুলিয়া লইলেন; গদগদ স্বরে বলিলেন—'মা! মা জননী! ওঠো, তোমার বাবা তোমাকে নিতে এসেছেন।'

সেদিন দেবী পিতৃগৃহে ফিরিয়া গেল। তারপর নয় বৎসর স্বামীর সঙ্গে তাহার আর কোনো সম্পর্ক রহিল না। দেবী পিতৃগৃহে রহিল। কৃষ্ণকান্ত প্রতি সপ্তাহে একবার দুইবার গিয়া দেবীকে দেখিয়া আসেন। কিন্তু রাধাকান্তের পত্নীর সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিবার হুকুম নাই। কৃষ্ণকান্ত স্থির করিয়াছেন, ছেলে-বৌ বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের মিলন ঘটিতে দিবেন না।

একুশ বছর বয়সে রাধাকান্ত পরম কান্তিমান যুবাপুরুষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে কলেজে পড়ে, এবার বি. এ. পরীক্ষা দিবে।

পড়ার ঘরে টেবিলের সামনে বসিয়া সে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে লিখিতেছে; দেখিলে মনে হয় খুব মন দিয়াই লেখাপড়া করিতেছে। কিন্তু যদি সন্তর্পণে তাহার কাঁধের উপর দিয়া উঁকি মারা যায়, দেখা যাইবে সে যাহা লিখিতেছে তাহার সহিত আসন্ন পরীক্ষার কোনও সম্বন্ধ নাই। তাহার লিখনটি এইরূপ—

'প্রিয়তমাসু,

দেবী, তোমার জন্যে আমার মন সর্বদা ছটফট করছে। তোমাকে ছেড়ে আমি আর থাকতে পারছি না। এবার জামাইষষ্ঠীর সময় তোমাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে তোমাকে একবারটি দেখেছিলাম। তাও দূর থেকে, মুহূর্তের জন্যে। আশা মিটল না।

বাবা এত নিষ্ঠুর কেন? শ্বশুরমশাই এত নিষ্ঠুর কেন? কেন আমাদের দূরে রেখেছেন? আমি যে আর থাকতে পারছি না। তোমার কি আমাকে দেখতে ইচ্ছে করে না?

আচ্ছা, লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা করলে কেমন হয়? বেশ মজা হয়, না? তুমি যদি রাজী থাকো আমি লুকিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করব। কেউ জানতে পারবে না। তুমি চিঠি লিখো।

আমার একটা ফটোগ্রাফ এই সঙ্গে পাঠালাম। তোমার ফটোগ্রাফ আমাকে পাঠিও। ভালবাসা নিও। অনেক অনেক ভালবাসা নিও। ইতি—

তোমার রাধাকান্ত।'

চিঠি শেষ করিয়া রাধাকান্ত নিজের একটি ক্ষুদ্র ফটোগ্রাফ লইয়া চিঠির সঙ্গে খামের মধ্যে পুরিয়া খাম বন্ধ করিয়াছে, এমন সময় দ্বারের বাহিরে পিতার ফট্ ফট্ চটির শব্দ শুনিয়া চক্ষের নিমেষে খামখানি পকেটে লুকাইল। তারপর একটি বই খুলিয়া একাগ্র চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

কৃষ্ণকান্ত এই কয় বছরে আর একটু বৃদ্ধ হইয়াছেন; পদসঞ্চার ও বাচনভঙ্গী মন্থর হইয়াছে। তিনি কক্ষে প্রবেশ করিতেই রাধাকান্ত সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল—'কি বাবা?'

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন—'কিছু নয়, এই দেখতে এলাম। পড়াশুনো বেশ হচ্ছে তো? পরীক্ষার আর মাত্র তিন মাস বাকি—'

রাধাকান্ত বলিল—'হ্যাঁ বাবা।'

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন—'এই বি. এ. পরীক্ষাটা পাস করে নাও, তারপর আর তোমাকে পড়তে বলব না। অবশ্য তোমাকে পেটের দায়ে চাকরি করতে হবে না। তবে কি জানো বাবা, বি. এ. ডিগ্রিটা হচ্ছে জীবনযুদ্ধে একটা বড় হাতিয়ার। ওটা হাতে থাকা ভাল।'

রাধাকান্ত বলিল—'হ্যাঁ বাবা।'

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন—'আজ কি তোমার কলেজ নেই?'

রাধাকান্ত বলিল—'আছে বাবা। এখনি যাব।'

'হ্যাঁ। চটপট খাওয়া-দাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়। কলেজ কামাই করা ঠিক নয়। আর এই তিনটে মাস বৈ তো নয়। পরীক্ষা হয়ে গেলেই ব্যস্—নিশ্চিন্দি। তখন বৌমাকে ঘরে আনব। তিনটে মাস দেখতে দেখতে কেটে যাবে।' কৃষ্ণকান্ত ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

রাধাকান্ত বসিয়া পড়িল। দুই হাতে মাথা চাপিয়া সনিশ্বাসে বলিল—'তি-ন মা-স!'

ওদিকে দেবীর কাছে রাধাকান্তের চিঠি পৌঁছিয়াছিল। দেবী এখন পূর্ণযুবতী, রূপে, রসে, লাবণ্যে যেন টলমল করিতেছে।

চিঠি দেখিয়া দেবী প্রথমটা বুঝিতে পারিল না কে লিখিয়াছে। তাহাকে তো কেহ চিঠি লেখে না। একটু অবাক হইয়া সে খাম ছিঁড়িল। অমনি রাধাকান্তের ফটো বাহির হইয়া পড়িল। তখন সে সচকিতে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল কেহ দেখিয়াছে কিনা। তারপর আঁচলের মধ্যে চিঠি লুকাইয়া নিজের ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিল।

স্পন্দিত বক্ষে সে খাম হইতে ফটো বাহির করিয়া দেখিতে লাগিল। অধরে কখনো একটু হাসি খেলিয়া যায়, চোখদুটি কখনো বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া ওঠে। জামাইষষ্ঠীর সময় দেবীও রাধাকান্তকে চকিতের ন্যায় দেখিয়াছিল, কিন্তু অতটুকু দেখায় কি মন ভরে? ছবিটা তবু সে কাছে পাইয়াছে, যতবার ইচ্ছা দেখিতে পারিবে।

অবশেষে ছবিখানি বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া দেবী চিঠি পড়িল। বুক দুরুদুরু করিতে লাগিল, মুখ তপ্ত হইয়া উঠিল। রাধাকান্ত যেন দেবীর মনের কথাই দেবীকে লিখিয়াছে। দেবী যেমন স্বামীকে চায়, স্বামীও তেমনি দেবীকে পাইবার জন্য পাগল।

কিন্তু এত আবেগ-বিহ্বলতার মধ্যেও দেবী স্থিরভাবে চিন্তা করিবার ক্ষমতা হারায় নাই। সে স্বামীর চিঠিখানি মুঠিতে লইয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিল, তারপর বুকের তলায় বালিশ দিয়া বিছানায় শুইয়া চিঠির উত্তর লিখিতে প্রবৃত্ত হইল। চিঠিতে সলজ্জ অপটু ভাষায় দেবীর মনের ভাব প্রকাশ পাইল—

'শ্রীচরণকমলেষু,

তোমার ছবি আর চিঠি পেয়েছি। আমার আর এখানে থাকতে ইচ্ছে করে না, তোমার কাছে থাকতে ইচ্ছে করে। কবে তুমি আমাকে নিয়ে যাবে? বাবা দুপুরবেলা অফিসে যান, বাড়িতে ঝি-চাকর ছাড়া কেউ থাকে না। তুমি আমার প্রণাম নিও। ইতি—

তোমার দেবী।'

চিঠির মধ্যে নিজের একটি ফটো দিয়া দেবী ঝিয়ের হাতে চিঠি ডাকে পাঠাইয়া দিল।

চিঠি পাইয়া রাধাকান্ত একেবারে মাতিয়া উঠিল। চিঠিতে কথা বেশী নাই, কিন্তু মনের ভাব সুস্পষ্ট। রাধাকান্ত স্বভাবতই একটু ভাবপ্রবণ, একটু হঠকারী,

অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কাজ করা তাহার স্বভাব নয়। সে মনে মনে এক প্রচন্ড সংকল্প করিয়া বসিল—দেবীকে সে চুরি করিয়া লইয়া পলাইবে।

সংকল্প কার্যে পরিণত করিতে বিলম্ব হইল না। পরদিন দুপুরবেলা ছ্যাকড়া গাড়ি চড়িয়া রাধাকান্ত শ্বশুর-ভবনে উপস্থিত হইল। দ্বারের কড়া নাড়িতেই দেবী দ্বার খুলিয়া দিল। যেন দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল।

প্রথম সমাগমের লজ্জা কাটিতে একটু সময় লাগিল। রাধাকান্ত হর্ষরোমাঞ্চিত. দেবী বিনতভুবনবিজয়ীনয়না। ক্রমে ভাব হইল, চুপিচুপি ফিসফিস কথা হইল। রাধাকান্ত দেবীর হাত ধরিয়া নিজের বুকের উপর রাখিল—'তোমাকে ছেড়ে আর আমি থাকতে পারছি না। চল, দু'জন মিলে পালিয়ে যাই।'

দেবী চমকিয়া চোখ তুলিল—'পালিয়ে যাবে? কোথায় পালিয়ে যাবে?'

রাধাকান্ত বলিল—'যেদিকে দু'চক্ষু যায়। বাবাদের অত্যাচার আর সহ্য হয় না।'

দেবী ক্ষণেক চিন্তা করিল। পালাইয়া যাইবে! কিন্তু স্বামীর সঙ্গে পালাইয়া যাইতে দোষ কি? সীতা রামের সঙ্গে বনবাসে গিয়াছিলেন, সুভদ্রা—

একটি সিল্কের চাদর গায়ে জড়াইয়া লইয়া দেবী বলিল—'চল।'

কেহ জানিল না, দুইজনে ছ্যাকড়া গাড়ি চড়িয়া কোথায় চলিয়া গেল।

দেবীর বাবা হরিমোহন বৈকালে অফিস হইতে ফিরিয়া দেখিলেন দেবী গৃহে নাই, ঝি-চাকরেরা কিছু জানে না। হরিমোহন ভয় পাইয়া বেহাই-এর কাছে ছুটিলেন।

ওদিকে কৃষ্ণকান্তের গৃহে রাধাকান্তও অনুপস্থিত। সে কলেজে যাইরে বলিয়া বাহির হইয়াছিল, আর ফিরিয়া আসে নাই। ব্যাপার বুঝিতে বৈবাহিক যুগলের বিলম্ব হইল না। তাঁহারা অবিমৃশ্যকারী যুবক-যুবতীর উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া চারিদিকে তল্লাস আরম্ভ করিলেন।

চেনা পরিচিত কাহারো ঘরে ফেরারীদের পাওয়া গেল না। হোটেলেও তাহারা যায় নাই। এদিকে রাত্রি হইয়া গিয়াছে, টিপিটিপি বৃষ্টি পড়িতেছে। অবশেষে রাত্রি দশটার সময় নগরের প্রান্তে একটি নির্জন পার্কে তাহাদের পাওয়া গেল। একটি বেঞ্চির উপর দু'জনে পাশাপাশি বসিয়া আছে, দেবীর সিল্কের চাদরটি দু'জনের গায়ে জড়ানো। অবস্থা অতি করুণ।

কৃষ্ণকান্ত অপরাধীদের তিরস্কার করিতে গিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। অপরাধীরা লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিল। কৃষ্ণকান্ত হাসি থামাইয়া বলিলেন—'এই যদি তোদের ইচ্ছে ছিল, আমাদের বললেই পারতিস। চল, এখন ঘরে চল।'

ছেলে-বৌ লইয়া কৃষ্ণকান্ত গৃহে ফিরিলেন।

রাত্রে দেবী ও রাধাকান্ত এক শয্যায় শয়ন করিল। বিবাহের নয় বৎসর পরে তাহাদের প্রকৃত ফুলশয্যা হইল।

বলাবাহুল্য রাধাকান্ত পরীক্ষায় ফেল করিল। কৃষ্ণকান্ত নিরাশ হইলেন বটে, কিন্তু বলিলেন—'আমি জানতাম। যাহোক আর পড়াশুনোয় কাজ নেই, এবার কাজে ঢুকে পড়। আমার বয়স হয়েছে, কবে আছি কবে নেই; তুমি এইবেলা কাজকর্ম শিখে নাও। পৈতৃক ব্যবসাটা যাতে বজায় থাকে।'

রাধাকান্ত পৈতৃক কাজে লাগিয়া গেল। সে বুদ্ধিমান ছেলে, কাজে উৎসাহ আছে। অল্পকাল মধ্যেই সে কাগজের ব্যবসার মারপ্যাঁচ বুঝিয়া লইল। কৃষ্ণকান্তের শরীর অল্পে অল্পে জীর্ণ হইতেছিল, তিনি আর অফিসে যান না, তাঁহার বদলে রাধাকান্ত অফিসের কাজ দেখে। কৃষ্ণাকান্ত বাড়িতে থাকেন'; বাড়ির নীচের তলায় কাগজের গুদাম, তাহারই দেখাশুনা করেন।

এদিকে দেবী সন্তান-সম্ভবা। কৃষ্ণকান্ত পৌত্রমুখ দর্শনের আশায় অত্যন্ত

আহ্লাদিত হইয়াছেন। খুব ঘটা করিয়া পুত্রবধূর সাধ দিলেন।

তারপর একদিন কাজ করিতে করিতে কৃষ্ণকান্ত হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিলেন। বলিলেন—'হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা। কাজ-কর্ম বন্ধ করে দিন। খুব সাবধানে থাকতে হবে।' ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন।

দেবী শ্বশুরের শয্যাপাশে বসিয়া উদ্বেগভরা চোখে তাঁহার পানে চাহিয়া ছিল, কৃষ্ণকান্ত তাহার প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—'নাতির মুখ দেখে যদি যেতে পারি, তাহলে আর আমার কোনো দুঃখ নেই।'

দেবী শ্বশুরের পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে অঝোরে কাঁদিতে লাগিল। শ্বশুরকে সে সত্যই ভালবাসিয়াছিল।

কৃষ্ণকান্ত দু'চার দিনে একটু সুস্থ হইলেন। কিন্তু বেশী চলাফেরা করেন না, বাড়ির উপর তলায় অল্পস্বল্প ঘুরিয়া বেড়ান। নাতির মুখ দেখিবার জন্যই যেন বাঁচিয়া আছেন।

তারপর একদিন দেবী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিল। কৃষ্ণকান্ত আনন্দে আত্ম-হারা হইলেন। বাড়িতে নহবৎ বসিল। আত্মীয়-বন্ধুগণের গৃহে মিষ্টান্ন বিতরিত হইল।

আঁতুড়ঘরে প্রবেশ করিয়া কৃষ্ণকান্ত নাতির মুখ দেখিলেন। বলিলেন—'চাঁদের মত ছেলে হয়েছে। ওর নাম রইল চন্দ্রকান্ত।' তারপর শয্যায় শয়ান পুত্রবধূর হাতে চাবির গোছা দিয়া বলিলেন—'তুমি ছেলের মা হয়েছ, আজ থেকে তুমি এ বাড়ির গৃহিণী। লোহার সিন্দুকের চাবি তোমার কাছে রইল। চিরায়ুষ্মতী হও।'

সেই রাত্রে নিদ্রাবস্থায় কৃষ্ণকান্ত পরলোকে গমন করিলেন।

আরও পাঁচটি বছর মহাকালের নীল সমুদ্র মিশিয়াছে।

রাধাকান্ত এখন বাড়ির কর্তা; তিনটি সন্তানের পিতা। প্রথম দুটি পুত্র, চন্দ্রকান্ত ও সূর্যকান্ত, তৃতীয়টি কন্যা, নাম গৌরী। প্রথম মহাযুদ্ধের বাজারে কাগজের ব্যবসা ফাঁপিয়া উঠিয়াছিল, রাধাকান্ত বিলক্ষণ লাভবান হইয়াছে। তাহাকে এখন রীতিমত বড়মানুষ বলা চলে।

দেবীর দেহমনও এই কয় বছরে পরিণতি লাভ করিয়াছে। সে আর এখন প্রণয়-ভয়ভঙ্গুর তরুণী নয়, তিনটি সন্তানের জননী, ঘরের ঘরণী। দেহের যৌবন যেমন অটুট আছে, তেমনি চরিত্র আরও শান্ত-ধীর ও দৃঢ় হইয়াছে। বিষয়বুদ্ধিতে সে স্বামীর সমকক্ষ, রাধাকান্ত অনেক সময় বিষয়কর্মে স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করে। রাধাকান্তের চরিত্রে যে অবিমৃশ্যকারিতা আছে, দেবী তাহা সংযত করিয়া রাখে।

আজ দেবী ও রাধাকান্তের জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। মোটরগাড়ি কেনা হইয়াছে, রথের মত উঁচু প্রকাণ্ড একটি মিনার্ভা গাড়ি। এতদিন ঘোড়ার গাড়িতেই কাজ চলিতেছিল। কিন্তু এখন দিনকাল বদলাইয়া যাইতেছে। মোটরগাড়ি না থাকিলে মান-মর্যাদা রক্ষা হয় না। একজন ড্রাইভার রাখা হইয়াছে, সে জগমগে পোশাক পরিয়া গাড়ি চালাইবে।

সকালবেলা গাড়ি আসিয়াছে, বাড়ির সামনের উঠান আলো করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তিনটি ছেলেমেয়ে সকাল হইতে গাড়ির মধ্যেই বাস করিতেছে। ঝি, চাকর পরম কৌতূহলের সহিত গাড়ি প্রদক্ষিণ করিতেছে। জগমগে পোশাক-পরা ড্রাইভার মাঝে মাঝে ঝাড়ন দিয়া গাড়ির ধুলা ঝাড়িতেছে।

দশটার সময় রাধাকান্ত ও দেবী দোতলা হইতে নামিয়া আসিয়া মোটরগাড়িতে উঠিল, চাকর এক চ্যাঙারি খাবার গাড়িতে তুলিয়া দিল। ছেলেমেয়েরা আগে হইতেই গাড়িতে ছিল, তাহারা কলহাস্য করিয়া করতালি দিয়া আনন্দ জ্ঞাপন করিল। রাধাকান্ত ও দেবী পরস্পরের পানে চাহিয়া পরম তৃপ্তির হাসি হাসিল। তারপর গম্ভীর স্বরে ড্রাইভারকে বলিল—'চলো, শিবপুর বটানিকাল গার্ডেন।'

আজ মোটরগাড়ি কেনার প্রথমদিনে তাহারা বন-ভোজনে যাইতেছে।

সারাদিন ভারি আনন্দে কাটিল। সন্ধ্যার সময় ক্লান্ত দেহ ও তৃপ্ত মন লইয়া তাহারা গৃহে ফিরিয়া আসিল।

তারপর অনাড়ম্বর গতানুগতিক সুখের দিনগুলি একে একে কাটিতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় রাধাকান্ত মোটরে চড়িয়া অফিস হইতে বাড়ি ফিরিতেছিল; একটি অপেক্ষাকৃত নির্জন রাস্তায় তাহার মোটরের এঞ্জিন গোলমাল আরম্ভ করিল। ড্রাইভার মোটর থামাইয়া গাড়ির বনেট খুলিয়া ঠুকঠাক আরম্ভ করিল। গাড়ি আবার চালু হইতে সময় লাগিবে দেখিয়া রাধাকান্ত বাহিরে আসিয়া ফুটপাথে পায়-চারি করিতে লাগিল।

সামনেই একটা চায়ের দোকান। এই অবকাশে এক পেয়ালা গরম চা সেবন করিয়া লইবার উদ্দেশ্যে রাধাকান্ত দোকানে প্রবেশ করিল। দোকানে খদ্দের বেশী নাই; রাধাকান্ত চা ফরমাশ করিয়া একটি টেবিলের সামনে বসিল।

ঘরে এখনো আলো জ্বলে নাই। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে রাধাকান্ত লক্ষ্য করিল—ঘরের কোণে টেবিল ঘিরিয়া বসিয়া চারজন লোক নিবিষ্টমনে তাস খেলিতেছে।

নির্জন ঘরে ক্রীড়ারত ওই লোকগুলা তাহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। চায়ের পেয়ালা শেষ করিয়া সে তাহাদের টেবিলের পাশে গিয়া দাঁড়াইল; লোকগুলা কেহ তাহাকে লক্ষ্য করিল না, আপন মনে খেলিয়া চলিল।

প্রেমারা খেলা চলিতেছে। জুয়া খেলা। কিন্তু ইহারা বেশী বড় দান দিয়া খেলি-তেছে না, দু' চার আনা দিয়া খেলিতেছে। এ খেলা রাধাকান্তের পরিচিত; সে আগ্রহ সহকারে দেখিতে লাগিল।

হঠাৎ খেলোয়াড়দের মধ্যে একব্যক্তি মুখ তুলিয়া রাধাকান্তের পানে চাহিল, মৃদু হাসিয়া বলিল—'এ খেলা কি দেখছেন বাবু, নেহাত ছেলেখেলা। যদি সত্যিকার 'বাঘের খেলা' দেখতে চান, ঐ ঘরে যান।' বলিয়া পাশের একটি ভেজানো দরজা দেখাইল।

রাধাকান্ত একটু ইতস্তত করিল, তারপর দরজা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

ঘরটি ছোট, আলো জ্বলিতেছে। গদি-পাতা মেঝের উপর বসিয়া পাঁচ-ছয় জন লোক জুয়া খেলিতেছে। প্রত্যেকের সম্মুখে টাকার স্তূপ।

রাধাকান্তকে দেখিয়া কেহ বিস্ময় প্রকাশ করিল না। একজন বলিল—'আসুন, বসে যান।'

রাধাকান্তের পকেটে দুইশত টাকা ছিল। সে বসিয়া গেল।

ওদিকে দেবী উদ্বেগে বাড়িময় ছটফট করিয়া বেড়াইতেছে। রাধাকান্ত কোনদিন অফিস হইতে বাড়ি ফিরিতে দেরি করে না। তবে আজ কি হইল?

রাত্রি সাড়ে আটটার সময় রাধাকান্ত বাড়ি ফিরিল। মুখ শুষ্ক, অপরাধ-লাঞ্ছিত। সে দেবীর কাছে বিলম্বের সত্য কারণ লুকাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। শেষ পর্যন্ত সব কথাই প্রকাশ পাইল। সে জুয়া খেলার লোভ সামলাইতে পারে নাই; পকেটে যে দুশো টাকা ছিল, তাহা গিয়াছে।

শুনিয়া দেবী ভয়ে আতঙ্কে দিশাহারা হইয়া গেল। দুশো টাকা গিয়াছে যাক,

কিন্তু জুয়ার নেশা সর্বনেশে নেশা। এ পথে চলিলে বিষয়-সম্পত্তি মান-মর্যাদা কয়দিন থাকিবে। দেবী কাঁদিয়া ফেলিল—'ওগো, এ তুমি কি করলে! জুয়া খেললে যে লক্ষ্মী ছেড়ে যায়।'

রাধাকান্ত অধোমুখে রহিল। দেবী তখন চোখ মুছিয়া বলিল—'দিব্যি কর, আর কখনো জুয়া খেলবে না।'

রাধাকান্ত শপথ করিল। দেবীর কিন্তু প্রত্যয় জন্মিল না। মেজ ছেলে সূর্যকান্ত ঘরের মেঝেয় খেলা করিতেছিল, দেবী তাহাকে কোলে তুলিয়া আনিয়া স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইল—'ছেলের মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি কর।'

রাধাকান্ত চার বছরের ছেলে সূর্যকান্তের মাথায় হাত দিয়া শপথ করিল জীবনে আর কখনো জুয়া খেলিবে না।

একটি একটি করিয়া বছর কাটিয়া যায়। ছেলেমেয়েরা বড় হইয়া উঠিতে থাকে। রাধাকান্তের প্রভাব-প্রতিপত্তি সামাজিক প্রতিষ্ঠা বর্ধিত হয়; তাহার রগের কাছে চুলে একটু পাক ধরে। দেবীর শরীরও একটু ভারী হইয়াছে; কিন্তু মনের সজাগ সাবলীলতা অক্ষুণ্ণ আছে। সংসারের চারিদিকে তাহার সতর্ক মমতা।

বড়ছেলে চন্দ্রকান্তের বয়স এখন উনিশ, সে সরল ধীর প্রকৃতির ছেলে, কলেজে বি. এ. পড়ে। সূর্যকান্তের বয়স সতরো, স্বাস্থ্যবান, একটু উগ্র প্রকৃতি; খেলাধুলার দিকে মন; লেখাপড়ায় মন নাই; স্কুল ও কলেজের মধ্যবর্তী উঁচু বেড়া পার হইতে পারে নাই। সর্বকনিষ্ঠা গৌরী, বয়স চৌদ্দ, মায়ের মত লাবণ্যবতী নয়, কিন্তু যৌবনের তোরণদ্বারে আসিয়া তাহার আকৃতি বেশ একটি কোমল কমনীয়তা লাভ করিয়াছে। এই গৌরীকে সূত্র ধরিয়া যে সংসারে মহা-বিপর্যয় প্রবেশ করিবে, তাহা কেহ জানে না। কিন্তু সে পরের কথা।

চন্দ্রকান্ত লুকাইয়া প্রেমে পড়িয়াছিল, পাশের বাড়ির মেয়ে অমিয়ার সঙ্গে। অমিয়া সদ্‌বংশের মেয়ে, কিন্তু তাহার বাবার অবস্থা ভাল নয়; কোনো রকমে দিন চলে। দুই পরিবারের মধ্যে মুখ-চেনাচিনি থাকিলেও সামাজিক মেলামেশা নাই। চন্দ্রকান্তের শয়নঘরের জানালা দিয়া অমিয়ার শয়নঘরের জানালা দেখা যায়, মাঝখানে দশ-বারো হাত ব্যবধান। এই জানালা পথেই ভালবাসা জন্মিয়াছিল। প্রথমে চোখাচোখি হইলে সলজ্জে মুখ ফিরাইয়া লওয়া, তারপর চোখে চোখ মিলাইয়া হাসি, তারপর চাপাগলায় দুটি একটি কথা। 'তোমার নাম কি?' 'অমিয়া।' 'আমার নাম চন্দ্রকান্ত।' 'জানি।' তারপর ক্রমে হাতমুখ নাড়িয়া ইশারা ইঙ্গিতে প্রেম নিবেদন। প্রেম নিবেদনটা চন্দ্রকান্তের পক্ষেই বেশী, অমিয়া তাহার নাটুকে অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া হাসে।

একদিন সকালবেলা চন্দ্রকান্ত জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অঙ্গভঙ্গী সহকারে অমিয়াকে প্রাত্যহিক প্রেম নিবেদন করিতেছিল। দুঃখের বিষয়, আজ সে ঘরের দরজা বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। দেবী কোনও একটা সাংসারিক কাজের উপলক্ষে ঘরে প্রবেশ করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, তারপর নিঃশব্দে জানালার দিকে অগ্রসর হইল। চন্দ্রকান্ত মাকে দেখিতে পায় নাই, অন্য জানালা হইতে অমিয়া দেখিতে পাইয়াছিল। সে চট করিয়া সরিয়া গেল।

চন্দ্রকান্ত ফিরিয়া দেখিল—মা! মায়ের চোখে আগুন ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। সে ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িল।

দেবী কঠিন স্বরে বলিল—'চন্দ্রকান্ত! তুই—তুই পাশের বাড়ির মেয়েকে ইশারা

করছিলি! তোর এতদূর অধঃপতন হয়েছে?'

চন্দ্রকান্ত ঠোঁট চাটিয়া বলিল—'মা—আমি—'

দেবী তীব্র ভর্ৎসনার কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—' ছি ছি ছি চন্দ্রকান্ত, তোর এই কাজ! এ বংশে কেউ কখনো এ কাজ করেনি। আমার ছেলে হয়ে তুই গেরস্তঘরের মেয়ের দিকে নজর দিলি!'

চন্দ্রকান্ত মায়ের পদতলে পড়িয়া ব্যাকুল স্বরে বলিল—'মা, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। আমি—আমি অমিয়াকে—বিয়ে করতে চাই—'

দেবীর উগ্র ক্রোধ থমকিয়া গেল, মুখের ভাব একটু নরম হইল—'কি বললি?'

'মা—আমি অমিয়া—মানে—আমি ওকে বিয়ে করব।'

দেবী তাহার চুল ধরিয়া নাড়িয়া দিল।

'হতভাগা! ওঠ। বিয়ে করবি তো আমাকে বলিস নি কেন?'

চন্দ্রকান্ত উঠিয়া করুণস্বরে বলিল—'ওরা বড় গরীব, অমিয়ার বাবার একটিও পয়সা নেই। তাই—বলিনি। বাবা শুনলে রাগ করবেন।'

দেবীর ঠোঁটের কোণে একটু হাসি দেখা দিল—'ওরা গরীব, আর তোর বাপ বুঝি নবাব? মেয়েটা দেখতে শুনতে তো ভালই। সত্যি ওকে বিয়ে করতে চাস্?'

বিগলিত হইয়া চন্দ্রকান্ত বলিল—'হ্যাঁ মা, তুমি বাবাকে রাজী কর।'

'আচ্ছা আচ্ছা, সে তোকে ভাবতে হবে না। আমি আগে মেয়ে দেখব। যদি দেখি ভাল মেয়ে, তখন যা করবার করব।'—

দুপুরবেলা রাধাকান্ত অফিস হইতে আহার করিতে আসিলে দেবী তাহাকে কথাটা শুনাইয়া রাখিল। রাধাকান্ত ইতিমধ্যে গৌরীর বিবাহের ব্যবস্থা প্রায় পাকাপাকি করিয়া আনিয়াছিল, বলিল—'বেশ তো। মেয়ে যদি তোমার পছন্দ হয়, দুটো বিয়ে একসঙ্গে লাগিয়ে দাও।'

অপরাহ্ণে দেবী গায়ে চাদর জড়াইয়া পাশের বাড়িতে গেল। পাশাপাশি দুই বাড়ি, কিন্তু দেবী এই প্রথম অমিয়াদের বাড়িতে পদার্পণ করিল।

অমিয়ার মা বর্ষীয়সী মহিলা, অমিয়া তাঁহার শেষ সন্তান। দেবীকে দেখিয়া তিনি কৃতার্থ হইয়া গেলেন, তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন—'বোন, দূর দূর থেকে তোমাকে দেখেছি, কাছে যেতে কখনো সাহস হয়নি। আমার ভাগ্যি, আজ সাক্ষাৎ লক্ষ্মী আমার ঘরে পা রাখলেন।' তিনি দেবীকে শয়নকক্ষে লইয়া গিয়া মাদুর পাতিয়া বসাইলেন।

দু'চার কথার পর দেবী বলিল—'আপনার মেয়ে অমিয়াকে একবার ডেকে দিন। তার সঙ্গে দুটো কথা বলব।'

গৃহিণী কন্যাকে ডাকিলেন। অমিয়া দ্বিধায় জড়িত পদে কম্প্রবক্ষে আসিয়া দেবীকে প্রণাম করিল। দেবী তাহাকে পাশে বসাইয়া গৃহিণীকে বলিল—'আপনি কাজকর্ম করুন গিয়ে, আমি অমিয়ার সঙ্গে গল্প করি।'

গৃহিণী মনে মনে ঈষৎ শঙ্কিত হইয়া সরিয়া গেলেন। চন্দ্রকান্ত ও অমিয়ার প্রণয়-কাহিনীর খবর তিনি কিছুই জানিতেন না।

এটা সেটা গল্প করিতে করিতে দেবী অমিয়াকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। অত্যন্ত লাজুক মেয়ে, প্রগল্‌ভা মুখরা নয়, দু'বার ঢোক গিলিয়া একটা কথা বলে। তার উপর ভয় পাইয়াছে। দেবী বুঝিল, প্রণয় ব্যাপারের জন্য মূলতঃ চন্দ্রকান্তই দায়ী, অমিয়া ছলাকলা দেখাইয়া তাহাকে প্রলুব্ধ করে নাই। মেয়েটিকে তাহার পছন্দ হইল। সে তাহার চিবুক ধরিয়া তুলিয়া বলিল—'চন্দ্রকান্ত তোমাকে বিয়ে করতে চায়। তোমার মাকে তাহলে বলি?'

অমিয়া চক্ষু মুদিয়া নিস্পন্দ হইয়া রহিল। দেবী তখন হাসিয়া বলিল—'আমি কিন্তু ভারি দজ্জাল শাশুড়ী, উন থেকে চুন খসলেই বকুনি খাবে।'

তারপর দেবী উঠিয়া গিয়া অমিয়ার মাকে বলিল—'আমি আপনার মেয়েটিকে নিলুম আমার বড় ছেলের জন্যে।'

অমিয়ার মা স্বর্গ হাতে পাইলেন। অশ্রু গদগদ কণ্ঠে বলিলেন—'বোন, এ আমার স্বপ্নের অতীত। কিন্তু আমার যে আর কিছু নেই।'

দেবী বলিল—'আর কিছু তো চাই নি। শুধু মেয়েটি চেয়েছি।—'

মাসখানেক পরে মহা ধুমধামের সহিত একজোড়া বিবাহ হইয়া গেল। চন্দ্রকান্তের সহিত অমিয়ার এবং গৌরীর সহিত লালমোহন নামক একটি ধনীসন্তানের।

লালমোহন বনিয়াদী বংশের দুলাল। মোটর ছাড়া এক পা চলে না। যেমন তাহার মেদ-সুকুমার দেহ, তেমনি তাহার রাজাউজীর-মারা বাক্যচ্ছটা। সে নিজেকে মস্ত একজন ব্যায়ামবীর ও স্পোর্টসম্যান বলিয়া মনে করে।

বিবাহের পরদিন সকালবেলা বরকন্যা বিদায়ের পূর্বে রাধাকান্তের বৈঠকখানায় তরুণবয়স্কদের আসর জমিয়াছিল। নূতন জামাই লালমোহনই আসর জমাইয়াছিল। তাহার সঙ্গে ছিল সমবয়স্ক কয়েকজন বন্ধু, বাড়ির পক্ষ হইতে সূর্যকান্ত উপস্থিত ছিল। চা সহযোগে বিপুল প্রাতরাশের সদগতি হইতেছিল।

তাহার তিনটা রাইফেল আছে; সে ঘোড়ায় চড়িয়া বাঘ শিকার করিতে পারে, পোলো খেলাতেও সে নিতান্ত অপটু নয়, লালমোহন এইসব কথা বলিতে বলিতে বন্ধুদের চিমটি কাটিতেছিল। শ্রোতাকে চিমটি কাটিয়া কথা বলা তাহার অভ্যাস। শুনিতে শুনিতে সূর্যকান্তের গা জ্বালা করিতেছিল। তাহার ধৈর্য একটু কম, এ ধরনের নির্লজ্জ বড়াই সে সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু নূতন ভগিনীপতিকে কিছু বলাও যায় না। অনেকক্ষণ নীরবে সহ্য করিয়া সে বলিল—'আপনি তো ভারি বাহাদুর। আমার সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে পারেন?'

'পাঞ্জা!' লালমোহন অবজ্ঞায় নাক তুলিয়া বলিল—'ও সব ছোটলোকের খেলা আমি খেলি না।'

সূর্যকান্তও খোঁচা দিয়া বলিল—'গায়ে জোর আছে কিনা পাঞ্জা লড়লে বোঝা যায়।'

লালমোহন বলিল—'আমার গায়ের জোরের দরকার নেই। যতবড় পালোয়ানই আসুক, তাকে শায়েস্তা করবার ক্ষমতা আমার আছে!'

'তাই নাকি! গায়ে জোর না থাকে কি দিয়ে শায়েস্তা করবেন?'

'এই দিয়ে' বলিয়া লালমোহন পকেট হইতে একটি রিভলবার বাহির করিয়া দেখা-ইল.—'যন্তরটি দেখতে ছোট, কিন্তু এই দিয়ে তোমার মত ছ'জন গুণ্ডাকে শুইয়ে দিতে পারি।'

সূর্যকান্ত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও মর্মাহত হইল, কিন্তু বিতণ্ডা আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে পাইল না। রাধাকান্ত এবং আরো লোকজন আসিয়া পড়িল। বরকন্যাকে বিদায় করিবার সময় উপস্থিত।

লালমোহন বধূ লইয়া গৃহে ফিরিয়া গেল। কিন্তু এই ক্ষুদ্র ঘটনাটি তাহাদের দু'জনের মনে প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষের বীজ বপন করিল।

অতঃপর সুখে স্বচ্ছন্দে কয়েকমাস কাটিয়া গেল। দেবী অমিয়াকে বধূরূপে পাইয়া পরম তৃপ্ত, সে যেমনটি চাহিয়াছিল তেমনটি পাইয়াছে। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, একথাও ধীরে ধীরে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল, যে, গৌরীর দাম্পত্য-জীবন সুখের হয় নাই। প্রথম সমাগমের আবেগ-মাধুর্য ক্রমে ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতেছে।

গৌরীর শ্বশুরবাড়ি কলিকাতাতেই, সে মাঝে মাঝে বাপের বাড়ি আসে, তখন তাহার শুষ্ক মুখে করুণ হাসি দেখিয়া দেবীর বুকে শেল বিদ্ধ হয়। গৌরীকে প্রশ্ন করিলে সে প্রশ্ন এড়াইয়া যায়। তাহার স্বামী যে মদ্যপান করে, বন্ধু-বান্ধবদের লইয়া ঘোড়-দৌড়ের মাঠে যায়, তাহার পৈতৃক বসত-বাড়ি বন্ধক পড়িয়াছে—এ সব কথা সে নিজের মায়ের কাছেও বলিতে পারে না।

কিন্তু একদিন কিছুই আর ঢাকা রহিল না। দুপুরবেলা গৌরী কাঁদিতে কাঁদিতে বাপের বাড়ি ফিরিল। তাহার দেহে একটিও গহনা নাই। সে মায়ের গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। লালমোহন অনেকদিন হইতেই তাহার সহিত দুর্ব্যবহার করিতেছে। আজ ব্যাপার চরমে উঠিয়াছে। গৌরীর বিবাহের যৌতুক আন্দাজ বিশ হাজার টাকার গহনা ছিল, এতদিন লালমোহন তাহাতে হাত দেয় নাই; আজ সে সেই গহনা চাহিয়া বসিল। গৌরী গহনা দিতে রাজী হইল না, তখন লালমোহন তাহাকে মার-ধোর করিয়া সমস্ত গহনা কাড়িয়া লইয়াছে, এমন কি গায়ের গহনাগুলাও ছাড়ে নাই। তারপর বন্ধুদের লইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

বাড়ির সকলেই গৌরীর কাহিনী শুনিল। রাধাকান্ত আহার করিতে আসিয়া শুনিল, তারপর অগ্নিশর্মা হইয়া লালমোহনের সন্ধানে ছুটিল। আজ সে দেখিয়া লইবে, এত বড় আস্পর্ধা!

লালমোহন বাড়ি ফেরে নাই। চাকর বলিল, বাবু রেস খেলিতে গিয়াছেন, সন্ধ্যার সময় ফিরিবেন।

রাধাকান্ত রেসকোর্সে গেল। কান ধরিয়া জামাইকে ঘরে ফিরাইয়া আনিবে। স্ত্রীর গয়না বেচিয়া রেস খেলা!

রেসকোর্সে লোকারণ্য। রাধাকান্ত পূর্বে কখনও ঘোড়দৌড়ের খোঁয়াড়ে প্রবেশ করে নাই। সে ব্যাপার দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গেল। আধঘণ্টা অন্তর একদল ঘোড়া ছুটিতেছে, দর্শকেরা গগনবিদারী চীৎকার করিতেছে; হাজার হাজার টাকা হাতে হাতে লেনদেন হইতেছে। রাধাকান্তের রক্ত চনমন করিয়া উঠিল। সে এদিক-ওদিক জামাইকে তল্লাস করিল, কিন্তু অত ভিড়ের মধ্যে কোথায় জামাই? তখন সে রেলিং-এর পাশে দাঁড়াইয়া ঘোড়দৌড় দেখিতে লাগিল।

অনিবার্যভাবেই একজন দালাল আসিয়া জুটিল।

'উর্বশী ধরেছেন?'

'উর্বশী!'

'সামনের রেসে দৌড়ুবে। ঘোড়া নয় পক্ষীরাজ, আকাশে উড়ে চলে।'

'তাই নাকি! তা কি করে ধরতে হয়?'

'আপনার দেখছি এখনও হাতেখড়ি হয়নি। আসুন আমার সঙ্গে।'

রাধাকান্তের সঙ্গে শ'তিনেক টাকা ছিল, তাই দিয়া সে বাকি সব ক'টা রেস খেলিল। রেসের শেষে দেখা গেল সে পঞ্চাশ টাকা জিতিয়াছে। সে উত্তেজিত মনে ভাবিতে লাগিল, সঙ্গে যদি আরও টাকা থাকিত, তাহা হইলে সে আরও জিতিতে পারিত।

সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরিয়া সে রেসের কথা উচ্চারণ করিল না, বলিল, লালমোহনকে কোথাও খুঁজিয়া পায় নাই। দীর্ঘ পারিবারিক আলোচনার পর স্থির হইল, লালমোহন উচ্ছন্ন যাইতে চায় যাক, গৌরী বাপের বাড়িতে থাকিবে।

পরের শনিবার রাধাকান্ত আবার রেস খেলিতে গেল। দেবী কিছুই জানিল না। এইভাবে চুপি চুপি জুয়া খেলা চলিতে লাগিল। রাধাকান্তের রক্তে জুয়ার প্রচণ্ড নেশা ছিল; সে শপথ ভুলিয়া গেল, তাহার সহজ বিষয়বুদ্ধিও লোপ পাইল।

শীতের শেষে ঘোড়দৌড়ের মরসুম যখন শেষ হইল, তখন রাধাকান্তের ব্যবসায়ের তহবিলে যত টাকা ছিল সব গিয়াছে, উপরন্তু আকণ্ঠ দেনা।

রেসের শেষ দিনে সন্ধ্যাবেলা রাধাকান্ত বাড়ি ফিরিল না। দেবী জানিত রাধাকান্ত অফিসে আছে, তাই বিশেষ উদ্বিগ্ন হয় নাই। কিন্তু রাত্রি ন'টা বাজিয়া যাইবার পরও যখন সে ফিরিল না এবং অফিসে টেলিফোন করিয়াও কোন খবর পাওয়া গেল না তখন দেবী দুই ছেলেকে লইয়া রাধাকান্তের অফিসে গেল।

শূন্য অফিসে রাধাকান্তের মৃতদেহ পড়িয়া আছে। সে বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। মৃত্যুকালে নিজের সমস্ত অপরাধ স্বীকার করিয়া দেবীকে একটি চিঠি লিখিয়া গিয়াছে।

এই মর্মান্তিক আঘাতে দেবী প্রায় ভাঙিয়া পড়িল। কিছুদিন সে শয্যা ছাড়িয়া উঠিল না। তারপর উঠিয়া যন্ত্রের মত গৃহকর্ম করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অবসর কালে শয়নকক্ষে রাধাকান্তের ফটোগ্রাফের সামনে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত —মনে মনে প্রশ্ন করিত—কেন এ কাজ করতে গেলে? টাকাই কি বড়? আমরা কি কেউ নই?

কিন্তু তাহার মাথার উপর নিয়তির খড়্গ যে এখনো উদ্যত হইয়া আছে, তাহা সে জানিত না।

শ্বশুরের মৃত্যুসংবাদ জানাজানি হইবার পর হঠাৎ লালমোহন কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কোন রহস্যময় উপায়ে আবার তাহার অবস্থা ফিরিয়া গিয়াছে। মুরুব্বিয়ানা চালে মোটর হইতে নামিয়া শ্বশুরগৃহে প্রবেশ করিল, গ্রাম্ভারি মুখে সকলকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল—'আমি আছি, তোমাদের কোনো ভয় নেই।'

গৌরী দীর্ঘকাল পরে স্বামীকে দেখিয়া বোধ করি আনন্দিত হইল, কিন্তু সূর্যকান্ত তাহার লম্বা লম্বা কথায় জ্বলিয়া উঠিল। কথা-কাটাকাটি আরম্ভ হইতে বিলম্ব হইল না। সূর্যকান্ত বলিল—'তোমার জন্যেই বাবা আত্মহত্যা করেছেন। তুমি দায়ী।'

লালমোহনও গরম হইয়া উঠিল—'ডেঁপোমি কোরো না। ইস্কুলের ছেলে, লেখা-পড়া কর গিয়ে।'

গৌরী ও চন্দ্রকান্ত উপস্থিত ছিল, তাহারা ঝগড়া থামাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু নিয়তির লিখন কে খন্ডাইবে? ঝগড়া চরমে উঠিল। সূর্যকান্ত বলিল—'বেরিয়ে যাও এখান থেকে।'

লালমোহন বলিল—'তোমার হুকুম নাকি? যাব না। এটা আমার শ্বশুরবাড়ি, আমারও হক আছে।'

সূর্যকান্ত ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধাক্কা দিল, লালমোহন পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া সূর্যকান্তের বুকে গুলি করিল। চক্ষের নিমেষে একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটিয়া গেল।

বন্দুকের আওয়াজে ঝি-চাকর যে যেখানে ছিল ছুটিয়া আসিল। হাহাকার পড়িয়া গেল। দেবী আসিয়া যখন পুত্রের রক্তাক্ত দেহ কোলে তুলিয়া লইল, তখন সূর্যকান্তের প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে। লালমোহন পিস্তল হাতে দাঁড়াইয়া আছে।

অল্প শোকে কাতর, অনেক শোকে পাথর। দেবী ছেলের মৃতদেহ বুকে জড়াইয়া মেয়ে-জামাইয়ের পানে চোখ তুলিল, অকম্পিত স্বরে বলিল—'চলে যাও তোমরা, দু'জনেই চলে যাও। আর কখনো আমাকে মুখ দেখিও না।'

লালমোহন খুনের দায়ে দায়রা সোপর্দ হইল। মামলা কিন্তু টিকিল না। দেবী

আদালতে গিয়া সাক্ষ্য দিল যে, খেলাচ্ছলে হাত-কাড়াকাড়ি করিতে করিতে আচমকা লালমোহনের পকেটের বন্দুক ফায়ার হইয়া গিয়াছিল।

আদালতে সকলেই উপস্থিত ছিল। লালমোহন খালাস পাইবার পর গৌরী আসিয়া মায়ের পা জড়াইয়া ধরিল। দেবী কিন্তু তাহার পানে চাহিল না, কঠিন স্বরে বলিল—'আমার সঙ্গে তোমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। যাও, আর আমার কাছে এস না। যতদিন বেঁচে থাকব, তোমাদের মুখ দেখব না।'

রাধাকান্তের মৃত্যুর পর হইতেই তাহার গৃহে মহাজনেরা যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অনেক টাকা ধার দিয়াছিলেন, রাধাকান্তের সম্পত্তি হইতে সে টাকা উদ্ধার করা যাইবে কিনা এই চিন্তা তাঁহাদের উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল। এবং যতই দিন যাইতেছিল, তাঁহাদের ব্যবহার ততই কড়া হইয়া উঠিতেছিল।

এদিকে দেবীর হাতে যে নগদ টাকা আছে, তাহাতে কোনমতে সংসার চলে, মহাজনের ধার শেষ করা যায় না। চন্দ্রকান্ত পৈতৃক ব্যবসায়ের কিছুই জানে না। তবু সে প্রাণপাত করিয়া ব্যবসাকে আবার দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু একা নিঃসহায় অবস্থায় সর্বদিক সামলাইতে পারিতেছে না। ফুটা নৌকার মত দেবীর সংসার ধীরে ধীরে মজিবার উপক্রম করিতেছে।

এই বিপর্যয়ের মধ্যে অমিয়া একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে। অন্ধকারের শিশু, তাহার জন্মকালে নহবৎ বাজে নাই, মিষ্টান্ন বিতরিত হয় নাই। কিন্তু এই নাতিকে কোলে পাইয়া দেবী যেন নবজীবন লাভ করিয়াছে। সে এখন আর সংসারে কাজ দেখে না, নাতিকে কোলে লইয়া বসিয়া থাকে আর চিন্তা করে। অমিয়া নিঃশব্দে সংসারের সমস্ত ভার নিজের মাথায় তুলিয়া লইয়াছে।

একদিন দেবী চন্দ্রকান্তকে ডাকিয়া বলিল—'পাওনাদারদের সকলকে খবর দে, তারা যেন কাল সকালে আসে। আমি তাদের সঙ্গে কথা বলব।'

চন্দ্রকান্ত চমৎকৃত হইয়া মায়ের মুখের পানে চাহিল। এতদিন সে সংসারসমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছিল, এখন তাহার বুক নাচিয়া উঠিল। আর ভয় নাই, মা তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

পরদিন সকালে পাঁচ-ছয় জন পাওনাদার আসিয়া বৈঠকখানায় বসিলেন। তারপর দেবী নাতিকে কোলে লইয়া তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বিধবার শুভ্র বেশ, মুখে শান্ত গাম্ভীর্য; সকলে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

দেবী ধীর কণ্ঠে বলিল—'আপনারা বসুন। আমি কুলস্ত্রী আজ লজ্জা ত্যাগ করে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি। আমার কথা আপনাদের শুনতে হবে।'

একজন বলিলেন—'বলুন বলুন, কি বলবেন বলুন।'

দেবী বলিল—'আমার স্বামী আপনাদের কাছে টাকা ধার করেছিলেন। আমার স্বামীর ঋণ আমি শোধ করব; এক পয়সা বাকী রাখব না। কিন্তু আমাকে একটু সময় দিতে হবে।'

পাওনাদারেরা চুপ করিয়া রহিলেন।

দেবী আবার বলিল—'আমি আজই আপনাদের পাওনা শোধ করতে পারি। আপনাদের আদালতে যেতে হবে না, ডিক্রিজারি করতে হবে না। আমার এই বাড়িখানা আছে, আরও কিছু স্থাবর সম্পত্তি আছে, গায়ের গয়না আছে; সে সব বিক্রি করে আপনাদের টাকা চুকিয়ে দিতে পারি। কিন্তু তাতে, আমার ছেলেপিলে খেতে পাবে না, আমার এই নাতি এক ঝিনুক দুধ পাবে না। আপনারা কি তাই চান?'

একজন তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—'না, না, সে কি কথা? আমরাও ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করি, আপনাকে কষ্ট দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু—'

দেবী বলিল—'তবে আমাকে এই অনুগ্রহটুকু করুন। আমি আমার এই নাতির মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করছি, আপনাদের টাকা আমি শোধ দেব, আমার স্বামীর ঋণ আমি রাখব না। আমাকে দয়া করে এক বছর সময় দিন।'

দেবীর কথা মহাজনদের মর্মস্পর্শ করিল, তাঁহারা এক বছর অপেক্ষা করিতে সম্মত হইলেন।

পরদিন হইতে দেবী কাজে লাগিয়া গেল। লজ্জা-সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া রীতিমত অফিস যাইতে লাগিল। চন্দ্রকান্ত সঙ্গে থাকিত, দেবী স্বামীর আসনে বসিয়া কাজ-কর্ম পরিচালনা করিত। পুরনো বিশ্বাসী কর্মচারীরা একে একে ফিরিয়া আসিল, সম-ব্যবসায়ী কয়েকজন বন্ধু বিধবাকে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিলেন। রাধাকান্তদের বিলাত হইতে অনেক কাগজ আমদানী হইত, মাঝে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, বিলাতী কাগজওয়ালাদের সঙ্গে আবার সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। দেখিয়া-শুনিয়া পুরাতন গ্রাহকরাও ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন।

একবৎসর হাড়ভাঙা খাটুনির পর ব্যবসা আবার দাঁড়াইয়া গেল। চন্দ্রকান্ত ইতিমধ্যে কাজকর্ম শিখিয়া লইয়াছিল। তাহাকে অফিসে বসাইয়া দেবী বলিল—'এবার তুই চালা। কাল থেকে আমি আর আসব না।'

পরদিন পাওনাদারদের ডাকিয়া দেবী তাঁহাদের টাকা চুকাইয়া দিল। তাঁহারা ধন্য ধন্য করিতে করিতে টাকা লইয়া প্রস্থান করিলেন।

দেবী কিন্তু ভিতরে ভিতরে জীবনে বীতস্পৃহ হইয়াছিল; তাহার কাজ শেষ হইয়াছে, আর বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই।

নাতিটি ইতিমধ্যে দেড় বছরের হইয়াছে। দেবী তাহার নাম রাখিয়াছে উষাকান্ত। তাহার এখন পা হইয়াছে, সে সারাক্ষণ ঠাকুরমার আঁচল-চাপা থাকিতে রাজী নয়। খেলা করিতে করিতে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া যায়, উঠানে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করে।

একদিন এক কাণ্ড হইল। বাড়ির নীচের তলায় কাগজের গুদাম; উষাকান্ত গুদামের দ্বার খোলা পাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল। তারপর কেমন করিয়া কাগজের গুদামে আগুন লাগিয়া গেল। শিশুকে কেহ গুদামে প্রবেশ করিতে দেখে নাই, অথচ বাহিরেও তাহাকে পাওয়া যাইতেছে না।

দেবী তখন সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া শিশুকে উদ্ধার করিয়া আনিল। তাহার নিজের দেহ পুড়িয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল, কিন্তু উষাকান্তের গায়ে আঁচ লাগিল না।

তারপর দমকল আসিয়া আগুন নিভাইল। আর্থিক ক্ষতি বেশী হইল না বটে, কিন্তু দেবী সর্বাঙ্গে দহনক্ষত লইয়া শয্যাগ্রহণ করিল।

ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বিশেষ ভরসা দিতে পারিলেন না; জীবনের আশা খুবই কম। তিনি যন্ত্রণা লাঘবের প্রলেপ দিয়া চলিয়া গেলেন।

রাত্রে দেবী অমিয়ার আঁচলে নিজের চাবির গোছা বাঁধিয়া দিয়া বলিল—'আমি চললুম। আজ থেকে তুমি এ বাড়ির গিন্নী।' চন্দ্রকান্তও উপস্থিত ছিল, দুইজনে অঝোরে কাঁদিতে লাগিল।

গৌরীর শ্বশুরবাড়িতে বিলম্বে খবর পোঁছিয়াছিল। দুপুর রাত্রে গৌরী আসিল, মায়ের বুকের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল। দেবী কিন্তু চোখ খুলিয়া মেয়ের পানে চাহিল না। গৌরী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'মা, একবার কথা বল। বল আমাদের ক্ষমা করেছ।'

দেবী কিন্তু কথা কহিল না, চোখ মেলিয়া চাহিলও না। তারপর তাহার ডান হাতখানা ধীরে ধীরে উঠিয়া গৌরীর মাথার উপর স্থাপিত হইল; আঙুলগুলি গৌরীর চুলের মধ্যে একটু খেলা করিল।

তারপর তাহার অবশ হাত গৌরীর মাথা হইতে খসিয়া পড়িল।

দেবীর জীবনলীলা শেষ হইয়াছে।

প্রিয় চরিত্র

বড় মুশকিলে পড়িয়াছি। জনৈক সম্পাদক জানিতে চাহিয়াছেন, আমার সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে আমি কোন্‌টিকে বেশী ভালবাসি।

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কি সহজ? ত্রিশ বছর ধরিয়া গল্প লিখিতেছি। কত চরিত্র ছায়াবাজির মত চোখের সামনে দিয়া চলিয়া গিয়াছে; তাহাদের মধ্যে দুই চারিটিকে কাগজের উপর কালির আঁচড় কাটিয়া ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু ভালবাসিবার অবকাশ পাইলাম কৈ? ভালবাসিতে হইলে দু'চার দিন একসঙ্গে থাকিতে হয়, জীবনের শীত-গ্রীষ্ম শরৎ-বসন্ত একসঙ্গে ভোগ করিতে হয়, হাসি-কান্নার ভাগ লইতে হয়। তারপর, ভালবাসা যদি বা জন্মিল, ভালবাসা কতদিন থাকে? সাবানের বুদ্বুদের মত নানা রঙের খেলা দেখাইতে দেখাইতে হঠাৎ এক সময় ফাটিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। আমার হৃদয়েও কত বুদ্বুদ ফাটিয়াছে তাহার কি হিসাব রাখিয়াছি? অতীতে কাহাকে ভালবাসিয়াছিলাম, এবং এখন কাহাকে বেশী ভালবাসি তাহা কেমন করিয়া বলিব!

আমার অপবাদ আছে আমি গজদন্ত স্তম্ভের চূড়ায় বাস করি। যাঁহারা আমাকে এই অপবাদ দিয়া থাকেন, তাঁহাদের চোখে যদি ধূম্র কাঁচের চশমা না থাকিত তাহা হইলে তাঁহারা দেখিতে পাইতেন, স্তম্ভটা গজদন্তের নয়, চুনকাম করা ইটপাথরের। বেশ মজবুত স্তম্ভ, পাকানো সিঁড়ি দিয়া ইহার ডগায় উঠিলে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। তবে স্তম্ভের মাথায় যাহারা বাস করে তাহাদের জীবনে সঙ্গী-সাথী বেশী জোটে না, আমার জীবনও একটু নিঃসঙ্গ।

একদা রাত্রিকালে আমি স্তম্ভশীর্ষে বসিয়া নিজের মুশকিলের কথা চিন্তা করিতেছি, মৃৎপ্রদীপটি মিটিমিটি জ্বলিতেছে, এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনিতে পাইলাম। বিস্মিত হইলাম; দিনের বেলাই আমার কাছে কেহ আসে না, রাত্রে কে আসিল!

রোগাপানা একটি লোক। চেহারা দেখিয়া বয়স অনুমান করা যায় না; চল্লিশ বছর হইতে পারে, আবার চার হাজার বছরও হইতে পারে। আমার সম্মুখে আসিয়া বসিল; একদৃষ্টে আমার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'আমাকে চিনতে পারছেন না?'

দ্বিধাভরে মাথা নাড়িয়া বলিলাম, 'চিনি চিনি মনে হচ্ছে বটে—কিন্তু—'

সে বলিল, 'আমি জাতিস্মর।'

মাথা চুলকাইয়া বলিলাম, 'জাতিস্মর! হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেকদিন আগে তোমার সঙ্গে কয়েকবার দেখা হয়েছিল, মনে পড়েছে; তুমি রেলের কেরানী ছিলে—'

জাতিস্মর তীব্রস্বরে বলিল, 'রেলের কেরানী ছিলাম এই কথাটাই মনে রেখেছেন। সোমদত্তাকে ভুলে গেছেন! উল্কাকে ভুলে গেছেন!'

উল্কা—বিষকন্যা উল্কা—যাহাকে ভালবাসিয়াছিল তাহাকে দেহ দিতে পারে নাই। সোমদত্তা—নিজের ধর্ম দিয়া স্বামীর প্রাণ বাঁচাইয়াছিল। তাহাদের অনেকদিন আগে চিনিতাম, এক সময় উহারা আমার মন জুড়িয়া বসিয়াছিল। কিন্তু উহাদের ভালবাসিয়াছিলাম কি? ভালবাসিলে কি ভুলিয়া যাইতে পারিতাম?

বলিলাম, 'আসল কথাটা কি জানো—'

জাতিস্মর লোকটার মাথায় ছিট আছে, সে লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তর্জনী তুলিয়া বলিল, 'আপনি উল্কাকে ভুলে গেছেন, সোমদত্তাকে ভুলে গেছেন, রুমাকেও মনে নেই। আপনারা—এই লেখক জাতটা বড় লঘুচিত্ত, ভালবাসতে জানেন না। শুধু কুৎসা রটাতে জানেন। ছিঃ।'

জাতিস্মর ধিক্কার দিয়া চলিয়া গেল।

বসিয়া বসিয়া তাহার কথাই ভাবিতে লাগিলাম। সে জন্মে জন্মে বারবার বহু নারীকে ভালবাসিয়াছিল। আমি যদি একই জন্মে পর্যায়ক্রমে বহু নারীকে ভালবাসি তবে তাহা ভালবাসা হইবে না, অতি নিন্দনীয় কার্য হইবে। কেন? একটি নারীকে সারা জীবন ধরিয়া ভালবাসিব তবেই তাহা ভালবাসা হইবে—এমন কি কথা আছে! প্রাণে ভালবাসা থাকিলেই তো হইল।—

পায়ের শব্দ শুনিতে পাই নাই, চোখ তুলিয়া দেখি একটি যুবতী আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আনন্দময়ী মূর্তি কিন্তু বিহ্বলতা নাই। সর্বাঙ্গে সোনার গহনা, রূপের বুঝি অবধি নাই। বিদ্যাপতির শ্লোক মনে পড়িয়া যায়—'নব জলধরে বিজুরি রেখা দন্দ পসারি গেলি।' গলায় আঁচল দিয়া আমাকে প্রণাম করিল, তারপর পায়ের কাছে বসিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, 'আমি চুয়া।'

বলিলাম, 'পরিচয় দিতে হবে না, তোমাকে দেখেই চিনেছি। এত সুন্দর মেয়েকে কি ভোলা যায়!'

চুয়া লজ্জারুণ মুখে জড়সড় হইয়া বসিয়া রহিল। প্রশ্ন করিলাম, 'চন্দন বেনে কেমন আছে?'

চুয়া শঙ্কাভরা চোখ তুলিয়া বলিল, 'তিনি আবার সাগরে গেছেন।'

তাহাকে ভরসা দিবার জন্য বলিলাম, 'বেনের ছেলেরা সাগরে যাবে না? দু'দিন পরেই ফিরবে, ভয় কি।—নিমাই পণ্ডিতের খবর ভাল?'

চুয়া একটি ছোট্ট নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'ঠাকুর সন্ন্যাস নিয়েছেন। উনি তো আর মানুষ ছিলেন না, দেবতা ছিলেন। কতদিন সংসারে থাকবেন।'

'আর মাধাই?'

'তার সঙ্গে একবার দেখা হয়েছিল। তিনি আমাকে মা বলে ডেকেছেন।'

আমিও একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিলাম—'বেশ বেশ। সব খবরই ভাল দেখছি। তা তুমি আমার কাছে এলে কেন বলো দেখি। তোমাকে ভালবাসি কি না জানতে চাও?'

সে একটু নীরব থাকিয়া বলিল, 'আপনি আমাকে সর্বনাশের মুখ থেকে উদ্ধার করেছিলেন তাই আপনাকে প্রণাম করতে এসেছি।'

সে আবার গলায় আঁচল দিয়া আমাকে প্রণাম করিল। বলিলাম, 'চিরায়ুষ্মতী হও, পাকা মাথায় সিঁদুর পর। তোমাকে উদ্ধার করেছিল চন্দন আর নিমাই পণ্ডিত। কিন্তু আমিও তোমাকে ভালবাসি। আচ্ছা এস।'

চুয়া চলিয়া গেল।

ঘুরিয়া ফিরিয়া মাধাই-এর কথা মনে আসিতে লাগিল। মহাপাষণ্ড মাধাই মহাপুরুষের চরণস্পর্শে উদ্ধার হইয়া গেল। আমার জীবনে এমনি কোনও মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটিবে কি? মনে তো হয় না। মহাপুরুষেরা বাছিয়া বাছিয়া অতি বড় পাষণ্ডদেরই কৃপা করেন, ছোটখাটো পাষণ্ডদের প্রতি তাঁহাদের নজর নাই।

আরে ব্বাস্ রে! ব্যাপার কি? একসঙ্গে অনেকগুলি লঘুক্ষিপ্র পদধ্বনি; তারপর এক ঝাঁক যুবতী আমার স্তম্ভগৃহে ঢুকিয়া পড়িল এবং আমাকে ঘিরিয়া বসিল।

প্রদীপ উস্কাইয়া দিয়া একে একে সকলের মুখ দেখিলাম। কেহ আনারকলি, কেহ রজনীগন্ধা, কেহ অপরাজিতা। সকলেরই মুখ চেনা, কিন্তু সকলের নাম মনে নাই। বলিলাম, 'রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তোমরা সবাই ভাল। গুরুদেবের কথার প্রতিবাদ করতে চাই না, কিন্তু তোমাদের কী মতলব বল দেখি। রাত্তির বেলা একজোট হয়ে নিরীহ ব্রাহ্মণকে আক্রমণ করেছ কেন?'

একটি মুখফোড় মেয়ে বেণী দুলাইয়া বলিল, 'আপনি মোটেই নিরীহ ব্রাহ্মণ নয়, খালি খোঁচা দিয়ে কথা বলেন।'

তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলাম, 'তোমাকে চিনেছি। তুমি করবী। কিন্তু খোঁচা দিয়ে কথা কখন বললাম? তোমাদের ঐ দোষ সত্যি কথা সইতে পার না।—যাক, বিমলা কেমন আছে? সুহাসকে দেখছি না!'

করবী বলিল, 'বৌদি এলেন না, তাই হাসি-দি'ও এল না। আমাদেরও আসতে দিচ্ছিল না, বলছিল কেন ভদ্রলোককে জ্বালাতন করবি। আমরা জোর করে চলে এলুম।'

বলিলাম, 'তোমাদের মধ্যে দু'একজনের সুবুদ্ধি আছে তাহলে। কিন্তু এসেছ ভালই করেছ। এখন বল মতলবটা কি?'

এবার অন্য একটি মেয়ে কথা বলিল; কালো মেয়ে, চোখের কূলে কূলে হাসি খেলা করিতেছে, বলিল, 'আমরা জানতে এলুম কেন আপনি আর আমাদের ভালবাসেন না, কেন আমাদের নাম পর্যন্ত ভুলে গেছেন।'

বলিলাম, 'তোমার নাম ভুলিনি। তুমি, রুচিরা।'

আর একটি মেয়ে বলিল, 'আর আমি? আমার নাম বলুন দেখি।'

অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম। মেয়েটি চুয়ার মত সুন্দরী নয়, কিন্তু ভারি সুশ্রী...মনে হয় যেন ছেলেবেলায় স্নানযাত্রার মেলায় হারাইয়া গিয়াছিল, এক মধ্যবিত্ত দম্পতী তাহাকে কুড়াইয়া পাইয়া মানুষ করেন...তারপর?...বড়মানুষের একটা খেয়ালী ছেলে... একটা তোৎলা...

মেয়েটি ম্লান হাসিয়া বলিল, 'বলতে পারলেন না তো! আমি কেয়া।'

মনে দুঃখ হইল। সত্যই তো, মানুষ কেন ভুলিয়া যায়? হে মহাকাল, তুমি তো কিছু ভোল না, আমাদের অস্থি-মজ্জায় তোমার অভিজ্ঞান অঙ্কিত আছে; তবে আমরা ভুলি কেন? আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ে একটি বৈ দু'টি ভালবাসার স্থান নাই, তাই বুঝি একটিকে ঘরে আনিবার সময় আগেরটিকে বিদায় দিতে হয়!

করবী আবেগ-প্রবণ কণ্ঠে বলিল, 'বলুন, কেন আপনি আমাদের ভুলে গেছেন, কেন

আর ভালবাসেন না!'

ক্ষীণকণ্ঠে বলিলাম, 'দ্যাখো, তোমাদের সকলকেই তো আমি একটি একটি ভালবাসার পাত্র জুটিয়ে দিয়েছি, তবে আবার আমার ভালবাসা চাও কেন? মেয়ের বাপ মেয়ের বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্দি হয়, মেয়েও নিজের স্বামী নিয়ে মনের সুখে ঘরকন্না করে। তখন আর বাইরের ভালবাসা চায় না। কিন্তু তোমাদের এ কি? ভালবাসায় কি তোমাদের অরুচি নেই?'

সকলে মুখ তাকাতাকি করিয়া হাসিয়া উঠিল। একজন বলিল, 'অমৃতে নাকি অরুচি হয়? আপনি হাসালেন।'

করবী বলিল, 'কিন্তু আপনার ভালবাসার ওপর আমাদের দাবী আছে।'

বলিলাম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তা আছে বৈকি। তোমাদের কাউকেই আমি ভুলিনি, সবাই আমার অবচেতনার তোষাখানায় জমা হয়ে আছো। তবে কি জানো, চোখের আড়াল প্রাণের আড়াল। তোমরাও তো এতদিন আমাকে ভুলে ছিলে; আজ মাসিক পত্রে প্রশ্ন উঠেছে, আমার প্রিয় চরিত্র কোনটি, তাই আমাকে মনে পড়েছে।'

একটি মেয়ে, তার নাম বোধহয় আলতা, বলিল, 'মোটেই না, আপনার দিকে আমাদের বরাবর নজর আছে। আপনি যে-কাণ্ড করে চলেছেন! আজ রট্টা যশোধরা, কাল কুহু-গুঞ্জা-শিখরিণী, পরশু বীরশ্রী-যৌবনশ্রী-বান্ধুলি। আরও কত মনের মধ্যে লুকিয়ে রেখে-ছেন কে জানে।—গা জ্বলে যায়।'

আমার অবস্থা খুব কাহিল হইয়া পড়িল। ভালবাসায় যাহাদের দুর্নিবার লোভ, অথচ অন্যকে ভালবাসি দেখিলে যাহাদের গা জ্বলিয়া যায়, তাহাদের সহিত তর্ক করিয়া লাভ নাই। কি বলিয়া ইহাদের ঠাণ্ডা করিব ভাবিতেছি, হেনকালে পিছনদিকে পুরুষ-কণ্ঠের স্নিগ্ধ-মধুর হাসি শুনিতে পাইলাম। তারপরই সংস্কৃত ভাষায় সম্বোধন, 'অয়মহং ভো!'

ঘাড় ফিরাইয়া দেখি, তেজঃপুঞ্জকান্তি এক পুরুষ দাঁড়াইয়া আছেন। একালের মানুষ নয় তাহা বেশবাস দেখিয়া বোঝা যায়। ক্ষৌরিত মাথাটির মাঝখানে পরিপুষ্ট শিখা, স্কন্ধে মুঞ্জোপবীত, গলায় শুভ্র দুকূলের উত্তরীয়, নিম্নাঙ্গে হাঁটু পর্যন্ত বস্ত্র; মুখখানি স্মিতহাস্যোজ্জ্বল, চক্ষুদুটি ভ্রমরের ন্যায় মেয়েদের মুখের উপর পরিভ্রমণ করিতেছে।

মেয়েরা পুরুষকে দেখিয়া ক্ষণেকের জন্য যেন সন্ত্রস্ত হইয়া রহিল, তারপর এক ঝাঁক প্রজাপতির মত ছুটিয়া পলাইল।

ঘর শূন্য হইয়া গেলে আমি যুক্তকরে পুরুষকে বলিলাম, 'আসুন কবিবর, আপনার চরণস্পর্শে আমার স্তম্ভ পবিত্র হোল।'

কালিদাস উপবিষ্ট হইয়া এদিক ওদিক চাহিলেন, বলিলেন, 'খাসা স্তম্ভটি। আমার যদি এমন একটি স্তম্ভ থাকত, আরও অনেক লিখতে পারতাম। রাজসভার হট্টগোলে কি লেখা যায়?'

বলিলাম, 'কবি, সাতটি গ্রন্থ লিখে আপনি সপ্তলোক জয় করেছেন। কী প্রয়োজন?'

কবি একটু বিমনা হইয়া বলিলেন, 'তা যেন হল। কিন্তু মেয়েগুলো আমাকে দেখে পালালো কেন বল দেখি।'

অপ্রতিভভাবে কাশিয়া বলিলাম, 'হেঁ হেঁ—কি জানেন, স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপারে আপনার একটু—ইয়ে—দুর্নাম আছে কিনা—তাই—'

পরম বিস্ময়ভরে কবি বলিলেন, 'তাই নাকি! কিন্তু সেকালে তো কোনো দুর্নাম ছিল না। উজ্জয়িনীর প্রধানা নগরনটী প্রিয়দর্শিকার সঙ্গে আমার ভাব-সাব ছিল, ভালবাসতাম; এমন কি রানী ভানুমতীও আমার প্রতি প্রীতিমতী ছিলেন।

কিন্তু সেজন্যে আমাকে দুর্নাম তো কেউ দেয়নি। আর তরুণীরাও আমাকে দেখে ছুটে পালাত না, বরং ছুটে এসে ঘিরে ধরত।'

কবিকে ক্ষুব্ধ দেখিয়া আমি বলিলাম, 'একালের মেয়েরা আগের মত সাহসিনী নয়, ভারতবর্ষে যবন আক্রমণের পর থেকে আর্যনারীরা বড়ই ভীরু হয়ে পড়েছে। উপরন্তু আপনার নামে নানারকম গল্প শুনেছে—'

কবিবর উত্তপ্ত হইয়া বলিলেন, 'এ তোমাদের কাজ। তোমরাই বানিয়ে বানিয়ে আমার নামে মিথ্যে গল্প রচনা করেছ। তাই সুন্দর সুন্দর মেয়েরা আমাকে দেখে পালিয়ে যায়।'

বলিলাম, 'তা কি করব? আপনি নিজের সম্বন্ধে একটি কথাও লিখে যাননি, কাজেই আমাদের বানিয়ে বানিয়ে গল্প লিখতে হয়। আপনার সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহলের যে অন্ত নেই কবি।'

কবি একটু প্রসন্ন হইলেন, বলিলেন, 'আমার জীবনের সব তথ্য জানা থাকলে কি এত কৌতূহল থাকত? কিন্তু ওকথা যাক। তুমি এ কি কাণ্ড করেছ?'

'কী কাণ্ড করেছি?'

'আমাকে নিয়ে দুটো গল্প বানিয়েছ। একটাতে পরম সুশীলা কুন্তল-রাজকুমারীর সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছ। অন্যটিতে আমার স্ত্রীকে করেছ এক দজ্জাল খাণ্ডার মেয়েমানুষ। দুটোই কি করে সম্ভব হয়?'

'কেন সম্ভব হবে না? কুন্তলকুমারী কালক্রমে দজ্জাল খাণ্ডার হয়ে উঠতে পারেন। এমন তো কতই হয়।'

কবি মিটিমিটি হাসিয়া বলিলেন, 'তোমার অভিসন্ধি বুঝেছি। অন্ধকারে দুটো ঢিল ছুঁড়েছ, যেটা লেগে যায়। কেমন?'

আমি উত্তেজিত হইয়া বলিলাম, 'তাহলে একটা ঢিল লেগেছে!'

কালিদাস মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'উঁহু, এই ফাঁকে সত্য কথাটা জেনে নিতে চাও। সেটি হচ্ছে না। আমি উঠলাম।' বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিলেন।

আমি করজোড়ে বলিলাম, 'কবিবর, আর একটু বসুন। আপনি কেন এই দীনের কুলায়ে শুভাগমন করেছেন তা তো বললেন না। আপনিও কি জানতে চান আমি আপনাকে ভালবাসি কিনা? তাহলে মুক্তকণ্ঠে বলছি, আমি আপনাকে ভালবাসি, আমার যতটুকু ভালবাসার ক্ষমতা আছে সব দিয়ে আপনাকে ভালবাসি।'

কবি বলিলেন, 'কথাটা পরিষ্কার হল না। আমাকে ভালবাস, না আমার কাব্যকে ভালবাস?'

বলিলাম, 'আপনার কাব্য আর আপনি কি আলাদা? আপনাকে আপনার কাব্যের মধ্যেই পেয়েছি, আর তো কোথাও পাইনি। আমি আপনার যে চরিত্র গড়েছি সে তো আপনার ভাবমূর্তি, আপনার কাব্যের মধ্যেই সে-মূর্তি পেয়েছি। —কবি, বলুন আমার আঁকা সে-মূর্তি যথার্থই কিনা।'

কবি বলিতে গিয়া থামিয়া গেলেন, মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'আর একটু হলেই বলে ফেলেছিলাম। তুমি বড় ধূর্ত। নাঃ, আর নয়, এবার আমি উঠি।'

কিন্তু তাঁহার ওঠা হইল না, দ্বারের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। আমি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম ব্যোমকেশ বক্সী দাঁড়াইয়া আছে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হইতেই সে আসিয়া আমার সম্মুখে মহাকবির পাশে বসিল। তাঁহার প্রতি একটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, 'অনেক পুরনো লোক মনে হচ্ছে। শীলভদ্র নাকি? না, গলায় পৈতে আছে, বৌদ্ধ নয়। দীপঙ্করও নয়। তবে কি মহাকবি কালিদাস?'

কবিবর ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন। আমি তখন পরিচয় করাইয়া

দিলাম। বলিলাম, 'ব্যোমকেশ বক্সী একজন সত্যান্বেষী। পরের গুপ্তকথা খুঁচিয়ে বার করা ওর কাজ। কবিবর, আপনার জীবনে যদি কোনো গুপ্তকথা থাকে, সাবধান থাকবেন।'

কবি তড়িৎস্পৃষ্টবৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, 'আরে সর্বনাশ! আমার জীবনটাই তো একটা গুপ্তকথা। এখানে আর বেশীক্ষণ থাকলে সব ফাঁস হয়ে যাবে। আমি চললাম। এ রকম লোক তোমার কাছে আসে জানলে—। আচ্ছা, স্বস্তি স্বস্তি।'

আমি দ্বার পর্যন্ত কবিকে পেঁৗছাইয়া দিয়া বলিলাম, 'নমস্কার কবি। পুনশ্চ ভূয়োপি নমোনমস্তে।'

কবি দ্রুত সিঁড়ি দিয়া নামিয়া অদৃশ্য হইলেন।

ফিরিয়া আসিয়া বসিলাম। ব্যোমকেশকে ভোলা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তাহার সহিত আমার পরিচয় প্রায় ত্রিশ বছর। সে বিবাহ করিবার পর ষোল-সতরো বছর তাহাকে কাছে ঘেঁষিতে দিই নাই, তারপর আবার আসিয়া জুটিয়াছে। লোকটাকে আমি পছন্দ করি না। এত বুদ্ধি ভাল নয়।

প্রশ্ন করিলাম, 'তোমার ল্যাংবোট কোথায়?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'অজিত? সে আপনার ওপর অভিমান করেছে, তাই এল না।'

'অভিমান কিসের?'

'আপনি তাকে ক্যাবলা বানিয়েছেন তাই। বেচারা সাহিত্যিক মহলে কলকে পায় না, সবাই তাকে দেখে হাসে।'

'হুঁ। তোমাকে দেখে কেউ হাসে না এই আশ্চর্য। তোমরা দু'জনেই সমান। এক-জন বুদ্ধির জাহাজ, অন্যটি ক্যাবলা। দু'চক্ষে দেখতে পারি না।'

ব্যোমকেশ সিগারেটে লম্বা টান দিয়া বাঁকা হাসিল, বলিল, 'আমাদের তাহলে আপনি ভালবাসেন না? মানে, আমরা আপনার প্রিয় চরিত্র নই।'

দৃঢ়স্বরে বলিলাম, 'না, তোমরা আমার প্রিয় চরিত্র নও। এ কথাটা ভাল করে বুঝে নাও।'

ব্যোমকেশ নির্বিকার স্বরে বলিল, 'আমি আগে থেকেই জানি। এবং আপনার প্রিয় চরিত্র কে তাও জানি।'

চকিত হইয়া বলিলাম, 'তাই নাকি! কে আমার প্রিয় চরিত্র? কার কথা বলছ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'যে আপনার প্রত্যেক লেখার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে. যাকে বাদ দিয়ে আপনি এক ছত্রও লিখতে পারেন না, তার কথা বলছি।'

'কিন্তু লোকটা কে? নাম কি?'

'শুনবেন?' ব্যোমকেশ আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া চুপিচুপি একটা নাম বলিল।

চমকিয়া উঠিলাম। মনের অগোচর পাপ নাই, ব্যোমকেশ ঠিক ধরিয়াছে। কিছুক্ষণ মুখ-ব্যাদান করিয়া থাকিয়া বলিলাম, 'তুমি কি করে জানলে?'

ব্যোমকেশ অট্টহাস্য করিয়া উঠিল, বলিল, 'আপনার প্রশ্নটা অজিতের প্রশ্নের মত শোনাচ্ছে!'

আত্মসংবরণ করিয়া তাহার পানে কটমট তাকাইলাম, দ্বারের দিকে অংগুলি নির্দেশ করিয়া বলিলাম, 'তুমি এবার বিদেয় হও।'

ব্যোমকেশ হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, 'ধরা পড়ে গিয়ে আপনার রাগ হয়েছে দেখছি। আচ্ছা, আজ চলি। আর একদিন আসব।'

সে চলিয়া গেলে দ্বার বন্ধ করিয়া দিলাম। আজ আর কাহাকেও ঢুকিতে দিব না। অনর্থক সময় নষ্ট।

প্রদীপটিকে কাছে টানিয়া খাতা পেন্সিল লইয়া লিখিতে বসিলাম। পূজা আসিয়া পড়িল। পূজার সময় একটা ব্যোমকেশের রহস্য-কাহিনী না লিখিলেই নয়।

স্ত্রী - ভা গ্য

ধীরাজের বিবাহ ও দাম্পত্যজীবন একটা হাসির ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ধীরাজ আমার ছেলেবেলার বন্ধু; তারপর বড় হইয়া কলিকাতার একই মেসে একই ঘরে বাস করিয়াছি, এবং একই শেয়ার-দালালের অফিসে কেরানীগিরি করিয়াছি। সুতরাং তাহার হৃদয়-মনের একটা স্পষ্ট চিত্র আমার মনে থাকা উচিত। কিন্তু এখন মনে হয় তাহার হৃদয়ের মধ্যে একটা গোপন চোর-কুঠরি ছিল; সেখানে সে কী রাখিত আমি কোনোদিন জানিতে পারি নাই।

অথচ সে চাপা প্রকৃতির লোক ছিল না। তাহার ছিপ্‌ছিপে লম্বা চেহারা দেখিলে ও ধারালো মুখের শাণিত কথাবার্তা শুনিলে মনে হইত সে বিজ্ঞানের ছাত্র; তাহাকে কেরানীশ্রেণীর মানুষ বলিয়া একেবারেই মনে হইত না। সাধারণ মানুষ যে-সকল প্রসঙ্গ সংকোচবশে এড়াইয়া যায় সে তাহা খোলাখুলিভাবে আলোচনা করিত। তখন আমরা দু'জনেই অবিবাহিত, সম্পূর্ণ আত্মীয়স্বজনহীন এবং দরিদ্র কেরানী। আমি এখনো দরিদ্র কেরানীই রহিয়া গিয়াছি, কিন্তু ধীরাজের জীবনে এই কয়বছরে এত উত্থানপতন ঘটিয়াছে যে বিস্মিত হইতে হয়।

ধীরাজের বুদ্ধি ছিল অত্যন্ত প্রখর, কিন্তু তাহার দেহটা ছিল ঠিক সেই পরিমাণে অলস ও নিষ্কর্মা। ছুটির দিনে সারাদিন বিছানায় পড়িয়া থাকিত; ঘরে আড্ডা বসিলে সে বিছানায় শুইয়া শুইয়াই আড্ডায় যোগ দিত। অফিসে না গেলে চাকরি থাকিবে না তাই অফিসে যাইত। তাও অফিসের কাজ এমন বেগার-ঠেলা ভাবে করিত যে আমি তাহার অর্ধেক কাজ করিয়া না দিলে চাকরি থাকিত কিনা সন্দেহ।

ধীরাজের বিবাহ একটি বিচিত্র ঘটনা। একটা ছুটির দিনে সকালবেলা আমি বাজারে গিয়াছিলাম, তেল সাবান টুথ-পাউডার প্রভৃতি কিনিবার ছিল। বেলা দশটা নাগাদ ফিরিয়া আসিয়া দেখি, ধীরাজ শয্যাত্যাগ করিয়াছে, দাড়ি কামাইয়াছে, কাপড়-চোপড় পরিয়া তৈরি হইয়া আছে। আমাকে দেখিয়া বলিল, 'চল্, এখনি বেরুতে হবে।'

আমি হাঁ করিয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলাম, 'তোর আজ হল কি! কোথায় যেতে হবে?'

সে বলিল, 'পরে শুনিস্। এখন চট্ করে ভালো কাপড়-চোপড় প'রে তৈরি

হয়ে নে।'

পনরো মিনিটের মধ্যে বাহির হইলাম। রাস্তায় চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কোথায় যাওয়া হচ্ছে সেটা এবার জানতে পারি কি?'

ধীরাজ বলিল, 'আমি যাচ্ছি বিয়ে করতে। সিভিল ম্যারিজ্। তুই আমার সাক্ষী।'

রাস্তার মাঝখানেই দাঁড়াইয়া পড়িলাম, 'বিয়ে! কার সঙ্গে? কোথায়?'

সে আমার বাহু ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল, 'বেশী দূর নয়, পাঁচ মিনিটের রাস্তা।'

'কিন্তু পাত্রী কে? কার মেয়ে?'

'কার মেয়ে জানি না। পাত্রীকে জানি; নাম ঊষা পাঠক। স্বাধীন মেয়ে, ইন্সিওরেন্সের দালালি করে।'

আবার দাঁড়াইয়া পড়িলাম।

'কে দালালি করে?'

'পাত্রী।'

অতঃপর আর কিছু বলিবার রহিল না। বীমার দালালি করে এমন মেয়ে নিশ্চয় আছে, নচেৎ ধীরাজ তাহাকে বিবাহ করিবে কেমন করিয়া? কিছুক্ষণ নীরবে চলিবার পর বলিলাম, 'বিয়ের কথা আগে বলিসনি কেন?'

সে বলিল, 'কী এমন মহামারী ব্যাপার যে ঢাক পিটোতে হবে?'

নানা প্রশ্নের মধ্যে একটা প্রশ্ন প্রবলতর হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কোথায় তোদের দেখাশুনো হল তাও জানি না। তা—প্রেম নাকি? প্রেমে পড়েছিস?'

ধীরাজ প্রশ্নের উত্তর দিল না, ঠোঁট টিপিয়া একটু হাসিল।

ইতিমধ্যে আমরা একটি তিনতলা বাড়ির সামনে আসিয়া পৌঁছিলাম, সুতরাং আর প্রশ্ন করাও হইল না। ধীরাজ আমাকে লইয়া তিনতলা বাড়ির ডগায় উঠিল।

ছিমছাম পরিচ্ছন্ন একটি ফ্ল্যাট। যে যুবতীটি ফ্ল্যাটের দরজা খুলিয়া দিল সেও বেশ ছিমছাম। সুন্দরী নয়, মুখখানা টিয়াপাখির মত; কিন্তু চোখে আছে চটুল কটাক্ষ, পরিপক্ক অধরে আছে খুনখারাবি রঙের হাসি। বেশবাস পরিবার ভঙ্গীতে দেহকে আচ্ছাদন করার চেয়ে উন্মোচন করার চেষ্টাই বেশী।

ধীরাজ পরিচয় করাইয়া দিল, 'আমার বন্ধু মানিক ঘোষ। ঊষা পাঠক—আমার—'

ঊষা পাঠক আমরা পানে চোখ বাঁকাইয়া হাসিল।

সুসজ্জিত ঘরে গিয়া বসিলাম। ঘরের সাজসজ্জা দেখিয়া মনে হয় ধীরাজের ভাবী স্ত্রীর পয়সা আছে, বীমার দালালি করিয়া নিশ্চয় অনেক টাকা রোজগার করে।

ঘরে আরও দুটি মানুষ আছে। বিলাতী পোশাক-পরা ফিটফাট দুটি যুবক। একজন বাঙালী, অন্যটি মাড়োয়ারী। ইহারা পাত্রীর বন্ধু, বিবাহে সাক্ষী দিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে।

অল্পক্ষণ পরেই বিবাহের পুরোহিত, অর্থাৎ রেজিস্ট্রার মহাশয় চাপরাসীর হাতে বিরাট খাতা লইয়া উপস্থিত হইলেন। পাত্র-পাত্রীকে দু'একটি সওয়াল-জবাব, খাতায় নাম লেখা, সাক্ষীদের সহি-দস্তখত। ব্যস্, বিবাহ হইয়া গেল। ঢাক-ঢোল নাই, বরযাত্রী-কন্যাযাত্রীর কামড়া-কামড়ি নাই, উলু সাতপাক কুশণ্ডিকা নাই, অথচ পাকা বিবাহ। রেজিস্ট্রার মহাশয় দক্ষিণা লইয়া প্রস্থান করিলেন। খাসা বিবাহ।

অতঃপর আমরা সাক্ষীরা জলযোগপূর্বক প্রস্থান করিলাম। নববধূ বঙ্কিম কটাক্ষপাত করিয়া খুনখারাবি রঙের হাসি হাসিল। ধীরাজ বলিল, 'আচ্ছা, কাল অফিসে দেখা হবে।'

বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। মনটা খারাপ হইয়া গেল। একে তো বিবাহের পদ্ধতিটা

নিতান্তই অনভ্যস্ত, তার ওপর ঊষা পাঠক মেয়েটাকেও ভালো লাগিল না। তাহার বন্ধু দুটিকে ভালো লাগিল না। তাহাদের চালচলন ভাবভঙ্গী খুবই পরিমার্জিত, তবু ভালো লাগিল না।

ছুটির দিনে বাসার অন্য অধিবাসীরা সকলেই বাসায় ছিলেন, পাশের ঘরে আড্ডা বসিয়াছিল। আমি ফিরিয়া আসিলে দুই-তিন জন আমাদের ঘরে আসিলেন। একজন বলিলেন, 'কি ব্যাপার বলুন দেখি! ধীরাজবাবু আজ দুপুরের আগেই বিছানা ছেড়ে কোথায় গেলেন?'

মনের দুঃখে ধীরাজের বিবাহের কথা বলিলাম। শুনিয়া সকলে চেঁচামেচি করিতে লাগিলেন, 'এ কি রকম কথা! ধীরাজবাবু বিয়ে করলেন অথচ আমাদের একবার জানালেন না! না হয় বরযাত্রী না-ই যেতাম, রসগোল্লা না-ই খেতাম'—ইত্যাদি।

সুশীলবাবু নামক এক ভদ্রলোক বলিলেন, 'বোধ হয় অসবর্ণ বিবাহ। পাত্রীর নাম কি?'

বলিলাম, 'ঊষা পাঠক।'

সুশীলবাবুর ভ্রূযুগল গুণছেঁড়া ধনুকের মত লাফাইয়া উঠিল, 'ঊষা পাঠক! বলেন কি মশাই! সে যে নামজাদা মেয়ে!'

'নামজাদা মেয়ে! আপনি তাকে চেনেন নাকি?'

সুশীলবাবু বলিলেন, 'পরিচয় নেই। তবে কীর্তিকলাপ জানা আছে। ছি ছি ছি, ধীরাজবাবু শেষে ঊষা পাঠককে বিয়ে করলেন! এইজন্যই বুঝি কাউকে খবর দেন নি।'

'ঊষা পাঠকের কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে আপনি কী জানেন?'

সুশীলবাবু অরুচিসূচক মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, 'অনেক কিছুই জানি; শুধু আমি নয়, আরো অনেকে জানে। ঊষা পাঠক যখন কলেজে পড়ত তখন একটা ছেলের সঙ্গে নটঘট করেছিল, পরে জানাজানি হয়ে যায়; কলেজ থেকে দু'জনকেই তাড়িয়ে দেয়। তারপর ঊষা বীমার দালালি আরম্ভ করে। বীমার দালালিটা ছুতো, আসলে বড়মানুষের ছেলেদের মাথা খাওয়াই ওর পেশা।'

সুশীলবাবুরা চলিয়া যাইবার পর গুম হইয়া বসিয়া রহিলাম। ধীরাজ কি জানিয়া-শুনিয়া একটা নষ্ট-মেয়েকে বিবাহ করিল? কিন্তু কেন? এই লইয়া মেসে ঢিঢিক্কার পড়িয়া যাইবে ভাবিয়া মনটা বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল।

পরদিন ধীরাজ আসিল না। মেসেও ফিরিল না। তারপর মাস-দুয়েক আর তাহার দেখা নাই। তাহার কাপড়-চোপড় বাক্স-বিছানা সবই বাসায় পড়িয়া আছে। তাহার চরিত্র যতদূর জানি তাহা হইতে অনুমান করিলাম সে নব-পরিণীতা স্ত্রীর বাসায় বিছানায় শুইয়া পরমানন্দে দিন কাটাইতেছে। রোজগেরে বৌ যখন পাইয়াছে তখন আর কাজ করিবে কেন? বলা বাহুল্য, চাকরি রহিল না।

আমি ইচ্ছা করিলে তাহার স্ত্রীর বাসায় গিয়া খোঁজখবর লইতে পারিতাম। কিন্তু তাহার স্ত্রীর সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলাম তাহার পর আর সেদিকে যাইবার উৎসাহ ছিল না। যাক্ গে, মরুক গে, আমার কী,—এইরূপ মনোভাব লইয়া বসিয়া ছিলাম। বাসায় আমার ঘরে ধীরাজের বদলে অন্য লোক আসিয়াছিল।

একদিন বিকালে অফিস হইতে বাহির হইয়া ফুটপাথে পা দিয়াছি, একটি ঝক-ঝকে নূতন মোটর আসিয়া ফুটপাথ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। গাড়ির মধ্যে বসিয়া আছে ধীরাজ। তাহার চেহারাও মোটরের মতই ঝকঝক করিতেছে; পরিধানে পুরু সিল্কের প্যান্টলুন ও মিহি সিল্কের বুশ-শার্ট, মাথার চক্‌চকে চুল ব্যাক্‌ব্রাশ করা। গাড়ি চালাইতেছে একজন ছোকরা শিখ। দেখিয়া শুনিয়া আমি কেমন যেন ভ্যাবাচাকা

খাইয়া গেলাম।

ধীরাজ গাড়ির দরজা খুলিয়া দিয়া বলিল, 'আয়, তোকে বাসায় পেঁছে দিই।'

মনের আড়ষ্টতা দূর হইবার পূর্বেই গাড়িতে উঠিয়া বসিলাম। গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিল।

ধীরাজ আমার পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিল, সোনার সিগারেট-কেস আমার সামনে খুলিয়া ধরিয়া বলিল, 'তুই কি ঘাব্‌ড়ে গেলি নাকি?'

দামী সিগারেট। আমি যে-সিগারেট খাই তাহার এক প্যাকেটের চেয়েও এই একটা সিগারেটের দাম বেশী। ধীরাজ লাইটার জ্বালিয়া সিগারেট ধরাইয়া দিল। আমি নীরবে দুই-তিন টান দিয়া বলিলাম, 'কার গাড়ি?'

ধীরাজ ভ্রূ তুলিয়া বলিল, 'আমার গাড়ি। আর কার?'

প্রশ্ন করিলাম, 'টাকা কোথায় পেলি?'

ধীরাজের চক্ষু উত্তেজিত হইয়া উঠিল, 'টাকা—রোজগার করেছি। পাঁচ হপ্তায় সাঁইত্রিশ হাজার টাকা রোজগার করেছি। বিশ্বাস হয়?'

'বিশ্বাস করা শক্ত। কিসে এত টাকা রোজগার করলি?'

'শেয়ার-মার্কেটে। এতদিন মিছেই কেরানীগিরি করে মরেছি। যদি গোড়া থেকে ফাট্‌কা খেলতাম—এতদিনে লাখপতি হয়ে যেতাম।'

তাহার মুখচোখের ভাব দেখিয়া বুঝিলাম, হঠাৎ অনেক টাকা রোজগার করার উত্তেজনা সে এখনো কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। মনে মনে একটু ঈর্ষা যে অনুভব না করিলাম এমন নয়। বলিলাম, 'শেয়ার-মার্কেটে জুয়া খেলতে হলে মূলধন দরকার। তুই মূলধন পেলি কোথায়?'

ধীরাজ তখন সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। বিবাহের পর তাহার স্ত্রী বলিয়াছিল, 'কেরানীগিরিতে কি পয়সা আছে? তুমি শেয়ার-মার্কেটে যাতায়াত আরম্ভ করো।'

এই বলিয়া তাহাকে দু'হাজার টাকা দিয়াছিল। ধীরাজ শেয়ার-দালালের অফিসে চাকরি করিয়া শেয়ার বেচাকেনা সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জানিত, কিন্তু নিজে কখনো শেয়ারের খেলা খেলে নাই। সে ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হইল। কিন্তু এমনি তাহার জোর বরাত, প্রথম হইতেই সে লাভ করিতে আরম্ভ করিল। বৌ তাহাকে শেয়ার সম্বন্ধে 'টিপ' সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিত। ক্রমে এমন দাঁড়াইল, সে যে-শেয়ার কেনে সেই শেয়ারের দাম চড়চড় করিয়া চড়িয়া যায়। গত পাঁচ হপ্তায় সে সাঁইত্রিশ হাজার টাকা লাভ করিয়াছে; তারপর মোটর কিনিয়াছে, দেড়শো টাকা মাহিনা দিয়া ড্রাইভার রাখিয়াছে। এখন আরো কিছু টাকা হস্তগত করিতে পারিলেই বালিগঞ্জে বাড়ি কিনিবে।

কাহিনী শেষ করিয়া ধীরাজ বলিল, 'একেই বলে পুরুষস্য ভাগ্যং।'

মনে মনে ভাবিলাম, স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং-ও বটে। মুখে বলিলাম, 'খাসা বৌ যোগাড় করেছিস। কথায় বলে স্ত্রী-ভাগ্যে ধন। তা তুই তো আর আমাদের পচা মেসে ফিরে আসবি না; তোর জিনিসপত্র আমার কাছে পড়ে রয়েছে, সেগুলো নিয়ে যা।'

ধীরাজ তাচ্ছিল্যভরে বলিল, 'ও আর এখন কী হবে, তোর কাছেই থাক। পরে দেখা যাবে।'

গাড়ি আসিয়া মেসের সামনে থামিল। আমি নামিবার উপক্রম করিতেছি, ধীরাজ বলিল, 'তুই একটা লাইফ ইন্সিওরেন্স পলিসি নে না।'

ফিরিয়া বলিলাম, 'লাইফ ইন্সিওরেন্স পলিসি!'

সে বলিল, 'হ্যাঁ। আমি পঞ্চাশ হাজারের নিয়েছি। তুই অন্তত দশ হাজারের নে। বিশ বছর পরে টাকা পাবি।'

বলিলাম, 'তা তো পাব, কিন্তু ততদিন খাব কি? যা মাইনে পাই, প্রিমিয়াম দিয়ে কিছু বাঁচবে কি?'

সে হাসিয়া বলিল, 'আচ্ছা, পাঁচ হাজারের নিস। বেশী প্রিমিয়াম দিতে হবে না, আমার বৌ সব ঠিকঠাক করে দেবে। একদিন আসিস আমার বাসায়।'

আমি উত্তর দিলাম না, গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িলাম। গাড়ি চলিয়া গেল। ধীরাজের কপাল খুলিয়াছে, কিন্তু আমার তো খোলে নাই। পেটে ভাত নাই—পাঁচ হাজার টাকার ইন্সিওরেন্স!

মেসের দোরগোড়ায় সুশীলবাবুর সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। তিনি ভুরু তুলিয়া বলিলেন, 'ব্যাপার কি! কার মোটরে চড়ে অফিস থেকে ফিরলেন?' তিনি পদব্রজে অফিস হইতে ফিরিতেছিলেন।

বলিলাম, 'ধীরাজের মোটরে চড়ে।'

তাঁহার মুখে বিস্ময় ও অবিশ্বাসের সঙ্গে গভীর অসন্তোষ ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন, 'তাই নাকি! ধীরাজবাবু তাহলে এখন স্ত্রীর রোজগারে মোটর হাঁকাচ্ছেন?'

বলিলাম, 'পুরুষস্য ভাগ্যং। কি করবেন, বলুন।'

সুশীলবাবু হঠাৎ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন, 'ঝ্যাঁটা মারি অমন ভাগ্যের মুখে। ইজ্জতের বদলে মোটরগাড়ি! ছ্যাঃ।' তিনি ঘৃণাভরে পদদাপ করিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। বুঝিলাম, ধীরাজের বিবাহের সংবাদে তিনি যতটা ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন তাহার ভাগ্যোদয়ের সংবাদে ততোধিক অসুখী হইয়াছেন। আমাদের মত সামান্য সাধারণ মানুষের পক্ষে ইহাই বোধ হয় স্বাভাবিক। ধর্মের জয় এবং অধর্মের ক্ষয় দেখিবার জন্য আমাদের মন সর্বদাই উৎসুক; ইহার ব্যতিক্রম দেখিলে মন খারাপ হইয়া যায়।

ধীরাজের ভাগ্যোন্নতির খবর মেসে প্রচারিত হইল। ধীরাজের অনুপস্থিতিতে আমাকে লক্ষ্য করিয়াই বাক্যবাণ নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল; কারণ আমিই ছিলাম তাহার নিকটতম বন্ধু এবং সম্প্রতি তাহার মোটরগাড়িতে চড়িয়াছি। আমি কিন্তু ব্যঙ্গবিদ্রূপে বিচলিত হইলাম না, বরং ব্যঙ্গকারীদের দলে ভিড়িয়া গেলাম। তাহাতে প্রতিপক্ষের অভাবে ব্যঙ্গবীরেরা একটু ভগ্নোদ্যম হইলেন বটে, কিন্তু পাঁয়তাড়া কষা একেবারে বন্ধ হইল না। বিশেষত সুশীলবাবু উদ্যোগী পুরুষ, তিনি মাঝে মাঝে বাহির হইতে নূতন খবর সংগ্রহ করিয়া আনিয়া স্তিমীয়মান জল্পনাকে চাঙ্গা করিয়া তুলিতেন।

একদিন তিনি অফিস হইতে ফিরিয়া আমার ঘরে আসিলেন, তক্তপোশের পাশে বসিয়া বলিলেন, 'আজ এক জবর খবর শুনলাম। ঊষা পাঠক, মানে ধীরাজবাবুর সহধর্মিণী এখন এক মাড়োয়ারী ছোকরার সঙ্গে ধর্মকর্ম করে বেড়াচ্ছেন। রাত্রে বাড়ি থাকেন না, মাড়োয়ারীর সঙ্গে হোটেলে রাত্রি যাপন করেন। মাড়োয়ারী ছোকরাটি নেহাত হেঁজিপেঁজি নয়, তার বাপ বুলিয়ন-মার্কেটের একজন দিক্পাল।'

বিবাহের সময় মাড়োয়ারী সাক্ষীকে দেখিয়াছিলাম মনে পড়িল; ইনি সম্ভবত তিনিই। কিন্তু সুশীলবাবুকে সে-কথা বলিয়া তাঁহার রসদ বাড়াইতে ইচ্ছা হইল না, হাসিয়া বলিলাম, 'তবেই দেখুন। ধীরাজের বৌকে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সবাই ভালবাসে। এমনকি মাড়োয়ারী পর্যন্ত।'

সুশীলবাবু বলিলেন, 'বলিহারি যাই! ছোঁড়াগুলো কি দেখে মজেছে তাও বুঝি না। দাঁত উঁচু, ঠোঁট মোটা—রূপের ধুচুনি!'

বলিলাম, 'রূপ দেখে কেউ মজে না, সুশীলবাবু। যা দেখে মজে তার খাস বিলিতি নাম হচ্ছে—'যৌন আবেদন'।'

'ঝ্যাঁটা মারি!' বলিয়া সুশীলবাবু উঠিয়া গেলেন।

এইভাবে দিন কাটিতে লাগিল। সুশীলবাবু মাঝে মাঝে বাহির হইতে খবর আনিয়া

শোনান; ঊষা পাঠক কোন্ পার্টিতে কত পেগ্ হুইস্কি টানিয়াছে, কাহার সহিত কত-বার নাচিয়াছে,—এই ধরনের খবর। কিন্তু যতই দিন কাটিতে লাগিল, ঊষা-ধীরাজের কেচ্ছা ততই বাসী হইয়া পড়িতে লাগিল। ধীরাজের ভাগ্যোদয়ও গা-সওয়া হইয়া গেল। ধীরাজ আমাকে তাহার বাসায় যাইতে বলিয়াছিল, আমি অবশ্য যাই নাই; সেও আর আসে নাই। ধীরাজ আমাদের জীবনের সংকীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। ভালোই হইয়াছে; ক্ষুদ্র কেরানী আমরা, বড়মানুষের সঙ্গে আমাদের কিসের সম্পর্ক!

অতঃপর প্রায় দুই বছর পরে আবার তাহার সহিত দেখা হইল। এবার আর মোটর-গাড়ি নাই; আমার অফিসের সামনে একটা ল্যাম্প্‌পোস্টে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম। তাহার চেহারার সেই গিল্‌টি-করা চাকচিক্য আর নাই; মুখে একটা শুষ্ক বিবর্ণ ভাব।

আমাকে দেখিয়া ফ্যাকাসে হাসিল, ল্যাম্প্‌পোস্ট হইতে মেরুদণ্ড বিযুক্ত করিয়া বলিল, 'কি রে, কেমন আছিস?'

আমি এদিক-ওদিক চাহিলাম, 'তোর মোটর কোথায়?'

'মোটর—' সে কথা পাল্‌টাইয়া বলিল, 'তুই বাসায় ফিরবি তো? বাসে যাবি, না হেঁটে?'

'হেঁটে। এখন বাসে চড়া অসাধ্য।'

'চল্ তবে, আমিও খানিকদূর তোর সঙ্গে হাঁটি।'

দুজনে পাশাপাশি চলিলাম। কথাবার্তা নাই। তাহার সহিত যেন মনের সংযোগ ছিঁড়িয়া গিয়াছে। শেষে সে নিজেই বলিল, 'মোটরটা বিক্রি করে ফেলতে হল। তিন মাস ধরে ক্রমাগত লোকসান চলেছে। বাজারের ধার শোধ করতে হবে তো।'

'নগদ টাকাও শেষ হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ। নগদ বেশী ছিল না। বৌ—' বলিয়া ধীরাজ থামিয়া গেল।

চকিতে তাহার পানে চাহিলাম, 'বৌ কোথায়?'

ধীরাজ কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, 'বৌ এখানে নেই। ব্যাঙ্কে জয়েন্ট-অ্যাকাউন্টে টাকা ছিল, সে সব টাকা নিয়ে গেছে।'

'কোথায় গেছে? কদ্দিন গেছে?'

'মাস-তিনেক হল। বোধহয় বোম্বাই গেছে।'

'বোধহয় বোম্বাই গেছে—তার মানে? তোকে কিছু বলে যায়নি?'

ধীরাজ চুপ করিয়া রহিল। বুঝিলাম বৌ টাকাকড়ি হস্তগত করিয়া পালাইয়াছে। হয়তো মাড়োয়ারী নাগর সঙ্গে আছে।

মনটা নিষ্ঠুর হইয়া উঠিল; বলিলাম, 'কার সঙ্গে পালালো? মাড়োয়ারীর সঙ্গে?'

ধীরাজ আমার পানে একটা গুপ্ত কটাক্ষ হানিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল; অস্পষ্ট-স্বরে বলিল, 'না, না, তুই ভুল শুনেছিস। মাড়োয়ারী নয়। বৌ ইন্সিওরেন্সের কাজে গেছে, বম্বেতে ওদের হেডঅফিস—'

'তুই এখন আছিস কোথায়?'

'বৌ-এর বাসাতেই আছি। বছরখানেকের ভাড়া আগাম দেওয়া ছিল, এখনো ছ'মাসের মেয়াদ আছে।'

'তাই সেখানেই পড়ে আছিস? তোর মত বেহায়া দেখিনি। তুই যদি মানুষ হতিস, বৌকে ডিভোর্স করতিস।' বলিয়া আমি সবেগে পা চালাইলাম। রাগে আমার গা জ্বালা করিতেছিল।

ধীরাজ কিন্তু আমার সঙ্গ ছাড়িল না, সেও পা চালাইল। কিছুদূর চলিবার পর হঠাৎ বলিল, 'আমাকে পাঁচ-শো টাকা ধার দিতে পারিস?'

প্রথমটা ধাঁধা লাগিয়া গিয়াছিল, তারপর হাসিয়া উঠিলাম, 'ও—এইজন্যেই আমাকে মনে পড়েছে! টাকা ধার চাই! তা আমি কত মাইনে পাই তা তো জানিস। পাঁচ-শো টাকা জলে ফেলে দেবার মত অবস্থা আমার নয়।'

সে বলিল, 'আমি বম্বে থেকে ফিরেই তোর টাকা শোধ করে দেব।'

'বুঝেছি, বম্বে যাওয়ার জন্যে টাকা দরকার। বৌকে ফিরিয়ে আনবি! তা—ভালো কথা। কিন্তু আমি টাকা ধার দিতে যাব কেন? আমার টাকা অত সস্তা নয়।'

আমি আরো জোরে পা চালাইলাম। এবার ধীরাজ আমার সঙ্গে তাল রাখিবার চেষ্টা করিল না, আস্তে আস্তে পিছাইয়া পড়িল। আমি কিছুদূর গিয়া ঘাড় ফিরাইলাম· সে ফুটপাথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া যেন কি চিন্তা করিতেছে। তারপর পিছু ফিরিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

বাসায় ফিরিতেই সুশীলবাবু ঘরে আসিয়া বসিলেন, 'আপনার বন্ধুপত্নীর নতুন খবর শুনেছেন?'

বলিলাম, 'শুনেছি, বম্বে পালিয়েছে। খবর কিন্তু নতুন নয়, তিন মাসের পুরনো।'

সুশীলবাবু একটু নিরাশ হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, 'তা যেন শুনেছেন। কিন্তু কার সঙ্গে পালিয়েছে তা জানেন কি?'

'না। কার সঙ্গে?'

সুশীলবাবু বিজয়দর্পিত কণ্ঠে বলিলেন, 'ওটাই তো আসল খবর। পালিয়েছে ধীরাজবাবুর ড্রাইভারের সঙ্গে!'

'ড্রাইভার! মানে মোটর-ড্রাইভার?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা ঝুঁটি-বাঁধা শিখ ছোঁড়া ছিল, তার সঙ্গে ভেগেছে। গলায় দড়ি—গলায় দড়ি! একটা বাঙালী জুটল না, শেষকালে শিখ! বাঙালীর মুখে চুনকালি পড়তে আর কী বাকি রইল?'

উষা যদি শিখের বদলে বাঙালীর সঙ্গে পালাইত তাহা হইলে কিরূপে বাঙালীর গৌরববৃদ্ধি হইত বুঝিলাম না। যাহোক, সুশীলবাবু উষ্ণ ক্ষোভ প্রকাশ করিতে করিতে প্রস্থান করিলে আমি ধীরাজের কথাই ভাবিতে লাগিলাম। যে-বৌ শিখ-ড্রাইভারের সঙ্গে কুলত্যাগ করিয়াছে, ধীরাজ তাহাকে খুঁজিতে যাইতেছে। যদি খুঁজিয়া পায় তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিবে। পতিব্রতা নারীর গল্প শুনিয়াছি, পঙ্গু স্বামীকে কাঁধে তুলিয়া বেশ্যালয়ে গিয়াছিলেন; কিন্তু পুরুষ সম্বন্ধে এরূপ রূপকথা শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়িতেছে না। ধীরাজ একটা নূতন আদর্শ সৃষ্টি করিল।

কিন্তু কেন? প্রেম? নিকষিত হেম? ইহাই যদি প্রেম হয় তবে ঝাড়ু মারি আমি প্রেমের মুখে।

মাস-তিনেক পরে সুশীলবাবুই আবার নূতন খবর আনিলেন। লোকটির সংবাদ সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা অসামান্য। কেন যে সংবাদপত্রের রিপোর্টার না হইয়া কেরানীগিরি করিতেছেন তাহা তিনিই জানেন। বলিলেন, 'ধীরাজবাবু শিখ-ড্রাইভারের হাত ছাড়িয়ে বৌকে ফিরিয়ে এনেছেন, মনের সুখে ঘরকন্না করছেন।'

'তাই নাকি! অবস্থা কেমন?'

'অবস্থা খুবই উন্নত। কিন্তু শিখ-ড্রাইভারকে বোধহয় ফিরিয়ে আনেননি, এখন নিজেই মোটর হাঁকাচ্ছেন। আবার নতুন গাড়ি, কাঁচপোকার মত রঙ!'

আমার বন্ধুর তালিকা হইতে ধীরাজের নাম কাটিয়া দিয়াছি। আমি যদি কোনোদিন বিবাহ করি, পাড়া-গাঁ হইতে একটা হাবাগোবা মেয়ে দেখিয়া বিবাহ করিব। তথাপি যদি সে কাহারও সহিত পলায়ন করে, তাহাকে ত্যাগ করিয়া আর একটা হাবাগোবা মেয়ে বিবাহ করিব। আমার জীবনাদর্শের সহিত ধীরাজের জীবনাদর্শের কোনো মিল নাই।

মাসখানেক পরে একদিন ধীরাজ-দম্পতিকে স্বচক্ষে দর্শন করিলাম। সিনেমা দেখিতে গিয়াছিলাম, ছবি শেষ হইলে ভিড়ের মধ্যে গুঁতাগুঁতি করিতে করিতে পথে বাহির হইয়াছি, দেখি ধীরাজ একটা কাঁচপোকা-রঙের চকচকে নূতন গাড়িতে স্টীয়ারিং-হুইলের পিছনে উঠিয়া বসিল, তাহার স্ত্রী পাশে বসিল। ধীরাজের চেহারা এবং বেশ-ভূষায় আবার লক্ষ্মীশ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাঁচপোকা-রঙের মোটর মোলায়েম সুরে হর্ন বাজাইয়া চলিয়া গেল। আমাকে বোধহয় দেখিতে পায় নাই।

তারপর আরো দেড় বছর কাটিয়া গিয়াছে, ধীরাজকে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি। সে বালিগঞ্জে বাড়ি কিনিল কিনা খবর রাখি নাই। সুশীলবাবুর অনুসন্ধিৎসাও আর নাই, মেসে ধীরাজকে লইয়া ঠাট্টা-তামাসাও থামিয়া গিয়াছে। একই কেচ্ছা লইয়া মানুষ কত-কাল ঘাঁটাঘাঁটি করিতে পারে? অনেক নূতন কেচ্ছা আসিয়া পুরাতনকে স্থানচ্যুত করিয়াছে।

একদিন রবিবার দুপুরবেলা দিবানিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়া দেখি ধীরাজ তক্ত-পোশের পাশে বসিয়া আছে। আবার সেই পুনর্মূষিক অবস্থা। বেশবাস অপরিচ্ছন্ন, চুলে তেল নাই, মুখ শুষ্ক।

কোনো কথা না বলিয়া উঠিয়া গেলাম। চোখেমুখে জল দিয়া আসিয়া তাহার পাশে বসিলাম।

'কী, আবার বৌ পালিয়েছে! এবার কার সঙ্গে পালাল? গুজরাতী না মাদ্রাজী?'

সে উত্তর দিল না, মুখখানা কেমনধারা করিয়া বসিয়া রহিল। বলিলাম, 'তা মুখ বুজে বসে থাকলে কি হবে, কোমর বেঁধে বেরিয়ে পড়্, বৌকে খুঁজে ঘরে নিয়ে আয়। আমি কিন্তু টাকা ধার দিতে পারব না।'

ধীরাজ আস্তে আস্তে বলিল, 'ঊষা কলকাতাতেই আছে...তাকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু এল না—' পকেট হইতে একটুকরা কাগজ বাহির করিয়া আমার হাতে দিল।

কাগজের ভাঁজ খুলিয়া দেখিলাম, তাহাতে মেয়েলি অক্ষরে লেখা আছে—'তোমার সঙ্গে আর আমার পোষাচ্ছে না, আমি আর একজনের সঙ্গে চললাম। তুমি এই চিঠির জোরে ডির্ভোস নিতে পার।—ঊষা'

চিঠি ফেরত দিয়া বলিলাম, 'তবে তো রাস্তা খোলা। কার সঙ্গে পালিয়েছে?'

ধীরাজ পূর্ববৎ ম্রিয়মাণ সুরে বলিল, 'শিরাজ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, তার ছেলের বাড়িতে আছে। বাড়ির ফটকে দারোয়ানের পাহারা, আমাকে ঢুকতে দিচ্ছে না।'

'তাহলে আবার বৌকে ফিরিয়ে আনতে চাস্! ধন্যি তুই। ধন্যি তোর ভালবাসা!'

সে ক্লান্তস্বরে বলিল, 'তুই সবই ভুল বুঝেছিস। ভালবাসা নয়। কিন্তু যাক। আমাকে পুরনো চাকরিটা আবার জুটিয়ে দিতে পারিস? টাকাকড়ি সব গেছে, বাসাটাও হপ্তাখানেকের মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে।'

বলিলাম, 'চাকরি খোয়ানো যত সহজ, জোটানো তত সহজ নয়। চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'দেখিস। বাক্স-বিছানা সব আছে তো? আচ্ছা, আজ উঠি, কাল দেখা করব।—ঊষা হড় পয়মন্ত ছিল।'

চাপা নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরাজ চলিয়া গেল।

পরদিন বিকালে অফিস হইতে বাহির হইয়া দেখি ধীরাজ ল্যাম্প্পোস্টে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমাকে দেখিয়া মুখে হাসি আনিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। ধীরাজের জীবন-প্রহসন যে এমন ট্র্যাজিক সুরে পরি-সমাপ্তি লাভ করিবে তাহা কল্পনা করিতে পারি নাই।

সবেমাত্র অফিস-আদালতের ছুটি হইয়াছে, রাস্তা দিয়া বাস ও মোটরের উদ্দাম স্রোত বহিয়া যাইতেছে। আমি ফুটপাথে তাহার পাশে গিয়া দাঁড়াইয়াছি, হঠাৎ রাস্তায় একটা বিশেষ রকমের মোটর-হর্নের আওয়াজ শুনিয়া ধীরাজ তীরবিদ্ধের ন্যায় ঘুরিয়া দাঁড়াইল। তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিলাম, একটা প্রকাণ্ড মোটর-গাড়ি মন্থর-গতিতে যাইতেছে; গাড়িতে বিলাতী বেশধারী মালিক-চালকের পাশে বসিয়া আছে ধীরাজের স্ত্রী ঊষা। তাহাদের গাড়ি আমাদের ছাড়াইয়া কিছুদূর গিয়াছে, ধীরাজ চীৎকার করিয়া ফুটপাথ হইতে রাস্তায় নামিয়া গাড়ির পিছন পিছন ছুটিল। তারপর—

বিকাল সাড়ে-পাঁচটার সময় সদর রাস্তা দিয়া পাগলের মত ছুটিলে যাহা অবশ্য-ম্ভাবী তাহাই ঘটিল।

একটা দ্রুতগামী বাস তাহাকে ধাক্কা দিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দিল, বিপরীত দিক হইতে অন্য একটা বাস তাহাকে মাড়াইয়া চলিয়া গেল।—

ধীরাজের মনস্তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করি। সে বলিয়াছিল—ভালবাসা নয়। তবে কী? সে বুদ্ধিমান এবং অলসপ্রকৃতির মানুষ ছিল। তাহার মনে টাকার ক্ষুধা ছিল, ভোগবিলাসের লোভ ছিল। বিবাহের পর তাহার কপাল খুলিয়াছিল; আবার বৌ পালাইবার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার দারুণ অবনতি হইয়াছিল। ধীরাজের বিশ্বাস জন্মিয়া-ছিল বৌ তাহার ভাগ্যদাত্রী; তাই সে প্রাণপণে নষ্ট-চরিত্র স্ত্রীকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ইহাই কি তাহার মনস্তত্ত্ব? এ ছাড়া আর কি হইতে পারে? কিংবা—হয়তো—

ঊষা পাঠক ধীরাজকে কেন বিবাহ করিয়াছিল সে-রহস্য আমি ভেদ করিতে পারি নাই। স্বৈরিণী নারীর মন বোঝা আমার কর্ম নয়। তবে ঊষা যে ভাগ্যবতী নারী তাহাতে সন্দেহ নাই। ধীরাজের জীবনবীমার পঞ্চাশ হাজার টাকা সে পাইয়াছে।

সুত-মিত-রমণী

গায়ে গায়ে দু'টি বাড়ি। একটিতে আমি বাস করি, অন্যটিতে গুরুচরণ। প্রায় কুড়ি বছর এইভাবে বাস করিয়াছি; প্রথম যখন ডাক্তারি পাস করিয়া প্র্যাক্টিস্ আরম্ভ করি তখন হইতে। তখন আমার বয়স ছিল ছাব্বিশ, গুরুচরণের হয়তো দু'এক বছর বেশী। গুরুচরণ সম্প্রতি বিবাহ করিয়াছিল, আমি তখনও অবিবাহিত। এই জেলা শহরটি

বাছিয়া লইয়া ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিলাম, সংকল্প ছিল প্র্যাকটিস্ না জমাইয়া বিবাহ করিব না।

আজ কয়েকদিন হইল গুরুচরণের মৃত্যু হইয়াছে। তাহার ফলে কিছু দায় আমার ঘাড়ে পড়িয়াছে; এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করাও হয়তো তাহারই একটা অংশ। বন্ধুকৃত্য নয়, কারণ এত বছর ধরিয়া পাশাপাশি বাস করার ফলে যে ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল তাহাকে বন্ধুত্ব বলিতে পারি না। কিন্তু মাঝে মাঝে সত্য কথা বলারও একটা দায় আছে, নহিলে আত্মসম্মান থাকে না।

গুরুচরণের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের অন্তরায় ছিল আমাদের প্রকৃতিগত বৈষম্য। চেহারা এবং চরিত্র, কোনও দিক দিয়াই আমাদের মধ্যে মিল ছিল না। তাহার চেহারা ছিল ঝড়ে পালক-ছেঁড়া ছাতারে পাখির মত; রোগা ন্যুব্জ শরীর, অস্থিসার মুখ, পুরু কাচের চশমার ভিতর দিয়া চোখদুটি মাছের চোখের মত দেখাইত। তাহার সরু পা' দুটি অত্যন্ত ক্ষিপ্রভাবে চলিত; মুখ দিয়া অত্যন্ত তাড়াতাড়ি কথা বাহির হইত। মোটের উপর তাহাকে দেখিয়া মনে হইত, সে সর্বদাই উত্তেজিত হইয়া আছে। আমি ডাক্তার তাই জানিতাম, তাহার শরীরে মারাত্মক রোগ না থাকিলেও স্নায়ু সুস্থ ছিল না।

প্রথম যেদিন বাসা ভাড়া লইয়া সদর দরজার পাশে নিজের নামযুক্ত ধাতুফলক লটকাইয়া দিলাম সেইদিন বৈকালে গুরুচরণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। আমি আসর সাজাইয়া প্রথম রোগীর প্রতীক্ষা করিতেছি, সে ক্ষিপ্রপদে প্রবেশ করিয়া বলিল—'আপনি ডাক্তার অবনী রায়? নতুন প্র্যাকটিস্ আরম্ভ করেছেন? বেশ বেশ, পাড়ায় একজন ডাক্তার পাওয়া গেল। নতুন এসেছেন, যদি কিছু দরকার হয় বলবেন। আমি পাশের বাড়িতে থাকি।' বলিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল।

প্রথম দর্শনে তাহাকে রোগী ভাবিয়া মনে যে আশ্বাস জাগিয়াছিল তাহা রহিল না বটে, কিন্তু একটি সজ্জন প্রতিবেশী পাওয়া গিয়াছে দেখিয়া কতকটা নিরুৎকণ্ঠ হইলাম। নবাগত অপরিচিত ডাক্তারকে প্রতিবেশীরা উপেক্ষাই করিয়া থাকে, অযাচিতভাবে সাদর সম্ভাষণ করে না।

ক্রমে পরিচয় হইল। গুরুচরণ স্থানীয় ম্যুনিসিপাল অফিসে চাকরি করে। উপরন্তু অবসরকালে বীমার দালালি করে। মন্দ রোজগার করে না। বছর দেড়েক আগে বিবাহ করিয়াছে। বৌএর নাম সুরমা। আকৃতি প্রকৃতিতে গুরুচরণের ঠিক বিপরীত। দেহে যৌবনশ্রী আছে, মুখে শান্ত মন্থর নিরুদ্বেগ ভাব। বয়স বোধকরি কুড়ি-একুশ, এখনও সন্তানাদি হয় নাই।

গুরুচরণ রোজই আমার ডিসপেন্সারিতে আসে, তড়বড় করিয়া দু'চার কথা বলিয়া চলিয়া যায়। একদিন সে একজন লোককে হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে লইয়া আসিয়া বলিল—'ডাক্তারবাবু, একে দেখুন তো, এর অসুখ করেছে।'

লোকটিকে পরীক্ষা করিলাম, ঔষধ দিলাম। দু'তিন দিনের মধ্যে রোগ সারিয়া গেল। পয়সা অবশ্য বেশী পাইলাম না, শুধু ঔষধের দাম। কিন্তু আমার প্র্যাকটিস্ আরম্ভ হইয়া গেল। ক্রমে দুটি একটি রোগী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আসিতে লাগিল।

তিন চার মাস পরে গুরুচরণ আমাকে তাহার বীমা কোম্পানীর ডাক্তার করিয়া লইল। আমার কিছু আয় বাড়িল, গুরুচরণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িল। সে সামান্য লোক ছিল, শহরে তাহার প্রভাব প্রতিপত্তি কিছুই ছিল না। লোকে তাহাক অবজ্ঞা মিশ্রিত কৌতুকের চক্ষে দেখিত; আড়ালে গুরুচরণ না বলিয়া সরুচরণ বলিত।। কিন্তু ঐহিক ব্যাপারে আমি তাহার কাছে ঋণী ছিলাম। একথা ভুলিতে পারি না। আর ভুলিতে পারি না একটা উন্মত্ত ঝড়ের রাত্রি। কিন্তু ঝড়ের রাত্রির কথা পরে বলিব।

দিন কাটিতেছে, পসার বাড়িতেছে। আগে নিজেই ঔষধ প্রস্তুত করিতাম, এখন

একজন কম্পাউণ্ডার রাখিয়াছি। আমার বাসাটি একতলা, পাঁচটি ঘর আছে; সামনের দুটি ঘর লইয়া ডাক্তারখানা, পিছনের তিনটি ঘর বাসস্থান। একজন পাচক-ভৃত্য গোড়া হইতেই ছিল।

একদিন সকালবেলা গুরুচরণ হন্তদন্ত হইয়া আসিল—'ডাক্তারবাবু, কাল রাত্রি থেকে সুরমার গা গরম হয়েছে, গায়ে ভীষণ ব্যথা। একবার দেখবেন?'

তৎক্ষণাৎ দেখিতে গেলাম। গুরুচরণের স্ত্রীকে পূর্বে বহুবার দেখিয়াছি। গুরুচরণের অফিস যাওয়ার সময় সে দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইত; সেই সময় আমার সঙ্গে কদাচ চোখাচোখি হইয়া গেলে তাহার চোখ সম্ভ্রমে নত হইত, খোঁপায় আটকানো মাথার আঁচলটা সিঁথি পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিত। কথা বলিবার উপলক্ষ্য কখনও হয় নাই। তখনকার দিনে মফঃস্বলে প্রতিবেশিনীর সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশার রেওয়াজ ছিল না, একটু আড়ষ্টতার ব্যবধান থাকিত।

সুরমা চাদর গায়ে দিয়া মুদিতচক্ষে শুইয়া ছিল. গুরুচরণ বলিল—'সুরমা, ডাক্তারবাবু এসেছেন।'

সুরমা চোখ মেলিল, তারপর আবার চোখ বুজিয়া জড়সড় হইয়া শুইল।

পরীক্ষা শেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'শরীরে কষ্ট কিছু আছে?'

একটু নীরব থাকিয়া সুরমা বলিল—'গায়ে ব্যথা।'

'আচ্ছা, আমি ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

রাস্তায় নামিয়া গুরুচরণ ব্যগ্রস্বরে বলিল—'ভয়ের কিছু নেই তো?'

বলিলাম—'ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে, ভয়ের কি থাকতে পারে? তবে দেখাশুনো করা দরকার। আপনি আজ আর অফিস যাবেন না।'

সে বলিল—'অফিসে একবারটি যাব, ছুটি নিয়ে চলে আসব। রান্নাবান্নাও তো আজ আমাকেই করতে হবে।'

বলিলাম—'তার দরকার নেই। আমার পদ্মলোচন আছে, সে দু'জনের রান্না রাঁধবে। রোগীর সাবু বার্লির ব্যবস্থা হবে। এখন আসুন, আপনাকে একটা গুলী খাইয়ে দিই। ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগটা ছোঁয়াচে।'

ডিসপেন্সারিতে গিয়া গুরুচরণকে একটি প্রতিষেধক বড়ি খাওয়াইলাম। সে বলিল—'আপনি সুরমার জন্যে ওষুধ তৈরি করে রাখুন, আমি দশ মিনিটের মধ্যে অফিস থেকে ফিরব। বিয়ে হয়ে পর্যন্ত ওর একদিনের জন্যেও শরীর খারাপ হয়নি, এই প্রথম। তাই একটু—' বলিতে বলিতে সে তাহার কাঠির মত পদযুগল অফিসের দিকে চালিত করিয়া দিল।

গুরুচরণ স্ত্রীকে ভালবাসিত, তাহার পরিচয় বহুবার বহুভাবে পাইয়াছি। কিন্তু ইহাতে বৈচিত্র্য কিছু নাই; যৌবনকালে নিজের স্ত্রীকে কে না ভালবাসে। তাহার পত্নীপ্রেম যৌবনের অবসানেও টিকিয়াছিল ইহাও বোধকরি খুব বড় কথা নয়। বরং তাহার পত্নীপ্রেম আমার কাছে তুচ্ছ হইয়া যায় যখন ভাবি তাহার পুত্রস্নেহের কথা। কিন্তু পুত্র এখনও আসে নাই; রাম না জন্মিতে রামায়ণ কথা আরম্ভ করিব না।

সুরমা কয়েকদিনের মধ্যে সারিয়া উঠিল। কিন্তু গুরুচরণের আশঙ্কা যায় না. সে বলিল—'ডাক্তার, ওকে একটা টনিক লিখে দিন, যাতে শিগ্‌গির চাঙ্গা হয়ে ওঠে।'

আমি হাসিয়া বলিলাম—'ওর টনিকের দরকার নেই। স্বাস্থ্য খুব ভাল, আপনিই চাঙ্গা হয়ে উঠবে। বরং আপনি যদি টনিক চান তো দিতে পারি।'

সে ব্যস্ত হইয়া উঠিল—'না না, আমার টনিক কি হবে। আমি দেখতে একটু রোগা বটে, কিন্তু রোগ নেই। মাঝে মাঝে হাঁপানিতে কষ্ট পাই, কিন্তু সে কিছু নয়। আমার পনরো হাজার ইন্সিওর আছে, যদিই ভালমন্দ কিছু হয় সুরমাকে রাস্তায় দাঁড়াতে হবে

না।—যাই, অফিসের বেলা হল। আপনি কিন্তু ওকে একটা ভাল টনিক লিখে দেবেন—'

তারপর সুরমা মাঝে মাঝে মাছ তরকারি রাঁধিয়া আমার জন্য পাঠাইয়া দেয়, কখনও নিজের হাতে মিষ্টান্ন তৈরি করিয়া পাঠায়। সে ভারি সুন্দর দরবেশ তৈরি করিতে পারে—

বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু এখনও অবস্থা অনুকূল নয়। শহরে যাঁহাদের সহিত পরিচয় হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঘটকালি আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু আমি এড়াইয়া যাইতেছি। আগে অর্থনৈতিক অবস্থার ভিৎ পাকা হোক, তারপর বিবাহ—

আমি প্র্যাকটিস্ আরম্ভ করার পর দেড় বছর কোন দিক্ দিয়া চলিয়া গেল। তারপর একদা রাত্রিকালে আসিল দুরন্ত ঝড়। ইহার উল্লেখ আগে করিয়াছি। মানুষের মনে ত্রাস জাগাইয়া, অনেক পুরানো বাড়ি ভূমিসাৎ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। আমার বাসাটা অক্ষত ছিল বটে কিন্তু গুরুচরণের রান্নাঘরের মটকা উড়িয়া গিয়াছিল।

ইহার পর বছর ঘুরিবার আগে গুরুচরণের জীবনে অপরূপের আবির্ভাব ঘটিল। সুরমা একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিল।

ছেলে পাইয়া গুরুচরণ পাগল হইয়া গেল। আনন্দে দিশহারা হইয়া সে যত্রতত্র নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল; তাহার জিহ্বা এবং পদদ্বয় আরও দ্রুত হইয়া উঠিল। রাস্তায় চেনা পরিচিত কাহারও সহিত দেখা হইলে পুত্রজন্মের সংবাদ তৎক্ষণাৎ দেওয়া চাই। ছেলে আঁতুড়ঘর হইতে বাহির হইতে না হইতে তাহাকে কোলে লইয়া আমার কাছে উপস্থিত—'দ্যাখো ডাক্তার, কী ছেলে! কী স্বাস্থ্য! আট পাউন্ড ওজন। ওর নাম রেখেছি পঙ্কজ। কেমন নাম?'

'খাসা নাম।'

'গণৎকারকে দিয়ে কুষ্ঠি করিয়েছি। লেখাপড়ায় ভাল হবে, দীর্ঘজীবী হবে, হাকিম হবে।'

'বেশ বেশ।'

ছেলের বয়স ছয় মাস, অর্থাৎ ঘাড় শক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গুরুচরণ তাহাকে ট্যাঁকে লইয়া সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। একদণ্ড ছেলেকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। যদি চাকরি যাইবার ভয় না থাকিত বোধকরি ছেলেকে লইয়া অফিস যাইত। সুরমার কিন্তু আবাহন বিসর্জন নাই, সুস্থ দেহ ও শান্ত নিরুদ্বেগ মন লইয়া সে যেমন ছিল তেমনিই রহিয়া গেল।

মনে আছে এই সময়, অর্থাৎ গুরুচরণের ছেলের বয়স যখন ছয়-সাত মাস তখন আমি বিবাহ করিয়াছিলাম। তার বছরখানেক পরে আমারও একটি পুত্রসন্তান জন্মিয়াছিল। বলা বাহুল্য, ছেলে লইয়া আমি মাতামাতি করি নাই। কিন্তু এটা আমার গার্হস্থ্য ইতিবৃত্ত নয়, গুরুচরণের কাহিনী, তাই নিজের কথা যথাসম্ভব বাদ দিয়া যাইব।

গুরুচরণের মনে অন্য চিন্তা নাই, মুখে অন্য কথা নাই, শুধু পঙ্কজ পঙ্কজ। পঙ্কজ একটু হাঁচিলে কি কাশিলে অমনি ডাক্তার। ছেলের স্বাস্থ্য ভাল, বেশ গোলগাল নধর, তাই ঔষধপত্র বেশী দিতে হয় না। গুরুচরণ আহ্লাদে আটখানা হইয়া ছেলেকে কখনও পিঠে কখনও কাঁধে লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। দেখিয়া আমারই যেন লজ্জা করে।

কিন্তু গুরুচরণের বাৎসল্য রসের ইতিহাস আগাগোড়া লিপিবদ্ধ করিতে গেলে মহাভারত হইয়া দাঁড়াইবে, তাহাতে কাজ নাই। পঙ্কজের যখন পাঁচ বছর বয়স তখন গুরুচরণ তাহাকে স্কুলে ভর্তি করিয়া দিল। ছেলে হাকিম হইবে, সুতরাং হাকিমকে গোড়াপত্তন একটু তাড়াতাড়ি করাই ভাল। ছেলেটা লেখাপড়ায় ভাল দাঁড়াইয়া গেল। তাহার স্বভাব কতকটা মায়ের মত; পড়াশুনায় অখণ্ড মনোনিবেশ; খেলা করে, তাও

ধীর শান্তভাবে।

এই সময় গুরুচরণের কিছু ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছিলাম। মনে হইয়াছিল, পুত্রকে স্কুলে পাঠাইবার পর পুত্রের প্রতি তাহার বাৎসল্যের উগ্রতা প্রশমিত হইয়াছে। সে তড়বড়ে ছিল বটে, কিন্তু খিটখিটে ছিল না; এই সময় তাহার মেজাজ খিটখিটে হইয়া উঠিয়াছিল। একদিন আমার সামনেই পঙ্কজের কান মলিয়া দিয়া গালে একটা চড় মারিল। তাছাড়া আমার সঙ্গেও যেন একটা দূরত্ব আসিয়া পড়িয়াছিল। আগে প্রত্যহ কারণে অকারণে আমার কাছে আসিত, এখন কাজ না থাকিলে আসে না। সম্প্রতি তাহার কাজের চাপ বাড়িয়াছিল; অফিসের কাজ তো ছিলই, বীমার কাজও খুব বাড়িয়া গিয়াছিল, তাই সকলের সহিত তাহার ব্যবহার খিটখিটে ও অসামাজিক হইয়া উঠিয়াছিল। অন্তত তখন আমার এইরূপই ধারণা হইয়াছিল।

কিন্তু এ ভাব তাহার বেশী দিন রহিল না। দুই তিন মাস পরেই দেখিলাম, সে ছেলেকে হাত ধরিয়া স্কুলে লইয়া যাইতেছে। একবার খেলা করিতে করিতে পঙ্কজের আঙুল কাটিয়া গিয়াছিল, গুরুচরণ উদ্বেগ ও উত্তেজনায় দিশাহারা হইয়া গেল। তাহার ব্যাকুলতা দেখিয়া হাসি পায় অথচ উপেক্ষা করা যায় না। শেষ পর্যন্ত ছেলেটাকে একটি এ. টি. এস. ইঞ্জেকশন পর্যন্ত দিতে হইল।

যেদিন পঙ্কজ স্কুলে প্রাইজ পাইল সেদিন গুরুচরণ পাড়ায় মিষ্টান্ন বিতরণ করিল। প্রায় নাচিতে নাচিতে আমার কাছে আসিয়া বলিল—'দেখেছ ডাক্তার, কী ছেলে! একেবারে হীরের টুকরো। এ ছেলে বাঁচবে তো?'

হাসিয়া বলিলাম—'তুমি যে রকম আদর দিচ্ছ, বাঁচা শক্ত।'

সে হঠাৎ লজ্জিত হইয়া পড়িল—'না না, আদর কোথায় দিই। এই তো সেদিন খুব বকেছি। সুরমাও খুব শাসন করে।—তা তুমি তোমার ছেলেকে স্কুলে দিচ্ছ কবে?'

'এবার দেব।'

অতঃপর দিন কাটিতেছে। পসার বাড়িয়াছে, সংসারও বাড়িয়াছে; দুটি ছেলে, একটি মেয়ে। গুরুচরণের কিন্তু সংসার বাড়ে নাই, ঐ এক ছেলে পঙ্কজ। পঙ্কজ কিণ্ডারগার্টেন উত্তীর্ণ হইয়া বড় স্কুলে ঢুকিয়াছে। আমার বড় ছেলে কিণ্ডারগার্টেনে ঢুকিয়াছে। আমরা যৌবনের সীমান্ত ছাড়াইয়া এখন প্রৌঢ়ত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছি।

এইবার গুরুচরণের পুত্রপ্রীতির শেষ দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব।

পঙ্কজের বয়স তখন বারো-তেরো বছর। পরীক্ষার দিন আগত। পরীক্ষায় সে প্রতি বছর প্রথম স্থান অধিকার করে, এবারও না করিবার কারণ নাই। আমার ছেলে কানুও বড় স্কুলে ভর্তি হইয়াছে, সেও পরীক্ষা দিবে। কানু একটু ভীরু প্রকৃতির ছেলে, তাই পরীক্ষার প্রথম দিন মোটরে করিয়া তাহাকে স্কুলে পৌঁছাইয়া দিতে গিয়াছিলাম।

স্কুলের প্রাঙ্গণে ছেলেদের ভিড়, দশ হইতে কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত নানা বয়সের ছাত্র চারিদিকে কিলবিল করিতেছে। তখনও ঘণ্টা বাজে নাই, কিন্তু বাজিতে বেশী দেরিও নাই।

স্কুলের ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই কানু বলিল—'বাবা, এবার তুমি যাও।'

তাহাকে সাহস দিবার জন্য পিঠ চাপড়াইয়া দিয়া বলিলাম—'আচ্ছা। কোথায় সীট পড়েছে খুঁজে পাবি তো?'

'পাব।' সে ছুটিয়া চলিয়া গিয়া অন্য ছেলেদের মধ্যে মিশিয়া গেল। আমি কিছুক্ষণ তাহাকে লক্ষ্য করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া ফিরিয়া চলিলাম।

এই সময় ফটকের পাশের দিক হইতে চাপা তর্জন শুনিয়া চমকিয়া ঘাড় ফিরাইয়া

দেখি, গুরুচরণ আর পঙ্কজ। গুরুচরণও পঙ্কজকে স্কুলে পেঁছাইতে আসিয়াছে। সে বাঁ হাতে পঙ্কজের একটা হাত ধরিয়াছে এবং ডান হাতের তর্জনী তুলিয়া বলিতেছে—'তোকে ফার্স্ট হতে হবে মনে রাখিস। ফার্স্ট হতে হবে—ফার্স্ট হতে হবে—'

পঙ্কজ লজ্জায় লাল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে; কয়েকটা স্কুলের ছেলে তাহাদের ঘিরিয়া দন্তবিকাশপূর্বক পঙ্কজের দুর্গতি দেখিতেছে।

গুরুচরণ বলিল—'ঘণ্টা বাজতে দেরি নেই। শিগ্‌গির আমার পায়ের ধুলো নে, তাহলে নিশ্চয় ফার্স্ট হবি। ফার্স্ট হওয়া চাই—'

পঙ্কজ নত হইয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ করিল। অমনি গুরুচরণ তাহার মাথায় হাত রাখিয়া বোধকরি ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিল। ছেলেরা অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

এই সময় পঙ্কজ আমাকে দেখিতে পাইয়া করুণ মিনতিভরা চক্ষে আবেদন জানাইল। আমার আর সহ্য হইল না; আমি গিয়া গুরুচরণের হাত ধরিয়া টানিলাম, প্রায় রূঢ়স্বরে বলিলাম—'এস এস, কী পাগলামি করছ!'

অতঃপর স্কুলে পরীক্ষারম্ভের ঘণ্টা বাজিল, পঙ্কজ দড়ি-ছেঁড়া বাছুরের মত পালাইল। আমি গুরুচরণকে লইয়া রাস্তায় বাহির হইলাম, তাহাকে আমার গাড়িতে তুলিয়া লইয়া গাড়ি চালাইয়া বাড়ির দিকে চলিলাম। গুরুচরণ তখনও উত্তেজনায় হাঁপাইতেছে। আমি বেশ বিরক্তভাবেই বলিলাম—'ছেলেটাকে সহপাঠীদের কাছে অপদস্থ করার দরকার আছে কি?'

গুরুচরণ ব্যাকুল স্বরে বলিল—'অপদস্থ! তুমি বুঝছ না ডাক্তার, ওকে ফার্স্ট হওয়াই চাই; নইলে সব গণ্ডগোল হয়ে যাবে। আমি ওর নামে দশ হাজার টাকার ইন্সিওর করেছি, ষোল বছর বয়স থেকে মাসে মাসে টাকা পাবে। নিজে না খেয়ে প্রিমিয়ামের টাকা দিয়েছি। আমি যদি মরে যাই, তবু ওর কলেজে পড়া আটকাবে না।' এই পর্যন্ত বলিয়া সে হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল।

তাহার কথা ও আচরণের মাথামুণ্ড নাই। কিন্তু ভালবাসা বস্তুটা চিরদিনই মাথামুণ্ডহীন।

মৃত্যু চিন্তা গুরুচরণের মনে লাগিয়া আছে। নিজের স্বাস্থ্যের উপর তাহার ভরসা ছিল না; বয়স যত বাড়িতেছিল ভরসা ততই কমিতেছিল। তাই সে স্ত্রীপুত্র সম্বন্ধে যথাশক্তি ব্যবস্থা করিয়াছিল।

তাহার মৃত্যুচিন্তা যে ভিত্তিহীন নয় তাহার প্রমাণ হইল উপরের ঘটনার বছর তিনেক পরে।। পঙ্কজ তখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়া মামার বাড়ি বেড়াইতে গিয়াছে। গুরুচরণের হাঁপানির ধাত, জীবনশক্তিও হ্রাস পাইয়াছিল। একদিন বৃষ্টিতে ভিজিয়া সে অসুখ বাধাইয়া বসিল; হাঁপানি নিউমোনিয়া ব্রঙ্ককাইটিস মিশিয়া এক বিশ্রী ব্যাপার।

কয়েকদিন চিকিৎসা করিয়া দেখিলাম গতিক ভাল নয়। আমি প্রত্যহ অবসর পাইলেই তাহাকে দেখিয়া আসি; একদিন সকালে তাহাকে দেখিয়া ফিরিতেছি, সুরমা সদর দরজা পর্যন্ত আমার সঙ্গে আসিল। আমি রাস্তায় নামিয়া ফিরিয়া দেখিলাম, তাহার নিরুদ্বেগ চোখে প্রশ্ন রহিয়াছে। আমি একটু ইতস্তত করিয়া বলিলাম—'পঙ্কজকে আনিয়ে নিলে ভাল হয়।'

সে আরও কিছুক্ষণ প্রশ্নভরা চোখে চাহিয়া রহিল, তারপর আমার কথার মর্মার্থ যেন বুঝিয়াছে এমনিভাবে একটু ঘাড় নাড়িল।

চলিয়া আসিলাম। সুরমার সহিত আমি কতবার কথা বলিয়াছি—হিসাব করিলে বোধহয় আঙ্গুলে গোনা যায়। আন্দাজ কুড়ি বছর পাশাপাশি বাড়িতে বাস করিতেছি। আমার বয়স এখন পঁয়তাল্লিশ, সুরমার বোধহয় চল্লিশের কাছাকাছি।

পরদিন গুরুচরণের অবস্থা একটু ভাল মনে হইল। শ্বাসকষ্ট আছে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম। পিঠের নীচে বালিশ দিয়া বিছানায় অর্ধশয়ান ছিল; আমাকে দেখিয়া বালিশের পাশ হইতে চশমা লইয়া পরিধান করিল, তারপর বিছানায় হাত চাপড়াইয়া আমাকে বসিতে ইঙ্গিত করিল। আমি বসিলাম। সুরমা দ্বারের কাছে কপাট ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আমি এবং গুরুচরণ যখন একত্র থাকি তখন সে কাছে আসে না, কথাও বলে না।

গুরুচরণ দু'চারবার দীর্ঘ নিশ্বাস টানিয়া ধীরে ধীরে কথা বলিল। কথা বলিবার তড়বড়ে ভঙ্গী আর নাই, কণ্ঠস্বর বসিয়া গিয়াছে; কঙ্কালসার মুখে হাসি আনিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া সে বলিল—'ডাক্তার, এ যাত্রা আব রক্ষে পাব না মনে হচ্ছে—'

আমি আশ্বাস দিতে গেলাম, সে হাত নাড়িয়া আমাকে নিবারণ করিল—'যদি আমার ভালমন্দ কিছু হয় তুমি খোকা আর সুরমাকে দেখো; ওরা যেন কষ্ট না পায়। তোমাকেই ওদের গার্জেন করে গেলাম।'

আমার বুকের ভিতরটা চমকিয়া উঠিল। সামলাইয়া লইয়া বলিলাম —'কি মুশ-কিল, এখন ওসব কথা কেন? আগে তুমি সেরে ওঠো—'

সে বলিল—'এখনি এসব কথা বলা দরকার। যদি না বাঁচি। টাকার জন্যে ভাবনা নেই, সে ব্যবস্থা আমি করেছি। তুমি শুধু ওদের অভিভাবক থাকবে।'

আমি অসহিষ্ণু হইয়া বলিলাম—'কিন্তু আমাকে কেন? পঙ্কজের মামারা রয়েছেন—'

সে বলিল—'মামাদের অনেক ছেলেপিলে, সেখানে খোকা আদর পাবে না। ওরা এই বাড়িতে থাকবে, তুমি ওদের দেখবে।'

'কিন্তু—' আমি তাহার মুখের পানে চোখ তুলিলাম। পুরু চশমার ভিতর দিয়া সে একদৃষ্টে আমার পানে চাহিয়া আছে। চোখাচোখি হইলে সে আস্তে আস্তে বলিল—'ডাক্তার, আমি জানি।'

তাহার অপলক চোখের সামনে আমাকে চক্ষু নত করিতে হইল। দ্বারের দিকে চাহিলাম। সুরমা শান্ত অবিচলিত মুখে দাঁড়াইয়া আছে, কেবল তাহার গণ্ড বহিয়া নিঃশব্দ অশ্রুর ধারা ঝরিয়া পড়িতেছে।

ষোল বছর পূর্বের একটা রাত্রির দৃশ্য চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। সেই অন্ধ ঝড়ের রাত্রি। সে রাত্রিতে সুরমার সহজসিদ্ধ শান্ত সংযমের বাঁধ হঠাৎ ভাঙিয়া গিয়াছিল।

সারাদিন দুঃসহ গরম গিয়াছে। আশা করিয়াছিলাম অপরাহ্নে কালবৈশাখী উঠিবে, কিন্তু উঠিল না। কাজকর্ম বিশেষ কিছু ছিল না, কম্পাউণ্ডার সন্ধ্যার পর চলিয়া গেল।

সাড়ে সাতটার সময় ভৃত্য পদ্মলোচন বলিল, সে সিনেমা দেখিতে যাইবে, ছুটি চাই। ছুটি দিলাম। আমার সংসারে পদ্মলোচন ছাড়া আর কেহ ছিল না, তখন আমি অবিবাহিত। পদ্মলোচন সাড়ে আটটার সময় আমার খাবার ঢাকা দিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল।

বাড়িতে আমি একা। ন'টার সময় সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া আমি আহারে বসিলাম।

আহার করিতে করিতে শুনিতে পাইলাম, এক পাল পাগলা হাতীর মত মড়মড় শব্দ করিয়া ঝড় আসিতেছে। আমি আহার শেষ করিয়া উঠিতে উঠিতে ঝড় আসিয়া আমার বাড়ির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, বাড়ির খোলা জানালাগুলো দড়াম দড়াম শব্দে আছাড় খাইতে লাগিল। ছুটিয়া গিয়া জানালাগুলো বন্ধ করিলাম।

ঝড়ের মাতন ক্রমশ বাড়িয়া চলিয়াছে। চারিদিকে রৈ-রৈ মচ্‌মচ্‌ মড়মড় শব্দ। 'ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে।' আমার বাড়িটা থাকিয়া থাকিয়া ভিৎ পর্যন্ত

দুলিয়া উঠিতেছে। বিদ্যুতের আলো কাচের গোলকের মধ্যে শিহরিতে লাগিল।

তারপর আসিল বৃষ্টি বজ্র বিদ্যুৎ। বজ্রের কড়কড় অট্টহাসি, বৃষ্টির ঝরঝর কান্না। আমি বাড়ির এঘর-ওঘর ঘুরিয়া বেড়াইতেছি; ভয় হইতেছে, বাড়িটা মাথার উপর ভাঙিয়া পড়িবে নাকি?

পরে আবহ মন্দিরের বিবরণে জানা গিয়াছিল, এমন দুরন্ত সাইক্লোন চল্লিশ বছরের মধ্যে আসে নাই। নব্বই মাইল বেগে বায়ু বহিয়াছিল, শহরের টিনের এবং খোলার চাল সমস্ত উড়াইয়া লইয়া গিয়াছিল, দশ-বারোজন লোক মারা পড়িয়াছিল। রাত্রি সাড়ে ন'টা হইতে সাড়ে তিনটা পর্যন্ত ঝড়ের এই প্রলয়ঙ্কর মাতামাতি চলিয়াছিল।

দশটা বাজিয়া গিয়াছে। দরজা জানালা সব বন্ধ, তবু খড়খড়ির ফাঁকে বাহিরের বাতাস আসিয়া বাড়িটাকে ঠান্ডা করিয়া দিয়াছে। আমি বিছানায় শুইয়া একটা ডাক্তারি বইএর পাতা উল্টাইতেছি, কিন্তু মন এবং কান বাহিরের দিকে পড়িয়া আছে।

এক ঝলক বিদ্যুৎ, সঙ্গে সঙ্গে বিকট বাজ পড়ার শব্দ। খুব কাছে কোথাও বাজ পড়িয়াছে। বিছানায় উঠিয়া বসিলাম।

বাজ পড়ার পর কিছুক্ষণ ঝড়ের শব্দ যেন নিস্তেজ হইয়া গেল। এই সময়—ঠক্ ঠক্ ঠক্। কে যেন আমার সদর দরজায় ধাক্কা দিতেছে।

এই ঝড়ের রাত্রে কে আসিল! রোগী? কিংবা পাড়ার কেহ জখম হইয়াছে! কান পাতিয়া রহিলাম। পদ্মলোচন কি ফিরিয়া আসিল? না, ঝড় না থামিলে সে ফিরিবে না—

আবার ঠক্ ঠক্ শব্দ। উঠিয়া গিয়া সন্তর্পণে হুড়কা খুলিলাম। কিন্তু বাতাসের ঠেলায় দরজা আমার হাত ছিনাইয়া সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। সেই সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করিল—সুরমা!

আমি প্রাণপণ শক্তিতে দরজা আবার রুদ্ধ করিয়া দিলাম। সুরমার দিকে ফিরিয়া দেখিলাম সে ভিজা কাপড়ে অসম্বৃত অবস্থায় দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে; চোখে ভয়ার্ত বিস্ফারিত দৃষ্টি। আমি স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিলাম, মুখ দিয়া বাহির হইল—'এ কি! ব্যাপার কি?'

তাহার ঠোঁট খুলিয়া গিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে বলিল—'রান্নাঘরের চালা উড়ে গেছে। তারপর দক্ষিণ দিকের নারকেল গাছে বাজ পড়ল। বাড়িতে আমি একা—'

'গুরুচরণ কোথায়?'

'সন্ধ্যের ট্রেনে কলকাতা গিয়েছে—'

এই সময় বজ্র আর একবার হুঙ্কার দিয়া উঠিল। সুরমা দু'হাতে কান ঢাকা দিল, তারপর বলিল—'পৃথিবী কি উল্টে যাবে?'

বলিলাম—'তুমি বড় ভয় পেয়েছ। এস, ওষুধ দিচ্ছি।'

ডাক্তারখানায় লইয়া গিয়া তাহাকে এক আউন্স ব্র্যান্ডি খাওয়াইয়া দিলাম। তারপর তাহাকে শয়নকক্ষে লইয়া গিয়া বলিলাম—'তুমি কিছুক্ষণ শুয়ে থাক, ভয় কেটে যাবে। আমি বাইরের ঘরে আছি।'

এই সময় হঠাৎ দপ করিয়া আলো নিভিয়া গেল। সুরমা আর্ত কাতরোক্তি করিয়া অন্ধকারে ছুটিয়া আসিয়া আমাকে খামচাইয়া ধরিল।...

ভগবান জানেন, দুরভিপ্রায় আমাদের কাহারও মনে ছিল না। যোগাযোগ দেখিয়া মনে হয় যেন দুইজন অতি সামান্য নরনারীর অযাচিত মিলন ঘটাইবার জন্য সে রাত্রে নিয়তি এমন বিপুল ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। কিন্তু সে যাক। নিয়তির অভিপ্রায় বুঝিবার চেষ্টা করিব না। এবং নিজের দুর্বলতার দায় নিয়তির ঘাড়ে চাপাইয়া সাধু সাজি-

বারও ইচ্ছা নাই।

সুরমাকেও আমি বিচার করিব না। চিরদিন তাহার যে শুদ্ধ-শান্ত রূপ দেখিয়াছি তাহা তাহার ছদ্মবেশ, একথা স্বীকার করি না। ইহাই তাহার প্রকৃত স্বরূপ। কিন্তু প্রকৃতির শান্ত নিরুদ্বেগ অন্তরে অলক্ষিতে যেমন ঝড়ের বাষ্প জমিয়া জমিয়া একদিন বিস্ফোরণের আকারে ফাটিয়া পড়ে, তেমনি মানুষের অন্তরেও যে অনুরূপ ব্যাপার ঘটে না তাহা কে বলিতে পারে।

সে রাত্রে ঝড় থামিবার পর রাত্রি সাড়ে তিনটার সময় সুরমা গৃহে ফিরিয়া গিয়াছিল। তারপর—তারপর—

পঙ্কজ আমার ছেলে। যেদিন তাহাকে প্রথম দেখিয়াছি সেইদিন হইতে জানি সে আমার ছেলে।

মৃত্যুশয্যায় শুইয়া গুরুচরণ হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া কথা বলিতেছে। আমি শয্যার পাশে বসিয়া শুনিতেছি। সুরমা দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে কাঁদিতেছে।

—'খোকার বয়স যখন পাঁচ বছর তখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম...সুরমাও অস্বীকার করেনি...কয়েক মাস বড় অশান্তিতে কেটেছিল...ভেবেছিলাম...ওদের ত্যাগ করব...কিন্তু ত্যাগ করতে গিয়ে দেখলাম খোকাকে ছেড়ে আমি মরে যাব।—সুরমা, খোকাকে আসতে লিখেছ? মরার আগে তাকে দেখতে পাব তো?...

এ কাহিনী কোথায় শেষ করিলে ভাল হয় জানি না। ইহার কি শেষ আছে? আমি যখন থাকিব না, সুরমা যখন থাকিবে না, হয়তো তখনও এ কাহিনীর রেশ চলিতে থাকিবে। সুতরাং এখানেই ছেদ টানা ভাল।

চলচ্চিত্র প্রবেশিকা

দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়লাম। আমি, আমার স্ত্রী, বড় শ্যালক নন্দু এবং ভৃত্য মহাবীর। নন্দু আর ইহজগতে নেই; সেদিন আমাদের অনিশ্চিত বিদেশ যাত্রার আরম্ভে সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। তাকে কৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ করছি।

যাত্রাপথটি কম নয়, মুঙ্গের থেকে বোম্বাই—১১০০ মাইল। আমাদের স্থির হয়েছিল থামতে থামতে যাব। এক দৌড়ে বোম্বাই যাওয়া কিছু নয়, তাজা অবস্থায়

বোম্বাই পেঁছুতে হবে।

দিনটা ছিল ২৪শে জুলাই ১৯৩৮। বিকেলবেলা বাবা এসে জামালপুর স্টেশন পর্যন্ত পেঁছে দিয়ে গেলেন। কয়েকজন বন্ধুও এসেছিলেন বিদায় দিতে। আমাদের যাত্রা হল শুরু।

আমার জীবনে একটা বৈচিত্র্য আছে; আমি জন্মেছি উত্তর প্রদেশের জৌনপুর শহরে, বড় হয়েছি বেহারের মুঙ্গের শহরে, লেখাপড়া করেছি কলকাতায়, কাজ করেছি বম্বেতে, এবং বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেছি পুণায়। নিখিল-ভারতীয় বাঙালী যদি কেউ থাকে সে আমি।

রাত্রিটা ট্রেনে কাটিয়ে পরদিন সকালবেলা এলাহাবাদে নামলাম। এলাহাবাদে আমার মামার বাড়ি। সেদিনটা এখানে বিশ্রাম করে রাত্রি দশটার সময় আবার ট্রেন ধরলাম। ইণ্টার ক্লাসে যাচ্ছি, কিন্তু তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ইণ্টার ক্লাসেও ভিড় থাকত না। দিব্যি ঘুমোতে ঘুমোতে চলেছি।

পরদিন সকালে আবার জব্বলপুরে নেমে পড়লাম। এখানে সারাদিন কাটিয়ে বিকেলবেলা বোম্বাই রওনা হব। জব্বলপুরে চেনাশোনা কেউ নেই। স্টেশনের ওয়েটিং রুমে রইলাম; দুপুরবেলা কেল্‌নারে খেলাম। মেঘলা আকাশ, মাঝে মাঝে বৃষ্টি নামছে। ইচ্ছে ছিল মর্মর-পাহাড় দেখে আসব, কিন্তু যাওয়া হল না।

বিকেল চারটের সময় বম্বে মেল এল। আমরা চড়ে বসলাম। এর পর আর কোথাও থামব না, পরদিন বেলা দশটার সময় একেবারে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস।

বম্বে মেল গম্‌গম্‌ করে ছুটেছে। অপরাহ্ণের আকাশে শ্রাবণের মেঘাড়ম্বর। বম্বে যতই এগিয়ে আসছে আমার মনও ততই উদ্বিগ্ন হচ্ছে। কোথায় যাচ্ছি? বম্বে শহরের কাউকে চিনি না। যারা চাকরি দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তারা কেমন লোক? তাদের সঙ্গে বনিবনাও হবে তো? জীবনে এই প্রথম চাকরি করছি, চাকরি করার ভাবভঙ্গী কিছুই জানি না। পারব তো?

বম্বের সিনেমা-কোম্পানিতে আমার চাকরি পাওয়া এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা। ১৯২৯ সালে সাহিত্য-সেবা আরম্ভ করি। তারপর আট-নয় বছর কেটে গেছে, কয়েকখানা বই বেরিয়েছে; মুঙ্গেরেই আছি। হঠাৎ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মশায়ের কাছ থেকে এক চিঠি পেলাম। দাশগুপ্ত মশায়র সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না; তিনি লিখেছেন তাঁর শ্যালক হিমাংশু রায় বম্বে টকীজ নামক ফিল্ম-প্রতিষ্ঠানের কর্তা, তিনি একজন গল্প-লেখক চান। দাশগুপ্ত মশায় জানতে চেয়েছেন আমি বম্বে গিয়ে ফিল্ম-কোম্পানিতে গল্প-লেখকের চাকরি নিতে রাজী আছি কিনা।

ফেরত ডাকে উত্তর দিলাম, আমি রাজী। তারপর দাশগুপ্ত মশায়ের দ্বিতীয় চিঠি পেলাম, আমি কলকাতায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারব কিনা। খুব পারব। দু'দিন বাদেই কলকাতা রওনা হলাম।

সংস্কৃত কলেজে গিয়ে দাশগুপ্ত মশায়ের সঙ্গে দেখা করলাম। প্রবীণ মোটাসোটা মানুষ, ক্রমাগত সিগারেট খান। প্রকাণ্ড টেবিলের দু'পাশে বসে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হল। পরে জানতে পেরেছিলাম, দাশগুপ্ত মশায় আরো দু'জন লেখককে ডেকেছিলেন। কিন্তু সে-কথা থাক।

যথাসময় খবর পাব এই আশ্বাস নিয়ে মুঙ্গেরে ফিরে এলাম। কয়েকদিন পরে বম্বে থেকে চিঠি এল, হিমাংশুবাবু লিখেছেন—আপনাকে কোম্পানির গল্প-লেখক নিযুক্ত করা হল, যত শীঘ্র পারেন চলে আসুন।

সুতরাং দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়লাম।

২৭শে জুলাই বেলা দশটার সময় যখন ভি টি পেঁছুলাম তখন অবিশ্রাম বৃষ্টি

পড়ছে। বোম্বাই বৃষ্টির এই প্রথম নমুনা। স্টেশনের বাইরে গিয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গেল বম্বে টকীজের স্টেশন-ওয়াগন আসেনি।

খাস বোম্বাই থেকে ১৮।১৯ মাইল উত্তরে মালাড্ নামক স্থান, সেখানে বম্বে টকীজের আস্তানা। চিঠি-পত্রে ব্যবস্থা হয়েছিল, স্টুডিওর গাড়ি এসে আমাদের স্টেশন থেকে তুলে নিয়ে যাবে। গাড়ি আসেনি দেখে দমে গেলাম। বম্বে থেকে মালাডে যাবার মোটর রোড আছে, আবার লোকাল ট্রেনেও যাওয়া যায়। কিন্তু এত খবর তখন জানা ছিল না।

অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে স্টুডিওতে ফোন করলাম। হিমাংশু রায়ের সেক্রেটারি ফোন ধরল। আমি পেঁছে গেছি শুনে সে বলল, 'মালাড্ স্টেশনে গাড়ি পাঠান হয়েছে; যাহোক, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ভি টি-তে গাড়ি যাচ্ছে, আপনারা অপেক্ষা করুন।'

অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম। ওয়েটিং রুমে স্নান সেরে স্টেশনের তেতলার হোটেলে গিয়ে খেয়ে নিলাম। কখন মালাডে পেঁছুব ঠিক নেই।

যথাসময় স্টেশন-ওয়াগন এল। আমরা লটবহর নিয়ে উঠে বসলাম। স্টেশন-ওয়াগন ফিরে চলল। এই আমার দূর যাত্রার শেষ ধাপ।

মালাড্ জায়গাটাকে তখন বড় গ্রাম কিংবা ছোট শহর বলা চলত। একটি মাত্র বড় রাস্তা, আর সব শাখা-প্রশাখা। বেশ নির্জন। আমাদের গাড়ি বৃষ্টি-ভেজা রাস্তা দিয়ে বম্বে টকীজের পাঁচিল-ঘেরা হাতায় প্রবেশ করল। চারিদিকে গাছপালা ফুলের বাগান, মাঝখানে দোতলা অফিস-বাড়ি। তার পাশে কিছু দূরে করোগেট্ দেওয়া প্রকাণ্ড গুদাম-ঘরের মত স্টুডিও। এই গুদাম-ঘর থেকে 'অছুৎকন্যা', 'জীবনপ্রভাত' প্রভৃতি ছবি বেরিয়েছে।

লোকজন কিন্তু বেশী নেই। অফিসের সামনে গাড়ি থেকে নেমে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি, দেখি স্টুডিওর দিক থেকে প্যাণ্টুলুন ও শার্ট পরা একটি ভদ্রলোক আসছেন। চেহারা অতি সুন্দর, বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ। কাছে এসে হাসিমুখে নিজের পরিচয় দিলেন—হিমাংশু রায়।

এই পরম প্রাণবন্ত মানুষটিকে দেখে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারলাম না যে, এঁর আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। আর দু'-বছরও বাঁচবেন না।

সমাদর করে নিজের অফিস-ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। ভারি চমৎকার কথা বলেন। আমাদের জন্যে কয়েকটি বাড়ি দেখে রেখেছেন, আমাদের যেটাতে ইচ্ছা থাকব। আমরা বেশীক্ষণ বসলাম না, বাড়ি দেখার জন্যে উঠে পড়লাম; কারণ কাজের কথা পরেও হতে পারবে, সর্বাগ্রে একটা আস্তানা চাই। হিমাংশুবাবু বললেন, 'আজ আমাদের রাত্তিরে শুটিং; ন'টা থেকে আরম্ভ হবে। আপনারা বাসা ঠিক করে বসুন, সন্ধ্যের পর যদি ইচ্ছে হয় স্টুডিওতে আসবেন। শুটিং দেখাব।'

বম্বে টকীজে তখন 'বচন' নামে একটি ফিল্মের শুটিং চলছিল। কিন্তু তার কথা পরে হবে।

যে গাড়িতে এসেছিলাম সেই গাড়িতে চড়ে বাড়ি দেখতে বেরুলাম। সঙ্গে চলল হিমাংশুবাবুর সেক্রেটারি পেরেরা। গোয়ানিজ ক্রিশ্চান, বছর পঁচিশেক বয়স হবে, ভারি কাজের ছেলে।

প্রথম যে বাড়িটা দেখলাম সেটা পছন্দ হল না। ভিত নীচু, মেঝে স্যাঁৎসেঁতে, মাত্র দুটি ঘর। পেরেরাকে বললাম, 'এর চেয়ে ভাল যদি কিছু থাকে, দেখাও।'

পেরেরা এবার আমাদের যে বাড়িতে নিয়ে গেল, সেটি একটি ছোটখাটো প্রাসাদ। বাড়ির মালিক বিখ্যাত ব্যারিস্টার মিস্টার দপ্তরী আগে এখানে থাকতেন, এখন খাস বম্বেতে উঠে গেছেন। আসবাব দিয়ে সাজানো বাড়ি, গোটা পাঁচেক ঘর, রান্নাঘর,

চাকরের ঘর; বাগান দিয়ে ঘেরা বাড়ি। দেখেই লোভে পড়ে গেলাম। ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলাম, 'ভাড়া কত?'

পেরেরা বলল, 'পঞ্চাশ টাকা।'

আর দ্বিরুক্তি করলাম না, মোটঘাট নামিয়ে বাড়ি দখল করে বসলাম। পেরেরা চলে গেল, আধ ঘণ্টা পরে চাল ডাল ময়দা মাছ মাংস তরকারি নিয়ে এল। বলল, 'মিস্টার রায় পাঠালেন, আপনাদের কাল দুপুর পর্যন্ত চলে যাবে। তারপর আপনারা নিজের ব্যবস্থা করে নেবেন। আজ রাত্রে শুটিং দেখতে যাবেন কি? যদি যান গাড়ি পাঠাব।'

বললাম, 'যাব। আটটার সময় গাড়ি পাঠিও।'

পেরেরা চলে গেল। বেলা তখন চারটে, সারাদিন পরে বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে। গৃহিণী মহাবীরের সঙ্গে সংসার পাততে লেগে গেলেন। আমি আর নন্দু মুখোমুখি বসে সিগারেট টানতে লাগলাম। চাকরি করতে এসেছি, সুদূর বিদেশে পদার্পণ করেই এমন আদর-যত্ন পাব কল্পনা করিনি। হিমাংশুবাবুর প্রতি মনটা কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল; তিনি শুধু খ্যাতিমান চিত্র-প্রণেতা নন, অতি হৃদয়বান ব্যক্তি।

নন্দু আমার মনের কথার প্রতিধ্বনি করে বলল, 'আমাদের যাত্রাটা ভালই হয়েছে মনে হয়।'

আটটার সময় গাড়ি এল। আমরা খেয়ে-দেয়ে তৈরি ছিলাম, পাঁচ মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম। বাড়ি থেকে স্টুডিও আন্দাজ আধ মাইল দূরে। যেতে যেতে মনটা বেশ উৎসুক হয়ে উঠল। সিনেমার শুটিং আগে কখনো দেখিনি।

স্টুডিওর হাতার মধ্যে চারিদিকে বড় বড় আলো জ্বলছে, অনেক লোক রঙ-বেরঙের কাপড় পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা গাড়ি থেকে নামতেই পেরেরা এসে দাঁড়াল, বলল, 'মিস্টার রায় মিউজিক-রুমে আছেন, চলুন আপনাকে নিয়ে যাই।'

অফিস-বাড়ি থেকে মিউজিক-রুম খানিকটা দূরে, হাতার এক কোণে। এখানকার অধিষ্ঠাত্রী হচ্ছেন মিউজিক-ডিরেক্টর সরস্বতী দেবী। তিনি জাতে পার্সী ছিলেন, সিনেমার খাতিরে হিন্দু নাম নিয়েছিলেন। সে-রাত্রে তাঁকে দেখিনি, পরে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।

মিউজিক-রুমে আজ মিউজিক নেই; হিমাংশু রায় টেবিল পেতে সস্ত্রীক খেতে বসেছিলেন, আমাদের দেখে তাড়াতাড়ি উঠে এলেন। মহিলাটির পরিচয় দিলেন, 'ইনি আমার স্ত্রী—দেবিকারাণী।'

দেবিকারাণীকে আগে কয়েকবার চলচ্চিত্রে দেখেছি, এখন সশরীরে দেখলাম। তখনকার দিনের ভারতীয় সিনেমা-রাজ্যের একচ্ছত্রী সম্রাজ্ঞী। ছোটখাটো মানুষটি, মুখে-চোখে সাবলীল লাবণ্য, বাংলা কথা একটু থেমে থেমে বলেন। ইনি বাংলাদেশের বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারের মেয়ে, প্রমথ চৌধুরী এ'র সাক্ষাৎ কাকা ছিলেন। এ'র শৈশবকাল বিলেতে কেটেছিল। তবু বাংলা মন্দ বলেন না, হিন্দীও শিখেছেন। হিন্দী-বাংলা-ইংরেজী মিশিয়ে বেশ কাজ চালিয়ে নেন।

আমার গৃহিণীর সঙ্গে অবিলম্বে দেবিকারাণীর ভাব হয়ে গেল। সে ভাব এখনও অটুট আছে। দুজনের বয়স প্রায় সমান। তারপর ছাব্বিশ বছর কেটে গেছে, দেবিকারাণীর জীবনে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, এ'দের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ আর হয় না। তবু আমার গৃহিণী দেবিকারাণীর প্রতি তেমনি প্রীতিমতী। অন্য পক্ষের কথা জানি না।

স্টুডিও থেকে ডাক এল—সেট তৈরি। হিমাংশুবাবু আমাদের নিয়ে স্টুডিওর বিরাট ছাউনির দিকে চললেন। আমি জীবনে প্রথম সিনেমা-স্টুডিওর আলোকোজ্জ্বল গহ্বরে প্রবেশ করলাম।

সামনেই বিরাট একটি দুর্গ।

'বচন' ছবির কাহিনী সেকালের রাজপুতদের নিয়ে। এই দুর্গটি গল্পের নায়কের দুর্গ, শত্রুপক্ষ এসে দুর্গের সিংহদ্বার ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করছে—আজ সেই দৃশ্য তোলা হবে।

নকল কেল্লা বটে কিন্তু চোখে দেখে নকল বোঝা যায় না, আঙুল দিয়ে টিপলে বোঝা যায় পাথর নয়, ক্যাম্বিসের ওপর রঙ চড়ানো।

স্টুডিওর মধ্যে আরও কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় হল। ফ্রান্জ্ অস্টেন নামে এক-জন জার্মান ছিলেন বম্বে টকীজের চিত্র-পরিচালক, কোম্পানির গোড়াপত্তন থেকে ইনিই সব ছবি পরিচালনা করেছিলেন। বেঁটে গোলগাল বয়স্থ লোক, ভাল ইংরেজি বলতে পারতেন না, বুঝতেন আরও কম। কিন্তু অতি উচ্চাঙ্গের চিত্র-পরিচালক ছিলেন। তিনি প্রবল বেগে আমার সঙ্গে শেকহ্যান্ড করে জার্মান সুরে গলার মধ্যে ঘড়ঘড় করে যা বললেন তার অধিকাংশই ধরতে পারলাম না। সৌজন্য দেখিয়ে বললাম, 'প্লিজড্ টু মীট ইউ।'

আরও দু'জন জার্মান তখন বম্বে টকীজে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজনের নাম ছিল উইরশিঙ। ইনি ছিলেন স্টুডিওর সর্দার ক্যামেরাম্যান। হিমাংশু রায় তাঁকে বীর সিং বলে ডাকতেন। অন্য লোকটির নাম ভুলে গেছি, কারণ আমি যাবার কিছুদিন পরেই তিনি কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যান।

বম্বে টকীজে হিমাংশু রায় ও দেবিকারাণী ছাড়া অন্য বাঙালীও আছে দেখে চমৎকৃত হলাম। সে-রাত্রে একজনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তার নাম অশোককুমার। অশোক যে বাঙালী তা তখনও জানি না। সে রাজপুত যুবকের সাজপোশাক পরে সামনে এসে দাঁড়াল, হিমাংশু রায় পরিচয় করিয়ে দিলেন। ছিপছিপে গড়ন, সুন্দর মুখ। ক্রমশ জানতে পেরেছিলাম তার স্বভাবটি চেহারার মতই মধুর।

ন'টা বাজল। শুটিং আরম্ভ হল। সারারাত চলবে। সিনেমায় দিবারাত্রি নেই, কৃত্রিম আলোতে ছবি তোলা হয়, একসঙ্গে দেড়শো-দুশো কিলোওয়াটের আলো জ্বলে, রাতকে দিন করে তোলে। আমরা সাড়ে দশটা পর্যন্ত শুটিং দেখে বাড়ি ফিরে এলাম।

দিন দশেক পরে নন্দু আমাদের ঘর-বসত করে দিয়ে মুঙ্গেরে ফিরে গেল। বিরাট বাড়িতে রয়ে গেলাম আমি, গৃহিণী এবং মহাবীর।

মহাবীর আমাদের মুঙ্গেরের বাড়ির পুরনো চাকর। বাবা তাকে মোটা চাকর বলতেন, অর্থাৎ মোটা কাজের চাকর। বাড়িতে সে গরুর জাবনা কাটত, ঘুঁটে দিত, শিলে মশলা বাটত। এখানে এসে সে একাধারে সরু-মোটা চাকর হয়ে দাঁড়াল; বাড়ির যাবতীয় কাজ সে-ই করে, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ। গিন্নী কেবল রান্না করেন।

একদিন মহাবীরের একটি নতুন প্রতিভার পরিচয় পেয়ে চমকে উঠলাম। বিকেল-বেলা বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, সন্ধ্যের পর ফিরে এসে দেখি রান্নাঘরে গিন্নী রান্না করছেন, আর মহাবীর দোরগোড়ায় বসে তাঁকে রূপকথা শোনাচ্ছে। মহাবীরের গল্প বলার ভঙ্গী ভাল, স্টাইল আছে। মনে মনে শঙ্কিত হলাম। একই বাড়িতে একজন গল্প-লেখক এবং একজন গল্প-কথকের সহাবস্থান শান্তিপ্রদ না হতে পারে। কোন্ দিন হয়তো মহাবীর আমার গল্পের ভুল ধরতে আরম্ভ করে দেবে।

ইতিমধ্যে আরো অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। বম্বে টকীজ তখন ছিল সর্ব জাতির জগন্নাথ-ক্ষেত্র; ইংরেজ-জার্মান-বাঙালী-মাদ্রাজী-গুজরাতী-মারাঠী-পাঞ্জাবী-পার্সী, কেউ বাদ পড়েনি। ইংরেজ ছিলেন স্যর রিচার্ড টেম্পল্, ইনি বম্বে টকীজ কোম্পানীর বোর্ড অফ্ ডিরেক্টর্সের একজন সদস্য, স্টুডিওর অফিস-বাড়ির দোতলায় থাকতেন। আমি যখন তাঁকে দেখলাম তখন তাঁর বয়স ষাটের ওপর। এঁর বাবা এক সময় বাংলাদেশের লেফটেনান্ট্ গভর্নর ছিলেন। কিন্তু স্যর রিচার্ডের মেজাজ

মোটেই ব্যুরোক্র্যাটের মত নয়, অত্যন্ত সরল সাদাসিধে প্রকৃতির মানুষ। একেবারে মাটির মানুষ। সম্প্রতি কাগজে দেখলাম, বিলেতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। আমার প্রতি এবং আমার স্ত্রীর প্রতি তিনি অত্যন্ত স্নেহশীল হয়েছিলেন, প্রায়ই আমাদের বাড়িতে গল্প করতে আসতেন। মনে হচ্ছে যেন সেদিনের কথা।

আরো কয়েকজন বাঙালীর সঙ্গে পরিচয় হল, সকলেই বম্বে টকীজে কাজ করে। শশধর মুখুজ্জে ছিল স্টুডিওর দু'-নম্বর সাউন্ড-রেকর্ডিস্ট, সে আবার অশোকের ভগিনীপতি। জ্ঞান মুখুজ্জে কাজ করত ল্যাবরেটরিতে। পরবর্তীকালে যখন হিমাংশু রায়ের মৃত্যুর পর বম্বে টকীজে ভাঙন ধরল, তখন এরা দু'জনেই চিত্র-পরিচালক হয়েছিল। এই ভাঙা-গড়ার ইতিহাস বড় পঙ্কিল, তাই বাদ দিয়ে গেলাম।

একটি মেয়ের সঙ্গে জানাশোনা হল; হিমাংশুবাবুর ছোট বোন, নাম লীলু। অবিবাহিতা মেয়ে, বম্বের আর্ট স্কুলে পড়ে; বাংলা সাহিত্যের খবর রাখে। হিমাংশুবাবু এবং দেবিকারাণী বাংলা সাহিত্যের খবর রাখতেন না, লীলুই যোগাযোগ ঘটিয়েছিল। মেয়েটি একটু ভাবপ্রবণ, সাহিত্য ও শিল্পকলা নিয়ে মেতে থাকত।

হিমাংশুবাবু আমাকে ছাড়পত্র দিয়েছিলেন, নিয়মিত অফিসে আসবার দরকার নেই, যখন ইচ্ছা আসব। বাড়িতেই কাজ করব, স্টুডিওর গণ্ডগোল থেকে দূরে থাকলেই মাথার কাজ ভাল হবে।

তবু রোজ সকালের দিকে একবার স্টুডিও যাই। হিমাংশুবাবুর অফিসে বসে গল্প করি, শুটিং থাকলে শুটিং দেখি। দেখে দেখে চিত্রের মাধ্যমে কাহিনী বলার শৈলী অনেকটা আয়ত্ত করলাম। বন্ধুবর বীরেন ভদ্র চিত্রনাট্য রচনা সম্বন্ধে একটি ইংরেজি বই দিয়েছিলেন—দি ঘোস্ট গোজ ওয়েস্ট; বইখানি আমার খুব কাজে লেগেছিল, তা থেকে অনেক কিছু শিখেছিলাম।

যাহোক, চিত্র-কাহিনী রচনার কৌশল তো মোটামুটি আয়ত্ত করলাম, এখন ভাবনা হল গল্প লিখব কোন্ ভাষায়। বাংলা লিখলে এখানে কেউ বুঝবে না, অন্য লোক তো দূরের কথা, বাঙালীদের কাছেও বাংলাভাষা মাতৃভাষা নয়, বিমাতৃভাষা। হিন্দীতে লেখা আমার সাধ্যাতীত। একমাত্র উপায় ইংরেজি। যদিও ইংরেজি ভাষায় আমি মহাপণ্ডিত নই, তবু মনের কথা যোগেযাগে প্রকাশ করতে পারব। হাজার হোক, অজস্র ইংরেজি গল্পের বই পড়েছি। গল্প লেখার ভঙ্গিটাও রপ্ত আছে। ভাষা যদি উৎকৃষ্ট নাও হয়, কাজ চালিয়ে নেব। যারা পড়বে তারাও তো ইংরেজিতে আমার মতই পণ্ডিত।

হিমাংশুবাবুর অফিসে গিয়ে বললাম, 'ইংরেজিতে গল্প লিখব ঠিক করেছি।' তিনি বললেন, 'তাহলে তো ভালই হয়। নিরঞ্জন পালও ইংরেজিতে লিখতেন।'

নিরঞ্জন পাল ছিলেন বম্বে টকীজের সাবেক গল্প-লেখক, অচ্ছুৎকন্যা জীবনপ্রভাত প্রভৃতি তাঁরই লেখা। হিমাংশু রায়ের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় তিনি বম্বে টকীজের কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি কিছুদিন আগে মারা গেছেন, তাঁর ছেলে কলিন পাল এখনো সিনেমার সঙ্গে জড়িত আছে।

আমি মিঃ রায়কে বললাম, 'আমি চিত্রনাট্য লেখার জন্যে তৈরি হয়েছি, কী গল্প লিখব বলুন।'

নিজের ইচ্ছামত গল্প লিখলে চলবে না। যিনি ছবি করবেন তাঁর মনের মত হওয়া চাই।

মিঃ রায় বললেন, "বচন' শেষ হতে মাসখানেক দেরি আছে। এর মধ্যে আপনি গল্প শেষ করতে পারবেন?'

বললাম, 'পারব। কিন্তু কোন ধরনের গল্প আপনি চান সেটা জানা দরকার।'

তিনি বললেন, 'আপনি দু'চারটে গল্প আমাকে শোনান, তার মধ্যে থেকে যেটা

পছন্দ হবে আমি বেছে নেব।'

বললাম, 'বেশ। কাল আমি আপনাকে কয়েকটা গল্পের আইডিয়া শোনাব।'

সেদিন বিকেলবেলা লীলু আমাদের বাড়িতে এল। বলল, 'দাদার কাছে শুনলাম, আপনি গল্প লেখার জন্যে তৈরি হয়েছেন। তা 'বিষের ধোঁয়া'র গল্পটাকে চিত্রনাট্য করুন না।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, "বিষের ধোঁয়া'! কিন্তু তাতে তো ছুরি-ছোরা-গোলা-গুলি-নারীহরণ এসব কিছুই নেই।'

লীলু বলল, 'তা হোক। আপনি লিখুন। নতুন জিনিস হবে। আমি দাদাকে গল্প শুনিয়েছি। তাঁর ভালই লেগেছে।'

লীলুর দেখলাম খুবই উৎসাহ, কিন্তু আমার মনটা সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে রইল। নিরামিষ গার্হস্থ্য উপন্যাস কি অ-বাঙালীদের ভাল লাগবে?

পরদিন অফিসে মিঃ রায়কে আমার সংশয়ের কথা বললাম। তিনি বেশী উৎসাহ দেখালেন না। নিরুৎসাহও করলেন না, বললেন, 'আপনি লিখতে আরম্ভ করে দিন, তারপর দেখা যাবে।'

বিকেলবেলা পেরেরা একটা টাইপ-রাইটার, রাশীকৃত ছাপার কাগজ ও কার্বন পেপার বাড়িতে পেঁৗছে দিয়ে গেল।

সুতরাং তোড়জোড় করে লেখা আরম্ভ করে দিলাম, একেবারে ছাপার অক্ষরে, টাইপ-রাইটার চালানোর অভ্যাস আগে থাকতেই ছিল। মনে মনে হিসেব করে নিলাম, রোজ যদি তিন পাতা লিখি তাহলে এক মাসে সীনেরিও শেষ করতে পারব।

এক মাসের মাথায় সীনেরিও শেষ হল। ওদিকে 'বচন'-এর শুটিংও শেষ হয়েছে, শিগ্‌গিরই রিলিজ হবে। মিঃ রায় তাই নিয়ে খুব ব্যস্ত। আমি তাঁকে বললাম, 'লেখা শেষ করেছি। কবে শুনবেন বলুন?'

তিনি বললেন, 'এখন নানা ঝামেলার মধ্যে রয়েছি, একটু ফুরসৎ পেলেই আপনাকে খবর দেব।'

পরদিন দুপুরবেলা পেরেরা এসে খবর দিয়ে গেল, মিঃ রায় তিনটের সময় গল্প শুনতে বসবেন, আমি যেন ঠিক সময় স্টুডিওতে যাই। পৌনে তিনটের সময় গাড়ি আসবে।

যথাসময়ে গল্পের ফাইল নিয়ে উপস্থিত হলাম। দেখলাম, শ্রোতা শুধু মিঃ রায় নন, সেই সঙ্গে আর একজন আছেন—যমুনাস্বরূপ কশ্যপ।

যমুনাস্বরূপ কশ্যপের নাম সম্প্রতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, বিলিতি ছবি নাইন আওয়ারস টু রাম-এ মহাত্মা গান্ধীর চরিত্র অভিনয় করে তিনি বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছেন। তখন তিনি ছিলেন বম্বে টকীজের হিন্দী সংলাপ-লেখক ও গীতকার। কশ্যপ অদ্ভুত সংলাপ লিখতে পারতেন। কিন্তু একবার লিখতে আরম্ভ করলে সহজে থামতে পারতেন না, অতি কষ্টে তাঁকে সংযত করে রাখতে হত। পরম হাস্যরসিক এই মানুষটিকে অনেক দিন পরে সেদিন দেখলাম। বুড়ো হয়েছেন বটে, কিন্তু মনের রস এখনো অক্ষুণ্ণ আছে।

যাহোক, একটি নিভৃত কক্ষে আমরা তিনজনে বসলাম। গল্প পড়া আরম্ভ হল। কেউ অবান্তর কথা বললেন না, নিবিষ্ট মনে শুনলেন। মাঝে মাঝে চা-কফি-বিস্কুট আসতে লাগল। ঘণ্টা তিনেক পরে গল্প পড়া শেষ হল।

ঘর তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। তিনজনে চুপ করে বসে আছি, কারুর মুখে কথা নেই। শেষে আমিই প্রশ্ন করলাম, 'কেমন শুনলেন?'

কশ্যপ গলার মধ্যে পাঁচমিশেলি আওয়াজ করলেন, তারপর 'কাল সকালে কথা

হবে' বলে চলে গেলেন। তিনি মাটুঙ্গায় থাকেন। ট্রেন ধরতে হবে।

দু'জনে মুখোমুখি বসে আছি। আমার রসনা তিন ঘণ্টা সচল থাকার পর একটু ক্লান্ত। মিঃ রায় কী ভাবছেন তিনিই জানেন। এক মাসের পরিশ্রম নষ্ট হল এই ভেবে আমার মনটা দমে যাচ্ছে।

বললাম, 'কি ভাবছেন'?

মিঃ রায় নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'অস্টেনকে গল্পটা বোঝাতে হবে। কিন্তু সে তো ভাল ইংরেজি জানে না। তাই ভাবছি কি করা যায়।'

বুঝলাম, নিজের অভিমত প্রকাশ করার আগে তিনি চিত্র-পরিচালক অস্টেন সাহেবের মতামত জানতে চান। খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু গল্প এবং অস্টেন সাহেবের মাঝখানে ভাষার দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান। আমি একটু চিন্তা করে সংকুচিতভাবে বললাম, 'গল্পটা যদি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করানো যায়, অবশ্য তাতে খরচ অনেক—'

মিঃ রায় চকিত হয়ে আমার মুখের পানে চাইলেন, খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, 'মন্দ কথা নয়। একটি জার্মান মেয়ে আছে, অবস্থা ভাল নয়, কিন্তু ভাল ইংরেজি জানে। দু'তিন শো টাকা পেলে সে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে দেবে।'

মিঃ রায় পেরেরাকে ডাকলেন। আমি কতকটা আশ্বস্ত হয়ে ফিরে এলাম।

তারপর কয়েক দিন 'বচন'-এর রিলিজ নিয়ে হুড়োহুড়ির মধ্যে কেটে গেল। বম্বের 'রক্সি' সিনেমায় 'বচন'-এর উদ্বোধন হল। আমরা স্টুডিওসুদ্ধ লোক উদ্বোধনে উপস্থিত। লোকে লোকারণ্য, ছবি দেখানোর অনেক আগেই টিকিট-বিক্রি বন্ধ হয়ে গেছে; বোর্ড টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে—হাউস ফুল!

ছবি কিন্তু বেশী দিন চলল না।

হিমাংশু রায় যখন বুঝতে পারলেন যে ছবিটা দীর্ঘায়ু হবে না, তখন তিনি যত শীঘ্র সম্ভব নতুন ছবি তৈরি করার জন্যে প্রস্তুত হলেন। পর পর তিনটি ছবি মার খেয়েছে, এবার ভাল ছবি তৈরি না হলে বম্বে টকীজ ডুববে।

হিমাংশু রায় বোধহয় মনে মনে 'বিষের ধোঁয়া'র গল্প পছন্দ করেননি। কিন্তু পর পর তিনবার মার খেয়ে তাঁর আত্মবিশ্বাস অনেকখানি কমে গিয়েছিল; বিশেষত তখন 'বিষের ধোঁয়া' ছাড়া অন্য কোন গল্প তাঁর হাতে ছিল না। তাই লীলুর সনির্বন্ধ প্ররোচনায় তিনি 'বিষের ধোঁয়া' তুলে নিলেন। আমার চিত্রনাট্য থেকে শুটিং স্ক্রীপ্ট লিখতে শুরু করে দিলেন।

বম্বে টকীজের ছবি তৈরি করার পদ্ধতি ছিল এই রকমঃ মূল লেখক গল্প ও সীনেরিও লিখবে, সংলাপ-লেখক হিন্দীতে সংলাপ লিখবে, হিমাংশু রায় শুটিং স্ক্রীপ্ট লিখবেন, সেই স্ক্রীপ্ট সামনে রেখে ফ্রান্জ্ অস্টেন ছবি তুলবেন। এই চারজনের মধ্যে হিমাংশু রায়ের ভূমিকাই প্রধান। গল্প যেমনই হোক, হিমাংশু রায় যে স্ক্রীপ্ট লিখবেন তাই হবে চরম, অর্থাৎ ফাইনাল। তিনিই ছবির স্রষ্টা, অন্য সবাই তাঁর সহ-যোগী মাত্র।

একদিন ফ্রান্জ্ অস্টেন আমাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'আপনার গল্পের অনুবাদ আমি পড়েছি। আমার খুব ভাল লেগেছে। যদি রায় ভাল স্ক্রীপ্ট লিখতে পারে, ভাল ছবি হবে।'

মন উল্লসিত হয়ে উঠল।

কিন্তু মনের উল্লাস বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। মিঃ রায়ের অফিস-ঘরে গিয়ে দেখলাম একটি যুবক তাঁর সঙ্গে বসে গল্প করছে। বেশ চটপটে স্মার্ট পাঞ্জাবী যুবক। মিঃ রায় পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'ইনি মিঃ বেরী। পাঞ্জাবে একটি ইংরেজি সিনেমা-পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, এখন বম্বে টকীজের পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টে ওঁকে

নিয়োগ করেছি।'

মিঃ বেরীর সঙ্গে শেকহ্যান্ড করলাম।

মিঃ রায় একটু অপ্রস্তুতভাবে বললেন, 'মিঃ বেরীকে 'বিষের ধোঁয়া'র চিত্রনাট্য পড়তে দিয়েছিলাম।'

মিঃ বেরী বললেন, 'আমি পড়েছি। গল্প ভালই, তবে কি জানেন, গল্পের মধ্যে সিনেমা মীট নেই।' তাঁর কণ্ঠস্বরে মুরুব্বিয়ানার আমেজ।

মিঃ রায়ের দিকে তাকালাম, 'সিনেমা মীট কী বস্তু?'

মিঃ বেরীই উত্তর দিলেন, 'সিনেমা মীট বুঝলেন না? প্যাশন, টেনসন, রোমান্স, ডেরিং-ডু—এই সব। আপনার গল্পে এসব কিছু নেই। আমার বিশ্বাস এ গল্প সিনেমায় চলবে না।'

মিঃ রায়কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনারও কি তাই মত?'

মিঃ রায় উদ্বিগ্নভাবে সিগারেট টানতে টানতে বললেন, 'এখন তো আর অন্য গল্প ধরবার সময় নেই, কাজ আরম্ভ করে দিয়েছি। 'বচন' চলল না। সাত দিনের মধ্যে নতুন ছবির শুটিং শুরু করতে হবে।'

সাত দিনের মধ্যে শুটিং শুরু হবে, অতএব ছবির পাত্র-পাত্রী স্থির করা দরকার। মিঃ রায় বললেন, 'দেবিকা আর অশোক ক্রমাগত ছবির পর ছবি প্লে করে যাচ্ছে, ওদের এবার বিশ্রাম দরকার। নতুন আর্টিস্ট দিয়ে ছবি করব।'

সুতরাং প্রোডাকশন ম্যানেজার মিঃ আচারিয়া আর্টিস্টের খোঁজে বেরুলেন। বম্বে টকীজে অবশ্য মাইনে-করা বাঁধা আর্টিস্ট আছে, হিরো-হিরোইন অশোক ও দেবিকা ছাড়াও গৌণ চরিত্রাভিনেতা পিঠাওয়ালা, মমতাজ আলি, মায়া, মীরা, সরোজ বোরকর ইত্যাদি। তাদের দিয়েই মোটামুটি কাজ চলে যেত। কিন্তু এখন নতুন হিরো-হিরোইন চাই, গৌণ চরিত্রের জন্যেও আরো লোক দরকার। 'বিষের ধোঁয়া'য় কিশোর, সুহাসিনী, বিনয়বাবু, দীনবন্ধু, অনুপম, করবী, হেমাঙ্গিনী—অনেকগুলি বড় বড় চরিত্র আছে।

কাতারে কাতারে আর্টিস্ট আসতে লাগল। মিঃ রায় তাদের সঙ্গে কথা বলতেন, আমি বসে বসে শুনতাম। তখনকার দিনে বম্বে টকীজের প্রচণ্ড নাম-ডাক, তার পতাকাতলে অভিনয় করবার জন্যে সকলেই উৎসুক।

হিরোর ভূমিকায় অভিনয় করার জন্যে একটি যুবককে মিঃ রায় নির্বাচন করলেন, তার নাম জয়রাজ। মুখশ্রী এমন কিছু আহা-মরি নয়, দৃঢ় স্বাস্থ্যের লাবণ্যে আপাদ-মস্তক ভরপুর। সে অনেক স্টাণ্ট ছবিতে হিরোর পার্ট করেছে, অনেক মারামারি কাটা-কাটি করেছে, কিন্তু ভদ্র ছবিতে কখনও অভিনয় করেনি। বম্বে টকীজের ছবিতে হিরোর পার্ট পেয়ে সে কৃতার্থ হয়ে গেল।

একে একে সব ভূমিকার জন্যে আর্টিস্ট জোগাড় হল। হিরোইন হবেন রেণুকা দেবী, করবী—মীরা, বিমলা—মায়া, দীনবন্ধু—পিঠাওয়ালা। কেবল বিনয়বাবুর ভূমিকার জন্যে মনের মত লোক পাওয়া গেল না। বিনয়বাবুর মত সরল পণ্ডিত পাগলাটে প্রফেসরের ভূমিকায় অভিনয় করা যার-তার কাজ নয়। একাধারে হাস্যরসিক এবং অভিনেতা হওয়া চাই।

আমার মনে শান্তি নেই। আমার প্রথম ছবি হবে, তার প্রধান ভূমিকাগুলিতে নতুন লোক। ওরা কি পারবে? যদি না পারে, যদি ছবি ফ্লপ করে, সবাই গল্পের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেবে। আমি মারা পড়ব।

অস্থির মন নিয়ে সেদিন বিকেলবেলা স্টুডিওতে গেলাম। মিঃ রায় আমাকে ডেকে

পাঠালেন। তাঁর অফিস-ঘরে গিয়ে দেখলাম তিনি একলা বসে বসে সিগারেট টানছেন। আমাকে দেখে বললেন, 'বসুন। আপনি ঘাবড়ে গেছেন মনে হচ্ছে। ভয় পাবেন না। আমি আর অস্টেন চিরকাল নতুন আর্টিস্ট নিয়ে কাজ করেছি, আর্টিস্ট তৈরি করেছি। অশোক আর দেবিকাও একদিন নতুন আর্টিস্ট ছিল।—যাই হোক, একজন আনকোরা নতুন আর্টিস্ট জোগাড় করেছি। তাকে দেখবেন?'

'দেখব। কোন্ ভূমিকার জন্যে?'

'আগে দেখুন তো।'

মিঃ রায় পেরেরাকে ডেকে বললেন, 'দেশাইকে পাঠিয়ে দাও।'

অল্পক্ষণ পরে একটি মূর্তি এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল। দোহারা বেঁটে-খাটো চেহারা। ধবধবে ফরসা রঙ, গোল মুখের ওপর গোল চশমা। পিট্-পিট্ করে আমার দিকে তাকিয়ে ভাঙা-ভাঙা গলায় বলল, 'নমস্তে।'

আমি হেসে উঠলাম, 'আরে, এ তো বিনয়বাবু।'

হিমাংশুবাবুও মুচকি হাসলেন, 'হ্যাঁ, ওকে বিনয়বাবুর পার্ট করবার জন্যে নিয়েছি। এই প্রথম ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবে। কেমন মনে হচ্ছে?'

'ভাল। চেহারায় অবিকল বিনয়বাবু। যদি অভিনয় করতে পারে—'

'অস্টেন আছে, অভিনয় করিয়ে নেবে।'

সেদিন প্রফুল্লমনে বাড়ি ফিরলাম। মনে হল দৈব অনুকূল, নইলে দেশাইয়ের মত একটা জলজ্যান্ত বিনয়বাবু কোথা থেকে এসে জুটল?

সাত দিন পরে শুভদিনে মহরৎ করে শুটিং আরম্ভ হয়ে গেল।

যদিও আমার কাজ ছিল কেবল গল্প লেখা, ছবি তৈরি করার কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার ছিল না, তবু একটা বিষয়ে আমি জোর করেছিলাম। আমি বলেছিলাম, চরিত্রগুলিকে বাঙালী সাজপোশাক পরাতে হবে; অর্থাৎ ধুতি-পাঞ্জাবি। সেকালে বিলিতি সাজপোশাক পরার রীতি বম্বে টকীজে চালু ছিল। মিঃ রায় প্রথমে নানারকম আপত্তি তুলেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে গেলেন।

ছবির নাম হল—ভাবী। অর্থাৎ, বউদি। কশ্যপ নাম রেখেছিলেন। খুব লাগসই নাম হয়েছিল।

শুটিং চলতে লাগল। আমি মাঝে মাঝে সেটে গিয়ে বসি, ফ্রান্জ্ অস্টেনের পরিচালনা দেখি। লোকটির পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা অদ্ভুত। বাঙালী মেয়েরা কি ভাবে শাড়ি পরে তা তিনি জানেন, তারা কেমন করে পান সেজে পান মুখে দেয়, তাও তাঁর অজানা নয়। প্রত্যেক আর্টিস্টের কাছ থেকে ষোল আনা কাজ তিনি আদায় করে নিতে পারেন, যতক্ষণ না ষোল আনা কাজ আদায় হয় ততক্ষণ আর্টিস্টের নিষ্কৃতি নেই। একবার একটি ভারি মজার ব্যাপার দেখেছিলাম।

যে মেয়েটি বিমলার ভূমিকা করছে তার নাম মায়া; একটি দৃশ্যে তাকে কাঁদতে হবে। তাকে ক্যামেরার সামনে দাঁড় করানো হল; মিঃ অস্টেন তাকে কান্নার ভঙ্গিটা অভিনয় করে দেখিয়ে দিলেন। মায়া কান্নার ভঙ্গিটা ঠিকই করল, কিন্তু তার চোখ দিয়ে জল বেরুল না। অস্টেন সাহেবের হুকুম চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া চাই। মায়ার চোখে জল নেই দেখে তিনি খুব খানিকটা তর্জন-গর্জন করলেন, কিন্তু কোন ফল হল না; তখন তিনি দুই হাত ঊর্ধ্বে আস্ফালন করে জার্মান ভাষায় গালমন্দ দিলেন; তবু মায়ার চোখ দিয়ে একফোঁটা জল বেরুল না। অস্টেন মোটা একটা লাঠি এনে তার মাথার ওপর ঘোরাতে লাগলেন, কিন্তু মায়ার চোখ মরুভূমি। অস্টেন লাঠি ফেলে দিয়ে হুঙ্কার ছাড়লেন, 'কাঁদবে না? আচ্ছা মজা দেখাচ্ছি। তুমি এইখানে দাঁড়িয়ে থাক, তোমার মুখের ওপর ক্যামেরা চালু করলাম। যতক্ষণ না চোখ দিয়ে জল বেরোয় ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক।

—চালাও ক্যামেরা।'

ক্যামেরা চলল। এক মিনিট, দু'মিনিট; প্রতি মিনিটে নব্বই ফুট ফিল্ম খরচ হয়ে যাচ্ছে। আমরা স্টুডিওসুদ্ধ লোক একদৃষ্টে মায়ার মুখের দিকে চেয়ে আছি। পাঁচ মিনিট পরে মায়ার চোখ দুটি একটু ঝাপ্‌সা হয়ে গেল। তারপর দরদর ধারায় চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

আমরা সমস্বরে জয়ধ্বনি করে উঠলাম।

সুন্দরী ঝর্ণা

ঝর্ণা নামে একটি মেয়েকে আমি চিনি এবং সে সুন্দরীও বটে। কিন্তু আজ তার কথা নয়। যদি দিন পাই আর একদিন বলব।—

সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই একটা কবিতার কলি মাথার মধ্যে ঢুকে পড়ল—ঝর্ণা ঝর্ণা সুন্দরী ঝর্ণা—.

এমন আমার মাঝে মাঝে হয়। সকালবেলা কবিতার কলি মাথায় আসে, তারপর বন্দী ভোমরার মত সারাদিন মাথার মধ্যে গুঞ্জন করতে থাকে।

পুণায় আজ এগারো দিন ধরে বৃষ্টি চলেছে, বিরাম বিশ্রাম নেই। মন নিরানন্দ। চায়ে চুমুক দিতে দিতে খবরের কাগজ পড়লাম। আনন্দদায়ক কোনো সংবাদ নেই। চীনের ড্রাগন জিভ বার করে হিমালয় পর্বতটিকে চেটে নেবার চেষ্টা করছে। কালিদাসের হিমালয়, দেবতাত্মা হিমালয়। যাক—

ঝর্ণা ঝর্ণা সুন্দরী ঝর্ণা—

ভারতের দুই প্রান্তে দ্বিখণ্ডিত রাহু কেতু উচ্চকণ্ঠে ভারতের নিন্দাবাদ ও নিজেদের জিন্দাবাদ করছে। দু'দিকেই মোরগ ডাকছে—কু-ক্বুর-কু। কিন্তু সকাল হচ্ছে না।

কাগজে পুণার খবরও আছে। খড়্‌গবৎসলার ড্যাম টৈটুম্বুর, বাঁধ ছাপিয়ে জল বইতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু ভয়ের কিছু নেই, মিলিটারি ইঞ্জিনীয়ারের দল এসে পাহারা দিচ্ছেন।

বিশেষ চিন্তিত হলাম না। প্রতি বছরই খড়্‌গবৎসলার বাঁধ কানায় কানায় ভরে ওঠে, স্লুইস্ খুললে জল বার করে দেওয়া হয়। জল নিকাশের প্রধান রাস্তা মুথা নদী। মুথা নদীর খাত পুণা শহরের মাঝখান দিয়ে গিয়েছে। সারা বছর মুথার খাতে শীর্ণ জলধারা প্রবাহিত হয়, কিন্তু বর্ষাকালে খাত ভরে ওঠে; তার ওপর যখন

খড়্‌গবৎসলা বাঁধের জল খুলে দেওয়া হয়, তখন মুথা নদীর চেহারা বদলে যায়, রণরঙ্গিনী মূর্তিতে উত্তাল তরঙ্গ তুলে সে ছুটতে থাকে। বাড়তি জল বার করে দেয়। পুণা শহরে মুথা নদীর ওপর তিনটি বড় বড় পুল আছে। যতই জল বাড়ুক, শহরের কোনো ক্ষতি হয় না।

এগারো দিন সূর্যের মুখ দেখিনি কিন্তু আজ আকাশ যেন একটু হালকা হয়েছে। আমার বাড়ির সামনে সিকি মাইল দূরে পাহাড়ের টিলার ওপর পার্বতী মন্দির, ঝির ঝির বৃষ্টির ফাঁকে পার্বতী মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে। হয়তো বিকেল-বেলা সূর্যের মুখ দেখতে পাব।

ঝর্ণা! ঝর্ণা! তরলিত চন্দ্রিকা চন্দনবর্ণা—

ছাতা মাথায় দিয়ে মারাঠী বন্ধু এলেন। পণ্ডিত ব্যক্তি, মাঝে মাঝে আসেন, গল্পসল্প করেন, তারপর এক পেয়ালা কফি খেয়ে চলে যান। তিনি আজ পদার্পণ করতেই আমার কুকুর কালীচরণ ঘেউ ঘেউ করে তাঁকে তেড়ে গেল। কালীচরণ শান্ত প্রকৃতির কুকুর, মারাঠী পণ্ডিত তার অপরিচিত নয়। কিন্তু ক'দিন থেকে তার মেজাজ খারাপ। আমি তাকে ধমক দিলাম, 'কেলো!' কেলো ঘাড় গুঁজে বারান্দার কোণে গিয়ে বসল।

বন্ধুকে বললাম, 'কেলোর দোষ নেবেন না। বৃষ্টির জন্যে বেরুতে পাচ্ছে না, তাই ওর মন খারাপ।'

বন্ধু একটু হাসলেন, 'আমাদের সকলেরই মন খারাপ। শহরে জনরব শুনছি খড়্‌গবাস্‌লার বাঁধের অবস্থা ভাল নয়।'

বললাম, 'সে তো ফি বারেই শোনা যায়।'

তিনি বললেন, 'এবার একটু বিশেষত্ব আছে। খড়্‌গবাস্‌লার বাঁধ থেকে কয়েক মাইল দূরে আর একটা কাঁচা বাঁধ কিছুদিন আগে তৈরি হয়েছে, উদ্দেশ্য গ্রীষ্মকালে খড়্‌গবাস্‌লার জলে টান পড়লে ওখান থেকে জল আনা চলবে। নতুন বাঁধের নাম—পানশেট্। এই পানশেট্ ড্যাম যদি ভাঙে তার সমস্ত জল এসে খড়্‌গবাস্‌লার ড্যামে ঠেলা মারবে।'

যদি ঠেলা মারেই আমরা কি করতে পারি। মানুষ নিজের সুখ-সুবিধার জন্যে নগর গড়ে তোলে, প্রকৃতি তিন মিনিটের ভূমিকম্পে ধূলিসাৎ করে দেয়। কেউ কিছু করতে পারে কি?

মারাঠী বন্ধু কফি খেয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে চলে গেলেন।

ঝর্ণা ঝর্ণা সুন্দরী ঝর্ণা—

বেলা এগারোটার সময় তিনটে জেট্ প্লেন মাথার ওপর তিন-চারবার চক্কর দিয়ে চলে গেল। পুণা পশ্চিম ভারতের সামরিক কেন্দ্র; প্রায় রোজই জেট্ প্লেন উড়তে দেখি; কিন্তু আজ যেন ওদের ওড়ার একটা উদ্দেশ্য আছে।

জেট্ প্লেনের কর্ণবিদারী মেঘনাদ মিলিয়ে যাবার পর একটি অটো-রিক্‌শ এসে বাড়ির সামনে থামল। আমার বারো বছরের নাতি লাফিয়ে রিক্‌শ থেকে নামল—'দাদা!' তার মুখে উগ্র উত্তেজনা।

আমিও উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম, 'কিরে! এত শিগ্‌গির ফিরে এলি যে!' সে স্কুলে গিয়েছিল। তার স্কুল মুথা নদীর ওপারে।

নাতি এক নিশ্বাসে বলল, 'বাঁধ ভেঙে জল আসছে—স্কুলে ছুটি দিয়ে দিলে—বাস চলছে না—ভাগ্যিস একটা অটো-রিক্‌শ পেয়ে গেলুম, নইলে আসতে পারতুম না—ডেক্যান্ জিমখানায় জল এসে গেছে—লক্‌ড়ী পুলের ওপর দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছে—'

হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল, আবার বসে পড়লাম।

ঝর্ণা ঝর্ণা সুন্দরী ঝর্ণা—

কিছুক্ষণ পরে চারিদিক থেকে সমবেত মনুষ্য কণ্ঠের কলরব আসতে লাগল। তারপর দেখলাম পালে পালে মানুষ ছুটে আসছে। নদীর ধারে যাদের বাড়ি তারা পালাচ্ছে, তাদের ঘর বাড়ি ভেসে গেছে। শহরের মধ্যে পার্বতী মন্দির সবচেয়ে উঁচু জায়গা, তাই গৃহহারারা এই দিকেই ছুটে আসছে। দেখতে দেখতে পার্বতী পাহাড়ের ঢালু অঙ্গ মানুষে ভরে গেল।

দুঃসহ উদ্বেগে দুপুর কাটল। বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে, দু'-একজন চেনা পরিচিত লোক মাঝে মাঝে খবর দিয়ে যাচ্ছে—লক্‌ড়ী পুল ডুবে গেছে...সাহিত্য পরিষৎ পর্যন্ত জল এসেছে...নদীর দু'ধারে কত বাড়ি ছিল, সব ভেসে গেছে...মানুষ গরু মোষ বানের জলে ভেসে যাচ্ছে...

একটা আধপাগলা লোক চিৎকার করছে—আসছে! মহাপ্রলয় আসছে; কেউ বাঁচবে না।—

ঝর্ণা ঝর্ণা—

বেলা চারটে থেকে জল নামতে শুরু করল। নিজের নিরাপত্তার জন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে দিতে ভাবতে লাগলাম—আমার বাড়ি যদি নদীর ধারে হত, নাতি যদি ঠিক সময়ে ফিরে না আসত...

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আলো নেই, অন্ধকার শহর। কালীচরণ রাস্তায় বেরোয়নি, বারান্দার কোণে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। তার মনেও বোধহয় মহা দুর্যোগের ছোঁয়াচ লেগেছে।

এই সময় একটি ব্যাপার দেখে চমৎকৃত হয়ে গেলাম। দেখি ছোট্ট একটি কাঠবেরালি সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠছে। মনে হল, বাচ্চা কাঠবেরালি, সর্বাঙ্গ ভিজে, থুর থুর করে কাঁপছে। হয়তো নদীর ধারে কোনো গাছে তার বাসা ছিল, বানের জলে গাছ ভেসে গেছে, কাঠবেরালি কোনো রকমে ডাঙগায় উঠেছে, তারপর আশ্রয় খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে হাজির হয়েছে।

কেলো ঘাড় তুলে একবার দেখল তারপর আবার থাবার ওপর মুখ রেখে মিটি মিটি চোখে কাঠবেরালিকে নিরীক্ষণ করতে লাগল। কাঠবেরালি এদিক-ওদিক ঘুরে শেষ পর্যন্ত কেলোর পাশে গিয়ে বসল। অন্য সময় হলে কেলো তাকে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলত। কিন্তু আজ কেলো নির্বিকার। ওরা বোধহয় জানে, মহা দুর্যোগের সময় হিংসা করতে নেই।

গৃহিণী কাঠবেরালিকে একটু দুধ দিলেন, সে চেটেপুটে খেয়ে ফেলল।

আজকের একটা দিনে কত কি দেখলাম, কত কি অনুভব করলাম। কিন্তু মাথার মধ্যে ভোমরার নেপথ্য সঙ্গীত থামেনি। রাত্রে ক্লান্ত দেহ এবং অবসন্ন মন নিয়ে যখন শুতে গেলাম তখনও মাথার মধ্যে বন্দী ভোমরাটা গুঞ্জন করে চলছে—ঝর্ণা ঝর্ণা সুন্দরী ঝর্ণা।

চিড়িক্দাস

পুণায় বন্যার সময় যে কাঠবেরালিটা আমার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল সেটা ধাড়ি কাঠবেরালি নয়, বাচ্চা। শেষ পর্যন্ত সে আমার বাড়িতেই রয়ে গেল।

তার নাম রেখেছি চিড়িক্দাস। গৃহিণী তার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হয়ে পড়েছেন; নাতি তাকে পকেটে নিয়ে বেড়ায়; আমার কুকুর কালীচরণ তার প্রতি খুব প্রসন্ন না হলেও তাকে অবজ্ঞাভরে সহ্য করে। চিড়িক্দাস সারাদিন চিড়িক্ চিড়িক্ শব্দ করে বাড়িময় ঘুরে বেড়ায়, ক্ষিদে পেলে গৃহিণীর কোলে উঠে বসে।

গৃহিণী চিড়িক্দাসের দৈনন্দিন আহারের যে ব্যবস্থা করেছেন তা দেখলে হিংসে হয়। সকালবেলা চা এবং বিস্কুট, দুপুরে দুধ-ভাত, বিকেলে আবার চা-বিস্কুট, রাত্রে শয়নের পূর্বে চীনা বাদাম, ভিজে ছোলা এবং কড়াইশুঁটি প্রভৃতি নানাপ্রকার দানা। একটি পুরাতন অব্যবহৃত পাখির খাঁচায় তার রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হয়েছে, সন্ধ্যা হলেই সে খাঁচায় ঢুকে ন্যাক্ড়া মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকে।

চিড়িক্দাস যত সুখে আছে পুণার মনুষ্যসম্প্রদায় কিন্তু তত সুখে নেই। যাদের বাড়ি-ঘর ভেসে গিয়েছিল তাদের তো কথাই নেই, অন্যরাও এখনো নাকানি-চোবানি খাচ্ছে। নদীর ব্রিজগুলো বেঁকে তেউড়ে এমন ত্রিভঙ্গ-মুরারি মূর্তি ধারণ করেছে যে, তার ওপর লোক চলাচল বিপজ্জনক, গাড়ি-ঘোড়া তো দূরের কথা। বৈদ্যুতিক আলো এসেছে বটে, কিন্তু নিত্যব্যবহার্য জলের অভাবে মানুষ হাহাকার করে বেড়াচ্ছে। জল যে মানুষের জীবনে কত বড় পরম পদার্থ তা এ রকম অবস্থায় না পড়লে বোঝা যায় না।

চিড়িক্দাসের জীবনে কিন্তু কোনো সমস্যা নেই। সকালে ঘুম থেকে উঠে সে নিজের ল্যাজটি দৃঢ়মুষ্টিতে উঁচু করে ধরে চাট্‌তে আরম্ভ করে, তারপর অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিষ্কার করে। প্রসাধন শেষ হলে দু'হাত জোড় করে উঁচু হয়ে বসে। গৃহিণী তখন তাকে চা-বিস্কুট দেন; সে প্রথমেই চা-টুকু চুক্‌চুক্ করে খেয়ে ফেলে, তারপর বিস্কুট দু'হাতে ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খেতে থাকে। আমি বসে বসে তার বিচিত্র ক্রিয়াকলাপ দেখিঃ সে যখন মুখে চিঁড়িক্ চিড়িক্ শব্দ করে তখন তার ল্যাজটি তালে তালে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে থাকে। ওর স্বরযন্ত্রের সঙ্গে ল্যাজের বোধহয় ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে।

আমার একটি বর্ষীয়সী প্রতিবেশিনী চিড়িক্দাসকে দেখে বললেন, 'কাঠবেরালি পুষেছেন ভালই করেছেন, সকালবেলা কাঠবেরালি দেখা খুব সুলক্ষণ। কিন্তু ওরা পোষ মানে না। যতদিন বাচ্চা আছে আপনার কাছে থাকবে, বড় হলেই পালিয়ে যাবে।'

বনের জন্তু যদি বনে চলে যায় আপত্তি করবার কী আছে? তবু মনটা বিমর্ষ হল; চঞ্চল ছোট্ট জন্তুটার ওপর মায়া পড়ে গিয়েছে। গৃহিণী বললেন, 'কখ্‌খনো না, চিড়িক্দাস কি আমাদের ছেড়ে যেতে পারে! ও পালাবে না, তুমি দেখে নিও।'

দিন কাটছে। পুণা শহরের সর্বাঙ্গে ঘা, রাস্তা খুঁড়ে নতুন জলের পাইপ বসানো হচ্ছে। আমার বাড়ির সামনে দিয়ে গভীর খাত চলে গিয়েছে, সেই খাত ডিঙিয়ে বাড়ি থেকে বেরুতে হয়; গাড়ি-ঘোড়ার চলাচল বন্ধ। অসুবিধার অন্ত নেই। ভরসা কেবল এই, মহারাষ্ট্রের মুখ্য-সচিব বলেছেন, পুণা শহরকে তিনি নতুন করে গড়ে তুলবেন, মর্ত্যে অমরাবতী তৈরি করবেন। শিবাজীর পুণা, পেশোয়াদের পুণা যদি ভাঙা-চোরা অবস্থায় পড়ে থাকে তাহলে মারাঠীদের লজ্জার অন্ত থাকবে না।

এদিকে চিড়িক্‌দাসের ক্ষুদ্র শরীরটি ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে; পিঠের কালো ডোরা গাঢ় হয়েছে, ল্যাজ মোটা হয়েছে। সে আর খিদে পেলেই গিন্নীর কোলে উঠে বসে না, দূর থেকে চিড়িক্ চিড়িক্ শব্দ করে আবেদন জানায়। কিন্তু সন্ধ্যের পর নিয়মমত খাঁচার মধ্যে ঢুকে শুয়ে থাকে। বুঝতে বাকি রইল না, চিড়িক্‌দাসের যৌবনকাল সমাগত, কোন্ দিন চুপিসারে চম্পট দেবে।

গিন্নীও মনে মনে চিড়িক্‌দাসের মতিগতি বুঝেছিলেন, তিনি একদিন রাত্রে চিড়িক্‌দাস খাঁচায় ঢোকবার পর খাঁচার দোর বন্ধ করে দিলেন। পরদিন সকালবেলা চিড়িক্‌দাসের সে কি লম্ফঝম্ফ! খাঁচার চারিধারে বেরুবার রাস্তা খুঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর চিড়িক্ চিড়িক্ শব্দ করে চেঁচাচ্ছে। গিন্নী তাকে বাইরে থেকে চা-বিস্কুট দুধ-ভাত দিলেন, সে সব খেয়ে ফেলল। কিন্তু তার প্রাণে শান্তি নেই; সে স্বাধীনতা চায়, বন্ধন দশায় থাকবে না।

গিন্নী বললেন, 'দু'চার দিন খাঁচায় বন্ধ থাকলেই অভ্যেস হয়ে যাবে, তখন আর পালাতে চাইবে না।'

চিড়িক্‌দাসকে কিন্তু ধরে রাখা গেল না। একদিন দুপুরবেলা দেখি, খাঁচা খালি, চিড়িক্‌দাস পালিয়েছে। গিন্নী বোধহয় অসাবধানে খাঁচা ভাল করে বন্ধ করেননি, চিড়িক্‌দাস সেই পথে বেরিয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছে।

নাতি তাকে খুঁজতে বেরুলো। কিন্তু কোথায় পাবে তাকে? আমি মনে মনে আশা করেছিলাম সন্ধ্যে হলে চিড়িক্‌দাস ফিরে আসবে, কিন্তু এল না। গিন্নী বিলাপ করতে লাগলেন, 'কী বেইমান জন্তু। এত খাওয়ালুম দাওয়ালুম, এত যত্ন করলুম, তা একটু কি কৃতজ্ঞতা নেই! হয়তো শেয়ালে কুকুরে ছিঁড়ে খাবে, নয়তো চিলে ছোঁ মারবে—'

তাঁকে আশ্বাস দেবার জন্যে বললাম, 'কিচ্ছু ভেবো না, চিড়িক্‌দাস সেয়ানা ছেলে। সামনে পেশোয়া পার্ক, অনেক বড় বড় গাছ আছে, ওখানে গিয়ে গাছের কোটরে বাসা বেঁধেছে। হয়তো একটি অর্ধাঙ্গিনীও জুটিয়ে ফেলেছে।'

দু'দিন চিড়িক্‌দাসের দেখা নেই। ভাবলাম সে আর আসবে না। কিসের জন্যেই বা আসবে? বনে-জঙ্গলে সে নিজের স্বাভাবিক খাদ্য পেয়েছে, অবাধ স্বাধীনতা পেয়েছে, মানুষের 'লালন-ললিত যত্ন' তার দরকার নেই।

তারপর তৃতীয় দিন সকালবেলা সদর দরজা খুলে দেখি—

চিড়িক্‌দাস হাত জোড় করে দোরের সামনে উঁচু হয়ে বসে আছে।

গিন্নী ছুটে এলেন, 'ওমা, চিড়িক্ এসেছে! আয় আয়।' তিনি তাকে ধরতে গেলেন, সে তুড়ুক্ করে সরে গেল, আবার ধরতে গেলেন, আবার সরে গেল, কিন্তু পালিয়ে গেল না। গিন্নী তখন খাঁচা এনে তার সামনে ধরলেন; কিন্তু চিড়িক্‌দাস খাঁচায় ঢুকল না। দূরে সরে গিয়ে আবার হাত জোড় করে দাঁড়াল।

আমার মাথায় হঠাৎ বুদ্ধি খেলে গেল, বললাম, 'শিগ্‌গির চা আর বিস্কুট নিয়ে এস।'

পিরিচে চা এবং একটি বিস্কুট এনে মেঝেয় রাখতেই চিড়িক্ গুটি গুটি এগিয়ে এল। প্রথমেই চুক্‌চুক করে চা-টুকু খেয়ে ফেলল, তারপর দু'হাতে বিস্কুট ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খেতে লাগল।

গিন্নী এই সুযোগে আবার তাকে ধরতে গেলেন। এবার সে বিস্কুটের অবশিষ্ট অংশটুকু মুখে নিয়ে তীরবেগে পালাল। আর তাকে দেখতে পেলাম না।

বললাম, 'ব্যাপার বুঝলে? চিড়িক্‌দাসকে চায়ের নেশায় ধরেছে। ধন্য চায়ের নেশা! ও আবার আসবে।'

আমার অনুমান মিথ্যে নয়। বিকেলবেলা ঠিক চায়ের সময় চিঁড়িক্‌দাস এসে হাজির, দরজার সামনে হাত জোড় করে বসল। চা এবং বিস্কুট খেয়ে, আধখানা বিস্কুট মুখে নিয়ে চলে গেল।

তারপর থেকে চিঁড়িক্‌দাস রোজ দু'বেলা আসে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তার একটি প্রণয়িনী জুটেছে। নইলে আধখানা বিস্কুট সে কার জন্যে নিয়ে যায়?

চিন্ময়ের চাকরি

চিন্ময়ের মুখে মামার ভাত তিক্ত হইয়া গিয়াছিল। মামী মানুষটি ভালো তাই রক্ষা, নহিলে এতদিন সে মামার বাড়িতে টিকিতে পারিত না।

আজ আট মাস হইল সে চাকরির খোঁজে কলিকাতায় আসিয়াছে এবং মামার স্কন্ধে আরোহণ করিয়াছে। সে পিতৃহীন; তাহার মা উত্তরবঙ্গে কোনও শহরের একটি হাসপাতালে নার্সের কাজ করেন। তিনি চিন্ময়কে আই. এ. পর্যন্ত পড়াইয়াছেন, কিন্তু আর অধিক পড়াইবার সামর্থ্য তাঁহার নাই; চিন্ময়ও আর পড়িতে চায় না। কোনও রকমে একটি চাকরি জুটাইয়া সে স্বাধীন হইতে চায়, মায়ের দুঃখ দূর করিতে চায়। তাহার বয়স কুড়ি বছর।

কলিকাতায় আসিয়া এই আট মাস সে চাকরির খোঁজে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অসংখ্য দরখাস্ত করিয়াছে, সরকারী এমপ্লয়মেণ্ট ব্যুরোতে ধর্না দিয়াছে, কিন্তু চাকরি পায় নাই। কেহ তাহার দরখাস্তের জবাব পর্যন্ত দেয় নাই। মামা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, ছেলেপিলে আছে; মুখে কিছু না বলিলেও মনে মনে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন তাহা বেশ বোঝা যায়। সঙ্গতি যেখানে অল্প, সেখানে দয়া দাক্ষিণ্য স্নেহ প্রীতির স্থান কোথায়?

তবু চিন্ময় দাঁতে দাঁত চাপিয়া পড়িয়াছিল। যেমন করিয়া হোক একটা চাকরি তাহার চাই; বেশী নয়, পঞ্চাশ-ষাট টাকার চাকরি হইলেও চলিবে। কোনও রকমে নিজের অন্ন-সংস্থান করিতে পারিলে সে ধন্য হইবে। পরের অন্ন আর তাহার গলা দিয়া নামিতেছে না।

অবশেষে তাহার নাছোড়বান্দা অধ্যবসায়ের ফলেই বোধহয় হঠাৎ একদিন একটু আশার আলো দেখা দিয়াছিল। কয়েক মাস পূর্বে সে এক বিলাতী সওদাগরী অফিসে দরখাস্ত করিয়াছিল, আজ তাহার উত্তর আসিয়াছে; কর্মকর্তা আগামী কল্য তাহাকে দর্শন দিবেন, সে যেন বেলা দশটার সময় অফিসে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করে।

চিঠি পাওয়া অবধি চিন্ময়ের মন আনন্দে নৃত্য করিতেছে। সারা দিন সে বিহ্বল-ভাবে ছটফট করিয়া বেড়াইয়াছে, চিঠিখানি বারবার খুলিয়া পড়িয়াছে এবং মনে মনে ভাবিয়াছে—চাকরি পাইলে সে দিবা-রাত্র কাজ করিবে, দরকার হইলে প্রভুর পদসেবা পর্যন্ত করিবে, কোনও কাজেই পশ্চাৎপদ হইবে না। ভগবান, চাকরিটা যেন হয়।

রাত্রে আহারের পর চিন্ময় চুপি চুপি মামীকে বলিয়াছিল, 'মামীমা, এখন শুলে ঘুম হবে না, আমি একটু পার্কে বেড়াতে যাচ্ছি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসব।'

মামী তাহার মনের অবস্থা বুঝিয়াছিলেন, বলিলেন, 'আচ্ছা। সদর-দরজা খোলা থাকবে।'

চিন্ময়ের মামা যে পাড়ায় থাকেন, তাহা খুব উচ্চ শ্রেণীর পাড়া নয়; কিন্তু এখান হইতে আধ মাইল রকম দূরে একটা নূতন পার্ক তৈরি হইতেছে। কলিকাতা শহর এই দিকে বাহু বিস্তার করিয়া নূতন জমি গ্রাস করিতেছে। চিন্ময় পার্কের দিকে চলিল।

স্থানটি রাত্রিকালে বেশ নির্জন। পার্কের চারিধারে রেলিং বসানো এখনো সম্পূর্ণ হয় নাই; ভিতরে অনেকগুলি বড় বড় গাছ আছে; গাছের নিচে সিমেন্টের বেঞ্চি। কিন্তু আলোর ব্যবস্থা নাই।

অন্ধকারে চিন্ময় একটি গাছের তলায় বেঞ্চিতে বসিল। চৈত্রের শেষে দিনগুলি ক্রমশ উষ্ণ হইয়া উঠিতেছে বটে, কিন্তু রাত্রির মাধুর্য একেবারে শুকাইয়া যায় নাই। দাক্ষিণা বাতাস অভিসারিকার মত সন্তর্পণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যেন সংকেত-স্থানে প্রিয়তমকে খুঁজিতেছে।

কিন্তু চিন্ময়ের প্রাণে কবিত্ব নাই, সে একাগ্র চিত্তে নিজের কথাই ভাবিতেছে। তাহার মন স্বভাবতই আগ্রহশীল ও একনিষ্ঠ, তাই একটা কথা একবার ভাবিতে আরম্ভ করিলে সহজে তাহা ছাড়িতে পারে না। রাস্তা দিয়া কদাচিৎ দুই-একটা মোটর গাড়ি আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া চলিয়া যাইতেছে; মাথার উপর গাছের নিবিড় শাখা-প্রশাখার মধ্যে নিদ্রালু পাখির কিচিমিচি থাকিয়া থাকিয়া শুনা যাইতেছে; কিন্তু চিন্ময়ের চক্ষু-কর্ণ সম্পূর্ণরূপে অন্তঃপ্রবিষ্ট, সে অন্ধকারে বসিয়া কেবল একটি কথাই ভাবিতেছেঃ কাল সকালে সে ইণ্টারভিউ দিতে যাইবে...যাঁহার কাছে ইণ্টারভিউ দিতে যাইবে, তিনি কেমন লোক? তাহাকে পছন্দ করিবেন তো! আই. এ. পাসের প্রশংসাপত্রটা লইয়া যাইতে হইবে, ভুল না হয়—

মন যখন আশা-আকাঙ্ক্ষার চিত্রাঙ্কনে মগ্ন থাকে, তখন সময় কোন দিক দিয়া যায় জানিতে পারা যায় না; দু' ঘণ্টা কিভাবে কাটিয়া গিয়াছে চিন্ময় অনুভব করে নাই। তাহার মন একই কথা চিন্তা করিতে করিতে একটু স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ চমক ভাঙিয়া সে সজাগ হইয়া উঠিল।

অতি নিকটে ঠুং করিয়া একটি শব্দ। রিক্সাতে যেমন ঘণ্টি বাজে সেই রকম। কিন্তু ঘণ্টি একবার বাজিয়াই থামিয়া গেল, আর বাজিল না। চিন্ময়ের চক্ষু অন্ধকারে খানিকটা অভ্যস্ত হইয়াছিল, সে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া যেদিক হইতে শব্দ আসিতেছে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

পাঁচ-ছয় গজ দূরে যেন কি-একটা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। রিক্সা বলিয়াই মনে হয়। সেটা নড়িতেছে। আর একবার ঠুং করিয়া শব্দ হইল, আবার সঙ্গে সঙ্গে নীরব হইল। চিন্ময় ভাবিল, বোধহয় কোনও রিক্সাওয়ালা এখানে ঘাসের উপর শুইয়া ঘুমাইবার উপক্রম করিতেছে।

তারপর তাহার ভুল ভাঙিয়া গেল। একটা মোটর গাড়ি রাস্তা দিয়া আসিতেছিল, তাহার হেড লাইটের তির্যক ছটায় সমস্ত দৃশ্যটা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।—

রিক্সাই বটে। রিক্সার মধ্যে একটা স্ত্রীলোকের দেহ আড় হইয়া পড়িয়া আছে; একটা পুরুষ রিক্সার পাশে দাঁড়াইয়া স্ত্রীলোকের দেহটাকে টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে। আলোর ছটা গায়ে পড়িতেই লোকটা ঘাড় ফিরাইয়া সেই দিকে চাহিল; বাঘের মত ভারি হাম্‌দো একটা মুখ, কিন্তু মুখে ভয় মাখানো। কপালের বাঁ-পাশে ভুরুর উপর লম্বা একটা কালো দাগ।

মোটর চলিয়া গেল। আবার অন্ধকার। চিন্ময়ের বুক ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল, সে মাত্র ছয়-সাত হাত দূরে বসিয়া আছে; কিন্তু লোকটা তাহাকে দেখিতে পায় নাই। লোকটা যে স্ত্রীলোকটিকে খুন করিয়া রিক্সাতে তুলিয়া এই পার্কে ফেলিয়া দিতে আসিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সে চিন্ময়কে দেখিতে পায় নাই এই ভাগ্য, দেখিতে পাইলে নিশ্চয় তাহাকেও খুন করিত। একবার তাহার মুখ দেখিয়াই চিন্ময় বুঝিয়াছে, হিংস্র ভয়ংকর প্রকৃতির লোক।

ধপ করিয়া শব্দ হইল। চোখে কিছু দেখা গেল না, কিন্তু চিন্ময় কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিল, লোকটা মৃতদেহ টানিয়া রিক্সা হইতে মাটিতে ফেলিল। তারপর কিছুক্ষণ সাড়া-শব্দ নাই। চিন্ময় নিশ্বাস বন্ধ করিয়া রহিল; কিছুক্ষণ পরে অপেক্ষাকৃত দূরে ঠুং করিয়া শব্দ হইল। লোকটা রিক্সা লইয়া চলিয়া যাইতেছে।

চিন্ময় আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা অসহ্য পলায়ন-স্পৃহায় ছটফট করিয়া উঠিল। মৃতদেহটা অদূরে এক চাপ গভীরতর অন্ধকারের মত পড়িয়া আছে; চিন্ময় গাছতলা হইতে উঠিয়া নিঃশব্দে বিপরীত দিকে পা বাড়াইল। পুলিসে খবর দিবার কথা তাহার মনে আসিল না; কোনও ক্রমে এখান হইতে পলায়ন করিতে পারিলেই সে বাঁচে।

গৃহে ফিরিয়া চিন্ময় দেখিল দরজা ভেজানো রহিয়াছে। সামনের ঘরে তক্তপোশের উপর তাহার শয়নের ব্যবস্থা। সে নিঃশব্দে গিয়া শয়ন করিল। তাহার মাথা গরম হইয়া উঠিয়াছিল, তবু সে চোখ বুজিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ঘুম সহজে আসিল না; তাহার নিজের চাকরির চিন্তা ছাপাইয়া ওই ভয়ংকর হাম্‌দো মুখখানা বারবার তাহার চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

সকালবেলা ঘুম ভাঙিবার পর কিন্তু গত রাত্রির ঘটনা দুঃস্বপ্নের মত তাহার মনের পশ্চাৎপটে সরিয়া গেল, ইন্টারভিউ দিবার তাড়া অন্য সব চিন্তাকে আড়াল করিয়া দিল। কাল রাত্রে সে যাহা দেখিয়াছিল তাহার জীবনে নিতান্তই তাহা আকস্মিক ঘটনা, সে দর্শক মাত্র, এই ঘটনার সহিত তাহার নাড়ীর যোগ নাই। যে লোকটার মুখ এখনো তাহার অন্তরপটে আঁকা রহিয়াছে, এ জীবনে হয়তো আর তাহার সহিত দেখা হইবে না।

ধোপদস্ত জামা-কাপড় পরিয়া মামা-মামীকে প্রণাম করিয়া চিন্ময় বাহির হইল।

সওদাগরী অফিসের প্রকাণ্ড প্রাসাদে খোঁজ-খবর লইয়া সে একটি কক্ষে উপনীত হইল। সেখানে আরও কয়েকটি উমেদার উপস্থিত আছে। যে অফিসারের সঙ্গে ইন্টারভিউ তিনি পাশের ঘরে আছেন, একে একে প্রার্থীদের ডাক পড়িতেছে।

সকলের শেষে চিন্ময়ের ডাক পড়িল। সে দুরু দুরু বক্ষে পাশের ঘরে প্রবেশ করিল, সেখানে টেবিলের সামনে যিনি বসিয়া আছেন, তাঁহার মুখ দেখিয়া সে একেবারে কাঠ হইয়া গেল।

সেই হাম্‌দো মুখ, সেই বাম ভুরুর উপর আর একটা ভুরুর মত লম্বা কাটা দাগ। উপরন্তু নিকট হইতে মুখের আরও কয়েকটা বৈশিষ্ট্য প্রকট হইল; নাকটা স্থূল এবং মাংসল, চোখ দুটাতে বিষাক্ত নৃশংসতা, নাকের নিচে চৌকশ ছাঁটা গোঁফ, দুই কানের নিচে চোয়ালের হাড় উঁচু হইয়া আছে। বলিষ্ঠ পেশীবদ্ধ

শরীর। বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ।

ইনিই গত রাত্রির রিক্সাওয়ালা এবং এই অফিসের দোর্দণ্ডপ্রতাপ বড়বাবু লালগোপাল মল্লিক। চিন্ময় টেবিলের পাশে দাঁড়াইয়া বিহ্বলচক্ষে চাহিয়া রহিল।

লালগোপালবাবুর কেবল চক্ষে বিষ আছে এমন নয়, জিহ্বাও বিষ মাখানো, তিনি চিন্ময়কে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, 'লবাবজাদা নাকি! নমস্কার করতেও জান না?'

চিন্ময় চমকিয়া হাত তুলিয়া নমস্কার করিল, অধর লেহন করিয়া বলিল, 'আজ্ঞে—'

লালগোপালবাবু ভেংচি কাটিলেন, 'আজ্ঞে! খুব শৌখীন জামা-কাপড় চড়িয়েছ দেখছি। তোমার চাকরিতে কী দরকার? বৈঠকখানায় তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে গড়গড়া টানলেই পারো।'

'আজ্ঞে—' বলিয়া এবারও চিন্ময় থামিয়া গেল।

টেবিলের উপর লালগোপালবাবুর সামনে চিন্ময়ের দরখাস্তটা রাখা ছিল, তিনি তাহার উপর একবার চোখ বুলাইয়া বলিলেন, 'এ দরখাস্ত তোমার নিজের হাতে লেখা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'খাসা হাতের লেখা! একেবারে মুক্তো ছড়িয়ে দিয়েছ!' লালগোপালবাবু হঠাৎ ফাটিয়া পড়িলেন, 'এই হাতের লেখা নিয়ে তুমি চাকরি করতে এসেছ! যাও যাও— এ অফিসে ঝাড়ুদারের চাকরিও তুমি পাবে না।' বলিয়া দরখাস্তটা মুঠি পাকাইয়া তিনি রদ্দি কাগজের চ্যাঙারিতে ফেলিয়া দিলেন। চিন্ময়ের প্রতি তাঁহার রূঢ়তার কোনও কারণ ছিল না; কিন্তু এক জাতীয় লোক আছে যাহারা অসহায় ব্যক্তির প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ করিয়া তৃপ্তি পায়, ইহাই তাহাদের মানস বিলাস।

চিন্ময়ের মনটা এতক্ষণ মোহাচ্ছন্ন হইয়া ছিল, এখন যেন চাবুকের ঘা খাইয়া সচেতন হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাথা গরম হইয়া গেল। কী! এই খুনী লোকটা তাহাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিবে? অপমান করিবে? চিন্ময় যখন কথা কহিল তখন তার মুখের ভাব বদলাইয়া গিয়াছে, ক্রোধের বশে বোধ করি চরিত্রও বদলাইয়া গিয়াছে। সে লালগোপালবাবুর চোখে চোখ রাখিয়া বলিল, 'চাকরি তাহলে দেবেন না?'

লালগোপালবাবু গর্জন করিয়া বলিলেন, 'না, দেব না। তোমার মত অপদার্থ লোক আমার চাই না। যাও।'

চিন্ময়ের মুখে একটা শুষ্ক বিকৃত হাসি দেখা দিল। সে বলিল, 'যাচ্ছি। কোথায় যাচ্ছি জানেন? পুলিসে খবর দিতে যাচ্ছি।' বলিয়া সে দ্বারের দিকে চলিল।

সে দ্বার পর্যন্ত গিয়াছে, পিছন হইতে ডাক আসিল, 'ওহে, শুনে যাও।'

চিন্ময় ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, লালগোপালবাবুর বিষাক্ত চোখে শঙ্কার ছায়া পড়িয়াছে; সে ফিরিয়া গিয়া টেবিলের পাশে দাঁড়াইল। লালগোপালবাবু সতর্ক স্বরে বলিলেন, 'পুলিসের কথা কী বলছিলে?'

চিন্ময় বলিল, 'কাল রাত্রে পার্কে যা দেখেছি, তাই পুলিসকে বলতে যাচ্ছি।'

লালগোপালবাবু নিশ্চল চক্ষে চিন্ময়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার কপালের দুই পাশে দুইটা শিরা স্ফীত হইয়া উঠিল। চিন্ময়ের আশঙ্কা হইল তিনি এখনি তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িয়া তাহার টুঁটি টিপিয়া ধরিবেন।

সে পিছু হটিতে হটিতে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। লালগোপালবাবু রুমাল বাহির করিয়া মুখ এবং ঘাড় মুছিলেন।

'শোনো—শোনো।'

চিন্ময় থামিল।

লালগোপালবাবু রদ্দির চ্যাঙারি হইতে চিন্ময়ের দরখাস্ত তুলিয়া লইয়া টেবিলের উপর ইস্তিরি করিতে করিতে বলিলেন, 'কি নাম তোমার—চিন্ময় ঘোষাল? আই. এ. পাস করেছ দেখছি। তা বেশ, তোমাকে চাকরি দেব। কাল থেকে কাজে আসবে।'

চিন্ময় নির্বাক দাঁড়াইয়া রহিল। তখন লালগোপালবাবু বলিলেন, 'যে কাজের জন্যে অ্যাপ্লাই করেছ তার মাইনে পঁচাত্তর টাকা, তা তোমাকে পুরোপুরি একশ' টাকাই করে দিলাম। কাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাবে। আর দেখো, তুমি ছেলেমানুষ তাই বলছি, পুলিসের হাঙ্গামায় যেও না, শেষে নিজেই জড়িয়ে পড়বে। আচ্ছা, আজ তুমি যেতে পার।'

চিন্ময় তবু দাঁড়াইয়া রহিল। সে লক্ষ্য করিল না যে লালগোপালবাবুর মুখের কথার সহিত চোখের দৃষ্টির সঙ্গতি নাই, চোখ দু'টা আগের মতই বিষ বিকীর্ণ করিতেছে। চিন্ময়ের মনের মধ্যে প্রচণ্ড দড়ি টানাটানি আরম্ভ হইয়াছে। একদিকে লোভ—আশাতীত মাহিনার চাকরি; অন্যদিকে—অশেষ হয়রানি, পুলিসের টানাটানি। সে গরীবের ছেলে, দু'পয়সা উপার্জন করিয়া কোনও ক্রমে বাঁচিয়া থাকিতে চায়—

চিন্ময় মনস্থির করিবার পূর্বেই বাধা পড়িল। বাহিরে মশমশ জুতার শব্দ; তারপর পুলিস অফিসারের ইউনিফর্ম পরা তিন ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করিলেন।

যিনি সর্বাগ্রে আসিলেন তিনি বয়স্থ ব্যক্তি, বড় দারোগা; তাঁহার পিছনে দুইজন সাব-ইন্সপেক্টর। তাঁহাদের আসিতে দেখিয়া লালগোপালবাবুর মুখখানা কেমন একরকম হইয়া গেল, তিনি চেয়ার হইতে অর্ধোত্থিত হইয়া শীর্ণস্বরে বলিলেন, 'কি—কি চাই?'

দারোগাবাবু বলিলেন, 'আমরা থানা থেকে আসছি। আপনার নাম লালগোপাল মল্লিক?'

লালগোপালবাবুর মুখ দিয়া সহসা কথা বাহির হইল না, তিনি কেবল ঘাড় নাড়িলেন।

দারোগাবাবু অনাহূত একটি চেয়ারে বসিলেন। তাঁহার দেহ এবং মুখের গঠনে এমন একটি কঠোর দৃঢ়তা আছে, যাহা এক পক্ষে আশ্বাসজনক এবং অন্য পক্ষে বিশেষ ভয়প্রদ। তিনি স্থির দৃষ্টিতে লালগোপালবাবুর দিকে চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'আপনার স্ত্রী কোথায় লালগোপালবাবু?'

লালগোপালবাবুর কাছে পুলিসের আগমন অবশ্য অপ্রত্যাশিত নয়, তবু পুলিস দর্শনে তিনি প্রবল ধাক্কা খাইয়াছিলেন। এখন নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিলেন, 'আমার স্ত্রী—চঞ্চলা?'

দারোগাবাবু বলিলেন, 'আপনার স্ত্রীর নাম চঞ্চলা? তিনি কোথায়?'

'সে—সে কাল সন্ধ্যেবেলা বাপের বাড়ি গিয়েছে। কেন বলুন দেখি?'

'তাঁর বাপের বাড়ি কোথায়?'

'কলকাতাতেই। বাগবাজারে। কিন্তু আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

দারোগাবাবু আরও কিছুক্ষণ নিবিষ্ট চক্ষে লালগোপালবাবুকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, 'আপনার স্ত্রী মারা গেছেন। আজ সকালে একটা পার্কে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া গেছে।'

লালগোপালবাবু লাফাইয়া উঠিয়া থিয়েটারি ভঙ্গিতে চিৎকার করিয়া উঠিলেন, 'কী—কি বললেন! চঞ্চলা মারা গেছে! পার্কে তার লাশ পাওয়া গেছে?'

দারোগা অবিচলিত স্বরে বলিলেন, 'হ্যাঁ। দু'জন লোক লাশ সনাক্ত করেছেন।

আপনার বাসা পার্ক থেকে বেশী দূর নয়।'

লালগোপালবাবু দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া আবার বসিয়া পড়িলেন, দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া হৃদয়বিদারক স্বরে বলিলেন, 'উঃ! এ যে আমার কল্পনার অতীত।'

দারোগা বলিলেন, 'আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।'

লালগোপালবাবু মুখ তুলিলেন, 'প্রশ্ন? তা করুন, কি প্রশ্ন করবেন করুন।'

দারোগা প্রশ্ন আরম্ভ করিলেন। উত্তরে লালগোপালবাবু বলিলেন, চঞ্চলা তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, বয়স আটাশ বছর, সন্তানাদি নাই। তাহার বাপের বাড়ি কলিকাতাতেই, তাই ইচ্ছা হইলেই সে বাপের বাড়ি গিয়া দু' একদিন কাটাইয়া আসিত। গতকল্য লালগোপালবাবু অফিস হইতে ফিরিলে চঞ্চলা বাপের বাড়ি যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তিনি অনুমতি দান করেন। চঞ্চলা ট্যাক্সি চড়িয়া চলিয়া যায়; তাহার গায়ে সাধারণ আটপৌরে গহনা ছিল, চুড়ি, বালা, হার ইত্যাদি। পরিধানে সবুজ রঙের শাড়ি ছিল।

দারোগাবাবু বলিলেন, 'গয়না গায়ে পাওয়া যায়নি। হত্যাকারী হাতের চুড়ি টেনে-হিঁচড়ে খুলে নিয়েছে, হাতের চামড়া ছিঁড়ে গেছে। যা হোক—'

আবার প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হইল। লালগোপালবাবুর বাড়িটি পৈতৃক। ছোট বাড়ি তাই ভাড়াটে রাখেন নাই, নিজেরাই থাকেন। কেবল বাড়ির উঠানটি কয়েকজন রিক্সা-ওয়ালাকে ভাড়া দিয়াছেন, তাহারা রাত্রিকালে তাহাদের রিক্সাগুলি এখানে রাখিয়া যায়।

গত রাত্রে চঞ্চলা বাপের বাড়ি চলিয়া যাইবার পর লালগোপালবাবু সারাক্ষণ বাড়িতেই ছিলেন, তারপর আজ সকালে অফিসে আসিয়াছেন। স্ত্রীর সম্বন্ধে তিনি আর কিছু জানেন না। স্ত্রীর মৃত্যু তাঁহার কাছে শক্তিশেল তুল্য আঘাত।

জেরা শেষ করিয়া দারোগা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন, 'আপনি আমার সঙ্গে চলুন। লাশ অবশ্য অন্য লোক সনাক্ত করেছে; কিন্তু আপনি নিকটতম আত্মীয়, আপনাকেও সনাক্ত করতে হবে।'

লালগোপালবাবু ভীতভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'না না, দারোগাবাবু, তার মরা মুখ আমাকে দেখতে বলবেন না।'

দারোগা বলিলেন, 'মৃতদেহ আপনার স্ত্রীর কিনা সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে চান না?'

লালগোপালবাবু থতমত হইয়া বলিলেন, 'অ্যাঁ—তা আপনারা যখন বলছেন আমার স্ত্রীর মৃতদেহ—কিন্তু—আচ্ছা চলুন।'

লালগোপালবাবু অনিচ্ছাভরে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন, দারোগাও উঠিলেন। তাঁহারা দ্বারের দিকে পা বাড়াইয়াছেন, এমন সময়—

'দারোগাবাবু!'

চিন্ময় এতক্ষণ ঘরের এক কোণে নিশ্চল দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিতেছিল। লাল-গোপালবাবু যখন স্ত্রীর মৃত্যুতে শোক ও বিস্ময় প্রকাশ করিতেছিলেন তখন শুনিতে শুনিতে তাহার সর্বাঙ্গ জ্বালা করিতেছিল, কিন্তু সে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করে নাই। তাহার মনে চাকরির আশাটা একেবারে নির্মূল হইয়া যায় নাই। কিন্তু দারোগাবাবু যখন লালগোপালবাবুকে স্ত্রী-হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত না করিয়া তাঁহাকে লাশ দেখাইবার জন্য গমনোন্মুখ হইলেন, তখন চিন্ময়ের অন্তর হইতে একটা দ্বিধাহীন বিদ্রোহ বাহির হইয়া আসিল।—চুলোয় যাক চাকরি। এই নৃশংস নারীহন্তাকে সে দিবে না, সে দারোগাবাবুকে সত্য কথা বলিবে।

'দারোগাবাবু!'

দারোগা ফিরিলেন। লালগোপালবাবু চিন্ময়কে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া সমস্ত কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। তিনি ঝাঁপাইয়া গিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন, উগ্র স্বরে বলিলেন, 'তুমি এখানে কি করছ! যাও যাও, বাইরে যাও—'

দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে ও?'

লালগোপালবাবু বলিলেন, 'কেউ না, কেউ না, একটা চ্যাংড়া ছোঁড়া। চাকরির জন্যে এসেছিল—'

চিন্ময় বলিল, 'চাকরি চাই না। দারোগাবাবু, ইনিই নিজের স্ত্রীকে খুন করেছেন—'

লালগোপালবাবু দু' হাতে চিন্ময়ের গলা টিপিয়া ধরিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন, 'মিথ্যে কথা। মিথ্যে কথা। আমি কিছু জানি না—'

সাব-ইন্সপেক্টর দুইজন আসিয়া জোর করিয়া চিন্ময়কে ছাড়াইয়া লইল।

লালগোপালবাবু হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, 'মিথ্যেবাদী রাস্কেল। আমার নামে মিথ্যে বদনাম দিচ্ছে। দারোগাবাবু, আমি আমার স্ত্রীকে মারিনি, মেরেছে তার—তার ভাবের লোক, শ্যামল ঘোষ। ওই পার্কে ওরা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা করত—'

দারোগা ইশারা করিলেন, দুইজন সাব-ইন্সপেক্টর লালগোপালবাবুর দুই পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন, যাহাতে তিনি যথেচ্ছা নড়িতে চড়িতে না পারেন। দারোগা চিন্ময়ের হাত ধরিয়া চেয়ারে লইয়া গিয়া বসাইলেন, শান্ত স্বরে বলিলেন, 'এবার কি বলবে বল।'

গলা টিপুনি খাইয়া চিন্ময়ের সর্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল, সে কোনোমতে আত্মসংবরণ করিয়া গত রাত্রির ঘটনা বিবৃত করিল। লালগোপালবাবু মাঝে মাঝে উন্মত্তের ন্যায় বাধা দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার আবোলতাবোল প্রলাপে কেহ কর্ণপাত করিল না।

চিন্ময়ের বয়ান শেষ হইলে দারোগা ক্ষণেক চিন্তা করিলেন, শেষে একজন সাব-ইন্সপেক্টরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'নরেশ, তুমি অফিসে যাও, একটা সার্চ-ওয়ারেণ্ট লিখিয়ে নিয়ে এস। লালগোপাল মল্লিকের বাড়ি খানাতল্লাশ করতে হবে। উনি যদি অপরাধী হন, মৃতের গয়নাগুলো হয়তো বাড়িতেই আছে। চুড়ি খোলবার সময় হাতের চামড়া ছড়ে গিয়েছিল, সম্ভবত চুড়িতে চামড়া এখনো লেগে আছে। তুমি চটপট ব্যবস্থা কর।' দারোগা উঠিলেন, 'লালগোপালবাবু, আপনাকে থানায় যেতে হবে। চিন্ময়, তুমিও চল। তোমার জবানবন্দী লিখে নিতে হবে।'

সারাদিন চিন্ময়ের থানায় কাটিল। বড় ছোট মাঝারি নানা শ্রেণীর পুলিস অফিসার আসিয়া তাহাকে সওয়াল-জবাব করিলেন, সে সত্য কথা বলিতেছে কিনা যাচাই করিলেন। তাহার এজাহার লিখিয়া লওয়া হইল। চিন্ময় কয়েক পেয়ালা চা পান করিয়া দিন কাটাইয়া দিল।

ওদিকে লালগোপালবাবুর গৃহ খানাতল্লাশ করিয়া গহনা পাওয়া গিয়াছে, চুড়িতে সংলগ্ন চামড়া হইতে নিঃসংশয়ে প্রমাণ হইয়াছে যে, মৃত্যুকালে লালগোপাল-বাবুর স্ত্রীর গায়ে ওই সব গহনা ছিল। একটা রিক্সাতে অল্প রক্তের দাগও পাওয়া গিয়াছে। লালগোপালবাবু কিন্তু হাজতে বসিয়া ক্রমাগত অপরাধ অস্বীকার করিয়া চলিয়াছেন; তিনি পাগলের মত বলিয়া চলিয়াছেন যে, শ্যামল ঘোষ চণ্ডলাকে খুন করিয়াছে। তাহাতে উল্টো ফল হইতেছে, স্ত্রীকে খুন করার যে বলবান মোটিভ ছিল তাহা প্রমাণ হইতেছে। কিন্তু তাহা বুঝিবার মত মনের অবস্থা তাঁহার নাই।

সন্ধ্যার সময় চিন্ময়ের দেহ-মন অবসাদে ও ক্লান্তিতে ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম

করিল। সে কাতর স্বরে দারোগাকে বলিল, 'দারোগাবাবু, এবার আমাকে ছেড়ে দিন। বাড়িতে মামা-মামীমা হয়তো ভাবছেন আমি গাড়ি চাপা পড়েছি—'

দারোগা বলিলেন, 'আচ্ছা, আজ তুমি যাও। কাল সকালে আবার আসবে।'

চিন্ময় হতাশ চক্ষে চাহিয়া বলিল, 'আবার কাল!'

দারোগা কহিলেন, 'হ্যাঁ। তুমি এ মামলার প্রধান সাক্ষী, তোমাকে এখন রোজ আসতে হবে। ট্রায়েলের সময় আসামীর উকিলের জেরায় তুমি ভেঙে না পড়ো সেজন্যে তোমাকে আমরা রোজ জেরা করব, তোমার স্মৃতিশক্তিকে ঘষে মেজে ঝকঝকে করে রাখব।'

চিন্ময় ক্ষীণ স্বরে বলিল, 'কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'আমাকে যে আবার চাকরির খোঁজে বেরুতে হবে দারোগাবাবু।'

দারোগাবাবুর মুখ অপ্রসন্ন হইল, তিনি বলিলেন, 'ওসব পরের কথা। খুনের মামলা আগে। আজ বাড়ি যাও। কাল সকালে ন'টার মধ্যে এসো।'

তারপর তিন মাস কাটিয়া গিয়াছে। এই তিনটি মাস চিন্ময়ের জীবনে একটা অবিস্মরণীয় বিভীষিকা। তাহাকে প্রথমে কমিটিং কোর্টে এবং পরে বড় আদালতে দাঁড়াইয়া দিনের পর দিন সাক্ষ্য দিতে হইয়াছে, আসামীর উকিলের কুটিল জেরার ফাঁদ বাঁচাইয়া চলিতে হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত লালগোপালবাবু চরম দণ্ড পাইয়াছেন। কিন্তু চিন্ময়ের শরীর মন একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে।

মোকদ্দমা শেষ হইবার পর সে আবার চাকরির সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু এখনও চাকরি পায় নাই।

ডিক্‌টেটর

পুণাতে আমার বাড়ির সামনে রাস্তার ওপারে একটা বড় গোছের মাঠ আছে। এবড়োখেবড়ো খানাখন্দ-ভরা মাঠ; বর্ষাকালে যখন মাঠে কাঁচ সবুজ ঘাস গজায় এবং খানাখন্দ জলে ভরে ওঠে, তখন একটা ছেলে একপাল মোষ নিয়ে এখানে চরাতে আসে।

হাতীর মত প্রকাণ্ড দশ-বারোটা মোষ। যে-ছেলেটা চরাতে আসে তার গায়ের

রঙ মোষের মতই কালো। তার শরীরের খাড়াই দেড় হাত, কোমরে ঘুন্‌সি ছাড়া লজ্জা নিবারণের আর কোনো উপকরণ নেই, পেন্সিলের মত একটি লাঠি। বয়স বড় জোর সাত বছর। মারাঠীরা বেঁটে জাত; ছেলেটার বয়সের অনুপাতে শারীরিক দৈর্ঘ্যের কোনো অসঙ্গতি নেই।

আমি বারান্দায় বসে ওই ছেলেটাকে এবং ওর অধীনস্থ মোষগুলোকে দেখি, আর অবাক হয়ে যাই। কী অখণ্ড প্রতাপ ছেলেটার। মোষগুলো যদি বাঁ পায়ে চাট মারে তাহলে ছেলেটা বোধহয় পুণা ডিঙিয়ে মহাবলেশ্বরে পোঁছে যায়, তাদের ধারালো বাঁকা শিঙ একটু নাড়লে ছেলেটা শূলবিদ্ধ হয়ে পটল তোলে। কিন্তু ছেলেটার প্রাণে ভয়-ডর নেই, মোষগুলো যেন তার খেলার সাথী। আর মোষগুলোর ভাবগতিক দেখে মনে হয় তারা ওর খাস তালুকের প্রজা।

মোষ নামক জন্তুটা দেখতে ভয়ঙ্কর, কিন্তু এমন নিরীহ জীব বোধহয় পৃথিবীতে নেই। বন্য অবস্থায় ওরা হয়তো ভয়ঙ্কর ছিল, কিন্তু মানুষের সংসর্গে এসে একেবারে বৈষ্ণব হয়ে পড়েছে। তবু দু' একবার ওদের ক্ষিপ্র রোষ দেখেছি; দুটো মোষ হঠাৎ শিঙে শিঙ আটকে মল্লযুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে, রক্তারক্তি কাণ্ড। কিন্তু তা এতই বিরল যে সেটা ওদের চরিত্রের ব্যতিক্রম বলে ধরা যেতে পারে।

আমি বসে বসে ওদের কার্যকলাপ দেখি। ছেলেটা মাঠের মাঝখানে পেন্সিলের মত লাঠি কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মোষগুলো চরতে চরতে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়েছে। দু' একটা মোষ রাস্তার কিনারার দিকে চলেছে। ছেলেটা অমনি মুখে টক্ টক্ টকাস্ টকাস্ শব্দ করল। মোষগুলো ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকালে, ছেলেটা লাঠি ঘুরিয়ে তাদের কী ইশারা করল জানি না, তারা মোড় ফিরে রাস্তার ধার থেকে সরে এল। ছেলেটা তখন নিশ্চিন্ত মনে গুলি-ডাণ্ডা খেলতে লাগল। তার সঙ্গী-সাথী নেই, খেলার দোসর নেই, সারাদিন একলাটি মোষগুলোকে নিয়ে কাটিয়ে দেয়।

দুপুরবেলা মোষগুলো জলে ভরা খানাখন্দের মধ্যে নেমে যায়, গলা বের করে বসে থাকে। পুণায় বর্ষাকালে ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি হয় না, কখনো রিমঝিম বৃষ্টি, কখনো ফিস্‌ফিস্ ইল্‌শেগুঁড়ি। আকাশ কিন্তু সারাক্ষণ মেঘে ঢাকা থাকে, সূর্যদেব মলমলের ঘোমটার আড়াল থেকে স্নিগ্ধ প্রভা বিকীর্ণ করেন। পুণায় সালিয়ানা বৃষ্টি মাত্র পঁচিশ ইঞ্চি; তাই পুণার বর্ষা এত মধুর।

বিকেলবেলা মোষগুলো জল থেকে বেরিয়ে আসে, আবার মাঠে চরে বেড়ায়। কখনো বা সবাই একজোট হয়ে ঘাসের ওপর বসে, নিশ্চিন্তভাবে রোমন্থন করে। ছেলেটা তখন কোনো একটা মোষের প্রশস্ত পিঠের ওপর গিয়ে শোয়, বোধহয় একটু ঘুমিয়ে নেয়। অন্য মোষগুলো গলা বাড়িয়ে তার গা চেটে আদর জানায়।

মানুষ ও পশুর মধ্যে নিবিড় সখ্য। আবার একদিকে কঠিন শাসন, অন্যদিকে নির্বিবাদ আনুগত্য। এই সম্পর্কের মূলে কোনো হেতু খুঁজে পাওয়া যায় না; যেমন হেতু খুঁজে পাওয়া যায় না মনুষ্য সমাজে ডিক্‌টেটর নামক জীবের।

গত চল্লিশ বছর ধরে কত ডিক্‌টেটর দেখলাম। মুস্তাফা কামাল, মুসোলিনী, হিটলার, স্টালিন, তাছাড়া ক্ষুদে ডিক্‌টেটর তো অসংখ্য। এরা কিসের জোরে এমন একাধিপত্য করে? কোথায় এদের শক্তির উৎস? কেন দেশসুদ্ধ লোক গড্ডলিকা প্রবাহের মত এদের অনুসরণ করে, কেন কান ধরে এদের গালে থাবড়া মারে না? আমি আজ পর্যন্ত এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাইনি। কিন্তু উত্তর যেমনই হোক, এই মেষপালক ছেলেটা যে একজন খাঁটি ডিক্‌টেটর তাতে সন্দেহ নেই। তার এই অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় একদিন হাতে হাতে পেয়েছিলাম বলেই আজ এই কাহিনীর অবতারণা।

আমার দু'নম্বর নাতি বম্বেতে তার মা-বাপ জেঠাজেঠির কাছে থাকে, মাঝে মাঝে সবাই মিলে পুণায় আসে। মধ্যম নাতির বয়স পাঁচ বছর, অতিশয় ক্ষীণকায় ব্যক্তি। হাত-পা কাঠির মত। তাই তার নাম রেখেছি কাঠিচরণ।

গত বছর শ্রাবণ মাসে কাঠিচরণ পুণায় এসেছে। পুণায় তখন বেশ ঠাণ্ডা, তার ওপর সে একটু শীত-কাতুরে। তার জেঠাই তাকে গরম জামাকাপড় পরিয়ে দিয়েছে। সে বাগানে কুকুর কালীচরণের সঙ্গে খেলা করছে।

বিকেলবেলা বৃষ্টি থেমেছে, মেঘের আড়ালে সূর্যদেব ঝিক্‌মিক্‌ করছেন: কাঠিচরণ আমাকে বলল, 'দাদু, আমি পেশোয়া পার্কে হনুমান দেখতে যাব।'

বললাম, 'হনুমান দেখার জন্যে পেশোয়া পার্কে যাবার কী দরকার?'

বক্রোক্তিটা সে বুঝল কিনা জানি না, গম্ভীর মুখে বলল, 'পেশোয়া পার্কের হনুমানদের লম্বা লেজ আছে।'

বললাম, 'তা বটে। চল তবে দেখে আসা যাক।'

বলা বাহুল্য, পেশোয়া পার্কে একটি ছোটখাটো চিড়িয়াখানা আছে। বাঘ, সিংহ, খট্টাস, নানা জাতের বানর, নানা জাতের পাখি, সব আছে। তাই শিশুদের কাছে স্থানটি পরম লোভনীয়।

কাঠিচরণকে নিয়ে বেরুলাম। সামনেই মাঠ, মাঠের ওপারে পেশোয়া পার্ক। রাস্তা দিয়ে যেতে গেলে একটু ঘুর পড়ে, তাই মাঠের ভিতর দিয়ে চললাম।

মাঠ বেশ ভিজে ভিজে। মোষগুলো এদিক-ওদিক চরে বেড়াচ্ছে। আমি আর কাঠিচরণ সাবধানে খানাখন্দ বাঁচিয়ে মাঠের মাঝামাঝি পৌঁছেছি, হঠাৎ চোখ তুলে একেবারে চক্ষুস্থির। বিভিন্ন দিক থেকে দশ-বারোটা মোষ ঘাড় বেঁকিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের তাকানোর ভঙ্গিটা ভাল নয়। বিরাগপূর্ণ ভাব। যেন আমাদের দেখে তারা চটেছে।

তারপরেই চোখে পড়ল, কাঠিচরণের গায়ে লাল রঙের সোয়েটার। গরু-মোষ যে লাল রঙ দেখলেই চটে যায় এটা আগে খেয়াল করিনি। সর্বনাশ!

মোষগুলো বিভিন্ন দিক থেকে আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। একটা মদ্দা মোষ 'গোঁ—' শব্দ করল, তারপর সবাই শিঙ বাগিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। ব্যাকুল চক্ষে চারিদিকে তাকালাম। কিন্তু পালাব কোথায়? মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি, মহিষ-ব্যূহ ভেদ করে পালাবার রাস্তা নেই। কাঠিচরণ রোগা হলেও বুদ্ধিমান ছেলে, ব্যাপার বুঝতে পেরেছিল। সে হাঁচোড়-পাঁচোড় করে আমার কাঁধে চড়ে বসল।

নিরুপায় হয়ে মহিষমর্দিনী দুর্গার নাম জপ করছি, কিন্তু কোন ফল হচ্ছে না। মোষগুলো সপ্তরথীর মত ঘিরে ধরেছে, দশ-বারো গজের মধ্যে এসে পড়েছে। আর রক্ষে নেই। সবাই মিলে একসঙ্গে শিঙ নাড়বে আর আমরা শিককাবাব হয়ে যাব।

চোখ বুজে প্রতীক্ষা করছি, আর দেরি নেই। হঠাৎ কানে শব্দ এল—টক্‌ টক্‌ টকাস্‌ টকাস্‌! চোখ খুলে দেখি মোষগুলো দাঁড়িয়ে পড়েছে, আর এগুচ্ছে না। তারপর মোষগুলোর পিছন দিক থেকে তীক্ষ্ন আওয়াজ হল—'হি'—ই'—ই'—ই'—।'

মোষগুলো একটু ইতস্তত করল। তারপর ফোঁস্‌ ফোঁস্‌ নিশ্বাস ফেলে পাশের দিকে ফিরল। সম্মোহিতের মত দাঁড়িয়ে দেখছি, তারা আমাদের দিকে পিছন ফিরল, তারপর যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে ঘাস খেতে খেতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তখন দেখতে পেলাম পেন্সিলের মত লাঠি হাতে ঘুন্‌সি-পরা ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ গম্ভীর, চোখে ভর্ৎসনার দৃষ্টি।

মনে মনে ন্যাংটা ছেলেটাকে তার অলৌকিক শক্তির জন্যে সাধুবাদ জানালাম, মুখে কিছু বলা হল না, কারণ তার ভাষা জানি না।

কাঠিচরণকে কাঁধে নিয়েই বাড়ি ফিরে এলাম। লম্বা ল্যাজওয়ালা হনুমান দেখার উৎসাহ আর নেই, আজ যা দেখেছি আজকের পক্ষে তাই যথেষ্ট।

ডিক্‌টেটরদের আমরা ভালবাসি না। ওরা মানুষ ভাল নয়, জনগণের শক্তি অপহরণ করে ওরা জনগণকেই নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়। ওদের এই শক্তি অপহরণের চাবিকাঠি কোথায় তা জানি না। কিন্তু এই অতিমানুষিক শক্তি মাঝে মাঝে আমার মত সাধারণ মানুষের খুব কাজে লাগে।

মু ষ্টি যো গ

পুণায় আমার পাশের বাড়ির একতলায় নতুন ভাড়াটে এসেছেন, নাম শম্ভুশঙ্কর লেলে। নাগপুরে না কোথায় এক কলেজে প্রিন্সিপাল ছিলেন, পঞ্চাশোর্ধ্বে অবসর পেয়ে আমাদের পাড়ায় বাসা নিয়েছেন। গ্যাঁটাগোঁটা চেহারা, কপালে ভ্রূকুটি, হাঁটুতে বাত; লাঠি ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেন।

একদিন বাড়ির সামনে রাস্তায় দেখা হয়ে গেল। বিকেলবেলা আমি বেড়াতে বেরিয়েছি, উনিও বেরিয়েছেন। মুখোমুখি হতেই ভাবলাম, নতুন পড়শি, আলাপ পরিচয় করা দরকার। কিন্তু সম্বোধন করেই বোকা বনে গেলাম, তিনি ভুরু কুঁচকে এমন রূঢ়ভাবে জবাব দিয়ে চলে গেলেন যে তার পর আর আলাপ পরিচয় করা চলে না। বুঝলাম, লেলে মশায় কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, পণ্ডিত ব্যক্তি; সামান্য অ-পণ্ডিত পড়শির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চান না।

যাহোক, পণ্ডিত ব্যক্তিদের অবহেলায় আমি অভ্যস্ত, লেলে মশায়ের রূঢ়তা গায়ে মাখলাম না। পরে জানতে পেরেছিলাম, কারুর প্রতি তাঁর পক্ষপাত নেই, সকলের সঙ্গে তিনি সমান ব্যবহার করেন। আমাদের পাড়াটা যে মূর্খের পাড়া, এ কথা তিনিই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

এবার দারুণ গরম পড়েছে। অন্যান্য বার এই সময় মাঝে মাঝে ঝড়বৃষ্টি হয়ে গরম চড়তে দেয় না, এবার বৃষ্টির নামগন্ধ নেই। বিকেলবেলা বাড়ির মধ্যে থাকা যায় না। আমি সাধারণত বেড়াতে বেরুই; কিন্তু আজ একটি বিশেষ কারণে বাড়ির বার হইনি, বাড়ির সামনে বন্ধ ফটকের কাছে চেয়ার পেতে বসেছি।

কারণটি এই। গতরাত্রে পেশোয়া পার্কের চিড়িয়াখানা থেকে একটা হায়েনা

খাঁচা ভেঙে পালিয়েছে। খবরটা আজ সকালে রাষ্ট্র হবার পর থেকে এদিকে লোক চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে, চারিদিকে একটা ছম্‌ছমে ভাব। এদেশে হায়েনাকে তরস্‌ বলে। বোধহয় তরক্ষুর অপভ্রংশ। হায়েনা দেখতে কতকটা বড় জাতের কুকুরের মত, ঘাড় নিচু করে চলে, খট্‌খট্‌ হাসির মত তার ডাক। অত্যন্ত হিংস্র জন্তু, চেহারা দেখলেই ভয় করে। তাই আজ আর বাড়ি থেকে বেরুইনি, হায়েনার নৈশাহারে পরিণত হবার ইচ্ছে নেই। আমার ফটক বেশ উঁচু, তা ডিঙিয়ে হায়েনা আমাকে খাবে সে-সম্ভাবনা নেই।

একলাটি বসে আছি। আরো কয়েকটি চেয়ার সাজানো রয়েছে; কিন্তু আজ যে কেউ আসবে সে-আশা নেই। আমার কুকুর কালীচরণ প্রায়ই আমার সঙ্গে বেড়াতে বেরোয়, আজ দেখছি একলাই বেরিয়েছে। ব্যাটাকে হায়নায় না ধরে। কালীচরণের স্বভাবটা একটু বেশী মিশুক, হায়েনার সঙ্গে যদি বন্ধুত্ব পাতাতে যায়—

ফটকের গরাদের ফাঁক দিয়ে দেখলাম শম্ভুশঙ্কর লেলে লাঠিতে ভর দিয়ে বেড়াতে চলেছেন। একবার ভাবলাম তাঁকে ডেকে হায়েনার কথাটা জানিয়ে দিই, তিনি সম্ভবত জানেন না। তারপরে ভাবলাম, কী দরকার! যে-লোক বিদ্যার অহঙ্কারে মানুষের সঙ্গে কথা কয় না সে অহঙ্কারের ফল ভোগ করুক। আমি মুখ-ঝাম্‌টা খেতে যাই কেন!

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে এমন সময় আমার দুই মারাঠী বন্ধু এলেন। আমারই সমবয়স্ক দু'জন; তাঁদের সমাদর করে বসিয়ে বললাম, 'একি! আপনাদের প্রাণে কি হায়েনার ভয় নেই?'

অভ্যঙ্কর মশায় বললেন, 'হালের খবর আপনি শোনেননি, হায়েনা ধরা পড়েছে।'

পাটিল বললেন, 'রাত্তিরে পালিয়ে জঙ্গলে গিয়েছিল কিন্তু সেখানে খেতে পায়নি। পেটের জ্বালায় আজ বিকেলবেলা নিজেই খাঁচায় ফিরে এসেছে।'

ইতর প্রাণীদের কাছে স্বাধীনতার চেয়ে খাবারের দাম বেশী এই কথা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে, অভ্যঙ্কর মশায় বললেন যে, মানুষ যদি পেট ভরে নিজের পছন্দসই খাবার খেতে পেতো তাহলে সেও স্বাধীনতা চাইত না; এমন সময় দূরে একটা ক্ষীণ চিৎকারের শব্দ শুনে আমরা তিনজন ফটকের বাইরে চোখ ফেরালাম। রাস্তা দিয়ে একটা লোক ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে, আর তার পিছনে বিশ হাত দূরে লাফাতে লাফাতে আসছে কালো একটা জানোয়ার। রাস্তায় অন্য লোক নেই।

গোধূলির ঘোলাটে আলো সত্ত্বেও পলায়মান লোকটিকে চিনতে দেরি হল না, আমার নবাগত প্রতিবেশী শম্ভুশঙ্কর লেলে। তাঁর লাঠি কোথায় গেছে জানি না, পায়ে বাতের ব্যথারও কোনো লক্ষণ নেই; তিনি ছুটে আসছেন রেস্‌-এর ঘোড়ার মত।

আমরা হতভম্ব হয়ে বসে আছি, এক অবিশ্বাস্য কান্ড ঘটল। আমার ফটকের খাড়াই পাঁচ ফুটের কম নয়; শম্ভুশঙ্কর লেলে সেই ফটক এক লাফে ডিঙিয়ে আমাদের মধ্যে এসে পড়লেন এবং একটা চেয়ারে হাত-পা এলিয়ে হ্যা-হ্যা করে হাঁপাতে লাগলেন। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'তরস্‌—হায়েনা—'

কিন্তু কোথায় হায়েনা! ফটকের দিকে চেয়ে দেখি আমার কালীচরণ সমস্ত দাঁত বের করে হাসছে এবং প্রফুল্লভাবে ল্যাজ নাড়ছে। ব্যাপার বুঝতে পারলাম, শম্ভু-শঙ্কর কেলোকে হায়েনা মনে করে দৌড় মেরেছিলেন।

শম্ভুশঙ্কর যে মহাপন্ডিত ব্যক্তি, একথা বোধহয় অবস্থাগতিকে ভুলে গিয়ে-ছিলেন। তিনি একটু দম নিয়ে যা বললেন তার মর্ম এইঃ বেড়াতে বেরিয়ে পেশোয়া পার্কের কাছাকাছি যেতেই একটা অজ্ঞ লোক তাঁকে বলল, 'রাও, বাড়ি ফিরে যাও, একটা তরস্‌ ছাড়া পেয়ে আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে।' শুনেই শম্ভুশঙ্কর

তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে ফিরলেন। খানিক দূরে এসে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, একটা কালো জন্তু তাঁর পিছু নিয়েছে। তিনি দৌড়ুতে আরম্ভ করলেন, তারপর আমাদের দেখতে পেয়ে ফটক ডিঙিয়ে এখানে এসেছেন।

অভ্যংকর গম্ভীর মুখে বললেন, 'হায়েনা নয়, আপনাকে তাড়া করেছিল—কুকুর।'

'কুকুর!' শম্ভুশঙ্কর ভ্রূকুটি করে সোজা হয়ে বসলেন।

পাটিল নীরস স্বরে বললেন, 'তাড়া করেনি। আপনি দৌড়ুচ্ছেন দেখে আপনার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছিল।'

শম্ভুশঙ্কর ফটকের কাছে কালীচরণকে দেখলেন, আমাদের দিকে কট্‌মট্‌ করে তাকালেন; তারপর নিঃশব্দে উঠে চলে গেলেন।

এই ঘটনার পর শম্ভুশঙ্কর আমাদের ওপর মর্মান্তিক চটে গেছেন। আমরা শুধু মুর্খই নয়, তাঁর আত্মমর্যাদায় ভীষণ আঘাত করেছি। এখন আমাদের দেখলে তিনি মুখ ফিরিয়ে চলে যান।

তবে একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে। তাঁর হাঁটুর বাত একেবারে সেরে গেছে। তিনি আর লাঠি ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটেন না, সোজা দুই পায়ে ভর দিয়ে হাঁটেন। দৌড়োদৌড়ি এবং হাই-জাম্প্‌ করলে হাঁটুর বাত সেরে যায় একথা আগে জানতাম না।

গো দা ব রী

পুণার বাঙালীরা রামকানাইবাবুকে একঘরে করেছে, বারোয়ারি পুজোয় চাঁদা আদায় করা ছাড়া তাঁর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না।

বছর দশেক আগে প্রথম যখন আমি পুণায় আসি তখন রামকানাইবাবুর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। আমি নবাগত, তিনি একঘরে; দু'জনেই বিকেলবেলা পেশোয়া পার্কে গিয়ে বসতাম। প্রথমে দূরে থেকে পরস্পরের দিকে আড়চোখে তাকাতাম, ধুতি পরার ধরন থেকে দু'জনেই দু'জনকে বাঙালী বলে চিনতে পেরেছিলাম। তারপর আমিই যেচে আলাপ করলাম। তিনি যেন স্বর্গ হাতে পেলেন।

তাঁর চেহারাটা মধ্যমাকৃতি এবং নিরেট গোছের, দেখে মারাঠী বলে মনে হয়। বয়স পঞ্চাশের নীচে; রঙ ফরসা, মুখে বসন্তের দাগ, চোয়ালের হাড় ভারী, মাথার কাঁচা-পাকা চুল এত ছোট করে ছাঁটা যে টেরি কাটা যায় না। প্রথম আলাপের পর রোজই দেখা হতে লাগল। তারপর একদিন তিনি আমাকে নিজের বাড়িতে ধরে নিয়ে গেলেন।

বাড়িটি তাঁর নিজস্ব, নতুন তৈরি করিয়েছেন। ছোটখাটো ছিমছাম বাড়ি, চারিদিকে প্রকাণ্ড বাগান, দেখে ভারি পছন্দ হয়েছিল। এবং বুঝেছিলাম যে রামকানাইবাবু পয়সা-ওয়ালা লোক।

দার্জিলিঙ চায়ের সহযোগে প্রচুর খাইয়েছিলেন তিনি। বাংলা দেশের মিষ্টি পেয়ে পুলকিত হয়েছিলাম; তখন জানতাম না যে মিষ্টান্নগুলি তাঁর বাড়িতে তৈরি। গোদাবরীকে তখনো দেখিনি। অর্থাৎ—দেখেছিলাম, কিন্তু—

একদিন তিনি আমাকে নৈশ ভোজনের নেমন্তন্ন করলেন। আহারের পর একটু নিষিদ্ধ অনুপানের ব্যবস্থা ছিল। রাত্রি আন্দাজ সাড়ে দশটার সময় রামকানাইবাবু দ্রব্যগুণে মুক্তকণ্ঠ হয়ে পড়লেন, সরলতার প্রবল বন্যায় তাঁর জীবনের কাহিনী বেরিয়ে এল। অসামান্য অভিনবত্ব হয়তো নেই তাঁর কাহিনীতে, কিন্তু শুনে বেশ আমোদ অনুভব করেছিলাম।

তাঁর কাহিনী নীচে লিখছি।—

যৌবনকালে রামকানাইবাবু বোম্বাই এসে ব্যবসা শুরু করেছিলেন। তীক্ষ্ন বাণিজ্য-বুদ্ধির ফলে তিনি অলপকালের মধ্যে গুজরাতী মহলে আসর জাঁকিয়ে বসলেন। তাঁর ভাগ্য ছিল সুপ্রসন্ন, এই সময়ে মহাযুদ্ধ বেধে গেল। তিনি দু'হাতে টাকা লুটতে লাগলেন। মহাযুদ্ধ যখন শেষ হল তখন দেখা গেল তাঁর ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স ফুলে ফেঁপে লাল হয়ে উঠেছে।

কিন্তু ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স যে-পরিমাণ ফাঁপলো, রামকানাইবাবুর শরীর সেই পরিমাণে চুপসে গেল। বোম্বাই-এর যাঁরা বহিরাগত বাসাড়ে তাঁরা জানেন, বম্বে-স্টমাক নামক এক বিচিত্র রোগ আছে; এই রোগ যাকে ধরে তার খেয়ে সুখ নেই, ঘুমিয়ে সুখ নেই, জেগে সুখ নেই; মনটা পাকস্থলীকে কেন্দ্র করে অহর্নিশ ঘুরপাক খেতে থাকে। ডাক্তারেরা তখন মাথা নেড়ে বলেন—যদি প্রাণত্যাগ করতে না চান তো স্থানত্যাগ করুন, এ রোগের ওষুধ নেই। বেশীর ভাগ লোকই স্থানত্যাগ করেন।

মহাযুদ্ধ যখন শেষ হল, তখন রামকানাইবাবুর আয়ের রাস্তাও বন্ধ হয়ে গেল। তিনি ভাবলেন—দূর ছাই, টাকা তো অনেক রোজগার করেছি, আর বেশী রোজগার না করলেও বাকি জীবনটা সুখে-স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে। এখন প্রাণটা রক্ষা করা দরকার। তিনি এক জ্যোতিষীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

জ্যোতিষী মহাশয় রামকানাইবাবুর কোষ্ঠী দেখে ভারী খুশী। বললেন—'আর বাঃ! এ যে পদে পদে রাজযোগ! রোজগার অনেক করেছেন, আর বেশী হবে না। এখন জীবন উপভোগ করুন। শুক্রের মহাদশা আরম্ভ হচ্ছে, স্ত্রী-সুখ, ভোজন-সুখ, বিশ্রাম-সুখ, সবই আপনি পাবেন।'

রামকানাই জিজ্ঞেস করলেন—'আর শরীর-সুখ?'

জ্যোতিষী বললেন—'আপনি কেতুর দশায় শরীর-কষ্ট পেয়েছেন। কিন্তু আর বেশী দিন নয়, শীঘ্রই শরীর নীরোগ হবে।'

রামকানাই জ্যোতিষীকে দক্ষিণা দিয়ে ফুল্লমুখে ফিরে এলেন।

তাঁর সংসার খুবই সংক্ষিপ্ত, ছেলেপুলে নেই; কেবল তিনি আর তাঁর স্ত্রী। বন্ধ্যা স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর ব্যবহারিক ভালবাসা ছিল। মনের দিক দিয়ে খুব যে প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতা ছিল তা নয়, কিন্তু স্ত্রী খুব ভাল রাঁধতে পারতেন, এবং রামকানাই ছিলেন ভোজন-বিলাসী। তিনি স্ত্রীকে মাসে একখানি সোনার গহনা কিনে দিতেন। টাকার দাম যেখানে হুহু শব্দে নেমে যাচ্ছে, সেখানে সোনা একমাত্র অচলপ্রতিষ্ঠ বস্তু; রামকানাইবাবু এক ঢিলে দুই পাখি মারতেন, ঘরে সোনাও আসত, গিন্নীও খুশী থাকতেন। খুশী হয়ে গিন্নী তাঁকে নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন রান্না করে খাওয়াতেন। দু'জনেই দু'জনের কদর

বুঝতেন।

তারপর জ্যোতিষী মহাশয়ের ভবিষ্যদ্বাণী ওলট-পালট করে দিয়ে এক ব্যাপার ঘটল; রামকানাইবাবুর স্ত্রী মাত্র কয়েকদিন জ্বরে ভুগে মারা গেলেন। রামকানাইবাবুর স্ত্রী-সুখ এবং ভোজন-সুখ একসঙ্গে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। তিনি হৃদয়ে যত আঘাত পেলেন, তার চেয়ে বেশী আঘাত পেলেই হৃদয়ের নিকটবর্তী অন্য একটা স্থানে। গৃহিণীর রান্না খেয়ে তিনি কোনো মতে পাকস্থলীকে খাড়া রেখেছিলেন, এবার পাকস্থলী জবাব দিল। বম্বে-স্টমাক সংহার মূর্তি ধারণ করল।

রামকানাই গোয়ানীজ বাবুর্চি রাখলেন, কিন্তু তাতে পেটের যন্ত্রণা বেড়ে গেল; অত গরগরে রান্না রোগা পেটে সহ্য হবে কেন? গোয়ানীজকে বরখাস্ত করে তিনি বাংলা দেশ থেকে রাঁধুনী বামুন আনালেন; কিছুদিন মন্দ চলল না। কিন্তু ক্রমাগত থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড় খেয়ে তাঁর অরুচি ধরল; দিনান্তে অন্ন মুখে দিতে পারেন না। বম্বে-স্টমাক আসর জাঁকিয়ে বসল। রামকানাইবাবু গৃহিণীর রান্না স্মরণ করে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন।

ডাক্তার এলেন, মাথা নেড়ে বললেন—'যদি বাঁচতে চান বম্বে ছেড়ে পালান। এখানে থাকলে বাঁচবেন না।'

রামকানাইবাবু কাতরস্বরে বললেন—'কিন্তু যাব কোথায়। বংলা দেশে দু'দিন থাকলেই আমার ম্যালেরিয়া ধরে।'

ডাক্তার বললেন—'কেন, পুণায় যান না। পুণার স্বাস্থ্য খুব ভাল, আপনার বম্বে-স্টমাক সেরে যাবে।'

সুতরাং রামকানাইবাবু পাততাড়ি গুটিয়ে পুণায় এলেন। পুণায় তিনি পূর্বে কখনো আসেননি, তাঁর রেস খেলার নেশা নেই, ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন সম্বন্ধেও তাঁর মন সম্পূর্ণ উদাসীন। কিন্তু পুণায় এসেই জায়গাটা তাঁর ভাল লেগে গেল। তখন হেমন্ত কাল, শীত পড়ি-পড়ি করছে। শুকনো ঠান্ডা বাতাসে তাঁর শরীর চাঙ্গা হয়ে উঠল। তিনি একটি হোটেলে উঠলেন এবং তৎক্ষণাৎ মশালা দোসা এবং দহিবড়া হুকুম দিলেন। এখানকার খাদ্যদ্রব্যের স্বাদই যেন আলাদা; আরো সতেজ, আরো মুখরোচক। শুধু তাই নয়, মশালা দোসা এবং দহিবড়া অবিলম্বে হজম হয়ে গেল।

তিন দিন পুণায় থেকে রামকানাইবাবু বুঝলেন, পুণার মত পুণ্যস্থান আর নেই; তিনি এখানেই ডেরাডান্ডা গাড়বেন; কাশী-বৃন্দাবনে যারা যেতে চায় যাক, তাঁর পরম তীর্থ পুণা। কিন্তু হোটেলে কতদিন থাকা যায়। হোটেলের খাবার প্রথম দু'চার দিন মন্দ লাগে না, ক্রমে অসহ্য হয়ে ওঠে। হোটেলের একটি ঘরে আবদ্ধ থাকাও কারাবাসের সামিল। অতএব চটপট একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

রামকানাইবাবু কর্মতৎপর লোক, তিনি মহা উৎসাহে লেগে গেলেন। পুণার পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে শঙ্কর শেঠ রোড নামে রাস্তা আছে, সেখানে একটু নিরিবিলি দেখে দুই বিঘা মাপের একখন্ড জমি কিনে ফেললেন। তারপর প্ল্যান তৈরি করিয়ে কর্পোরেশন থেকে প্ল্যান স্যাংশন করিয়ে কাজ আরম্ভ করে দিলেন। এখানে আসবার পর তাঁর যে দু'চার-জন বন্ধু জুটেছিল, তারা বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বলল—'পুণায় বাড়ি ফেঁদেছেন, পাক্কা তিনটি বছর লাগবে। এখানে তিন বছরের কমে বাড়ি হয় না।'

রামকানাইবাবু বললেন—'দেখা যাক।'

পাঁচ মাস পরে তিনি গৃহপ্রবেশ করলেন। চার-পাঁচখানা ঘর নিয়ে একতলা বাড়ি, তাকে ঘিরে প্রশস্ত বাগান। গৃহপ্রবেশের দিন রামকানাইবাবু নিজের জানা-শোনা বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করে প্রচুর ভূরিভোজন করালেন। পুণায় তাঁর দ্বিতীয় সংসার-যাত্রা আরম্ভ হল।

একলা বাড়িতে থাকেন, সঙ্গী-সাথী নেই। বোম্বাই শহরে তিনি ভাড়াটে বাড়িতে থাকতেন, বাগান ছিল না; এখানে নিজের বাগান তৈরি করা নিয়ে বেশ আনন্দে দিন কাটতে লাগল। একদিন একটি বিলিতী পত্রিকায় দেখলেন, প্রাক্-কম্যুনিস্ট যুগের চীনা ভাষায় প্রবাদ আছে—যদি একদিনের জন্যে সুখী হতে চাও, মদ খাও; যদি এক মাসের জন্যে সুখী হতে চাও, বিয়ে করো; আর যদি চিরদিনের জন্যে সুখী হতে চাও তো বাগান করো। প্রবাদটি রামকানাইবাবুর খুব ভাল লাগল। তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে বাগান বানাতে শুরু করে দিলেন। কলকাতা থেকে চালতার চারা, পাতিনেবুর কলম আনালেন; দেওঘর থেকে গোলাপ, দার্জিলিঙ থেকে অর্কিড্। দিনের বেলাটা বাগানের চিন্তায় আনন্দে কেটে যায়। এটি তাঁর জীবনের অন্যতম বিলাস।

একটি বিলাসের কথা আগে বলেছি; তিনি সুরন্ধিত অন্নব্যঞ্জন খেতে ভালবাসতেন, আহারটি মনের মত না হলে তাঁর জীবনটাই বিস্বাদ হয়ে যেত। যতদিন গিন্নী ছিলেন, ততদিন খাওয়া সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা ছিল না, কিন্তু এখন তিনি নির্জনে বসে প্রায়ই গৃহিণীর কথা স্মরণ করে অশ্রু বিসর্জন করেন। ডুমুরের ডালনা, পাব্দা মাছের ঝাল, মুর্গীর রোস্ট তেমন করে কে রাঁধবে?

রামকানাই হাতে-কলমে রন্ধন-বিদ্যা আয়ত্ত না করলেও থিওরিটা ভাল রকম জানতেন। পুণায় এসে তিনি পাঁচটা রাঁধুনী বদল করেছেন, দাঁড়িয়ে থেকে তাদের রান্না শেখাবার চেষ্টা করেছেন; কিন্তু কেউ কোনো কর্মের নয়, কেবল সম্বর শুখি-ভাজি আর মশালাভাত রাঁধতে জানে; নতুন রান্না শেখালেও শেখে না।

রন্ধন-কর্মটি আসলে একটি শিল্পকর্ম। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, কবিত্ব আর ল্যাজ টেনে বার করা যায় না। যার হবার, তার হয়। রন্ধন-পটুত্বও তাই। চন্দনং ন বনে বনে। রামকানাইবাবু একটি প্রতিভাবান রাঁধুনী খুঁজছেন, কিন্তু পাচ্ছেন না।

রামকানাইবাবুর আর-একটি নেশার কথা এখনো বলা হয়নি, সেটি হচ্ছে তবলা। যদিও ওস্তাদ তবল্চি নন, তবু মোটের ওপর তিনি ভালই বাজাতে পারেন। তাঁর একজোড়া ডুগি-তবলা আছে; কলকাতা থেকে বটতলার ছাপা তবলা শিক্ষার বইও আনিয়েছেন। রোজ সন্ধ্যের পর বাঁয়া-তবলা নিয়ে বসেন। তাঁর শ্রোতা নেই, একলা বসে বসে বাজিয়ে যান আর অস্ফুটকণ্ঠে তবলার বোল আবৃত্তি করেন—

ধিনাগ্ ধা ধিনাগ্ ধা ধিনাগ্ ধিনাগ্ ধা ধা ধা—

এইভাবে পুণার নতুন বাড়িতে তাঁর দিন কাটছে। দু'জন মালী রেখেছেন, তাদের নিয়ে সকাল বিকেল বাগানের পরিচর্যা করেন। তাঁর বাড়ির দুই মাইলের মধ্যে কোনো বাঙালীর বাস নেই, তাই তাঁর বাড়িতে বন্ধু-সমাগম বড় একটা হয় না। সন্ধ্যের পর তিনি বাঁয়া-তবলা নিয়ে বসেন। কিন্তু তাঁর চিত্তে সুখ নেই; আহারের কথা মনে হলেই তাঁর মন খারাপ হয়ে যায়। ভাপা ইলিশ মাছ, ইঁচড়ের ডালনা, পুঁইশাক আর কুচো চিংড়ির চচ্চড়ি—স্মরণ হলেই তাঁর চক্ষু এবং রসনা যুগপৎ জলপূর্ণ হয়ে ওঠে।

একদিন বিকেলবেলা বাগানের কাজকর্ম সেরে রামকানাইবাবু বাড়ির সামনের বারান্দায় চেয়ার পেতে বসেছিলেন। আজ তাঁর মন বড় খারাপ; যে রাঁধুনী-চাকরটি মাসখানেক কাজ করছিল, সে আজ সকালে মাইনে পেয়ে দুপুরবেলা উধাও হয়েছে। আজকাল চাকর-বামুনদের পাখ্না গজিয়েছে, সর্বদাই উড়ু উড়ু করছে; বেশীদিন তাদের এক জায়গায় ধরে রাখা যায় না। আজ রাত্রিটা রামকানাইবাবুকে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতে হবে। কিম্বা হোটেলে গিয়ে খেয়ে এলে কেমন হয়? বাড়ির কাছাকাছি হোটেল নেই। লস্করে—অর্থাৎ ক্যান্টনমেন্টে—গেলে ভাল আমিষ হোটেল পাওয়া যায়। হোটেল থেকে খাবার আনিয়ে নিলে মন্দ হয় না—

ফটক দিয়ে একজন নিম্নশ্রেণীর বুড়ো গোছের লোক ঢুকল, তার সঙ্গে একটি

দশ-বারো বছরের মেয়ে। এ দেশে নিম্নশ্রেণীর লোক সাধারণত 'মারাঠা' নামে পরিচিত; এরা মহারাষ্ট্র দেশের 'মাটির সন্তান'। এরা চাষবাস করে, কুলিকাবাড়ির কাজ করে, সৈন্যদলে যোগ দেয়—এরাই দেশের মেরুদণ্ড। বৃদ্ধ লোকটি রামকানাইবাবুর কাছে এসে প্রশ্ন করল—'ঘাটি মনুষ্য পাইজে?' অর্থাৎ চাকর চাই?

রামকানাইবাবু মারাঠা ভাষা বোঝেন ও বলতে পারেন। তিনি বৃদ্ধের পাকানো চেহারার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'রাঁধতে পারিস?'

বৃদ্ধ বলল—'আমার নাতনী গোদাবরীবাঈ রাঁধতে জানে।' এই বলে পাশের মেয়েটার দিকে চোখ নামালো।

মেয়েটাকে রামকানাইবাবু এতক্ষণ ভাল করে চেয়ে দেখেননি। নিতান্তই ছেলেমানুষ মেয়েটা; কৈশোরে পদার্পণ করেছে কিনা সন্দেহ। কাছা দিয়ে কাপড় পরা অপরিণত শ্যামল দেহটিতে কিন্তু বেশ শ্রী আছে, 'যৌবনে কুক্কুরী ধন্যা' জাতীয় অস্থির লাবণ্য নয়,· সহজাত বলিষ্ঠ শ্রী। চোখে-মুখে উৎসুক বুদ্ধির ছাপ রয়েছে, মনে হয়, সে স্বভাবতই নিপুণ ও কর্মতৎপর।

রামকানাইবাবু তাকে জিজ্ঞেস করলেন—'তুই কি কি রাঁধতে পারিস?'

গোদাবরীর চোখ দুটি চকচক করে উঠল, সে বলল—'যা বলবে, সব রাঁধতে পারি।'

রামকানাই বললেন—'মারাঠী রান্না ছাড়া আর কিছু রাঁধতে জানিস?'

গোদাবরী বলল—'না। কিন্তু শিখিয়ে দিলে পারি।'

মেয়েটার আত্মপ্রত্যয় রামকানাইবাবুর ভাল লাগল। তিনি গোদাবরীর ঠাকুর্দা মারুতিকে বললেন—'বয়স কম, পারবে কিনা জানি না; তবু চেষ্টা করে দেখব।' তারপর গোদাবরীর চাকরির শর্ত ঠিক হলঃ বারো টাকা মাইনে, দু'বেলা খেতে পাবে; হোলি আর দেয়ালির সময় কাপড় পাবে; রোজ সূর্যোদয়ের আগে আসবে, সারাদিন কাজকর্ম করবে, তারপর রাত্তিরের রান্নাবান্না সারা হলে নিজের খাবার নিয়ে ঘরে চলে যাবে।

শর্ত পাকা হলে রামকানাই গোদাবরীকে বললেন—'তবে আজ থেকেই কাজ শুরু করে দে। আজ বেশী কিছু রাঁধতে হবে না; জোয়ারের ভাকড়ি, আমটি, কথ্‌বেলের চাটনি আর মাটন। বেশী ঝাল দিবি না। কাল থেকে বাংলা-রান্না শেখাব। আয়, তোকে রান্নাঘর দেখিয়ে দিই।'

মারুতি সামনের বারান্দায় উপু হয়ে বসে রইল, রামকানাই গোদাবরীকে রান্নাঘরে নিয়ে গেলেন। রান্নাঘরটি আকারে বেশ বড়, একাধারে রান্নাঘর এবং ভাঁড়ার ঘর; তার পাশে টেবিল-পাতা খাবার ঘর। গোদাবরী সব দেখে শুনে নিয়ে চটপট কাজ আরম্ভ করে দিল।

রামকানাই বসবার ঘরে গিয়ে মেঝেয় মাদুর পাতলেন, তার ওপর ডুগি-তবলা রাখলেন, একটা কাচের গেলাসে ফিকে হুইস্কি তৈরি করে ডুগি-তবলার সামনে বসলেন; একটি কাঠের হাতুড়ি দিয়ে যন্ত্র বাঁধতে বাঁধতে ভাবলেন—মেয়েটা চটপটে আছে, কিন্তু বয়স বড় কম। বাড়ির সব কাজ হয়তো পারবে না। যদি রান্নাটা শেখাতে পারি, তাহলে না-হয় অন্য কাজের জন্যে একটা চাকর রাখলেই চলবে।

গেলাসে একটি ছোট্ট চুমুক দিয়ে তিনি চক্ষু অর্ধমুদিত করে বাজাতে আরম্ভ করলেন—

ধিনা ধিন্‌ তাক্‌ ধিনা ধিন্‌—

ঘণ্টাখানেক কেটেছে কি না কেটেছে, রামকানাইবাবু সবেমাত্র হুইস্কির গেলাসে শেষ চুমুক দিয়েছেন, গোদাবরী দোরের কাছে এসে দাঁড়াল, বলল—'রাও, তোমার খাবার তৈরি।'

রামকানাইবাবু অবাক হয়ে চোখ তুললেন—'বলিস কিরে! এরি মধ্যে!'

গোদাবরী বলল—'হো।'

রামকানাই গিয়ে টেবিলে খেতে বসলেন। গোদাবরী পরিবেশন করল। রামকানাই প্রত্যেকটি রান্না চেখে চেখে খেলেন। তাঁর মন খুশী হয়ে উঠল—বাঃ, মেয়েটার রান্নার হাত আছে, ওকে শেখালে শিখবে। তিনি আহার শেষ করে অনেকদিন পরে একটি পরিতৃপ্তির ঢেকুর তুললেন, বললেন—'বেশ রেঁধেছিস। তুই এবার তোর খাবার নিয়ে ঘরে যা, তোর ঠাকুর্দা বসে আছে।'

গোদাবরীর মুখে এক ঝলক সার্থকতার হাসি খেলে গেল। সে নিজের খাবার পুঁটলি বেঁধে নিয়ে ঠাকুর্দার হাত ধরে চলে গেল। রামকানাই তাকে বলে দিলেন—'ভোরবেলা আসবি। আমি সাড়ে ছটার সময় চা খাই।'

পরদিন সূর্যোদয়ের আগে রামকানাই বাগানে বেড়াচ্ছিলেন, গোদাবরী এল। আজ আর তার সঙ্গে মারুতি নেই, একাই এসেছে। সন্ধ্যেবেলা মারুতি আসবে তাকে নিয়ে যাবার জন্যে। তাদের ঘর বেশী দূর নয়, আধ মাইল আন্দাজ হবে, কিন্তু গোদাবরী অন্ধকারে একলা পথ চলতে ভয় পায়।

দশ মিনিটের মধ্যে গোদাবরী স্টোভে চা তৈরি করে রামকানাইবাবুকে ডাকল। চায়ে চুমুক দিয়ে তিনি একটু হাসলেন; মারাঠী চা হয়েছে, কড়া পাঁচনে প্রচুর দুধ আর চিনি। তিনি বললেন—'চা ভাল হয়নি। বেজায় কড়া হয়েছে।'

গোদাবরী লজ্জা পেয়ে বলল—'তুমি কেমন চা খাও আমাকে শিখিয়ে দাও, আমি করে দেব।'

'বিকেলবেলা চা তৈরি করার সময় শিখিয়ে দেব।'

চা খেয়ে রামকানাই বাজার করতে বেরুলেন। অন্যান্য শাকসব্জির সঙ্গে তিনি একটি মোচা পেলেন। মোচা এ দেশে সুলভ সামগ্রী নয়, এদেশের লোক কি করে মোচা রাঁধতে হয় জানে না; তিনি স্থির করলেন মোচার ঘণ্ট দিয়েই গোদাবরীর রান্নার হাতেখড়ি দেবেন। রোজ একটি করে বাংলা রান্না শেখাবেন।

সাতদিন কাটবার পর রামকানাই নিঃসংশয়ে বুঝলেন গোদাবরী একটি নারীরত্ন। রান্নার কথা তাকে একবারের বেশী দু'বার বলতে হয় না, নুন ঝাল টক মিষ্টি যা যা দিতে হয় এবং যতখানি দিতে হয় একবারেই শিখে নেয়। তাছাড়া সারাদিন বাড়িময় যেন চরকিপাক ঘুরে বেড়ায়। এটা ধুচ্ছে ওটা মুছছে, আসবাব ঝাড়ছে, মেঝে ঝাড়ু দিচ্ছে; শরীরে ক্লান্তি নেই, মুখে হাসিটি লেগে আছে। এক হপ্তা পরে রামকানাই-বাবুকে আর কিছু বলতে হয় না, ঘড়ির কাঁটার মত বাড়ির কাজ চলতে থাকে।

একমাস পরে রামকানাইবাবু গোদাবরীর মাইনে বাড়িয়ে দিলেন, বারো টাকা থেকে পনরো টাকা। তিনি অবশ্য ব্যবসাদার লোক, মনে মনে যতটা খুশী হয়েছেন মুখে ততটা প্রকাশ করেন না। কিন্তু তাঁর অন্তরের সমস্ত বাৎসল্য স্নেহ গিয়ে পড়েছে এই ছোট্ট মেয়েটার ওপর। শুধু তাই নয়, গোদাবরীর অশেষ বুদ্ধি ও গুণপনার জন্যে তাকে মনে মনে সমীহ করেন। হোক বারো বছরের মেয়ে, এমন মেয়ে কোটিকে গুটিক মিলে।

এইভাবে, রামকানাইবাবুর জীবনে তৃপ্তি ও সন্তোষের ফল্গুধারা বইতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু একটি উদ্বেগ মাঝে মাঝে তাঁর মনের মধ্যে উঁকি মারে, গোদাবরী যদি চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যায়! এই রকম উদ্বেগের একটু কারণও ঘটেছিল। একদিন সন্ধ্যেবেলা পরিচিত একটি বাঙালী ভদ্রলোক বেড়াতে এলেন। রামকানাইবাবু সমাদর

করে তাঁকে হিঙের কচুরি আর রসবড়া খাওয়ালেন। খেয়ে ভদ্রলোক উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন—'এত চমৎকার বাংলা খাবার কোথায় পেলেন?' রামকানাইবাবু তখন সগর্বে গোদাবরীকে ডেকে দেখালেন, বললেন,—'এই মেয়েটা তৈরি করেছে।' ভদ্রলোক কৌতূহলী হয়ে গোদাবরী সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করলেন, তিনিও সরলভাবে উত্তর দিলেন।

দু'তিনদিন পরে আর একটি পরিচিত ভদ্রলোক বেড়াতে এলেন। তিনি গোদাবরীর তৈরি নিমকি ও দরবেশ খেয়ে চমৎকৃত। গোদাবরী সম্বন্ধে তত্ত্বতল্লাস সুলুক সন্ধান নিলেন; সে কত মাইনে পায়, কোথায় থাকে, এই সব।

দিনে দিনে রামকানাইবাবুর অতিথির সংখ্যা বাড়তে লাগল। সকলেই গোদাবরীকে দেখতে চায়, তার তৈরি খাবার খেতে চায়, তার কথা জানতে চায়।

রামকানাই বেশ আনন্দে আছেন; কারণ তিনি যেমন খেতে ভালবাসেন তেমনি খাওয়াতে ভালবাসেন। বুড়ো মারুতি রোজ সন্ধ্যের পর আসে, দেয়ালে ঠেস দিয়ে উপু হয়ে বসে থাকে; গোদাবরীর কাজ সারা হলে তাকে নিয়ে বাড়ি চলে যায়। একদিন মারুতি গলা খাঁকারি দিয়ে বলল—'রাও, একজন বাঙালীবাবু কুড়ি টাকা পগার দিয়ে গোদাকে রাখতে চায়।' এই বলে মারুতি মিটিমিটি চক্ষে রামকানাইবাবুর মুখ দেখতে লাগল।

রামকানাইবাবু চমকে গেলেন, হঠাৎ কথা খুঁজে পেলেন না। কি ভয়ানক ব্যাপার! ভিতরে ভিতরে গোদাবরীকে ভাঙিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা চলছে! তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে নীরস কণ্ঠে বললেন—'গোদাবরী যদি যেতে চায় যাবে।' তিনি বারান্দা থেকে উঠে গিয়ে তবলা বাজাতে বসলেন। ঘটনাক্রমে সেদিন কোনো বাঙালী বন্ধুর আবির্ভাব হয়নি।

যথাসময় তিনি খেতে বসলেন, গোদাবরী পরিবেশন করল। তিনি মুখ গম্ভীর করে খাচ্ছেন, অন্যদিনের মত রান্নার দোষগুণ আলোচনা করছেন না। গোদাবরী কয়েকবার তাঁর মুখের দিকে তাকালো; আরপর তাঁর খাওয়া যখন শেষ হয়ে এসেছে তখন সে সহজ গলায় বলল—'বুঢ়া বড় লোভী, বাবুরা বেশী পয়সা দিয়ে আমাকে নিয়ে যেতে চায় তাই বুঢ়ার লোভ হয়েছে। আমি কিন্তু যাব না, যে যত টাকাই দিক আমি যাব না।'

রামকানাইবাবুর মুখে সহর্ষ হাসি ফুটে উঠল, তিনি গদগদ স্বরে বললেন—'যাবি না!' গোদাবরী বলল—'না, আমি আট বছর বয়স থেকে কাজ করছি, অনেক বাড়িতে কাজ করেছি। তোমার বাড়িতে কাজ করতে আমার ভাল লাগে।'

যেসব বন্ধুরা গোদাবরীকে ভাঙিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা যখন তাকে ভাঙাতে পারলেন না তখন রামকানাইবাবুর ওপর ভীষণ চটে গেলেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে কানাকানি করতে লাগলেন, মেয়েটা দেখতে ছোটখাটো হলে কি হবে, মারাঠী মেয়ে তো, মেঘে মেঘে বেলা হয়েছে। নিশ্চয় রামকানাইবাবুর সঙ্গে ইত্যাদি।

কিন্তু ইতিমধ্যে আর একটি ঘটনা ঘটেছিল যার ফলে সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদের সন্দেহ আরো বেড়ে গিয়েছিল। মারুতি বুড়ো রোজ সন্ধ্যের পর গোদাবরীকে নিতে আসত, একদিন সে এল না। রামকানাইবাবু রাত্রির আহার সমাধা করে বাগানে বেড়াচ্ছিলেন, মারুতির অনুপস্থিতি লক্ষ্য করেননি; তিনি দেখলেন গোদাবরী বারবার ঘর-বার করছে, কখনো ফটক পর্যন্ত গিয়ে বাইরে উঁকি মেরে দেখছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—'কি রে, তুই এখনো ঘুরঘুর করছিস যে! ঘরে যাবি না?'

গোদাবরী উদ্বিগ্নস্বরে বলল—'বুঢ়া এখনো আসেনি রাও। সকালবেলা বলেছিল শরীর ভাল নয়, হয়তো বিছানা নিয়েছে।'

'তা কী হয়েছে, তুই একাই চলে যা না, তোর ঘর তো বেশী দূর নয়।'

'না রাও, রাত্তিরে একলা পথ হাঁটতে আমার ভারি ভয় করে। আর একটু দেখি, বুড়ো যদি না আসে তখন রান্নাঘরে শুয়ে রাত কাটিয়ে দেব।'

আরো আধঘন্টা কেটে গেল কিন্তু মারুতি এল না। গোদাবরী তখন রান্নঘরের মেঝেয় মাদুর পেতে শুয়ে পড়ল।

তারপর থেকে রামকানাইবাবুর বাড়িতে গোদাবরীর রাত্রিবাস একরকম কায়েমী হয়ে গেল। বুড়ো রোজ আসে না, যেদিন আসে গোদাবরীকে নিয়ে যায়। বাকি রাত্রিগুলি গোদাবরী রামকানাইবাবুর বাড়িতেই ঘুমোয়।

গুজবের যিনি অধিষ্ঠাত্রী উপদেবতা তিনি চুপ করে থাকেন না। পুণায় বাঙালীদের ঘরে ঘরে উত্তেজিত জল্পনা শুরু হয়ে যায়; রামকানাইবাবু যে ডুবে ডুবে জল খাচ্ছেন এ বিষয়ে কারুর মনে সন্দেহ থাকে না। আশ্চর্য এই যে রামকানাইবাবু এই সব আলাপ-আলোচনার জল্পনা-কল্পনার কিছুই খবর রাখেন না। এমন কি সম্প্রতি তাঁর বাড়িতে বাঙালী বন্ধুবান্ধবের পদার্পণ যে থেমে গেছে তা তিনি লক্ষ্য করেননি; তিনি তাঁর বাগান তবলা এবং রান্নাবান্নার মধ্যে মগ্ন হয়ে আছেন।

এইভাবে প্রায় চার বছর কেটে গেল।

এখন, মানুষের জীবনে চার বছর খুব কম সময় নয়; যার প'য়তাল্লিশ বছর বয়স ছিল সে উনপঞ্চাশে পেঁছেছে, বারো বছর বয়সের খুকী ষোল বছরে পদার্পণ করেছে; কারুর গোঁফ গজিয়েছে, কারুর গোঁফে পাক ধরেছে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে রাকানাই-বাবু এই কাল-সঞ্চার কিছুই জানতে পারেননি। তাঁর শরীরে গুরুতর রোগ আর কিছু নেই, বম্বে-স্টমাক বোম্বাই বর্ষার মত সহ্যাদ্রির ওপারে আটকে গিয়েছে; নানা রঙের দিনগুলি তাঁর হৃদয়ের বাগানে বিচিত্র সুন্দর প্রজাপতির মত মধুপান করে বেড়াচ্ছে। মনে হয় তাঁর জীবনের এই অকাল বসন্ত কোনো দিন শেষ হবে না।

গোদাবরী ষোল বছরে পা দিয়েছে। মেয়েদের পক্ষে ষোল বছরে পা দেওয়া সামান্য কথা নয়। কিন্তু গোদাবরী যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই ষোড়শী হয়ে উঠেছে। তার শরীর একটু লম্বা হয়েছে, একটু পরিণত হয়েছে, চোখের দৃষ্টিতে একটু গভীরতা এসেছে। সে নিম্ন শ্রেণীর মেয়ে, কিন্তু তার মন প্রসারশীল; অবস্থান্তরের সঙ্গে সে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। এ ছাড়া সে যেমনটি ছিল এখনো ঠিক তেমনিটি আছে।

হঠাৎ একদিন শান্ত রসাস্পদ তপোবনে বিঘ্নরাজের আবির্ভাব হল; নানা রঙের দিনগুলি চৈতালী ঘূর্ণির মুখে উড়ে যাবার উপক্রম করল।

একদিন দুপুরবেলা খেতে বসে রামকানাই লক্ষ্য করলেন গোদাবরীর মুখ ফুলো-ফুলো, চোখ ছলছল করছে। তার প্রকৃতি স্বভাবতই প্রফুল্ল; কিন্তু আজ তার মুখে কথা নেই, হাসি নেই। রামকানাই জিজ্ঞেস করলেন—'কিরে গোদা, তোর সর্দি হয়েছে নাকি?'

গোদা উত্তর দিল না, নিঃশব্দে পরিবেশন করে চলল। রামকানাই ভাবলেন, সর্দি হয়েছে, সেরে যাবে। তিনি আর কিছু বললেন না। গোদার যে সর্দি হয়নি, সে লুকিয়ে কেঁদেছে, এ কথা তিনি তখন জানতে পারলেন না।

সেদিন সন্ধ্যের সময় মারুতি এসে উপু হয়ে বসল, কয়েকবার গলা খাঁকারি দিয়ে বলল—'গোদা আর কাজ করতে পারবে না, ওর বিয়ে ঠিক হয়েছে।'

রামকানাই বজ্রাহতের মত ক্ষণকাল বসে রইলেন, তারপর চিড়িক্ মেরে বলে উঠলেন —'কি বললি! কার বিয়ে? কি রকম বিয়ে?'

মারুতি তাঁকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করল যে পুণা থেকে বিশ কোশ দূরে একটি গ্রামে গোদাবরীর বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হয়ে গেছে, সামনের হপ্তায় বর বিয়ে করতে আসবে।

রামকানাই ভীষণ অস্থির হয়ে বললেন—'না না না, এ আবার কী হাঙ্গামা! ঐটুকু মেয়ের বিয়ে! হতেই পারে না। যা তুই— পালা—ভাগ।'

মারুতি ভাগলো না, চিবিয়ে চিবিয়ে বলল—'রাও, গোদার ষোল বছর বয়স হয়েছে, এখন ওর বিয়ে না দিলে জাত থেকে কেটে দেবে। তা ছাড়া বরের বাপের কাছ থেকে আমি গোদার দাম নিয়েছি তিনশো টাকা। সে ছাড়বে কেন? আমার নামে মামলা করে দেবে।'

রামকানাই গুম হয়ে বসে রইলেন। মারুতি উঠে দাঁড়াল, বলল—'আজ আমি তোমাকে খবর দিতে এসেছিলাম, কাল বিকেলবেলা এসে গোদাকে নিয়ে যাব।'

সে-রাত্রে আর তবলা বাজানো হল না, রামকানাই উষ্ণ মস্তিষ্কে বাগানে পায়চারি করতে লাগলেন।

রাত্রি ন'টা বেজে যাবার পরও যখন তিনি খেতে এলেন না তখন গোদাবরী বাইরে এসে তাঁকে ডাকল—'রাও, খেতে এস, খাবার দিয়েছি।'

রামকানাই হঠাৎ তেরিয়া হয়ে বললেন—'খাব না আমি, ক্ষিদে নেই।' বলে নিজের বিছানায় গিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন।

গোদাবরী তাঁর পায়ের কাছে এসে বসল, পায়ের ওপর হাত রেখে বলল—'খাবে চল, সব ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

রামকানাই ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসলেন, আঙুল তুলে বললেন—'দেখ্ গোদা, তুই যদি আমায় ছেড়ে চলে যাস তাহলে আমিও পুণা ছেড়ে চলে যাব।'

গোদাবরী ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল, বুজে-যাওয়া গলায় বলল—'আমি কি করব। আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে চাই না, বিয়ে করতে চাই না, কিন্তু জাতের লোকেরা নানা কথা বলছে—'

কথাটা রামকানাই-এর কানে খোঁচা দিল, তিনি ভ্রূকুটি করে বললেন—'কি বললি! নানা কথা বলছে! কী কথা বলছে?'

গোদাবরী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল—'সে তোমার শুনে কি হবে।' তার মুখের লজ্জা দেখে বোঝা যায় সে আর নেহাত ছেলেমানুষ নয়, জ্ঞানবুদ্ধি হয়েছে।

রামকানাই সিংহবিক্রমে লাফিয়ে খাট থেকে নামলেন, হুঙ্কার ছেড়ে বললেন—'কী! ছোট মুখে বড় কথা! আমার নামে—আমাদের নামে কলঙ্ক! কে বলেছে এ কথা? ক্যাচাং করে তার মুন্ডু উড়িয়ে দেব।'

তিনি কিছুক্ষণ দাপাদাপি করলেন, শেষে ক্লান্ত হয়ে বললেন—'কিন্তু এখন উপায় কি গোদা?'

গোদাবরী বলল—'উপায় কিছু নেই, বিয়ে আমাকে করতেই হবে—'

রামকানাই আবার গরম হয়ে উঠলেন—'বিয়ে করতেই হবে! এ কি মগের মুল্লুক নাকি! তুই সাবালক হয়েছিস—'

এই পর্যন্ত বলে তিনি হঠাৎ থেমে গেলেন। তার মাথায় অ্যাটম বোমার মত একটি প্রচন্ড আইডিয়া বিস্ফুরিত হল। তিনি কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল চক্ষে চেয়ে থেকে বললেন—'গোদা!' তাঁর গলার সব জোর যেন ফুরিয়ে গেছে।

শঙ্কাকম্পিত স্বরে গোদাবরী বলল—'কি?'

রামকানাই খুব খানিকটা নিশ্বাস টেনে নিয়ে বলতে আরম্ভ করলেন—'আমাকে বিয়ে করবি? আমার বয়স হয়েছে, কিন্তু এখনো অনেক দিন বাঁচব। আমার টাকাও আছে অনেক। সব তুই পাবি। করবি আমাকে বিয়ে?'

গোদা খাটের পাশে যেমন বসেছিল তেমনই বসে রইল, তারপর বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। রামকানাই ভ্যাবাচাকা খেয়ে বললেন—'অ্যাঁ—তাহলে—তুই

তাহলে রাজী নয়!'

গোদা চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল, ধরা-ধরা গলায় বলল—'আমাকে তাড়িয়ে দিলেও আমি এ বাড়ি থেকে নড়ব না। এস।' সে রামকানাইকে পাশ কাটিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলল।

রামকানাই মহানন্দে তার পিছু নিলেন, বলতে বলতে চললেন—'এ বাড়ি থেকে তোকে তাড়ায় কার সাধ্যি। বাস্, তুই যখন রাজী তখন আর ভয় কাকে। কালই আমি সব ঠিক করে ফেলছি। আর দেরি নয়, বিলম্বে কার্যহানি। খুব খিদে পেয়ে গেছে রে গোদা। এবেলা কি কি রেঁধেছিস বল্ দেখি?

রামকানাই কাৰিৎকৰ্মা লোক। পরদিন সকালে উঠেই তিনি উকিলের বাড়ি গেলেন। বিকেলবেলা মারুতি গোদাবরীকে নিতে এসে দেখল, পুরোহিত উকিল সাক্ষী সকলের সামনে রামকানাই ও গোদাবরীর বিয়ে হচ্ছে। মহারাষ্ট্র দেশে দিনের বেলা বিয়ে হয়।

বিবাহ ক্রিয়া শেষ হলে রামকানাই মারুতির হাতে এক হাজার টাকা দিয়ে বললেন —'এই নে গোদাবরীর কন্যা-পণ।' মারাঠী উকিল মহাশয় রসিদের ওপর মারুতির টিপ-সই নিলেন। মারুতি এক হাজার টাকা পেয়ে এমন বোকা বনে গেল যে আপত্তির একটি কথাও তার মুখ দিয়ে বেরুলো না।

রামকানাইবাবু সুখে আছেন, গোদাবরী তাঁকে সুখে রেখেছে। কবি গেয়েছেন—রমণীর মন, সহস্র বর্ষের সাধনার ধন। আবার না চাইলেও তাকে পাওয়া যায়। রামকানাই-বাবুর জীবনে প্রার্থনীয় আর কিছু নেই। এইভাবে যদি বাকি দিনগুলি কেটে যায়—

ডুগি-তবলা বাজাতে বাজাতে মাঝে মাঝে তাঁর সেই জ্যোতিষীর কথা মনে পড়ে। স্ত্রী-সুখ ভোজন-সুখ বিশ্রাম-সুখ। জ্যোতিষীর কথা মিথ্যে হয়নি।

কেবল পুণার বাঙালীরা রামকানাইকে একঘরে করেছে, ক্রিয়াকর্মে ডাকে না। কিন্তু বাৎসরিক বারোয়ারি চাঁদা তোলার সময় তাঁর কথা তাদের মনে পড়ে যায়।

অবিকল

নিজের অতীত জীবনের কথা আমার মনে বেশী আসে না। কিন্তু পুণার নিঃসঙ্গ জীবনযাত্রার ফলে মনটা মাঝে মাঝে ফাঁকা হয়ে যায়, তখন সেই শূন্য স্থানটা ভরাট করার জন্যে মনের অন্ধকার কোণ থেকে দু'-একটা বহু পুরনো স্মৃতি বেরিয়ে আসে। আজ তেমনি একটি স্মৃতিকথা লিখছি।

সালটা ঠিক মনে নেই, তবে ১৯২৪ থেকে ১৯২৬-এর মধ্যে। আমি তখন পাটনা ল-কলেজে আইন পড়ি। আমার বাড়ি মুঙ্গেরে। পাটনা থেকে মুঙ্গের ১১০ মাইল রাস্তা, তাই মাসের মধ্যে একবার-দু'বার বাড়ি যাই। বাড়িতে মা বাবা স্ত্রী দুই ছেলে বিদ্যমান। লেখাপড়া ছেড়ে দেবার চার বছর পরে আবার কেঁচে গণ্ডূষ করেছি। মনের টান বাড়ির দিকেই বেশী।

পাটনা ও মুঙ্গেরের মধ্যে যাতায়াত করতে হলে কিউল জংশনে গাড়ি বদল করতে হয়। একবার আমি বিকেলের ট্রেনে বাড়ি থেকে পাটনা যাচ্ছি—বোধহয় জানুয়ারী মাস—কিউল জংশনে পেঁছে দেখি পাটনার গাড়ি ছেড়ে গেছে, ঘণ্টা দুয়ের আগে আর গাড়ি নেই।

কিউল জংশনটি বেশ ফাঁকা-ফাঁকা। কাছেপিঠে জনবসতি নেই, দুটি লাইনের সংযোগ ঘটানোর জন্যেই এই জংশনের সৃষ্টি। লম্বা নীচু কয়েকটা প্ল্যাটফর্ম পাশাপাশি চলে গেছে, তাদের মাঝামাঝি স্থানে একটুখানি ছাউনি, ছাউনির নীচে কয়েকটি ঘর; বাকি সব প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা পড়ে আছে। লোকজনও বেশী নেই, যে দু'-চারজন কুলি-কাবাড়ি খুঞ্চেওয়ালা আছে তারা ট্রেন চলে যাবার পর কোথায় অন্তর্হিত হয়েছে।

আমার সঙ্গে মোটঘাট নেই, ঝাড়া হাত-পা যাচ্ছি; তাই দুর্ভাবনাও নেই। দু' ঘণ্টা দেরিতে পেঁছুব এই যা। এদিকে দিন শেষ হয়ে আসছে; ওয়েটিং রুমের জমাট ঠাণ্ডায় কিছুক্ষণ বসে থাকার পর উঠে পড়লাম। ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেছে, বাইরে এখনও আলো আছে।

শালখানা ঘোমটার মত মাথায় দিয়ে গায়ে ভাল করে জড়িয়ে নিলাম, তারপর প্ল্যাটফর্মের এ-মুড়ো ও-মুড়ো পায়চারি করতে লাগলাম। চুপ করে বসে থাকার চেয়ে হেঁটে বেড়ালে রক্তের চাঞ্চল্য বাড়ে, শীত কম লাগে।

প্রথমে লক্ষ্য করিনি, আর একটি ভদ্রলোক আমার মতই প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করছেন। তবে তিনি পায়চারি করছেন আমার উল্টো মুখে; প্ল্যাটফর্মের মাঝামাঝি আমাদের দেখা হচ্ছে। ভদ্রলোকটি মুসলমান; আমারই মত লম্বা একহারা চেহারা, ঘাড়ের কাছে একটু নুব্জ, চোখে চশমা; পরিধানে গরম শিরওয়ানি ও পায়জামা, গলায় গলাবন্ধ, মাথায় পশমের রোমশ টুপি। আমার পাশ কাটিয়ে যাবার সময় তিনি আমার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে গেলেন। আমারও তাঁকে দেখে মনে হল লোকটি যেন চেনা-চেনা, আগে কোথাও দেখেছি।

কিন্তু কোথায় দেখেছি? যখন স্কুলে পড়তাম তখন আমার কয়েকটি মুসলমান বন্ধু ছিল, তাদেরই মধ্যে কেউ কি? নূর মহম্মদ? না, নূর তো ছিল মোটা আর বেঁটে। তবে কি জিয়াউদ্দিন? স্কুল ছাড়ার পর ওদের সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

দ্বিতীয়বার তাঁর পাশ কাটিয়ে যাবার সময় লোকটিকে আরও ভাল করে দেখলাম। হাঁটার ভঙ্গী, দেহের গড়ন, মুখের ডৌল, সবই চেনা-চেনা, কিন্তু তবু চিনতে পারছি না। তিনি আমার শালের ঘোমটা ভেদ করে মুখখানা দেখবার চেষ্টা করলেন, আমার

দিকে চাইতে চাইতে পাশ দিয়ে চলে গেলেন।

এবার আমি এক মতলব করলাম। আমি যদি তাঁকে চিনতে নাও পারি তিনি তো আমাকে চিনতে পারেন। তাই তৃতীয়বার তাঁর সামনা-সামনি হবার সময় আমি মাথার ওপর থেকে শালের ঘোমটা নামিয়ে দিলাম।

তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, অবাক বিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। আমিও চেয়ে রইলাম। তাঁর মুখে একটা হতবুদ্ধি হাসি ফুটে উঠল, তারপর তিনি নিজের মাথা থেকে পশমের রোমশ টুপিটা খুলে নিলেন।

স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলাম। এ যে অবিকল আমারি মুখ। এতক্ষণ চিনি-চিনি করে চিনতে পারছিলাম না। ওই টুপি ছদ্মবেশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু এ কি সম্ভব! দু'জন রক্তের সম্পর্কহীন মানুষের চেহারা একরকম হতে পারে?

কতক্ষণ পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না, যখন চমক ভাঙলো তখন অন্ধকার হয়ে গেছে, আর ভাল করে তাঁর মুখ দেখতে পাচ্ছি না। সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার নাম জানতে পারি কি?'

বললেন, 'আলি আহমদ। আপনার?'

নিজের নাম বললাম। তিনি অস্ফুট স্বরে একবার বললেন, 'তাজ্জব!' তারপর এগিয়ে এসে আমার বাহুতে হাত রাখলেন যেন এখনো বিশ্বাস করতে পারছেন না যে আমি জলজ্যান্ত মানুষ।

বলা বাহুল্য, আমাদের কথাবার্তা উর্দুতেই হচ্ছিল।

প্ল্যাটফর্মের ঘরগুলিতে কেরসিনের বাতি জ্বলছে। আমি বললাম, 'চলুন কেল্‌নারে চা খাওয়া যাক।'

'চলুন।'

কেল্‌নারের ঘরে সাদা টেবিল-ক্লথ ঢাকা একটি টেবিলে মুখোমুখি বসলাম। আলি আহমদ আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ হো হো শব্দে হেসে উঠলেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠলাম। দু'জনে খুব খানিকটা হাসলাম। মনের মধ্যে যে অগাধ বিস্ময় জমা হয়ে উঠেছিল তা উচ্ছ্বসিত করে দেবার এই বোধহয় একমাত্র পথ।

চা এল। আমরা শান্তভাবে চা খেতে খেতে পরস্পরকে দেখছি। আলি আহমদ প্রশ্ন করলেন, 'ভুরুর ওপর ও দাগটা কিসের? স্বাভাবিক নাকি?'

বললাম, 'না, হকি খেলতে গিয়ে কেটে গিয়েছিল।'

তিনি নিজের ভুরুর ওপর আঙুল বুলিয়ে বললেন, 'আমারও কেটে গিয়েছিল। একজন পাথর ছুঁড়ে মেরেছিল।'

প্রশ্নোত্তর চলেছে। তাঁর বয়স পঁচিশ, বিবাহিত, দুটি মেয়ে আছে। বাড়ি পাটনা সিটিতে। কিছু জমিদারি আছে, লেখাপড়া বেশীদূর করেননি, বিষয়সম্পত্তির দেখা-শোনা করেন। ভাগলপুরে শ্বশুরবাড়ি; সেখানে গিয়েছিলেন কয়েকদিনের জন্যে, এখন বাড়ি ফিরছেন।

আমার জীবনবৃত্তান্ত শুনে তিনি বললেন, 'এদিকে বিশেষ মিল নেই। কিন্তু চেহারা এমন হল কি করে?'

আমি মাথা নাড়লাম; এ প্রশ্নের জবাব জানি না। হয়তো প্রকৃতির অজস্র অগণিত সৃষ্টির মধ্যে দু'টি-একটির এমনি আকস্মিক মিল ঘটে যায়। হয়তো শুধু আমরা দু'জন নয়, আমাদের মত চেহারার মানুষ আরও আছে। হয়তো শুধু চেহারার মিল নয়, জীবনের ঘটনাতেও একজন মানুষের সঙ্গে আমার জীবন হুবহু মিলে যাচ্ছে। বিপুলা চ পৃথ্বী। শুধু পৃথিবী নয়, মহাশূন্যে কত গ্রহ জ্যোতিষ্ক আছে, সেখানে আমারই মত একটি জীব অবিকল আমারই মত জীবনযাপন করে চলেছে।

ঘণ্টা বাজল, গাড়ি আসছে।

আলি আহমদ ও আমি ইণ্টার ক্লাসের একই কামরায় উঠে বসলাম। গাড়ি চলতে লাগল। আমরা পাশাপাশি বসে আছি, কামরায় আর কেউ নেই; মাথার ওপর আলোটা টিমটিম করে জ্বলছে। আমরা মাঝে মাঝে দু'-একটা অবান্তর কথা বলছি; যেন নিজের সঙ্গেই নিজে কথা বলছি। সঙ্গতি অসঙ্গতির কথা ভাবছি না, যখন যা মনে আসছে তাই বলছি। নিজের কাছে নিজের সতর্ক থাকার দরকার কি?

পাটনা সিটি স্টেশনে আলি আহমদ নেমে গেলেন। নামবার আগে আমার হাত ধরে বললেন, 'কাছাকাছি তো, আবার দেখা হতে পারে।'

আমি বললাম, 'তা হতে পারে।'

হেঁচকা দিয়ে আবার গাড়ি চলতে আরম্ভ করল, তিনি নেমে পড়লেন। অস্পষ্টালোকিত স্টেশনে একবার তাঁকে দেখতে পেলাম। মনে হল আমি যেন লম্বা পা ফেলে স্টেশনের ফটকের দিকে যাচ্ছি।

মনটা আচ্ছন্ন হয়ে রইল। রাত্রি ন'টার সময় পাটনা জংশন স্টেশনে নামলাম।

তারপর প্রায় চল্লিশ বছর কেটে গেছে, আলি আহমদ সাহেবের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। আমি যখন বেঁচে আছি তখন তিনিও নিশ্চয়ই বেঁচে আছেন। ভাবি, তাঁর চেহারা কি আমার চেহারার মতই দাঁড়িয়েছে? হঠাৎ যদি দেখা হয়, আবার চিনতে পারব কি?

কিসের লজ্জা

পুণায় আসার তিন চার বছর পরে একটি লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল এবং তাঁর বিচিত্র ব্যবহার দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম। হয়তো অবাক হবার কিছু নেই, অনুরূপ অবস্থায় পড়লে আমিও এইরূপ ব্যবহার করতাম। যতদূর মনে পড়ছে লোকটির নাম ছিল রাম বিনায়ক জোশী। সংক্ষেপে রাম জোশী। জাতিতে ব্রাহ্মণ।

পুণায় আমার প্রথম মারাঠী বন্ধু ছিলেন শ্রীযুক্ত ডিকে। আমার চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন, এখন দেহরক্ষা করেছেন। যতদিন সচল ছিলেন, সুবিধা পেলেই আমার বাড়িতে আসতেন, আমিও সুবিধা পেলে তাঁর বাড়িতে যেতাম। দুটো বাড়ির মধ্যে ব্যবধান ছিল আন্দাজ আধ মাইল।

শ্রীযুক্ত ডিকের বাড়িটি ছিল দোতলা; ওপর তলায় তিনি থাকতেন, আর নীচের তলায় যিনি ভাড়াটে ছিলেন তাঁর নাম রাম জোশী। যখনই শ্রীযুক্ত ডিকের কাছে যেতাম,

দেখতাম রাম জোশী সদর দরজার সামনে টুল পেতে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। লোকটির বয়স হয়েছে, থলথলে মোটা গোছের শরীর। তাঁর গৃহিণীকেও দেখেছিলাম, রোগা লম্বা ধরনের মহিলা, এককালে সুন্দরী ছিলেন, এখন শুষ্ক বংশদণ্ডে পরিণত হয়েছেন। বাড়িতে ছেলেপুলে কেউ চোখে পড়েনি।

আমি এলেই রাম জোশী খবরের কাগজের আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে দেখতেন। কী দেখতেন ভগবান জানেন। পুণায় এসে লক্ষ্য করেছি ভিন্ন প্রদেশের লোক সম্বন্ধে মারাঠীদের কৌতূহলের অন্ত নেই। তবে তারা গায়ে পড়ে কারুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও করতে চায় না।

একদিন কথাচ্ছলে শ্রীযুক্ত ডিকে রাম জোশীর কথা বলেছিলেন। রাম জোশী পোস্ট অফিসের কর্মচারী ছিলেন, সম্প্রতি রিটায়ার করেছেন। তাঁর দুই ছেলে পুণার বাইরে চাকরি করে, মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে। স্বামী-স্ত্রী একা একা থাকেন।

রাম জোশী সম্বন্ধে এইটুকুই জানা ছিল। তার পর আমার বন্ধু মারা গেলেন, আমার ওদিকে যাওয়া বন্ধ হল। রাম জোশীর কথাও আর মনে রইল না।

একদিন সান্ধ্য ভ্রমণের পর বাড়ি ফিরছি, দেখলাম আমার ফটকের কাছে একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। লোকটিকে দেখে চিনতে পারলাম না, সে সামনে ঝুঁকে বিনীত ভাবে নমস্কার করল, থেমে থেমে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, 'আমাকে আপনি চিনতে পারবেন না, আমি ডিকে সাহেবের বাংলার নীচের তলায় থাকি। আমার নাম রাম বিনায়ক জোশী।'

তখন চিনতে পারলাম। লোকটির চেহারা খারাপ হয়ে গেছে, চোখে একটা ব্যাকুল বিহ্বল ভাব। আশ্চর্য হয়ে ভাবলাম—কী চান রাম জোশী!

ফটকের ভিতর দিকে চেয়ার পাতা ছিল, রাম জোশীকে নিয়ে গিয়ে বসালাম, বললাম, 'কি ব্যাপার বলুন তো? কিছু দরকার আছে কি?'

রাম জোশী চেয়ারের প্রান্তে বসে ঘাড় নীচু করে রইলেন, লজ্জায় যেন ভেঙে পড়ছেন। ঘাড় না তুলেই জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, 'আমি বড় বিপদে পড়ে এসেছি। ডিকে সাহেবের কাছে শুনেছিলাম আপনি জ্ঞানী ব্যক্তি—'

আমি কত বড় জ্ঞানী ব্যক্তি তা আমিই জানি; কিন্তু ব্যাপার কি? রাম জোশী বিপদে পড়ে নিজের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের কাছে না গিয়ে আমার মত সম্পূর্ণ অপরিচিত জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে এলেন কেন? সতর্কভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি বিপদ?'

রাম জোশী আর ঘাড় তোলেন না, কথাও বলেন না। শেষে অবরুদ্ধ স্বরে বললেন, 'আমার স্ত্রী—'

চকিত হয়ে বললাম, 'আপনার স্ত্রী।'

এবার রাম জোশী জোর করে ঘাড় তুললেন, ঝোঁক দিয়ে দিয়ে বলতে লাগলেন, 'হ্যাঁ, আমার স্ত্রী। ত্রিশ বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে, তিনি তিনটি সন্তানের মা। আমি জানি তাঁর মত সুশীলা সাধ্বী স্ত্রী হয় না। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'কিন্তু কিছুদিন থেকে কী হয়েছে জানি না, তিনি—তাঁর রাগ ভীষণ বেড়ে গেছে, আমাকে অশ্লীল গালাগালি দিচ্ছেন, অশ্লীল কথা বলছেন। বাবুজি, তিনি জীবনে কখনো অশিষ্ট কথা বলেননি। কিন্তু এখন—'

এবার আমি লজ্জায় অধোবদন হলাম। ক্ষীণকণ্ঠে বললাম, 'কিন্তু এ বিষয়ে আমি কি করতে পারি?'

রাম জোশী বললেন, 'আপনি জ্ঞানী লোক, নিশ্চয় এর প্রতিকার জানেন। বাবুজি,

আমি বড় মনঃকষ্টে আছি, আপনি আমাকে উদ্ধার করুন।'

আমি আরো দিশাহারা হয়ে গেলাম। এটা কি রোগ? আর যদি রোগই হয় আমি তার প্রতিকারের কী জানি? ফ্যালফ্যাল করে রাম জোশীর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

তিনি হাতের আস্তিনে চোখ মুছে বললেন, 'বেশী কি বলব বাবুজি, আমার স্ত্রী বলছেন আমার ছেলেমেয়েরা আমার নয়।'

লজ্জায় শিউরে উঠলাম। বৃদ্ধ বয়সে ভদ্রলোকের এ কী বিড়ম্বনা! বুঝতে পারলাম কেন তিনি নিজের আত্মীয়স্বজনের কাছে না গিয়ে আমার কাছে এসেছেন। আমি বিদেশী, আমার কাছে তাঁর লজ্জা কম। নিজের আত্মীয়স্বজনকে প্রাণ গেলেও তিনি এ কথা বলতে পারতেন না।

রাম জোশী আবার বললেন, 'বাবুজি, আপনি একটা উপায় করুন। নিশ্চয় আপনি এর দাবাই জানেন। এ একটা রোগ, আমার স্ত্রী রোগের মুখে মিথ্যে কথা বলছেন। তাঁর স্বভাব আমি জানি, এ সব মিথ্যে কথা।'

হঠাৎ মনে পড়ে গেল। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বই নিয়ে নাড়াচাড়া করা অভ্যাস আছে, মনে পড়ল কোন্ একটা ওষুধে এই রকম লক্ষণ দেখেছি। কি নাম ওষুধটার—হায়োসায়ামাস্! কিন্তু আমি বাড়িতে যে ছোট্ট হোমিও ওষুধের বাক্স রাখি তাতে হায়োসায়ামাস্ নেই; অত তেজালো ওষুধ আমার দরকার হয় না, পারিবারিক ব্যবহারের জন্যে নক্স ভমিকা পল্‌সেটিলা বেলেডোনা সাল্‌ফার এই রকম সাদাসিধে ওষুধই যথেষ্ট। আমি রাম জোশীকে বললাম, 'দেখুন, আমার মনে হয় হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রে এর দাবাই আছে। আপনি বরং একজন হোমিও ডাক্তারের কাছে যান।'

তিনি ব্যাকুল হয়ে বললেন, 'কিন্তু আমি যে হোমিও ডাক্তার কাউকে চিনি না!'

'আমি চিনি। তুলসী বাজারের মোড়ে ডাক্তার জি. বি. সাঠের হোমিও ডাক্তারখানা আছে, আমি মাঝে মাঝে ওষুধ কিনতে সেখানে যাই; ডাক্তার সাঠের সঙ্গে মুখ চেনা-চিনি আছে। সেই কথা রাম জোশীকে বললাম। তিনি প্রথমে গাঁইগুঁই করলেন, স্বজাতীয় ডাক্তারের কাছে যাবার ইচ্ছে নেই। শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন, আমার হাত ধরে মিনতি করে বললেন, 'আপনি সঙ্গে চলুন, আমি একা যেতে পারব না।'

রাত হয়ে গেছে, কিন্তু উপায় কি? রাম জোশীকে নিয়ে ডাক্তার সাঠের ডাক্তারখানায় গেলাম। দু'জনের পরিচয় করিয়ে দিয়ে চলে এলাম। আসার সময় রাম জোশী গলদশ্রু হয়ে বললেন, 'ধন্যবাদ বাবুজি, বহুৎ বহুৎ সুক্রিয়া।'

দিন পরে রাম জোশী আবার আমার বাড়িতে এলেন। আজ তাঁর মুখ বেশ প্রফুল্ল। বললেন, 'ওষুধ ধরেছে। ডাক্তার সাঠে ভারি বিচক্ষণ লোক, উনি কাউকে কিছু বলবেন না।'

তার পর মাসখানেক রাম জোশীর আর দেখা নেই।

একদিন বিকেলবেলা ডাক্তার সাঠের ডাক্তারখানায় ওষুধ কিনতে গেছি, ডাক্তার আমার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন। প্রশ্ন করলাম, 'রাম জোশীর স্ত্রীর খবর কি?' সাঠে বললেন, 'সেরে গেছে।'

মনটা খুশী হল। বললাম, 'কি ওষুধ দিয়েছিলেন?'

ডাক্তার মাথা নাড়লেন, 'ওষুধের নাম বলতে নেই।'

'হায়োসায়ামাস্?'

ডাক্তার চোখ বড় করলেন, কিন্তু হাঁ-না কিছু বললেন না।

ফেরার পথে ভাবলাম রাম জোশীর সঙ্গে দেখা করে যাই। শ্রীযন্ত্র ডিকে মারা যাবার পর আর ওদিকে যাইনি।

সদর দরজায় বসে রাম জোশীর স্ত্রী ডাল বাচছিলেন, আমাকে দেখে লজ্জায় ব্যাকুল হয়ে বাড়ির মধ্যে চলে গেলেন। এবং একটু পরেই রাম জোশী এসে দোরের সামনে দাঁড়ালেন।

আমি বললাম, 'কি জোশীজি, বাড়ির খবর ভাল তো?'

রাম জোশী আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে রূঢ় স্বরে বললেন, 'কে তুমি! তোমাকে আমি চিনি না।' এই বলে দড়াম করে দোর বন্ধ করে দিলেন।

লাঞ্ছিত মুখে বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভাবতে লাগলাম—এটা কী? লজ্জা? কিসের লজ্জা? আমি তো সবই জানি।

বো ম্বা ই কা ডা কু

কয়েকদিন আগে পুণার একটা হোটেলে দহি-বড়া খেতে ঢুকেছিলাম, আচারিয়ার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। প্রায় কুড়ি বছর পরে দেখা। বম্বে টকীজে আমরা একসঙ্গে ছিলাম, তারপর আচারিয়া যখন নিজের ফিল্ম কোম্পানী খুললেন তখন আমি বছর দেড়েক তাঁর সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। আমি চিত্রনাট্য লিখতাম, তিনি ছবি পরিচালনা করতেন।

দু'জনেরই চেহারার বদল হয়েছে, কিন্তু চিনতে কষ্ট হল না। আচারিয়া গুজরাতি, কিন্তু শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলেন, পরিষ্কার বাংলা বলেন। দু'জনে দহি-বড়া খেতে খেতে পুরনো কালের অনেক গল্প করলাম। অনেক পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটলাম। নানা কথার মধ্যে এক সময় তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'নর্সিং ভাই, সেই ঘটনাটা মনে আছে?' ঘটনার উল্লেখ করলাম, তিনি উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন।

যেদিন ঘটনাটি ঘটেছিল সেদিন কিন্তু হাসেননি। আজ সেই কথা বলি।

আচারিয়া তখন নিজের ফিল্ম কোম্পানী করেছেন। প্রথম ছবি শেষ হবার পর দ্বিতীয় ছবি আরম্ভ হয়েছে। গল্পটি প্রসিদ্ধ লেখক পান্নালাল প্যাটেলের লেখা, আমি চিত্রনাট্য তৈরি করেছি।

শুটিং চলছে, কখনো দিনে কখনো রাত্রে। দিনের বেলা শুটিং থাকলে আমি মাঝে মাঝে শুটিং দেখতে যাই, কিন্তু রাত্রে যাই না। আমি থাকি মালাডে, শুটিং হচ্ছে দাদরের একটা স্টুডিওতে, আন্দাজ বারো মাইলের তফাত। রাত্রে শুটিং দেখা পোষায় না।

একবার রাত্রে শুটিং পড়েছে। তারিখটা মনে আছে, সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিন। আমি সেদিন গৃহিণীকে নিয়ে দাদরে সিনেমা দেখতে গেছি; দাদরে মাঝে মাঝে

বাংলা ছবি আসে। ছবি শেষ হল আন্দাজ সাড়ে আটটায়। ভাবলাম নিজেদের ছবির কেমন শুটিং চলছে দেখে যাই।

আমার তখন একটা ছোট অস্টিন গাড়ি ছিল; তাইতে স্টুডিওতে যাতায়াত করতাম। সে-রাত্রে স্টুডিওতে পেঁছে দেখি শুটিংয়ের তোড়জোড় আরম্ভ হয়ে গেছে। প্রকাণ্ড উঁচু টিনের চালা ঘরে সেট বসেছে—গ্রাম্য একটি কুটির। চারিদিকে ওপরে নীচে তীব্র শক্তির আলো সাজানো হচ্ছে। কুটিরের দোরের সামনে ক্যামেরা বসেছে। আচারিয়া তদারক করছেন। অভিনেতারা মেক-আপ করতে গেছে। ন'টার সময় শুটিং আরম্ভ হবে, ভোর পর্যন্ত চলবে।

আমাদের দেখে আচারিয়া এগিয়ে এলেন, 'আপনারা এসেছেন। আজ খুব ভাল শুটিং আছে, হিরো হিরোইন দু'জনেই থাকবে। দেখে যান।'

গৃহিণী কিন্তু রাজী হলেন না। বম্বে টকীজে তিনি অনেক শুটিং দেখেছেন, দেখে দেখে অরুচি ধরে গেছে। উপরন্তু বাড়িতে ছেলেরা আছে, মা ফিরে না গেলে তারা খেতে পাবে না।

আচারিয়া তখন আমাকে বললেন, 'উনি বাড়ি যান, আপনি থাকুন। আজকের শুটিং একটু কঠিন, আপনি থাকলে আমার সাহায্য হবে।'

শেষ পর্যন্ত তাই ঠিক হল। গৃহিণী মোটরে ফিরে যাবেন, আমি সারারাত থাকব তারপর সকালবেলা লোকাল ট্রেনে বাড়ি ফিরব।

গৃহিণী চলে গেলেন। আচারিয়া আর আমি স্টুডিওর ক্যাণ্টিনে গিয়ে নৈশ আহার সম্পন্ন করলাম। খেতে খেতে আচারিয়া বললেন, 'আজ বড় ভয়ে ভয়ে আছি।'

বললাম, 'ভয় কিসের?'

তিনি বললেন, 'আজ ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই বাঁদর দেখেছি।'

'তাতে কী হয়?'

'বাঁদর দেখা ভারি খারাপ, সব কাজ ভণ্ডুল হয়ে যায়। আজ দুপুরবেলা আমার গাড়ির অ্যাক্সেল ভেঙেছে।'

সিনেমার লোকদের অনেক রকম কুসংস্কার থাকে। অশোককুমারের সামনে দিয়ে যদি কালো বেড়াল রাস্তা ডিঙিয়ে যায় সে আর এগুবে না। এমনি আরো অনেক আছে। সন্দেহ হল আচারিয়া আমাকে বাঁদরের অ্যাণ্টিডোট হিসেবে ধরে রেখেছেন। হেসে বললাম, 'রাম নাম করুন, সব বিপদ কেটে যাবে।'

শুটিং শুরু করতে সাড়ে ন'টা বাজল।

ছবির হিরোইন তখনকার দিনের যশস্বিনী অভিনেত্রী সর্দার বেগম। তিনি কুটির প্রাঙ্গণে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়েছেন; ক্যামেরা চালু হয়েছে, ঠকাস শব্দে ক্ল্যাপস্টিক পড়েছে, সর্দার বেগম অভিনয় আরম্ভ করেছেন, এমন সময়—

ক্যামেরা বন্ধ হয়ে গেল।

সবাই ক্যামেরা ঘিরে দাঁড়াল। ক্যামেরাম্যান এবং তার সহযোগীরা নানা ভাবে ফন্দি-ফিকির খাটিয়ে ক্যামেরা আবার চালু করবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু ক্যামেরা অটল, নট্ নড়ন চড়ন, নট্ কিচ্ছু। মঞ্চে ভিড় জমে গেল, কর্মীরা ছাড়াও অনেক লোক জুটে গেল। আচারিয়া গলদঘর্ম হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগলেন। একবার কাতরভাবে আমার দিকে তাকালেন; তাঁর দৃষ্টির অর্থ—বলেছিলাম কিনা। বাঁদর দেখা কখনো মিথ্যে হয়!

দেড় ঘণ্টা ধস্তাধস্তি করেও যখন ক্যামেরা চালানো গেল না তখন একজন সহকারী ক্যামেরাম্যান ক্ষেপে গিয়ে বলল, 'দাঁড়াও, আমি ব্যবস্থা করছি।' এই বলে সে ছুটে মঞ্চ থেকে বেরিয়ে গেল।

রাত্রি তখন এগারোটা বেজে গেছে। সর্দার বেগম একটি ক্যাম্বিসের চেয়ারে বসে ঝিমোচ্ছেন। আমরা হতাশ মনে ভাবছি এতরাত্রে কোথায় গেল লোকটা, এমন সময় সে ফিরে এল। হাতে একটি ছোবড়া-ছাড়ানো আস্ত নারকেল। সে নারকেলটি দু'হাতে নিয়ে ক্যামেরার সামনে মেঝের ওপর সজোরে আছাড় মারল; নারকেল ভেঙে খানিকটা জল বেরুল। তখন সে বলল, 'চালাও ক্যামেরা।'

আশ্চর্য ব্যাপার! সুইচ টিপতেই ক্যামেরা চলতে আরম্ভ করল। সকলে হৈ হৈ করে উঠল। আচারিয়া সহকারী ক্যামেরাম্যানের পিঠ ঠুকে দিয়ে বললেন, 'সাবাস!'

আবার শুটিং চালু হল।

কিন্তু বাঁদরের বাঁদরামি তখনো শেষ হয়নি।

রাত্রি একটা পর্যন্ত বেশ শুটিং চলল; তারপর হঠাৎ হিরোইনের পায়ে পেরেক ফুটে গেল। সেট তৈরি করার সময় কেউ অসাবধানে পেরেক ফেলে রেখেছিল; হিরোইন গ্রাম্য সুন্দরী, তাই সর্দার বেগম খালি পায়ে অভিনয় করছিলেন; পেরেকটা তাঁর পায়ের চেটোয় বিঁধে গেছে।

আবার হৈ হৈ কাণ্ড। শুটিং বন্ধ হয়ে গেল। দু'জন সহকারী ডিরেক্টর হিরোইনকে নিয়ে হাসপাতালে ছুটল। এখনি এ. টি. এস. ইন্জেক্শন দিতে হবে, দেরি করলে ধনুষ্টঙ্কার হতে পারে।

আচারিয়া ক্ষুব্ধভাবে ঘড়ি দেখে বললেন, 'আজ আর কিছু হবে না, দেড়টা বাজে। সর্দার বাঈ এখন বোধ হয় তিন-চার দিন সেটে আসতে পারবেন না, শুটিং ক্যান্সেল করে দিতে হবে। দেখলেন তো বাঁদরের কাণ্ড!'

'তা তো দেখলাম, কিন্তু আমি এখন যাই কোথায়! রাত্রি দেড়টার সময় লোকাল ট্রেন বন্ধ হয়ে গেছে, আবার সেই ভোরবেলা চালু হবে। ততক্ষণ কি ইস্টিশানে বসে হাপু গাইব?'

আচারিয়া সমস্যার সমাধান করে দিলেন, বললেন, 'চলুন আমার বাসায়। গিন্নী বাপের বাড়ি গেছেন, বাসায় কেউ নেই। দু'জনে আরামসে শুয়ে থাকা যাবে। সকালে চা খেয়ে আপনি বাড়ি চলে যাবেন।'

ধড়ে প্রাণ এল। বললাম, 'চলুন।'

আচারিয়ার বাসা স্টুডিও থেকে মাত্র পাঁচ মিনিটের রাস্তা, হেঁটে যাওয়া যায়। চারতলা বাড়ির তৃতীয় তলায় ছোট একটি ফ্ল্যাট। আমি আগে এসেছি, বাড়িটাতে গোটা আষ্টেক ফ্ল্যাট আছে।

বাড়ির সামনে পৌঁছে দেখলাম দরজার কাছে একটা লরি দাঁড়িয়ে আছে। লরিতে মালপত্র চাপানো রয়েছে, লোকজন কাউকে দেখলাম না।

বাড়ির দরজাটা বেশ চওড়া, ভেতরে ঢুকেই সিঁড়ি আরম্ভ হয়েছে; মাথার ওপর টিম টিম করে ন্যাড়া বাল্ব জ্বলছে। আমরা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে আরম্ভ করলাম।

দোতলা পর্যন্ত উঠেছি, দেখলাম ওপর দিক থেকে একজন লোক নেমে আসছে; তার মাথায় একটা প্রকাণ্ড হোলড্-অল, হাতে বেশ পুরুষ্টু গোছের একটি স্যুটকেস। একটু আশ্চর্য মনে হল। রাস্তায় লরি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আশ্চর্য হইনি, এখন সপ্রশ্ন চক্ষে আচারিয়ার দিকে চাইলাম। এত রাত্রে কেউ কি ট্রেন ধরতে যাচ্ছে?

সিঁড়িতে জায়গা কম। আচারিয়া পাশের দিকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন, লোকটি মোট-ঘাট নিয়ে আমাদের পাশ কাটিয়ে নীচে গেল। আমরা ওপরে উঠতে লাগলাম। আচারিয়া বললেন, 'বোধ হয় কেউ বাসা বদল করছে। আজ তিরিশে সেপ্টেম্বর কাল নতুন মাস আরম্ভ হবে, তাই ভোর হবার আগেই বাসা ছেড়ে দিচ্ছে।'

'তাই হবে।'

তেতলায় উঠে বাঁ দিকে আচারিয়ার ফ্ল্যাট। তিনি পকেট থেকে চাবি বার করে দোর খুলতে গিয়ে চমকে উঠলেন—এ কি! তালা খোলা!

এক ধাক্কায় দরজা খুলে তিনি ঘরে ঢুকলেন, দোরের পাশে সুইচ টিপে আলো জ্বাললেন, তারপর হতভম্ব হয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ঘরে কিছু নেই। খাট বিছানা চেয়ার টেবিল সব অদৃশ্য হয়েছে। পাশের ঘরটা ভাঁড়ার এবং রান্নাঘর, সেখানে হাঁড়িকুড়ি কিছু নেই। চোর যথাসর্বস্ব চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে।

এই সময়ে নীচে রাস্তা থেকে লরির ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল। আমরা দু'জনেই ছুটে গিয়ে রাস্তার ধারের জানলায় দাঁড়ালাম। উঁকি মেরে দেখলাম মাল-বোঝাই লরিটা গুরুগম্ভীর শব্দ করে চলে গেল।

আচারিয়া সেই দিকে গলা বাড়িয়ে চেয়ে রইলেন, তারপর লরি যখন অদৃশ্য হয়ে গেল তখন আমার দিকে ফিরে পাংশু মুখে বললেন, 'যাঃ! বেটা সব নিয়ে চলে গেল!'

বুঝতে বাকি রইল না, চোর লরি নিয়ে চুরি করতে এসেছিল, চোরের সঙ্গে সিঁড়িতে আমাদের দেখাও হয়েছিল, কিন্তু তার স্বরূপ চিনতে পারিনি। আচারিয়া নিজের হোলড্-অল এবং স্যুটকেস চিনতে পারেননি।

বাঁদর যে এমন সাংঘাতিক জীব তা কে জানত!

কিন্তু—অলমতি বিস্তরেণ।

সে-রাত্রে মেঝের ওপর খবরের কাগজ পেতে আমরা শুয়েছিলাম।

আর একটু হলেই

মুশকিল হয়েছে, সত্যি কথা বললে কেউ বিশ্বাস করে না। অথচ মাঝে মাঝে সত্যি কথা না বললেই বা চলে কি করে? সুতরাং আজ সত্যি কথাই বলব। যা থাকে কপালে।

তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে আসছে। আমি থাকি বম্বে শহরের উপকণ্ঠে মালাড্ নামক স্থানে। মালাড্ আমার আদি কর্মস্থল, ১৯৪১ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত বম্বে টকীজে চাকরি করেছি। তারপর যখন চাকরির মেয়াদ ফুরলো, তখনো মালাডেই থেকে গিয়েছিলাম। দরকার হলে বৈদ্যুতিক লোকাল ট্রেনে বোম্বাই যাতায়াত করতাম।

একদিন শীতের দুপুরে কি একটা কাজে বোম্বাই গিয়েছিলাম। কাজ সারতে বিকেল গড়িয়ে গেল। তাড়াতাড়ি দাদর স্টেশনে এসে ট্রেনের অপেক্ষা করতে লাগলাম।

আজই রাত্রে আবার আমাকে দাদরে ফিরে আসতে হবে; দাদরে একটা গানের জলসা আছে তাতে যোগ না দিলেই নয়। বাড়ি ফিরে ধড়াচুড়ো ছেড়ে ধুতি পাঞ্জাবিতে বাঙালী সেজে আবার আসতে হবে।

পাথর-বাঁধানো উঁচু প্ল্যাটফর্ম। আমি প্ল্যাটফর্মের সামনের দিকে রেল-লাইন থেকে তিন চার হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছি। ট্রেন এল। পাঁচটা বেজে গেছে, অসম্ভব ভিড়। থার্ড ক্লাস গাড়ির দোরের সামনে অসংখ্য যাত্রী ডাণ্ডা ধরে বাদুড়ের মত ঝুলছে।

গাড়ি তখনো থামেনি, তবে প্রায় থেমে এসেছে, এমন সময় একটা ব্যাপার ঘটল। গাড়ির দোরের সামনে যে-সব যাত্রী ঝুলছিল তাদের মধ্যে একজন প্ল্যাটফর্মের ওপর লাফিয়ে পড়ল। কিন্তু তার মুখ ছিল পিছন দিকে, সে তাল সামলাতে পারল না, প্ল্যাটফর্মের ওপর পড়ে গিয়ে গড়াতে শুরু করল। গতি রেলের লাইনের দিকে।

আমি দেখছি লোকটা গড়াতে গড়াতে আমার সামনে দিয়ে যাচ্ছে। দুটো গাড়ির মাঝখানে ফাঁক থাকে, এখনি তার মধ্য দিয়ে লাইনের ওপর পড়বে। ট্রেন তখনো থামেনি।

লোকটার একটা ঠ্যাং শূন্যে লাফিয়ে উঠল। আমি যন্ত্রচালিতের মত হাত বাড়িয়ে ঠ্যাং ধরে টেনে নিলাম। শপথ করে বলছি আমি বয়-স্কাউট নই, দৈনিক সৎকার্য করার দিকে আমার তিলমাত্র ঝোঁক নেই। এই লোকটার প্রাণরক্ষার ব্যাপারে আমি নিমিত্তমাত্র।

লোকটা বেশ জোয়ান। গ্যাঁটাগোঁটা চেহারা। এদেশে যাদের ভৈয়া বলে সেই শ্রেণীর লোক। অর্থাৎ উত্তরপ্রদেশ থেকে আগত গোয়ালা। এরা দুধের ব্যবসা করে এবং অবসর কালে গুণ্ডামি করে বেড়ায়।

লোকটা প্ল্যাটফর্মে বসে ফ্যালফ্যাল করে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। মনে হল তার বিশেষ চোট লাগেনি, কেবল পাগড়িটা খসে গিয়ে ঘাড়ের ওপর পড়েছে। খানিকক্ষণ বসে থাকার পর সে মাটি ধরে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। তার ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল—'বাবু সাব—'

আর কিছু শুনতে পেলাম না। আমারো তাড়া ছিল, গুঁতোগুঁতি করে গাড়িতে উঠে পড়লাম। আশ্চর্য এই যে, এতবড় একটা ব্যাপার ঘটে গেল কিন্তু স্টেশনের ছুটো-ছুটি হুড়োহুড়ির মধ্যে কেউ তা লক্ষ্য করল না। লোকটা রেলে কাটা পড়লে অবশ্য লক্ষ্য করত।

আমার হাত দিয়ে ভগবান এমন একটা সৎকার্য করিয়ে নিলেন কেন ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরে এলাম। তারপর বেশ পরিবর্তন করে কিছু জলযোগ করে নিয়ে আবার বেরুলাম। রাত্রি আটটা থেকে গানের জলসা। কয়েকটি বাঙালী এবং অবাঙালী সিনেমা গায়ক সঙ্গীতসুধা বিতরণ করবেন।

জলসার অকুস্থল দাদর স্টেশন থেকে বেশী দূর নয়, প্ল্যাটফর্ম থেকে পুলে উঠে পূব দিকে যেতে হয়। যারা পুলে চড়তে চায় না তারা রেলের লাইন টপকে রাস্তায় গিয়ে পড়ে। কিন্তু ভিড়ের সময় লাইন ডিঙানো নিরাপদ নয়। আমি পুল পেরিয়ে গানের আসরে উপস্থিত হলাম।

সে-রাত্রে মজলিশ খুব জমেছিল। যাঁরা গাইলেন তাঁরা সকলেই তখনকার দিনের খ্যাতনামা গাইয়ে, এখনও তাঁদের মধ্যে দু'একজন অবশিষ্ট আছেন। সভা যখন ভঙ্গ হল তখন বারোটা বাজতে বেশী দেরি নেই। গানের গুঞ্জন মনে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম। রাত যত বাড়বে লোকাল ট্রেনের সংখ্যা তত কমতে থাকবে। বাড়ি পৌঁছতে একটা বেজে যাবে।

রাস্তা নির্জন। দাদর স্টেশন আলোগুলোকে জ্বালিয়ে রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছে। স্টেশনের এলাকায় পৌঁছে আমি ভাবলাম, পুলে উঠে কী হবে, লাইন ডিঙিয়ে

প্ল্যাটফর্মে উঠি। বেশী দূর নয়, বড় জোর পঞ্চাশ গজ। লোকজন নেই, কেউ দেখতে পাবে না; পেলেও নিদ্রালু অবস্থায় হাঙ্গামা করবে না।

লাইন টপকে চলেছি, কোথাও জনমানব দেখা যাচ্ছে না। দূরে দূরে উঁচু ল্যাম্প-পোস্টগুলোর মাথায় নীলাভ আলো জ্বলছে। আধাআধি রাস্তা গিয়েছি, পিছন দিকে চাপা পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে ফিরে তাকালাম। একটা লোক পা টিপে টিপে আমার দিকে এগিয়ে আসছে, তার হাতে হাত-খানেক লম্বা একটা লোহার ডান্ডা।

আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল। চিন্তা করবার ফুরসৎ পেলাম না, চিৎ হয়ে একটা ল্যাম্পপোস্টের নীচে মাটিতে পড়ে গেলাম।

লোকটা আমার বুকের ওপর চেপে বসে লোহার ডান্ডা তুলল। লক্ষ্য আমার মাথা।

তারপরই তার হাত অর্ধপথে থেমে গেল। সে সজোরে নিশ্বাস টেনে বলে উঠল—'বাবু সাব!'

ল্যাম্পপোস্টের আলোতে সে আমার মুখ চিনতে পেরেছিল। আমি তার মুখ দেখতে পেলাম না, পাগড়ির ছায়ায় মুখটা ঢাকা পড়েছিল; কিন্তু চিনতে বাকি রইল না। আজ বিকেলে যাঁর প্রাণরক্ষা করেছিলাম ইনি সেই ব্যক্তি।

এইখানেই ঘটনার শেষ। লোকটা ক্ষণকাল জবুথবুভাবে আমার বুকের ওপর বসে রইল, তারপর ধড়মড় করে উঠে লম্বা দৌড় মারল। এ জীবনে তাকে আর দেখিনি।

আমি উঠে গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে ভাবলাম আর একটু হলেই গিয়েছিলাম। ভাগ্যিস লোকটার প্রাণ বাঁচিয়েছিলাম! কিন্তু তাই বা কেন? লোকটা যদি রেলে কাটা পড়ত তাহলে তো এখন এ ব্যাপার ঘটতে পারত না! ভগবানের মতলব বুঝতে পারলাম না, মাথাটা ঘুলিয়ে গেল। আজও ঘুলিয়েই আছে।—

ওপরে যা লিখলাম নির্জলা সত্যি কথা। সাক্ষী চন্দ্র সূর্য এবং দাদর স্টেশনের সেই ল্যাম্পপোস্টটা।

কিষ্টোলাল

হরিবিলাসবাবুর ছেলে রামবিলাস বার দুয়েক ম্যাট্রিক ফেল করে বাড়ি থেকে ফেরার হয়েছিল। হরিবিলাসবাবু আমাদের পাড়াতেই থাকতেন; শরীর বাতে পঙ্গু কিন্তু পয়সা-কড়ি আছে। ঘরে বসে বসে যতদূর সম্ভব ছেলের খোঁজ-খবর করলেন, কলকাতার কাগজে হাহুতাশপূর্ণ বিজ্ঞাপন দিলেন। কিন্তু রামবিলাস ফিরে এল না। সে বাপের ক্যাশ-বাক্স ভেঙে অনেক টাকা নিয়ে পালিয়েছিল, টাকা যতদিন না ফুরোবে

ততদিন রামবিলাস বাড়িমুখো হবে না এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত ছিলাম।

একদিন হরিবিলাসবাবু খোঁড়াতে খোঁড়াতে আমার কাছে এসে উপস্থিত। হাতে এক-তাড়া নোট এবং একটি ফটোগ্রাফ। বললেন, 'পাজিটার সন্ধান পেয়েছি। দিল্লীতে গিয়ে লুকিয়ে আছে।'

বললাম, 'বলেন কি? একেবারে দিল্লী!'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। আমার পাটনার এক বন্ধু দিল্লী গিয়েছিলেন, তিনি লিখেছেন। একবার রাস্তায় তাকে দেখেছিলেন, ছোঁড়া দূর থেকে তাঁকে দেখেই কেটে পড়ল।'

'হুঁ। এখন তাকে ধরবেন কি করে?'

'আমার তো অবস্থা দেখছ ভায়া, নড়বার ক্ষমতা নেই। তা বলছিলাম কি, তুমি তো এখন কাজকর্ম কিছু করছ না, তুমি যদি যাও। পাজিটার কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে আসবে।'

প্রস্তাবটি খুবই স্পৃহণীয়। সে আজকের কথা নয়, তখন বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক চলছে। আমি তখন লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে মুঙ্গেরে বসে আছি এবং পিতৃ-অন্ন ধ্বংস করছি। পরের পয়সায় দিল্লী সফরের এত বড় সুযোগ ছাড়া যায় না। এক কথায় রাজী হয়ে গেলাম।

ওপরে যা লিখলাম তা এই আখ্যায়িকার ভূমিকা, আসল কাহিনী নয়। আসল কাহিনীর সঙ্গে রামবিলাসের যোগসূত্র খুবই সামান্য, সে আমার দিল্লী ভ্রমণের নিমিত্ত মাত্র।

একদিন ভোরবেলা দিল্লী পৌঁছুলাম। শীতের মরসুম শেষ হয়ে আসছে, তবু ভোর পাঁচটার সময় দিল্লী শহর কুয়াশার ভোট কম্বল মুড়ি দিয়ে তন্দ্রাসুখ উপভোগ করছে। স্টেশনের উঠানে টাঙার দল কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

একটা টাঙার পাশে গিয়ে গাড়োয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ভাড়া যাবে?'

গাড়োয়ান টাঙায় বসে বিড়ি টানছিল, নেমে এসে বিশুদ্ধ উর্দুতে বলল, 'কোথায় যেতে হবে?'

গাড়োয়ানের চেহারা চাবুকের মত লিকলিকে। চুস্ত পাজামা ও চুড়িদার কুর্তায় আরও লিকলিকে দেখাচ্ছে। রঙ্ তামাটে ফরসা, চোখে সুর্মার রেশ, ঠোঁটের দুই কোণে গতরাত্রির পানের ছোপ শুকিয়ে আছে; মাথায় রোমশ পশমের ঝাঁকড়া টুপি। বয়স আন্দাজ পঁচিশ। মনে হল লোকটি বোধহয় পাঞ্জাবী মুসলমান।

বিশুদ্ধ উর্দু বলতে পারি না, কিন্তু বুঝতে পারি। বললাম, 'আগে একটা মাঝারি ভাড়ার হোটেলে যাব, সেখানে মালপত্র রেখে শহর দেখতে বেরুব।'

গাড়োয়ান বলল, 'বহুত খুব। আপনাকে আমি দিল্লী দেখিয়ে দেব। কিন্তু আগেই হোটেলে যাবার দরকার কি! শহর দেখে বিকেলবেলা হোটেলে যাবেন। তাতে ভাড়া কম লাগবে।'

'কিন্তু আমার মালপত্র রাখব কোথায়?'

সঙ্গে ছিল ছোট সুটকেস এবং বিছানা, একটা কুলি মাথায় নিয়ে আমার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়োয়ান একবার সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'এই মাল? এ আমার টাঙাতেই রাখা চলবে।'

মুহূর্ত মধ্যে মাল টাঙার খোলের মধ্যে রেখে গাড়োয়ান বলল, 'চলুন তাহলে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়া যাক। কুতুব দেখবেন তো?'

দেখলাম সে আমার নগর দর্শনের সমস্ত দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছে। কুলির পয়সা চুকিয়ে দিয়ে টাঙায় উঠে বসলাম, বললাম, 'নিশ্চয়। তাছাড়া লালকেল্লা,

আরও যা-যা দেখবার আছে—'

'বহুত খুব। সারাদিন লাগবে।'

'কত ভাড়া নেবে বললে না তো?'

'সারাদিনের জন্যে পাঁচ টাকা।'

'বেশ, দেব।'

আকাশে সূর্য উঠি উঠি করছে, রাস্তা জনবিরল। গাড়োয়ান তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

আধ মাইল রাস্তা যাবার পর সে ঘ্যাঁচ করে টাঙা থামাল। আমি সামনের আসনে তার পাশে বসেছিলাম, ঘাড় ফিরিয়ে বললাম, 'কি ব্যাপার। এখানে কী?'

সে বলল, 'খাবারের দোকান। সারাদিন বাইরে বাইরে কাটবে, ভাল করে খেয়ে নিন।'

'তুমিও এস।'

দু'জনে খাবারের দোকানে গিয়ে বসলাম। গাড়োয়ানকে ফরমাস করতে বললাম। সে ফরমাস দিল, সদ্য ভাজা জিলিপি আর গরম দুধ। পেট ভরে খেলাম। কিছু শুকনো খাবার—লাড্ডু, সামোসা, শেও-ডালমুট—সঙ্গে নিলাম। দুপুরবেলা দরকার হবে।

গাড়োয়ান পানের দোকান থেকে এক ডিবে পান ভরে নিল। তারপর আবার যাত্রা শুরু হল। শহরের এলাকা পার হয়ে গাড়োয়ান মৃদু গলায় গান গাইতে গাইতে চলল—বাবুল মোরি নৈহর ছুটো যায়—

কুতুব মিনার শহর থেকে এগারো মাইল, আগে সেখানেই যাচ্ছি। নয়াদিল্লী তখন সবে তৈরি হচ্ছে, তেপান্তর মাঠের ভিতর দিয়ে বাঁধানো রাস্তা চলেছে, মাঠের ওপর বাঘ-বন্দী খেলার ছক তৈরি হয়েছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ির ভিত মাটি ছাড়িয়ে মাথা তুলেছে।

গাইতে গাইতে গাড়োয়ানটা আমার দিকে তাকাচ্ছে, তার ঠোঁটের কোণে একটু হাসি লেগে আছে। তারপর সে অপরূপ বাংলা ভাষায় কথা বলল, 'আপনি তো বাংগালী হচ্ছেন।'

অবাক কাণ্ড। আমি পুলকিত হয়ে বললাম, 'আরে, তুমি বাংলা জান?'

সে হাসি হাসি মুখে বলল, 'হামিও বাংগালী হচ্চি। হামার নাম কিষ্টোলাল গাঙ্গোলী।'

চমৎকৃত হয়ে চেয়ে রইলাম। বাঙালীর ছেলে! অথচ চেহারায় চালচলনে বাঙালীত্বের ছিটেফোঁটাও নেই।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কতদিন এ কাজ করছ?'

সে বলল, 'এ টাঙা চালানো? সে বহুৎ দিন। দশ-বারো বরষ।'

মনে একটু কষ্ট হল। বাঙালী ব্রাহ্মণের ছেলে, বাপ হয়তো দিল্লীতে থাকত, অল্প বয়সে মারা গিয়েছিল, অনাথ ছেলেটা পেটের দায়ে টাঙা চালাচ্ছে। এতক্ষণ মনে মনে তাকে একটু নীচু নজরে দেখছিলাম, এখন সামাজিক পার্থক্য ঘুচে গেল। কিষ্টোলাল আর আমি সমপর্যায়ের মানুষ।

তারপর সারাদিন আমরা দু'জনে একসঙ্গে ঘুরে বেড়ালাম। কুতুব দেখলাম, লালকেল্লা দেখলাম। ছোটখাটো অনেক কিছু দেখা হল না, সন্ধ্যে হয়ে গেল। কিন্তু কিষ্টোলালের সঙ্গে আমার প্রণয় গভীর হল।

লালকেল্লা দেখে টাঙায় উঠলাম, বললাম, 'ভাই কিষ্টোলাল, আজ এই পর্যন্ত থাক, কাল আবার দেখা যাবে। তোমার ঘোড়াটা বোধহয় লোহা দিয়ে তৈরি, তোমার

শরীরও তাই। কিন্তু আমার গতর চূর্ণ হয়ে গেছে।'

কিষ্টোলাল খিলখিল করে হেসে উঠল, বলল, 'চলুন আপনাকে এক জায়গায় নিয়ে যাই।'

টাঙা আবার চলল। যেতে যেতে হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল রামবিলাসের কথা। যার খোঁজে দিল্লী এসেছি তার কথাই ভুলে গিয়েছিলাম। বললাম, 'কিষ্টোলাল, তুমি তো সর্বদাই রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াও, রামবিলাস নামে একটা ছেলেকে দেখেছ?'

'রামবিলাস! সে কৌন আছে?'

তখন রামবিলাসের কেচ্ছা বললাম, শুনে কিষ্টোলাল গরম হয়ে উঠল। বলল, 'বড়া শয়তান লৌন্ডা আছে, ঘর ছেড়ে ভেগেছে! আচ্ছা, হামি খবর নিবে।'

তারপর কিষ্টোলাল এক পাঁচিল-ঘেরা বাড়ির ফটকে টাঙা ঢোকালো। প্রকান্ড হাতা, মাঝখানে দোতলা বাড়ি; বাড়ির সামনে টেনিস কোর্ট, দু'পাশে ফুলের বাগান; বাড়ির ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে বললাম, 'ও কিষ্টোলাল, এ কোথায় নিয়ে এলে! এই তোমার মামুলি হোটেল নাকি?'

কিষ্টোলাল মুচকি হেসে বলল, 'হোটেল না, হামার পিতাজির বাড়ি।'

ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলাম। কিষ্টোলাল বলে কী! ঠাট্টা করছে নাকি? টাঙা গাড়ি বারান্দার সামনে এসে দাঁড়াল। কিষ্টোলাল হাঁক ছাড়ল, 'প্যারেলাল! গুলাব সিং! মেহদি মিঞা! ইধর আও, সাহেব আয়ে হৈঁ, সামান উতারো।'

গোটা চারেক চাকর ছুটে এল, টাঙা থেকে আমার সামান নামাতে লাগল। কিষ্টোলাল টাঙা থেকে নেমে বলল, 'আসুন।'

আমরা বাড়ির বারান্দায় উঠলাম। ইতিমধ্যে একটি মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক ভিতর দিক থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন, বললেন, 'কি রে কেষ্ট, তুই এলি!'

আমি বিস্ময়াহত হয়ে দেখছি, কিষ্টোলাল গিয়ে বাপের হাঁটু ছুঁয়ে প্রণাম করল, উর্দুতে বলল, 'হ্যাঁ, আমার একটি বন্ধুকে নিয়ে এসেছি। ইনি বাংগালী, দু'-চার দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছেন।'

কিষ্টোলালের বাবা স্মিতমুখে এগিয়ে এলেন। বললেন, 'আসুন।'

প'রে জানতে পেরেছিলাম তাঁর নাম প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী, দিল্লীর একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যারিস্টার। শীর্ণ লম্বা চেহারা, ফর্সা রঙ, কপালের দুই পাশে টোল খেয়েছে, গালে মাংস নেই, কেশবিরল মাথাটা গম্বুজের মত উঁচু হয়ে আছে। কিষ্টোলালের সঙ্গে তাঁর চেহারা মিলিয়ে দেখলাম, কাঠামো একই, কালক্রমে কিষ্টোলালও তার বাবার মত হয়ে দাঁড়াবে।

মন থেকে বিস্ময় কিছুতেই যাচ্ছে না। কিষ্টোলালের বাপ যদি এমন ধনী ব্যক্তি তবে সে টাঙা হাঁকায় কেন? বাপ-ব্যাটায় অসদ্ভাবও তো নেই। তবে ব্যাপার কি?

প্রিয়নাথবাবু সমাদর করে আমাকে ড্রয়িংরুমে নিয়ে গেলেন। ছেলেকে বললেন, 'কেষ্ট, তুই আজ এখানেই থেকে যা না।'

কিষ্টোলাল বলল, 'না বাবুজি, ঘোড়াটা থকে আছে, আমি এখনি যাব।'

প্রিয়নাথবাবু আর কিছু বললেন না, মেহদি মিঞাকে মুর্গি কাটবার হুকুম দিয়ে ভিতর দিকে চলে গেলেন।

কিষ্টোলাল আমার কাছে এসে খাটো গলায় বলল, 'ভাড়াটা দেবেন নাকি? তাহলে আজ রাত্তিরে একটু খানা-পিনার ব্যবস্থা করি।'

আমি তাকে ভাড়ার পাঁচটা টাকা দিলাম, সে টাকা পকেটে রেখে বলল, 'আমার বন্ধুদের বাড়িতে নিয়ে এলে বাবুজি খুশী হন।—আচ্ছা, আজ তাহলে চলি। কাল সকালে আবার আসব।'

প্রিয়নাথবাবু দু' মিনিট পরে ফিরে এসে দেখলেন কিষ্টোলাল অন্তর্হিত হয়েছে। একটু ম্লান হেসে তিনি আমার পাশে বসলেন, বললেন, 'কেষ্ট পালিয়েছে! পালাবেই তো, বাড়িতে যে বাঘ আছে।'

প্রিয়নাথবাবুর ইঙ্গিতটা ঠিক বুঝলাম না। কিন্তু কিষ্টোলাল চলে যাবার পর আমি বিলক্ষণ অস্বস্তি বোধ করছিলাম, অপ্রতিভ ভাবে বললাম, 'কেষ্ট আমাকে আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে চলে গেল। আপনি আমাকে চেনেন না, নাম পর্যন্ত জানেন না। আপনার নিশ্চয় খুব অসুবিধা হবে—'

প্রিয়নাথবাবু শান্ত স্বরে বললেন, 'কোনো অসুবিধা হবে না। কেষ্ট যখন অতিথি নিয়ে আসে আমার ভালই লাগে। কয়েক মাস আগে একপাল আমেরিকান টুরিস্ট নিয়ে হাজির হল। তারা দু' দিন বাড়িতে ছিল, আমার এক কেস হুইস্কি সাবাড় করে দিয়ে গেল। কিন্তু ভারি আমুদে, যতদিন ছিল ভালই লেগেছিল।' একটু থেমে বললেন, 'আমার আর কেউ নেই, এত বড় বাড়িটা ফাঁকা পড়ে আছে। কেষ্ট যখন বন্ধুদের নিয়ে আসে মনে হয় তবু আমার আপনার লোক আছে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি একলা থাকেন?'

প্রিয়নাথ বললেন, 'তা একলা বৈকি। কেষ্ট আমার একমাত্র সন্তান। ওর মা বহুদিন মারা গেছেন। এখন কেবল—'

এই সময় একটি অপরূপ সুন্দরী যুবতী ট্রের ওপর চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে ঢুকল। চোখ-ঝলসানো রূপ, কিন্তু মুখখানি বিষণ্ণ গম্ভীর। আমি একবার তাকিয়েই ঘাড় নীচু করে ফেললাম। প্রিয়নাথ শুষ্ক স্বরে বললেন, 'কেষ্টর বৌ—আলপনা।'

আমার মনের মধ্যে বিস্ময় বেড়েই চলেছে। কেষ্টর বৌ আছে! নানা প্রশ্ন মনের মধ্যে গজগজ করে উঠল। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু জিজ্ঞেস করাও যায় না। আলপনা চা ঢেলে আমাদের দিল, তারপর আস্তে আস্তে ঘর থেকে চলে গেল।

চা পান শেষ হলে প্রিয়নাথবাবু বললেন, 'আপনি বোধহয় স্নান করবেন?'

বললাম, 'হ্যাঁ। গায়ে সারাদিনের ধুলো জমেছে।'

প্রিয়নাথবাবু ডাকলেন, 'আলপনা!'

আলপনা দোরের কাছে এসে দাঁড়াল, বলল, 'বাথরুমে গরম জল দেওয়া হয়েছে।' তার গলাটিও বেশ মিষ্টি।

প্রিয়নাথ আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন। এটি আমার শয়নকক্ষ। সাজানো ঘর। বিছানা পাতা রয়েছে, খাটের পাশে আমার সুটকেস। প্রিয়নাথ বললেন, 'পাশেই বাথরুম, স্নান করে নিন। সাড়ে আটটার সময় খাবার দেবে।'

গরম জলে স্নান করে শরীর সুস্থ হল, কিন্তু মন থেকে কিষ্টোলালের রহস্যময় জীবন-প্রশ্ন দূর হল না। প্রিয়নাথবাবু যে বলেছিলেন, বাড়িতে বাঘ আছে, তা কি আলপনাকে লক্ষ্য করে? আলপনা দেখতে এত সুন্দর, তবে কি তার স্বভাবে কিছু দোষ আছে?

সাড়ে আটটার সময় প্রিয়নাথবাবু এবং আমি টেবিলে খেতে বসলাম। আলপনা আমাদের সঙ্গে বসল না, নিঃশব্দে নানারকম অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করল।

খাওয়া শেষ হলে আমরা ড্রয়িংরুমে গিয়ে বসলাম। প্রিয়নাথ বললেন, 'আলপনা, তুমি খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়। আর, প্যারেলালকে পাঠিয়ে দাও।'

আলপনা চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে প্যারেলাল নামক ভৃত্য এসে বোতল আর গ্লাস রেখে গেল।

প্রিয়বাবু আমার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিপাত করলেন; আমি মাথা নাড়লাম। তিনি তখন নিজের জন্যে সোডা মিশিয়ে এক গ্লাস তৈরি করলেন। আমি সিগারেট ধরালাম।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। প্রিয়বাবু মাঝে মাঝে গ্লাস তুলে চুমুক দিলেন। শেষে আমি বললাম, 'কেষ্টকে আমার খুব ভাল লেগেছে। কিন্তু ওর ব্যাপার কিছু বুঝলাম না।'

প্রিয়বাবু বললেন, 'আমি ওর বাপ, আমিই বুঝিনি তা আপনি বুঝবেন কোত্থেকে।'

অতঃপর গেলাসে চুমুক দিতে দিতে প্রিয়বাবু তাঁর ছেলের জীবনচরিত আমাকে শোনালেন।—

কেষ্টর মা মারা যান যখন তার বয়স দশ বছর। বাড়িতে আর কেউ নেই, কেবল ঝি চাকর। আমি সারাদিন কোর্টে কাজ করি, সকাল বিকেল মক্কেল নিয়ে বসি। কেষ্ট ঝি-চাকরের কাছেই মানুষ হতে লাগল।

কেষ্ট তখন স্কুলে ভর্তি হয়েছে, কিন্তু দু'দিন যেতে না যেতেই স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে ছোটলোকের ছেলেদের সঙ্গে লাট্টু ঘুরিয়ে পতং উড়িয়ে বেড়াতে লাগল। আমার কানে যখন কথাটা এল তখন আমি দু' একটা চড়-চাপড় মারলাম, কিন্তু তাতে কোনোই ফল হল না। আমি কোন দিক দেখব, ভাবলাম দূর ছাই, যা ইচ্ছে করুক, বয়স বাড়লে বুদ্ধি পাকলে সব ঠিক হয়ে যাবে। হাজার হোক, ভদ্রবংশের ছেলে। রোজগার তো আর করতে হবে না, আমি যা রেখে যাব তাই যথেষ্ট। লেখাপড়া নাই শিখল। লেখাপড়া শিখেও তো কত ছেলে হনুমান হয়।

ওর যখন সতরো-আঠারো বছর বয়স তখন ও আমার কাছে তিনশো টাকা চাইল। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে টাকা দিলাম। ও মাঝে মাঝে আমার কাছে দু'দশ টাকা চাইত, আমি টাকা দিতাম। জানতাম টাকা না দিলে চুরি করতে শিখবে।

তিনশো টাকা পেয়ে কেষ্ট একটা টাঙা আর একটা ঘোড়া কিনে এনে আস্তাবলে রাখল। আমি একটু বকাবকি করলাম। আমার একটা বগী গাড়ি একটা ফিটন্ এবং দুটো ঘোড়া রয়েছে, আবার টাঙা কেন। কিন্তু কে কার কথা শোনে।

কেষ্ট টাঙা হাঁকিয়ে শহরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। শহরের যত টাঙাওয়ালা সবাই তার বন্ধু। সে মাঝে মাঝে বন্ধুদের বাড়িতে নিয়ে আসত, অনেক রাত পর্যন্ত আস্তাবলে খানা-পিনা হৈ হুল্লোড় করত। আবার কেষ্ট মাঝে মাঝে বাড়ি আসত না, বন্ধুদের আড্ডায় হৈ হুল্লোড় করত।

এইভাবে বছর পাঁচেক কেটে গেল। কেষ্ট বাংলায় কথা বলা প্রায় ভুলে গেল, উর্দুতেই কথা বলে; তার পোশাক পরিচ্ছদও টাঙাওয়ালা গাড়োয়ানের মত; মাথায় টুপি পরে, চোখে সুর্মা লাগায়। আমার বন্ধুরা ক্রমাগত আমাকে খোঁচাচ্ছেন—ছেলেটা নষ্ট হয়ে গেল, ছোটলোক হয়ে গেল, তুমি দেখছ না। আরে আমি কি করব! যার যেমন ধাত, গাধা পিটিয়ে কি ঘোড়া করা যায়। তবে একটা কথা বলব, ছোটলোকদের সঙ্গে মিশলেও ওর মনটা ছোট হয়ে যায়নি। উঁচু ঘরে জন্মেছিল, মেজাজটা উঁচুই আছে। সহবতটা শুধু মন্দ।

এক বন্ধু উপদেশ দিলেন, ছেলের বিয়ে দাও, তাহলে ঘরে মন বসবে। ভাবলাম, মন্দ কথা নয়। অনেক খুঁজে একটি লক্ষ্মীপ্রতিমার মত মেয়ে যোগাড় করলাম। কেষ্ট প্রথমটা তানানানা করেছিল, তারপর রাজী হয়ে গেল। বিয়ে হয়ে গেল। আলপনাকে আপনি দেখেছেন, রূপেগুণে অমন মেয়ে পৃথিবীতে নেই।

কেষ্ট বিয়ের পর সাত দিন বাড়িতে ছিল, তারপর দুপুর রাত্রে টাঙা নিয়ে নিরুদ্দেশ। সেই যে পালাল, ছ'মাস আর বাড়ি-মুখো হল না।

আমার শাস্তিটা একবার বুঝে দেখুন। একটা মেয়ের সর্বনাশ করলাম। ছেলেটা আগে তবু বাড়িতে থাকত, এখন ন'মাসে ছ'মাসে একবার আসে; হঠাৎ এসে হঠাৎ চলে যায়, আলপনার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করে না।

প্রিয়বাবু গেলাস শেষ করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন,—'এইভাবে তিন বছর চলছে।

জানি না কোনোদিন কেষ্টর মতিগতি ফিরবে কিনা। কেন বৌকে ফেলে চলে গেল তাও কিছু বলে না। আমার কাছে টাকা চায় না, টাঙা ভাড়া খাটিয়ে খায়। আমি আর কি করতে পারি। আলপনাকে কলেজে ভর্তি করে দিয়েছি, সে এখন বি. এ. পড়ছে।'—

মনটা খারাপ হয়ে গেল। সে-রাত্রে কিষ্টোলালের বিচিত্র দুর্মতির কথা ভাবতে ভাবতে অনেকক্ষণ জেগে রইলাম।

পরদিন ব্রেকফাস্ট শেষ করে উঠেছি, কিষ্টোলাল টাঙা নিয়ে এসে হাজির। প্রিয়বাবু তখন বৈঠকখানায় মক্কেল নিয়ে বসেছেন। কিষ্টোলাল তাড়াতাড়ি আমাকে টাঙায় তুলে টাঙা হাঁকিয়ে দিল। পাছে বৌ-এর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তাই বোধহয় বেশীক্ষণ রইল না।

আমি বললাম, 'এত তাড়া কিসের? আর কী দেখবার আছে?'

কিষ্টো বলল, 'আভি বহুৎ চিজ্ দেখার আছে। জুম্মা মসজিদ, নিজামুদ্দিন আউলিয়া, হুমায়ুঁ বাদশার কবর, সফদরজঙ্গ, যন্তর-মন্তর। ঔর দো দিন লাগবে।'

কিছু দূর যাবার পর আমি বললাম, 'কিষ্টোলাল, তোমার ঘরে এমন বৌ, তুমি ঘরে থাক না কেন?'

কিষ্টোলাল চকিত চোখে আমার দিকে তাকাল, তার মুখে একটা দুষ্টুমির ভাব খেলে গেল। সে বলল, 'আলপনাকে দেখেছেন!! খুবসুরৎ ছোক্‌রি আছে।'

যেন নিজের বৌ নয়, অন্য কার কথা বলছে। বললাম, 'অমন খুবসুরৎ মেয়ে খুব কম দেখা যায়। তুমি ওর কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াও কেন?'

কিষ্টোলাল কিছুক্ষণ মিটিমিটি হাসল, তারপর বলল, 'খুবসুরৎ তো আছে, লিখা-পঢ়া ভি বহুৎ জানে। লেকেন—দিল বৈঠতা নেই।'

'তার মানে! ওর স্বভাব কি ভাল নয়?'

'স্বভাব ভি বহুৎ আচ্ছা, লেকেন—' কিষ্টোলাল মনের কথাটা ভাষায় প্রকাশ করতে পারল না।

আর কিছু বলা চলে না। বলবার কী বা আছে। ও যদি নিজের বৌকে পছন্দ না করে আমি মাথা গলাতে যাই কেন?

খানিক পরে কিষ্টোলাল নিজেই অন্য কথা পাড়ল। সাঁই সাঁই করে চাবুক ঘুরিয়ে ঘোড়াকে গালমন্দ দিয়ে বলল, 'আপনার রামবিলাসের খোঁজে লোক লাগিয়েছি, এখনো পাত্তা পাওয়া যায়নি।'

আমি বললাম, 'তার পাত্তা কি সহজে পাওয়া যাবে। সে গা ঢাকা দিয়ে আছে।'

'মিলেগা মিলেগা' বলে কিষ্টোলাল গান ধরল—

'নজর বাঁচাকে হম্‌সে প্যারে
ছুপ্ কিঁউ যাতে হো—'

শহরের পুরাকৃতি দেখতে খুবই ভাল লাগে, কিন্তু অসুবিধা এই যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে অনেক সময় নষ্ট হয়। সেদিন দুটো জায়গা দেখতেই বেলা একটা বেজে গেল। বললাম, 'কিষ্টোলাল, বেজায় ক্ষিদে পেয়ে গেছে। চল, কোথাও গিয়ে খাওয়া যাক।'

কিষ্টোলাল হেসে বলল, 'খোদাবন্দ্, খানা তৈয়ার।'

এবার কিষ্টোলাল আমাকে যেখানে নিয়ে এল সেটা শহর বাজার নয়, একটা এঁদোপড়া বস্তি। গলির মধ্যে ছোট ছোট একতলা বাড়ি, বেশীর ভাগই খাপরার ছাউনি, দু'

একটা পাকা বাড়ি আছে।

কিষ্টোলাল একটি ছোট্ট চুনকাম-করা কুটিরের সামনে টাঙা দাঁড় করালো। কুটিরের দোর বন্ধ ছিল, টাঙা থামতেই একটুখানি ফাঁক হল; ফাঁকের মধ্যে দিয়ে একটি মেয়ের হাসি-মুখ দেখতে পেলাম।

কিষ্টোলাল টাঙা থেকে লাফিয়ে নেমে বলল, 'জান্‌কি, আয়, ঘোড়াটাকে দানাপানি দে।'

আমিও নেমে পড়লাম। মেয়েটি এসে ঘোড়ার রাশ ধরে নিয়ে গেল।

কিষ্টোলাল দোরের সামনে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করল,—'আসুন আমার গরীব-খানায়।'

আমাকে মাথা নীচু করে ঘরে ঢুকতে হল, নইলে চৌকাঠে মাথা ঠুকে যাবে। পাশাপাশি ছোট দুটি ঘর, সামনের ঘরের মেঝেয় শতরঞ্জির ওপর জাজিম পাতা, পাশের ঘরটি রান্নাঘর। আসবাবপত্র খাট পালঙ্ক কিছু নেই, কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

জাজিমের ওপর বসে বললাম, 'এটা তোমার বাসা। এখানেই খাবার ব্যবস্থা?'

কিষ্টোলাল আমার পাশে বসে বলল, 'জি।'

'মেয়েটি কে?'

কিষ্টোলাল গলার মধ্যে গিল্‌গিল্‌ করে হাসল, আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'জান্‌কী, আমার দিল্‌কি পিয়ারী।'

গুম হয়ে গেলাম। যা সন্দেহ করেছিলাম, তা মিথ্যে নয়।

কিছুক্ষণ পরে জান্‌কী ফিরে এল। কিষ্টোলাল বলল, 'জান্‌কি, ইনি আমার দোস্ত্‌, আমার জাত-ভাই, অনেক দূর মুলুক থেকে এসেছেন। যাও, জলদি খাবার নিয়ে এস। এঁর ভারি ভুখ্‌ লেগেছে।'

'অভি লাঈ।' জান্‌কীর মুখে এক ঝলক হাসি খেলে গেল, সে রান্নাঘরে ঢুকল।

জান্‌কী নিম্নশ্রেণীর মেয়ে, বয়স উনিশ-কুড়ি। কৃশাঙ্গী, লম্বা ধরনের গড়ন, রঙ ময়লা। রূপে সে আলপনার বাঁ পায়ের কড়ে আঙুলের কাছেও লাগে না। কিন্তু তবু সুশ্রী বলতে হবে। হাসিটি স্বতঃস্ফূর্ত, চঞ্চল চোখ দুটিও হাসি ভরা। গলার স্বরে তীক্ষ্নতা নেই। মনে হয় স্বভাবটি প্রসন্ন এবং জটিলতাবর্জিত।

অচিরাৎ খাবার এসে পড়ল। পদ বেশী নয়, এক জামবাটি মাংস, ফুল্‌কা রুটি আর চুকন্দরের আচার। জাজিমের ওপর জামবাটি টেনে নিয়ে বসে গেলাম।

মাংস মুখে দিয়ে একেবারে বিমোহিত হয়ে গেলাম। কালিয়া কোর্মার মত স্বাদ নয়, এ স্বাদ একেবারে অন্যরকম। আরো বলিষ্ঠ, আরো উপাদেয়। ঝাল একটু বেশী, কিন্তু পেঁয়াজের নামগন্ধ নেই।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কে মাংস রেঁধেছে?'

কিষ্টোলাল বলল, 'জান্‌কী রেঁধেছে, আর কে রাঁধবে? ভাল হয়নি?

বললাম, 'অপূর্ব হয়েছে। মাংসের এমন রান্না আগে কখনও খাইনি। কী দিয়ে রেঁধেছে?'

কিষ্টোলাল হো হো করে হেসে উঠল, 'স্রেফ্‌ আদা রসুন আর গরমমশলা, রসুন বেশী লাগে। এর নাম—মদের চাট্‌।'

মদের চাট্‌! আগে কখনও খাইনি। যদি জানতাম মদের সঙ্গে এমন চাট্‌ পাওয়া যায়—

আকণ্ঠ রুটি-মাংস খেয়ে জাজিমের ওপরেই লম্বা হলাম। পান চিবোতে চিবোতে ভাবতে লাগলাম, শুভক্ষণে কিষ্টোলালের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। এখানে এসে বিনা খরচে আছি, বিনা খরচে রাজভোগ খাচ্ছি। কিষ্টোলালের প্রবৃত্তি যত নিম্নগামীই

হোক, তার মেজাজটা ভারি উঁচু আর দরাজ। গ্রহনক্ষত্রের কীরকম যোগাযোগ ঘটলে এরকম মানুষ জন্মায়?

সঙ্গে সঙ্গে আলপনার কথাও মনে পড়ল। অতি বড় সুন্দরী না পায় বর। আলপনা স্বামীকে পেয়েও পেল না। অথচ না পাওয়ার কোন ন্যায্য কারণ নেই। বিচিত্র সংসার!

একবার কৌতূহল হল কিষ্টোলালকে জিজ্ঞেস করি জান্‌কীকে সে বিয়ে করেছে কিনা। কিন্তু প্রশ্ন করতে গিয়ে থেমে গেলাম। থাক, কাজ নেই। কিষ্টোলাল হাঁ-না যেমন উত্তরই দিক, আমার মন খারাপ হয়ে যাবে।

বেলা তিনটে নাগাদ উঠে পড়লাম। দিল্লীর পুরাকৃতি অপেক্ষা করে আছে, তাকে নিরাশ করা চলবে না।

সেদিন প্রত্ন-দর্শন শেষ করে প্রিয়নাথবাবুর বাড়িতে ফিরতে একটু দেরি হয়ে গেল। দেখলাম প্রিয়নাথবাবু ড্রয়িংরুমে পুত্রবধূর সঙ্গে দাবা খেলছেন।

কিষ্টোলাল আমাকে নামিয়ে দিয়ে ভাড়া নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল, বলে গেল কাল সকালে আবার আসবে। যা কিছু দ্রষ্টব্য বাকি আছে কালকের মধ্যে শেষ করা যাবে।

প্রিয়নাথবাবু আমাকে ডেকে নিলেন যেন আমি বাড়ির একজন হয়ে গেছি। আলপনা চা এনে দিল। আজ সে আমাদের কাছেই বসে রইল, উঠে গেল না। চা খেতে খেতে অলসভাবে গল্প হতে লাগল; কোথায় কী দেখলাম এই সব। কিষ্টোলালের কথা এড়িয়ে গেলাম। যতবার আমার চোখ আলপনার ওপর পড়ল ততবার আমার জান্‌কীর কথা মনে পড়ল। আলপনার তুলনা নেই; ধীর শান্ত মিতভাষিণী। কিন্তু সে জান্‌কীর মত মদের চাট্‌ রাঁধতে পারে কি?

তারপর স্নান করে যথারীতি ডিনার খেয়ে শুয়ে পড়লাম। আলপনার সঙ্গে জান্‌কীর তুলনাটা কিন্তু মনের মধ্যে চলতেই লাগল। রাজহংসী আর গৃহকপোতী— ইলিশ মাছ আর মৌরলা মাছ—মুর্গির রোস্ট আর মদের চাট্‌—

পরদিন সকালে টাঙায় চড়ে বেরিয়েছি, কিষ্টোলাল বলল, 'আপনার রামবিলাসের পাত্তা পেয়েছি। কঞ্জর—কটা চোখ—না?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ছবিটা তোমাকে দেখানো হয়নি; বেরালের মত কটা চোখ। কোথায় পেলে তাকে?'

'শহরতলির একটা মুসাফিরখানা আছে। সারাদিন এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়, রাত্রে জুয়ার আড্ডায় গিয়ে জুয়া খেলতে বসে।'

'জুয়া খেলতে বসে! বল কি?'

'হাঁ। লৌণ্ডা পাকা জুয়াড়ী আছে।'

'তবে উপায়! চল, এখনি তাকে ধরি গিয়ে।'

কিষ্টোলাল মাথা নেড়ে বলল, 'আভি ধরতে গেলে শিকার পালাবে। ওর পাকিট্‌মে এখনো টাকা আছে।'

'তাই নাকি? তাহলে—?'

কিষ্টোলাল কুটিল হেসে বলল, 'আপনি বে-ফিকির থাকুন। আজ রাতকো হাম্‌ভি জুয়া খেলেগা। জুয়া খেলা কাকে বলে বাচ্চুকে শিখিয়ে দেব।'

সেদিন দিল্লী দর্শন শেষ করে ফিরে এলাম। ওদিকে রামবিলাসের একটা হেস্তনেস্ত আজ রাত্রেই হয়ে যাবে। আমার দিল্লীর মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে।—

সেই ক'দিনের জন্যে একটি ভদ্র পরিবারের সংসর্গ আমার মনে এমন একটা দাগ কেটেছিল যা চল্লিশ বছরেও মুছে যায়নি। প্রিয়নাথবাবুর অতিথিবাৎসল্য এবং উদার সহৃদয়তা, আলপনার লাবণ্যপূর্ণ গাম্ভীর্য, কিষ্টোলাল ও জান্‌কীর বিচিত্র খাপছাড়া

জীবনযাত্রার কথা যখন মনে পড়ে তখনই ওদের সম্বন্ধে একটা দুর্নিবার কৌতূহল জেগে ওঠে। তারা এখন কোথায়? প্রিয়নাথবাবু নিশ্চয় বেঁচে নেই। কিন্তু কিষ্টোলাল আলপনা ও জান্কীর ত্রিকোণ-সমস্যার কি কোনও সমাধান হয়েছে? কিষ্টোলাল কি এখনও টাঙা হাঁকাচ্ছে?

বছর পাঁচেক আগে একবার দিল্লী গিয়েছিলাম। দিল্লী আর সে দিল্লী নেই; নতুন এবং পুরনো দিল্লী মিলে এক বিপুল ব্যাপার। তার জনসমুদ্রে কিষ্টোলালকে খোঁজার চেষ্টা করিনি।

কিন্তু যাক।—

পরদিন সকালে মালপত্র কিষ্টোলালের টাঙায় তুলে প্রিয়নাথবাবুর কাছে বিদায় নিলাম। তিনি বললেন, 'আবার যদি এদিকে আসো আমার কাছেই থাকবে।'

বললাম, 'আজ্ঞে, আর কোথাও থাকতে পারব না।'

হৃদয়ের পূর্ণতা সব সময় কথায় প্রকাশ করা যায় না, আমার হৃদয়ের পূর্ণতাও বোধহয় অপ্রকাশিত রয়ে গেল। তাছাড়া আলপনা ও জান্কীর মাঝখানে আমার মনটা এমন ফাঁপরে পড়ে গিয়েছিল যে কিষ্টোলালকে ধরে কেবল ঠ্যাঙাতে হচ্ছে করছিল। এরকম পরিস্থিতিতে কী করা উচিত তার কূলকিনারা পাচ্ছিলাম না। জান্কীকে ছেড়ে কিষ্টোলাল যদি আলপনার কাছে ফিরে আসে, তাহলেই কি ভাল হয়! যদি ফিরে না আসে আলপনার মত একটা মেয়ের জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে!

দুত্তোর! যার ভাগ্যে যা আছে তাই হবে, আমি কি করব। কিষ্টোলালের মনে কোনো ভাবনা নেই, সে নিজের পথ বেছে নিয়েছে, সেই পথে গাড়োয়ানী করে বেড়াক। আমার কিসের মাথাব্যথা।

টাঙায় উঠে গোঁজ হয়ে বসে রইলাম। কিষ্টোলাল টাঙা চালিয়ে দিল। কিছু দূর গিয়ে সে গুনগুন করে গান ধরল—

চলো ভাই মুসাফির য়ে জগ্ হ্যয় সরায়ে

জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?'

সে বলল, মুসাফিরখানায়, যেখানে আপনার রামবিলাস আছে। কাল রাত্রে তাকে ল্যাংটা বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছি!'

শহরতলির সরায়ে পৌঁছে দেখলাম রামবিলাস কাঁচুমাচু মুখে দোরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে, আর গোটা কয়েক ষণ্ডাগুণ্ডা গোছের লোক তাকে ঘিরে আছে। আমি টাঙা থেকে নামতেই সে আমাকে দেখতে পেল, ছুটে এসে আমার দুই হাঁটু জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল—'কাকাবাবু, আপনি এসেছেন আমাকে রক্ষে করুন। আমার সব টাকা ফুরিয়ে গেছে। সরাইওয়ালার পাওনা দিতে পারছি না। সে বলছে টাকা না দিলে আমাকে খুন করবে।'

আমি কিষ্টোলালের দিকে তাকালাম। সে টাঙা থেকে নেমে এসে চোখ টিপলো। বলল, 'কুছ পরোয়া নেই। আমি কাল জুয়াতে অনেক টাকা জিতেছি, আমি সরাই-ওয়ালার পাওনা চুকিয়ে দেব।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে লেন-দেন চুকিয়ে আমরা স্টেশনে গেলাম। ভাগ্যক্রমে ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই একটা পূর্বগামী ট্রেন আছে।

ট্রেন না ছাড়া পর্যন্ত কিষ্টোলাল প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে রইল। ট্রেন ছাড়ার দু'মিনিট আগে আমি তাকে আলিঙ্গন করে বললাম, 'তোমার দিল্কি পিয়ারিকে বোলো তার রান্না আমার খুব ভাল লেগেছে। আবার যদি কখনো আসি, মদের চাট্ খাওয়াতে হবে।'

কিষ্টোলাল এক গাল হেসে বলল, 'আচ্ছা।'

জন্মান্তর সৌহৃদানি

হলুদ গাঁয়ের রামকেষ্ট দাস রাস্তার ধারে নিজের বাড়ির দাওয়ায় বসে থেলো হুঁকোয় তামাক খাচ্ছিলেন। আজ হাটবার, হপ্তায় একদিন গাঁয়ের কিনারে হাট বসে; আজও বসেছিল। এখন অপরাহ্ণে হাট ভাঙতে আরম্ভ করেছে; ভিন গাঁয়ের লোকেরা নিজের গ্রামে ফিরবে।

বছর তিরিশ আগের কথা বলছি। দেশের তখনো এমন দৈন্যের দশা হয়নি। হলুদ গাঁয়ের লক্ষ্মীশ্রী ছিল, সম্প্রতি হাট বসানোর ফলে লক্ষ্মীশ্রী আরো বেড়েছিল। দূর দূর থেকে হাটুরেরা আসত, কেউ কিনতে আসত, কেউ বেচতে আসত। গাঁয়ের লোক আনন্দে ছিল।

কেবল রামকেষ্ট দাসের প্রাণে আনন্দ নেই। তিনি থেলো হুঁকোয় টান দিতে দিতে নিজের ভাগ্যের কথা ভাবছিলেন। তাঁর বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ, শরীর এখনো বেশ মজবুত; তাঁর কিছু জোতজমি আছে, লগ্নি কারবার আছে, পাকা বসতবাড়ি আছে। কিন্তু তবু যেন আস্তে আস্তে সব নিভে আসছে; সে দপদপা আর নেই। মা লক্ষ্মী যেন পা টিপে টিপে খিড়কি দরজা দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন। বাইরের ঠাট বজায় আছে, ভিতরে ফোঁপরা হয়ে গেছে। কবে থেকে এই ব্যাপার ঘটতে আরম্ভ করেছে? সেই যে-বছর গো-মড়কে তাঁর গাই বলদ সব মরে গেল। প্রায় বারো বছর।

হুঁকোটা শেষ হয়ে গিয়েছিল, রামকেষ্ট সেটা এক কোণে রাখতে যাবেন, এমন সময় তাঁর বৌ বাড়ির ভিতর থেকে এসে চায়ের পেয়ালা তাঁর সামনে রাখল, আর হুঁকোটা নিয়ে নিঃশব্দে বাড়ির মধ্যে চলে গেল। আড়-ঘোমটা দেওয়া বৌটি দেখতে মন্দ নয়, বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ। ললিতা তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের বৌ। রাশভারী প্রকৃতির মেয়ে, ভারি গুণের বৌ। এই এগারো বছর বিয়ে হয়েছে, এক দিনের তরেও কথা-কথান্তর হয়নি। তাঁর প্রথম পক্ষের বৌ লক্ষ্মী ছিল যেমন দজ্জাল খাণ্ডার, তেমনি কুচুটে কুটিল। একেবারে বিছুটি।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়াতে রামকেষ্ট চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে গিয়ে থেমে গেলেন। লক্ষ্মী মারা গিয়েছিল বারো বছর আগে, অর্থাৎ যে-বছর গো-মড়ক হয় সেই বছর। রামকেষ্ট লক্ষ্মীকে বাড়িতে রেখে বৃন্দাবনে তীর্থ করতে গিয়েছিলেন, ফিরে এসে দেখলেন লক্ষ্মী টাইফয়েডে মরমর। বাঁচল না। তারপর—সেই থেকে রামকেষ্টর অবস্থা খারাপ হতে আরম্ভ করেছে। লক্ষ্মী দুষ্টু-দজ্জাল ছিল বটে, কিন্তু বোধহয় পয়মন্ত ছিল।

'দাস মশাই—ও দাস মশাই।'

রামকেষ্ট শুনতে পেলেন না, তিনি নিজের মনের মধ্যে ডুবে গেছেন। লক্ষ্মী সত্যিই লক্ষ্মীমন্ত বৌ ছিল। মাত্র আট বছর সে তাঁর ঘর করেছিল; ছেলেপুলে হয়নি বটে, কিন্তু সংসার ফলে-ফুলে সোনাদানায় ভরে উঠেছিল। রামকেষ্টর কাছ থেকে লক্ষ্মী তিনশো ভরির সোনার গয়না আদায় করেছিল। গয়নাগুলো কোথায় গেল? লক্ষ্মীর মৃত্যুর পর সেগুলো বাড়িতে পাওয়া যায়নি।

'বলি ও কর্তা!'

রামকেষ্টর চমক ভাঙল, তিনি চোখ তুলে চাইলেন। দেখলেন রাস্তার ওপর একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর তাঁর দিকে চেয়ে ফিক ফিক করে হাসছে। মেয়েটার বয়স নয়-দশ

বছরের বেশী নয়; বোধহয় ভিন গাঁয়ের মেয়ে, হাটে এসেছে। নিজের গাঁয়ের মেয়ে হলে চিনতে পারতেন। রামকেষ্ট চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখলেন, বললেন—'কে রে তুই?'

মেয়েটা এগিয়ে এসে রাস্তার কিনারায় দাঁড়াল, যেন ভারি অবাক হয়েছে এমনিভাবে গালে হাত দিয়ে বলল—'ওমা চিনতে পারলে না! আরো ভাল করে দেখ দেখি।'

মেয়েটার ভারি পাকা-পাকা কথা। রামকেষ্ট আরো ভাল করে দেখলেন। মুখখানা একেবারে অচেনা, কিন্তু চোখের দুষ্টুমিভরা দৃষ্টি যেন চেনা-চেনা, আগে কোথায় দেখেছেন। তিনি সন্দিগ্ধভাবে বললেন—'তুই তো এ গাঁয়ের মেয়ে নয়। তোর নাম কি? কোন গাঁয়ের মেয়ে?'

মেয়েটা মুচকি হেসে বলল—'আমার নাম এখন রমা, আগে অন্য নাম ছিল। পীরপুর গাঁয়ে আমার বাড়ি।'

রামকেষ্ট বললেন—'পীরপুর! সে যে পাঁচ কোশ রাস্তা! এলি কি করে?'

রমা বলল—'আমার বাপ পীরপুরের মস্ত জোতদার। হলুদ গাঁয়ে হাট বসে শুনে বাপ বলল, চল দেখে আসি। আমরা গরুর গাড়িতে এসেছি।'

রামকেষ্ট দ্বিধাগ্রস্ত চোখে রমার পানে চেয়ে রইলেন, বললেন—'তোর বাপের নাম কি?'

'কেশব মণ্ডল।'

'চিনি না। পীরপুর গাঁয়েও অনেক দিন যাইনি। তুই আগে কখনো হলুদ গাঁয়ে এসেছিস?'

রমা মুখের একটা বিচিত্র ভঙ্গী করল, বলল—'এ জন্মে এই প্রথম। এসে দেখি, ওমা সব চেনা। তারপর এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে এই বাড়িটা চোখে পড়ল। সব মনে পড়ে গেল। কাছে এসে দেখি, তুমি ঠিক আগের মত দাওয়ায় বসে আছ। তোমার চেহারা একটুও বদলায়নি, যেমন ছিল তেমনি আছে।'

রামকেষ্ট বুকের মধ্যে একটা প্রবল অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলেন, তাঁর মনে হলো তিনি একটা ভয়াবহ রহস্যের সম্মুখীন হয়েছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি একটু স্খলিত স্বরে বললেন—'স্পষ্ট করে বল্ তুই কে, কোথায় তোকে দেখেছি!'

রমা একেবারে দাওয়ার গা ঘেঁষে দাঁড়াল, রামকেষ্টর মুখের কাছে মুখ এনে বলল—'স্পষ্ট করে না বললে বুঝতে পারবে না?—আগের জন্মে আমার নাম ছিল লক্ষ্মী। এবার চিনতে পেরেছ?'

রামকেষ্টর মাথাটা যেন ধাক্কা খেয়ে পেছিয়ে গেল, তিনি অবিশ্বাসভরা চোখ মেলে রমার পানে চেয়ে রইলেন। মেয়েটার চোখের চাউনি দুষ্টুমিতে ভরা; লক্ষ্মীর চাউনি ওই রকম ছিল, সর্বদাই যেন মনে মনে কু-মতলব আঁটছে। আর কথার বাঁধুনি! এতটুকু মেয়ের এমন পাকা কথা শুনলে অবাক হয়ে যেতে হয়। এ সবই লক্ষ্মীর মত, কিন্তু তাছাড়া আর কোনো মিল নেই। নিজেকে সামলে নিয়ে রামকেষ্ট বললেন—'তুই লক্ষ্মী! গাল টিপলে দুধ বেরোয়, আমার সঙ্গে রহস্য করতে এসেছিস? যা বেরো!'

রমা চোখ ছোট করে বলল—'বিশ্বাস হলো না? তাহলে হাঁড়ির খবর শুনবে?' রমা গলা খাটো করে দু-চারটি কথা বলল। দাম্পত্য জীবনের নিগূঢ় গুপ্তকথা, পৃথিবীতে কারুর জানার উপায় নেই। অথচ এই পুঁচকে মেয়েটা জানে! রামকেষ্ট যেন দিশেহারা হয়ে গেলেন—'অ্যাঁ—কি বললি! তুই জানলি কেমন করে! তুই তাহলে সত্যিই লক্ষ্মী! অবাক কাণ্ড! এ যে চোখে দেখেও বিশ্বাস হয় না!'

রমা মুচকি হেসে বলল—'আচ্ছা, আজ চললুম। আমার বাপ বোধহয় আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছে।'

সে পিছন ফিরে চলতে আরম্ভ করল। রামকেষ্টর মনটা আঁকুপাঁকু করে উঠল, তিনি গলা চড়িয়ে ডাকলেন—'ওরে ও—কি বলে—রমা না লক্ষ্মী! শুনে যা—একটা কথা শুনে যা—'

রমা বোধহয় জানতো রামকেষ্ট তাকে ফিরে ডাকবেন, সে এসে আবার দাওয়ার সামনে দাঁড়াল, দু'পাটি দাঁত বার করে বলল—'কি বলবে বলো। বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারব না।'

রামকেষ্ট একবার ঢোক গিলে মুখে খোশামুদে হাসি এনে বললেন—'তুই যদি সত্যিই লক্ষ্মী হোস, তাহলে তোর নিশ্চয় মনে আছে, তোকে বাড়িতে রেখে আমি বৃন্দাবনে তীর্থ করতে গিয়েছিলাম। দেড় মাস পরে ফিরে এসে দেখলাম তোর অসুখ। আর সোনার গয়নাগুলো একটাও তোর গায়ে নেই। কত জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু তুই মুখ টিপে রইলি, কিছুতেই বললি না গয়নাগুলো কোথায়। কেন লুকিয়ে রেখেছিলি বল দেখি।'

রমা চোখের কুটিল ভঙ্গী করে বলল—'যদি মরে যাই তাহলে আমার গয়না তুমি দ্বিতীয় পক্ষকে পরাবে, তাই লুকিয়ে রেখেছিলুম।'

রামকেষ্ট অপ্রস্তুত হয়ে বললেন—'তা—তা—তুই যখন মরেই গেলি—বুঝলি না—এখন তো আবার জন্মেছিস—এখন বল-না কোথায় লুকিয়েছিলি।'

'ইঃ! বলছি আর কি!'

'তা যদি না বলিস তাহলে বুঝব কি করে তুই সত্যিই লক্ষ্মী?'

রমা রামকেষ্টর মুখের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় বলল—'আমাকে যদি বিয়ে কর তবেই বলব, নইলে নয়।' সে এক ছুটে হাটের দিকে চলে গেল।

রামকেষ্ট হতভম্ব হয়ে বসে রইলেন।

দোরের কাছ থেকে গলা শোনা গেল—'ভেতরে এস।' ললিতার গলা। ললিতা বোধহয় দোরগোড়া থেকে রমাকে দেখেছে। রামকেষ্ট উঠে বাড়ির ভিতর গেলেন।

তিনি এদিক ওদিক চেয়ে বললেন—'কানু কোথায়?'

ললিতা বলল—'খেলতে গেছে, এখনি ফিরবে।'

কানু রামকেষ্টর একমাত্র সন্তান, অনেক বিলম্বে দ্বিতীয় পক্ষে এই একটি ছেলে হয়েছে। এখন তার বয়স আন্দাজ পাঁচ বছর।

ললিতা তারপর বলল—'ও মেয়েটা কে?'

রামকেষ্ট একটু ইতস্তত করলেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের এই স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর মনের সম্পর্ক এতই ঘনিষ্ঠ যে তার কাছে গোপন কিছুই নেই। তিনি ললিতাকে সব কথা বললেন।

শুনে ললিতা খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। সে পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, জন্মান্তরিত বৌ সম্বন্ধে তার মনে কোনো সংশয় জাগল না; যেন খুবই স্বাভাবিক পরিস্থিতি। সে কেবল প্রশ্ন করল—'তিনশো ভরি সোনার দাম কত?'

রামকেষ্ট বললেন—'তা আজকের বাজারে দশ হাজার টাকার কম হবে না। একটা জমিদারী কেনা যায়।'

আর এ বিষয়ে কথা হলো না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর কানু যখন ফিরল না, রামকেষ্ট বলেন—'খেলায় মত্ত হয়ে আছে, যাই ধরে নিয়ে আসি।'

বাইরে তখনো আবছায়া দিনের আলো আছে। রামকেষ্ট হাটের কাছে গিয়ে দেখলেন, হাট ভেঙে গেছে, গাঁয়ের কয়েকজন লোক এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। রামকেষ্ট তাদের কানুর কথা জিজ্ঞেস করলেন, তারা কেউ কিছু বলতে পারল না। একটি কিশোর বয়সের ছেলে বলল—'কানু? সে তো গরুর গাড়িতে চড়ে চলে গেছে।'

রামকেষ্টর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল—'সে কি! কোথায় গেছে?'

ছেলেটি বলল—'তা জানি না। একটা মেয়ে তাকে গরুর গাড়িতে তুলে নিয়ে চ'লে গেল।'

'মেয়ে! কত বড় মেয়ে?'

'ন-দশ বছরের হবে।'

রামকেষ্ট ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরে এলেন, ললিতাকে বললেন—'সর্বনাশ হয়েছে। লক্ষ্মী কানুকে গরুর গাড়িতে তুলে নিয়ে পালিয়েছে?'

ললিতা বিবর্ণ মুখে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে ভারি শক্ত মেয়ে তাই ভেঙে পড়ল না। রামকেষ্ট বললেন—'আমি এখনি পীরপুরে যাচ্ছি; ছেলে নিয়ে ফিরব।'

সুদাম গোয়ালার গরুর গাড়ি আছে, তাইতে চড়ে রামকেষ্ট বেরুলেন। পাড়াগেঁয়ে কাঁচা রাস্তায় অন্য কোনো যানবাহন চলে না। পীরপুরে পেঁছুতে আড়াই ঘণ্টা লাগল। পীরপুর গ্রাম তখন নিশুতি। ,

একজনের দোর ঠেঙিয়ে খবর পেলেন, রমা কেশব মোড়লের মেয়ে। কেশব মোড়লেব দোর ঠেঙিয়ে তাকে তোলা হলো। মোড়ল বলল—'কি ব্যাপার?'

রামকেষ্ট বললেন—'তোমার মেয়ে আমার পাঁচ বছরের ছেলেকে চুরি করে এনেছে। শিগগির ছেলে বের কর নইলে পুলিস ডাকব!'

মোড়ল বলল—'রমা হলুদ-গাঁ থেকে একটা ছেলেকে এনেছে বটে। আমি মানা করেছিলাম, কিন্তু শোনেনি। মেয়েটা ভারি ত্যাঁদড়, আমার কথা শোনে না। তুমি যদি পারো তোমার ছেলে নিয়ে যাও।'

এই সময় রমা এসে দাঁড়াল, দাঁত বার করে বলল—'কি দাস মশাই, ছেলের খোঁজে এসেছ?'

রামকেষ্ট তর্জন করে বললেন—'তুই আমার ছেলে চুরি করে এনেছিস!'

রমা ঠোঁট উল্টে বলল—'আমি কোন্ দুঃখে তোমার ছেলে চুরি করতে যাব! কানু নিজের ইচ্ছেয় আমার সঙ্গে এসেছে।'

'কোথায় সে?'

'কোথায় আবার! খেয়েদেয়ে আমার বিছানায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে। দেখবে তো এসো।'

একটি ঘরে তক্তপোশের ওপর দু'জনের বিছানা। কানু অকাতরে ঘুমোচ্ছে; বেশ বোঝা যায়, রমা তাকে কোলের কাছে নিয়ে তার পাশে শুয়েছিল।

রামকেষ্ট ঘুমন্ত ছেলেকে বুকে তুলে নিলেন, কোনো কথা না বলে বাইরের দিকে চললেন। রমা তাঁর পিছু পিছু সদব দোর পর্যন্ত এল, বলল—'নিয়ে যাচ্ছ যাও। কিন্তু আমি ওর বড়-মা, আবার আমি ওকে দেখতে যাব।'

রামকেষ্ট জবাব দিলেন না, ছেলে নিয়ে গরুর গাড়িতে উঠলেন। রাতদুপুরে ঘুমন্ত ছেলে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন।

পরদিন সকালে কানুর কিছু মনে নেই। ঘুম থেকে উঠে সে যখন মুড়ি-মুড়কি নারকেল-নাড়ু নিয়ে খেতে বসল, তখন রামকেষ্ট তাকে জেরা আরম্ভ করলেন। ললিতা বসে শুনতে লাগল।

'হ্যাঁরে, কাল সন্ধ্যেবেলা তুই কোথায় গিয়েছিলি?'

কানু একটু ভাবল, তারপর তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বলল—'বড়-মার সঙ্গে গিয়েছিলুম।' এদিক ওদিক চেয়ে বলল—'বড়-মা কোথায়?'

'বড়-মা কে? কোথায় পেলি তাকে?'

'ওই যে আমি হাটের কাছে খেলা করছিলুম, বড়-মা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছিল। জিজ্ঞেস করল, তোর বাপের নাম কি। আমি তোমার নাম বললুম। বড়-মা

তখন হেসে বলল, তুই আমার সঙ্গে গরুর গাড়ি চড়ে বেড়াতে যাবি? আমি বললুম, যাব। বড়-মা তখন আমাকে গাড়িতে চড়িয়ে বেড়াতে নিয়ে গেল।'

'ওকে বড়-মা বলছিস কেন? বোকা ছেলে! ও তো মোটে ন-দশ বছরের মেয়ে।'

'বড়-মা বলেছে ও আমার বড়-মা। বড়-মা খুব ভাল, আমাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কত ভাল ভাল খাবার খেতে দিয়েছিল। নিজের কাছে নিয়ে শুয়েছিল।'

'হুঁ।'

রামকেষ্ট ললিতার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলেন। দু'জনেরই মন আশঙ্কায় ভরে উঠল। লক্ষ্মী বাঁজা ছিল, হয়তো প্রাণে সন্তান আকাঙ্খা নিয়ে মরেছিল।

পরের হাটবারে রমা এল না, তারপরের হাটবারে এল। বিকেল আন্দাজ চারটের সময় রামকেষ্ট সবে মাত্র দাওয়ায় এসে বসেছেন, রমা হাটের দিক থেকে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল, বলল—'আমার ছেলে কোথায়?'

রামকেষ্ট চোখ পাকিয়ে বললেন—'তোর ছেলে! তুই পেটে ধরেছিস! বলতে লজ্জা করে না? তোর ছেলে!'

রমা বলল—'হ্যাঁ, আমার ছেলে। আমি বেঁচে থাকলে ও আমার পেটেই জন্মাতো।'

এ রকম যুক্তির জবাব নেই। রামকেষ্ট ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। রমা গলা চড়িয়ে ডাকল—'কানু! কানু!'

কানু তখনো খেলতে বেরোয়নি, বাড়িতেই ছিল, সে ছুটে এসে রমাকে জড়িয়ে ধরল—'বড়-মা—বড়-মা—!'

রমা রামকেষ্টর দিকে কুটিল হাসি হেসে কানুকে বলল—'চল, হাটে যাই। তোকে অনেক অনেক খেলনা কিনে দেব।'

কানু লাফাতে লাফাতে রমার সঙ্গে চলল। রামকেষ্ট কিছুক্ষণ জবুথবু হয়ে বসে রইলেন, তারপর ধড়মড়িয়ে উঠে তাদের পিছনে ছুটলেন—'ওরে, আমার ছেলেকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস—'

রমা উত্তর দেওয়া দরকার বোধ করল না।

তারপর হাটের সহস্র লোকের মাঝখানে রমা আর কানুর পিছন পিছন রামকেষ্ট ঘুরে বেড়ালেন। দশজনের সামনে চেঁচামেচি হাঙ্গামা বাধানো তাঁর স্বভাব নয়, কিন্তু এক পলকের তরেও তিনি কানুকে চোখের আড়াল করলেন না।

সূর্য পাটে বসতে যখন আর দেরি নেই, তখন রমা কানুকে হাটের বাইরের দিকে নিয়ে চলল। অনেকগুলো গরুর গাড়ি সেখানে দাঁড়িয়ে আছে, যারা দূর দূর থেকে এসেছে, তাদের গরুর গাড়ি। একটা গরুর গাড়ির পিছন দিকে কেশব মণ্ডল সওদা করা মাল তুলছে। রমা কানুকে সেই দিকে নিয়ে গেল।

রামকেষ্ট ছুটে এসে কানুর হাত ধরলেন। কেশব মণ্ডল ঘাড় ফিরিয়ে চাইল। রামকেষ্ট বললেন— দ্যাখো মোড়ল, তোমার মেয়ের নষ্টামিটা দ্যাখো, আজ আবার আমার ছেলেকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল!'

কেশব মণ্ডল মেয়েকে বকাবকি শুরু করল—'তোর কি কোনো দিন হুঁস-আক্কেল হবে না! শেষে আমার হাতে দড়ি দিবি?' রমা কিন্তু নির্বিকার, একদৃষ্টে রামকেষ্টর দিকে চেয়ে রইল। কেশব মণ্ডল তখন হাত জোড় করে রামকেষ্টকে বলল—'কর্তা, তুমি তোমার ছেলেকে নিয়ে যাও। আমার মেয়েটা হতচ্ছাড়া বজ্জাত; মা-মরা মেয়ে কোনো দিন শাসন পায়নি, তাই এমন ধিঙ্গি হয়েছে।'

রামকেষ্ট কানুর হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছিলেন, কানু কাঁদো কাঁদো সুরে বলল—'আমি বড়-মা'র সঙ্গে যাব।'

রামকেষ্ট ধমক দিয়ে বললেন—'না, তুমি বাড়ি যাবে।' যেতে যেতে তিনি শুনতে

পেলেন পেছন থেকে রমা বলছে—'আচ্ছা, কানুর খেলনা আমার কাছেই রইল। আবার আমি আসব।'

ললিতা বাড়ির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে দেখতে পেয়ে কানু চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল—'আমি বড়-মা'র কাছে যাব। বড়-মা আমাকে খেলনা কিনে দিয়েছিল, সেই খেলনা নিয়ে খেলব।'

ললিতা ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে বলল—'আমি তোমাকে অন্য খেলনা কিনে দেব।'

কানুর কান্না কিন্তু সহজে থামল না। সে-রাত্রে সে ফোঁপাতে ফোঁপাতে ঘুমিয়ে পড়ল।

স্বামী-স্ত্রী পরস্পর মুখের পানে আতঙ্কভরা চোখে চেয়ে রইলেন। শেষে রামকেষ্ট বললেন—'হতচ্ছাড়া নচ্ছার মেয়েমানুষ, মরেও শান্তি দেবে না। আমার ছেলেটাকে গুণ করেছে। আমি এখন কী করি?'

ললিতা বলল—'তুমি মাথা ঠাণ্ডা রাখো। এবার থেকে হাটবারে কানুকে বাড়ির বাইরে যেতে দেব না।'

কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না।

দু-তিনটে হাটবারে রমা এসে কানুকে ডাকাডাকি করল। কিন্তু বাড়ির সদর দোর বন্ধ, কেউ সাড়া দিল না। তারপর একদিন—সেটা হাটবার নয়—কানু বিকেলবেলা খেলতে বেরিয়ে আর ফিরে এল না।

বুঝতে বাকি রইল না কানু কোথায় গেছে।

রামকেষ্ট তখনি গরুর গাড়ি চড়ে বেরুলেন। এবার ললিতা তাঁর সঙ্গে।—

পীরপুরে পেঁছুলে রমা এসে দোর খুলে দিল। দু'জনকে দেখে দাঁত খিঁচিয়ে হাসল—'দু'জনেই এসেছ। ছেলেকে আটকে রাখতে পারলে?'

তারপর তিনজনে অনেক কথা কাটাকাটি হলো, অনেক চেঁচামেচি হলো। শেষে রামকেষ্ট বললেন—'কানুকে মামার বাড়ি পাঠিয়ে দেব। পঞ্চাশ কোশ দূরে ওর মামার বাড়ি। তখন কি করবি?'

রমার চোখের দৃষ্টি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল, সে দাঁতে দাঁত চেপে বলল—'কানুকে যদি না দেখতে পাই, আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব। আর ওকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।'

স্বামী-স্ত্রী আতঙ্কে শিউরে উঠলেন। ভয়-বিহ্বলভাবে কিছুক্ষণ জড়বৎ বসে থাকার পর রামকেষ্ট বলে উঠলেন—'ওরে সর্বনেশে মেয়েমানুষ, তুই কি চাস্ বল।'

রমা বলল—'আমি কানুর কাছে থাকব। ওকে যদি এখানে থাকতে না দাও, আমি ওর কাছে গিয়ে থাকব।'

'তার মানে আমার বাড়িতে গিয়ে থাকবি?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু লোকে বলবে কি? আজ তুই ছেলেমানুষ আছিস। চিরদিন তো ছেলেমানুষ থাকবি না।'

'আমাকে বিয়ে করে তোমার ঘরে নিয়ে যেতে হবে।'

প্রস্তাবটা রামকেষ্টর কাছে নতুন নয়, তবু তিনি প্রবল ধাক্কা খেলেন। সতীনকে চোখে দেখেও বিয়ে করতে চায়। এমন নাছোড়বান্দা মেয়েমানুষ দেখা যায় না। রামকেষ্ট অসহায়ভাবে ললিতার পানে চাইলেন, দু'জনে অনেকক্ষণ চোখে চোখে চেয়ে রইলেন। তারপর ললিতা রমার দিকে ফিরে বলল—'সোনার গয়না কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলে বার করতে পারবে?'

রমা বলল—'পারব। কিন্তু ও আমার গয়না, আমি কাউকে দেব না।'

ললিতা বিরসকণ্ঠে বলল—'তোমার গয়না কেউ চায় না। গয়না তুমিই নিও।

ছেলেও তোমার কাছে থাকবে। কিন্তু একটা কথা বলে রাখছি। স্বামীর দিকে হাত বাড়াবার বয়স তোমার এখনো হয়নি। স্বামীকে যদি বিরক্ত করো ভাল হবে না।'

রমা চোখ কুঁচকে চাইল—'যদি বিরক্ত করি কী করবে তুমি?'

ললিতার চোখ কামারশালার আগুনের মত গনগনিয়ে উঠল, সে বলল—'ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব।'

দু'জনের চোখ খানিকক্ষণ পরস্পর আবদ্ধ হয়ে রইল, যেন চোখে চোখে মরণান্তক লড়াই চলছে। তারপর রমার চোখ আস্তে আস্তে নীচু হয়ে পড়ল।

বিয়েটা নমো নমো করেই সারতে হলো। তারপর রামকেষ্ট দশ বছর বয়সের বৌ নিয়ে ঘরে ফিরে এলেন।

শ্বশুরবাড়ি এসেই রমা প্রথমে ছুটে গিয়ে কানুকে কোলে নিয়ে কয়েকটা চুমু খেল। তারপর কোমরে আঁচল জড়িয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। বলল—'ভাঙো উনুন। উনুনের নীচে আছে।'

রামকেষ্ট উনুন ভাঙলেন, তারপর শাবল দিয়ে উনুনের নীচে খুঁড়তে লাগলেন। কিছু দূর খোঁড়বার পর দেখা গেল একটা পাথরের পাটি পাতা রয়েছে। পাথরের পাটি সরানো হলো; তার নীচে একটি গর্ত, গর্তের মধ্যে পিতলের হাঁড়িতে তিনশো ভরি খাঁটি সোনার গয়না।

যদি বা আগে কিছু সন্দেহ ছিল, এখন আর সন্দেহ রইল না যে এ-জন্মের রমা আগের জন্মে লক্ষ্মীই ছিল।

তারপর দিন কাটছে। কানুকে নিয়ে রমা আলাদা শোয়, এ ছাড়া রামকেষ্টর পরিবারে আর কোনো পরিবর্তন হয়নি। তিনি তৃতীয় পক্ষে বালা স্ত্রী বিয়ে করেছেন, এই নিয়ে গ্রামের লোক একটু ঠাট্টা তামাশা করে, কিন্তু রামকেষ্ট তা গায়ে মাখেন না। আসল কথাটা কেউ জানতে পারে না।

রামকেষ্টর মন মাঝে মাঝে অশান্ত হয়ে ওঠে। রমা বড় হয়ে কি জানি কি কান্ড বাধাবে, সংসারের শান্তি চিরদিনের জন্যে নষ্ট হয়ে যাবে। ললিতা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে—'তুমি ভেবো না। আমি ওকে শাসনে রাখব।'

ক্রমে দুটি তত্ত্ব পরিস্ফুট হয়ে উঠতে লাগল। প্রথম, রামকেষ্টর ঘরে আবার লক্ষ্মীশ্রী ফিরে আসছে। লগ্নি কারবার জাঁকিয়ে উঠছে, মুদির দোকানেতেও আবার বেচাকেনা বেড়ে চলেছে। ক্ষেত-খামারের অবস্থাও উন্নতির পথে। যে গৃহলক্ষ্মী খিড়কির দোর দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি আবার অকারণেই ফিরে আসছেন।

দ্বিতীয়, রমার স্বভাবচরিত্র আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছে। ললিতা তার ওপর খর দৃষ্টি রেখেছে, রমা মনে মনে তাকে ভয় করতে আরম্ভ করেছে। হয়তো এই ভয়ের ফলেই তার স্বভাব ধীরে ধীরে নরম হয়ে আসছে।

শেক্সপীয়র Taming of the Shrew- তে মিছে কথা বলেননি। যতবড় খাণ্ডার স্বভাবের মেয়েই হোক, তার প্রাণে ভয় ঢুকিয়ে দিতে পারলে আখেরে ফল ভাল হয়।

পলাতক

সকালবেলার ডাকে একটা পোস্টকার্ড পেলাম। প্রেরকের ঠিকানা নেই, নাম দস্তখত নেই, কেবল কয়েকটি হোমিওপ্যাথি ওষুধের নাম। নক্স ভমিকা, সাল্‌ফার, পালসেটিলা ইত্যাদি গোটা বারো ওষুধ।

চিঠি কে লিখেছে আমি জানি; আমার বন্ধু কমলেশ। সে অজ্ঞাতবাস করছে, দু'তিন মাস অন্তর আমি তার কাছ থেকে এই ধরনের চিঠি পাই।

চিঠি পাওয়ার আধ ঘণ্টা পরে কমলেশের শালা সৌরীন এল। বছর বত্রিশ বয়স, লম্বা মোটা দশাসই চেহারা, ভাঁটার মতো চোখ; সর্বদা কোট-প্যাণ্ট পরে থাকে। আমার দিকে চোখ পাকিয়ে মোটা গলায় বলল, 'আপনি জানেন কমলেশ কোথায় লুকিয়ে আছে। ভালো চান তো বলুন, নইলে—'

প্রশ্ন করলাম, 'নইলে কী?'

সৌরীন তার শরীরটাকে মুষ্টিযোদ্ধার ভঙ্গিতে টান করে দু'হাত মুঠি করে বলল, 'দেখছেন চেহারাটা?'

সৌরীনের চেহারা ইতিপূর্বে আরো কয়েকবার দেখেছি, মাঝে মাঝে এসে আমাকে হুমকি দিয়ে যায়। একবার বোনকেও সঙ্গে এনেছিল। সেদিন ভালো করে চিনতে পেরেছিলাম কমলেশের বউ কেমন মেয়ে। প্রথমে আমার গা ঘেঁষে বসে মিষ্টি মিষ্টি খোশামোদের কথা বলেছিল, তারপর উগ্রমূর্তি ধারণ করেছিল। ভদ্রঘরের মেয়ের মুখে এমন দেশি বিলিতি খিস্তি-খেউড় আগে কখনো শুনিনি। কিন্তু কোনোই ফল হয়নি। তারপর থেকে সৌরীন একাই আসে।

সৌরীন বক্সারের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চোখ পাকিয়ে আছে দেখে আজ আমার মেজাজটা হঠাৎ বিগড়ে গেল। অনেক সহ্য করেছি, আর নয়। আমি উঠে বাঁ হাতে তার নেকটাই ধরে ডান হাতে তার গালে একটা চড় মারলাম। বললাম, 'তুমি আমার বাড়িতে ট্রেসপাস করেছ। ভালো চাও তো এখনি বেরোও, নইলে লাথি মেরে প্যাণ্টুলুন ফাটিয়ে দেব।'

সৌরীন হতবুদ্ধির মতো গালে হাত দিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর নেড়ি কুত্তার মতো ল্যাজ গুটিয়ে পালাল। সৌরীনের যত বিক্রম মুখে। কাগজের বাঘ।

কমলেশ আমার প্রাণের বন্ধু। তার বাবা বছর তিনেক আগে অনেক টাকাকড়ি এবং কলকাতায় একটি বসতবাড়ি রেখে মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু মরবার আগে তিনি একটি কুকার্য করেছিলেন, একমাত্র ছেলের সঙ্গে দেউলিয়া ব্যারিস্টার শৈলেন মজুমদারের মেয়ে মঞ্জরীর বিয়ে দিয়েছিলেন। শৈলেন ব্যারিস্টারের এক সময় খুব ভালো ক্রিমিনাল প্র্যাকটিস ছিল; কিন্তু তিনি নিজেও ছিলেন অমিতব্যয়ী এবং তাঁর স্ত্রী পুত্র কন্যাও তাঁর ধাত পেয়েছিল। ফলে তাঁর প্র্যাকটিস যখন হঠাৎ পড়ে গেল তখন তাঁর ভাঁড়ে মা ভবানী ছাড়া আর কিছুই নেই। তিনি কোনো মতে মেয়েকে পাত্রস্থ করে দায়মুক্ত হলেন এবং পুনর্মূষিকের মতো জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে লাগলেন।

মঞ্জরী এসে কমলেশের সংসারে পাটরানী হয়ে বসল। বাড়িতে কেবল কমলেশ আর তার বাবা। বিয়ের তিন মাস পরে বাবাও গেলেন। রয়ে গেল শুধু কমলেশ।

কমলেশ লাজুক এবং মুখচোরা স্বভাবের মানুষ। সুতরাং মঞ্জরীর পোয়া বারো। বিয়ের ছ' মাস যেতে না যেতে সে একাধারে বাড়ির কর্তা এবং গিন্নী হয়ে দাঁড়াল। নিজের ইচ্ছে মতো সিনেমা দেখতে যায়, বন্ধুদের নিয়ে থিয়েটার দেখে, নিজের বাপের বাড়ির

সকলকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ায়, কমলেশের অনুমতি নেওয়া দূরের কথা, তাকে জানায় পর্যন্ত না। এক মাসের সংসার খরচ এক হপ্তায় শেষ করে দিয়ে কমলেশকে বলে, অত কম টাকায় ভদ্রলোকের সংসার চলে না, আরো টাকা বের করো।

কমলেশ কোনো দিনই আমার কাছে কিছু লুকোয় না। বিয়ের পরেও আমি তার পারিবারিক জীবনের সব খবরই পেতাম। মঞ্জরী সুন্দরী না হলেও তার চটক আছে। কমলেশ প্রথম কিছু দিন মুগ্ধ হয়েছিল, তারপর নেশার ঘোর কেটে গেল। তখন আমার কাছে এসে কাঁদুনি গাইত আর বলত, খবরদার, তুই বিয়ে করিস নি। বিয়ে করেছিস কি মরেছিস।

আমার অবশ্য বিয়ে করার ইচ্ছে কোনো দিনই ছিল না এবং কোনো কালে হবেও না। কিন্তু কমলেশের অবস্থা দেখে যেমন রাগ হতো তেমনি দুঃখও হতো।

ক্রমে কমলেশের শালা সৌরীন তার বাড়িতে এসে আড্ডা গাড়ল। খায়-দায় ঘুমোয়, কমলেশের খরচে দামী সিগারেট টানে, বোনকে ক্রিকেট ম্যাচ টেনিস ম্যাচ দেখাতে নিয়ে যায়। কমলেশ একদিন তাকে বাজার থেকে কি জিনিস কিনে আনতে বলেছিল, সৌরীন এমন চোখ ঘোরাতে আরম্ভ করল যে, তারপর থেকে আর সে সৌরীনকে কোনো কথা বলেনি।

বছরখানেক পর জানা গেল কমলেশের শ্বশুর-শাশুড়ীও বাসা তুলে দিয়ে কমলেশের স্কন্ধে আরোহণের উদ্যোগ আয়োজন করছেন। তাঁদের আরো তিন-চারটি নাবালক পুত্র কন্যা আছে।

কমলেশ একদিন এসে বলল, 'আমি এবার পাগল হয়ে যাব। কি করি বল্ দেখি?'

বললাম, 'বৌকে ধরে বেদম ঠ্যাঙানি দে, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

সে নিশ্বাস ফেলে বলল, 'তা যদি পারতাম তাহলে কি আমার এ দুর্দশা হতো! তুই বুদ্ধি দিতে না পারিস আমি নিজেই একটা কিছু করব। আমি মরীয়া হয়ে উঠেছি।'

'আর কী করবি? ডিভোর্স?'

'না না, ডিভোর্সে অনেক হাঙ্গামা। অন্য কিছু।'

কমলেশ চলে গেল। তারপর মাস দেড়েক তার আর দেখা নেই। আমি কয়েকবার তার বাড়িতে ফোন করে তাকে পেলাম না। সৌরীনের মোটা গলা পেলাম।

'হ্যালো।'

'কমলেশের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'কমলেশ বাড়ি নেই।'

'কোথায় গেছে?'

'কে জানে কোথায় গেছে!'

'আপনি কে?'

'সৌরীন মজুমদার। আপনি কে?'

নাম বললাম। প্রশ্ন হলো, 'কি দরকার?'

'আপনার সঙ্গে কোনো দরকার নেই।' এই বলে আমি ফোন রেখে দিলাম। তারপর যতবার ফোন করেছি ওই একই প্রশ্নোত্তর।

দেড় মাস পরে একদিন সকালবেলা কমলেশ আমার বাড়িতে এল। হাতে একটি পুরুষ্টু ব্যাগ, ছিঁচকে চোরের মতো সতর্ক ভাবভঙ্গী। দেখেই সন্দেহ হয়। বললাম, 'কি রে, বৌকে খুন করেছিস নাকি?'

সে সন্তর্পণে ব্যাগটি কোলে নিয়ে আমার পাশে বসল। বলল, 'উহুঁ। তোর বাড়িতে আর কেউ আছে নাকি?'

বললাম, 'বৌও নেই শালাও নেই, আমার বাড়িতে আর কে থাকবে! চাকরটা বাজারে গেছে।'

কমলেশ তখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, 'আমার বাড়ি আর গাড়ি বিক্রি করে দিয়েছি।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'বলিস কী। বাড়ি গাড়ি বিক্রি করতে গেলি কেন?'

কমলেশ মুচকি হাসল, উত্তর দিল না। তারপর ব্যাগের ওপর আঙুলের টোকা দিয়ে বলল, 'এর মধ্যে কী আছে জানিস? টাকা। ব্যাঙ্কে যত টাকা ছিল সব তুলে নিয়েছি। তার ওপর বাড়ি আর মোটর বিক্রির টাকা। সব মিলিয়ে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টাকা এই ব্যাগের মধ্যে আছে!'

আমি হতবুদ্ধি হয়ে বললাম, 'কি সর্বনাশ, এত টাকা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস! কী মতলব তোর?'

সে বলল, 'দক্ষিণ কলকাতার একটা ব্যাঙ্কে ভলট্ আছে খবর নিয়েছি। সেখানে তোর নামে লকার ভাড়া নিয়ে টাকাগুলো রাখব।'

আমার মাথা ঘুরে গেল, 'তারপর?'

'তারপর আমি হাওয়া হব।'

'হাওয়া হবি!'

'হ্যাঁ, একেবারে নিরুদ্দেশ। পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস।'

মনটা খানিকক্ষণের জন্য অসাড় হয়ে রইল। স্ত্রী এবং শ্বশুর পরিবারের সম্পর্কে কমলেশের জীবন এতই দুর্বহ হয়েছে যে, সে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে বৈরাগী হয়ে যেতে চায়। শেষ পর্যন্ত বললাম, 'আমার নামে তোর যথাসর্বস্ব রাখতে চাস। তার দরকার কি? নিজের নামেই তো রাখতে পারিস?'

সে বলল, 'না রে, জানিস তো শ্বশুর ব্যারিস্টার। যদি খবর পায় আমি টাকা লকারে লুকিয়ে রেখেছি অমনি আইনের ফাঁদে ফেলে সব টাকা হজম করবে।'

'আর আমি যদি টাকা হজম করি?'

কমলেশ ব্যাগ হাতে উঠে দাঁড়াল, 'তুই যদি হজম করিস বুঝব আমার টাকার সদ্‌গতি হলো। নে ওঠ, এখনি ব্যাঙ্কে যেতে হবে।'

ট্যাক্সি চড়ে দক্ষিণ কলকাতার ব্যাঙ্কের দিকে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় গিয়ে অজ্ঞাতবাস করবি কিছু ঠিক করেছিস?'

'সব ঠিক করেছি। কিন্তু একথা কেবল তুই জানবি আর আমি জানব।' কমলেশ তার অজ্ঞাতবাসের আস্তানা কোথায়, আমাকে বলল।

চড় খেয়ে সৌরীন প্রস্থান করবার পর আমি বাজার করতে বেরুলাম। হোমিও দোকানে গিয়ে ওষুধ কিনলাম। আরো অনেক টুকিটাকি। কমলেশ যদিও কাপড়চোপড়ের কথা লেখেনি. তবু এক জোড়া ধুতি আর তিনটে গেঞ্জি কিনে নিলাম। নিজের সম্বন্ধে তার বড় গাফিলতি।

দিনটা নিঃসঙ্গ আলস্যে কাটল। সংসারে আমি একা; কেবল একটি তিনতলা বাড়ি আছে। নীচের তলায় আমি থাকি, উপরের দু'টো তলা ভাড়া দিয়েছি, সেই ভাড়া থেকে আমার জীবিকা নির্বাহ হয়।

রাত্রি এগারোটার সময় স্টেশনে গিয়ে একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন ধরলাম। সারারাত গাড়ি থামতে থামতে চলল। তারপর ভোরবেলা একটি ছোট্ট স্টেশনে নেমে পড়লাম।

রোদ উঠেছে, সোনালি কাঁচা রোদ। স্টেশনের বাইরে রেল কর্মচারীদের কোয়ার্টার

এবং কয়েকটি টিনের ঘর। মুদির দোকানের ঝাঁপ সবে মাত্র উঠছে। আমি ব্যাগ হাতে গিয়ে দাঁড়ালাম, মুদি হেসে বলল, 'আসুন কর্তা। চা তৈরি হচ্ছে। সাইকেল চাই তো?'

বললাম, 'সাইকেল চাই বৈ কি। সাইকেল চালু অবস্থায় আছে তো?'

'আজ্ঞে আছে। আসুন, ভেতরে এসে বসুন।'

মুদির দোকানে মুড়িমুড়কি সহযোগে চা খেলাম, তারপর সাইকেলের পিছনে ব্যাগ বেঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সাইকেলের ভাড়া দৈনিক চার আনা; কাল সকালে এসে মুদিকে সাইকেল ফেরত দেব।

মেটে রাস্তা দিয়ে সাইকেল চালিয়ে চলেছি। রাস্তায় লোকজন নেই, দু'পাশের দৃশ্য কখনো একটু শিলাকীর্ণ কখনো দূর্বাশ্যামল। মেটে রাস্তাটি দক্ষিণ দিকে বেঁকে গেছে, কোথাও সরু শান্ত একটি নদীর গা ঘেঁষে চলেছে। দূরে দূরে তালগাছ খেজুরগাছের গুচ্ছ।

প্রায় তিন মাইল সাইকেল চালাবার পর সামনে একটি গ্রাম নজরে এল। বাঁশ-ঝাড় ঘেরা আদিবাসীদের গ্রাম, আশেপাশে হাঁস মুরগী চরে বেড়াচ্ছে। আরো কাছে গিয়ে দেখলাম, গ্রামের কিনারায় পাকুড় গাছের তলায় একটি যুবতী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বোধহয় আমাকে দেখতে পেয়েই ছুটে গ্রামের মধ্যে চলে গেল।

পাকুড় তলায় সাইকেল থেকে নেমে আমি সজোরে কয়েকবার ঘণ্টি বাজালাম। গ্রাম থেকে নয়া পয়সার মতো এক পাল ছেলেমেয়ে পিলপিল করে বেরিয়ে এল, তাদের পিছনে কমলেশ।

কমলেশ হাসিমুখে বলল, 'এলি? আয় আয়। তুই আসছিস আমি আগেই খবর পেয়েছি।'

যে মেয়েটা পাকুড় তলায় দাঁড়িয়েছিল সেই নিশ্চয় ছুটে গিয়ে খবর দিয়েছিল। এবার লক্ষ্য করলাম কমলেশের বেশ ছিরি হয়েছে, গায়ে মাছি পিছলে পড়ে। তবু প্রশ্ন করলাম, 'আছিস কেমন?'

'খাসা আছি।' সে যেন আরো কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল।

কমলেশের কুটির গ্রামের অন্য প্রান্তে। আমরা মিছিল করে সেই দিকে চললাম। আগে আগে কমলেশ, তার পিছনে আমি, আমার পিছনে অর্ধনগ্ন ছেলেমেয়ের দল। গ্রামের মেয়ে-পুরুষ নিজের নিজের কুটির থেকে দাঁত বার করে আমাকে অভ্যর্থনা করল।

কমলেশের কুটির দেখা গেল। সামনের রোয়াকে এক সারি লোক বসে আছে। তারা ওষুধ নিতে এসেছে। কমলেশ গ্রামের অবৈতনিক ডাক্তার।

কুটিরে ফিরেই কমলেশ ডাক্তারি করতে বসে গেল। আমি ব্যাগের মধ্যে সের খানেক লবঞ্চুষ এনেছিলাম, তাই শিশুদের মধ্যে বিতরণ করলাম। তারা লবঞ্চুষ চুষতে চুষতে হর্ষকাকলি করতে করতে চলে গেল।

কমলেশও চটপট রুগীদের ওষুধ দিয়ে বিদেয় করল। তারপর আমরা রোয়াকের ওপর মুখোমুখি বসলাম। কমলেশ মুচকি হেসে প্রশ্ন করল, 'তারপর শত্রুপক্ষের খবর কি?'

বললাম, 'কাল শত্রুপক্ষের সেনাপতি এসেছিল, তার গালে একটা চড় মেরেছি।'

কমলেশ হো হো করে হেসে উঠল, 'সত্যি চড় মেরেছিস! আহা, আমি দেখতে পেলাম না।'

বললাম, 'যাকে বাড়ি বিক্রি করেছিলি সে এখন বাড়ি দখল করেছে, তোর শালা আর বৌ বাপের বাড়িতে ফিরে গেছে। তাদের আর সে জৌলুস নেই। থিয়েটার সিনেমা দেখা বন্ধ। পাগলের মতো তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

এই সময় কুটিরের ভিতর থেকে একটি ষোল-সতেরো বছরের শ্যামাঙ্গী মেয়ে এসে আমার সামনে এক বাটি গরম দুধ এবং কিছু ক্ষীরের মণ্ড রাখল। মনে হলো এই মেয়েটাই আমার প্রতীক্ষা করছিল। দেখলাম তার মুখে একটু চাপা হাসি খেলা করছে, সে আমার প্রতি সকৌতুক কটাক্ষপাত করে আবার ভিতরে চলে গেল।

আগে যতবার এসেছি, কমলেশকে নিজেই নিজের রান্নাবান্না করতে দেখেছি। এ মেয়েটাকে বোধহয় সম্প্রতি ঘরের কাজ করার জন্যে রেখেছে। জিজ্ঞেস্ করলাম, 'এ মেয়েটাকে কোথা থেকে জোগাড় করলি?'

কমলেশ অপ্রস্তুতভাবে কিছুক্ষণ ঘাড় হেঁট করে রইল, তারপর মুখ নীচু করেই অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'লখিয়া আমার বৌ।'

আঁতকে উঠলাম, 'অ্যাঁ! আবার বিয়ে করেছিস?'

কমলেশ বলল, 'কি করব ভাই। আমার উপায় ছিল না। গাঁয়ের মোড়লের আমাশা হয়েছিল, আমি ওষুধ দিয়ে সারিয়েছিলাম। সেরে উঠে মোড়ল বলল—তুমি মস্ত বড় ডাক্তার, গাঁয়ের অনেক উপকার করেছ, আমরা তোমার বিয়ে দেব, তুমি যদি একলা থাকো সেটা আমাদের ভারি লজ্জার কথা হবে।...আমি অনেক না না করলাম, কিন্তু ওরা শুনল না। লখিয়া হচ্ছে মোড়লের ভাগনী। একদিন লখিয়াকে এনে আমার সঙ্গে মালা বদল করিয়ে বিয়ে দিল। তারপর গাঁ-সুদ্ধ মেয়ে-মদ্দ মদ খেয়ে সারা রাত নাচল আর ঢোল মাদল বাজাল। এর পর আমি আর কি করতে পারি বল্।'

আমি একটু মুহ্যমান হয়ে পড়লাম। পৃথিবীতে ভালমানুষ হয়ে লাভ নেই; ভালমানুষ পেলে সবাই জুলুম করে, এমন কি আদিবাসী পর্যন্ত। কমলেশ একটা বৌ নিয়েই নাকানি চোবানি খাচ্ছে, এখন তার দুটো বৌ হলো। শেষ পর্যন্ত হয়তো এ গ্রাম ছেড়েও পালাতে হবে।

লখিয়া এসে দুধের বাটি আর রেকাব তুলে নিয়ে গেল, তারপর ফিরে এসে কমলেশের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে তার কানে কি বলল; কমলেশ ঘাড় নেড়ে সায় দিল। তখন লখিয়া ছুটে বাইরে চলে গেল।

কমলেশকে প্রশ্ন করলাম, 'কতদিন বিয়ে হয়েছে?'

সে বলল, 'মাস দুই হলো। গতবার তুই এসেছিলি। তার দশ-বারো দিন পরে।'

'দেখতে তো ভালই। স্বভাব-চরিত্র কেমন?'

কমলেশ একটু চুপ করে রইল, তারপর সহজ মোহমুক্ত স্বরে বলল, 'ভারি মিষ্টি স্বভাব। মঞ্জরীর মতো নয়। ও এসে অবধি আমাকে ঘরের কাজ আর কিছু করতে হয় না। শুধু ডাক্তারি করি।'

'হুঁ। এখন তোর কানে কানে কথা বলে কোথায় গেল?'

কমলেশ হাসল, 'গাঁয়ের একটা বুড়োর গেঁটে বাত হয়েছিল, নড়তে পারত না, তাকে সারিয়েছিলাম। সে খুশী হয়ে আমাকে একটা মোরগ দেবে বলেছিল। আজ তুই এসেছিস তাই লখিয়া মোরগ আনতে গেল। আজ ফাউল কারি হবে।'

দুপুরবেলা নদীতে স্নান করে এসে দুজনে ফাউল কারি খেলাম। লখিয়া যদিও ছেলেমানুষ কিন্তু রাঁধে ভাল। অন্তত কমলেশের চেয়ে ভাল রাঁধে।

তারপর ঘরের মেঝেয় মাদুর পেতে দুই বন্ধু পাশাপাশি শুলাম। সারা দিন গল্প হলো। বুঝলাম কমলেশ লখিয়াকে বিয়ে করে সুখশান্তির স্বাদ পেয়েছে। সে আর কোনো দিন সভ্য সমাজের কোলে ফিরে যেতে চাইবে না।

রাত্রিটাও দুই বন্ধু এক বিছানায় শুয়ে দুপুর রাত পর্যন্ত গল্প করে কাটালাম। লখিয়া বোধহয় মামার বাড়ি গিয়ে রাত কাটাল।

রাত্রে গল্প করতে করতে কমলেশ হঠাৎ বিছানায় উঠে বসল, 'হ্যাঁরে, তুই বিয়ে

করবি? ফ্লিয়া নামে একটা মেয়ে আছে, লখিয়ার সখী। ভারি ভাল মেয়ে, ঠিক লখিয়ার মতো স্বভাব। দেখতেও ভাল। বিয়ে করিস তো বল্ সম্বন্ধ করি।'

আমিও উঠে বসে বললাম, 'খবরদার। তুই দ্টো বিয়ে করেছিস, ইচ্ছে হয় আরো পাঁচটা বিয়ে কর। আমি ও-সবের মধ্যে নেই। সভ্য বৌ, জংলি বৌ কিছ্ই আমার চাই না। পৃথিবীতে একলা এসেছি একলা চলে যাব। অন্তত মেয়েমান্ষকে কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছিনে।'

কমলেশ বলল, 'তুই কাপ্রুষ। এখন ঘ্মিয়ে পড়, কাল আবার ভোরবেলায় উঠতে হবে।'

পরদিন ভোর হতে না হতে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। পৌনে সাতটার সময় ট্রেন আছে, বিকেলবেলা কলকাতায় পেঁছ্বে।

কমলেশ গ্রামের কিনারা পর্যন্ত আমার সঙ্গে এল। আমি যখন সাইকেলে চড়তে যাচ্ছি তখন সে বলল, 'দ্যাখ, এবার যখন আসবি এক জোড়া লাল পেড়ে শাড়ি আনিস। ওকে এখনো কিছ্ দিইনি। শৌখীন শাড়ি নয়, গড়গড়ে মোটা শাড়ি আনবি। নইলে গাঁয়ের অন্য মেয়েদের হিংসে হবে।'

'আচ্ছা'—বলে আমি বেরিয়ে পড়লাম।

যেতে যেতে নানান কথা মনে আসতে লাগল। শহরের সভ্য জীবন তো বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। শান্তি নেই, স্বচ্ছন্দতা নেই, আনন্দ নেই। কমলেশ বেশ আছে, জীবন যন্ত্রণার সমাধান করে নিয়েছে। আমিও যদি ওর সঙ্গে জ্টে যাই—

ভাই ভাই

বাপ মারা যাবার পর দ্'মাস কাটতে না কাটতেই দ্ই ভায়ে তুম্ল ঝগড়া বেধে গেল। বড় ভাই দ্র্গাদাসের বয়স উনত্রিশ, ছোট ভাই চণ্ডীদাস বছর তিনেকের ছোট। দ্'জনেই বিবাহিত, কিন্তু এখনো ছেলেপ্লে হয়নি।

দ্র্গাদাসের মেজাজ স্বভাবতই গরম, সে-ই ঝগড়া বাধালো। কিন্তু এক পক্ষের তর্জন-গর্জন শ্নতে শ্নতে অপর পক্ষও গরম হয়ে ওঠে। চণ্ডীদাসও চীৎকার শ্র্ করল। দ্ই বউ ভয়ে জড়সড় হয়ে রইল। একটা কথা বলতে হবে, ভায়ে ভায়ে ঝগড়ার জন্য বউদের কোনো দায়-দোষ ছিল না। দ্ই বউ-এর মধ্যে গভীর প্রীতি ছিল।

পাড়ার বয়স্থ ব্যক্তিরা এসে ঝগড়া থামালেন। কিন্তু বিরোধ মিটল না। বাপ অনেক বিষয়-সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন, শহরের মাতব্বরেরা বসে সম্পত্তি ভাগ করে দিলেন।

বড় ভাই দুর্গাদাস সাবেক বসতবাড়ি পেল, শহরের অন্য প্রান্তে আর একটা বাড়ি ছিল, সেটা চণ্ডীদাসের ভাগে পড়ল। সে স্ত্রীকে নিয়ে অন্য বাড়িতে চলে গেল। যাবার আগে দুই বউ রেবা আর শান্তা পরস্পরের গলা জড়িয়ে খুব কাঁদল।

তারপর দীর্ঘকাল দুই ভায়ের মধ্যে আর মুখ দেখাদেখি নেই। কেউ কারুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না। কিন্তু ছোট শহরে মজা-দেখা বন্ধু অনেক থাকে, তারা গিয়ে দু'জনকে দু'জনের খবর শোনায়। চণ্ডীদাস চুপ করে শুনে যায়, দুর্গাদাস গলার মধ্যে গরগর করে।

'ওহে শুনেছ, চণ্ডীদাস নতুন মোটর কিনেছে।'

দুর্গাদাস বলে—'কিনেছে তো কিনেছে, আমার তাতে কি!'

'তোমারও কেনা উচিত। ও কিনেছে ফিয়েট; তুমি বড়, তোমার উচিত মিনার্ভা কেনা।'

দুর্গাদাস গর্জন করে বলে—'ওর দেখাদেখি আমি মোটর কিনব! কিনব না।'

বছর দেড়-বছর কেটে যায়। বন্ধু এসে বলে—'ওহে শুনেছ, চণ্ডীদাসের ছেলে হয়েছে।'

দুর্গাদাসের ওইখানেই সব চেয়ে বেশী ব্যথা। তার প্রায় সাত-আট বছর বিয়ে হয়েছে, কিন্তু সন্তান-সন্ততি হয়নি। ডাক্তারেরা সন্দেহ করেন দুর্গাদাসের স্ত্রী রেবা সম্ভবত বাঁজা। তার সন্তান-সম্ভাবনা কম।

বন্ধুর মুখে খবর শুনে দুর্গাদাস রাগে একেবারে ফেটে পড়ে—'তুমি কে হে? তোমার এত মাথাব্যথা কিসের! চণ্ডীদাসের দশটা ছেলে হোক, পঞ্চাশটা ছেলে হোক, তোমার কি! যাও, বেরোও আমার বাড়ি থেকে। আর কোনো দিন এ-বাড়িতে মাথা গলিয়েছ মাথা ফাটিয়ে দেব।'

তারপর একটি একটি করে বছর কাটতে থাকে। দুর্গাদাসের বয়স তিরিশের কোঠা পেরিয়ে চল্লিশের রাস্তা ধরেছে। ডাক্তারদের অনুমানই সত্যি, দুর্গাদাসের স্ত্রী রেবা বন্ধ্যা। শূন্য বাড়িতে স্বামী-স্ত্রী প্রেতের মত বাস করে। বন্ধু-বান্ধব যারা আগে আসা-যাওয়া করত, দুর্গাদাসের অসংযত মেজাজের জন্য তারাও সম্পর্ক ত্যাগ করেছে। যার পয়সা আছে তাকে কাজ করতে হয় না, কাজের সূত্রে কারুর সংস্পর্শে আসার সুযোগ নেই। মধ্যবয়সে উপস্থিত হয়ে দুর্গাদাস দেখল সংসারে সে একা, সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ।

এই অনাহত নিঃসঙ্গতার মধ্যে কেবল একটি জিনিস তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, বন্ধ্যা স্ত্রী রেবার প্রতি তার অন্ধ ভালবাসা। স্বামী-স্ত্রী যেন মরীয়া হয়ে পরস্পরকে আঁকড়ে ছিল।

একদিন গ্রীষ্মের রাত্রি শেষ হয়েছে কি না হয়েছে, দুর্গাদাস ধড়মড়িয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়ল। রেবা ঘুম-ভাঙা চোখে উৎকণ্ঠা ফুটিয়ে বলল—'কি হলো?'

দুর্গাদাস বলল—'হয়নি কিছু। অনেকক্ষণ জেগে শুয়ে আছি। আর পারছি না, যাই একটু বেড়িয়ে আসি।'

ইতিপূর্বে দুর্গাদাস কখনো প্রাতঃভ্রমণে বেরোয়নি। বেলা পর্যন্ত বিছানায় পড়ে থাকা তার অভ্যাস। রেবা চা তৈরি করে তাকে ডাকে, তখন সে ওঠে।

রেবা ঘাড় উঁচু করে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল—'আচ্ছা। তাড়াতাড়ি এসো কিন্তু, আমি সাড়ে ছ'টার সময় চা তৈরি করব।'

'আচ্ছা।'

দুর্গাদাস যখন রাস্তায় বেরুল, তখন রাত্রির ঘোর সবেমাত্র কেটেছে, রাস্তায় লোকজন নেই। সে এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে শেষে নদীর ধারে উপস্থিত হলো। শহরের

পাশ দিয়ে একটি ছোট নদী গিয়েছে, তারই একটা পুরনো ভাঙা ঘাট। বহুকাল থেকে ঘাটটি ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে, কেউ ব্যবহার করে না। দুর্গাদাস ঘাটের প্রথম পৈঠায় গিয়ে দাঁড়াল। তখন বেশ আলো ফুটেছে, কিন্তু সূর্যোদয় হয়নি।

এদিক ওদিক চাইতে তার চোখে পড়ল, ঘাটের এক পাশে কয়েক ধাপ নীচে একটি ছেলে পিছনে ঠেস দিয়ে বসে এক মনে বই পড়ছে। ছেলেটির বয়স আন্দাজ বারো বছর; পাতলা চেহারা, তরতরে মুখ। সে একবার দুর্গাদাসের দিকে মুখ তুলে আবার পড়ায় মন দিল।

দুর্গাদাসের সন্দেহ হলো ছেলেটি লুকিয়ে লুকিয়ে নভেল পড়ছে। আজকালকার ছোঁড়াদের তাই তো হয়েছে, লেখাপড়ায় মন নেই, ভোর হতে না হতে বাড়ি থেকে পালিয়ে নদীর ঘাটে বসে নভেল পড়ছে!

রাগী মানুষের রাগ চড়ে গেল। দুর্গাদাস ছেলেটির কাছে গিয়ে উগ্র সুরে বলল—'কি হে ছোকরা, সাতসকালে উঠে কী বই পড়ছ?'

ছেলেটি চমকে মুখ তুলল। আচমকা গলার আওয়াজ শুনে যেন ধাঁধা লেগে গেছে এমনিভাবে চেয়ে থেকে বলল—'আজ্ঞে,'—

দুর্গাদাস তিরস্কারপূর্ণ তর্জনী দেখিয়ে বলল—'ওটা কি বই?'

ছেলেটি ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থেকে বলল—'আজ্ঞে জিওমেট্রি।'

দুর্গাদাসের মনে বিস্ময়ের সঙ্গে অবিশ্বাস মিশল। সে হাত বাড়িয়ে বলল—'দেখি বইখানা।'

ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে বইখানা তার দিকে এগিয়ে ধরল। সত্যিই ইউক্লিডের জিওমেট্রি। দুর্গাদাস বই হাতে নিয়ে সিঁড়ির ধাপের ওপর বসল, বই-এর পাতা ওল্টাতে লাগল। ছেলেটি তার সামনে নীচের ধাপে দাঁড়িয়ে রইল।

অতঃপর দুর্গাদাস যখন কথা বলল, তখন তার গলা নরম হয়েছে। সে মুখ তুলে বলল—'তোমার বয়স কত?'

'বারো বছর।'

'কোন ক্লাসে পড়?'

'সেভেন্থ ক্লাসে।'

ছেলেটি সপ্রতিভ অথচ শান্ত। দুর্গাদাস বই ফেরত দিয়ে বলল—'তুমি এখানে এসে পড় কেন? বাড়িতে কি পড়ার জায়গা নেই!'

ছেলেটি বলল—'আজ্ঞে বাড়িতে পড়ার ঘর আছে। কিন্তু সকালবেলা এখানে এলে পড়ায় মন বসে। আমার বাড়ি বেশী দূর নয়।'

তার ভাবভঙ্গী, কথা বলার ধরন দুর্গাদাসের ভাল লাগল, তার মনটা প্রসন্ন হলো। সে বলল—'বেশ বেশ। আচ্ছা আমি যাই। তুমি পড়াশুনো কর।'

সে দু'ধাপ ওপরে উঠে ফিরে দাঁড়াল, প্রশ্ন করল—'তোমার নাম কি?'

ছেলেটি বলল—'দেবীদাস রায়।'

দুর্গাদাসের বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল। সে খানিকক্ষণ তীব্র চক্ষে ছেলেটির পানে চেয়ে রইল, তারপর গলার স্বর যথাসাধ্য সহজ করে বলল—'বাপের নাম?'

'শ্রীচণ্ডীদাস রায়।'

দুর্গাদাস আর দাঁড়াল না—

রেবা সাড়ে ছ'টার সময় চা তৈরি করে বসে ছিল, দুর্গাদাস ফিরল আটটার পর। ঘাট থেকে বেরিয়ে সে শহরময় ঘুরে বেড়িয়েছে। রেবা তার মুখ দেখেই বুঝল, একটা

গুরুতর কিছু ঘটেছে। সে ব্যগ্র উৎকণ্ঠায় প্রশ্ন করল—'কি হয়েছে গা?'

দুর্গাদাস গলার মধ্যে কেবল ঘোঁত ঘোঁত ঘড় ঘড় শব্দ করল। সে রাগী এবং একগুঁয়ে মানুষ, হঠাৎ ঠিক করে বসেছে কাউকে কিছু বলবে না, রেবাকেও না। রেবা বার বার কী হয়েছে কী হয়েছে প্রশ্ন করেও তার মুখ থেকে কিছু বের করতে পারল না। কথায় বলে, মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল—দুর্গাদাসের সেই অবস্থা। কেবল মুখে কথা নেই।

সারা রাত দুর্গাদাস জেগে রইল, তারপর ভোর হতে না হতে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। রেবারও ভাল ঘুম হয়নি, সে ঘাড় তুলে বলল—'কোথায় চললে?'

দুর্গাদাস একটু দম নিয়ে বলল—'বেড়াতে। তুমি যাবে?'

'যাব।' রেবা বিছানা থেকে নেমে পড়ল।

পাঁচ মিনিট পরে দুজনে বেরুল। নদীর ঘাটে গিয়ে দেখল দেবীদাস কাল যেখানে বসে ছিল, আজও ঠিক সেইখানে বসে বই পড়ছে। দুর্গাদাস নিঃশব্দে তার দিকে আঙুল দেখাল। রেবা প্রশ্নভরা বিস্ফারিত চোখে তার পানে চাইল। প্রশ্ন করতে হলো না, দুর্গাদাস ঘাড় নাড়ল।

রেবা তখন পা টিপে টিপে দেবীদাসের কাছে গিয়ে বসল। দেবীদাস চমকে মুখ তুলে একটি মহিলাকে দেখে একেবারে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। রেবা মুখে হাসি আনল বটে, কিন্তু কথা বলতে গিয়ে তার গলা কেঁপে গেল—'তোমার নাম কি?'

'দেবীদাস।' তার কণ্ঠস্বর সঙ্কোচরুদ্ধ।

রেবা আঙুল দিয়ে তার চিবুক ধরে মুখখানি নিজের দিকে ফিরিয়ে মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইল, কতকটা নিজের মনেই বলল—'কি সুন্দর মুখ, যেন কুঁদে কাটা। বাবা, তোমরা ক' ভাই-বোন?'

দেবী বলল—'আমরা দুই ভাই, এক বোন।'

'তুমি বুঝি বড়?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

আরো কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে রেবা বলল—'আমি কে জানো? আমি তোমার জেঠাইমা।'

দেবী সন্দেহ করেছিল, এখন চট করে ব্যাপার বুঝে নিল, হাসিমুখে রেবার পায়ের ধুলো নিয়ে বলল—'আপনাদের কথা মা'র মুখে শুনেছি।' সে উঠে গিয়ে দুর্গাদাসের পায়ের ধুলো নিয়ে আবার এসে বসল।

রেবা তার হাত ধরে বলল—'বাবা, তোমার মাকে আমাদের কথা বোলো। বোলো আমাদের কেউ নেই।' বলেই রেবা চোখে আঁচল দিয়ে কেঁদে উঠল।

দুর্গাদাস এতক্ষণ নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে ছিল। এখন রুক্ষ স্বরে বলল—'চল, এবার বাড়ি ফিরতে হবে।'

দুজনে বাড়ি ফিরে এল, কিন্তু রেবার কান্না থামল না। একদিন গেল দু'দিন গেল, রেবা কেঁদেই চলেছে। কারুর প্রতি তার নালিশ নেই, ভগবানকে সে আক্ষেপ জানাল না, শুধু তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রুর ধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল।

তিনদিনের দিন ভোরবেলা দুর্গাদাস মরীয়া হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। সোজা নদীর ঘাটে গিয়ে দেখল, দেবী যথাস্থানে বসে বই পড়ছে। দুর্গাদাস তার কাছে যেতেই দেবী উঠে দাঁড়াল। দুর্গাদাস তার হাত ধরে বলল—'আয় আমার সঙ্গে।'

দেবী আপত্তি করল না, নিঃশব্দে তার সঙ্গে চলল; সে দেখল দুর্গাদাস তাকে

তাদের বাড়ির দিকেই নিয়ে যাচ্ছে। সে তার মাকে সব কথা বলেছিল, তার মা-ও তাকে চুপি চুপি সব বলেছিল; দুর্গাদাস যখন তাকে তার বাড়ির দিকেই নিয়ে চলল, তখন তার বুঝতে বাকি রইল না যে, আজ একটা গুরুতর ঘটনা আসন্ন হয়েছে। সে মনে মনে তৈরি হয়ে রইল।

যেতে যেতে দুর্গাদাস হঠাৎ বলল—'তোর জেঠাই বোধহয় বাঁচবে না। কেঁদে কেঁদে মরে যাবে। কেবল তুই তাকে বাঁচাতে পারিস।'

দেবী তার পানে একাগ্র দৃষ্টি তুলল; দুর্গাদাস বলল—'তুই আমাদের কাছে থাকবি?'

বারো বছরের ছেলের পক্ষে কঠিন প্রশ্ন, কিন্তু দেবী মনে বল এনে বলল—'থাকব।'

দেবীর কব্জির ওপরে দুর্গাদাসের মুঠির চাপ আরো শক্ত হলো।

চন্ডীদাসের বাড়ির ফটকের সামনে এসে দুর্গাদাস একবার থমকে দাঁড়াল, তারপর গটগট করে এগিয়ে চলল। বাড়িটা ফটক থেকে প্রায় বিশ গজ পিছনে।

বাড়িতে চন্ডীদাস তখন বৈঠকখানায় বসে প্রাতঃকালীন তামাক খাচ্ছিল, আর শান্তা পাশের ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে ছেলের পথ চেয়ে ছিল। শান্তাই আগে ওদের দেখতে পেল।

দুর্গাদাস দেবীকে নিয়ে বৈঠকখানার দোরগোড়ায় পৌঁছুলে চন্ডীদাস তাকে দেখে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল, তার হাত থেকে গড়গড়ার নল খসে পড়ল। এই সময় শান্তা পাশের ঘর থেকে ছুটে এসে গলায় আঁচল দিয়ে ভাসুরকে প্রণাম করল।

সে উঠে দাঁড়াতেই দুর্গাদাস হতভম্ব ভায়ের দিকে একটা কড়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করে শান্তাকে সম্বোধন করে বলল—'বউমা, আমি দেবীকে নিয়ে যাচ্ছি, ও আমার কাছে থাকবে। আজ থেকে আমিই ওকে মানুষ করব।'

প্রায় অস্ফুট নীচু গলায় শান্তা বলল—'আচ্ছা দাদা।' বিয়ের পর থেকে সে ভাসুরকে দাদা বলেই ডেকেছে।

দুর্গাদাস দেবীর হাত ধরে গটগট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এতক্ষণ চন্ডীদাস জড়বস্তুর মত বসে ছিল, যেন ধারণা করতেই পারছিল না, তার চোখের সামনে কী ঘটছে। ওরা ফটক পার হয়ে যাবার পর সে ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল, চীৎকার করে বলল—'অ্যাঁ! আমার ছেলেকে কেড়ে নিয়ে গেল! এ কি মগের মুল্লুক! দাঁড়াও, আমি মজা দেখাচ্ছি। আজ খুনোখুনি হয়ে যাবে।'

সে দোর পর্যন্ত এসেছে, শান্তা গিয়ে তাকে দু'হাতে জাপটে ধরল, বলল—'না, আর আমি তোমাকে দাদার সঙ্গে ঝগড়া করতে দেব না।'

চন্ডীদাস তার হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে বলল—'ছেড়ে দাও, আমার ছেলেকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে—'

শান্তা বাহুবন্ধন শিথিল করল না, বলল—'তোমার ছেলেকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছেন না, দেবী নিজের ইচ্ছেয় ওঁর সঙ্গে গিয়েছে। তুমি কি চোখেও দেখতে পাও না?'

চন্ডীদাসের রোখ একটু নরম হলো বটে, তবু সে বলল—'কিন্তু আমার ছেলে—'

শান্তা বলল—'তোমার ছেলে তোমার কাছে যত সুখে আছে, ওঁদের কাছেও তেমনি সুখে থাকবে। বরং বেশী তো কম নয়।'

চন্ডীদাস গোঁ-ভরে আবার বলল—'কিন্তু আমার বড় ছেলে—'

শান্তা চন্ডীদাসকে যেমন আঁকড়ে ছিল তেমনি আঁকড়ে রইল, ব্যগ্র মিনতির সুরে বলল—'ওগো, কেন তুমি বুঝতে পারছ না? ওঁরা নিঃসন্তান, ওঁদের কেউ নেই। ও'রা যদি বুড়ো বয়সে একটা অবলম্বন না পান, তাহলে বাঁচবেন কি নিয়ে! আমাদের তিনটি আছে। এমন তো নয় যে, দেবী চিরদিনের জন্যে আমাদের পর হয়ে যাবে। বরং

দেবীকে দিয়ে আমরা ওঁদের ফিরে পাব।' বলতে বলতে স্বামীর কাঁধে মাথা রেখে শান্তা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

শহরের অন্য প্রান্তে রেবা তখনো চোখ বুজে বিছানায় পড়ে ছিল। দুর্গাদাস দেবীকে নিয়ে খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়াল, বিজয়ীর কণ্ঠে বলল—'ওগো, চোখ খুলে দেখ কাকে নিয়ে এসেছি।'

প্রে ম

মাত্র বারো ঘণ্টা তারা একসঙ্গে ছিল। অসিতা আর সুপর্ণ। সুপর্ণ অফিসের কাজে একদিনের জন্যে বোম্বাই থেকে কলকাতা যাচ্ছিল। আর অসিতা কলকাতা থেকে বোম্বাই এসেছিল তার দাদার কাছে। তার দাদা বোম্বাই-এ বড় চাকরি করেন, অসিতার একটি বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলেন এবং পাত্রপাত্রীর দেখাশোনার জন্যে তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। পাত্রপাত্রী দু'জনেই দু'জনকে পছন্দ করেছে। তারপর সাতদিন বোম্বাই-এ কাটিয়ে অসিতা কলকাতায় ফিরে যাচ্ছে। এরপর অভিভাবকেরা যথাকর্তব্য করবেন।

ভোরবেলা সাণ্টাক্রুজ বিমানবন্দর থেকে প্লেন ছাড়ল। ক্যারাভেল প্লেন, ঘণ্টা তিনের মধ্যে কলকাতা পৌঁছে যাবে।

অসিতা আর সুপর্ণ পাশাপাশি সীট পেয়েছিল। প্লেন আকাশে উঠলে তারা অন্য যাত্রীদের লক্ষ্য করল, কিন্তু বাঙালী আর কেউ থাকলেও চেনা গেল না। পরিদর্শন শেষ করে তারা পাশের দিকে চোখ ফেরাল। সুপর্ণ দেখল, তার পাশে বসে আছে একটি ছোটখাটো সুশ্রী মেয়ে; তার সাজ-পোশাক শাড়ি পরার ভঙ্গী দেখে সন্দেহ থাকে না, সে বাঙালী মেয়ে। অসিতা দেখল, বিলিতি পোশাক-পরা সাতাশ-আটাশ বছরের সুদর্শন যুবা, বাঙালী কিনা চেনা যায় না।

সুপর্ণর মুখে হাসি ফুটল, সে বলল—'আমিও বাঙালী।'

অসিতা লজ্জা-লজ্জা হাসল—'আমি আন্দাজ করেছিলুম, কিন্তু—'

সুপর্ণ বলল—'কিন্তু বিজাতীয় পোশাক দেখে নিঃসন্দেহ হতে পারেননি। আপনি কি বম্বেতেই থাকেন?'

'না, কলকাতায় থাকি। বম্বেতে আমার দাদা থাকেন।'

'ও—বেড়াতে এসেছিলেন। আপনার দাদার নাম কি?'

অসিতা নাম বলল। সুপর্ণ বলল—'আমি চিনি না।'

'আপনি বুঝি বম্বেতেই থাকেন?'

'বছরখানেক আছি। তবে আমার বাউণ্ডুলে চাকরি, কবে কোথায় বদলি হয়ে যাব কিছু ঠিক নেই।'

এয়ার হোস্টেস এসে সকলকে ব্রেকফাস্ট দিয়ে গেল। খেতে খেতে দু'জনে গল্প করতে লাগল। সহজ সরল গল্প; কার বাড়িতে কে কে আছে, কে কোন দেশে বেড়াতে গিয়েছে, কোন লেখক কার প্রিয়, এইসব। তারা যে দু'জনেই অবিবাহিত, প্রশ্ন না করেও তা জানতে পারল।

হঠাৎ কো-পাইলট এসে যাত্রীদের সামনে দাঁড়াল, হাত তুলে বলল—'একটি নিবেদন আছে। ভয় পাবেন না। ইঞ্জিন একটু গোলমাল করছে, আমাদের ঘণ্টাখানেকের জন্যে নাগপুরে নামতে হবে।'

যাত্রীরা উদ্বিগ্ন মন নিয়ে বসে রইলেন। অসিতা আর সুপর্ণ পরস্পরের মুখের পানে চেয়ে হাসল। যেন ভারি সুখবর।

প্লেন নাগপুরে নামল। ইঞ্জিনের ত্রুটি কিন্তু সহজে মেরামত হলো না, প্রায় ন' ঘণ্টা লেগে গেল। এই ন' ঘণ্টা সুপর্ণ আর অসিতা একসঙ্গে রইল; এয়ারপোর্টের খাবার ঘরে একসঙ্গে লাঞ্চ খেল, একসঙ্গে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াল, পাশাপাশি বসে গল্প করল। তারপর যখন প্লেনে ওঠবার ডাক পড়ল, তখন দু'জনে উঠে পাশাপাশি বসল। প্লেন ছেড়ে দিল।

প্লেন যখন দমদমে পৌঁছুল, তখন রাত্রি হয়ে গেছে। দু'জনে প্লেন থেকে নেমে বাইরের ভেস্টিবুলে এসে দাঁড়াল। সুপর্ণ বলল—'দিনটা কোন্ দিক দিয়ে কেটে গেল জানতেই পারলাম না।'

অসিতা একটু ফিকে হাসল, বলল—'আমার দাদা গাড়ি এনেছেন। চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

সুপর্ণ লোভ দমন করে বলল—'আপনি যাবেন বারাকপুরে, আপনাদের কষ্ট দেব না। আমি স্টেশন ওয়াগনেই যাব।' হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল—'আচ্ছা।'

অসিতা তার হাতে হাত মেলাল, বলল—'আচ্ছা।'

চার বছর কেটে গেছে।

সুপর্ণ বিয়ে করেছে, একটি ছেলে হয়েছে। ছেলের বয়স যখন বছরখানেক, তখন সুপর্ণ বাঙ্গালোরে বদলি হলো। এর আগে সে বাঙ্গালোরে আসেনি, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এসে উপস্থিত হলো।

বাঙ্গালোরে বাঙালী বাসিন্দার অভাব নেই, কিন্তু সুপর্ণ যে-পাড়ায় বাসা পেয়েছিল, সে পাড়াটি উচ্চবর্গের হলেও সেখানে বাঙালীর সংখ্যা কম। তারা গোছগাছ করে বসবার পর একদিন বিকেলবেলা সুপর্ণর সদর দরজার ঘণ্টি বেজে উঠল।

সুপর্ণ এসে দরজা খুলে দেখল, সামনে দাঁড়িয়ে এক তরুণ বাঙালী মিথুন। যুবকটি অপরিচিত, কিন্তু যুবতীকে দেখেই সুপর্ণ চিনতে পারল—অসিতা। দু'জনেই চক্ষু বিস্ফারিত করে চাইল।

যুবকটি একমুখ হেসে বলল—'আমার নাম মন্মথ চৌধুরী, কাছেই থাকি। পাড়ায় বাঙালী এসেছেন শুনে এলাম। এ আমার স্ত্রী অসিতা।'

'আসুন আসুন।' সুপর্ণ তাদের লিভিং রুমে নিয়ে গিয়ে বসাল, নিজের স্ত্রী তৃপ্তিকে ডেকে পরিচয় করিয়ে দিল। তৃপ্তি মেয়েটি কান্তিমতী হাস্যমুখী গৃহকর্মে নিপুণা। সে অসিতার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল, ছেলেকে এনে দেখাল। কথাবার্তায়

জানা গেল অসিতার একটি মেয়ে হয়েছিল, আঁতুড় ঘরেই মারা যায়। তারপর আর হয়নি।

ওদিকে মন্মথ আর সুপর্ণও খুব গল্প জমিয়েছিল। দু'জনে সমবয়স্ক, কর্মক্ষেত্রেও সমপদস্থ। ঘণ্টাখানেক পরে চা-টা খেয়ে মন্মথরা উঠল, বলল—'এবার আপনাদের পালা। আমার বাসা কাছেই।' সে নিজের ঠিকানা দিল। যাবার সময় অসিতা সুপর্ণর পানে চেয়ে একটু মুখ টিপে হাসল। কিন্তু তাদের পূর্ব পরিচয়ের কথা দু'জনেই চেপে গেল।

পরদিন বিকেলবেলা সুপর্ণ তৃপ্তিকে বলল—'চল ওদের বাড়ি যাই।'

তৃপ্তি একটু ভুরু তুলে বলল—'আজই?'

'দোষ কি?'

'বেশ চল।'

দু'জনে মন্মথ চৌধুরীর বাড়ি গেল। সেখানে আদর-আপ্যায়ন খাওয়া-দাওয়া। তারা যখন বাড়ি ফেরবার জন্য উঠেছে তখন অসিতা সুপর্ণর দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসল।

তারপর রোজই যাওয়া-আসা চলতে লাগল। এরা একদিন যায় তো ওরা একদিন আসে। গল্পসল্প হয়, অসিতা অন্য দু'জনের অলক্ষ্যে মুখ টিপে হাসে।

মাসখানেক এইভাবে চলবার পর ক্রমে মন্মথ আর তৃপ্তি এই যাওয়া-আসার পালা থেকে খসে পড়ে। কেবল সুপর্ণ আর অসিতা আসে যায়। বিকেল হলেই তাদের মন অন্য বাড়ির দিকে টানতে থাকে।

তিন মাস কেটে গেল। তাদের সম্বোধন 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নেমে এল। একদিন সুপর্ণ অসিতাদের বাড়ি গিয়ে দেখল মন্মথ বেরুচ্ছে। মন্মথ বলল—'আমাকে একবার বেরুতে হবে। তুমি বোসো ভাই, পালিও না! আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমি ফিরব।'

মন্মথ চলে গেল। অসিতা আর সুপর্ণ টেবিলের দু'পাশে মুখোমুখি বসল। এই তাদের প্রথম জনান্তিকে দেখা। অসিতা মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে বলল—'আমাদের কী হয়েছে বলো দেখি?'

সুপর্ণ তার পানে চেয়ে গম্ভীর গলায় বলল—'তোমাকে রোজ একবার না দেখলে থাকতে পারি না।'

অসিতা বলল—'আমিও না।'

'কিন্তু আমি তৃপ্তিকে ভালবাসি।—'

'আমিও আমার স্বামীকে ভালবাসি।—তবে এটা কী?'

সুপর্ণ খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল—'জানি না।—পৃথিবীটা ভারি আশ্চর্য জায়গা।'

অসিতা স্বপ্নালু কণ্ঠে বলল—'পৃথিবীটা ভারি আশ্চর্য মিষ্টি জায়গা।'

মন্মথ ফিরে না আসা পর্যন্ত তারা নীরবে মুখোমুখি বসে রইল।

সত্যি এটা কী? প্রেম?

রমণীর মন

কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি। দুপুর রাত্রে গাঁয়ের জমিদার বাড়িতে ডাকাত পড়ল। পঁচিশজন ঘোড়সওয়ার ডাকাত মশাল জ্বালিয়ে বাড়ি ঘেরাও করল।

জমিদার অবনীধর রায় নিজের শয়নকক্ষে সস্ত্রীক ঘুমোচ্ছিলেন, বাইরে গণ্ডগোল শুনে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি কড়া মেজাজের মানুষ, ভৃত্য পরিজনের বেয়াদপি সহ্য করেন না; ভাবলেন চাকর এবং দরোয়ানেরা মদ খেয়ে বাইরে হুল্লোড় করছে। তিনি ঘুমচোখে ঘরের দোর খুলে সদর বারান্দায় বেরিয়ে এলেন।

ডাকাতের সর্দার এবং তার কয়েকজন সঙ্গী ওত পেতে ছিল, তারা একসঙ্গে তাঁর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল। অবনীধর ধরাশায়ী হলেন। ডাকাতেরা তাঁকে টেনে তুলে দালানের একটা থামে দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধল। জমিদারবাবু চীৎকার করে চাকরদের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন কিন্তু কেউ এল না। ডাকাতের সর্দার অট্টহাসি হেসে বলল—'কাকে ডাকছ? কেউ নেই, সব পালিয়েছে।' তারপর নিজের দলের লোকদের বলল—'লুট আরম্ভ কর। টাকাকড়ি সোনাদানা সব নেবে, বাজে মাল নেবে না। যাও।'

লুটপাট শুরু হয়ে গেল। ডাকাতের সর্দার জমিদারের শয়নকক্ষে প্রবেশ করল।

শ'খানেক বছর আগেকার ঘটনা। সিপাহী যুদ্ধের আগুন নিভেছে কিন্তু ছাই ঠাণ্ডা হয়নি। যেসব সিপাহী ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়েছিল তাদের মধ্যে অনেকেই শ্যাম-কুল দু'ই হারিয়েছে। বেশীর ভাগই যুদ্ধবৃত্তি ছেড়ে নিজের গাঁয়ে গিয়ে লুকিয়ে আছে, অল্পসংখ্যক সিপাহী ছোট ছোট দল তৈরি করে ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে। তাদের মতলব লুটপাট করে কিছু অর্থ সংগ্রহ করবে, তারপর নতুন জায়গায় গিয়ে ভালমানুষ সেজে সংসার পেতে বসবে।

পশ্চিম বাংলার রাইনগর গ্রামে এইরকম একদল ডাকাত হানা দিয়েছিল।

রাইনগরের রায়েরা চার পুরুষে জমিদার। তাঁরা অপব্যয়ী ছিলেন না, চার পুরুষ ধরে অনেক ধনসঞ্চয় করেছিলেন; গ্রামে পাকা বাড়ি বাগান পুকুর দেবমন্দির করেছিলেন। অবনীধর রায় এই বংশের চতুর্থ পুরুষ; বয়স বেশী নয়, অনুমান পঁয়ত্রিশ বছর; যেমন তেজস্বী আকৃতি, তেমনি গম্ভীর রাশভারী প্রকৃতি। বাল্যকালে তাঁর একবার বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু কৈশোর অতিক্রম করবার আগেই সে-স্ত্রী মারা যায়; তারপর অনেকদিন বিয়ে করেননি। বছর পাঁচেক আগে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেছেন। নতুন স্ত্রী সরযূর বয়স এখন কুড়ি-একুশ। সন্তানাদি হয়নি। বেশ সুখে শান্তিতে দিন কাটছিল, হঠাৎ দুপুর রাত্রে ডাকাতদের আক্রমণ। যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। মুহূর্তমধ্যে সব তচনচ হয়ে গেল।

সরযূর ঘুম একটু দেরিতে ভেঙেছিল। সে আঁচল-খসা গায়ে বিছানায় উঠে বসে ব্যাকুল চোখে এদিক ওদিক চাইছিল। ঘরের কোণে ঘৃত-প্রদীপ জ্বলছিল, তারি মৃদুস্নিগ্ধ আলোয় সরযূকে দেখা যায়। গায়ের রঙ একটু চাপা, কিন্তু মুখ ও দেহের গড়ন অতুলনীয়। রজনীগন্ধার ছড়ের মত কৃশাঙ্গী, কিন্তু সর্বাঙ্গে ভরা যৌবনের প্রাচুর্য। কাঁধে পিঠে চুলের ঢাল এলিয়ে পড়েছে।

বাঁ হাতে মশাল, ডান হাতে প্রকাণ্ড কাটারি নিয়ে একটা দৈত্যের মত লোক ঘরে ঢুকছে দেখে সরযূ ভয় পেয়ে চীৎকার করে উঠল—'কে! কে তুমি! কি চাও?'

ডাকাতের সর্দার উত্তর দিল না, রক্তাভ চোখ মেলে খাটের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। সরযূ গলার মধ্যে অব্যক্ত শব্দ করে আঁচলে মুখ ঢাকল। এই ভীষণাকৃতি লোকটার দিকে তাকাতেও ভয় করে।

লোকটা খাটের পাশে এসে দাঁড়াল, কিছুক্ষণ সরযূর স্খলিত-বসন অর্ধনগ্ন দেহের পানে চেয়ে থেকে কর্কশ স্বরে বলল—'মুখ খোলো, নইলে কাপড়ে আগুন লাগিয়ে দেব।'

কাঁপতে কাঁপতে সরযূ মুখ খুলল, কিন্তু চোখ বুজে রইল। লোকটা মশাল তার মুখের কাছে এনে ভাল করে মুখখানা দেখল, তারপর আগের মতই কঠিন স্বরে বলল—'এস আমার সঙ্গে। আমরা লুট করতে এসেছি, তোমাকেও লুটে নিয়ে যাব। আজ থেকে তুমি আমার।'

সরযূ বিভীষিকাপূর্ণ চোখ খুলে চীৎকার করে কেঁদে উঠল। ডাকাত সর্দার অমনি কাটারি উঁচিয়ে তাকে মারবার উপক্রম করল। সরযূ আর সহ্য করতে পারল না, অজ্ঞান হয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়ল।

ডাকাত সর্দার কাটারি কোমরে গুঁজে সরযূকে এক হাতে জড়িয়ে বিছানা থেকে তুলে নিয়ে কাঁধে ফেলল, যেন তার দেহটা শিশুর দেহ। তারপর মশাল তুলে ধরে ঘরের বাইরে চলল।

বাড়ির অন্য ঘরগুলোতে নানারকম শব্দ হচ্ছে, খটাখট ঝনঝন। তার সঙ্গে ডাকাতদের কর্কশ চীৎকার। তারা বাক্স-পেটরা সিন্দুক ভেঙে লুট করছে।

এক ঘণ্টা পরে ডাকাতেরা পোঁটলা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল। তখন কৃষ্ণাষ্টমীর চাঁদ গাছের মাথা ছাড়িয়ে উঁচুতে উঠেছে। জমিদারবাবু থামে বাঁধা ছিলেন, সর্দার সরযূর সংজ্ঞাহীন দেহ কাঁধে নিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়াল, অট্টহাসি হেসে বলল—'আমরা চললাম জমিদারবাবু। তোমার বৌকেও নিয়ে চললাম। তুমি আবার বিয়ে কোরো।'

তারপর ডাকাতেরা মশাল নিভিয়ে ঘোড়ার পিঠে পড়ে বসল, চাঁদের আলোয় ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

গ্রামের উত্তর দিকে ক্রোশখানেক দূরে বন আরম্ভ হয়েছে। দশ ক্রোশ জুড়ে ঘন শাল-পিয়ালের বন। ডাকাতেরা বনের মধ্যে প্রবেশ করল।

বনের মাঝখানে একটুখানি খোলা জায়গা। প্রকাণ্ড গাছগুলো যেন চারিদিক থেকে এগিয়ে আসতে আসতে মন্ত্রপূত গণ্ডীর বাইরে থেমে গেছে। ডাকাতেরা এইখানে এসে ঘোড়া থেকে নামল। চাঁদের আলো এখন বেশ উজ্জ্বল হয়েছে, মুখ চেনা যায়। ডাকাত সর্দার সরযূর অচৈতন্য দেহ এক পাশে ঘাসের ওপর শুইয়ে দিয়ে অন্য ডাকাতদের বলল—'ভাই সব, আজ আমাদের শেষ ডাকাতি। আজ আমরা যা লুট করেছি তাতে অনেকদিন চলবে। এস লুটের মাল ভাগ করে নিই। তারপর যার যেদিকে ইচ্ছে চলে যাব, আর আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হবে না।'

সকলে সায় দিল। তারপর লুটের সোনা রুপো গয়না টাকা মোহর সমান ভাগ করে যে-যার পুঁটলিতে বাঁধল, ঘোড়ায় চড়ে একে একে দু'য়ে দু'য়ে ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলে গেল। রয়ে গেল কেবল সর্দার।

সকলে অন্তর্হিত হবার পর সর্দার সরযূর পাশে ঘাসের ওপর গিয়ে বসল। সরযূর দেহ শিথিল, মুখে গভীর নিদ্রার ভাবহীনতা; এখনো তার জ্ঞান হয়নি। সর্দার তার মুখের কাছে মুখ ঝুঁকিয়ে দেখল, বুকের মাঝখানে হাত রেখে বুকের ধুকধুকুনি অনুভব

করল। তারপর তার দেহের ঊর্ধ্বভাগ সবলে টেনে নিয়ে নিজের বুকে চেপে ধরল।

এই সময় সরযূর জ্ঞান হলো। তার শরীরের স্নায়ুপেশী শক্ত হলো, সে চোখ খুলে চাইল, তারপর শিউরে উঠে চোখ বন্ধ করল। তার শরীর আবার শিথিল হয়ে এলিয়ে পড়ল।

সর্দার সেই অবস্থাতেই সরযূকে পাঁজাকোলা করে তুলে উঠে দাঁড়াল, একবার চারদিকে ঘাড় ফেরাল। কেউ কোথাও নেই, কেবল ঘোড়াটা চাঁদের আলোয় কিছু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। সর্দার তখন সরযূকে বুকের কাছে নিয়ে একটা গাছের অন্ধকার ছায়ার দিকে চলল।...

রাত্রি শেষ হয়ে আসছে, চাঁদ পশ্চিম দিকে একটু ঢলেছে। বনের মধ্যে পাখিরা থেকে থেকে ডেকে উঠছে। সর্দার সরযূকে কাঁধে ফেলে গাছের ছায়া থেকে বেরিয়ে এল। ঘোড়ার কাছে এসে এক লাফে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল, তারপর উত্তর দিক লক্ষ্য করে ঘোড়া চালাল।

জমিদার অবনীধর রায় সারা রাত্রি থামে বাঁধা রইলেন। তাঁর চাকর-বাকর ডাকাতদের সাড়া পেয়ে পালিয়েছিল, তারা আর ফিরে এল না। ডাকাতের হাতে যদি বা প্রাণ বেঁচেছে, ফিরে এলে মালিকের হাতে প্রাণ যাবে। তারা দেশান্তরী হলো।

রাত্রে গ্রামবাসীরা সবাই জানতে পেরেছিল যে, জমিদারের বাড়িতে ডাকাত পড়েছে, কিন্তু কেউ দোর খোলেনি। সূর্যোদয়ের পর যখন তারা নিঃসংশয়ে বুঝল যে, ডাকাতেরা চলে গেছে তখন গুটি গুটি এসে জমিদারের বাড়িতে উপস্থিত হলো। ডাকাত পড়েছিল শুনে তারা ঘোর বিস্ময় প্রকাশ করল, তারপর জমিদারবাবুর বন্ধন খুলে দিল। অবনীধর রায় গুরুতর আহত হননি বটে, কিন্তু তাঁর দেহ অক্ষত ছিল না। উপরন্তু তাঁর দেহের চেয়ে মনের ক্ষতই বেশী হয়েছিল। গ্রামবাসীরা যখন শুনল যে, ডাকাতেরা তাঁর স্ত্রীকে ধরে নিয়ে গেছে তখন তাদের বিস্ময় ও হাহুতাশ চতুর্গুণ বেড়ে গেল।

একজন মাতব্বর লোক বলল—'কালে কালে এসব হচ্ছে কি! আগেও ডাকাত পড়ত, কিন্তু তারা মেয়েমানুষের গায়ে হাত দিত না। এরা নিশ্চয় বাংলা দেশের ডাকাত নয়, চাষাড়ে খোট্টা ডাকাত, তাই এত আস্পর্ধা।'

জমিদারবাবু বললেন—'ডাকাতের সর্দারকে আমি চিনতে পেরেছি।'

'অ্যাঁ! চিনতে পেরেছেন! কে? কে?'

'খগেশ্বর নন্দী।'

'অ্যাঁ? খগা!·খগা নন্দী! তার এই কাজ!'

দশ বছর আগে খগা ওই গ্রামেরই ছেলে ছিল। জন্মাবধি দুরন্ত এবং দুঃশীল, যতই তার বয়স বাড়তে লাগল ততই সে অসহ্য রকম দুরাচার হয়ে উঠল। তারপর একদিন সে এমন একটা অকথ্য দুষ্কার্য করল যে, জমিদার অবনীধরবাবু তাকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিলেন। গ্রামে এক বুড়ী পিসী ছাড়া খগার কেউ ছিল না; সে গ্রাম ছেড়ে চলে গেল, শহরে গিয়ে ইংরেজের সিপাহী দলে ভর্তি হলো। সেই থেকে গ্রামের লোক তার কোনো খবর রাখত না, এতদিন পরে আবার তার আবির্ভাব।

হপ্তাখানেকের মধ্যে জমিদারবাবু সুস্থ হয়ে উঠলেন। কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে আগুন জ্বলছে। চার পুরুষের সঞ্চিত টাকাকড়ি সোনাদানা গিয়েছে যাক; জমিদারী আছে, টাকা আবার হবে। কিন্তু ডাকাত তাঁর স্ত্রীকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে এই

মর্মদাহ নিরন্তর তাঁকে দগ্ধ করছে। সতীসাধ্বী সরযূ অবশ্য আত্মহত্যা করেছে; কিন্তু খগা যতদিন বেঁচে আছে ততদিন তাঁর বুকের আগুন নিভবে না।

অবনীধর রায় চারিদিকে গুপ্তচর পাঠালেন। অল্প দিনের মধ্যেই দু'তিন জন গুপ্তচর ফিরে এসে খবর দিল যে, ডাকাতের দল ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে, যার যেদিকে খুশি চলে গেছে। অনেক টাকা পেয়েছে, তারা আর ডাকাতি করবে না।

কিন্তু খগা নন্দী কোথায় গেছে কেউ খবর দিতে পারল না। জমিদার এক হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করলেন, তবু খগা নন্দীর পাত্তা পাওয়া গেল না।

জমিদার স্থিরবুদ্ধি লোক। তিনি বাছা বাছা চারজন ভোজপুরী জোয়ান জোগাড় করলেন; তারা এমন লোক যে খুন-জখমে পিছপাও হবে না। তাদের কর্তব্যকর্ম বুঝিয়ে দিয়ে তাদের হাতে একখানি করে কাটারি দিলেন, নিজের কোমরে তলোয়ার বাঁধলেন; তারপর পাঁচজনে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়লেন। ঘরে বসে খগা নন্দীকে ধরা যাবে না, গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে তাকে খুঁজে বেড়াতে হবে।

মাস তিনেক জমিদারের বাড়ি বন্ধ রইল, তারপর তিনি সঙ্গীদের নিয়ে ফিরে এলেন। খগেশ্বরকে পাওয়া যায়নি। বাড়ি ফিরে এসে তিনি মাসখানেক বিশ্রাম করলেন, তারপর আবার বেরুলেন। এইভাবে চলতে লাগল। মাসের পর মাস কাটল, বছরের পর বছর ঘুরে গেল, কিন্তু খগার সন্ধান মিলল না।

দেখতে দেখতে তিন বছর কেটে গেল।

রাইনগর থেকে আন্দাজ চল্লিশ ক্রোশ উত্তরে গঙ্গার কূলে একটি গ্রাম। গ্রাম না বলে পল্লী বললেই ভাল হয়। কুড়ি পঁচিশটি মাটির কুটির ঘিরে ক্ষেত খামার। পিছনে জঙ্গল, সামনে গঙ্গা। এই পল্লীর পূর্বদিকে ক্রোশ দুই দূরে গঙ্গার ধারে একটি ছোট নগর আছে।

পল্লীর অধিবাসীরা অর্ধসভ্য আদিম জাতির মানুষ। তারা চাষবাস করে, আবার তীরধনুক নিয়ে বনে শিকারও করে। কদাচিৎ গঙ্গায় ত্যগ ফেলে মাছ ধরে খায়; তাদের নৌকো নেই। কখনো বনের কাঠ কেটে নগরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে। এইভাবে তাদের বৈচিত্র্যহীন সংকীর্ণ জীবনযাত্রা নির্বাহ হয়।

খগেশ্বর কয়েক জায়গা ঘুরে শেষে সরযূকে নিয়ে এইখানে বাসা বেঁধেছিল। ঘন সন্নিবিষ্ট পল্লী থেকে একটু দূরে গঙ্গার পাড়ের ওপর কুটির তৈরি করেছিল। কুটির ঘিরে গঙ্গামাটির আল হাঁটু পর্যন্ত উঁচু, তার মধ্যে ছোট্ট একটুখানি শাকসব্জির বাগান।

পল্লীবাসীরা প্রথমে তাদের দেখে বেশ কৌতূহলী হয়েছিল; খগেশ্বর ছদ্মনামে নিজের পরিচয় দিয়ে তাদের সঙ্গে ভাব জমিয়েছিল; গাঁয়ের লোককে বলেছিল—সরযূ তার বৌ, কোনো দুষ্ট জমিদার সরযূর প্রতি কুদৃষ্টি দিয়েছিল, তাই সে বৌ নিয়ে পালিয়ে এসেছে। সরল পল্লীবাসীরা তাই বুঝেছিল এবং সহৃদয়তার সঙ্গে তাদের আশ্রয় দিয়েছিল।

জমিদারবাবুর অনুমান সত্য নয়, সরযূ আত্মহত্যা করেনি, বেঁচে আছে। কিন্তু তাকে দেখে মনে হয় সে অন্য মানুষ। আগে তার দেহ ছিল কোমল সুকুমার, এখন কঠিন হয়েছে; মুখে হাসি লেগে থাকত, এখন হাসি নেই, জীবনের কঠোর অভিজ্ঞতা মুখে ছাপ মেরে দিয়েছে। সে কোনোকালেই বেশী কথা বলত না, এখন একেবারেই কথা বলে না। তাকে দেখে মনে হয় কাঁচা মাটির পুতুলকে পুড়িয়ে শক্ত করা হয়েছে।

দুর্দান্ত-স্বভাবের খগেশ্বর যখন সরযূকে হরণ করে নিয়ে যায় তখন তার মনে

ছিল প্রতিহিংসা আর নারীলিপ্সা; সরযূকে চিরজীবন আঁকড়ে থাকার সংকল্প তার ছিল না; ভেবেছিল দু'চার দিন পরে তাকে কোথাও ফেলে রেখে চলে যাবে। কিন্তু কিছুকাল একসঙ্গে থাকার পর তার মনের ভাব আস্তে আস্তে বদলাতে লাগল। সরযূর রূপ-যৌবনের মোহ তার কাটল না, সে প্রচণ্ড আগ্রহে প্রাণপণে সরযূকে আঁকড়ে রইল; অন্য স্ত্রীলোক সম্বন্ধে তার মন নির্বিকার হয়ে গেল।

তাদের জীবনযাত্রা বড় বিচিত্র। এক পক্ষে দুর্মদ প্রমত্ততা, অন্য পক্ষে বাক্যহীন হাস্যহীন সমর্পণ। সরযূর যেন স্বাধীন ইচ্ছা নেই; খগেশ্বর যা বলে সে সজীব যন্ত্রের মত তাই করে। খগেশ্বর তার দেহ দুই বাহুর মধ্যে নিয়ে নিষ্পেষিত করে, কিন্তু তার মনের মধ্যে কী হচ্ছে জানতে পারে না।—রমণীর মন।

কিছুদিন গঙ্গাতীরের কুটিরে কাটাবার পর একদিন খগেশ্বর সরযূকে বলল—'একটা মতলব ঠাউরেছি। আমি নগরে যাচ্ছি, ফিরতে বেলা গড়িয়ে যাবে। তুমি রেঁধে বেড়ে রেখো, এসে খাব।'

সরযূ কোনো প্রশ্ন করল না, কেবল ঘাড় নাড়ল। খগেশ্বর টাকার গেঁজে কোমরে বাঁধল, কাঁধে চাদর ফেলে গঙ্গার ধার বেয়ে ভাটির মুখে চলল। এর আগে খগেশ্বর কখনো সরযূকে ছেড়ে বেশী দূর যায়নি। এখন সে বুঝেছে সরযূ তাকে ছেড়ে পালাতে পারবে না। কোথায় পালাবে?

দুপুর পেরিয়ে যাবার পর সরযূ ঘরের কাজ সেরে গঙ্গার ধারে গিয়ে বসল। সূর্যের তাপ বেশী নয়, গঙ্গার জলছোঁয়া ঝিরি ঝিরি বাতাস বেশ ঠাণ্ডা। সরযূ দূরের দিকে চেয়ে বসে রইল। চুলে একটু জট পড়েছে, প্রসাধনের কোনো চেষ্টা নেই; তবু তাকে দেখতে ভাল লাগে।

অনেকক্ষণ বসে থাকার পর সে দেখতে পেল, দূরে ভাটির দিকে গঙ্গার ধারা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেইখানে একটি জেলে ডিঙি দেখা দিয়েছে। ডিঙিতে কেবল একটি মানুষ, সে দাঁড় টানছে; সরযূর দিক থেকে তার পিঠ দেখা যাচ্ছে, মুখ দেখা যাচ্ছে না। ডিঙি আরো কাছে এলে সরযূ চিনতে পারল, মানুষটা খগেশ্বর, তার ঘামে-ভেজা গায়ে সূর্যের আলো চকচক করছে, দুই বলিষ্ঠ বাহুতে দু'টি দাঁড় ধরে সে উজান বেয়ে এগিয়ে আসছে। সরযূর কপালে বিস্ময়ের রেখা পড়ল; সে সেইদিকে চেয়ে রইল।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে সরযূ যেখানে বসে ছিল সেইখানে খগেশ্বরের ডিঙি এসে লাগল। খগেশ্বর সরযূর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে হা হা করে হেসে উঠল, তারপর বলল—'এস এস, দাঁড়টা ধর।' ডিঙির গলুই-এ বাঁধা একটা দড়ির প্রান্ত সরযূর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে সে ডিঙি থেকে এক হাঁটু জলে নেমে পড়ল, তারপর ডাঙায় উঠে সরযূর হাত থেকে দড়ি নিয়ে ডিঙিটাকে টেনে বালির ওপর তুলল। সারাক্ষণ সে কথা বলে চলেছে—'সাত্ত টাকা দিয়ে ডিঙি কিনেছি। কেমন, সুন্দর নয়? ছোট বটে, কিন্তু নতুন; সোলার মতন হালকা, কিন্তু ভারি মজবুত। এই ডিঙিতে চড়ে গঙ্গায় মাছ ধরব। খেপলা জাল কিনেছি। মাছ ধরে নিজেরা খাব, গাঁয়ের লোকেদের দেব; বেশী মাছ ধরলে নগরে বিক্রি করব। খুব ক্ষিদে পেয়েছে। নগরে একটা দোকানে জিলিপি আর কাঁচাগোল্লা খেয়েছিলাম, কিন্তু এতখানি দাঁড় টেনে সব হজম হয়ে গেছে। হা হা হা! তোমার জন্যেও মিষ্টি এনেছি, শাড়ি এনেছি, গামছা, আরো কত কী এনেছি—'

এর পর থেকে ওদের জীবনযাত্রায় একটা নূতনত্ব এল। দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়া সেরে ওরা ডিঙিতে ওঠে, মাঝ গঙ্গায় গিয়ে মন্থর স্রোতের মুখে ডিঙি ভাসিয়ে দেয়।

সরযূ ডিঙির গলুই-এ চুপ করে বসে থাকে, খগেশ্বর জাল হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। খেপলা জাল ফেলার কায়দা সে জানে; হাত ঘুরিয়ে জাল ছুঁড়ে দেয়, জাল চক্রাকার হয়ে জলে পড়ে। খগেশ্বর দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে থাকে, জাল ডুবে গেলে আস্তে আস্তে দড়ি টেনে ডিঙির পাশে আনে।

জালে কখনো ছোট মাছ ওঠেঃ বাটা চেলা মৌরলা; কখনো বড় মাছঃ রুই কাৎলা মৃগেল। বড় মাছ উঠলে খগেশ্বর আহ্লাদে আটখানা হয়ে যায়; সরযূর সাহায্যে মাছ জাল থেকে বের করে ডিঙির খোলের মধ্যে রেখে আবার জাল ফেলে।

এইভাবে জাল ফেলতে ফেলতে তাদের ডিঙি বাঁকের দিকে ভেসে চলে। যেদিন খগেশ্বর বড় মাছ পায় সেদিন নগরের ঘাটে গিয়ে ডিঙি বাঁধে। সরযূ ডিঙিতেই মুখে ঘোমটা টেনে বসে থাকে, খগেশ্বর মাছ বিক্রি করে। নিজেদের জন্যে একটা মাছ রেখে বাকি মাছ বিক্রি করে। ঘাটেই সব মাছ বিক্রি হয়ে যায়। খগেশ্বর বিক্রির পয়সা সিকি আধুলি যা পায় তাই দিয়ে বাজারে সওদা করে, হাসতে হাসতে ডিঙিতে ফিরে আসে, দাঁড় টেনে ঘরে ফিরে যায়।

যেদিন জালে চুনো মাছ ছাড়া আর কিছু ওঠে না সেদিন খগেশ্বর বাঁকের মুখ থেকেই ঘরে ফিরে আসে। নিজেদের জন্যে কিছু মাছ রেখে বাকি মাছ সরযূকে দিয়ে বলে, 'যাও, গাঁয়ে বিলিয়ে এস।'

সরযূ গামছায় মাছ বেঁধে গাঁয়ে যায়, সেখানে ঘরে ঘরে মাছ বিলোয়। গাঁয়ের মেয়েরা কলকলিয়ে তার সঙ্গে গল্প করে, তাকে কলাটা মুলোটা দেয়; তাই নিয়ে সরযূ ফিরে আসে।

রাত্রির খাওয়া শেষ হলে সরযূ নদীতে গিয়ে বাসন মেজে আনে। তারপর তার রাত্রি কাটে খগেশ্বরের বাহুবন্ধনের মধ্যে।

এইভাবে একটি একটি করে বছর কাটতে থাকে। খগেশ্বর মাছ ধরে, সরযূ গৃহকর্ম করে। যে মেয়ে আগে কখনো নিজের হাতে জল গড়িয়ে খায়নি, সে রাঁধে, ঘর ঝাঁট দেয়, কাপড় কাচে, বাসন মাজে। আগেকার কথা তার মনে পড়ে কিনা কে জানে!

তিন বছর কেটে গেল।

আষাঢ় মাস আরম্ভ হয়েছে। আকাশে নতুন মেঘ, বিকেলবেলার দিকে বৃষ্টি নামে। গঙ্গায় ইলিশ মাছ দেখা দিয়েছে।

একদিন ভোরবেলা খগেশ্বর সরযূকে নিয়ে মাছ ধরতে বেরুল। আকাশ মেঘে ঢাকা, ইলশে-গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। ইলিশ মাছ ধরার এই সময়।

চার-পাঁচ বার জাল ফেলতেই গোটা পঁচিশ ইলিশ জালে উঠল। খগেশ্বর অট্টহাসি হেসে বলল—'আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম। চল ঘরে ফিরি। নগরে যাব না; গাঁয়ের লোকেরা আমাদের অনেক দেয় থোয়, আজ ওদের পেট ভরে ইলিশ মাছ খাওয়াব।'

ঘরে ফিরে সরযূ একটা মাছ কুটে রাঁধতে বসল। রান্না হলে খগেশ্বর ইলিশ মাছের রাই-ঝাল খেয়ে বিছানায় লম্বা হলো। সরযূ নিজে খেয়ে নদীতে বাসন মাজল। ততক্ষণ বেলা প্রায় তিন প্রহর। সরযূ তখন একটা চুবড়িতে ইলিশ মাছগুলি নিয়ে চুবড়ি কাঁখে গাঁয়ে গেল।

সরযূকে দেখে গাঁয়ের মেয়েরা কলকোলাহল করে যে-যার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ইলিশ মাছ পেয়ে সবাই আনন্দে দিশেহারা। মাছ ভাগ করে নিয়ে তারা বকুল গাছের তলায় সরযূকে ঘিরে গল্প করতে বসল। হাসি-গল্পে ঘণ্টাখানেক কেটে গেল।

কয়েকটি বালিকা গাঁয়ের দক্ষিণ প্রান্তের মাঠে খেলা করছিল। তারা হঠাৎ ছুটতে

ছুটতে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—'ঘোড়ায় চড়ে পাঁচজন লোক আসছে।'

পাঁচজন ঘোড়সওয়ার! এমন অভাবনীয় ব্যাপার গাঁয়ে কখনো ঘটেনি। মেয়েরা বাঁধভাঙা জলের মত সেইদিকে ছুটল। কেবল সরযূ একা বকুলতলায় বসে রইল।

'ঘোড়সওয়ার' শুনেই সরযূর মনে খটকা লেগেছিল। সে আস্তে আস্তে উঠে একটি কুটিরের পিছনে লুকিয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরেই মেয়েদের কলকলানির সঙ্গে ঘোড়ার আওয়াজ শোনা গেল। সরযূ আড়াল থেকে কান পেতে শুনতে লাগল। তারপরই শুনতে পেল একজন পুরুষের গম্ভীর গলা—'এ গাঁয়ে খগেশ্বর নন্দী নামে কেউ থাকে?'

অত্যন্ত পরিচিত গলা। সরযূ আর দাঁড়াল না, সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে নিজের কুটিরের দিকে ছুটল।

খগেশ্বর তখনো চিত হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছিল, সরযূ ছুটে এসে তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল, তার বুকের ওপর হাত রেখে ব্যগ্র চাপা গলায় বলল—'শুনছ? ওঠো ওঠো, ওরা আমাদের ধরতে এসেছে।'

খগেশ্বর তড়াক করে একেবারে উঠে দাঁড়াল। ঘুম-রাঙা চোখে চেয়ে বলল—'কারা ধরতে এসেছে?'

সরযূও উঠে দাঁড়াল, পাংশু মুখে বলল—'ওরা—রাইনগর থেকে।'

'জমিদার!' দেয়ালের গায়ে খাঁড়ার মত কাটারিটা ঝুলছিল, খগেশ্বর এক লাফে গিয়ে সেটা হাতে নিল। সরযূ ভয়ার্ত স্বরে বলল—'না না, ওরা পাঁচজন ঘোড়ায় চড়ে এসেছে। ওদের সঙ্গে তুমি একলা পারবে না। চল আমরা পালিয়ে যাই।' সরযূ খগেশ্বরের খুব কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

খগেশ্বর বলল—'পালিয়ে যাব! কোথায় যাব?'

সরযূ বলল—'চল ডিঙিতে করে গঙ্গার ওপারে চলে যাই।'

খগেশ্বরের মুখে আস্তে আস্তে একটা প্রকাণ্ড নিঃশব্দ হাসি ফুটে উঠল। সে এক খাবলায় সরযূকে শূন্যে তুলে নিয়ে নিজের বুকে চেপে ধরল, তারপর নামিয়ে দিয়ে বলল—'চল পালাই।'

টাকার গেঁজে কোমরে বেঁধে নিয়ে, এক হাতে কাটারি অন্য হাতে সরযূর হাত ধরে সে গঙ্গার ধারে গেল; ডিঙি জলে ঠেলে দিয়ে ডিঙিতে দু'জনে উঠে বসল। খগেশ্বর দু' হাতে দাঁড় নিয়ে জলে ডোবাল; ডিঙি তীরের মত পরপারের দিকে ছুটে চলল। দুস্তর গঙ্গা, এপার থেকে ওপার দেখা যায় না।

জমিদার অবনীধর রায় গাঁয়ে খোঁজখবর নিয়ে খোলা তলোয়ার হাতে যখন গঙ্গার তীরে এলেন তখন ডিঙি অনেক দূর চলে গেছে। তার ওপর ছিপছিপ করে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। আবছা আলোয় ধূসর জলের ওপর কেবল একটি কালো বিন্দু দেখা যায়।

মটর মাস্টারের কৃতজ্ঞতা

মাস তিনেক আগে বদলি হয়ে কলকাতায় এসেছি। ভাল বাসা পাইনি, তাই এখনো ফ্যামিলি আনিনি। কিন্তু মোটর গাড়িটা আনতে হয়েছে। আমার যে ধরনের কাজ তাতে মোটর না হলে চলে না।

কলকাতায় এসেই কিন্তু ফ্যাসাদে পড়ে গেছি। অপরাধের মধ্যে একজনের প্রাণরক্ষা করেছিলাম। তার ফল যে এমন বিষময় হয়ে উঠবে তখন কে জানত! বিদ্যাসাগর ছিলেন মহাপুরুষ লোক, তিনি জানতেন পৃথিবীতে কারুর উপকার করতে নেই। আমি অর্বাচীন, তাই আমার আজ এই দুরবস্থা।

যার প্রাণ বাঁচিয়েছিলাম তার নাম মটর মাস্টার। মটর মাস্টারকে আপনারা চিনবেন না, কিন্তু আমি হাড়ে হাড়ে চিনেছি। তার কৃতজ্ঞতার ঠেলায় এখন হাতে দড়ি না পড়লে বাঁচি।

একদিন কাজের সূত্রে কলকাতার বাইরে একটা ফ্যাক্টরীতে গিয়েছিলাম। বড় বড় ফ্যাক্টরীতে কার্য পরিচালনা সম্বন্ধে সুপরামর্শ দেওয়াই আমার কাজ। সেদিন ফ্যাক্টরীতে কাজ শেষ করতে অনেক দেরি হয়ে গেল। রাত্রে ফ্যাক্টরীর কর্মকর্তা আমাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খুব খাওয়ালেন। তারপর রাত্রি আন্দাজ এগারোটার সময় মোটর চালিয়ে কলকাতায় ফিরে চললাম।

শহরতলিতে কিছুদূর এগিয়েছি, একটা বাঁক নিয়ে মোটরের হেডলাইটের ছটায় একটা দৃশ্য চোখে পড়ল। সামনে প্রায় ত্রিশ গজ দূরে রাস্তার ওপর কয়েকজন লোক একটা লোককে লাঠি দিয়ে মারছে। লোকটা নিরস্ত্র, কেবল দু'হাত দিয়ে নিজের মাথা বাঁচাবার চেষ্টা করছে। আমার মোটরের আলো দেখে লোকটা আক্রমণকারীদের মধ্যে থেকে ছুটে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করল. আততায়ীরাও ক্ষণেকের জন্যে থমকে গেল, তারপর আমি সজোরে হর্ন বাজাতেই তারা রাস্তার দু' পাশের অন্ধকারে ছায়ার মত মিলিয়ে গেল।

অকুস্থলে গিয়ে মোটর দাঁড় করালাম। আক্রান্ত লোকটাকে ভাল করে দেখবার সুযোগ পেলাম না, সে তড়াক করে গাড়িতে আমার পাশে উঠে বসল, ব্যগ্রস্বরে বলল—'চলুন চলুন, দেরি করবেন না।'

আমি আবার গাড়ি চালিয়ে দিলাম, যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে লোকটাকে দেখলাম। নিম্নতর শ্রেণীর লোক, হাড়গিলের মত আকৃতি: কপালের ওপর একটা হাত চেপে বসে আছে, বোধ হয় কপালে লাঠির চোট খেয়েছে। আমি বললাম—'মাথায় লেগেছে? রক্তপাত হয়েছে? হাসপাতালে নিয়ে যাব?'

সে বলল—'আজ্ঞে না।'

বললাম—'থানায় যাবে?'

সবেগে মাথা নেড়ে সে বলল—'আজ্ঞে না।'

'তবে কোথায় যাবে?'

'তুলসীতলায়।'

চকিতে তার পানে তাকালাম—'তুমি তুলসীতলায় থাকো?'

লোকটা খরদৃষ্টিতে আমার পানে চাইল। বলল—'আপনাকে এতক্ষণ চিনতে পারিনি। আমাদের পাড়ায় নতুন এসেছেন, ৪৫ নম্বরে থাকেন।'

বললাম—'হ্যাঁ। তোমাকে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।'

সে বলল—'আমি আপনাকে দেখেছি, আমার নাম মটর মাস্টার।'

মটর মাস্টার কোন বিদ্যার মাস্টারী করে বুঝতে পারলাম না। অতঃপর আর কোনো কথা হলো না। আধঘন্টা পরে গাড়ি আমার বাসার সামনে এসে থামল, সঙ্গে সঙ্গে মটর মাস্টার গাড়ি থেকে নেমে দুপুর রাতের আবছায়া রাস্তায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

দিন তিনেক পরে একটা রবিবারে বাজারে যাব বলে বেরিয়েছি, একটা লোক বিপরীত দিক থেকে আসতে আসতে দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল। লোকটাকে যেন কোথায় দেখেছি; সিড়িঙ্গে লম্বা হাড়-বার করা চেহারা, তার শরীরে লালচে রঙের একটু আধিক্য আছে। চুল লালচে কালো, চোখ লালচে, দাঁত লালচে, গায়ের রঙের কালোর ওপর একটু লালচে আভা; দোলের সময় গায়ে রঙ ধুয়ে ফেলবার পরও যেমন একটু ছোপ লেগে থাকে অনেকটা সেই রকম।

চিনি-চিনি করেও লোকটাকে চিনতে পারলাম না। অবশ্য এ পাড়ার কাউকেই ভাল করে চিনি না। পাড়াটা যেন কেমনধারা। যারা বড় কাজ করে তারা সকালবেলা মোটরে চড়ে কাজে চলে যায়, সন্ধ্যের সময় বাড়ি ফিরে আসে; কারুর সঙ্গে মেলামেশা নেই। যারা মধ্যবিত্ত তারা পান চিবুতে চিবুতে অফিসে যায়, কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলে না। বেলা দশটার পর পাড়ায় থেকে যায় একদল যুবক। তাদের মাথায় ঝাঁকড়া চুল, গায়ে হাত-কাটা গেঞ্জি ও ঢিলা পাজামা; বিড়ি সিগারেট টানতে টানতে তারা ফুট-পাথে পায়চারি করে আর নিজেদের মধ্যে খাটো গলায় কথা বলে। তাদের স্কুল কলেজ আছে বলে মনে হয় না। পাড়ায় নতুন লোক দেখলে তাদের দৃষ্টি প্রখর হয়ে ওঠে। আমি যখন প্রথম এ পাড়ায় আসি রাস্তায় বেরুলেই ওদের কুঞ্চিত চোখের দৃষ্টি আমাকে অনুসরণ করত; এখনো করে। ওরা কী ভাবে, ওদের মনের গঠন কি রকম কিছুই বুঝতে পারি না। অন্য পাড়ায় ভাল বাসা খুঁজছি, পেলেই চলে যাব।

আমি একটা শুকো চাকর রেখেছি, সে একাধারে আমার পাচক এবং চাকর। সে-রাত্রে চাকরটা চলে যাবার পর আমি দোর বন্ধ করে নৈশাহার সারলাম, তারপর সিগারেট ধরিয়ে একটা বই নিয়ে বসলাম। দশটা বাজল; তখন বই বন্ধ করে শুতে যাব ভাবছি এমন সময় সদর দোরে খুটখুট করে কড়া নড়ল।

এত রাত্রে কে এল? উঠে গিয়ে দোর খুললাম, দেখি সেই লালচে লোকটা। সে সুট করে ঢুকে পড়ল, খপ করে পায়ের ধুলো নিয়ে বলল—'আজ্ঞে আমি মটর মাস্টার।'

এবার তাকে চিনতে পারলাম, সেই লোকটাই বটে। সেরাত্রে আবছা আবছা দেখেছিলাম, তাই চিনতে পারিনি।

ঘরে নিয়ে গিয়ে মটর মাস্টারকে বসালাম, সে আর এক খাবলা পায়ের ধুলো নিয়ে জোড় হাতে বলল—'স্যার, আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন, আপনি আমার বাপের তুল্যি।'

ব্যস্ত হয়ে বললাম—'আরে না না, আমি আর কি করেছি। তোমার বাঁচবার ছিল তাই বেঁচে গেছ।'

মটর মাথা নেড়ে বলল—'আজ্ঞে না স্যার! অন্য কেউ হলে গাড়ি দাঁড় করাত না, চোঁ চাঁ দৌড় মারত।'

বললাম—'তা সে যাক। কিন্তু তোমাকে ওরা ঠেঙাচ্ছিল কেন বল দেখি?'

মটর একটু চুপ করে রইল, তারপর বলল—'ওরা আমার শত্তুর। সেরাত্রে লুকিয়ে ওদের এলাকায় ঢুকেছিলাম, কিন্তু ধরা পড়ে গেলাম।'

'ভাল বুঝলাম না। ওদের এলাকা মানে কি? আর সেখানে ঢুকলে ওরা তোমাকে ঠেঙিয়েই বা মারবে কেন?'

মটর তখন একটু কেশে গলা খাঁকারি দিয়ে যা বলল তার মর্ম এই—

কলকাতার বিশেষ বিশেষ পাড়ায় একদল লোক আছে, যাদের অজ্ঞ ব্যক্তিরা গুণ্ডা বলে; কিন্তু আসলে তারা পাড়ার ধনী গৃহস্থদের রক্ষক। সামান্য দক্ষিণার বিনিময়ে তারা ধনী প্রতিবেশীর ধনপ্রাণ রক্ষা করে। যদি কেউ ধনী হওয়া সত্ত্বেও এদের শরণাপন্ন না হয় তাহলে তাদের হাত-পা খোঁড়া হয়, বাড়িতে চুরি হয়, মোটর কারে আগুন লাগে এবং আরো নানা রকম দুর্ঘটনা হয়। তাই যারা বুদ্ধিমান তারা কোনো গণ্ডগোল করে না, নিঃসাড়ে রক্ষক-ভক্ষকদের পাওনাগণ্ডা চুকিয়ে দেয়।

সব শুনে বললাম—'খাসা ব্যবসা তোমাদের। তা এতদিন আমাকে রক্ষে করতে আসনি কেন?'

মটর লালচে দাঁত বার করে বলল—'আজ্ঞে, যারা দু'হাজার টাকার কম রোজগার করে তাদের আমরা ছুঁই না।'

'কে কত রোজগার করে সব খবর তোমরা রাখো?'

'আজ্ঞে রাখতে হয়, নইলে ব্যবসা চলে না।'

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর মটর মাস্টার উঠল—'আজ আসি স্যার। আপনার যদি কোনো উপকার করতে পারি কৃতার্থ হয়ে যাব।'

বললাম—'না না, আমার কোনো উপকার করতে হবে না। অপকার যদি না কর তাহলেই যথেষ্ট।'

জিভ কেটে মটর বলল—'বলেন কি স্যার! আমি আপনার অপকার করব! মনে রাখবেন, মটর মাস্টার যতদিন বেঁচে আছে আপনার গায়ে আঁচড়টি লাগতে দেবে না। আজ চলি। মাঝে মাঝে এসে খোঁজখবর নিয়ে যাব।'

আজকালকার দিনে মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং প্রত্যুপকার করতে চায় দেখে মনে আনন্দ হলো।

তারপর থেকে মটর হপ্তায় নিয়মিত একবার আসে। রাস্তায় লোক-চলাচল যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন আসে। অভিসারিকার মত নিঃশব্দসঞ্চার তার গতিবিধি।

মটর নিজের পাতাল-জীবনের গল্প বলে। সমাজের যে-স্তরে মটরের বাস সে-স্তর আমার একেবারে অজানা, শুনতে শুনতে মন বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়। ভ্রম হয়, যেন সৌর মণ্ডলের পরপারে কোনো উপগ্রহবাসী জীবের কাহিনী শুনছি।

যখনি আসে আমাকে বার বার প্রশ্ন করে—'স্যার, একবারটি বলুন আপনার জন্যে আমি কি করতে পারি। কিছুই কি করতে পারি না?'

বলি—'না মটর। দেখছ তো আমি একলা মানুষ, আমার আর কিসের দরকার?'

'আচ্ছা, আসুন তবে আপনার পা টিপে দিই।'

'সর্বনাশ! পা দুটোর যাও বা কিছু আছে, তুমি টিপলে আর কিছু থাকবে না।'

'আচ্ছা স্যার, আপনার নিশ্চয় শত্তুর আছে?'

'শত্তুর! শত্তুর থাকবে কোন দুঃখে! আমি কি লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে বেড়াই?'

'একটিও শত্তুর নেই?'

'না। থাকলেও আমি জানি না।'

মটর মাস্টার মুষড়ে পড়ে।

একদিন সে কাগজে মোড়া একটি বাণ্ডিল বগলে করে এল। প্রশ্ন করলাম—'বগলে ওটা কি।'

মটর সলজ্জভাবে মোড়ক খুলে একটি বোতল আমার সামনে রাখল, বলল—'আপনার জন্যে এনেছি স্যার। খাঁটি বিলিতি মাল।'

বোতলটি তুলে নিয়ে লেবেল পড়লাম; খাঁটি মাল বটে, স্কটল্যাণ্ডে তৈরি মাল।

প্রশ্ন করলাম—'মটর, এর দাম কত?'

মটর তাচ্ছিল্যভরে বলল—'হবে শ'খানেক টাকা। আমি ফোকটে পেয়েছি।'

'তুমি খাও?'

'কালেভদ্রে খাই। মাতাল হই না।'

'তাহলে এটা তুমিই রাখো, আমার অভ্যেস নেই।' বোতলটি ফেরত দিলাম। মটর দুঃখিত হলো, কিন্তু পীড়াপীড়ি করল না।

তারপর মটর মাস্টার আসে যায়। কোনোদিন এক রাশ ফল নিয়ে আসে: আঙুর আপেল পীচ; কোনোদিন আনে চন্দননগরের কড়া পাকের সন্দেশ। আমি বলি—'মটর, তোমার কৃতজ্ঞতার ঋণ কি এখনো শোধ হয়নি।'

সে বলে—'সে কি কথা স্যার। সারা জীবন ধরে আপনার সেবা করলেও শোধ হবে না।'

আমি অস্বস্তি অনুভব করি। কোনো জিনিসেরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়। মটরের কৃতজ্ঞতার অমৃত অতি-মন্থনের ফলে বিষ না হয়ে ওঠে!

তারপর একদিন একটি ব্যাপার ঘটল।

রাত্রে মটর এসেছিল, তার গল্প শুনতে শুনতে প্রায় দশটা বেজে গেল। সময়ের দিকে খেয়াল ছিল না, হঠাৎ সদর দরজায় খটখট কড়া নড়ে ওঠাতে চমকে উঠলাম।

মটর উৎকণ্ঠিতভাবে আমার পানে চাইল, আমি তাকে চুপিচুপি বললাম—'জানি না কে এসেছে, তুমি একটু আড়াল হও।' তাকে বাড়ির পিছন দিকে আঙুল দেখালাম; সে বিড়াল-গতিতে অদৃশ্য হলো। গভীর রাত্রে গুণ্ডার সঙ্গে ধরা পড়া বাঞ্ছনীয় নয়।

উঠে গিয়ে দরজা খুললাম। গুটি চারেক ছোকরা দাঁড়িয়ে আছে: যাদের ঢিলা পাজামা আর হাত-কাটা গেঞ্জি পরে ফুটপাথে বিচরণ করতে দেখেছি, তাদেরি দলের ছেলে। কিন্তু আজ তাদের বেশভূষায় পারিপাট্য আছেঃ ধোপদস্ত ধুতি-পাঞ্জাবি, বার্নিশ করা জুতো। তাদের মুখপাত্র হাত জোড় করে সবিনয়ে বলল—'মাফ করবেন, অসময়ে বিরক্ত করতে এলাম।'

ভাবলাম, বুঝি চাঁদা চায়। 'আসুন' বলে তাদের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালাম।

মুখপাত্র ছোকরাটি বেশ চটপটে, বলিয়ে-কইয়ে। মধুর হেসে বলল—'আপনি আমাদের পাড়ায় বাসা নিয়েছেন আমরা সকলেই দেখেছি, কিন্তু অ্যাদ্দিন আলাপ করবার সাহস হয়নি। আমরা সামান্য লোক, বয়সেও ছোট—'

'কি ব্যাপার বলুন দেখি!'

মুখপাত্র বিনীত করুণ হেসে বলল—'বড় বিপদে পড়েছি স্যার। আমার নাম হারু ঘোষ। আমাদের একটি ক্লাব আছে—'বিবর'। আমি বিবরের সেক্রেটারী। ক্লাবে বসে আমরা তাস পাশা খেলি, একটু-আধটু গানবাজনা করি। কারুর সাতে-পাঁচে নেই।'

'তারপর?'

'কাল সন্ধ্যেবেলা আমরা ক্লাবে বসে তাস খেলছি, হঠাৎ একদল পুলিস এসে হাজির। ক্লাবেরই একজন মেম্বর—নাম কালাচাঁদ দত্ত—তাকে ধরে নিয়ে চলে গেল। বলে কিনা কালাচাঁদ দিনদুপুরে একজনের বাড়িতে ঢুকে একটি মেয়েলোকের মাথায় বাড়ি মেরে অজ্ঞান করে সব লুটপাট করে পালিয়েছে। দেখুন দেখি কি অত্যোচার। কালাচাঁদ ভদ্রলোকের ছেলে, সে যাবে ডাকাতি করতে?'

পলকের মধ্যে আমার দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হলো। এরা কাজকর্ম করে না, স্কুল কলেজে যায় না, হাত-কাটা গেঞ্জি আর ঢিলা পাজামা পরে ফুটপাথে টহল মারে; অথচ এদের অন্নবস্ত্রের অভাব নেই। বুঝতে পারলাম এদের রসদ আসে কোথা থেকে। তাদের মুখের দিকে তাকালাম; তারা শিকারী বেড়ালের মত খরদৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে

আছে।

বললাম—'ভারি অন্যায় পুলিসের। কিন্তু আমার কাছে এসেছেন কেন?'

'কি বলব স্যার, পুলিসের জুলুম। আপনি বিজ্ঞ ব্যক্তি, সবই তো জানেন। কালাচাঁদকে ধরে নিয়ে গিয়ে হাজতে রেখেছে, পাঁচ হাজার টাকা জমানত না পেলে তাকে ছাড়বে না। এ পাড়ায় যত পয়সাওয়ালা লোক আছে সকলের দোরে দোরে কাকুতি-মিনতি করেছি, কিন্তু এমন পাজি নচ্ছার ছোটলোক সব, কেউ আঙুল নেড়ে সাহায্য করবে না। তাই নিরুপায় হয়ে আপনার কাছে এসেছি। আপনি মহাপ্রাণ ব্যক্তি, গরীব বেচারা বিপদে পড়েছে, আপনি নিশ্চয় তাকে পুলিসের কবল থেকে উদ্ধার করবেন।'

অতঃপর ছোকরাদের মতলব জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। আমার জামিনে কালাচাঁদ মুক্তি পাবে এবং অচিরাৎ ফেরারী হবে, তখন জমানতের টাকার দায় আমার ঘাড়ে পড়বে। বিবরের সভ্যরা দাঁত বার করে হাসবে। যথাসম্ভব সহজভাবে বললাম—'মাপ করবেন, আমি পারব না।'

'না স্যার, এ কাজটি আপনাকে করতেই হবে।'

'পারব না। অত টাকা আমার নেই।'

'নগদ টাকা দিতে হবে না স্যার। আপনি গণ্যমান্য লোক, মোটর আছে, মুচলেকা লিখে দিলেই হবে।'

'হবে না। মিছে উপরোধ করবেন না।'

অনুনয় বিনয় ক্রমে তর্কে দাঁড়াল; তারপর ঝগড়ায় পরিণত হলো। শেষ পর্যন্ত হারু ঘোষ চোখ লাল করে দাঁতে দাঁত ঘষে বলল—'আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করে পাড়ায় বাস করতে পারবে না, এটা জেনে রাখো। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা যায় না।'

বললাম—'তোমরা কুমীর নও, ছুঁচো—যাও, বিদেয় হও।'

চারজন একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল, আগুনভরা চোখে আমার পানে চাইল। ভাবলাম, বুঝি আক্রমণ করবে। আমি পকেটে হাত দিলাম। পকেটে যদিও কিছুই ছিল না, তবু বিবরের দল পেছিয়ে গেল; বোধ হয় ভাবল, আমার পকেটে ছোরা ছুরি পিস্তল কিছু আছে।

'আচ্ছা দেখে নেব' বলে তারা চলে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। এদের মুখের দাপট যতটা বেশী সাহস ততটা নয়, তবু হয়তো অনিষ্ট করবার চেষ্টা করবে। মটরের কথা মনে পড়ে গেল। উঠে গিয়ে বাড়ির পিছন দিকে খোঁজ করলাম। দেখলাম মটর কখন খিড়কির দোর খুলে চলে গেছে।

অতঃপর তিন চারদিন নিরুপদ্রবে কেটে গেল। একদিন সকালবেলা সবে মাত্র চায়ের পেয়ালা নিয়ে বসেছি, একজন সাব-ইন্সপেক্টর এসে উপস্থিত। বললেন—'একটু দরকার আছে।'

ঘরে এনে বসালাম—'কি দরকার বলুন।'

'আপনি হারু ঘোষ নামে কাউকে চেনেন?'

হারু ঘোষের সঙ্গে পরিচয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম।

'তার সঙ্গে আপনার ঝগড়া হয়েছিল?'

ঝগড়ার ইতিহাস বললাম। শুনে তিনি বললেন—'তাকে আপনি খুন করবেন বলে শাসিয়েছিলেন?'

চোখ কপালে তুলে বললাম—'সে কি কথা! হারু ঘোষই বরঞ্চ আমাকে 'দেখে নেব' বলে শাসিয়েছিল। কিন্তু কি ব্যাপার বলুন দেখি। কী হয়েছে?'

সাব-ইন্সপেক্টর গাত্রোত্থান করে বললেন—'গত রাত্রে হারু ঘোষকে কেউ ছুরি মেরে

খুন করেছে। তার তিনজন বন্ধু—যারা তার সঙ্গে আপনার কাছে এসেছিল, তারা বলছে আপনি তাকে শাসিয়েছিলেন। আচ্ছা আজ চলি। দরকার হলে আবার আসব।'

স্তম্ভিত হয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। তারপর মনের মেঘাচ্ছন্ন দিগন্ত ধীরে ধীরে পরিষ্কার হতে লাগল।

রাত্রি দশটার সময় মটর এল। দরজা জানলা বন্ধ করে তাকে সামনে বসালাম, কড়া সুরে বললাম—'মটর, তুমি হারু ঘোষকে খুন করেছ!'

মটর বলল—'হারু ঘোষ! সে আবার কে?'

বললাম—'ন্যাকামি কোরো না! সেদিন হারু ঘোষ দলবল নিয়ে এসেছিল, তুমি আমাদের কথাবার্তা শুনেছিলে; হারু ঘোষ আমাকে অপমান করেছিল. শাসিয়েছিল, তাই তুমি তাকে খুন করেছ!'

মটর এবার অ্যাটম বোমার মত ফেটে পড়ল—'হ্যাঁ. মেরেছি হারামজাদাকে। এত বড় আস্পর্ধা। আমার এলাকায় থেকে আমার প্রাণদাতাকে হুমকি দেবে, চোখ রাঙিয়ে কথা বলবে! ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবে! এখনি হয়েছে কি স্যার, ওদের দলের সবাইকে একে একে সাবাড় করব, তবে আমার নাম মটর মাস্টার। দেখে নেবেন আপনি।'

আমি হাত জোড় করে বললাম—'মটর. দোহাই তোমার. তুমি যাও, আর কখনো আমার কাছে এস না। কেউ যদি দেখে ফেলে আমার বাসায় তোমার যাতায়াত আছে, তাহলে আর রক্ষে থাকবে না; পুলিস ভাববে আমি তোমাকে দিয়ে হারু ঘোষকে খুন করিয়েছি, দু'জনেই খুনের দায়ে পড়ব। এমনিতেই আমার ওপর পুলিসের নজর পড়েছে।'

মটর কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইল, তারপর উঠে ভারী গলায় বলল—'আচ্ছা স্যার, আর আসব না। কিন্তু আপনি আমার প্রাণদাতা, আপনার ঋণ কোনোদিন ভুলব না।'

এক খাবলা পায়ের ধুলো নিয়ে মটর চলে গেল। তারপর আর আসেনি।

আমি কিন্তু ভয়ে ভয়ে আছি; ইতিমধ্যে দারোগাবাবু বার দুই তত্ত্বতল্লাস নিয়ে গেছেন। কোনদিন গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে হাজির হবেন। মটর মাস্টার যদি ধরা পড়ে—

বুড়ো বুড়ি দু'জনাতে

পুণায় আমার বাড়ির খুব কাছেই পেশোয়া পার্ক। পশুপক্ষী আছে, বাচ্চাদের জন্যে নকল রেলগাড়ি আছে, আর গাছপালার নীচে সিমেন্টের বেঞ্চি আছে। যারা শহরের ছোট ছোট বাড়ির ছোট ছোট ঘরে বাস করে, তারা সন্ধ্যের সময় এখানে এসে

খোলা জায়গায় একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

আমিও প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যেবেলা পেশোয়া পার্কে যাই; মানুষ এবং অন্যান্য জীবজন্তু নিরীক্ষণ করি। পার্কের এক কোণে ঝোপঝাড়ের আড়ালে একটি নিরালা বেঞ্চি আছে, সেখানে কিছুক্ষণ বসে অন্ধকার হলে বাড়ি ফিরে আসি।

কিছুদিন থেকে কিন্তু একটু অসুবিধে হয়েছে। একদিন ইতর প্রাণীদের পরিদর্শন শেষ করে নিজের বেঞ্চিটিতে বসতে গিয়ে দেখি, এক জোড়া বুড়ো-বুড়ি সেখানে বসে আছে এবং বিজবিজ করে গল্প করছে। বুড়োর বয়স আন্দাজ সত্তর, লম্বা রোগা পাকানো চেহারা; বুড়ির বয়স পঁয়ষট্টির কম নয়, গোলগাল ছোটখাটো গড়ন, পাকা চুল পিছন দিকে গিঁটবাঁধা। বুঝতে কষ্ট হয় না, এরা স্বামী-স্ত্রী। এতখানি স্বচ্ছন্দতা পরনারী বা পরপুরুষের সঙ্গে হয় না। সম্ভবত ওদের বাড়িতে অনেক ছেলেপুলে নাতি-নাতনী, সেখানে মন খুলে কথা বলার সুবিধে নেই, তাই ওরা সন্ধ্যেবেলা এখানে এসে বসে। এতদিন হয়তো অন্য কোথাও বসতো, এখন আমার নিরিবিলি বেঞ্চিটি আবিষ্কার করেছে।

পার্কের বেঞ্চির ওপর আমার অবশ্য মৌরুসী পাট্টা নেই, তবু মনটা খারাপ হয়ে গেল। এতদিনেও যদি তোমাদের দাম্পত্য প্রেম ফুরিয়ে না গিয়ে থাকে, অন্য কোথাও গিয়ে প্রেম কর না বাপু, আমার বেঞ্চির ওপর নজর কেন! জ্বালাতন!

তারপর দু'দিন পেশোয়া পার্কে যাওয়া হয়নি। তৃতীয় দিন গিয়ে দেখি বুড়ো-বুড়ি ঠিক বসে আছে। বুড়ি বুড়োর মুখের সামনে হাত নেড়ে কি বলছে, আর বুড়ো ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়ছে। অর্থাৎ বুড়ি যা বলছে সবতাতেই বুড়ো রাজী। এমন অস্বাভাবিক বুড়ো-বুড়ি জন্মে দেখিনি।

এর পর যতবার আমার বেঞ্চিতে বসতে গেছি, দেখেছি বুড়ো-বুড়ি হাজির, নট্ নড়নচড়ন। আমি হতাশ হয়ে ফিরে এসেছি।

এইভাবে মাসখানেক কাটবার পর একদিন সিংহমিথুনের খাঁচার সামনে বিমর্ষভাবে দাঁড়িয়ে আছি, ধুরন্ধরের সঙ্গে দেখা। সুধীর ধুরন্ধর আধুনিক কালের মারাঠী ছেলে, ভারি ফুর্তিবাজ এবং ফাজিল; আমি বাঙালী বলেই বোধহয় আমার প্রতি তার একটু আকর্ষণ আছে। মাঝে মাঝে আমার বাড়িতে আসে, তার হাসি-গল্পের স্রোতে মন পরিষ্কার হয়ে যায়। আমাকে দেখে বলল—'একি, আপনার মুখ শুকনো কেন? বক্কেশ্বরীর শরীর ভাল আছে তো?'

বক্কেশ্বরী ওরফে বকুরানী আমার টিয়াপাখির নাম। জানালাম বক্কেশ্বরীর স্বাস্থ্য ভালই আছে। তারপর নিজের দুঃখের কথা বললাম। বেঞ্চি বেদখলের কথা শুনে ধুরন্ধর বলল—'তাই নাকি! চলুন তো দেখি কেমন বুড়ো-বুড়ি।'

তাকে বেঞ্চির দিকে নিয়ে গিয়ে আঙুল দেখালাম। বুড়ো-বুড়িকে দেখে ধুরন্ধর খিলখিল করে হেসে উঠল—'আরে এ যে—! আপনি একটু দাঁড়ান, আমি এখুনি আসছি।'

আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে ধুরন্ধর বুড়ো-বুড়ির কাছে চলে গেল। দেখলাম হাত নেড়ে তাদের সঙ্গে কথা বলছে। পাঁচ মিনিট পরে যখন সে ফিরে এল, তার কান থেকে নাক অবধি হাসি লেগে আছে। বলল—'গুরুতর ব্যাপার। ওদের বেঞ্চি থেকে হটানো যাবে না।'

'তুমি ওদের চেনো দেখছি।'

'চিনি বৈকি। বুড়োর নাম কেশোরাও দেশমুখ, আর বুড়ির নাম শান্তা মোরে।'

'অ্যাঁ! ওরা স্বামী-স্ত্রী নয়!'

'স্বামী-স্ত্রী হতে যাবে কোন্ দুঃখে। বুড়ো বিপত্নীক, আর বুড়ি বিধবা।'

'বল কি! তাহলে—'

'পুরাকালে—অর্থাৎ পঞ্চাশ বছর আগে শান্তা বাঈ-এর সঙ্গে কেশোরাও-এর বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল। বোধহয় একটু ভালবাসাও ছিল। কিন্তু বিয়ে হলো না। অন্য লোকের সঙ্গে বিয়ে হলো। শান্তা বাঈ-এর একঘর ছেলেপুলে নাতি-নাতনী হলো, কেশোরাও-এরও তাই। দু'জনেই পুণার স্থায়ী বাসিন্দা, দেখাশুনো হয়। তারপর কেশোরাও বিপত্নীক হলেন, আর শান্তা বাঈ হলেন বিধবা। ব্যস, লাইন ক্লিয়ার!'

'লাইন ক্লিয়ার মানে! বুড়ো-বুড়ি প্রকাশ্য পার্কে বসে ঢলাঢলি করছে কেউ কিছু বলে না!'

'বলবে কি করে! ওরা যে নাতি-নাতনীর বিয়ের পাকা কথা কইছে।'

'সেটা কি রকম?'

'বুড়োর একটি বিয়ের যুগ্যি নাতনী আছে, আর বুড়ির নাতি মুকুন্দ সবেমাত্র ডাক্তারি পাস করে বেরিয়েছে। তাই বুড়ো-বুড়ি উঠে পড়ে লেগেছে তাদের বিয়ে দেবার জন্যে। নিজেদের বিয়ে হয়নি তাই নাতি-নাতনীর বিয়ে দিয়ে শোধ তুলতে চায়।'

'যাঃ, এ সব তোমার বানানো গল্প। তোমাদের দেশের ছেলে-মেয়েরা তো নিজেরাই বর-বৌ খুঁজে নেয়, ঘটকালির তোয়াক্কা রাখে না। তবে যদি নাতি-নাতনী পরস্পরকে পছন্দ না করে তো আলাদা কথা।'

'পছন্দ খুবই করে। ব্যাপার বুঝলেন না? বুড়ো-বুড়ি এই ছুতো করে পুরনো প্রেম ঝালিয়ে নিচ্ছে।'

'তোমার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি না। বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলা তোমার স্বভাব।'

'বিশ্বাস হচ্ছে না! আসুন তাহলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিচ্ছি। এই কিছুক্ষণ আগে পার্কে মুকুন্দ আর কান্তাকে দেখেছি।'

পার্কের অন্য প্রান্তে এক জোড়া যুবক-যুবতী ঘাসের ওপর বসে তন্ময় হয়ে গল্প করছে. আমরা তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই চকিতে মুখ তুলে চাইল। ধুরন্ধর তর্জনী নেড়ে যুবককে বলল—'মুকুন্দ, তোমাকে সাবধান করে দিতে এসেছি। এইমাত্র দেখে এলাম তোমার দিদিমা তাঁর বয়-ফ্রেন্ডকে নিয়ে বেঞ্চির ওপর ঘেঁষাঘেঁষি বসে আছেন।'

মুকুন্দ মুখ গম্ভীর করে কান্তার পানে চাইল, বলল—'দিদিমার বয়-ফ্রেন্ডকে আমি চিনি। বুড়োর মতলব ভাল নয়। আমি দিদিমাকে সাবধান করে দেব।'

কান্তা মুচকি হেসে বলল—'আমার ঠাকুর্দা কারুর বয়-ফ্রেন্ড নয়। শান্তা বাঈ আমার ঠাকুর্দার গার্ল্-ফ্রেন্ড হবার চেষ্টায় আছেন। বুড়ির মতলব ভাল নয়। কোন্ দিন বুড়োকে নিয়ে ইলোপ করবেন।'

হরি হরি! কোথায় ঠাকুর্দা আর দিদিমার কার্যকলাপে লজ্জায় অধোবদন হবে, তা নয় ঠাট্টাতামাশা শুরু করে দিয়েছে—যেন ভারি মজার ব্যাপার! আজকালকার ছেলেমেয়েদের মনে গুরুজনের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা কি কিছুই নেই! কালে কালে এসব হচ্ছে কি?

কা ল স্রো ত

১

এই কাহিনীর সূত্রপাত হয়েছিল আজ থেকে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগে। বাংলাদেশের মেয়েরা তখন পর্দা ছেড়ে বেরিয়েছে বটে, কিন্তু এমন ব্যাপকভাবে রাস্তাঘাটে ছড়িয়ে পড়েনি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের তৎপরতা রান্নাঘরেই সীমাবদ্ধ ছিল।

মথুরানাথবাবুর বয়স ছিল তখন অনুমান চল্লিশ বছর। প্রশান্ত মুখ, দৃঢ় শরীর, অত্যন্ত মিতবাক্ মানুষ। বছর তিনেক আগে বিপত্নীক হয়ে সংসারযন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভ করেছেন। একলা মানুষ, ছেলেপুলে নেই।

কলকাতার যে-অংশে তিনি থাকতেন সেখান থেকে জাতীয় গ্রন্থাগার, অর্থাৎ তাৎকালিক ইম্পীরিয়ল লাইব্রেরী খুব কাছে। ইচ্ছা করেই এখানে বাসা নিয়েছিলেন। তাঁর অর্থ উপার্জনের প্রয়োজন ছিল না; বিপত্নীক হবার পর তিনি নিজের জীবনকে অত্যন্ত ঋজু এবং অনাড়ম্বর করে ফেলেছিলেন। ঝি-চাকর ছিল না, নিজেই নিজের সমস্ত গৃহকর্ম করতেন।

তাঁর দিনকৃত্য ছিল এইরকম—

সকালে উঠেই তিনি বাড়ি ঝাঁট দিয়ে ফেলতেন। সাড়ে তিনখানা ঘরের বাড়ি, ঝাঁট দিতে বেশী সময় লাগত না। তারপর স্টোভ জেবলে রান্না চড়াতেন। রান্না মানে চালে ডালে মিশিয়ে তাতে আলু পটোল কুমড়ো ইত্যাদি দিয়ে ঘ্যাঁটের মত একটা পদার্থ। ঘ্যাঁট সিদ্ধ হলে তাতে খানিকটা ঘি ঢেলে দিয়ে স্টোভ নিভিয়ে তিনি স্নান করতে যেতেন। স্নানাদি সেরে পরম তৃপ্তির সঙ্গে ঘ্যাঁট উদরস্থ করে বাড়িতে তালা লাগিয়ে জাতীয় গ্রন্থাগারে যেতেন, সেখানে সারাদিন থাকতেন, বই পড়তেন, নোট করতেন, আবার অপরাহ্নে বাড়ি ফিরে আসতেন। রাত্রে রান্নার পাট নেই। রান্নাঘরে তাকের ওপর সারি সারি গোয়ালিনী মার্কা গাঢ় দুধের টিন সাজানো থাকত, তারি একটা টিন নিয়ে তাতে ফুটো করে ফুটোতে মুখ লাগিয়ে চোঁ চোঁ করে দুধ খেয়ে টিন ফেলে দিতেন। তারপর পড়ার ঘরে গিয়ে আলো জেবলে আবার পড়তে বসতেন। পড়ার ঘরে আর একটি অতিরিক্ত খাটে বিছানা ছিল, প্রয়োজন বোধ করলে বিছানায় শুয়ে পড়তেন।

মথুরানাথ ছিলেন ইতিহাস-প্রেমিক। জীবনে অন্য কোনো প্রকার প্রেম আসেনি; স্ত্রী ছিলেন প্রখরভাষিণী ছিদ্রান্বেষিণী মহিলা, তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন স্বামীকে শান্তি দেননি। তাঁর মৃত্যুর পর মথুরানাথ স্বয়ংসিদ্ধ হয়ে ইতিহাসের গবেষণায় মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে তাঁর গবেষণার ফল বিলিতী অভিজাত পত্রিকায় প্রকাশিত হতো, বিলেতের পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সাড়া পড়ত। কিন্তু বাংলাদেশে তাঁর বিদ্যাবুদ্ধির খবর বড় কেউ রাখত না।

এই পাড়ায় তিনি ছ-সাত বছর আছেন। সকলের সঙ্গেই আলাপ-পরিচয় ছিল, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা কারুর সঙ্গে ছিল না। তিনি যখন প্রথম এ পাড়ায় আসেন তখন ভদ্র প্রতিবেশীরা তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে মানসিক স্তরভেদ এত বেশী ছিল যে. অন্তরঙ্গতা দানা বাঁধতে পারেনি, মৌখিক শিষ্টতায় আবদ্ধ হয়ে ছিল। তারপর তিনি বিপত্নীক হলে কেউ কেউ তাঁকে কন্যাদানের আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু ন্যাড়া দ্বিতীয়বার বেলতলায় যেতে রাজী হননি; সুখের চেয়ে শান্তিকেই তিনি শ্রেয় মনে করেছিলেন। তাঁর হৃদয়ের স্নেহ-মমতা অর্পিত হয়েছিল

অতীতকালের নরনারীর ওপর।

তিনি এইভাবে অতীতকালের নায়ক-নায়িকা নিয়ে মশগুল হয়ে আছেন, একদা রাত্রিকালে হঠাৎ একটি ঘটনা ঘটল।

পাড়ায় বসন্ত রায় নামে এক ভদ্রলোক বাস করতেন। মধ্যবিত্ত লোক, বয়সে মথুরানাথেরই সমকক্ষ; যা কাজকর্ম করতেন তাতে মোটের ওপর টায়ে টায়ে সংসার চলত। লোকটি অত্যন্ত বিনয়ী এবং মিষ্টভাষী, কিন্তু তাঁর চোখ দু'টি ছিল ভারি ধূর্ত। এক-দিন সন্ধ্যের পর তিনি মথুরানাথের সঙ্গে দেখা করতে এলেন, সঙ্গে তাঁর শ্যালক কালীনাথ। কালীনাথের শরীরের গড়ন ও চোখের রক্তাভ চাউনি গুণ্ডার মত; সে বেশী কথাবার্তা বলে না, তার চোখের চাওয়া নীরব তিরস্কারেই কাজ হয়।

মথুরানাথ তাঁদের নিয়ে গিয়ে পড়বার ঘরে বসালেন। পড়ার ঘরের দেয়ালগুলি বই-এর আলমারি দিয়ে ঢাকা, মাঝখানে টেবিল-চেয়ার, পাশে একটি সরু লোহার খাট।

তিনজনে উপবিষ্ট হবার পর বসন্তবাবু একটু কেশে বিনীতকণ্ঠে বলেন—'মথুরা-বাবু, বড় ঠেকায় পড়ে আপনার কাছে এসেছি। একটু উপকার করতে হবে।'

'কি ব্যাপার?'

'আর বলেন কেন! ছা-পোষা মানুষ, কোনোমতে শাক-ভাত খেয়ে বেঁচে আছি, তার ওপর এই বিপদ। আমার মা আর শাশুড়ী দু'জনেই কাশীবাস করেন, একসঙ্গে থাকেন। আজ বিকেলবেলা 'তার' পেলাম তাঁরা দু'জনে গঙ্গাস্নান করে ফিরছিলেন, একটা মোটর-কার তাঁদের ধাক্কা দিয়ে ফেলে চলে যায়। দু'জনেরই এখন-তখন অবস্থা। আজ রাত্রেই স্ত্রীকে নিয়ে কাশী যাচ্ছি; এই আমার শালা কালীনাথ, ওকেও সঙ্গে নিচ্ছি। কিন্তু মুশকিল হয়েছে সুষমাকে নিয়ে।'

মথুরনাথ চোখে উদ্বিগ্ন জিজ্ঞাসা নিয়ে চেয়ে রইলেন। বসন্তবাবু তখন বিস্তারিত করে বললেন—'আমার মেয়ে সুষমা। তাকে আপনি নিশ্চয় দেখেছেন। আমার একমাত্র সন্তান। ভারি ভীতু মেয়ে, ওকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই না। এমনিতেই তো বিপদের পাহাড় মাথার ওপর ভেঙে পড়েছে, ওকে তার মধ্যে নিয়ে যেতে মন সরচে না। তাছাড়া খরচের কথাটাও ভাবতে হয়। এই ব্যাপারে কত যে খরচ হবে ভেবে দিশপাশ পাচ্ছি না।'

মথুরানাথ বোধহয় বসন্তবাবুর অভিপ্রায় অনুমান করতে পেরেছিলেন, শঙ্কিত স্বরে বললেন—'মেয়েটির বয়স কত?'

বসন্তবাবু তাচ্ছিল্যভরে বললেন—'কত আর হবে, বড়জোর পনেরো-ষোল; একেবারে ছেলেমানুষ। ওর জন্যেই আপনার কাছে এসেছি মথুরাবাবু। আমরা আজ যাচ্ছি, পরশু নাগাদ আমি কিংবা কালীনাথ ফিরে আসব। এই দুটো রাত্তিরের জন্যে সুষমাকে আপনার বাড়িতে রাখতে হবে।'

মথুরানাথ অত্যন্ত বিব্রত হয়ে বললেন—'কিন্তু—কিন্তু—আমি একলা থাকি, আমার বাসায় আর কেউ নেই—'

যেন ভারি হাসির কথা এমনিভাবে হেসে বসন্তবাবু বললেন—'কী যে বলেন আপনি! সুষমা আপনার মেয়ের বয়সী। আর, আপনাকে পাড়ার কে না চেনে। দেবতুল্য লোক। সেই জন্যেই তো নিশ্চিন্দি হয়ে আপনার কাছে মেয়ে রেখে যাচ্ছি—'

'কিন্তু—কিন্তু—পাড়ায় যাঁরা পরিবার নিয়ে থাকেন তাঁদের কারুর কাছে রেখে গেলেই তো—'

'তাঁদের কাছে রেখে যেতে সাহস হয় না মথুরাবাবু। সকলের বাড়িতেই উচক্কা বয়সের ছেলে আছে। কার মনে কী আছে কে বলতে পারে!'

'কিন্তু—কিতু—'

সজ্জন ব্যক্তি হবার একটা অসুবিধা এই যে, অন্যায় অনুরোধ-উপরোধ এড়াবার কৌশল জানা থাকে না। মথুরানাথ শেষ পর্যন্ত অপ্রসন্ন মনে রাজী হলেন। বেশ শান্তিতে ছিলেন তিনি, এ আবার কী ফ্যাসাদ!

ফ্যাসাদ যে কতখানি দূরপ্রসারী তা তিনি তখনো ভাবতে পারেননি।

বসন্তবাবু উচ্ছ্বসিত ধন্যবাদ দিতে দিতে শ্যালককে নিয়ে চলে গেলেন এবং অল্পক্ষণ পরেই সুষমাকে নিয়ে ফিরে এলেন। সুষমার হাতে একটি ছোট সুট্‌কেস, সম্ভবত তার মধ্যে তার নিত্য ব্যবহারের জামা কাপড় আছে।

সুষমাকে মথুরানাথ রাস্তায় যাতায়াত করতে দেখেছেন কিন্তু ভাল করে লক্ষ্য করেননি; সে নেহাত কিশোরী নয়, বয়স অন্তত উনিশ-কুড়ি। সুন্দরী নয়; আমাদের দেশে প্রকৃত সুন্দরী মেয়ে খুব বেশী নেই, কিন্তু সুশ্রীতার নানা প্রকারভেদ দেখা যায়। সুষমার এক ধরনের সুশ্রীতা আছে যাকে যৌবনসুলভ স্বাস্থ্যের সুশ্রীতা বলা চলে। তার চোখ দু'টিও বেশ কথা কইতে পারে।

সে একবার মথুরানাথের পানে তিরছ নয়নে চেয়ে চোখ নীচু করল। বসন্তবাবু বললেন—'সুষমা বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছে, আজ রাত্তিরে ওর আর কিছু দরকার হবে না। আচ্ছা, আমি তাহলে আর দেরি করব না, এখনি পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে স্টেশনের দিকে রওনা দিতে হবে।' এক ঝলক হেসে তিনি রওনা দিলেন।

মথুরানাথ সুষমাকে নিয়ে পড়ার ঘরে এসে বসলেন। তাঁর শরীর এবং মন অস্বাচ্ছন্দ্যে ভরে উঠেছে। তিনি স্বভাবতই মেয়েদের কাছে একটু মুখচোরা, তার ওপর বর্তমান পরিস্থিতিকে ঠিক সাধারণ পরিস্থিতি বলা চলে না। বাড়িতে তিনি এবং একটি অনাত্মীয়া যুবতী ছাড়া আর কেউ নেই। এইভাবেই রাত কাটাতে হবে।

সুষমা মথুরানাথের সামনের চেয়ারে বসে আছে, মাঝে টেবিলের ব্যবধান। সুষমার মুখ বেশ প্রফুল্ল, সে থেকে থেকে মথুরানাথের পানে স্মিত-চকিত দৃষ্টি হেনে আবার চোখ সরিয়ে নিচ্ছে। সব মেয়েই অল্পবিস্তর অভিনয় করতে পারে, কিন্তু সুষমার ভাবভঙ্গী দেখে মনে হয়, এ বিদ্যায় সে বিলক্ষণ পটীয়সী।

মথুরানাথ নিজেকে বোঝালেন যে, মেয়েটা নিতান্তই শিশু, তার সান্নিধ্যে ভয় পাওয়া কাপুরুষতার লক্ষণ। তিনি সহজভাবে কথা বলবার চেষ্টা করলেন। —'তুমি এই ঘরে এই খাটে শোবে। অসুবিধে হবে না? মানে ভয় করবে না?'

সুষমা ফিক করে হাসল—'ভয় করবে কেন? আপনার বাড়িতে ভূত আছে নাকি?'

সুষমার গলায় একটি মিষ্টি ঝংকার আছে।

মথুরানাথ বললেন—'না, ভূত নেই। অন্তত আমি কখনো দেখিনি।'

'তাহলে ভয় করবে না।'

'যদি ইচ্ছে কর, আলো জেলে শুতে পারো।'

'চোখে আলো লাগলে আমি ঘুমোতে পারি না।'

'বেশ, যেমন তোমার ইচ্ছে।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। মথুরানাথ কথা খুঁজে পাচ্ছেন না। মেয়েটাকে শিশু মনে করা সম্ভব হচ্ছে না; তার দেহ ও মন সমান পরিপুষ্ট। সে যেন গূঢ়ভাবে তাঁর সঙ্গে রসিকতা করছে। মথুরানাথ ঘড়ি দেখলেন, সাড়ে আটটা বেজেছে। আজ পড়াশুনো হলো না, আরো আধ ঘণ্টা এইভাবে চালাতে হবে।

'আপনার বাড়িতে কেউ নেই, বিয়ে করেননি বুঝি?'

মথুরানাথ চমকে তাকালেন; দেখলেন, সুষমার চোখে কৌতুক ও কৌতূহল। সে তাঁর অতীত জীবনের কিছু জানে না। কিংবা—

প্রসঙ্গটা রুচিকর নয়, তিনি শুকনো গলায় বললেন—'বিয়ে করেছিলাম, স্ত্রী

বে'চে নেই।'

'ও—আমি জানতুম না। আপনি বুঝি ঠিকে বামুন চাকর রেখেছেন?'

বাক্যালাপের একটা নতুন সূত্র পেয়ে মথুরানাথ একটু সজীব হলেন—'বামুন চাকর নেই, আমি নিজেই সংসারের সব কাজ করি। একলা মানুষ, চলে যায়।'

'রান্নাও আপনি নিজেই করেন?'

'রান্না আর কি, চালে ডালে মিলিয়ে খিচুড়ি করি। তাই খেয়ে লাইব্রেরী চলে যাই। রাত্তিরে রান্নার হাঙ্গামা নেই, এক টিন কন্‌ডেন্‌স্‌ড্‌ মিল্ক খেয়ে নিই।—কিন্তু ও কথা থাক, কাল থেকে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। তুমি সকালে ঘুম থেকে উঠে কি খাও বলো দেখি।'

'চা খাই।' সঙ্গে মুখটেপা হাসি।

'চা!' মথুরানাথ বিব্রতভাবে চারিদিকে তাকালেন—'চায়ের ব্যবস্থা তো নেই। আচ্ছা, হয়ে যাবে। বিকেলবেলাও চা খাও?'

সুষমা হাসিমুখে ঘাড় নাড়ল—'হ্যাঁ।'

'হুঁ। তুমি রান্না করতে জানো?'

'ভাত আর আলুভাতে রাঁধতে জানি।' সুষমার মুখে কপট কৃতিত্বের গর্ব। মথুরানাথ মনে মনে বিরক্ত হলেও মুখে হাসি টেনে আনলেন—'তোমাদের বাড়িতে রাঁধে কে?'

'মা রাঁধে। আমাকে শেখায়নি, আমি কি করব!' সুষমা একটু ঠোঁট ফোলায়।

গেরস্ত ঘরের মেয়েকে মা রাঁধতে শেখায় না এমন মা বাংলাদেশে দুর্লভ। সুষমা বোধহয় নিজে ইচ্ছে করেই রাঁধতে শেখেনি। শিখলেই তো রাঁধতে হবে। মথুরানাথের মন সুষমার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে তিনি প্রশ্ন করলেন—'বই পড়ার অভ্যেস আছে?'

'বই!' সুষমার কণ্ঠস্বরে নৈরাশ্য ফুটে উঠল—'বাংলা গল্পের বই পড়েছি দু'-চারখানা।'

'সিনেমা দেখতে ভাল লাগে?'

সুষমার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল—'হ্যাঁ, খুব ভাল লাগে। কিন্তু বেশী দেখতে পাই না, বাবা পয়সা দেয় না।' সে আশান্বিত চোখে মথুরানাথের পানে চেয়ে রইল, কিন্তু তিনি উচ্চবাচ্য করলেন না।

ন'টা বাজল; মথুরানাথ উঠে পড়লেন—'আচ্ছা, তুমি এবার শুয়ে পড়। ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিতে পারো।'

সুষমাও উঠে দাঁড়িয়েছিল। মথুরানাথ দেখলেন, সে মিটিমিটি হাসছে; তার চোখের মধ্যে একটা দুষ্ট অভিসন্ধি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। মথুরানাথ আর দাঁড়ালেন না, নিজের শোবার ঘরে গিয়ে দোর বন্ধ করলেন। সাধারণত রাত্রি সাড়ে দশটা পর্যন্ত তিনি লেখাপড়া করেন, আজ আর তা হলো না। ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত স্নায়ুমণ্ডল নিয়ে তিনি আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন।

বেশ কয়েকবার এপাশ ওপাশ করার পর তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু মনটা সতর্ক ছিল; খুটখুট শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি বিছানায় উঠে বসলেন, বালিশের পাশে হাতঘড়ি রাখা ছিল, তুলে চোখের কাছে এনে দেখলেন সওয়া বারোটা। তিনি উৎকর্ণ হয়ে দোরের পানে চেয়ে রইলেন।

আবার খুটখুট শব্দ। মথুরানাথ উঠে সুইচ টিপে আলো জ্বাললেন, তারপর দোর খুললেন। দোরের সামনে সুষমা দাঁড়িয়ে আছে; তার খোঁপা খুলে গিয়ে কাঁধের ওপর এলিয়ে পড়েছে, পরনের শাড়ি শিথিলভাবে গায়ে জড়ানো। ভৎর্সনার চোখে চেয়ে

সুষমা ঠোঁট ফোলাল। ঠোঁট ফোলালে তাকে ভাল দেখায় তা বোধহয় সে জানে।

মথুরানাথ বললেন—'কী?'

'ঘুম আসছে না।'

'সেকি! বারোটা বেজে গেছে এখনো ঘুমোওনি!'

'না, কিছুতেই ঘুম আসছে না।'

স্নায়ুর উত্তেজনা। নতুন জায়গায় নতুন বিছানায় শুলে অনেকের ঘুম আসে না। মথুরানাথ একটি ছোট হোমিওপ্যাথির বাক্স রাখতেন, বললেন—'দাঁড়াও আমি ওষুধ দিচ্ছি, খেলেই ঘুম আসবে।'

তিনি ঘরে ফিরে গিয়ে ওষুধের বাক্স খুলে দেখছেন 'কফিয়া' আছে কিনা, সুষমাও ঘরে ঢুকল, এদিক ওদিক চোখ ফিরিয়ে দেখতে লাগল। এ ঘরের খাট বেশ চওড়া, দু'-জনের শোয়ার উপযোগী; এটি মথুরানাথের অতীত দাম্পত্য জীবনের পরিশিষ্ট।

মথুরানাথ সুষমাকে ঘরের মধ্যে দেখে মনে মনে ভাবলেন, মেয়েটা যেন কেমনধারা—লজ্জা-সংকোচ নেই। আসলে শিক্ষাদীক্ষার অভাব। কিংবা—

তাঁর বুকের রক্ত সহসা চঞ্চল হয়ে উঠল। সুষমা তাঁর খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তিনি বাক্স থেকে শিশি বার করে বললেন—'হাত পাতো।'

সুষমা হাত পাতলো, তিনি তার হাতের তেলোয় কয়েকটি গুলি দিয়ে বললেন—'নাও, খেয়ে ফেল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘুম এসে যাবে।'

গুলি মুখে দিয়ে সুষমা ভর্ৎসনাভরা চোখে মথুরানাথের পানে চাইতে চাইতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মথুরানাথ একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। কিন্তু নিশ্বাসটা স্বস্তির কিংবা আক্ষেপের তা তিনি নিজেই বুঝতে পারলেন না।

ভোর পাঁচটার সময় মথুরানাথের ঘুম ভাঙল। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে দেখলেন সুষমার দোর তখনো বন্ধ, ঘরের মধ্যে সাড়াশব্দ নেই। মথুরানাথ ক্ষণেক দাঁড়িয়ে চিন্তা করলেন। আজ আর ঝাঁট দেওয়া চলবে না, ঝাঁটার শব্দে সুষমার ঘুম ভেঙে যেতে পারে।

তিনি নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে আলমারি খুললেন। আলমারিতে তাঁর কাপড়চোপড় টাকাকড়ি সবই থাকে। তিনি কিছু টাকা এবং একটি থার্মোফ্লাস্ক নিয়ে নিঃশব্দে বাড়ি থেকে বেরুলেন।

অনতিদূরে একটি চায়ের দোকান। সেখানে দু'পেয়ালা চা থার্মোফ্লাস্কে ভরে নিয়ে, কিছু কেক ও ক্রীম বিস্কুট কিনে তিনি বাড়ি ফিরে এলেন।

বাড়ি নিশুতি, সুষমা এখনো ওঠেনি। মথুরানাথ চা বিস্কুট প্রভৃতি রান্নাঘরে রেখে বাথরুমে ঢুকলেন। কাজ এগিয়ে রাখা ভাল। মেয়েটা কখন ঘুম থেকে উঠবে ঠিক নেই।

দাড়ি কামানো স্নান ইত্যাদি সেরে বেরুতে সাড়ে ছ'টা বাজল। সুষমা এখনো ওঠেনি। রাত্রে ঘুম হয়নি বলেই বোধহয় উঠতে দেরি হচ্ছে।

একটা কথা মনে পড়ে গেল। মথুরানাথ রান্নাঘরে গিয়ে উঁচু তাক থেকে বহুকালের অব্যবহৃত পেয়ালা পিরিচ প্রভৃতি বার করলেন। সেগুলোকে ধুয়ে পরিষ্কার করে আলাদা করে রাখলেন; কেক ও বিস্কুট প্লেটে সাজালেন। তারপর রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

সাতটা বাজতে বেশী দেরি নেই। মথুরানাথের মন হঠাৎ অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। এত ঘুমোয় কেন মেয়েটা? তিনি গিয়ে সুষমার দোরে টোকা দিলেন।

মিনিটখানেক পরে সুষমা দোর খুলল। ঘুম-ঘোলাটে চোখ, মুখে বিরক্তি আর অসন্তোষ। মথুরানাথ বললেন—'তুমি উঠছ না দেখে ভাবনা হচ্ছিল। আমি পাঁচটার সময় উঠেছি, তোমার চা এনেছি।'

সুষমা উত্তর দিল না। নিজের ব্যাগটা নিয়ে বাথরুমের দিকে চলল। মথুরানাথ পিছন থেকে ডেকে প্রশ্ন করলেন—'ওষুধ খাবার পর রাত্তিরে ঘুমিয়েছিলে তো?'

এবারও সুষমা উত্তর দিল না, বাথরুমে ঢুকে সশব্দে দোর বন্ধ করে দিল। অসময়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিলে তার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।

সাড়ে সাতটার সময় সুষমা বাথরুম থেকে বেরুল। ভিজে চুল পিঠে ছড়ানো, পরনে পাটভাঙা শাড়ি ব্লাউজ, মুখে হাসি। মিষ্টি সুরে বলল—'কাল ঘুমোতে এত দেরি হলো যে কিছুতেই সকালে ঘুম ভাঙছিল না। আপনি সাতসকালে উঠে আমার জন্যে চা নিয়ে এলেন, আমার ভারি লজ্জা করছে। চা নিশ্চয় জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে।'

মথুরানাথ বললেন—'চা থার্মোফ্লাস্কে আছে, ঠাণ্ডা হয়নি। তুমি রান্নাঘরে গিয়ে চা-কেক খাও, আমি বাজারে চললাম।'

'বাজারে যাবেন!'

'হ্যাঁ। বাড়িতে চাল ডাল ছাড়া আর কিছু নেই।'

কয়েকটা থলি নিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন। সুষমা চায়ের ফ্লাস্ক ও কেকের প্লেট নিয়ে নিজের ঘরে গেল, টেবিলের সামনে বসে তরিবত করে চা ঢেলে খেতে লাগল। বাড়ির চায়ের চেয়ে দোকানের চা সুষমার বেশী ভাল লাগে; বিশেষত তার সঙ্গে যদি কেক থাকে।

এক ঘণ্টা পরে মথুরানাথ বাজার থেকে শাক-সবজি মাছ চায়ের প্যাকেট গুঁড়ো মসলা ইত্যাদি কিনে বাড়ি ফিরলেন; এসেই কুটনো কুটে রান্না চড়িয়ে দিলেন। সুষমা একবার আধমনাভাবে সাহায্য করার প্রস্তাব করল, কিন্তু তিনি কান দিলেন না। সুষমাও বেঁচে গেল।

ডাল ভাত একটা চচ্চড়ি ও মাছের ঝোল রাঁধতে সাড়ে এগারোটা বেজে গেল। মথুরানাথ আজ ডাল ভাত খেলেন, নিজের জন্যে আলাদা ঘ্যাঁট রাঁধলেন না। তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে বললেন—'তুমি ধীরে-সুস্থে খাও, আমি লাইব্রেরী চললাম।'

'অ্যাঁ—কখন ফিরবেন?'

'বিকেলবেলা।'

'সারাদিন আমি একলা থাকব?' সুষমার স্বরে শঙ্কা ফুটে উঠল।

মথুরানাথ থমকে গেলেন, তারপর সাহস দিয়ে বললেন—'ভয় কি! সদর দোর বন্ধ রেখো, আমি না ফেরা পর্যন্ত খুলো না।'

'কিন্তু সারাদিন আমি একলা কি করব?'

'যদি ঘুম পায় ঘুমিও। নয়তো বই পড়তে পারো, আমার আলমারিতে অনেক বই আছে।—আচ্ছা।'

মথুরানাথ লাইব্রেরী চলে গেলেন।

কিন্তু লাইব্রেরীতে গিয়ে তিনি মনে স্বস্তি পেলেন না। বার বার মনটা বাড়ির দিকে ফিরে যেতে লাগল। বসন্তবাবু বিশ্বাস করে মেয়েকে তাঁর জিম্মায় রেখে গেছেন... পাড়ায় দুষ্টু বজ্জাত ছোঁড়া নিশ্চয় দু'চারটে আছে, তারা যদি...মেয়েটার স্বভাব-চরিত্র কেমন তা তিনি আঁচ করতে পারছেন না, কখনো মনে হয় ভাল, কখনো মনে হয় শিকারী মেয়ে...স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে মথুরানাথের অজ্ঞতা অপরিসীম...মথুরানাথের কটুভাষিণী স্ত্রী পদে পদে স্বামীর ছিদ্রান্বেষণ করতে ভালবাসতেন, তাঁর তুলনায় সুষমা অনেক ভাল...কিন্তু তার চোখের দৃষ্টিতে কী যেন আছে—

লেখাপড়ায় মন বসল না। চারটে বাজার আগেই তিনি লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

সুষমা তাঁকে দেখে একগাল হাসল—'আপনি এলেন! বাব্বা বাঁচলুম। চা তৈরি করব?'

'তুমি চা তৈরি করতে জানো?'

'জানি। চা তৈরি করা মোটেই শক্ত নয়।'

'তুমি নিজের জন্যে তৈরি করো। আমি চা খাই না।'

'একটুও খাবেন না?'

'আচ্ছা দিও এক পেয়ালা।'

পড়ার ঘরে বসে চা-পর্ব সম্পন্ন হলো। তারপর সুষমা মথুরানাথের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আদুরে সুরে বলল—'আমাকে সিনেমা দেখতে নিয়ে যাবেন? কতদিন যে ছবি দেখিনি।'

মথুরানাথ এমনভাবে তাকালেন, যেন সিনেমার নাম আগে কখনো শোনেননি—'সিনেমা! কোথায়?'

সুষমা বলল—'পাড়াতেই চিত্রালি সিনেমা হাউস, সেখানে একটা খুব ভাল ছবি দেখাচ্ছে। যাবেন?'

'কিন্তু—রান্নাবান্না করতে হবে না? রাত্রে খাবে কি?'

'কেন, সিনেমা দেখার পর হোটেলে খেয়ে নিলেই হবে।'

মথুরানাথের মন চাইছিল না, কিন্তু তিনি ভাবলেন, আজকের দিনটা বই তো নয়। বললেন—'বেশ চলো। আমি সবাক ছবি কখনো দেখিনি, ছেলেবেলায় নির্বাক বায়স্কোপ দু'একবার দেখেছি।'

মথুরানাথ সুষমাকে নিয়ে চিত্রালি সিনেমায় গেলেন। ভেস্টিবুলে পাড়ার কয়েকজন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হলো, মথুরানাথ একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন, যেন অবৈধ কাজে ধরা পড়েছেন। তাড়াতাড়ি টিকিট কিনে সুষমাকে নিয়ে প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে বসলেন।

পিছন দিকের সীট, দর্শক বেশী নেই। মথুরানাথ যেখানে বসেছেন তার আশেপাশে অন্য দর্শক নেই।

ঘর অন্ধকার হলো, ছবি আরম্ভ হলো। নানা রসের সমাবেশে ছবিটি বেশ সুস্বাদু হয়েছে। মূলে আছে একটি প্রেমের কাহিনী, দেখতে দেখতে মথুরানাথের মন বেশ আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। পর্দার ওপর নায়ক-নায়িকার প্রেম ঘনীভূত হয়ে একটা চরমাবস্থার নিকটবর্তী হচ্ছে এমন সময় মথুরানাথ অনুভব করলেন, সুষমার একটা হাত এসে তাঁর হাতের মধ্যে প্রবেশ করল। মথুরানাথ হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেলেন, তারপর আস্তে আস্তে নিজের হাত সরিয়ে নিয়ে কোলের ওপর রাখলেন। তিনি ছবির পর্দার দিকেই চেয়ে রইলেন বটে, কিন্তু ছবির দৃশ্যগুলি তাঁর চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে গেল; তিনি মোহাচ্ছন্নের মত শুনতে লাগলেন, একটা গান কে যেন গাইছে—মধুর যুবতিজন সঙ্গ, মধুর মধুর রসরঙ্গ—

ছবি শেষ হলে মথুরানাথ বাইরে এলেন, কিন্তু সুষমার মুখের পানে তাকাতে পারলেন না। সুষমার লজ্জা-সংকোচ নেই, সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল—'কি সুন্দর ছবি! একবার দেখে মন ভরে না। আপনার ভাল লেগেছে?'

মথুরানাথ নীরস স্বরে বললেন—'হ্যাঁ।—হোটেল কোথায়?'

সুষমা বলল—'এই যে কাছেই। আসুন আমার সঙ্গে।'

হোটেলটি ভাল। সেখানেও দু'একজন পাড়ার লোকের সঙ্গে দেখা হলো, তারা সুষমাকে মথুরানাথের সঙ্গে দেখে ভুরু তুলে চাইল। মথুরানাথ হোটেলে খেতে এসেছেন, সঙ্গে যুবতী—দৃশ্যটা বিস্ময়কর।

আহার শেষ করে বাড়ি ফিরতে দশটা বাজল। বাড়িতে ফিরেই তিনি নিজের ঘরে ঢুকে পড়লেন, দোর বন্ধ করতে করতে অস্পষ্ট স্বরে বললেন—'শুয়ে পড় গিয়ে। রাত হয়েছে।'

বিছানায় শুয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন, আজ রাত্রিটা কাটলে বাঁচা যায়। কিন্তু

কাল যদি ওর বাপ না আসে? যাদের দেখতে গিয়েছে তারা যদি মরে যায় তাহলে কি এত শীগ্‌গির ফিরতে পারবে? এইভাবে কতদিন চলবে...মনের উদ্বেগ বাড়তে লাগল। মেয়েটার চালচলন যেন কেমনধারা। আজকালকার মেয়েদের ভাবভঙ্গী তিনি কিছুই বুঝতে পারেন না; তাদের পর্দা না থাক, সম্ভ্রম শালীনতাও কি থাকবে না! যুবতী মেয়েদের এমন নিরঙ্কুশ গায়ে-পড়া ভাব কি ভাল! আর একটা কথা, সুষমার ঠাকুরমা ও দিদিমা গুরুতর রকম আহত হয়ে মরমর অবস্থায় রয়েছেন, কিন্তু কই, তার তো কোনো উৎকণ্ঠা নেই! একবার তাঁদের নাম উচ্চারণ পর্যন্ত করল না। সুষমা ভদ্রঘরের মেয়ে, কিন্তু তার মন-মেজাজ স্বভাব-চরিত্র কেমন?

এ প্রশ্নের উত্তর মথুরানাথ অবিলম্বে পেলেন। হোটেলের অনভ্যস্ত খাবার খেয়ে তাঁর পেটের মধ্যে কিঞ্চিৎ আন্দোলন শুরু হয়েছিল, মস্তিষ্কও যথেষ্ট উত্তেজিত, তাই ঘুম আসছিল না। সাড়ে এগারোটা বেজে যাবার পর তিনি উঠে জল খেলেন, তারপর শুনতে পেলেন—দরজায় আবার সেই খুটখুট শব্দ। একটু দ্বিধার পর তিনি দরজা খুললেন।

সুষমা দাঁড়িয়ে আছে। আজ তার বেশবাস আরো শিথিল। আঁচলটা মাটিতে লুটোচ্ছে। ঠোঁট ফুলিয়ে মথুরানাথের পানে চাইল। তার দৃষ্টির মর্মার্থ এতই স্পষ্ট যে, তা বুঝতে মথুরানাথের তিলমাত্র কষ্ট হলো না। তিনি সশব্দে দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি লাগিয়ে দিলেন, তারপর বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন। তাঁর মনে হলো কে যেন তাঁর গলা চেপে ধরে শ্বাসরোধের চেষ্টা করছে।

পরদিন সকালে মথুরানাথ বাজারে চলে গেলেন। ফিরে এসে দেখলেন সুষমা উঠেছে। কেউ কোনো কথা বলল না। মথুরানাথ রন্ধন শেষ করে নিজে আহার করলেন, সুষমার জন্যে খাবার রেখে লাইব্রেরী চলে গেলেন।

লাইব্রেরী থেকে তিনি আজ একটু দেরি করেই ফিরলেন। সুষমা মুখ ভারী করে দোর খুলে দিল। তারপর তিনি মুখ হাত ধুয়ে বেরুতেই সুষমার বাবা বসন্ত রায় এসে উপস্থিত হলেন, সঙ্গে পাড়ার দু'টি ভদ্রলোক। বসন্ত রায় একগাল হেসে হাত জোড় করলেন—'আজ দুপুরবেলা ফিরেছি। আপনার আশীর্বাদে মা এবং শাশুড়ী ঠাকরুন দু'জনেই সামলে গেছেন; কালীনাথকে রেখে আমি ফিরে এলাম। আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। আপনি খাঁটি সজ্জন তাই বিপদের সময় সাহায্য করলেন।' সঙ্গীদের দিকে ফিরে বললেন—'দেখছেন তো, সাক্ষাৎ দেবতুল্য মানুষ। উনি দু'-রাত্তিরের জন্যে জায়গা না দিলে কোথায় রাখতাম মেয়েটাকে বলুন তো। তা আর কষ্ট দেবো না, সুষমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

সুষমা কাছে এসে দাঁড়াল। তার মুখ বিমর্ষ, চোখে ছলছল বিষণ্ণতা। বসন্তবাবু তার পানে একবার তীক্ষ্ম চোখে চাইলেন, তারপর আরো খানিকটা মসৃণ চাটুবাক্য বলে মেয়েকে এবং সঙ্গীদের নিয়ে চলে গেলেন।

মথুরানাথ ভাবলেন, ফাঁড়া কাটল। তবু তিনি একটা নিশ্বাস ফেললেন। হঠাৎ দু'দিনের জন্যে তাঁর জীবনে একটা নাটকীয় তীক্ষ্মতা এসেছিল। নাটক শেষ হবার আগেই যেন পর্দা পড়ে গেল।

তিন দিন নিরুপদ্রবে কাটল। মথুরানাথের জীবন আবার অভ্যস্ত খাতে প্রবাহিত হতে লাগল। কিন্তু তাঁর মনের তপোভংগ হয়েছিল, মন সহজে আশ্বস্ত হলো না।

চতুর্থ দিন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।

সকালবেলা মথুরানাথ লাইব্রেরী যাবার জন্যে বেরুচ্ছিলেন, দোর খুলে দেখলেন সামনেই চারজন লোক দাঁড়িয়ে আছেঃ বসন্ত রায়, কালীনাথ এবং পাড়ার সেই দু'জন ভদ্রলোক। সকলের মুখেই প্রলয়ংকর গাম্ভীর্য।

হঠাৎ কালীনাথ লাফিয়ে সামনে এসে মুঠি বাগিয়ে গর্জন ছাড়ল—'ভণ্ড! লম্পট! তোমাকে খুন করব আমি।' তার লাল চোখ দুটো থেকে আগুন ঠিকরে পড়তে লাগল।

মথুরানাথ হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইলেন।

বসন্ত রায় শালাকে সরিয়ে দিয়ে তার জায়গায় এসে দাঁড়ালেন। তাঁর ভাবভংগী অন্যরকম; গভীর ভর্ৎসনাভরা চোখে চেয়ে তিনি হৃদয়বিদারক স্বরে বললেন—'আপনাকে ভদ্রলোক ভেবে আপনার কাছে আমার কুমারী মেয়েকে রেখে গিয়েছিলাম, আপনি এই করলেন! ছি ছি ছি!'

পাড়ার ভদ্রলোক দু'জন দুঃখিত গাম্ভীর্যের সংগে মাথা নাড়লেন। অর্থাৎ, ছি ছি ছি।

এদের ক্রোধ এবং ধিক্কারের অন্তরালে যে অকথিত অভিযোগ আছে, মথুরানাথ হতভম্ব অবস্থাতেও তা অনুভব করলেন, তাঁর মাথার মধ্যে হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠল। এরা শুধু অকৃতজ্ঞই নয়, সাক্ষীসাবুদ এনে তাঁকে মিথ্যে অপরাধের জালে ফাঁসাতে চায়। তিনি কঠোর স্বরে বললেন—'কি বলতে চান আপনারা?'

কালীনাথ বসন্ত রায়কে সরিয়ে দিয়ে সামনে এল, দু'হাত আস্ফালন করে চীৎকার করল—'কি বলতে চাই জানো না তুমি, নচ্ছার ছোটলোক কোথাকার! আমার ভাগনীর সর্বনাশ করেছ! যদি ভদ্রলোকের রক্ত শরীরে থাকে তাকে বিয়ে করতে হবে।—নইলে—' কালীনাথ মথুরানাথের মুখের সামনে মুঠি নাড়তে লাগল।

ভদ্রলোক দু'টি এই সময় গতিক ভাল নয় দেখে গমনোদ্যত হলেন, সম্ভবত দাংগা-হাংগামায় জড়িয়ে পড়তে চান না। তাই দেখে বসন্ত রায় কালীনাথকে বললেন—'চলে এস ভাই, চলে এস। আমরা যে ভদ্রলোক সে কথা যেন ভুলে না যাই। প্রকাশ্য কেলেংকারীতে আমাদের মুখ উজ্জ্বল হবে না। যা করবার আমরা আইনসংগত ভাবে করব।' তিনি কালীনাথের হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন।

কালীনাথ চলে যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে তর্জন ছাড়ল—'রেপ-কেস আনব তোমার নামে, লোচ্চা লম্পট কোথাকার!'

চারজনে চলে গেল। মথুরানাথের আর লাইব্রেরী যাওয়া হলো না, তিনি দোর বন্ধ করে ঘরে এসে বসলেন। তাঁর মাথার মধ্যে এলোমেলো চিন্তা ও রাগের ঝড় বইছে। সুষমা তাঁর নামে মিথ্যে অভিযোগ করেছে। কিন্তু কেন? নিজের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল তাই প্রতিশোধ নিচ্ছে? কিন্তু এ যে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভংগ! সুষমা কেমন মেয়ে? ফাঁদে ফেলে তাঁকে বিয়ে করতে চায়!

হঠাৎ তাঁর মনে হলো, শুধু সুষমা নয়, তার বাপ মামা সবাই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে। সোজাসুজি বিয়ের প্রস্তাব করলে তিনি রাজী হতেন না, তাই তাঁকে ধরবার জন্যে ফাঁদ পেতেছে। তাঁকে ভয় দেখিয়ে বিনা খরচে মেয়ের বিয়ে দিতে চায়। কী সাংঘাতিক লোক ওরা!

তবু মথুরানাথের মনের কোণে সুষমার জন্যে একটু নরম স্থান আছে। সুষমা

তাঁকে চেয়েছে; হয়তো বাপ এবং মামার ওসকানিতে তাঁর নামে মিথ্যে দুর্নাম দিয়েছে। তবু দুটো রাত্রির কথা তিনি ভুলতে পারেন না। সুষমা তাঁকে চেয়েছিল।—

তারপর কিছুদিন সুষমার বাপ ও মামা আর কোনো হাংগামা করল না। কিন্তু অন্য এক বিপদ হয়েছে। প্রত্যহ রাত্রে মথুরানাথ সুষমাকে স্বপ্ন দেখেনঃ তাঁর খাটের পাশে সুষমা এসে দাঁড়িয়েছে; তার বুকের আঁচল খসা; চোখে অভিমান-ভরা ভর্ৎসনা। আবার স্বপ্ন দেখেন, তিনি সিনেমা দেখছেন, প্রেক্ষাগৃহ অন্ধকার. সুষমার একটি হাত নিঃশব্দে এসে তাঁর মুঠির মধ্যে প্রবেশ করল...

একটি একটি করে দিন কাটছে। মথুরানাথের লাইব্রেরী যাওয়া বন্ধ হয়েছে; দিনের বেলা বাড়ি থেকে বেরোন না, সন্ধ্যের পর চুপিচুপি বেরিয়ে সংসারের প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনে আনেন। সর্বদা ভয়, পাছে চেনা লোকের সংগে দেখা হয়ে যায়। মানসিক দ্বন্দ্বে এবং দৈহিক তৎপরতার অভাবে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হতে লাগল, মনের দৃঢ়তা যেটুকু ছিল তাও ভেঙে পড়বার উপক্রম করল।

ছ' হপ্তা পরে একটি চিঠি এল; রেজিস্ট্রি করা উকিলের চিঠি। খামের ওপর ছাপার অক্ষরে সলিসিটারের নাম।

দুরুদুরু বুকে মথুরানাথ খাম খুললেন। চিঠিতে অপ্রত্যাশিত কোনো কথাই নেই, তবু তাঁর মাথায় হাতুড়ির ঘা পড়ল। উকিল মহাশয় আইনসংগত চোস্ত ভাষায় তাঁর মক্কেল বসন্ত রায়ের পক্ষ থেকে জানিয়েছেন, তাঁর অনূঢ়া কন্যার গর্ভাধানের জন্য মথুরানাথ দায়ী; তিনি যদি অচিরাৎ কন্যাকে বিবাহ না করেন তাঁর নামে দেওয়ানী এবং ফৌজদারী মামলা আনা হবে। ইত্যাদি।

মথুরানাথের মানসিক অবস্থা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। সুষমার চরিত্র এবং তার বাপের অভিসন্ধি এখন তাঁর কাছে স্পষ্ট। নষ্ট মেয়েকে তাঁর সংগে বিয়ে দিয়ে ওরা সব দিক রক্ষে করতে চায়। সুষমার ব্যভিচার বোধহয় সংগে সংগেই ধরা পড়ে গিয়েছিল, প্রকৃত অপরাধী বিয়ে করতে রাজী হয়নি। তখন, গর্ভাধানের আশঙ্কা আছে জেনে সুষমার বাপ অবিলম্বে তাকে তাঁর কাছে রেখে গিয়েছে এবং সুষমাও তাঁর ঘাড়ে দোষ চাপাবার বিধিমত চেষ্টা করেছে। মেয়েটা বিকীর্ণকামা; ইংরেজিতে যাকে বলে নিম্‌ফো; সূর্পণখার জাত।

মথুরানাথ একজন বড় সলিসিটারের অফিসে গেলেন। একটি ঘরে প্রশান্তমূর্তি একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি বসে আছেন, মথুরানাথ তাঁর সামনে বসে স্খলিতস্বরে নিজের লাঞ্ছনার কাহিনী বয়ান করলেন, উকিলের চিঠি দেখালেন। প্রসন্নমূর্তি উকিলের মুখ তিলমাত্র অপ্রসন্ন হলো না, কিন্তু তিনি যে মথুরানাথের নিষ্কলঙ্কতার কথা একটি বর্ণও বিশ্বাস করেননি তা স্পষ্ট বোঝা গেল। তিনি ধীর মন্থর স্বরে বললেন—'দেখুন, আপনি মোকদ্দমা লড়তে পারেন, কিন্তু জিতের আশা খুব কম। ওরা আটঘাট বেঁধে কাজ করেছে, আপনার নিজের মুখের কথা ছাড়া আর কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। এ অবস্থায় আমার পরামর্শ, মোকদ্দমা লড়তে যাবেন না। ফৌজদারী মামলায় যদি দোষী সাব্যস্ত হন, লম্বা মেয়াদের জন্যে জেলে যেতে হবে। খবরের কাগজে দেশ-জোড়া ঢিঢিক্কার হবে তার কথা ছেড়ে দিলাম।'

মথুরানাথ টাউরি খেতে খেতে ফিরে এলেন। মনে মনে অনেক তর্জনগর্জন করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজী হতে হলো।

রেজিস্ট্রি অফিসে বিয়ে হলো। সাক্ষী বসন্ত রায় এবং পাড়ার সেই ভদ্রলোক দু'টি। অন্য কেউ নেই, চুপিচুপি বিয়ে। সুষমার মুখ শান্ত নমিত, তাকে দেখে মনে হয় অনাঘ্রাত ফুল। মথুরানাথের ভাবভংগী ভিজে বেরালের মত, যেন চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছেন।

রেজিস্ট্রি অফিস থেকে বেরিয়ে বসন্ত রায় হাসিহাসি মুখে বললেন—'বাবাজি, যা হবার হয়ে গেছে। এখন তুমি আমার জামাই হলে—'

মথুরানাথের ভিজে-বেরাল ভাব মুহূর্তে অন্তর্হিত হলো। তিনি ক্ষেপে গেলেন; উগ্রস্বরে বললেন—'জুতো মারব তোমাকে—'

বসন্ত রায় আর মথুরানাথকে ঘাঁটালেন না, একটি বিষণ্ন নিশ্বাস ফেলে সাক্ষী-সাবুদ নিয়ে চলে গেলেন। মথুরানাথ সুষমাকে বললেন—'তুমিও বাপের সঙ্গে যাও-না। আর কি, কাজ তো হাসিল হয়ে গেছে।'

সুষমা নড়ল না, নির্বিকার মুখে মথুরানাথের পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

ট্যাক্সি ডেকে মথুরানাথ নববধূ নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন।

কাম এষ ক্রোধ এষ। শাস্ত্রে বলে, ও দুটো রিপু একই বস্তুর এপিঠ ওপিঠ। মথুরানাথের মনে এই দুই রিপুর সংযোগে যা তৈরি হয়েছিল তা স্বাভাবিক বৃত্তি নয়, উদগ্র পাশবিকতা। সে-রাত্রে সুষমা যখন তাঁর দোরের সামনে এসে দাঁড়াল তখন তিনি রূঢ়ভাবে তার হাত ধরে ঘরের ভিতর টেনে নিলেন।

মথুরানাথের জীবনের ধারা বদলে গেল, তিনি সম্ভোগের ঘোলা জলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে গেলেন।

বিয়ের সাত মাস পরে সুষমা একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল। আইনতঃ মথুরানাথ তার পিতা। তিনি পুত্রমুখ দর্শন করলেন; ছেলে দেখতে ভাল, বয়সকালে সুপুরুষ হবে। সুষমার রুচির নিন্দা করা যায় না। মথুরানাথ ছেলের নাম রাখলেন সত্যকাম। সুষমা নামের ব্যঙ্গার্থ বুঝল না, তাই আপত্তি করল না।

তারপর ধীরে ধীরে মথুরানাথের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হলো, তিনি আবার নিয়মিত লেখাপড়া ও লাইব্রেরী যাতায়াত আরম্ভ করলেন। বাড়িতে তিনি সুষমা ও ছেলেকে নিজের ঘর ছেড়ে দিয়েছিলেন, নিজে পড়ার ঘরে শুতেন। সুষমা সন্তানের যত্ন করতে জানে না, তাই দেখে তিনি একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোককে ধাই-মা রেখেছিলেন। রাইমণি শক্তসমর্থ স্ত্রীলোক, সংসারের বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখে সে ছেলে মানুষ করা ছাড়াও সংসারের অধিকাংশ কাজ নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল।

সত্যকামের বয়স যখন চার মাস তখন একদিন মথুরানাথ লাইব্রেরী থেকে বাড়ি ফিরে এসে দেখলেন সুষমা বাড়িতে নেই। তিনি রাইমণিকে জিজ্ঞেস করলেন—'সুষমা কোথায়?'

রাইমণি মুখের একটা ভঙ্গী করে বলল—'সিনেমা দেখতে গেছে গো বাবু। একটি কমবয়সী বাবু ক'দিন ধরেই দুপুরবেলা আসছিল, আজ তার সঙ্গে সিনেমা দেখতে গেছে।'

এটা নতুন খবর। মথুরানাথ খবরটি পরিপাক করে নীরব রইলেন, রাইমণির কাছে মনের কথা প্রকাশ করলেন না।

সুষমা ফিরল সন্ধ্যের পর। ভাবভঙ্গী অপরাধীর মত। মথুরানাথ নির্লিপ্তভাবে প্রশ্ন করলেন—'কার সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলে?'

সুষমা ক্ষীণ কণ্ঠে বলল—'আমার মাসতুত ভাই এসেছিল, তার সঙ্গে।'

মথুরানাথ একটু চুপ করে থেকে বললেন—'বাপের বাড়ির সঙ্গে যদি সম্পর্ক রাখতে চাও তাহলে এখানে থাকা চলবে না।'

সুষমা কাঁচুমাচু হয়ে বলল—'আর যাব না।'

সুষমার অন্য যে-দোষই থাক, সে ভাল অভিনেত্রী।

তিন দিন পরে সুষমা প্রেমিকের সঙ্গে উধাও হলো। যাকে সে মাসতুত ভাই বলে পরিচয় দিয়েছিল, আসলে সে তার প্রণয়ী এবং সত্যকামের জনক। সত্যকামকে সে নিয়ে গেল না, তার বদলে নিয়ে গেল মথুরানাথের আলমারি ভেঙে সমস্ত মজুত টাকাকড়ি। ভাগ্যক্রমে মথুরানাথ বাড়িতে বেশী টাকাকড়ি রাখতেন না, তবু তিন চারশো টাকা গেল।

বিকেলবেলা মথুরানাথ লাইব্রেরী থেকে ফিরে এলে রাইমণি বলল—'তোমার বৌ তোমাকে ছেড়ে চলে গেল গো বাবু।'

'সে কি! কোথায় গেল?'

'তা কি জানি! দুপুরবেলা সেই ভাবের মানুষটি এল, তার সঙ্গে শোবার ঘরে গিয়ে জিনিসপত্র গুছিয়ে বাক্স-পেটরা নিয়ে চলে গেল। আমি শুধোলুম—হ্যাঁ বাছা, কোথায় চললে? বৌ বলল—যেখানে মন চায় সেখানে যাচ্ছি। আমি বললুম—আর ছেলে? বৌ বলল—ছেলে মানুষ করবার জন্যে আমি জন্মাইনি। এই বলে ট্যাক্সিতে চড়ে চলে গেল।'

ছেলেটা দোলায় শুয়ে ঘুমোচ্ছিল, মথুরানাথের ইচ্ছে হলো তাকে টান মেরে রাস্তায় ফেলে দেন। কিন্তু তা না করে তিনি নিজের সাবেক শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। ঘরের অবস্থা দেখে কিছুই বুঝতে বাকি রইল না; সুষমা হাতের কাছে যা পেয়েছে সব নিয়ে চলে গেছে, আর ফিরবে না।

বিনিদ্র রাত্রি কাটিয়ে মথুরানাথ পরদিন সকালে আবার সেই সলিসিটারের কাছে গেলেন। সলিসিটার মহাশয় এবার তাঁর বয়ান শুনে বললেন—'ডিভোর্স পাওয়া কঠিন হবে না। আপনি আগে এক কাজ করুন, টাকাকড়ি যা-যা চুরি গিয়েছে তার একটা লিস্ট তৈরি করে থানায় গিয়ে সানা লিখিয়ে আসুন। তাতে আপনার ডিভোর্স কেস আরো মজবুত হবে।'

মাস ছয়েক পরে মথুরানাথ আদালত থেকে ছাড়পত্র পেলেন। পরম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তিনি বাড়ি ফিরে এলেন। তাঁর দেহ থেকে যেন একটা ক্লেদাক্ত চর্মরোগ দূর হয়েছে।

বাড়ি ফিরে এসে প্রথমেই তাঁর চোখ পড়ল ছেলেটার ওপর। সত্যকামের বয়স তখনো এক বছর পূর্ণ হয়নি, বেশ চটপটে হয়েছে, কান্নাকাটি নেই, চোখের দৃষ্টিতে বুদ্ধির প্রখরতা। মথুরানাথ আবার একটু অস্বস্তি অনুভব করলেন; ছেলেটাকে বিদেয় করতে পারলে তিনি পুরোপুরি আগের অবস্থা ফিরে পেতে পারতেন। কিন্তু আইনতঃ তার উপায় নেই। তিনি অনিচ্ছামন্থর পায়ে তার দোলার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

সত্যকাম তাঁর পানে চেয়ে ফোকলা মুখে একমুখ হাসল। তিনি তার মুখের কাছে তর্জনী বাড়িয়ে মনে মনে বললেন—'তোর অসতী মা'কে বিদেয় করেছি।' সত্যকাম খপ করে আঙুলটা ধরে মুখে পুরে চুষতে শুরু করে দিল।

রাইমণি চায়ের জল চড়াতে রান্নাঘরে ঢুকেছিল, এই সময় বেরিয়ে এসে বলল—'হ্যাঁ গো বাবু, ফারখত হয়ে গেল?'

'হ্যাঁ, পাপ দূর হয়েছে। এখন এই ছেলেটাকে নিয়ে কি করা যায় ভাবছি।'

রাইমণি গালে হাত দিয়ে বলল—'সে কি কথা গো বাবু! নিজের ছেলেকে পালবে পুষবে মানুষ করবে। মা যেমনই হোক, ছেলে তো তোমার।'

মথুরানাথ উত্তর দিলেন না, বাথরুমে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলেন।

পরদিন ভোরবেলা মথুরানাথ চা খেতে বসলেন। দু'বেলা চা খাওয়ার অভ্যাসটা আবার ফিরে এসেছে। চা খেতে খেতে তিনি রাইমণিকে বললেন—'এখানে আর আমার

থাকবার ইচ্ছে নেই রাইমণি।'

রাইমণি সায় দিয়ে বলল—'এ পাড়ায় আর না থাকাই ভাল। সবাই গাল কাত করে হাসে। আমার বাবু-সোনা বড় হবে, বুঝতে শিখবে। ওর কথাও তো ভাবতে হবে।'

মথুরানাথ বললেন—'শুধু পাড়া নয়, কলকাতাতেই আর থাকব না। শুনতে পেলাম সুষমা নাকি সিনেমা করবে বলে স্টুডিওতে ঢুকেছে।'

রাইমণি বলল—'ওমা তাই বুঝি! তা হবে। কিন্তু তুমি কলকাতা ছেড়ে কোথায় যাবে?'

'দিল্লী যাব। দিল্লীতে আমার মুখচেনা কেউ নেই, কিন্তু লাইব্রেরী আছে। তুমি যাবে রাইমণি? তুমি যদি না যাও তাহলে আমাকে অন্য লোক দেখতে হবে।'

রাইমণি অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—'না গো বাবু, আমি যাব। কলকাতা ছেড়ে যেতে মন চায় না, কিন্তু যাব। আমার আর কে বা আছে, বাবু-সোনাকে ছেড়ে থাকতে পারব না। হিল্লী-দিল্লী যেখানে হয় নিয়ে চলো।'

মথুরানাথ বললেন—'বেশ।—আর একটা কথা—সত্যকাম যেন কোনোদিন জানতে না পারে যে তার মা—'

রাইমণি জিভ কেটে বলল—'ওমা সে কি কথা! বড় হয়ে বাবু-সোনা জানবে তার মা মরে গেছে।'

তারপর মাসখানেকের মধ্যে মথুরানাথ সত্যকাম ও রাইমণিকে নিয়ে দিল্লী চলে গেলেন।

পঁচিশ বছর কেটে গেছে।

এই পঁচিশ বছরে পৃথিবীতে অনেক রদবদল হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মানুষের মন উন্মার্গগামী হয়েছে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে, পাকিস্তান জন্মগ্রহণ করেছে, অ্যাটম্ বোমা ফেটেছে, মহাশূন্যে মানুষের পদচিহ্ন অঙ্কিত হয়েছে এবং আরো অনেক বিচিত্র ব্যাপার ঘটেছে।

দিল্লীতে মথুরানাথ সত্যকামকে নিয়ে বাস করছেন। মথুরানাথ বৃদ্ধ হয়েছেন, সত্যকামের বয়স এখন ছাব্বিশ। রাইমণি সংসারের গৃহিণী হয়ে আছে।

দিল্লী আসার পর সত্যকামের প্রতি মথুরানাথের মনের ভাব ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে আরম্ভ করেছিল। ছেলেটা একদিকে যেমন বুদ্ধিমান অন্যদিকে তেমনি সুশীল। দুষ্ট পিতামাতার সন্তান সজ্জন হতে পারে ইতিহাস পুরাণে তার অনেক উদাহরণ আছে, মহর্ষি জাবালি তাদের অন্যতম। মথুরানাথ সত্যকামের গুণে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। তাঁর অন্তরে অনেকখানি স্নেহরস পাত্রের অভাবে অব্যবহৃত পড়ে ছিল, সেই বাৎসল্য তিনি সত্যকামকে অর্পণ করলেন। নিজের মনকে বোঝালেন: সুষমা আমার কেউ ছিল না, সে ছিল দুশ্চরিত্রা স্বৈরিণী; তার ছেলেও আমার কেউ নয়; মানুষ যেমন অনাথালয় থেকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করে, আমিও তেমনি সত্যকামকে পোষ্য-পুত্র নিয়েছি, সে আমার দত্তকপুত্র।

সত্যকাম যখন স্কুলে ভরতি হলো তখন মথুরানাথ তার নাম বদলে দিলেন, নতুন নাম হলো—সত্যপ্রিয়। নতুন নামই চালু হলো; মথুরানাথ সংক্ষেপে তাকে প্রিয় বলে ডাকেন, রাইমণি বলে সতু-সোনা। স্বভাবতই সে মথুরানাথকে বাবা বলে, আর রাইমণিকে

বলে মণি-মা।

স্কুলে ঢোকবার পর থেকে তার লেখাপড়ার ইতিহাস নিষ্কলঙ্কঃ প্রত্যেকটি পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়। বিজ্ঞানের দিকে তার ঝোঁক বেশী। কলেজে ঢুকে সে বিজ্ঞানের দিকেই গেল। তারপর যথাসময় জীব-রসায়নবিদ্যায় প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করে পাস করে রিসার্চ স্কলার হলো।

কলেজে একটি বাঙালী মেয়ের সঙ্গে সত্যপ্রিয়র ভাব হয়েছিল, তার নাম শর্বরী। কুড়ি বছর বয়সে বি. এস্‌সি. পাস করে সে এম. এস্‌সি. পড়ছিল, সেও জীব-রসায়নের ছাত্রী। যৌবনের স্বাভাবিক আকর্ষণ ছাড়াও একটা গভীরতর আকর্ষণ দু'জনকে পরস্পরের কাছে টেনে এনেছিল। দু'জনের প্রকৃতি একই জাতেরঃ জলের মত স্বচ্ছ, তীরের মত ঋজু। দু'জনের বুদ্ধিই বিজ্ঞানভিত্তিক, সংস্কার বা মোহের স্থান সেখানে বেশী নেই। প্রথম সাক্ষাতের দু'চার দিনের মধ্যেই তারা নিজেদের মনের অবস্থা বুঝতে পারল এবং অকপটে পরস্পরের কাছে ধরা দিল।

শর্বরী মেয়েটি দীর্ঘাঙ্গী সুগঠনা শ্যামলী। তার বাবা কেন্দ্রীয় সরকারের বড় চাকরে, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। মেয়ে কাউকে পছন্দ করে বিয়ে করতে চাইলে তিনি আপত্তি করতেন না। কিন্তু সত্যপ্রিয় এবং শর্বরী পরামর্শ করে স্থির করল, বিয়ের কোনো তাড়া নেই, পূর্বরাগের মধু পরিপূর্ণভাবে আস্বাদন করে যখন বিয়ের ইচ্ছা দুর্নিবার হবে তখন তারা বিয়ে করবে। তবে খবরটা কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে রাখলে ক্ষতি নেই।

একদিন শর্বরী সত্যপ্রিয়কে নিয়ে নিজের বাড়িতে গেল। শর্বরীর মা-বাবা তাকে দেখলেন, তার সঙ্গে কথা কইলেন। চেহারা পিতৃপরিচয় এবং বুদ্ধিসুদ্ধির দিক থেকে পরম সুপাত্র। মেয়ের মনের অবস্থা বুঝতেও তাঁদের কষ্ট হলো না। তাঁরা মনে মনে খুশী হলেন।

তারপর শর্বরী একটা রবিবারে সত্যপ্রিয়র বাড়িতে এল। মথুরানাথ বাড়িতে ছিলেন, ঘরে লেখাপড়া করছিলেন। সত্যপ্রিয় শর্বরীকে নিয়ে গিয়ে বলল—'বাবা, এর নাম শর্বরী—আমার ছাত্রী।'

শর্বরী প্রণাম করল, মথুরানাথ তাকে সস্নেহে কাছে বসিয়ে বললেন—'তোমাদের যে বিদ্যা তার আমি কিছুই জানি না। তবু আশীর্বাদ করি তোমার বিদ্যা যেন তোমার বুদ্ধির সহকারী হয়।'

তিনজনে একসঙ্গে বসে চা খেলেন। সাধারণভাবে গল্প করতে করতে মথুরানাথ অনুভব করলেন, এরা শুধু গুরুশিষ্যা নয়, এদের মনের সম্বন্ধ আরো ঘনিষ্ঠ। তিনি অন্তরে অন্তরে একটা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে লাগলেন। মনের অগোচর পাপ নেই। গত দু'তিন বছরে তিনি সত্যপ্রিয়র বিয়ের কথা অনেকবার ভেবেছেন। কিন্তু বিয়ে দিতে গেলেই সত্যপ্রিয়র মিথ্যা পরিচয় দিতে হবে, মিথ্যার জালে জড়িয়ে পড়তে হবে। যদি সত্যের ভগ্নাংশও প্রকাশ হয়ে পড়ে? তাঁর মন বিমুখ হয়ে ফিরে এসেছে।

সন্ধ্যের সময় সত্যপ্রিয় শর্বরীকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এল। রান্নাঘরে গিয়ে দেখল রাইমণি রান্না চড়িয়েছে। সে তার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল, বলল—'মণি-মা, আজ যে মেয়েটা এসেছিল তাকে দেখলি?'

রাইমণি ঘাড় বেঁকিয়ে সত্যপ্রিয়র পানে চাইল, তার গালের লোলচর্মে একটা খাঁজ পড়ল; সে আবার রান্নায় মন দিয়ে বলল—'তা দেখলুম বৈকি।'

'কেমন দেখলি?'

রাইমণি দন্তহীন মুখে হাসল—'কী ভাগ্যি, তোর সংসারধম্মে মন হয়েছে। তা কবে হবে?'

'তোর কেমন লাগল বল্ না!'

'ভাল রে বাপু ভাল, তোর পছন্দ কখনো মন্দ হয়! রাঙা বরের সঙ্গে কালো বউ মানায় ভাল। কর্তাকে বলেছিস?'

'এখনো বলিনি। বাবার নিশ্চয় পছন্দ হয়েছে। মণি-মা, তুই আমার হয়ে বাবাকে বলবি?'

'কেন, তোর বুঝি লজ্জা করছে?'

'লজ্জা নয়, লজ্জা কিসের? তবে—'

'আচ্ছা বলব।'

মথুরানাথকে অবশ্য বলবার দরকার ছিল না, তিনি বুঝেছিলেন। রাইমণির মুখে শুনে তিনি প্রশ্নভরা চোখে তার মুখের পানে চাইলেন; রাইমণি গলা খাটো করে বলল —'ভয় নেই গো বাবু, সতু-সোনার মায়ের কথা কেউ কিচ্ছু জানবে না।'

তবু, মনের মধ্যে নানা সংশয় নিয়ে মথুরানাথ সম্মতি দিলেন। সত্যপ্রিয়র বিয়ে যখন দিতেই হবে এবং সে যখন নিজে মেয়ে পছন্দ করেছে, তখন—

মাস দুই কেটে যাবার পর একদিন দুপুরবেলা শর্বরী আর সত্যপ্রিয় একসঙ্গে কলেজ থেকে ফিরছিল। কি একটা কারণে হঠাৎ কলেজের ছুটি হয়ে গেছে। ফাল্গুন মাসের আরম্ভে দিল্লীর শীত কমতে আরম্ভ করেছে। দু'জনে হেঁটেই বাড়ি ফিরছিল; দুপুরবেলার মিঠেকড়া রোদ্দুরটি বড় উপভোগ্য। সত্যপ্রিয় শর্বরীকে বাড়ি পেঁছে দিয়ে আসবে।

দু'জনে সৈনিকের মত একসঙ্গে পা ফেলে চলেছে। একটা পার্কের পাশ দিয়ে যেতে যেতে শর্বরী বলল—'চলো, পার্কে একটু বসা যাক।'

দুপুরবেলা পার্ক নির্জন। পাতা-ঝরা গাছের তলায় একটি বেঞ্চি, ওরা গিয়ে বসল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর শর্বরী একটু কাছে ঘেঁষে বসল, ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বলল—'আর ভাল লাগছে না।'

সত্যপ্রিয় চকিতে ঘাড় ফেরাল—'কী ভাল লাগছে না?'

শর্বরী চোখ নীচু করে একটু হাসল—'বাপের বাড়ি।'

সত্যপ্রিয় গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে সহজ জিজ্ঞাসার সুর বলল—'বাপের বাড়ি ভাল লাগছে না কেন?'

শর্বরী মুখ টিপে হাসল—'আহা, যেন বুঝতে পারনি। তোমার অবস্থা কেমন?'

সত্যপ্রিয় হেসে ফেলল, শর্বরীর একটি হাত নিজের মুঠির মধ্যে নিয়ে বলল— 'আমার অবস্থা তোমারি মত।' কিছুক্ষণ চুপ করে ভেবে নিয়ে বলল—'চলো, আজই তোমার বাবাকে বলি। তোমার বাবা যদি মাথা নাড়েন—'

শর্বরী বলল—'মাথা নাড়বেন না। মা এরই মধ্যে আমাকে লুকিয়ে বিয়ের গয়না গড়াতে শুরু করে দিয়েছেন।'

'ব্যস্, তবে আর কি!' সত্যপ্রিয় হাত ধরে শর্বরীকে টেনে তুলল—'চলো, কর্তব্য কর্ম সেরে ফেলা যাক।'

বাড়ির ফটকের কাছে এসে শর্বরী থমকে দাঁড়াল—'ওই যা, বাবা তো এখনো অফিস থেকে ফেরেননি!'

'ঠিক তো। আচ্ছা, তাহলে আমি সন্ধ্যের পর আসব।'

বাড়ি ফিরে এসে সত্যপ্রিয় ভাবল—ভালই হলো, আমার বাবাকে আগে বলা উচিত, তিনি বিয়ের দিন স্থির করে দেবেন।

মথুরানাথ তখনো লাইব্রেরী থেকে ফেরেননি। তাঁর ফিরতে পাঁচটা বাজে।

সত্যপ্রিয়র চা খাবার ইচ্ছা হলো। সে রান্নাঘরে গিয়ে দেখল রাইমণি উনুনের পাশে কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। সে তাকে জাগাল না, নিজের ঘরে এসে বিছানায় লম্বা

হলো। মনের মধ্যে শর্বরীর কথা ঘোরাফেরা করতে লাগল...বাপের বাড়ি আর ভাল লাগছে না...

চমক ভেঙে তার কানে এল, কেউ হালকা হাতে সদর দোরের ঘণ্টি বাজাচ্ছে। সত্যপ্রিয় ভাবল, বাবা ফিরেছেন। কিন্তু তাঁর তো এখনো ফেরার সময় হয়নি। তবু সে তাড়াতাড়ি গিয়ে দোর খুলল।

একটি স্ত্রীলোক। ভদ্রশ্রেণীর বাঙালী স্ত্রীলোক, কিন্তু পোশাক পরিচ্ছদ দেখে দুঃস্থ মনে হয়। বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ, যদিও সস্তা প্রসাধনের দ্বারা বয়স কমাবার চেষ্টা আছে। সে উৎকণ্ঠা-ভরা চোখে সত্যপ্রিয়র মুখের পানে চেয়ে রইল। শেষে স্খলিত কণ্ঠে বলল—'এটা কি মথুরানাথবাবুর বাড়ি?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি—তুমি কি তাঁর ছেলে?'

'হ্যাঁ। কাকে চান?'

স্ত্রীলোকটির চোখ একটু বাষ্পাচ্ছন্ন হলো, সে ঢোক গিলে বলল—'আমি—আমি তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলতে চাই।'

'আমার সঙ্গে! কী কথা?'

'ভেতরে আসতে পারি?'

সত্যপ্রিয়র মন স্ত্রীলোকটিকে দেখে অপ্রসন্ন হয়েছিল, তবু সে শিষ্টভাবেই বলল—'আসুন।'

সে তাকে বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। স্ত্রীলোকটি বলল—'তোমাকে দেখেই চিনেছি, ঠিক বাপের মত চেহারা।'

মনে বিরক্তি নিয়ে সত্যপ্রিয় চেয়ে রইল। কে এই স্ত্রীলোকটা? কী চায়?

'আমাকে তুমি চিনতে পারবে না। আমি বড় বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি। আগে জানতুম না তোমরা দিল্লীতে আছ—'

সত্যপ্রিয়র মনটা কড়া হয়ে উঠেছিল, সে ঈষৎ রুক্ষস্বরে বলল—'আপনার পরিচয় দিন আগে, তারপর বিপদের কথা শুনব।'

স্ত্রীলোকটির চক্ষু সজল হলো, সে অস্ফুট কণ্ঠে বলল—'কি বলে পরিচয় দেবো ভেবে পাচ্ছি না। আমি—তোমার মা।'

সত্যপ্রিয় চমকে উঠল, পাগল নাকি!

'কি বলছেন আপনি!'

'সত্যি কথাই বলছি বাবা, আমি তোমার মা। আমি তোমাকে পেটে ধরেছি।'

সত্যপ্রিয় নিজেকে সংযত করে বলল—'আমার মা আমি জন্মাবার পরেই মারা গেছেন। কে আপনি? কি চান?'

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সুষমা বলল—'তোমার মা মারা যায়নি, ওরা মিছে কথা বলে তোমাকে ভুলিয়েছে। তোমার বাপ আমার নামে মিথ্যে অপবাদ দিয়ে আমাকে ডিভোর্স করেছিল।'

সত্যপ্রিয়র রগের শির উঁচু হয়ে উঠল। এত বড় স্পর্ধা, তার ঋষিতুল্য পিতার নামে মিথ্যা কুৎসা করে! কিন্তু সে আত্মসংবরণ করে ধীরভাবে বলল—'ও কথা যাক। আপনি কি চান বলুন।'

সুষমার আশা হলো হয়তো ছেলের মন ভিজেছে, সে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল—'আমি বড় অভাবে পড়েছি বাবা, তাই তোমার কাছে ভিক্ষে চাইতে এসেছি। তুমি ছেলে, তুমি যদি খেতে না দাও তো কে দেবে?'

'এতদিন কে খেতে দিচ্ছিল?'

'সামান্য চাকরি করে পেট চালিয়েছি, কিন্তু এখন আর সে সামর্থ্যও নেই। দিল্লীতে এসেছিলুম চাকরির খোঁজে, তারপর খবর পেলুম তোমরা এখানে আছ। তাই সন্ধান নিয়ে তোমার কাছে এলুম—'

'ও—' সত্যপ্রিয় হঠাৎ প্রশ্ন করল—'রাইমণিকে আপনি নিশ্চয় চেনেন?'

সুষমা চকিত শঙ্কায় চোখ বিস্ফারিত করল—'রাইমণি এখনো আছে নাকি?'

'আছে। তাকে ডাকব?'

'না না, তাকে ডাকবার দরকার নেই। সে—সে আমাকে দেখতে পারে না, আমার নামে মিথ্যে সাক্ষী দিয়েছিল—।'

'তাহলে একটু অপেক্ষা করুন, বাবা এখনি লাইব্রেরী থেকে ফিরবেন।'

সুষমা গুণছেঁড়া ধনুকের মত লাফিয়ে উঠল—'অ্যাঁ, তিনি তো পাঁচটার সময় ফেরেন।'

সত্যপ্রিয় হাতের ঘড়ি দেখে বলল—'পাঁচটা বাজতে দেরি নেই। আপনি সব খবর রাখেন দেখছি।'

সুষমা বিচলিতভাবে বলল—'আমি—আমি আজ যাই, আর একদিন আসব।'

এই সময় সদর দরজার ঘণ্টি বেজে উঠল। সত্যপ্রিয় বলল—'ওই বাবা এলেন। আপনি বসুন—'

সত্যপ্রিয় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সুষমা বসল না, কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল; চোখে ভয়ার্ত দিশাহারা দৃষ্টি।

মথুরানাথ ঘরে ঢুকেই সুষমাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর মুখ সাদা হয়ে গেল। তিনি যে সুষমাকে চিনতে পেরেছেন তাতে সন্দেহ নেই।

সুষমা কিন্তু আর দাঁড়াল না, চোরের মত পাশ কাটিয়ে ঘর থেকে ছুটে পালাল।

মথুরানাথের দেহটা টলমল করে উঠেছিল, তিনি অন্ধের মত হাত বাড়িয়ে ডাকলেন—'প্রিয়—'

সত্যপ্রিয় ছুটে এসে বাপকে জড়িয়ে ধরল—'বাবা—'

মথুরানাথ বললেন—'আমি বসব।'

সত্যপ্রিয় তাঁকে টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল। তিনি কিছুক্ষণ ডান হাত দিয়ে বুকের বাঁ দিকটা চেপে বসে রইলেন, তারপর মুখ তুলে প্রশ্ন করলেন—'ও তোমাকে কিছু বলেছে?'

সত্যপ্রিয় বাপের কাছে কখনো মিথ্যে কথা বলেনি, সে একটু নীরব থেকে বলল—'উনি বললেন উনি আমার মা।'

মথুরানাথের মাথা টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ল। সত্যপ্রিয় ভয় পেয়ে ডাকল—'বাবা!' তিনি সাড়া দিলেন না।

সত্যপ্রিয় তখন চীৎকার করে ডাকল—'মণি-মা, শীগ্‌গির এস, বাবা অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন। আমি ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি।'

দু'তিনটে বাড়ির পরে ডাক্তারের বাড়ি। ডাক্তার এলে সকলে ধরাধরি করে মথুরানাথকে তাঁর শয়নঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। তারপর পরীক্ষা করে বললেন—'হার্ট অ্যাটাক। লক্ষণ ভাল ঠেকছে না। আপনারা প্রস্তুত থাকুন।' তিনি যথারীতি চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন।

সন্ধ্যের পর শর্বরী টেলিফোন করল—'কই, তুমি এলে না?'

সত্যপ্রিয় বলল—'বাবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। এখন জ্ঞান হয়েছে। ডাক্তার কিন্তু ভরসা দিচ্ছেন না। হার্ট স্পেশালিস্ট এসেছিলেন, তিনি স্পষ্টভাবে কিছু বলছেন না। বাবার হার্ট নাকি অনেকদিন থেকেই দুর্বল হয়ে ছিল,

উনি কাউকে কিছু বলেননি।'

একটু নীরব থেকে শর্বরী বলল—'আমি যাব?'

সত্যপ্রিয় একটু ভেবে বলল—'না, আজ রাত্তিরটা বাবা যদি ভাল থাকেন, কাল সকালে এস।'

'আচ্ছা।'—

রাত্রি এগারোটার সময় মথুরানাথ বিছানায় চোখ বুজে শুয়ে ছিলেন, সত্যপ্রিয় খাটের পাশে চেয়ার নিয়ে বসে তাঁর মুখের পানে চেয়ে ছিল। তিনি চোখ খুলে খুব দুর্বল স্বরে বললেন—'প্রিয়, আমাকে একটা বড়ি দাও।'

ডাক্তার বলে গিয়েছিলেন বেশী দুর্বল বোধ করলে বড়ি দিতে হবে। সত্যপ্রিয় বড়ি খাইয়ে দিল। মথুরানাথ দশ মিনিট চোখ বুজে শুয়ে রইলেন, তারপর বললেন—'প্রিয়, আমার কাছে এসে বোসো।' এবার তাঁর কণ্ঠস্বরে কিছু বলসঞ্চার হয়েছে।

প্রিয় খাটের পাশে বসল। মথুরানাথ তার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললেন—'আমার সময় হয়েছে। তোমার জন্মবৃত্তান্ত তোমাকে শোনাতে চাই। মিথ্যের বোঝা বুকে নিয়ে যদি মরি আমার সদ্গতি হবে না। তুমি বুদ্ধিমান সাহসী ছেলে, নিষ্ঠুর সত্য তুমি সহ্য করতে পারবে।'

থেমে থেমে আধ ঘণ্টা ধরে মথুরানাথ কাহিনী শোনালেন। কাহিনী শেষ করে বললেন—'প্রিয়, আইনতঃ তুমি আমার ছেলে, আমি তোমাকে ছেলের মতই ভালবাসি। আমার যা কিছু আছে সব তোমার। আমি যখন থাকব না তুমি নিজের বুদ্ধিতে যা ভাল বুঝবে তাই করবে।' ঘড়িতে বারোটা বাজল।—'এবার আমি ঘুমোব।''

মথুরানাথ চোখ বুজলেন, আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়লেন। শেষ রাত্রে তাঁর ক্লান্ত হৃদ্‌যন্ত্র ঘুমের মধ্যেই থেমে গেল।

মথুরানাথের মৃত্যুর পর কয়েক মাস কেটে গেছে। সত্যপ্রিয়র নেড়া মাথায় চুল গজিয়ে এখন প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

কিন্তু নিজের জন্মবৃত্তান্ত জানার পর তার মনে শর্বরী সম্বন্ধে একটা সংকোচ এসেছে যা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি দিয়ে দূর করা যাচ্ছে না। শর্বরীকে সে ছাড়তে পারবে না, আবার তার কাছে সত্য গোপন করাও তার পক্ষে অসম্ভব। এ অবস্থায় সে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। শর্বরীর সঙ্গে প্রায় রোজই কলেজে তার দেখা হয় কিন্তু সে আড়ষ্ট হয়ে থাকে। যে নিবিড় মানসিক ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল তা আর নেই।

শর্বরীও মন-মরা হয়ে আছে। হঠাৎ এ কী হলো! যে মানুষ এত কাছে এসেছিল সে আবার দূরে সরে যাচ্ছে কেন? পিতার মৃত্যুতে সত্যপ্রিয় দারুণ আঘাত পেয়েছে, কিন্তু তাতে তো তার আরো কাছে আসার কথা, দূরে সরে যাবে কেন? অশান্ত মন নিয়ে শর্বরী একলা ঘুরে বেড়ায়, অদৃশ্য বেড়া পেরিয়ে সত্যপ্রিয়র কাছে আসতে পারে না।

এইভাবে দিন কাটছে, একদিন দুপুরবেলা সুষমা আবার এসে উপস্থিত হলো। মুখের ভাব বেশ আত্মপ্রসন্ন, মথুরানাথের মৃত্যুর খবর নিশ্চয় জানে।

দোর খুলে সুষমাকে দেখে সত্যপ্রিয়র মুখ কঠিন হয়ে উঠল। এই তার মা! সে রূঢ় স্বরে বলল—'আবার কি চাও?'

সুষমা থতমত খেয়ে গেল, তারপর বলল—'আমি দিল্লীতে ছিলুম না, ফিরে এসে শুনলাম তোমার বাবা মারা গেছেন!'

'তাই সহানুভূতি জানাতে এসেছ! যাও, তোমার মুখ দেখতে চাই না।'

'আমি তোমার মা। আমি খেতে পাচ্ছি না, তুমি আমাকে আশ্রয় দেবে না! এখন তো আর কোনো বাধা নেই।'

'তোমার জন্যেই বাবা মারা গেছেন। মৃত্যুর আগে তিনি আমাকে সব কথা বলে গেছেন।'

সুষমার চোখ সজল হয়ে উঠল, সে বলল—'তাহলে তুমি জানো যাকে তুমি বাপ বলে মনে করেছ সে তোমার কেউ নয়।'

সত্যপ্রিয় বলল—'তিনিই আমার সব, তুমি কেউ নয়। যাও, আর কখনো আমার কাছে এস না।'

সুষমা কাঁদতে কাঁদতে বলল—'তুই এত নিষ্ঠুর! মাকে খেতে দিবি না!'

সত্যপ্রিয়র গলার স্বর হিংস্র হয়ে উঠল, সে দাঁতে দাঁত চেপে বলল—'লম্পটের ঔরসে নষ্ট স্ত্রীলোকের গর্ভে যার জন্ম তার কাছে আর কী প্রত্যাশা কর? এখন যাবে, না রাইমণিকে ডাকব? সে তোমাকে চেনে, উপযুক্ত ব্যবস্থা করবে।'

সুষমা আর দাঁড়াল না।

দোর বন্ধ করে দিয়ে সত্যপ্রিয় নিজের মাথায় কয়েক ঘটি জল ঢালল, ভিজে মাথায় অনেকক্ষণ বিছানায় শুয়ে রইল। তারপর উঠে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল।

সন্ধ্যে হয়-হয়, তখন সে মনঃস্থির করে শর্বরীকে টেলিফোনে ডাকল—'একবারটি আসবে, কিছু কথা আছে।'

কী কথা আছে শর্বরী প্রশ্ন করল না, আগ্রহ-শঙ্কামেশা গলায় বলল—'আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।'

শর্বরী এলে সত্যপ্রিয় তাকে হাত ধরে বসবার ঘরে নিয়ে গেল, বলল—'বোসো। চা খাবে? কফি? কোকো?'

শর্বরী মাথা নাড়ল—'না, কি বলবে আগে বলো।'

সত্যপ্রিয় তার সামনাসামনি চেয়ারে বসে ধীরস্বরে বলল—'আমি আজ তোমাকে যা বলব তার ওপর আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। সব কথা মন দিয়ে শোনো, তারপর তোমার মতামত জানিও।'

শর্বরী নীরবে জিজ্ঞাসুচোখে তার পানে চেয়ে রইল, সত্যপ্রিয় নির্লিপ্তকণ্ঠে নিজের বৃত্তান্ত তাকে শোনাল; সুষমা যে সম্প্রতি যাতায়াত করছে এবং তাকে কিভাবে সে তাড়িয়ে দিয়েছে তাও গোপন করল না। যেন নিজের কথা নয়, অন্য কারুর কাহিনী সে বলছে। শর্বরী একটি কথা বলল না, চুপ করে অবহিতচিত্তে যেন ক্লাসে বসে প্রবীণ অধ্যাপকের বিজ্ঞানভাষণ শুনছে এমনিভাবে শুনল।

কাহিনী শেষ করে সত্যপ্রিয় উঠে দাঁড়াল, বলল—'এই হলো আমার ইতিহাস। এখন তুমি সব দিক ভেবে বলো কী করবে।'

মিনিটখানেক শর্বরী কপালে মুঠি ঠেকিয়ে নতমুখে বসে রইল, তারপর উঠে এসে সত্যপ্রিয়র সামনে দাঁড়াল, তার গলা জড়িয়ে বুকে বুক দিয়ে ঠোঁট তুলে ধরে বলল—'চুমু খাও।'—

কিছুক্ষণ পরে শর্বরী বলল—'এখন চলো, মা-বাবা অপেক্ষা করে আছেন। ওঁদের এসব কথা কিছু বলে কাজ নেই। হাজার হোক সেকেলে মানুষ।'

অমাবস্যা

দার্জিলিং কিংবা সিমলার মত একটি শৈল-নগর। উঁচু-নীচু রাস্তা, ছবির মত বাড়ি। নগরের এক প্রান্তে খাড়া পাহাড়, তার কোলে গভীর খাদ।

একটি স্থান বন-জঙ্গলে ঢাকা, পাকা রাস্তা এখান পর্যন্ত এসে থেমে গেছে। পাহাড়ের ফাঁকে একটা সমতল পাথর খাদের ওপর ঝুঁকে আছে। লোকে বলে বাঘের জিভ। পাঁচ-ছয় হাত চওড়া, দশ-বারো হাত লম্বা পাথরটা যেন খাদের ওপর সেতু বাঁধতে গিয়ে এক-পা এগিয়েই থেমে গেছে।

একদিন অপরাহ্ণে এই কাহিনীর নায়িকা পুষ্পা একা এই বাঘের জিভের ওপর বসে গুনগুনিয়ে গান গাইছিল। পিছনে রাস্তার ওপর তার ছোট্ট টু-সীটার গাড়িটা রয়েছে। পুষ্পা থেকে থেকে উৎসুক চোখে পিছু ফিরে তাকাচ্ছে, মনে হয় সে কারুর জন্যে অপেক্ষা করছে।

দূর থেকে একটি মোটরের গুঞ্জন শোনা গেল। একটি বড় গোছের গাড়ি পুষ্পার গাড়ির পাশে এসে দাঁড়াল। চালকের আসন থেকে অবতীর্ণ হলো এক কান্তিমান যুবক, নাম দীপনারায়ণ। তাকে দেখে পুষ্পার মুখে হাসি ফুটল। দীপনারায়ণ এসে পুষ্পার পাশে বসল। বেশ বোঝা যায় তারা পরস্পরের প্রতি আসক্ত।

পুষ্পা বলল, 'কি করে জানলে আমি এখানে এসেছি?'

দীপ বলল, 'একটি ছোট্ট পাখির মুখে শুনলাম।'

তারপর দু'জনে ফষ্টিনষ্টি হাসি-মস্করায় মগ্ন হয়ে গেল।

কিন্তু বেশীক্ষণের জন্যে নয়। মৃদু মোটরহর্নের শব্দে চকিত হয়ে দু'জনেই ঘাড় ফেরাল। দেখল, তৃতীয় মোটর এসে হাজির হয়েছে এবং রাজমোহন নামক যুবা তা থেকে নামছে। পুষ্পা ও দীপের মুখ ম্লান হয়ে গেল।

রাজমোহন দীপনারায়ণের সমবয়স্ক, সে-ও সুপুরুষ, কিন্তু তার চোখের দৃষ্টিতে কুটিলতা মেশানো আছে। সে কাছে এসে দাঁড়ালে পুষ্পা মুখে একটু হাসি এনে বলল, 'তুমিও কি কাক-কোকিলের মুখে খবর পেয়েছিলে নাকি?'

রাজমোহন ভারী গলায় বলল, 'না। তোমার বাড়িতে গিয়ে শুনলাম তুমি গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছ। আমার মন বলল তুমি এখানে এসেছ, তাই চলে এলাম।'

সে তাদের সামনে বসল, তার সন্দিগ্ধ চোখ দু'জনের মুখের ওপর যাতায়াত করতে লাগল।

কিন্তু আসর আর জমল না। কিছুক্ষণ ছাড়া ছাড়া কথাবার্তা চালাবার পর পুষ্পা উঠে পড়ল, বলল, 'এবার আমায় বাড়ি ফিরতে হবে। পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বোন হয়ে জন্মানো যে কী গুরুতর ব্যাপার তা তো তোমরা জান না, সন্ধের আগে বাড়ি না ফিরলে সারা শহরের পুলিস আমাকে খুঁজতে বেরুবে।' একটু হেসে নড় করে পুষ্পা চলে গেল।

দু'জনে উঠে গিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েছিল। পুষ্পার গাড়ি দূরে অদৃশ্য হয়ে যাবার পর রাজমোহন দীপের দিকে ফিরে সহজ বন্ধুত্বের সুরে বলল, 'তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে দীপ।'

রাস্তা এবং বাঘের জিভের সন্ধিস্থলে প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গের মত একটা পাথর খাড়া দাঁড়িয়ে-ছিল, দীপ অলসভাবে তাতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'কি কথা?'

রাজমোহন বলল, 'মনে হচ্ছে তুমি পুষ্পাকে বিয়ে করতে চাও। আমিও চাই তাকে বিয়ে করতে। এখন কথা হচ্ছে কে তাকে বিয়ে করবে।'

মৃদু কৌতুকের সুরে দীপ বলল, 'বাছাবাছির ভারটা পুষ্পোর ওপর ছেড়ে দিলে হয় না?'

রাজমোহন বলল, 'না, হয় না। আমি বেঁচে থাকতে তুমি পুষ্পোকে পাবে না, তুমি বেঁচে থাকতে আমি পুষ্পাকে পাব না। এর নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। দ্যাখো, তুমি বড়মানুষ, আমারও পয়সার অভাব নেই ; আমাদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি ভাল দেখায় না। চল আমার বাড়িতে, সেখানে কথা হবে।—ভাল কথা, ওই পাথরটার ওপর অমনভাবে হেলান দেওয়া ঠিক নয়, মনে হয় ওটা যেন একটু দুলছে।'

দীপ সোজা হয়ে দাঁড়াল। পাথরটা টলমল করতে লাগল, যেন একটু ঠেলা দিলেই বাঘের জিভের ওপর দিয়ে গড়িয়ে খাদে পড়বে।

দীপ বলল, 'তোমার বাড়িতেই চল, কী তোমার প্রস্তাব শোনা যাক।'

রাজমোহনের বাড়িটি চমৎকার। সামনে বিস্তীর্ণ ফুলের বাগান। সেদিন রাজমোহনের বোন পূর্ণিমা বাগানে ফুল তুলে তোড়া বাঁধছিল, রাজমোহন ও দীপনারায়ণের মোটর আগে পিছে ফটক দিয়ে প্রবেশ করছে দেখে চোখ বিস্ফারিত করে চেয়ে রইল।

গাড়ি-বারান্দায় দু'টি গাড়ি থামল, দুজনে গাড়ি থেকে নামল। রাজমোহন তার খাস চাকর সেওলালকে ডেকে বলল, 'আমরা বসবার ঘরে যাচ্ছি, শরবত নিয়ে এস।' সেওলালকে দেখেই চেনা যায় ধূর্ত প্রকৃতির লোক।

রাজমোহন দীপকে বসবার ঘরে নিয়ে গেল। বাগানের দিকের জানলা খুলে দিয়ে দু'জনে টেবিলের দু'পাশে বসল। সেওলাল দু'গ্লাস শরবত রেখে চলে যাবার পর রাজমোহন দেরাজ থেকে দুটো ওষুধের ট্যাবলেট বের করে বলল, 'এ দুটো কিসের বড়ি বলতে পার?'

দীপ ঈষৎ বিস্ময়ে বড়ি নিরীক্ষণ করে বলল, 'তা কি করে বলব? কুইনিন নাকি?'

রাজমোহন বলল, 'একরকম দেখতে হলেও দুটো এক জাতের বড়ি নয়। একটি মারাত্মক বিষ, খেলেই মৃত্যু ; অন্যটি সাধারণ বড়ি—অ্যাসপিরীন।'

দীপ শঙ্কা-ভরা চোখে চেয়ে বলল, 'তোমার মতলবটা কি?'

রাজ হেসে বলল, 'মতলব খুব সোজা। আমরা দু'জনেই তো পুষ্পোকে বিয়ে করতে পারিনে, একজনকে সরে দাঁড়াতে হবে। এস, আমরা এই বড়ি দুটোর মধ্যে একটা বেছে নিই। কোনো হাঙ্গামা নেই, বেছে নিয়ে যে-যার শরবতের গ্লাসে ফেলে ঢক করে খেয়ে ফেলা। ব্যস্, নিষ্পত্তি হয়ে গেল। তোমার কপালে যদি বিষের বড়ি ওঠে তাহলে এক ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু, কোনো যন্ত্রণা নেই, কিছু টের পাবে না। আর আমার কপালেই যদি মৃত্যু থাকে, ঠেকাবে কে? পুষ্পা কার হবে এ নিয়ে আর তকরার থাকবে না। কেমন? এবার এস, নিজের বড়ি বেছে নাও।'

দীপ এতক্ষণ স্তম্ভিতভাবে চেয়ে ছিল, এখন বলে উঠল, 'তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি!'

রাজ ব্যঙ্গ করে বলল, 'তুমি দেখছি ভয় পেয়েছ বন্ধু! মৃত্যুকে এত ভয়!'

দীপ বলল, 'মৃত্যুকে ভয় করি না। কিন্তু এ যে নিছক পাগলামি।'

রাজ বলল, 'কেন, পাশ্চাত্ত্য দেশে প্রণয়িনীর জন্যে ডুয়েল লড়ত, শোনিনি?'

শেষ পর্যন্ত মোহগ্রস্তের মত দীপ রাজী হলো। একটি বড়ি রাজের হাত থেকে তুলে নিয়ে নিজের গ্লাসে ফেলল। রাজও অন্য বড়িটি নিজের গ্লাসে ফেলে বলল, 'এস, চুমুক দেওয়া যাক, দেখি ভাগ্যলক্ষ্মী কার গলায় মালা দেন।'

বিলিতি কায়দায় তারা গ্লাসে গ্লাস ঠেকিয়েছে এমন সময় খোলা জানলা দিয়ে ফুলের তোড়া এসে পড়ল গ্লাসের ওপর, দুটো গ্লাসই টেবিলের ওপর পড়ে চূর্ণ হয়ে

গেল। সঙ্গে সঙ্গে গরাদহীন জানলা দিয়ে ভয়ার্ত মুখে প্রবেশ করল পূর্ণিমা। রাজ কটমট করে তার পানে তাকিয়ে বলল, 'কী ব্যাপার! আমরা শরবত খাচ্ছি—'

পূর্ণিমা কান্না-মেশানো চীৎকার করে বলল, 'মিথ্যে কথা বলো না, আড়াল থেকে আমি সব শুনেছি। (দীপের প্রতি) দাদা পুষ্পার জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছে, তুমিও কি তাই?'

লজ্জাহত স্বরে দীপ বলল, 'অসংখ্য ধন্যবাদ পূর্ণিমা। তোমার দাদার ছোঁয়াচ লেগে আমিও প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। আর এখানে নয়, আমি চললাম।' দীপ চলে গেল।

পূর্ণিমা কিছুক্ষণ রাজের ক্রুদ্ধ-বিফল মুখের পানে চেয়ে থেকে বলল, 'দাদা, তোমার মতলবটা কি বলো দেখি?'

কোণ-ঠাসা বিড়ালের মত রাজ ফোঁস করে উঠল, 'মতলব আবার কি! আমি ওকে সরাতে চাই।'

'খুন করতেও তোমার দ্বিধা নেই! কিন্তু তুমি জানলে কি করে যে দীপই বিষের বড়ি তুলে নেবে?'

রাজ হিংস্র হাসি হেসে বলল, 'মেয়ে-বুদ্ধি আর কাকে বলে! গোড়ায় দুটো বড়িই বিষের বড়ি ছিল, তারপর আমার নিজের গ্লাসে বড়ি ফেলবার সময় হাত-সাফাই করলাম।'

'হাত-সাফাই!'

'হ্যাঁ। বিষ-বড়ির বদলে একটা নির্দোষ বড়ি গ্লাসে ফেললাম।'

'উঃ! কী সাংঘাতিক মানুষ তুমি! তোমার শরীরে দয়া-মায়া বলে কি কিছু নেই?'

'না। পুষ্পাকে আমি চাই, যে ভাবেই হোক ওকে আমার চাই।' হঠাৎ থেমে গিয়ে রাজ চোখ ছোট করে পূর্ণিমার পানে চাইল—'তুই—তুই দীপনারায়ণকে ভালবাসিস?'

পূর্ণিমা ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল, চোখে আঁচল দিয়ে অস্পষ্টভাবে ঘাড় নাড়ল।

রাজ লাফিয়ে উঠে উত্তেজিত স্বরে বলল, 'তাহলে তুই তার মন ভোলাবার চেষ্টা করছিস না কেন? তুই দেখতে সুন্দরী, নাচ-গান জানিস; দীপের মন পেতে আর বেশী কী দরকার? দীপ যদি তোর প্রেমে পড়ে আমার রাস্তা সাফ, পুষ্পাকে বিয়ে করার আর কোনো বাধা থাকে না।'

পূর্ণিমা অসহায়ভাবে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'ও যদি আমার পানে ফিরে না চায়, আমি কি করব!'

মুখে রাগ আর অসন্তোষ নিয়ে রাজ তার পানে চেয়ে রইল।

দীপ নিজের বাড়িতে ফিরে এল। রাজের বাড়ির মতই সুন্দর বাগান-ঘেরা দোতলা বাড়ি। বাড়িতে সে একলা থাকে, সঙ্গীর মধ্যে ম্যানেজার বজ্‌রঙ্‌ আর বুড়ো চাকর কেশব।

দীপ নিজের বসবার ঘরে গিয়ে টেবিলের সামনে গালে হাত দিয়ে বসে ভাবতে লাগল। পুষ্পা—রাজ—পুষ্পা—তার মাথার মধ্যে চক্রাকারে ঘুরতে লাগল।

ম্যানেজার বজ্‌রঙ্‌ এসে টেবিলের পাশে দাঁড়াল, মৃদু সম্ভ্রমের সুরে কথা বলতে লাগল। সে অতি মিষ্টভাষী, কিন্তু মনে জিলিপির প্যাঁচ। ব্যবসায়ে দীপের অমনোযোগিতার সুযোগ নিয়ে সে নিজে বেশ গুছিয়ে নিচ্ছে। দীপকে ইদানীং প্রায়ই বাইরে যেতে হয়, তাই বজ্‌রঙ্‌ সময়মত ট্যাক্স ইত্যাদি দিতে পাচ্ছে না, এই ধরনের একটা অজুহাত দেখিয়ে সে ইতিমধ্যে দীপের কাছ থেকে মোক্তারনামা লিখিয়ে নিয়েছে; এখন সে দীপকে দিয়ে ব্যাঙ্কের একটি চিঠি সই করিয়ে নিল যাতে বজ্‌রঙও দীপের পক্ষে ব্যাঙ্ক থেকে

চেক্ কেটে টাকা তুলতে পারে। দীপ অন্যমনস্কভাবে চিঠি সই করে দিয়ে ভাবতে লাগল—পুলিসের বড়সাহেব বোধহয় অমত করবেন না—

বুড়ো চাকর কেশব কফির ট্রে নিয়ে এল। বিড় বিড় করে বজ্‌রঙের নামে অনেক অভিযোগ করল, বজ্‌রঙ্ নাকি মদ খায়। মদের টাকা আসে কোথা থেকে? নজর না রাখলে ঘরের ঢেঁকি কুমীর হয়। ইত্যাদি। দীপ তার কথায় কান দিল না, কফির পেয়ালায় কালো কফি ঢেলে খেতে লাগল। কেশো বকতে বকতে চলে গেল।

পুলিসের বড়সাহেব রণবীর আর পুষ্পা তাদের বাংলোতে নৈশাহার শেষ করে কফি খাচ্ছে। রণবীরের বয়স চল্লিশের নীচে; মিলিটারি ধরনের দীর্ঘ দৃঢ় শরীর। ড্রয়িং-রুমে কফি খেতে খেতে ভাই-বোনে গল্প হচ্ছে।

রণবীর বলল, 'আজ বিকেলে কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলি?'

পুষ্পা বলল, 'বাঘের জিভের ওপর গিয়ে বসেছিলুম।'

রণবীর সকৌতুকে ভুরু তুলে প্রশ্ন করল, 'একা?'

'একাই গিয়েছিলুম। পরে আরো দু'জন এল।'

'দু'জন? দীপনারায়ণ আর রাজমোহন। কেমন?'

'হ্যাঁ। তুমি কি গুপ্তচর লাগিয়েছ নাকি?'

রণবীর হাসল, 'না। ওদের মতলব বুঝতে দেরি হয় না। তোকে আর একলা থাকতে দিতে চায় না, নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলতে চায়। তা তোর কোন্‌টিকে পছন্দ?'

পুষ্পা সলজ্জ স্বরে বলল, 'তোমার কাকে পছন্দ আগে বলো।'

রণবীর বলল, 'দু'জনেই তো যোগ্য পাত্র মনে হয়। শিষ্ট, ভদ্র, পয়সাকড়ি আছে। তবে দীপ যেন একটু বেশী ভাল। (পুষ্পা মৃদু হেসে ঘাড় নাড়ল) ঠিক ধরেছি তাহলে? কিন্তু তোর যাকেই পছন্দ হোক, আমার অবস্থা সমান, তুই স্বামীর ঘরে চলে গেলে আমি একলা পড়ে যাব।'

'দাদা!' পুষ্পা উঠে গিয়ে রণবীরের পিছনে দাঁড়াল, তার কাঁধে দু'হাত রেখে বলল, 'তুমি এবার বিয়ে কর-না দাদা। আমার জন্যে কতদিন আইবুড়ো থাকবে? তোমার বোধহয় ভয় যে, তুমি বিয়ে করলেই আমি তোমার বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দেব, তাই আমাকে বিদেয় না করা পর্যন্ত বিয়ে করছ না। সত্যি বলছি আমি তোমার বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া করব না।'

রণবীর পুষ্পার হাতের ওপর হাত রেখে হেসে উঠল, 'দূর পাগলি! সে জন্যে নয়। আসলে নিজের জন্যে বৌ খোঁজা একটা ঝামেলা। তা তুই না হয় আমার ঘটকালি কর। তোর তো অনেক বান্ধবী আছে।'

পুষ্পা বলল, 'তুমি তো আমার সব বান্ধবীকেই চেনো, বলো না কাকে তোমার পছন্দ।'

'আমার আবার পছন্দ, যাহোক একটা হলেই হলো।' ক্ষণেক চুপ করে থেকে হঠাৎ রণবীর বলল, 'আচ্ছা, রাজমোহনের একটি বোন আছে না? কী নাম তার—'

'পূর্ণিমা।'

'কেমন মেয়ে বল দেখি? দেখতে তো ভালই। স্বভাব কেমন?'

'ভারি নরম মিষ্টি স্বভাব, ঠিক যেমনটি তোমার দরকার।—তাহলে ঘটকালি করি?'

রণবীর হেসে বলল, 'কর। কিন্তু আমি তো বুড়ো বর, রাজমোহন আমার হাতে কি বোনকে দেবে?'

পুষ্পা সগর্বে বলল, 'দেবে না আবার, স্বর্গ হাতে পাবে।'

পরদিন বিকেলবেলা দীপ রণবীরের বাংলোতে গেল। বাগানের এক কোণে ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে একটি দোলনা আছে, দীপ জানে সেটি পুষ্পার প্রিয় স্থান। সে সেইদিকে চলল।

কিন্তু রাজমোহন আগেই সেখানে হাজির হয়েছিল এবং বিলাতি কায়দায় পুষ্পার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করছিল। প্রস্তাবটা খুব অপ্রত্যাশিত নয়, তবু পুষ্পা ঘাবড়ে গিয়ে দোলনায় বসে শঙ্কিতভাবে এদিক ওদিক চাইছিল। প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে রাজ আরো আবেগভরে প্রস্তাব করছিল। এই সময় পুষ্পা দীপকে আসতে দেখে যেন অকূলে কূল পেল। সে আহ্বানসূচক হাত তুলল।

রাজ যখন দেখল দীপ আসছে, তখন সে রাগে অধর দংশন করল, তারপর মুখ অন্ধকার করে চলে গেল।

দীপ এসে কাছে দাঁড়াতেই পুষ্পা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল, 'বাব্বাঃ! আর একটু হলেই গিয়েছিলুম।'

সে দোলনার একপাশে সরে গিয়ে দীপের জন্যে জায়গা করে দিল; দীপ তার পাশে বসে উৎকণ্ঠিত স্বরে বলল, 'কী হয়েছে? রাজ চলে গেল দেখলাম—সে কি তোমাকে কিছু বলেছে নাকি?'

মুখে ছদ্ম গাম্ভীর্য এনে পুষ্পা বলল, 'হুঁ। গুরুতর কথা বলেছে। এবার তুমি কি বলবে বলো।'

দীপ প্রশ্ন করল, 'আমি কী বলব?'

নিরাশ মুখভঙ্গী করে পুষ্পা বলল, 'তোমার কিছু বলবার নেই?'

'কিছু না তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে।—তোমার দাদা কোথায়?'

'বাড়িতেই আছেন, দপ্তরে কাজ করছেন। দাদার সঙ্গে তোমার কী দরকার?'

'তাঁর একমাত্র ছোট বোনকে আমি বিয়ে করব, তাই তাঁর অনুমতি চাইতে হবে।'

পুষ্পার মুখে নবারুণের রঙ ফুটল। সে দীপের পানে চকিত বিদ্যুৎবিলাসের মত দৃষ্টি হেনে খাটো গলায় বলল, 'তাই নাকি! আর একমাত্র ছোট বোন যদি বলে তোমাকে বিয়ে করবে না?'

'তাহলে তাকে এমনি করে পক্ষীরাজ ঘোড়ার পিঠে তুলে উড়িয়ে নিয়ে চলে যাব।' দীপ সজোরে দোলনা দুলিয়ে দিল। হঠাৎ দোল খেয়ে পুষ্পা দীপের গলা আঁকড়ে ধরল, তারপর বুকের ওপর মাথা রাখল।

পরদিন সকালবেলা পূর্ণিমা নিজেদের বাগানে বিষণ্ণ মনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, এমন সময় দীপ এল। হাসিখুশী মুখে বলল, 'সুপ্রভাত, পূর্ণিমা।'

পূর্ণিমা বলল, 'সুপ্রভাত। তোমাকে আজ খুব খুশী মনে হচ্ছে।'

দীপ হেসে বলল, 'খুশীর কারণ আছে, যথাসময় জানতে পারবে।—রাজ কোথায়?'

পূর্ণিমা বলল, 'বাড়িতেই আছে। কেমন যেন মন-মরা ভাব। কিছু দরকার আছে?'

'না—এমন কিছু নয়—আমি দেখি—' দীপ বাড়ির দিকে অগ্রসর হলো। পূর্ণিমা সন্দিগ্ধভাবে চেয়ে রইল, তারপর দূরে থেকে দীপের অনুসরণ করল।

দীপ রাজের বসবার ঘরে গিয়ে দেখল রাজ চিন্তামগ্নভাবে একলা বসে আছে। সে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, একটু অপ্রস্তুতভাবে বলল, 'ভাই রাজ, তোমার শুভেচ্ছা চাইতে এসেছি. ভাগ্যদেবী আমার ওপর প্রসন্ন হয়েছেন।'

রাজ আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল, 'তার মানে পুষ্পা তোমাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে?'

দীপ বলল, 'হ্যাঁ। রণবীরও সম্মতি দিয়েছেন।—তুমি মনে ক্ষোভ রেখো না বন্ধু।'

সে করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল।

রাজ মুখে তিক্ত হাসি নিয়ে করমর্দন করল, 'না, ক্ষোভ কিসের। একজনকে তো পরাজয় স্বীকার করতেই হবে। তোমাকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

পূর্ণিমা জানলার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনল, তারপর দীপ যখন চলে গেল তখন বুকের জ্বালা দমন করে ঘরে ঢুকল, রাজের দিকে বাঁকা বিদ্রুপভরা চোখে চেয়ে বলল, 'তাহলে দীপ তোমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিল!'

রাজের মুখ হিংস্র হয়ে উঠল, সে চাপা তর্জনের সুরে বলল, 'এখনি হয়েছে কী, এই তো সবে শুরু। যুদ্ধ যখন শেষ হবে তখন দেখিস।'

পূর্ণিমা বলল, 'এখন আর তুমি কী করতে পার?'

রাজ বিকৃত হেসে বলল, 'বিয়ে তো আর আজই হচ্ছে না। তার আগে অনেক কিছু ঘটতে পারে।' ফস করে লাইটার জ্বেলে সে সিগারেট ধরাল।

পুষ্পার বিয়ের এন্গেজ্মেণ্ট উপলক্ষে রণবীর বেশ ঘটা করল। বাড়িতে নহবত বসল। বাগানের মাঝখানে রঙ্গমঞ্চ খাড়া হলো, সেখানে নাচ-গানের আসর বসবে। শহরের যত গণ্যমান্য লোক নিমন্ত্রিত হলো ; রণবীর নিজে পুষ্পাকে নিয়ে রাজমোহনের বাড়িতে গেল, বিশেষ করে পূর্ণিমাকে নিমন্ত্রণ করল। বলল, 'তুমি পুষ্পার বান্ধবী ; শুনেছি নাচ-গান জান। আমরা প্রত্যাশা করব তুমি তোমার নাচ-গান দিয়ে নিমন্ত্রিতদের সমাদর করবে। আমি মনে করি তুমি আমারই বাড়ির একজন।'

রণবীরের অকপট আগ্রহ দেখে পূর্ণিমা ম্রিয়মাণ ভাবে সম্মত হলো। রাজমোহনও দেঁতো হাসি হেসে বলল, 'নিশ্চয় নিশ্চয়। আমিও যাব, এ তো আমাদের বাড়ির কাজ।'

নির্দিষ্ট দিনে সন্ধ্যার পর বাগানের গাছে গাছে বিদ্যুতের রঙীন দীপালি জ্বলে উঠল ; রঙ্গমঞ্চের সামনে চেয়ারের সারি, তাতে অতিথিরা বসল। তকমা-আঁটা ভৃত্যেরা নিঃশব্দে আহার্য পানীয় আইসক্রীম পরিবেশন করতে লাগল। নহবতের মিষ্টি সুরের সঙ্গে মিশে আলো-ঝিলমিল দৃশ্যটি যেন স্বপ্নময় হয়ে উঠল।

রঙ্গমঞ্চে একজন বাজিকর এসে নানা রকম ইন্দ্রজাল দেখালেন। তারপর এলেন এক ওস্তাদ, কালোয়াতি গান শুনিয়ে সঙ্গীত-রসিকদের মুগ্ধ এবং বেরসিকদের বিরক্ত করলেন। সর্বশেষে এল পূর্ণিমা ; দেবযানীর ভূমিকায় সে কচকে বিদায় দেওয়ার উপলক্ষে নৃত্য করবে। একক নৃত্য। পূর্ণিমা মঞ্চে এসে দাঁড়াল, তারপর বাদ্যের তালে তালে তার দেহ দুলতে লাগল ; অদৃশ্য প্রণয়াস্পদকে সে বিদায় দিচ্ছে। তার নৃত্যে প্রিয়-বিদায়ের অন্তর্গূঢ় বেদনা মথিত হয়ে উঠল। নৃত্যের চরম মুহূর্তে সে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

রণবীর দর্শকদের মধ্যে প্রথম সারিতে বসেছিল, সে এক লাফে মঞ্চে উঠে পূর্ণিমাকে পরীক্ষা করে দেখল, তারপর দুই বাহুতে তুলে নিয়ে সটান বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেল। দীপ ও রাজ তার সঙ্গে সঙ্গে গেল। রণবীর পূর্ণিমাকে একটা সোফায় শুইয়ে দিয়ে মুখে জলের ছিটে দিতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে পূর্ণিমা চোখ খুলল। রণবীর রাজকে বলল, 'তোমরা সভায় যাও, আমি পূর্ণিমার কাছে আছি।'

রাজ ও দীপ নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেল। খবর পেয়ে পুষ্পা ছুটে এল, 'দাদা, কী হয়েছে পূর্ণিমার? আমি বাড়ির মধ্যে এসেছিলুম দু-মিনিটের জন্যে—'

রণবীর বলল, 'কিছু নয়, তুই চট করে একটু ব্র্যাণ্ডি নিয়ে আয় তো পুষ্পা।' সে ইশারা করে চোখ টিপল।

পুষ্পা মুচকি হেসে বলল, 'দেখি, ব্র্যাণ্ডির বোতল কোথায় আছে খুঁজে বার করতে হবে তো।' পূর্ণিমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে সে চলে গেল।

বাইরে তখন মঞ্চের ওপর একটি গায়িকা মিহি সুরে গজল গাইছিলেন। রাজ ও দীপ একটু দূরে একটি বিদ্যুদ্দীপমণ্ডিত গাছের তলায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে টানতে গল্প করছিল।

রাজ বলল, 'তুমি হাত-দেখায় বিশ্বাস কর? সেদিন বাঘের জিভের নীচে জঙ্গলের মধ্যে এক সাধুর সঙ্গে দেখা। লোকটার আশ্চর্য ক্ষমতা। আমার হাত দেখে বলেছিল আমার বোনের অসুখ হবে।'

দীপ সাগ্রহে বলল, 'তাই নাকি! আর কী বলল?'

রাজ মলিন হেসে বলল, 'আর বলল, প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমি হেরে যাব।'

'সত্যি! আশ্চর্য সাধু। কোথায় থাকেন?'

'নীচে ঝর্ণার কাছে একটা গুহার মত আছে, সেইখানে থাকেন। কেন বলো দেখি?'

'পুষ্পাকে সুখী করতে পারব কিনা এই ভাবনা এখন মাথায় ঢুকেছে। তোমার সাধু যদি বলতে পারেন—'

'পারবেন, পারবেন। তুমি একবার গিয়েই দেখ না।'

'যাব। আমার অবশ্য কোনো কুসংস্কার নেই, কিন্তু—'

'তা তো বটেই। আমারও কুসংস্কার নেই, কিন্তু—'

দু'জনে একসঙ্গে হেসে উঠল।

তারপর যথাসময় উৎসব শেষ হলো। পূর্ণিমাও সুস্থ হয়েছে, তাকে বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছে। তাকে নিয়ে রাজ বাড়ি ফিরে এল। রাজের মনও বেশ প্রফুল্ল। এত সহজে যে দীপ ফাঁদে পা দেবে তা সে আশা করেনি।

খাদের সংকীর্ণ পথে ক্ষুদ্র হ্রদের কাছে পাহাড়ের গায়ে একটা খোঁদলের মত তৈরি হয়েছে; তারই মুখের কাছে সাধুবাবা বসে আছেন। সামনে ধুনী জ্বলছে। বাবার মাথায় জটা, দাড়ি-গোঁফে মুখ আচ্ছন্ন। গঞ্জিকার প্রসাদে রক্তবর্ণ চক্ষু দু'টি ঘূর্ণিত হচ্ছে।

দীপকে দেখে বাবা চেরা গলায় বললেন, 'আও বেটা। তোমার জন্যে বসে আছি। জানতাম তুমি আসবে।'

দীপ পুলকিত হয়ে বলল, 'জানতেন! কী করে জানলেন বাবা?'

বাবা বললেন, 'একটা ছোট্ট কাঠবেরালি আমাকে বলে গেল। বস, বস। কী জানতে চাও জানি। কিন্তু তুমি নিজের মুখেই বলো।'

বাবার পাশে উপবিষ্ট হয়ে দীপ তদ্‌গত কণ্ঠে বলল, 'বাবা, একটি মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে, শিগ্‌গির বিয়ে হবে। এখন আমার ভাবনা হয়েছে স্ত্রীকে আমি সুখী করতে পারব তো?'

বাবা কিছুক্ষণ শিবনেত্র হয়ে রইলেন। অর্ধস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করলেন—'ফড়িং ফড়িং ফড়িং।' তারপর দীপের মুখের ওপর চোখ রেখে বললেন, 'বাধা আছে, তোমার বিয়ে সুখের হবে না—'

'অ্যাঁ, সে কি কথা বাবা! তবে আমি এখন কী করব?'

'দৈব উপায় আছে, আমি বাতলে দিতে পারি। শুনবি?'

'হ্যাঁ বাবা।'

'শোন তবে। আজ অমাবস্যা। এই ধুনী থেকে ছাই দিচ্ছি, ভাল করে রাখ।'

বাবা এক মুঠি ছাই দীপকে দিলেন, সে রুমালের খুঁটে বেঁধে পকেটে রাখল—'তারপর বাবা?'

বাবা ঊর্ধ্বদিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'ওই যে বাঘের জিভ দেখছিস, খাদের ওপর বেরিয়ে আছে—আজ অমাবস্যার রাত দুপুরে ধুনীর ভস্ম নিয়ে ওই জিভের

ওপরে গিয়ে বসবি। ছাই মুখে মেখে ফেলবি, তারপর খাদের দিকে মুখ করে বসে চোখ বুজে জপ করবি—কিড়িং ফুঃ! কিড়িং ফুঃ! কিড়িং ফুঃ! রাত বারোটা থেকে একটা পর্যন্ত যদি জপ করতে পারিস তাহলে সব রিষ্টি কেটে যাবে, সংসার সুখের হবে।'

দীপ উত্তেজিত হয়ে বলল, 'ব্যস, আর কিছু করতে হবে না? শুধু কিড়িং ফুঃ মন্ত্র জপ?'

'হ্যাঁ।—শুধু একটা কথা মনে রেখো। জপ করতে করতে যদি কোনো শব্দ কানে আসে, খবরদার, পিছু ফিরে তাকাবে না। তাহলেই সব ভ্রষ্ট হয়ে যাবে।'

'আচ্ছা বাবা, তাকাব না।'

'এবার তুমি এস। আমি এখন ধ্যানে বসব।'

বাবা ধ্যানস্থ হলেন। দীপ পকেট থেকে টাকা বার করে তাঁর পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করে আনন্দিত মনে চলে গেল। সে চোখের আড়াল হতেই ধ্যানস্থ বাবা টাকাটি খপ করে তুলে নিয়ে ট্যাঁকে গুঁজলেন, জটা এবং দাড়ি-গোঁফ খুলে ফেলে মাথা চুলকোতে লাগলেন। এখন তাঁর স্বরূপ প্রকাশিত হলো; তিনি আর কেউ নয়, রাজমোহনের ভৃত্য সেওলাল।

গুহার অন্ধকার থেকে রাজমোহন বেরিয়ে এল। সেওলাল বলল, 'কেমন হুজুর, ঠিক কাজ হয়েছে কিনা?'

রাজ হেসে বলল, 'ঠিক ঠিক কাজ হয়েছে। মাছ টোপ গিলেছে।'

সেওলাল সেলাম করে বলল, 'তাহলে আমার ইনাম?'

রাজ পকেট থেকে দু'শো টাকার নোট বের করে সেওলালকে বলল, 'এত টাকা নিয়ে কী করবি?'

'কি আর করব, মজা লুটব। আমাকে দু'হপ্তার ছুটি দিন হুজুর।'

'আচ্ছা যা, মজা লুটগে যা। আজ অমাবস্যা, পূর্ণিমার দিন পর্যন্ত ছুটি দিলাম।'

রাত্রি আন্দাজ সাড়ে দশটার সময় রণবীরের বাংলোতে নৈশাহার শেষ হয়েছিল। বাইরে অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রি, ঘরের মধ্যে তিনটি প্রাণী; রণবীর, পুষ্পা ও পূর্ণিমা। পূর্ণিমা ও রাজমোহনের আজ এখানে নৈশভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল; রাজ আসেনি, কেবল পূর্ণিমাকে পোঁছে দিয়ে কাজের অজুহাত দেখিয়ে চলে গেছে। রাত্রি সাড়ে দশটার সময় পূর্ণিমাও উঠি-উঠি করছিল কিন্তু পুষ্পা ও রণবীর তাকে ছাড়ছিল না। পুষ্পা বলছিল, 'বাড়িতে গিয়ে শুধু ঘুমোনো। আর একটু বসো না ভাই, দাদা তোমাকে পোঁছে দিয়ে আসবেন।'

রণবীর বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি তো হামেহাল হাজির। তার চেয়ে এস আর এক দফা আইসক্রীম খাওয়া যাক। কি বলো পূর্ণিমা?'

পূর্ণিমা হাসিমুখে রাজী হলো। এদের দুই ভাই-বোনের প্রীতি ও স্নেহের স্পর্শ পেয়ে পূর্ণিমার মন বেশ প্রফুল্ল হয়েছে।

রণবীর খানসামাকে ডেকে আইসক্রীম হুকুম করল। এমন সময় বাইরে মোটরের শব্দ হলো। কে এসেছে দেখবার জন্যে রণবীর উঠে দাঁড়িয়েছে, দীপ প্রবেশ করল। একটু হেসে বলল, 'পুষ্পাকে একটা কথা বলতে এলাম।'

পুষ্পা তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, দীপ তাকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে খাটো গলায় বলল, 'বিশেষ একটা গোপন কাজে আমি এখুনি এক জায়গায় যাচ্ছি, একটা নাগাদ ফিরে তোমার সঙ্গে দেখা করব। আমি যতক্ষণ না ফিরি তুমি আমার জন্যে জেগে থাকবে?'

পুষ্পা বলল, 'থাকব। কিন্তু তুমি যাচ্ছ কোথায়?'

'সে-কথা ফিরে এসে বলব', দীপ একটু রহস্যময় হেসে সকলকে শুভরাত্রি জানিয়ে চলে গেল।

তারপর এদের সভাও ভঙ্গ হলো। রণবীর পূর্ণিমাকে নিজের গাড়িতে তুলে তার বাড়ির ফটক পর্যন্ত পেঁছে দিয়ে এল।

পূর্ণিমা রণবীরকে বিদায় দিয়ে বাড়িতে ঢুকতে যাবে, দেখল রাজমোহন বেরিয়ে আসছে। রাজের পরনে কালো পোশাক, পায়ে রবার-সোল জুতো। পূর্ণিমাকে দেখে সে একটু থমকে গেল। পূর্ণিমা বলল, 'দাদা, এত রাত্রে তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

রাজ বলল, 'হঠাৎ কাজ পড়ে গেল। কখন ফিরব বলা যায় না। আমার জন্যে জেগে থাকার দরকার নেই।'

রাজ বাইরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। পূর্ণিমা অবাক হয়ে খানিক চেয়ে রইল।

রণবীরের বাংলোতে পুষ্পা ভুরু কুঁচকে বসে ভাবছিল, রণবীর ফিরে এসে বলল, 'কি ভাবছিস? দীপ কি বলে গেল?'

পুষ্পা দীপের কথা বলল। শুনে রণবীরের কপালে চিন্তার রেখা পড়ল। সে বলল, 'তাহলে আমিও জাগি। আয়, ডব্‌ল্‌-হ্যান্ড ব্রিজ খেলা যাক, দেখতে দেখতে সময় কেটে যাবে।'

রাত্রি ঠিক বারোটার সময় দীপ বাঘের জিভের ওপর গিয়ে বসল, মুখে ছাই মেখে চোখ বুজে মন্ত্র জপ করতে লাগল। সামনে গভীর খাদ, পিছনে পাথরের চাঙড় স্তম্ভের মত উঁচু হয়ে আছে। কোথাও শব্দ নেই, জনমানব নেই।

পিছনে একটি ছায়ামূর্তির আবির্ভাব হলো। অন্ধকারে কালো পোশাক পরা রাজমোহনকে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সে শিলাস্তম্ভের পাশে দাঁড়িয়ে গলা বাড়িয়ে দীপকে দেখল, তারপর বাঘের জিভের দিকে লক্ষ্য করে পাথরটাকে ঠেলা দিতে লাগল। পাথর দুলতে আরম্ভ করল, রাজ ঠেলা দিয়ে চলল। শেষে পাথর আর স্বস্থানে থাকতে পারল না, কেন্দ্রচ্যুত হয়ে বাঘের জিভের দিকে গড়াতে শুরু করল।

পাথর গড়ানোর শব্দ কানে যেতেই সামান্য দ্বিধার পর দীপ পিছু ফিরে চাইল, দেখল পাথরটা গড়াতে গড়াতে প্রায় তার ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে। সে চীৎকার করে একপাশে সরে গেল, কিন্তু তাল সামলাতে পারল না। পাথরটা যেমন সগর্জনে খাদে ঝাঁপিয়ে পড়ল, সে-ও তেমনি তাল সামলাতে না পেরে খাদে পড়ে গেল।

রাজ এতক্ষণ পিছনে ছিল, এখন ছুটে এসে বাঘের জিভের ওপর শুয়ে নীচে উঁকি মারল। দেখল, দীপ জিভের পাশে আটকে নেই। তার মুখে হিংস্র হাসি ফুটল। এবার আর ফস্কায়নি, তার পথের কাঁটা দূর হয়েছে।

রাত্রি একটা পর্যন্ত দীপ যখন ফিরল না তখন পুষ্পা আর রণবীর দু'জনেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। তাস খেলা বন্ধ করে রণবীর বলল, 'তাই তো, দীপ এখনো ফিরল না—'

পুষ্পা পাংশু মুখে বলল, 'কিছু বুঝতে পারছি না। স্পষ্ট করে বলল না কোথায় যাচ্ছে। দাদা, আমার ভয় করছে।'

'ভয় কিসের?'

'কি জানি, মনে হচ্ছে ওর কোনো অনিষ্ট হয়েছে।'

রণবীর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চল, ওর বাড়িতে খবর নিই।'

রণবীর একটা বড় বৈদ্যুতিক টর্চ হাতে নিল, দু'জনে মোটরে চড়ে বেরুল।

প্রথমে তারা দীপের বাড়িতে গেল। চাকর কেশো ঘুমোচ্ছিল, সে মনিবের কোনো খবর জানে না। দীপ বাড়িতে নেই, রাত্রি দশটার সময় বেরিয়েছিল, আর ফিরে আসেনি। কেশোকে নিয়ে তারা রাজমোহনের বাড়ি গেল।

সেখানে হাঁকাহাঁকির পর পূর্ণিমা এসে দোর খুলল; রাজ মটকা মেরে বিছানায় পড়ে রইল। দীপ এখানে নেই।

রণবীর শহরের আরো কয়েক জায়গায় খুঁজে শেষে উদ্বিগ্ন হয়ে থানায় গেল, সেখান থেকে দু'জন পুলিস নিয়ে বেরুল। নিশ্চয় কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে।

সারা শহর খুঁজে শেষে তারা বাঘের জিভে গিয়ে দেখল দীপের শূন্য মোটর পড়ে আছে। টর্চ জেবলে স্থানটা পরিদর্শন করে স্পষ্টই বোঝা গেল, দীপ বাঘের জিভ থেকে খাদে পড়েছে। তখন তারা ঘুর পথে খাদে নেমে দেখল দীপ অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে; প্রচণ্ড আঘাতে তার মাথা ফেটে গেছে।

পুষ্পা কেঁদে উঠল। তারপর সকলে ধরাধরি করে দীপকে ওপরে আনল এবং রণবীরের বাংলোতে তুলল।

শহরের কয়েকজন বড় ডাক্তারকে ডাকা হলো। তাঁরা পরীক্ষা করে প্রাথমিক চিকিৎসা করলেন। তাঁদের মতে প্রাণের আশঙ্কা নেই, কিন্তু মস্তিষ্কে যে আঘাত লেগেছে তার গুরুত্ব কতখানি তা জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত বলা যাবে না।

পুষ্পা আর কেশো দীপের সেবার ভার নিল। সকাল হলো, কিন্তু দীপ অজ্ঞান হয়েই রইল। সারা দিন তার জ্ঞান হলো না। তখন রণবীর মহানগরে একজন ব্রেন-স্পেশালিস্টকে তার করল।

সেই রাত্রে ক্ষণেকের জন্যে দীপের একবার জ্ঞান হলো। সে বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে ছিল, মুখের ওপর তীব্রশক্তি ইলেকট্রিক বাল্‌বের আলো পড়েছিল। তার খাটের দু'পাশে পুষ্পা আর কেশো একদৃষ্টে তার মুখের পানে চেয়ে বসে ছিল। দীপের চোখের পাতা নড়ে উঠল। তারপর সে আস্তে আস্তে চোখ খুলল। ডান দিক থেকে বাঁ দিকে তার চোখ যাতায়াত করল, মুখে একটা বিকট পৈশাচিক ভাব ফুটে উঠল। তারপর সে আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

পুষ্পা ভয়ে শিউরে উঠেছিল, কোনোমতে নিজের মুখের ওপর হাত রেখে চীৎকার রোধ করল। দীপের মুখে এমন ভয়ঙ্কর ভাবের ব্যঞ্জনা সে আগে কখনো দেখেনি।

মহানগর থেকে স্পেশালিস্ট ডাক্তার এসে দীপের চিকিৎসা শুরু করলেন। শহরে খুব উত্তেজনা, রণবীরের বাড়িতে এসে অনেকে দীপের খবর নিয়ে যাচ্ছে। দীপ বেঁচে আছে শুনে রাজমোহন প্রথমটা খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল, ক্রমে সামলে নিয়েছে। এক মাঘে শীত পালায় না। সে পূর্ণিমাকে সঙ্গে নিয়ে দীপের খোঁজখবর নিতে আসে। পূর্ণিমার মনেও শান্তি নেই, সে সবই বুঝতে পেরেছে। একদিন সে রাজকে বলল, 'দীপ যদি মারা যায় তাহলে আমি সব ফাঁস করে দেব।'

রাজ দেখল, ঘরের ঢেঁকি কুমীর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তখন আর কোনো উপায় না দেখে সে একদিন পূর্ণিমাকে বাড়ির গুপ্ত তোষাখানায় নিয়ে গিয়ে সেখানে বন্ধ করে রাখল। এই তোষাখানায় বংশের দামী হীরা-জহরত সোনাদানা রাখা থাকে, বাইরের কেউ এ ঘরের খবর জানে না।

বিশেষজ্ঞের চিকিৎসায় দীপ হপ্তা দুয়ের মধ্যে সেরে উঠল। পুষ্পার শীর্ণ মুখে আবার হাসি ফুটছে।

দীপের সুস্থ হওয়ার ফলে রাজ খুবই ভয় পেয়েছিল; কিন্তু যখন সে শুনল যে সেদিনের কোনো ঘটনাই দীপের মনে নেই তখন সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। তবু অত

সহজে ফাঁড়া কাটে না। সেওলাল নানা ছুতোয় তার কাছে টাকা আদায় করার চেষ্টা করছে। ভয় দেখাচ্ছে, আরো টাকা না দিলে সে গুপ্ত কথা ফাঁস করে দেবে। তাকে আরো দু'শো টাকা দিয়ে রাজ সাময়িকভাবে অব্যাহতি পেয়েছে।

ওদিকে তোষাখানার চোর-কুঠুরিতে পূর্ণিমা বন্ধ আছে; দু'বেলা তাকে খাবার দিতে যেতে হয়। ঝগড়াঝাঁটি কান্নাকাটি।

দীপ রণবীরের বাড়িতে আরো কিছুদিন থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে কেশোকে সঙ্গে নিয়ে নিজের বাড়িতে ফিরে গেল। বাড়িতে আর এক বিপদঃ বজ্‌রঙ্ পালিয়েছে, যাবার সময় ব্যাঙ্ক থেকে দীপের ত্রিশ হাজার টাকা তুলে নিয়ে গিয়েছে। গুরুতর দুর্ঘটনার পালা শেষ না হতে হতেই এত টাকা লোকসান; দীপ মাথায় হাত দিয়ে বসল। পুলিসে টাকা চুরির খবর গেল; সারা শহরে খবর ছড়িয়ে পড়ল।

দুর্ঘটনার পর আজ একমাস পূর্ণ হলো। আবার অমাবস্যা।

ধনী ব্যবসায়ী শেঠ আম্বালালের বাড়িতে সন্ধ্যের পর বিরাট পার্টি জমেছে। অন্যান্য গণ্য অতিথিদের মধ্যে রণবীর, পুষ্পা ও দীপও নিমন্ত্রিত। নাচ-গান গল্পগুজব চলছে।

এক কোণে চেয়ারে গোল হয়ে বসে কয়েকজন অতিথি নিজেদের মধ্যে অমাবস্যার বিধিনিষেধ নিয়ে আলোচনা করছেন। একজন বললেন, অমাবস্যার দিন বেগুন খেলে গোদ হয়। একে একে অন্যরাও নিজের নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ অভিমত প্রকাশ করল। বোঝা গেল অমাবস্যার দিন সব বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয়।

অমাবস্যার প্রসঙ্গ উঠতেই দীপের কেমন ভাবান্তর হলো। যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। পুষ্পার কাছে বিদায় নিয়ে সে একটু সকাল সকাল বাড়ি ফিরে এল।

রাত্রে নৈশাহার শেষ করে দশটার সময় যখন সে শুতে গেল তখন সে বেশ সুস্থ মানুষ, অস্বচ্ছন্দতাও কেটে গেছে। সে বিছানায় শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

রাত বারোটার সময় তার ঘুম ভাঙল, বাড়ির একটা ঘরে ঢং ঢং করে ঘড়ি বাজছে। দীপ বিছানায় উঠে বসল, ধীরে ধীরে তার মুখের পরিবর্তন হতে লাগল; একটা পৈশাচিক ক্রূরতা তার মুখে ফুটে উঠল। হিংস্র শ্বাপদের মত এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে সে খাট থেকে নামল, তারপর নিঃশব্দে দোর খুলে নীচের তলায় নামতে লাগল।

সিঁড়ির ঠিক নীচের ধাপের সামনে কেশো মাদুর পেতে ঘুমোচ্ছিল, না জেনে তার ঘাড়ে দীপ পা দিতেই কেশো আঁক-পাঁক করে জেগে উঠল, 'এ কি দাদাবাবু, তুমি এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছ?'

দীপ কথা বলল না, জিঘাংসুভাবে দাঁত বার করল। কেশো ভয়ে পেছিয়ে এল। এ যেন দীপ নয়, কোনো একটা দুষ্ট উপদেবতা তার ওপর ভর করেছে। এই সুযোগে দীপ বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল এবং অমাবস্যার অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

চোরের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে পুলিসের চোখ এড়িয়ে দীপ শেষে শেঠ আম্বালালের বাড়িতে এসে পাঁচিল ডিঙিয়ে ঢুকে পড়ল। বাড়ির লোকজন সবাই ঘুমে অচেতন। দীপ এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে হাতের কাছে দামী জিনিস যা পেল তাই পকেটে পুরল। সব শেষে সে শেঠজির ঘরে ঢুকল। শেঠজি ঘুমোচ্ছিলেন, দীপ তাঁর বালিশের তলায় হাত ঢুকিয়ে চাবি বার করবার চেষ্টা করতেই তিনি জেগে উঠে 'চোর! চোর!' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। দীপ ছায়ামূর্তির মত অদৃশ্য হয়ে গেল।

রাত প্রায় দুটোর সময় দীপ বাড়ি ফিরে এল। কেশো আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাকে সন্তর্পণে ডিঙিয়ে বাড়ির স্ট্রং-রুমে গেল। এ ঘরে সারি সারি লোহার সিন্দুক, তাতে সাবেক কালের সোনা-রুপোর বাসন ও হীরা-জহরতের গয়না আছে। দীপ

একটি পুরনো মজবুত সিন্দুকের তালা খুলে চোরাই মাল পকেট থেকে বার করে তাতে রাখল, সিন্দুক বন্ধ করে নিজের শোবার ঘরে গিয়ে বিছানায় শয়ন করল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালবেলা কেশো চা নিয়ে দীপের ঘুম ভাঙাতে এল। তার হাতে চায়ের পেয়ালা দিয়ে সরাসরি জিজ্ঞেস করল, 'কাল রাত্রে তুমি কোথায় গেছলে?'

দীপ আশ্চর্য হয়ে বলল, 'কখন?'

কেশো বলল, 'দুপুর রাত্রে। আমাকে মাড়িয়ে খেপা হাতির মত চলে গেলে!'

'দূর পাগল! তোর মাথা খারাপ হয়েছে।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। কাল রাত্তিরে তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল তুমি সদ্য-মানুষ নও, তোমাকে দানোয় পেয়েছে। আশ্চর্য নয়। কাল তো অমাবস্যা ছিল। অমাবস্যার দুপুর রাত্রে ভূত প্রেত দৈত্য দানা সব মানুষের ঘাড়ে চাপবার জন্যে ঘুরে বেড়ায়।'

কাল রাত্রির কথা দীপের কিছুই মনে ছিল না, কিন্তু কেশোর মুখে অমাবস্যার কথা শুনে তার মনটা বিকল হয়ে গেল, সে অস্ফুট স্বরে বলল, 'অমাবস্যা!'

সেদিন বিকেলবেলা রাজমোহন একলা দীপের বাড়িতে বেড়াতে এল। বলল, 'পূর্ণিমাকে পুষ্পা চায়ের নেমন্তন্ন করেছিল, তাকে পেঁছে দিয়ে এলাম।'

দীপ কেশোকে চায়ের হুকুম দিল। দু'জনে চা খেতে খেতে গল্প করতে লাগল, তারপর এক সময় রাজ বলল, 'শুনেছ নিশ্চয়, কাল রাত্রে শেঠ আম্বালালের বাড়িতে একটা দুঃসাহসিক চুরি হয়ে গেছে।'

দীপ বলল, 'কই না, আমি তো কিছু শুনিনি।'

রাজ বলল, 'আমিও জানতাম না। এইমাত্র রণবীরের মুখে শুনলাম।'

'চোর ধরা পড়েছে?'

'না, তবে শেঠজি চোরকে এক নজর দেখেছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, চোরের চেহারা নাকি অনেকটা তোমার মত।'

দীপ চমকে উঠল, 'আমার মত?'

রাজ হেসে বলল, 'তোমার মত। কিন্তু সত্যিই তো আর তুমি নও।'

দীপের মনটা আবার বিকল হয়ে গেল।

এক মাস কেটে গেল। শেঠ আম্বালালের বাড়িতে চুরির কোনো কিনারা হয়নি। আবার অমাবস্যা ফিরে এসেছে, কিন্তু দীপ আধুনিক ছেলে, তিথি-নক্ষত্রের খবর রাখে না। রাস্তার পাশে একটা ভিখারি বসে ভিক্ষে চাইছে, 'আজ অমাবস্যার পুণ্য তিথি, দুটো পয়সা ভিক্ষে দাও বাবা।'

রাত্রে রণবীরের বাড়িতে দীপের ডিনারের নিমন্ত্রণ ছিল। ডিনার শেষ করে পুষ্পা বলল, 'চল, তিনজনে সিনেমা দেখে আসি।'

রণবীর বলল, 'আমার আলস্য হচ্ছে, তোমরা যাও।'

দীপ আর পুষ্পা দীপের মোটরে চড়ে বেরুল। শহরের ঘিঞ্জি পাড়ায় সিনেমা হাউস, এই একটি মাত্র হাউস। টিকিট কিনে দু'জনে বক্সে গিয়ে বসল। রাত্রি তখন ন'টা। দীপের মানসিক অবস্থার কোনো বিকার নেই, স্বাভাবিক মানুষ।

সিনেমা ভাঙল পৌনে বারোটার সময়। পুষ্পা আর দীপ গাড়িতে এসে বসল। দীপের মুখের ভাব একটু অন্য রকম। গাড়িতে স্টার্ট দিতে গিয়ে সে পুষ্পাকে বলল, 'একটু বস, আমি আসছি।' তার কণ্ঠস্বরে একটু কঠিনতার আভাস। চোখের দৃষ্টি দুঃস্বপ্নে আচ্ছন্ন।

গাড়ি থেকে নেমে সে পিছন দিকে চলে গেল। পুষ্পা একটু অবাক হলো ; কিন্তু কোনো প্রশ্ন না করে গাড়িতে বসে রইল।

দশ মিনিট দীপের দেখা নেই। তারপর সে পিছন দিক থেকে এসে সামনের দিকে চলতে আরম্ভ করল, মোটরের দিকে তাকাল না। সে চলে যাচ্ছে দেখে পুষ্পা ব্যগ্রভাবে ডাকল, 'ও কি, কোথায় যাচ্ছ? এই যে এখানে গাড়ি।'

দীপ ফিরে তাকাল না, হন হন করে এগিয়ে চলল। পুষ্পা তখন ড্রাইভারের সীটে সরে গিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিল, গাড়ি চালিয়ে দীপের পিছনে চলল। কিন্তু দীপের কাছ পর্যন্ত পেঁছিবার আগে দীপ পাশের একটা সরু গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল, যেখানে গাড়ি যায় না।

গলির মুখের কাছে গাড়ি থামিয়ে পুষ্পা হতভম্ব হয়ে বসে রইল। কী হয়েছে দীপের হঠাৎ? সে এমন ব্যবহার করছে কেন?

রাস্তা নির্জন হয়ে গিয়েছিল, একলা বসে বসে পুষ্পার ভয় করতে লাগল। এই সময় সামনে কিছু দূরে খটাখট জুতোর শব্দ এল, একজন পাহারাওয়ালা রোঁদে বেরিয়েছে। গাড়ির পাশে এসে সে গাড়ির মধ্যে টর্চের আলো ফেলল। পুষ্পাকে পুলিসের সকলেই চেনে। কনেস্টবল বলে উঠল, 'এ কি, মিসিবাবা! আপনি এত রাত্রে এখানে কী করছেন!'

পুষ্পা বলল, 'কিছু না। আচ্ছা, তুমি বলতে পার এই গলিটা কোথায় গিয়েছে?'

কনেস্টবল ইতস্তত করে বলল, 'গলিটা ভাল নয় মিসিবাবা, খারাপ পাড়া। আপনি আর এখানে থাকবেন না, বাড়ি ফিরে যান।'

অশান্ত হৃদয়ে ভয় সংশয় সন্দেহ নিয়ে পুষ্পা গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

গলির মধ্যে নিম্নশ্রেণীর পতিতার ঘর। ঘরের মধ্যে কেরোসিন ল্যাম্পের আলোয় একটি যুবতী পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নাচছে এবং থেকে থেকে গানের একটি কলি গাইছে ; সঙ্গে তবলা ও সারেঙ্গী বাজছে। বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়ায় বাতাস আচ্ছন্ন। যারা আসরে বসে আছে তারা সকলেই গুন্ডা-তস্কর জাতীয় লোক। তাদের মধ্যে সেওলালও উপস্থিত আছে। সে এখন আর রাজমোহনের চাকরি করে না, হাতের টাকা ফুরিয়ে গেলেই রাজমোহনের রুধির শোষণ করে।

দীপ গলি দিয়ে যাচ্ছিল, গান-বাজনার শব্দ শুনে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তার চেহারা দেখে মনে হয় সে-ও গুন্ডা-তস্করদের সমগোত্রীয় লোক। সে দোর ঠেলে ঢুকতেই নর্তকী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, দর্শকরা ঘাড় বেঁকিয়ে ভ্রূকুটি করে দীপের পানে চাইল।

দীপের গলায় বিকৃত বেপরোয়া হাসি ফুটে উঠল। সে নর্তকীকে বলল, 'থামলে কেন—নাচো নাচো।'

নর্তকী আবার নাচ আরম্ভ করল। দীপ কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে তার নাচ দেখতে লাগল।

ভিড়ের মধ্যে বসে সেওলাল চোখ কুঁচকে দীপের পানে তাকিয়ে দেখছিল। চেহারাটা ঠিক দীপেরই মত, তবু যেন ঠিক দীপ নয়। তাছাড়া দীপ বড়মানুষ, সে কি এরকম জায়গায় আসবে? সংশয়ে সেওলালের মন দোল খেতে লাগল। কিন্তু ও যদি সত্যিই দীপনারায়ণ হয়, তাহলে—। টাকা রোজগারের আর একটা রাস্তা পেয়ে লোভে সেওলালের চক্ষু তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। পুষ্পার সঙ্গে দীপের আসন্ন বিয়ের খবর তার অজানা ছিল না।

নাচ-গান শেষ হলে দীপ মেয়েটার দিকে একটা দশ টাকার নোট ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'সাবাস!'

সেওলাল এই সময় উঠে এসে দীপকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি দীপনারায়ণ রায়?'

দীপের মুখ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল, সে দু'হাতে সেওলালের গলা চেপে ধরে পাগলের মত ঝাঁকানি দিতে লাগল। হৈ-হৈ কাণ্ড বেধে গেল ; ধস্তাধস্তি মারামারি চীৎকার—

পরদিন সকালে কেশো চা নিয়ে দীপের ঘরে গিয়ে দেখল, দীপ বিছানায় অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

বেলা আন্দাজ ন'টার সময় সেওলাল রাজমোহনের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিল এবং রাজকে গত রাত্রির কথা সবিস্তারে শোনাচ্ছিল। এই সময় রণবীর হাতে একটি ফুলের তোড়া নিয়ে পূর্ণিমার সঙ্গে দেখা করতে এল। সে পায়ে হেঁটে এসেছে, তাই তার আসার কথা রাজ জানতে পারল না।

বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে রণবীর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, জানলা দিয়ে রাজ আর সেওলালের কথা শোনা যাচ্ছে।

রাজ মনের রাগ চেপে সেওলালকে বলছে, 'এবার কত টাকা চাও?'

সেওলাল বলল, 'বেশী নয়, শ' পাঁচেক।'

রাজ বলল, 'অত টাকা এখন হাতে নেই। এই পঞ্চাশ টাকা নিয়ে বিদেয় হও। যথেষ্ট দোহন করেছ, আর পাবে না।'

সেওলাল বলল, 'মাত্র পঞ্চাশ! এতে কী হবে। দীপনারায়ণবাবুকে পাথর গড়ানোর খবরটা দিলে অনেক বেশী বকশিশ পাব।'

'আচ্ছা আচ্ছা, পাঁচশো টাকাই দেব। কিন্তু আজ হবে না। কাল ব্যাঙ্ক থেকে টাকা বার করে দেব। কিন্তু তুমি আমার চাকরি ছেড়ে দিয়েও এখন বার বার আমার বাড়িতে এলে লোকে নানারকম সন্দেহ করবে। তার চেয়ে ঝর্ণার কাছে যে গুহা আছে, কাল সন্ধ্যেবেলা সেখানে দাঁড়িয়ে থেকো, আমি টাকা নিয়ে যাব। কেমন, রাজী?'

'রাজী।' সেওলাল পঞ্চাশ টাকা নিয়ে চলে গেল। রাজ কিছুক্ষণ আগুন-ভরা চোখ নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর দেরাজ খুলে একটা রিভলবার বার করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল।

রণবীর বাইরে থেকে সব শুনেছিল এবং বুঝেছিল যে রাজ কোনো বে-আইনী অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত আছে। কিন্তু সে যেন কিছুই জানে না এমনিভাবে বলল, 'কি হে, অনেক দিন তোমাদের খবর নেই তাই দেখতে এলাম। পূর্ণিমা কোথায়?'

রণবীরকে দেখে রাজ হকচকিয়ে গিয়েছিল, সামলে নিয়ে বলল, 'পূর্ণিমার শরীর ভাল নয়, সে নিজের ঘরে শুয়ে আছে।'

'তাই নাকি! কী হয়েছে?'

'মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড়—এই সব।'

'ও—তা আমি একবার তার সঙ্গে দেখা করতে পারি?'

'মাফ করবেন রণবীরবাবু, আমাদের বাড়ির রেওয়াজ নয়। কুমারী মেয়ের শোবার ঘরে—'

'আচ্ছা যাক', রণবীরের সন্দেহ হলো রাজ মিছে কথা বলছে— 'তুমিই না হয় ফুলগুলো তাকে দিও, বোলো আমি এসেছিলাম।'

ফুল নিয়ে রাজ বলল, 'আজ একজনের মুখে দীপ সম্বন্ধে একটা খবর শুনলাম। এত জঘন্য কথা যে বিশ্বাস হচ্ছে না।'

রণবীর ভ্রূ তুলে প্রশ্ন করল, 'দীপ সম্বন্ধে এমন কি কথা?'

রাজ তখন সেওলালের কাছে যা শুনেছিল, রণবীরকে বলল। শুনে রণবীরের মুখ গম্ভীর হলো, 'আচ্ছা আমি খোঁজ নেব।'

রণবীর চলে যাবার পর রাজ ফুলের তোড়া নিয়ে ওপরে গেল, তোষাখানার তালা খুলে পূর্ণিমাকে বলল, 'রণবীর তোমার জন্যে ফুলের তোড়া এনেছে। ব্যাপার কি? পুলিসের লোকের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা কিসের?'

পূর্ণিমা বলল, 'আমি মনে মনে ঠিক করেছি ওকে বিয়ে করব। তোমার হাত থেকে আমি নিষ্কৃতি চাই।'

'আমার নামে পুলিসের কাছে লাগাবে বলে নিষ্কৃতি চাও? পাবে না নিষ্কৃতি।' তোড়াটা পূর্ণিমার পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে রাজ চলে গেল।

রণবীর চিন্তান্বিত মনে ফিরে এল। বাড়িতে পুষ্পা মুখ শুকিয়ে বসে ছিল। রণবীর তাকে প্রশ্ন করল, 'কাল রাত্রে দীপকে তুই কোথায় নামিয়ে দিয়ে এসেছিলি?'

পুষ্পা দু'বার ঢোক গিলে বলল, 'ও আমাকে এখানে নামিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল।'

রণবীর বলল, 'তাহলে দীপের গাড়িটা আমাদের কম্পাউণ্ডে রয়েছে কি করে?'

এ প্রশ্নের উত্তর নেই; পুষ্পা মুখ নীচু করে রইল। রণবীর বুঝল পুষ্পা কাল রাত্রের কথা লুকোচ্ছে। সে আর প্রশ্ন না করে অফিসে গিয়ে কাজে বসল।

কিছুক্ষণ পরে দীপ পুষ্পার কাছে এল। তার মনে অপরাধের ছায়া নেই, কাল রাত্রির কথা সে সম্পূর্ণ ভুলে গেছে। পুষ্পা কিন্তু তাকে দেখে শক্ত হয়ে বসল, শুকনো গলায় বলল, 'কাল রাত্রে আমাকে গাড়িতে বসিয়ে কোথায় গিয়েছিলে?'

'কোথায় গিয়েছিলাম?' দীপ চকিত হয়ে চাইল।

কিছুক্ষণ কথা-কাটাকাটির পর পুষ্পা অধীরভাবে বলে উঠল, 'মিছে তর্ক করে লাভ নেই। তুমি যেখানে ইচ্ছে যেতে পার। আমি বাধা দেবার কে। যাবার সময় নিজের গাড়িটা নিয়ে যেও।'

পুষ্পা উঠে চলে গেল। দীপ মর্মাহতভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বাইরে এসে দেখল তার গাড়িটা কম্পাউণ্ডের এক কোণে রয়েছে। তার ভারি ধোঁকা লাগল। কাল রাত্রে সে পুষ্পাকে নিয়ে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল...তারপর কী হয়েছিল আর কিছু তার মনে নেই।

রাজমোহন ও সেওলালের মধ্যে যে রহস্যময় কথাবার্তা রণবীর আড়াল থেকে শুনেছিল তাতে তার বুঝতে বাকি ছিল না যে, ওরা দু'জনে প্রচ্ছন্নভাবে কোনো বে-আইনী কাজে লিপ্ত আছে। তাই পরদিন বিকেলবেলা সে পকেটে রিভলবার নিয়ে দু'জন সাব-ইন্‌সপেক্টরের সঙ্গে ঝর্ণার কাছে গুহার মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে রইল।

সন্ধ্যে হয়-হয় এমন সময় সেওলাল এসে ঝর্ণার ধারে একটা পাথরের ওপর উবু হয়ে বসল এবং বিড়ি টানতে টানতে প্ল্যান আঁটতে লাগল, এখন যে-টাকাটা পাবে সেটা কিভাবে খরচ করবে; পেছনে গুহার মধ্যে যে পুলিস লুকিয়ে আছে তা সে জানতে পারল না।

ঝর্ণার জল যেখানে খাদের মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়েছে সেখানে ঝোপঝাড় জঙ্গল, দিনের বেলাও অন্ধকার। সেওলাল নিশ্চিন্ত মনে একটা বিড়ি শেষ করে আর একটা ধরাবার উদ্যোগ করছে এমন সময় রাজ ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে পা টিপে টিপে এগিয়ে এল। সেওলাল তাকে দেখতে পেল না। রাজ পকেট থেকে রিভলবার বার করে দশ হাত দূর থেকে সেওলালকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। সেওলাল চিত হয়ে পড়ে গিয়ে গোঙাতে লাগল। সেওলাল মরেনি দেখে রাজ তার কাছে এসে আবার গুলি ছুঁড়তে উদ্যত হয়েছে এমন সময় গুহার মধ্যে দ্রুত পদশব্দ শুনে সে চকিতে পিছু

ফিরে চাইল, তারপর তীরবেগে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রণবীররা অবশ্য রাজকে দেখতে পেয়েছিল এবং চিনতে পেরেছিল। তারা সেওলালের কাছে এসে দেখল, সে গুরুতর আহত হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে, কিন্তু মরেনি। তারা তখন তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে শহরের হাসপাতালে ভর্তি করে দিল এবং ডাক্তারকে বলে এল যে, সেওলালের জ্ঞান হলেই যেন পুলিসে খবর দেওয়া হয়।

দীপের সঙ্গে পুষ্পার মনান্তর হবার পর দীপের মনের অবস্থা খুবই খারাপ। সে-রাত্রে সত্যিই কী হয়েছিল তা সে স্মরণ করতে পারছে না, তাই তার মনে শান্তি নেই, সে সাহস করে পুষ্পার কাছে যেতে পারছে না, পাছে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ে। পুষ্পার মনেও সুখ নেই, নানারকম সন্দেহে তার মন নিরন্তর দগ্ধ হচ্ছে। সে-ও দীপেব কাছে যেতে পারছে না। গভীর মনঃপীড়ার মধ্যে দিয়ে তাদের দিন কাটছে।

কেশো দীপের মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু বার বার প্রশ্ন করেও দীপের কাছ থেকে সদুত্তর পায়নি। কেশোর ধারণা হয়েছিল অমাবস্যার রাত্রে দীপের ঘাড়ে ভূত চাপে। তাই এক মাস পরে যখন অমাবস্যা ফিরে এল তখন সে এক মতলব করল ; রাত্রে দীপ নিজের ঘরে শুতে যাবার পর সে চুপি চুপি বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিল।

সে-রাত্রে দীপের ঘুম ভাঙল ঠিক বারোটার সময়। তার মুখে ক্রুর পাশবতা ফুটে উঠল। দোর খুলতে গিয়ে যখন দেখল দোর বন্ধ, তখন তার মুখের চেহারা আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। সে ছুটে গিয়ে খোলা জানলা দিয়ে তাকাল ; দোতলা থেকে অন্ধকার বাগানে কিছু দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু একটা বোগেনভিলিয়ার লতা নীচে থেকে উঠে জানলাকে ঘিরে ধরেছে। দীপ জানলা দিয়ে বেরিয়ে লতা ধরে ধরে মাটিতে নেমে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কেশো দোরে তালা লাগিয়ে দোরের বাইরে মাদুর পেতে শুয়েছিল, ঘরের মধ্যে শব্দ শুনে তার ঘুম ভেঙে গেল। সে নিঃশব্দে তালা খুলে ঘরে ঢুকল ; দেখল বিছানা শূন্য, পাখি উড়েছে।...

নিশাচর পাখি উড়ে গিয়ে শহরের এক নিকৃষ্ট জুয়ার আড্ডায় বসেছিল। খেলাড়িরা সবাই চোর বাটপাড় গুন্ডা। খেলতে খেলতে ঝগড়া বেধে গেল, তারপর মারামারি। দীপ আলো নিভিয়ে দিল। অন্ধকারে হাতাহাতি চলতে লাগল...

জুয়ার আড্ডা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে দীপ রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে, তার গলার মধ্যে গভীর উপভোগের হাসি। যেতে যেতে সে থমকে দাঁড়াল। রাস্তার পাশে রণবীরের বাংলো। সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দীপ পিছনের একটা খোলা জানলা দিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করল। নাইট-ল্যাম্পের আলোতে বাড়ির ঘরগুলি চোরের মত হাতড়ে বেড়াতে লাগল।

পুষ্পা নিজের বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। ড্রেসিং-রুমে খুটখাট শব্দ শুনে তার ঘুম ভেঙে গেল। সে উঠে ড্রেসিং-রুমের দোরের কাছ থেকে উঁকি মেরে দেখল, দীপ তার ড্রেসিং-টেবিল থেকে কয়েকটি ছোটখাটো গয়না—কানের দুল, সোনার রিস্টওয়াচ—নিয়ে নিজের পকেটে পুরছে। পুষ্পার গলা থেকে অজ্ঞাতসারেই একটা ভয়ার্ত শব্দ বেরিয়ে এল। দীপ তাই শুনে চোখ তুলে চাইল, তারপর বিদ্যুদ্বেগে জানলা খুলে বাইরে লাফিয়ে পড়ল।

রণবীরের ঘুম ভেঙেছিল। সে এসে দেখল পুষ্পা দোরের সামনে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে প্রশ্ন করল, ‘পুষ্পা, কি হয়েছে?’

পুষ্পা শীর্ণ কণ্ঠে বলল, 'চোর। চোর এসেছিল।'

রণবীর বলল, 'অ্যাঁ! কোথায় চোর?'

পুষ্পা জানলার দিকে আঙুল দেখাল, 'ওই দিক দিয়ে পালিয়েছে।'

রণবীর জানলার কাছে গিয়ে বাইরে দেখল। চোর তখন পালিয়েছে। সে বলল, 'আমার বাড়িতে চোর! এত দুঃসাহস কার? তুই চোরের মুখ দেখতে পেয়েছিলি?'

পুষ্পা বিবর্ণ মুখে মাথা নাড়ল, 'না।'

তারপর রণবীর লোকজন ডেকে সারা বাড়ি বাগান তল্লাস করল, কিন্তু চোরকে ধরা গেল না।

পুষ্পা নিজের ঘরে গিয়ে আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল, শূন্যদৃষ্টিতে দেয়ালের পানে তাকিয়ে ভাবতে লাগল—একি সত্যি? না তার চোখের ভুল?

ওদিকে দীপ নিজের বাড়িতে ফিরে গিয়ে জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকল, চোরাই মাল সিন্দুকে রেখে বিছানায় শুয়ে পড়ল। ঠং ঠং করে দুটো বাজল। দীপের মুখের চেহারা আবার স্বাভাবিক হলো, চোখ ঢুলে এল। তারপর সে ঘুমিয়ে পড়ল।

দুটো বেজে যাবার পর কেশো চুপি চুপি আবার দীপের ঘরে ঢুকল। দেখল, দীপ অকাতরে ঘুমোচ্ছে। সে চোখ মুছে আবার দেখল। না, চোখের ভুল নয়, সত্যিই দীপ ঘুমিয়ে আছে।

এক মাস কেটে গেছে, দীপ পুষ্পাকে দেখেনি; শেষে আর থাকতে না পেরে সে রণবীরের বাড়িতে গেল।

রণবীর বাড়িতে ছিল না, সেওলালের জ্ঞান ফিরেছে খবর পেয়ে সে হাসপাতালে গিয়েছিল। পুষ্পা একা বসবার ঘরে ছিল। দীপ মুখে সঙ্কোচভরা হাসি নিয়ে তার কাছে গিয়ে বসল। পুষ্পার বুক ঢিব ঢিব করে উঠল, সে স্খলিত স্বরে প্রশ্ন করল, 'কাল রাত্রি দেড়টার সময় তুমি কোথায় ছিলে?'

দীপ খানিকক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইল; শেষে বলল, 'এ প্রশ্ন কেন? আমি যথারীতি নিজের ঘরে ঘুমোচ্ছিলাম।'

'এখানে আসনি?'

'এখানে আসতে যাব কেন?—পুষ্পা, আমার সম্বন্ধে তোমার মনে কি কোনো সন্দেহ হয়েছে? কী সন্দেহ আমাকে বলো। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

পুষ্পা কেঁদে ফেলল। তারপর চোখে আঁচল দিয়ে ঘর থেকে উঠে চলে গেল।

দীপ গভীর নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল।

হাসপাতালে সেওলালের জ্ঞান হয়েছে; তার আঘাত গুরুতর হলেও প্রাণের আশঙ্কা নেই। সে রণবীরের কাছে জবানবন্দী দিয়েছে; সত্যি কথাই বলেছে। রণবীর ডাক্তারকে বলে গেছে যে পুলিসের হুকুম না পাওয়া পর্যন্ত সেওলালকে হাসপাতাল থেকে যেন ছাড়া না হয়।

হাসপাতাল থেকে রণবীর দীপের বাড়িতে গেল। সেখানে কেশো দীপকে জেরা করছে—'কাল রাত্রে কোথায় গিয়েছিলে? আমি দোরে তালা দিয়েছিলুম তবু কি করে ঘর থেকে বেরুলে?' দীপ জবাব দিতে পারছে না, কিন্তু তার মনেও নিজের সম্বন্ধে সন্দেহ জেগেছে। সত্যিই কি অলৌকিক ব্যাপার নাকি!

রণবীর আসতেই কেশো চলে গেল। রণবীর দীপের পাশে বসে সস্নেহ স্বরে বলল, 'দীপ, তোমার নামে অনেক রকম কথা কানে আসছে। কী ব্যাপার বলো তো?

শরীর খারাপ, না টাকার টানাটানি? আমার কাছে সঙ্কোচ করো না, সব কথা খুলে বলো।'

দীপ আস্তে আস্তে বলল, 'রণবীরবাবু, আপনি পুষ্পার দাদা, আমার পরমাত্মীয়, আপনার কাছে আমার কিছুই গোপন নেই। বিশ্বাস করুন, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমাকে সবাই সন্দেহ করছে; পুষ্পা সন্দেহ করছে, আপনি সন্দেহ করছেন, এমন কি আমার চাকর কেশো পর্যন্ত আমাকে সন্দেহ করছে। কিন্তু কিসের সন্দেহ? কি করেছি আমি?'

রণবীর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দীপের পানে চেয়ে থেকে প্রশ্ন করল, 'তুমি কোনো দিন দুপুর রাত্রে জুয়ার আড্ডায় গিয়েছিলে?'

দীপ চোখ কপালে তুলে বলে উঠল, 'জুয়ার আড্ডায়! কখনো না। রণবীরবাবু, আমার অনেক দোষ থাকতে পারে, কিন্তু আমি জুয়াড়ী নই।'

আরো কিছুক্ষণ প্রশ্নোত্তরের পর রণবীর বাড়ি ফিরে এল, পুষ্পাকে বলল, 'দীপের কিছু একটা হয়েছে, সন্দেহ হচ্ছে তার মস্তিষ্ক সুস্থ নয়। তার মাথায় যে চোট লেগেছিল তার জের এখনো কাটেনি। ব্রেন-স্পেশালিস্টকে আর একবার কল দেব ভাবছি।'

অমাবস্যা। দীপ নিজের ঘরে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। কেশো বাইরে থেকে দোরে তালা লাগিয়েছে। দীপের ঘুমন্ত মুখ শিশুর মুখের মত সরল।

মধ্যরাত্রির ঘড়ি বাজল। দীপ ধীরে ধীরে চোখ খুলল, ধীরে ধীরে তার মুখে চোখে বিষাক্ত ক্রূরতা ফুটে উঠল। বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে সে দরজা খুলতে গেল। কিন্তু দরজা খুলল না; কেশো দরজায় তালা লাগিয়েছে। দীপ তখন জানলা দিয়ে নেমে রাস্তায় নামল। আজ তার লক্ষ্য রাজমোহনের বাড়ি।

রাজের বাড়ির ফটকে পাহারাদার। দীপ পিছন দিকের পাঁচিল টপকে বাড়িতে ঢুকল। অন্ধকারে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে বেড়াবার পর দীপ একটা ঘরে নাইট-ল্যাম্প জ্বলছে দেখে উঁকি মারল, দেখল রাজ নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে; সে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল। রাজের মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে দেখল, তার বালিশের পাশে একগোছা চাবি রয়েছে। দীপ চাবির গোছা মুঠিতে ধরে তুলে নিল, রাজের ঘুম ভাঙল না। দীপ ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

সামনেই দোতলায় ওঠবার সিঁড়ি। দীপ ওপরে গিয়ে দেখল একটা দোরে তালা ঝুলছে। সে চাবির গোছা থেকে পর পর কয়েকটা চাবি তালায় লাগিয়ে দেখল, শেষে তালা খুলে গেল। দীপ কুটিল হেসে ঘরে ঢুকল।

ঘরে ঢুকেই কিন্তু সে চমকে উঠল। ঘরের চারিদিকে সারি সারি লোহার সিন্দুক, মাঝখানে মেঝেয় বিছানা পেতে পূর্ণিমা ঘুমোচ্ছে। দীপ সাবধানে পূর্ণিমাকে পাশ কাটিয়ে সিন্দুকের দিকে গেল, একটা সিন্দুকের তালা খুলতেই দেখল, ভিতরে হীরা-জহরতের গয়না রয়েছে। সে গয়নাগুলো নিয়ে নিজের পকেটে পুরতে লাগল।

একটা গয়না হাত ফসকে মেঝেয় পড়ল, ঝনাৎ করে শব্দ হলো। অমনি পূর্ণিমার ঘুম ভেঙে গেল। সে বিছানায় উঠে বসে চীৎকার করে উঠল—'অ্যাঁ—কে? চোর চোর!'

দীপ ঘাড় ফিরিয়ে চাইল। পূর্ণিমা তাকে চিনতে পারল, অমনি তার চীৎকার মধ্যপথে থেমে গেল। দীপ আর দাঁড়াল না, ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নীচে রাজের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সে ধড়মড়িয়ে উঠে দেখল বালিশের পাশে চাবি নেই। এক লাফে খাট থেকে নেমে সে দোতলায় ছুটল।

সিঁড়ির মাঝখানে দু'জনের ঠোকাঠুকি। রাজ দীপকে আঁকড়ে ধরে চেঁচাতে লাগল, দু'জনে একসঙ্গে গড়িয়ে গড়িয়ে নামতে আরম্ভ করল। তারপর দীপ এক ঝটকায়

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে রাজের পেটে মারল এক লাথি। রাজ দু-হাতে পেট ধরে গোঙাতে লাগল। দীপ ছুটে পালাল।

খানিক পরে রাজ সামলে নিয়ে দোতলায় গিয়ে দেখল তোষাখানার দোর খোলা, পূর্ণিমা অজ্ঞান হয়ে মেঝেয় পড়ে আছে। রাজ তার মুখে জলের ছিটে দিতেই তার জ্ঞান হলো, সে কেঁদে উঠল, 'এ আমি কী দেখলাম! না না, হতেই পারে না।'

রাজের চোখ দপ করে উঠল, 'তাহলে চোরকে তুই চিনেছিস! কে—কে লোকটা?'

পূর্ণিমা বলবার জন্যে ঠোঁট খুলে আবার বন্ধ করল। তার ভাবগতিক দেখে রাজের সন্দেহ বেড়ে গেল, সে ধমক দিয়ে বলল, 'চুপ করে আছিস যে! শিগ্‌গির বল্‌।'

পূর্ণিমা বলল, 'আমি—আমি জানি না।'

'জানিস না!' রাজ তার হাত ধরে মোচড় দিল, 'বল্‌ শিগ্‌গির, নইলে হাত ভেঙে দেব।'

'বলছি বলছি।' পূর্ণিমা কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'দীপ।'

'দীপ! দীপনারায়ণ!' রাজ লাফিয়ে উঠল, 'দীপনারায়ণ আমার বাড়িতে চুরি করতে ঢুকেছিল! ওর ম্যানেজার ওর সব টাকা নিয়ে ভেগেছে. সেই থেকে ও চুরি ব্যবসা ধরেছে। ব্যস্‌, আর যাবে কোথায়! ধরেছি এবার বাছাধনকে। দেখি, এবার কেমন করে পুষ্পাকে বিয়ে করে! জেলে পাঠাব, লাপসি খাওয়াব, তবে আমার নাম রাজমোহন।'

সে আস্ফালন করতে লাগল।

দীপ নিজের বাড়িতে এসে দেয়াল বেয়ে জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকল, চোরাই মাল যথারীতি সিন্দুকে রেখে বিছানায় শুয়ে পড়ল। রাত্রি তখন দুটো।

কিছুক্ষণ পরে কেশো দোর খুলে ঘরে ঢুকল, দীপের বিছানার কাছে গিয়ে তার মুখ দেখল। কেশোর সন্দেহ এখন দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে, সে গায়ে নাড়া দিয়ে দীপের ঘুম ভাঙাল। দীপ বিছানায় উঠে বসল, 'কি ব্যাপার? রাত্রি কত? বাড়িতে আগুন লেগেছে না চোর ঢুকেছে?'

কেশো বলল, 'চোরই ঢুকেছে। কোথায় গিছলে তুমি?'

দীপ বলল, 'কোথায় গিয়েছিলাম মানে? আমি তো ঘুমোচ্ছিলাম।'

'ঘুমোচ্ছিলে! তাহলে তোমার হাতে রক্তের দাগ এল কি করে?'

দীপ নিজের হাত চোখের কাছে এনে দেখল, সত্যিই রক্তের দাগ। সে বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

কেশো বলল, 'জানলা দিয়ে লতা ধরে ধরে তুমি নীচে নেমেছিলে। কেন নেমেছিলে? কোথায় গিছলে?'

দীপ নিজের রক্ত-মাখা হাতের দিকে তাকিয়ে যেন আপন মনেই বলে, 'ঘুমের ঘোরে হয়তো নিজেই আঁচড়ে ফেলেছি—'

কেশো বলল, 'লতার কাঁটায় হাত কেটেছে। এ-ঘরে এস দেখি, আমার নানারকম সন্দেহ হচ্ছে। সিন্দুকটা খুলে দেখ।'

পাশের ঘরে গিয়ে সিন্দুক খুলে দীপ হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইল, 'এত সব দামী দামী জড়োয়া গয়না—অ্যাঁ, এ যে পুষ্পার কানের দুল। এসব আমার সিন্দুকে এল কোত্থেকে?'

কেশো বলল, 'কোত্থেকে আবার, তুমি চুরি করে এনেছ। দুপুর রাত্রে তোমাকে ভূতে পায়, তুমি ঘর ছেড়ে বেরোও, তারপর চুরি ডাকাতি খুন, কী করে বেড়াও তুমি জানো। দু'ঘণ্টা পরে ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়। তখন ভূতটা তোমাকে ছেড়ে পালায়।'

ধন্দ-লাগা মুখ নিয়ে দীপ ফিরে গিয়ে বিছানার পাশে বসল, বলল, 'কেশো, এসব কি

সত্যি?'

'ভগবান জানেন, সব সত্যি!'

দীপ আত্মগতভাবে বলতে লাগল, 'তাহলে আমি একটা চোর...জানি না আরো কত অপরাধ করেছি। শেঠ আম্বালালের বাড়ির চুরি, পুষ্পার গয়না চুরি, আরো যত চুরি হয়েছে, সবই আমার কাজ। আজ রাত্রে কোথায় গিয়েছিলাম! কেশো, এ আমার কী হলো?'

কেশো গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর আস্তে আস্তে চলে গেল। দীপ উঠে গিয়ে টেবিলের সামনে বসল, গালে হাত দিয়ে মোহাচ্ছন্নের মত বসে অস্ফুট স্বরে বলল, 'পুষ্পাকে কোন্ মুখে বিয়ে করতে চাইব? চোরকে কে বিয়ে করবে?'

কিছুক্ষণ পরে মনকে দৃঢ় করে সে কাগজ-কলম নিয়ে পুষ্পাকে চিঠি লিখতে বসল।

দীপের চিঠি পেয়ে পুষ্পা অঝোরে কাঁদছে। রণবীর তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে। সে বলছে, 'কাঁদিসনে পুষ্পা, দীপ যে তোকে চিঠি লিখে বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে দিয়েছে, এ থেকেই বোঝা যায় তার মনে পাপ নেই। কিছু একটা হয়েছে, মানসিক ব্যাধি। ডাক্তার দেখানো দরকার। স্পেশালিস্টকে খবর পাঠিয়েছি, দু'এক দিনের মধ্যেই এসে পড়বেন।'

এই সময় গম্ভীর মুখে রাজমোহন প্রবেশ করল; দু'জনকে লৌকিক অভিনন্দন করে বলল, 'মিস্টার রণবীর, আপনি আমাদের প্রধান পুলিস অফিসার, তাই থানায় না গিয়ে আপনার কাছেই একটা নালিশ জানাতে এসেছি।'

পুষ্পার মুখে শঙ্কার ছায়া পড়ল। রণবীর রাজকে প্রশ্ন করল, 'কি রকম নালিশ?'

রাজ বলল, 'কাল রাত্রে আমার বাড়িতে চোর ঢুকেছিল, কিছু গয়না নিয়ে পালিয়েছে। পালাবার আগে আমি আর পূর্ণিমা তাকে চিনতে পেরেছি।'

'চিনতে পেরেছ! কে লোকটা?'

রাজ একবার আড়চোখে পুষ্পার পানে চেয়ে বলল, 'আপনাদের খুবই চেনা লোক—দীপনারায়ণ।'

পুষ্পা উঠে দাঁড়াল, ক্ষণেক নির্বাক থেকে তীব্র কণ্ঠে বলে উঠল, 'এ হতে পারে না, মিথ্যে কথা!'

রণবীর উদ্বিগ্ন স্বরে বলল, 'তোমরা বোধহয় ভুল করেছ রাজ। দীপ চুরি করবে এটা কি বিশ্বাসযোগ্য?'

রাজ বলল, 'শেঠ আম্বালালের বাড়িতে চুরি হয়েছিল মনে আছে? তিনিও দীপকে দেখেছিলেন, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেননি। এখন আর সন্দেহের অবকাশ নেই, ইদানীং শহরে যত চুরি হয়েছে সব দীপের কাজ। আমি এই গুরুতর অভিযোগের সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে তার নামে অভিযোগ আনছি। আপনি লোকজন নিয়ে তার বাড়ি সার্চ করুন, আমার বিশ্বাস সব চোরাই মাল পাওয়া যাবে।'

রণবীর গম্ভীর স্বরে বলল, 'আমি পুলিস অফিসার, তুমি যখন অভিযোগ এনেছ তখন আমাকে অনুসন্ধান করতেই হবে। আমি এখনি থানায় যাচ্ছি, সেখানে তোমার নালিশ লিখে নিয়ে দীপের বাড়িতে যাব। এস আমার সঙ্গে।'

পুষ্পা বলল, 'দাদা, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।'

দীপ নিজের ড্রইং-রুমে নিঝুম হয়ে বসে ছিল, কেশো ছুটে এসে খবর দিল, 'পুলিস! একদল পুলিস এসেছে। সঙ্গে রণবীরবাবু, পুষ্পাদিদি আর রাজমোহন।

কী করব, সদর বন্ধ করে দেব?'

ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে দীপ বলল, 'না, এখানে নিয়ে এস।'

'কিন্তু—', কেশো ইতস্তত করছে, এমন সময় রণবীর সদলবলে ঘরে ঢুকল। দলের পিছনে শঙ্কিত মুখে পুষ্পা।

রণবীর দীপের সামনে এসে আবেগহীন কণ্ঠে বলল, 'তোমার বাড়ি খানাতল্লাস করার পরোয়ানা আছে, তোমার বাড়িতে নাকি চোরাই মাল আছে। (রাজকে দেখিয়ে) এই ভদ্রলোকের অভিযোগ, তুমি কাল রাত্রে এ'র বাড়িতে ঢুকে চুরি করেছ। তোমার কিছু বলবার আছে?'

দীপ একে একে সকলের মুখের পানে চাইল, শুকনো গলায় বলল, 'না, কিছু বলবার নেই। আপনার যা কর্তব্য আপনি করুন।'

রণবীর ইন্সপেক্টরকে খানাতল্লাসের হুকুম দিল। দারোগা দলবল নিয়ে বাড়ির চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ড্রইং-রুমে রইল কেবল দীপ, পুষ্পা আর রণবীর। কিছুক্ষণ কথাবার্তা নেই।

পুষ্পা এক পা এক পা করে দীপের চেয়ারের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল, ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, 'তুমি একবার বলো তুমি নির্দোষ, আমি তোমাকে বিশ্বাস করব।'

দীপ কিছুক্ষণ শক্ত হয়ে বসে রইল, উত্তর দিল না। তারপর হঠাৎ উঠে গিয়ে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল।

ওদিকে পুলিসের দল বাড়ির একতলা দোতলা খানাতল্লাস করে বেড়াচ্ছে, সঙ্গে রাজমোহন আর কেশো। রাজমোহনের মুখে উত্তেজিত আগ্রহ, কেশোর চোখে বিস্ফারিত আতঙ্ক। সব ঘর শেষ করে তারা দীপের শোবার ঘরে উপস্থিত হলো।

ড্রয়িং-রুমে অখণ্ড নীরবতা। দোতলা থেকে উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনে তিনজনে ঘাড় তুলে চাইল। তারপর বিজয়ী সেনাপতির মত আগে আগে রাজমোহন প্রবেশ করল, তার পিছনে অঞ্জলি-ভরা গয়না নিয়ে ইন্সপেক্টর।

রাজমোহন সগর্বে গয়নার দিকে আঙুল দেখিয়ে রণবীরকে বলল, 'এই দেখুন চোরাই গয়না। সব ওর সিন্দুকের মধ্যে ছিল।'

ইন্সপেক্টর বলল, 'কেবল রাজমোহনবাবুর বাড়ির জিনিস নয় স্যার, শেঠ আম্বালালের বাড়ির জিনিসও সিন্দুকে ছিল।'

রাজমোহন অট্টহাস্য করে উঠল, 'চোর! দেখছেন কি, গ্রেপ্তার করুন। যেই ম্যানেজার টাকা নিয়ে পালালো অমনি চুরি ব্যবসা আরম্ভ করল। শুধু ভাত-কাপড় তো নয়, খারাপ পাড়ায় যাবার পয়সাও তো চাই।'

রণবীর কড়া সুরে বলল, 'তুমি চুপ কর। দীপ, তুমি কিছু বলবে?'

দীপ একবার সকলের দিকে তাকাল; সবাই একদৃষ্টে তার পানে চেয়ে আছে, পুষ্পার চোখে নির্নিমেষ প্রতীক্ষা। দীপ একটা নিশ্বাস ফেলে উদাস কণ্ঠে বলল, 'কিছু না। আমার যা বলবার আমি আদালতে বলব। আমাকে গ্রেপ্তার করুন।'

পুষ্পা ছুটে এসে তার বুকের ওপর আছড়ে পড়ল। রণবীর তার হাত ধরে সরিয়ে এনে ইন্সপেক্টরের দিকে ঘাড় নাড়ল, অর্থাৎ গ্রেপ্তার কর।

দীপ জামিন চায়নি, হাজতে আছে। কয়েকদিনের মধ্যেই তার মামলা এজলাসে উঠবে।

রণবীর ব্রেন-স্পেশালিস্ট ডাক্তারকে আনিয়েছে। রণবীরের বাড়িতে ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে, পুষ্পা চুপ করে বসে শুনছে। ডাক্তার বললেন, 'মানুষের প্রকৃতির এমন হঠাৎ পরিবর্তনে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অনেক কারণেই এমন হতে পারে।

সেই দুর্ঘটনায় ওঁর মাথায় আঘাত লেগেছিল ; বাইরে থেকে ওঁকে সুস্থ বলে মনে হয়, কিন্তু মস্তিষ্কের আঘাতটা ভিতরে ভিতরে রয়েই গেছে। ওঁর দুর্ঘটনা ঘটেছিল রাত্রি বারোটা থেকে দুটোর মধ্যে ; তাই মাঝে মাঝে রাত্রি বারোটা থেকে দুটোর মধ্যে ওঁর মস্তিষ্কে anti-social প্রবৃত্তি চাগাড় দিয়ে ওঠে। এটা কিছু নতুন ব্যাপার নয়, আমাদের মনোবিজ্ঞানে এর অনেক উদাহরণ আছে। মানুষের অবচেতন মনের মধ্যে তো সর্বদাই দেবাসুরের লড়াই চলছে।'

রণবীর বলল, 'এ রোগের কি কোনো প্রতিকার নেই? তাহলে আপনাকে খুলেই বলি, আমার চিন্তার বিশেষ কারণ, ওর সঙ্গে আমার বোনের বিয়ে পাকা হয়ে আছে।'

ডাক্তার সহানুভূতি-ভরা চোখে পুষ্পার পানে চাইলেন, 'দেখুন, কেসটা একটু নতুন ধরনের। প্রচন্ড ঝাঁকুনি লাগার ফলে মস্তিষ্কের কোনো অংশ একটু স্থানচ্যুত হয়েছে, এর কোনো ওষুধ নেই। হয়তো কালক্রমে মস্তিষ্কের বিচ্যুত অংশ আবার স্বস্থানে ফিরে আসবে। কিংবা আবার যদি মাথায় ঠিক ওই রকম আঘাত লাগে তাহলেও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসতে পারে। এ ছাড়া আর তো কোনো উপায় দেখছি না।— আচ্ছা, মামলাটা কবে কোর্টে উঠবে বলুন তো?'

রণবীর বলল, 'পরশু।'

ডাক্তার বললেন, 'সে সময় আমার কোর্টে থাকা দরকার। (পুষ্পাকে) আপনি হতাশ হবেন না মনে সাহস রাখুন। তারপর ভগবানের হাত।'

পূর্ণিমা এখনো তোষাখানায় বন্দী। রাজমোহন হাতে ওষুধের গেলাস নিয়ে তার কাছে গেল, বলল, 'এই ওষুধটা খেয়ে নে। ডাক্তার দিয়েছে।'

পূর্ণিমা উদাসীনভাবে বলল, 'কি এটা! বিষ নয় তো?'

রাজ বলল, 'না না, টনিক। খেলে শরীর চাঙ্গা হবে, জড়তা কেটে যাবে।'

পূর্ণিমা বলল, 'দাও, যা হয় হবে। মরণ হলে বাঁচি।'

ওষুধ খেয়ে সে শুয়ে পড়ল। রাজ নীচে নেমে এসে দেখল, রণবীর এসেছে। রণবীরের আচরণে ঘনিষ্ঠতার ভাব নেই। সে বলল, 'দীপের মামলায় পূর্ণিমা সরকারী পক্ষের বড় সাক্ষী। তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

রাজ এর জন্যে তৈরি ছিল, বলল, 'পূর্ণিমার সঙ্গে এখন তো দেখা হতে পারে না। সে বড় অসুস্থ, জ্ঞান নেই বললেই হয়।'

'অসুস্থ! জ্ঞান নেই! আমি নিজের চোখে দেখতে চাই।'

'আমার কথায় বিশ্বাস হচ্ছে না? বেশ, আসুন আমার সঙ্গে, নিজের চোখেই দেখুন।'

রাজ রণবীরকে নিয়ে পূর্ণিমার ঘরে এল। পূর্ণিমা ঘুমে অচৈতন্য। রণবীর তার নাড়ি দেখল, চোখের পাতা টেনে দেখল : রোগের কোনো লক্ষণ নেই, সন্দেহ হয় ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়ানো হয়েছে। সম্ভবত মর্ফিয়া।

রাজ বলল, 'দেখলেন তো, এখন কি ওর পক্ষে মামলায় সাক্ষী দেওয়া সম্ভব? তাছাড়া পূর্ণিমার সাক্ষী দেবার দরকারই বা কি? আমি যা দেখেছি সে তো তার চেয়ে বেশী কিছু দেখেনি। আমার কথা কি যথেষ্ট নয়?'

রণবীর উত্তর দিল না, দুজনে নীচে নেমে এল।

'আচ্ছা চলি।' রণবীর সদর দরজা পর্যন্ত গিয়ে হঠাৎ ফিরে দাঁড়াল, বলল, 'সেওলাল নামে তোমার একটা চাকর ছিল না? তাকে দেখছি না, সে কোথায়?'

আকস্মিক প্রশ্নের ধাক্কা সামলে নিয়ে রাজ বলল, 'সেওলাল! হ্যাঁ, ছিল বটে। লোকটা চোর ছিল, আমার পকেট থেকে টাকাপয়সা সরাতো। একদিন ধরে ফেললাম।

তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি।'

'ও—তাই নাকি?' রণবীর চলে গেল। যতক্ষণ তার গাড়ি দৃষ্টিবহির্ভূত না হলো ততক্ষণ রাজ চোখ কুঁচকে সেই দিকে চেয়ে রইল।

দীপের বিচার শুরু হয়েছে। আদালতে লোকের ভিড়। রণবীর, পুষ্পা, রাজমোহন সকলেই উপস্থিত। এক কোণে সেওলাল আধখানা মুখ ঢেকে বসে আছে। কাঠগড়ায় দীপ।

আদালতের সামনে একটা পুলিসের মোটরগাড়িতে দুজন পুলিস অফিসার বসে ছিল। যেন কিসের অপেক্ষা করছে।

এজলাসে হাকিম এসে বসলেন। পেশকার মোকদ্দমা পেশ করল। পাবলিক প্রসিকিউটার উঠে বক্তৃতা শুরু করলেন—May it please your honour রণবীর অলক্ষিতে এজলাস থেকে বেরিয়ে এসে প্রতীক্ষমান পুলিস-কারে উঠে বসল, কড়া সুরে বলল, 'রাজমোহনের বাড়ি—', গাড়ি বেরিয়ে গেল।

এজলাসে পাবলিক প্রসিকিউটার সরকারী বয়ান শেষ করলেন। হাকিম দীপের পানে চাইলেন ; তিনি একটু অপ্রতিভ, কারণ দীপের সঙ্গে আগে থাকতেই তাঁর পরিচয় আছে ; দুজনে এক ক্লাবের মেম্বার। একটু দ্বিধা করে তিনি বললেন, 'আপনার কৈফিয়ত? Guilty or not guilty?'

সকলের দৃষ্টি দীপের ওপর নিবদ্ধ হলো। দীপ একটু নীরব থেকে ধীরকণ্ঠে বলল, 'ধর্মাবতার, আমি চুরি করেছি কিনা তা আমি নিজেই জানি না।'

হাকিম ভ্রূ তুলে বললেন, 'তার মানে? ভেবে-চিন্তে কথা বলুন। আপনি অপরাধী কি-না?'

দীপ বলল, 'হুজুর, যখন চোরাই মাল আমার সিন্দুক থেকে পাওয়া গেছে তখন সম্ভবত আমি দোষী। কিন্তু আমিই যে চুরি করেছি একথা নিঃসংশয়ে বলতে পারি না।'

রাজমোহন ব্যঙ্গভরে হেসে উঠল। হাকিম তার পানে গভীর ভ্রূকুটি করে চাইলেন, তারপর দীপকে বললেন, 'আপনার বক্তব্য ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আমার প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দিন—Guilty or not guilty?'

এই সময় এজলাসের দোর দিয়ে প্রবেশ করল পূর্ণিমা, সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলল, 'ধর্মাবতার, এ প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারি।'

আদালতের মধ্যে একটা নতুন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। পূর্ণিমাকে দেখে রাজমোহনের মুখ শুকিয়ে গেল। তারপর সেওলাল যখন মুখের ঢাকা খুলে পূর্ণিমার পাশে গিয়ে দাঁড়াল তখন রাজ মনে মনে প্রমাদ গুনলো। সে পিছন ফিরে দেখল, রণবীর যেন তার পালাবার রাস্তা বন্ধ করবার জন্যেই তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে এবং কঠিন হাসি হাসছে।

সেওলাল হাতজোড় করে হাকিমকে বলল, 'হুজুর আমারও কিছু বলবার আছে।'

অতঃপর ব্রেন-স্পেশালিস্ট ডাক্তার দীপের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন, বললেন, 'ইয়োর অনার, এই কেস সম্বন্ধে আমিও কিছু জানি, আপনাকে তা জানানো দরকার। আমি একজন ব্রেন-স্পেশালিস্ট ডাক্তার ; কয়েক মাস আগে এই আসামী মাথায় আঘাত লেগে মরণাপন্ন হয়েছিলেন, তখন আমি এ'র চিকিৎসা করেছিলাম।'

আদালতে রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা। রাজমোহন দেখল, দীপের বিরুদ্ধে সে যে মোকদ্দমা গড়ে তুলেছিল তা ফেঁসে গেছে, সে নিজের ফাঁদে নিজে ধরা পড়েছে। সে পিছন ফিরে কোর্ট থেকে পালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু রণবীর দুর্লঙ্ঘ্য পাঁচিলের মত দাঁড়িয়ে

আছে। মরীয়া হয়ে সে পকেট থেকে রিভলবার বার করে চীৎকার করল, 'ছেড়ে দাও, আমার পথ ছেড়ে দাও—'

রণবীর খপ করে রাজমোহনের বন্দুক-সুদ্ধ হাত চেপে ধরে বলল, 'খবরদার, পালাবার চেষ্টা করো না। দীপনারায়ণ এবং সেওলালকে খুন করার চেষ্টার জন্যে আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করছি।'

রিভলবারের জন্যে কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি হলো ; ধস্তাধস্তির মধ্যে একটা গুলি বেরিয়ে গিয়ে দীপনারায়ণের মাথায় লাগল। মাথার খুলি ফুটো হলো না বটে, কিন্তু খুলির ওপর একটা গভীর দাগ কেটে গুলিটা পিছলে বেরিয়ে গেল। দীপ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

আরো কয়েকজন পুলিসের লোক এসে রাজকে চেপে ধরল, রণবীর তার হাত থেকে রিভলবার ছিনিয়ে নিল।

পুষ্পা ছুটে গিয়ে দীপের রক্তাক্ত মাথাটা নিজের বুকে চেপে ধরে কেঁদে উঠল—'ডাক্তার! ডাক্তার!'

ততক্ষণে আদালত-ঘর থেকে দর্শকের দল সব পালিয়েছে।

দীপের শয়ন-কক্ষ। রাত্রি বারোটা বাজতে বেশী দেরি নেই। বিছানায় দীপ চোখ বুজে শুয়ে আছে, তার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ঘরের মধ্যে আছে রণবীর, পুষ্পা, পূর্ণিমা, কেশো। ব্রেন-স্পেশালিস্ট ডাক্তার খাটের ধারে দাঁড়িয়ে দীপের মুখের পানে চেয়ে আছেন। পুষ্পা খাটের পাশে বসে নির্নিমেষ চোখে দীপের মুখ দেখছে ; তার মুখে আশা-আশঙ্কার চলচ্ছায়া।

ঘরের এক কোণে রণবীর আর পূর্ণিমা হাত-ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে এবং মাঝে মাঝে ফিসফিস করে কথা বলছে। কেশো অতৃপ্ত প্রেতের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে, একবার এর কাছে একবার ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে।

রণবীর খাটো গলায় পূর্ণিমাকে বলল, 'আজ রাত্রে তোমার বাড়ি গিয়ে কাজ নেই, তুমি বরং আমার বাংলোয় চল। তোমার বাড়িতে কেউ নেই, রাজমোহন হাজতে, এ সময় একলা তোমার নিজের বাড়িতে থাকা ঠিক হবে না।'

পূর্ণিমা বলল, 'পুষ্পার এই বিপদ, আমি কোথাও যাব না। পুষ্পা দীপকে এত ভালবাসে আমি বুঝতে পারিনি।—তুমি আমার দাদার চরিত্র জানতে পেরেছ। তা সত্ত্বেও আমাকে চাও?'

রণবীর বলল, 'তোমার দাদার চরিত্র এবং তোমার চরিত্র যে ঠিক বিপরীত তাও তো জানতে পেরেছি।'

'তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারবে?'

'বিশ্বাস না করতে পারলে তোমাকে বিয়ে করতে চাইব কেন?'

'আমি এক সময় দীপকে ভালবাসতাম, কিন্তু ও আমাকে চায়নি। তারপর কী যে হলো, দীপের ওপর থেকে আমার মন সরে গেল, বুঝতে পারলাম দীপ পুষ্পার, আর কারুর নয়।'

'আমি জানি পূর্ণিমা।'

'তোমাকে না জানিয়ে তোমাকে বিয়ে করতে পারব না তাই জানালাম।'

রণবীর তাকে আর একটু কাছে টেনে নিল।

কেশো ডাক্তারের কাছে গিয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'ডাক্তারবাবু, জ্ঞান হতে আর কত দেরি?'

ডাক্তার কেবল হাত তুলে তাকে আশ্বাস দিলেন। কেশো বিড় বিড় করে বলে

চলল, 'আজ আবার অমাবস্যা। আজকের দুপুর রাত্রে একটা ভূত ওর ঘাড়ে চাপে, তখন ও অন্য মানুষ হয়ে যায়—'

ডাক্তার আঙুল দেখিয়ে কেশোর দৃষ্টি দীপের মুখের দিকে আকর্ষণ করলেন।

দীপ এখনো অচৈতন্য, কিন্তু তার মুখের ওপর নানারকম ভাবের ব্যঞ্জনা একের পর এক খেলে যাচ্ছে। কখনো কপালে গভীর ভ্রূকুটি মুছে গিয়ে একটা বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠছে। তারপর ঠোঁটের কোণে একটু হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে, ঠোঁট একটু একটু নড়ছে, যেন সে অজ্ঞান অবস্থায় স্বপ্নে কথা কইবার চেষ্টা করছে—

নীচের একটা ঘরে ঠং ঠং করে বারোটা বাজতে আরম্ভ করল। নিস্তব্ধ রাত্রে সেই গম্ভীর আওয়াজে ঘরের সকলে যেন সচকিত হয়ে আরো গভীর আগ্রহে দীপের মুখের পানে চাইল।

ঘড়ির আওয়াজ থেমে যাবার পর দীপ আস্তে আস্তে চোখ খুলে চাইল। কিছুক্ষণ তার মুখ ভাবলেশহীন হয়ে রইল, তারপর কপালে ঈষৎ কুঞ্চন দেখা গেল।

ঘরের চারজন মানুষের শরীর শক্ত হয়ে উঠেছে, নিশ্বাস রোধ করে তারা তাকিয়ে আছে। কেবল কেশোর ঠোঁট একটু একটু নড়ছে, যেন সে ইষ্টনাম জপ করছে।

দীপের চোখ এদিক ওদিক ঘুরে পুষ্পার মুখের ওপর স্থির হলো। খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে সে পুষ্পার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিল, কোমল কণ্ঠে বলল, 'পুষ্পা, তুমি কবে আমায় বিয়ে করবে?'

পুষ্পা তার বুকের ওপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

ডাক্তার একটা নিশ্বাস ফেললেন।

'যাক, আর ভয় নেই।' তিনি কেশোর পেটে তর্জনীর খোঁচা দিয়ে বললেন, 'তোমার ভূত পালিয়েছে।'